গল্প-ভারতী

দুঃখহরণের সুখাকরণের উদ্ভাবনের লীলা

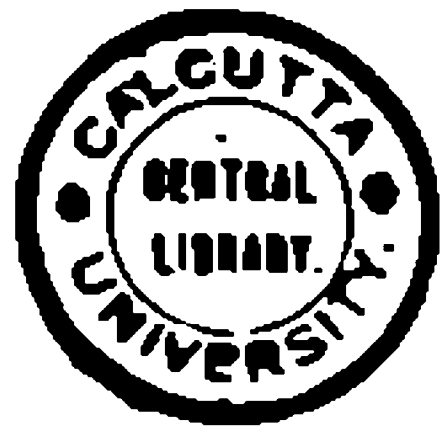

পূজার অর্ঘ্য

১৩৫৩

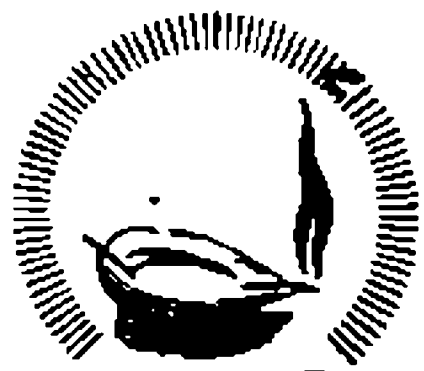

গল্প-ভারতী

759 b
005/2

সম্পাদক

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন
ভারতী সাহিত্য ভবন লিঃ
২৭৯ বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ
কলিকাতা

মূল্য সাড়ে-তিন টাকা

মুদ্রাকর
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস
দি ইষ্টার্ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৩৩, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দুর্লভ নয় মোটেই -

তনু দেহের পেলব কোমলতা ও লাবণ্য মণ্ডিত সৌন্দর্য সুষমা প্রকৃতির দুর্লভ দান। নিখিলস্রষ্টার পরম কাম্য বস্তু রূপের এই ঐশ্বর্য্য। প্রাকৃবৈজ্ঞানিক যুগে নারীর পক্ষে এই সম্পদ দুর্লভ ছিল বটে, কিন্তু একালে ক্যালকেমিকোর সযত্ন প্রস্তুত প্রসাধনী সৌন্দর্যকে প্রত্যেক নারীর হাতের কাছে এনে দিয়েছে

★ ফুকিলা স্নো
★ রেণুকা টয়লেট পাউডার
★ লাবণী স্নো এবং ক্রীম

ক্যালকাটা
কেমিক্যাল

এই গ্রন্থে আছে—

১।	সুভাষচন্দ্র	শ্রীকৃষ্ণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	১
২।	প্রতিশোধ	ডাঃ নরেশ সেন গুপ্ত	৩৩
৩।	আওয়াজ দি হুক	শ্রীকান্তি চন্দ্র ঘোষ	৪৫
৪।	ধরাল বন্ধুয়ারী	শ্রীকেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫২
৫।	শাদা পৃথিবী	শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	৭০
৬।	সর্প মঙ্গল	শ্রীউপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৫৮
৭।	একটি মেয়ের কথা	শ্রীমতী বাণী রায়	৮১
৮।	অনিবার্য্য	শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী	৯০
৯।	অন্ধকার	শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী	৯৮
১০।	ছায়া	শ্রীসুবোধ বসু	১০১
১১।	ব্লাড প্রেসার	শ্রীকৌশিক মোহন মুখোপাধ্যায়	১২০
১২।	ভাবী কালের কণ্ঠস্বর	শ্রীরমেন্দ্র দেব	১৩১
১৩।	ফুয়াডোর	শ্রীমতী সীতা দেবী	১৪১
১৪।	হেপাজাতের বাঘ	শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১৫৩
১৫।	আসল দখ	শ্রীমতী শান্তা দেবী	১৫৯
১৬।	বীজ মন্ত্র	শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়	১৬৮
১৭।	নূতন চোর	শ্রীসাধনেন্দ্রনাথ মজুমদার	১৮০

১৮।	বিশ্ব বান্ধব	শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী ১৮৫
১৯।	সহানুভূতি	শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯
২০।	মহাযুদ্ধের জন্ম	শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ১৯৫
২১।	কুলন পূর্ণিমা	রেখাচিত্র ২০১
২২।	প্রভাক্ষ সংঘর্ষ	শ্রীপ্রমথ নাথ বিশী ২০৯
২৩।	পূজারিণী	শ্রীমতী আশালতা সিংহ ২১৪
২৪।	সোনার হরিণ	শ্রীপাঁচু গোপাল মুখোপাধ্যায় ২১৭
২৫।	সিঙ্গাপুরের কাহিনী	শ্রীমতী নিরুপমা দত্ত ২২৪
২৬।	ক্রৌঞ্চ মিথুনের মিলন সেতু	শ্রীমতী অনুরূপা দেবী ২৩৮
২৭।	একটী জাপানী গল্প	শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ২৩৫
২৮।	মহুনা	অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্র নাথ মিত্র ২৭৮
২৯।	তৃনাদপি সুনীচেন	শ্রীদিলীপকুমার রায় ২৮৬
৩০।	আমার ছাত্র	শ্রীবিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১৯

গল্পানুবাদ :— বিভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হইতে

৩১।	পোপের খাদ্য	ডাঃ প্রবোধ চন্দ্র বাগচী ৩৩১
৩২।	বাদলা বিকেল	শ্রীঅমিতেন্দ্র নাথ ঠাকুর ৩৩৮
৩৩।	ঈশপের উপহার	শ্রীনরেশ চন্দ্র পাল ৩৪৩
৩৪।	পত্রনায়ক একটি পদরা	অধ্যাপক শ্রীসুরেন সেন ৩৪৮
৩৫।	দুমিত্রা কাহিনী	শ্রীনলিনী কান্ত ভদ্র ৩৬১
৩৬।	পুনে	শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ৩৬৮
৩৭।	পুনশ্চঃ (উপন্যাস)	"সমুদ্ধ" ৩৭৮

অভিজাত প্রসাধন-রেণু

ভৈরবী

মৃদু ও সুরভি
দেহ সৌন্দর্য্যকে
জাগ্রত করে

শিশুর কোমল অঙ্গেও নির্ভয়ে
ব্যবহার চলে

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা বোম্বাই

মুখবন্ধ

শ্রীমৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

তোমাকে স্মরণ করে, আমাদের এই শারদীয় গ্রন্থের সূচনা হলো।

পৃথিবীর এপারে থেকে কিম্বা ওপারে, তোমাকে প্রণাম!

প্রণাম তোমাকে, বাংলার যৌবনের হে দিব্য দীপ্ত বিকাশ,—

যেদিন তোমার এই জন্মভূমি নেতাহীন, পরিচালকহীন, যেদিন বাংলার প্রতিভা ম্লান মুমূর্ষু হয়ে ভারতের অন্য প্রদেশের মুখের দিকে অসহায়ভাবে চেয়ে ছিল যেদিন বাংলার নাম, বাঙালীর নাম, লোকে উপহাস করে উচ্চারণ করতে আরম্ভ করেছে...যেদিন আতঙ্ক, অবিশ্বাসে, আত্মকলহে, লোভে, মোহে, চৌর্য্যে, অপবাদে,

অগ্নিগর্ভ ভীরু মেষ-শাবকের মত তোমার স্বদেশবাসী পরস্পর পরস্পরকে পদ-দলিত করে কোন রকমে জীবন-ধারণ করে থাকবার উগ্র কুৎসিৎ আগ্রহে উন্মত্ত,

সেদিন, সেই নিদারুণ লজ্জার হাত থেকে, ঘোর বিচ্যুতির অপমান থেকে, সমগ্র জাতির সমষ্টিগত দৈন্যের, ভীরুতার, অসহায়তার অধঃপতন থেকে,

তুমি একা, তোমার চরিত্রে, তোমার কর্ম্মে, তোমার বাচনে, তোমার পরম-আহ্বানে, তোমার জন্মভূমিকে রক্ষা করেছ, তোমার স্বদেশবাসী সকলের হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছ...

মহা-অপমৃত্যুর হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করেছ। তোমাকে প্রণাম! কোটী কোটী প্রণাম!

প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে এমন একটা লগ্ন আসে, যখন একটী মানুষের মধ্যে সমগ্র জাতি বেঁচে থাকতে চায়।

বাংলার ইতিহাসের সেই মহা-লগ্নে, তুমি সেই একটী মানুষ...

প্রত্যেক জাতির জীবনে, শত সহস্র নামের মধ্যে, একটী নামে অসঙ্কোচে সকলে সাড়া দিয়ে উঠে।

বাংলার এই বিপন্ন জীবনে তুমি সেই একটী নাম :

যে-আশা সকলের মনে মূক হয়ে পড়ে ছিল...যে-স্বপ্ন হয়ে কেউ করেনি প্রকাশ...যে-কথা অব্যক্ত হয়ে কোটী চিত্তে ঘুরে মরেছে, অথচ পায়নি বাণী-রূপ.. যে পথ ছিল অন্ধকারে ঢাকা, পড়েনি যাতে কারুর চরণ-চিহ্ন—সে-আশাকে তুমি করেছ সফল.. সে-স্বপ্নকে তুমি করেছ সত্য, সে-অব্যক্ত অন্তরকে প্রাণের শব্দে তুমি করেছ বাঙ-ময়, সে-পথে পড়েছে তোমারই চরণ-চিহ্ন···

দিল্লীর পথে তোমার আহ্বান···ভারতের ইতিহাসের আহ্বান···তোমার স্বদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরই বিজয়-আহ্বান...

তোমাকে প্রণাম··কোটী কোটী প্রণাম।

তোমার মৃত্যু-সংবাদে সমস্ত জাতি আজ মুহ্যমান্।

মুহ্যমান্ অন্তর বিশ্বাস করে না সে-সংবাদ।

তুমি জীবিত আছ.. তুমি আবার একদিন আবির্ভূত হবে. এই আশায় সমগ্র জাতি আজ মৃত্যুময় মহাদুর্দিনে পথ চেয়ে আছে।

তোমার যে জন্মভূমিকে অপমৃত্যুর হাত থেকে তুমি রক্ষা করেছ, সে-দেশ আজ উন্মাদ আত্মঘাতি নেশায় নিজেকেই নিজে হত্যা করতে চলেছে

যুগ-সিন্ধু মন্থন করে উঠেছে আজ মহা-হলাহল, এ হলাহলে দেবতা দৈত্য দুই-ই হয়ে যাবে নিঃশেষ, তাদের কারুরই নেই শক্তি সে-বিষকে নিষ্ক্রিয় করতে, একমাত্র নীলকণ্ঠ তুমি...তুমিই পার আত্মস্থ করতে এই কাল-কূটকে...

তাই আজ দেবতা ও দৈত্য, দুই-ই আর্ত্ত চীৎকারে তোমাকেই আহবান করছে, এসো, এসো, হে নীলকণ্ঠ মহাপুরুষ! *

---

* সুভাষচন্দ্রের রোমাঞ্চকর জীবনী তিনি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ, জন্ম থেকে মান্দালয় জেল। দ্বিতীয় ভাগ, মান্দালয় জেল থেকে এলগিন্ রোডের বাড়ী থেকে অন্তর্ধান। তৃতীয় ভাগ, ভারতের বাইরে ইম্ফালের যুদ্ধ পর্যন্ত। বর্ত্তমান সংখ্যায় তার প্রথম অংশটী প্রকাশিত হলো। পরবর্তী অন্য অংশগুলি প্রকাশিত হবে।

(৯)

প্রথম পরিচয়ের এলো বিচ্ছেদ···অসহযোগ।

কটকে প্রোটেস্টাণ্ট মিশনারীদের স্কুল···সাহেব শিক্ষক···

সাহেবী-পোষাক-পরা ছাত্রের দল···বাইবেল···গড্ সেভ্ দি কিং!

স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে এসে বালক প্রায়ই বলে, ও-স্কুলে যাবো না!

শিক্ষ-পুত্রের অকারণ আবদার জানকী-সাহেব কাণে তোলেন না। পাশ্চাত্য সভ্যতার ঐশ্বর্য্য যদি আয়ত্ত করতে হয়, শৈশবের জ্ঞান-উন্মেষ থেকেই সেই আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হতে হবে!

তাই জানকী-সাহেব ছেলেবেলা থেকেই বালক-পুত্রকে মিশনারীদের স্কুলে দিয়েছেন। কড়া হুকুম, স্কুল ছাড়া বাড়ীর বাইরে পা রেখে না···পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে হৈ হৈ করবে না!

কিন্তু স্কুল থেকে বাড়ী এসে বালক রোজই সেই এক-কথা বলে। ক্রমশ জিদ্ ধরে।

শেষকালে একদিন পিতা বাধ্য হয়েই বালককে মিশনারী স্কুল থেকে ছাড়িয়ে দেশী স্কুলে ভর্ত্তি করে দিলেন। র‍্যাভেনশ কলিজিয়েট স্কুল।

বালকের মুখে হাসি ফুটে উঠে।

চারাগাছ নতুন দেশের টবে ভিজে মাটীর স্পর্শ পায়। অন্তরঙ্গে অতি-পরিচিত মাটী।

কটকের স্বনামধন্য সরকারী উকিল জানকীনাথের ছেলে সুভাষচন্দ্র র‍্যাভানশ কলিজিয়েট স্কুলে দেশী ছাত্রদের সঙ্গে এক বেঞ্চিতে এসে বসলো।

(২)

কিন্তু তফাৎ রয়ে গেল।

বালক চারদিকে চেয়ে দেখে, অন্য ছেলেদের পরণে ধুতি আর জামা, তারই শুধু বিলিতী পোষাক··· প্যাণ্ট আর কোট···হেডমাষ্টার বেণীবাবু ক্লাসে আসেন, সেই ধুতি আর চাদর।

একদিন ক্লাসের ছেলেরা দেখলো, সুভাষও ধুতি পরে এসেছে। সে আর প্যাণ্ট পরে আসবে না।

ছেলেরা পরম-বন্ধুর মত নবাগত বালককে তাদের দলে টেনে নিল।

সামান্য ব্যাপার কিন্তু হেডমাষ্টার বেণীবাবুর দৃষ্টি এড়ালো না। প্যাণ্ট থেকে ধুতির এই নিঃশব্দ পরিবর্ত্তনের মধ্যে এই শিক্ষাব্রতীর অন্তরাত্মা অসন্তুষ্টি সেদিন সেই মুহূর্ত্তেই বালকটীকে তীব্র ভর্ৎসনা দিল।

বাড়ীতে যখন জানকী সাহেব জানতে পারলেন, সুভাষ প্যাণ্ট বর্জ্জন ক'রে নিয়মিত ধুতি পরে স্কুলে যায়, তিনি পুত্রের কাছ থেকে কৈফিয়ৎ চাইলেন।

—এভাবে পোষাক বদলাবার মানে?

বালক শক্তি-সঞ্চয় ক'রে নির্ভীকভাবে উত্তর দেয়, এই তো আমাদের জাতীয় পোষাকে!

পুত্রের উত্তরের তীব্রতে জানকী সাহেব আর কোন প্রশ্ন করার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

তাঁর বন্ধু কলেজের অধ্যাপক রায়বাহাদুর গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলীকে এই ব্যাপার সম্পর্কে বলেন, সুবি এমন অদ্ভুতে নিভীকভাবে উত্তর দিল যে, তার কথাতেই আমাকে সায় দিতে হলো !

রায়বাহাদুর হেসে বলেন, উঠতি গাছ পত্তরেই চেনা যায়···সুবিকে লক্ষ্য করে যাবেন !

(৩)

কিন্তু সুবি পিতার অলক্ষ্যে বাড়ীর বাইরের নিষিদ্ধ জগতে নিঃশব্দে তার নিজের একটা ছোট্ট জগৎ গড়ে তুলতে লাগলো।

বছরের শেষে পরীক্ষার রিপোর্ট পিতার হাতে আসে, তাঁর সুবি শ্রেণীর সেরা ছেলে···ফার্ষ্ট বয়···তিনি সন্তুষ্ট।

সেই প্রোগ্রেস-রিপোর্টের আড়ালে পিতার দৃষ্টি তবু দেখতে পায়, পাঠ-বিরত কর্তব্যপরায়ণ ছাত্র··· শান্ত···নম্র···অন্তরঙ্গ···ভদ্র···

তার বেশী দেখবার প্রয়োজন আর হয় না। আর বেশী দেখবারও যে কিছু আছে তা পিতার মনেও হয় না।

কিন্তু পাঠ্য-পুস্তক ছাড়িয়ে ক্লাসের এই ফার্ষ্ট বয়ের দৃষ্টি তখন আর এক অপরূপ গ্রন্থে নিবদ্ধ হয়ে পড়েছে··· জীবন-গ্রন্থ···ছাপার অক্ষর নয়···জীবন্ত মানুষ

এই নতুন পাঠশালার গুরু-মশাই ছিলেন এক বেকার-মার্কা হোপা কর্মী···যাঁরা কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র গিরীশ বাগচী।

স্কুল আর কলেজের সব ছেলের কাছেই গিরীশ পরিচিত, কারণ ছেলেদের প্রতি ভালবাসায় প্রত্যেক বছরে প্রায় এক জায়গাতেই সে স্থায়ী হয়েই দাঁড়িয়ে থাকে···তাই পরীক্ষার উত্থান-পতনের মধ্যে অচল ঘড়ির কাঁটার মত সে সব ছাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সবাই তার কাছে এগিয়ে আসে···সেও সরে বেশী দূর যায় না। তাই স্কুলের ছোট বড় সব ছেলেরই সে বন্ধু। স্কুলের বাইরে সে তাদের দেবতা। সকলের গিরীশদা।

তার সমস্ত মনোযোগ টেনে নিয়েছিল, দুঃখী, দুঃস্থ লোকেরা, তাই হয়ত সে পাঠ্য-পুস্তকে আর তেমন মনঃসংযোগ করতে পারেনি। কোথায় কোন্ বুড়ো ঘরে চিকিৎসার-অভাবে কোন্ দুঃখী লোক অসহায়ভাবে কাৎরাচ্ছে···কোথায় এক মুঠী অন্নের অভাবে কে উপবাস দিচ্ছে···সারাদিন সেই ভালোতেই তার দিন চলে যায়। এই আর্ত্তসেবার উদ্দেশ্যেই ছাত্রদের নিয়ে সে একটী সেবাদল গড়ে তুলেছিল। তারই যখন তার দলের ছেলেরা শপথ করেছিল, সারাজীবন অবিবাহিত থেকে, আর্ত্তসেবায় জীবন-উৎসর্গ করবে ! বিদ্যুৎ কৈশোরের স্বপ্ন-অভিযান !

এই তন্ত্র স্বপ্নে ছেয়ে যায় সুভাষের মন। পিতার অজ্ঞাতে বালক এই সেবা-দলে যোগদান করে···

তার নতুন জগৎ ভরে ওঠে. বস্ত্রহীন, অন্নহীন, ব্যাধিগ্রস্ত অসহায় দীন-দুঃখী লোকে। যাদের কাছ থেকে দূরে থাকবার জন্যে জানকী-সাহেব কড়া হুকুম জারী করেছিলেন, অদূর ভবিষ্যতার ইঙ্গিতে বালক তাদেরই মধ্যে গিয়ে পড়লো।

(৪)

কল্পনায় দেখি, একটা ছোট ঘর·· বাড়ী থেকে আলাদা।

সেই ঘরে একে একে জড় হয়, একটা ছুটা করে, একদল তরুণ কিশোর। চোখের দৃষ্টিতে স্বপ্ন মাখানো··· যে-স্বপ্ন দেখতে পারে একমাত্র শুধু নবোদ্ভিন্ন কৈশোর···মুখে অনভিজ্ঞতার সুকোমল স্নিগ্ধতা···দেহের তন্ত্রীতে বিশ্বের-সকল-দুঃখ-দূর-করবার সঞ্জীবতা

ঘরের মেঝেতে একটা ছেঁড়া কর্দা চাদর···চাদরের শেষে একটা কাঠের চৌকি···চৌকির চারদিকে ধূপদানিতে ধূপ জ্বলছে···চৌকির ওপর ফ্রেমে-আঁটা একখানা ছবি···স্বামী বিবেকানন্দের ছবি···

নতজানু কিশোরেরা সেই পটকে প্রণাম জানায়।

আবেগ-আকুলকণ্ঠে বলে, হে মহাপুরুষ, হে মহাসন্ন্যাসী, ধর্ম জানি না, দেবতা জানি না, আমরা জানি শুধু তোমাকে·· তোমাকেই অনুসরণ করে আমরা চলবো জীবনের পথ। তুমি বলে গিয়েছ, মানুষের সেবা জীবনের সব চেয়ে বড় ধর্ম···সেই মানুষের সেবায় আমরা উৎসর্গ করলাম আমাদের জীবন···অনন্ত্য থেকে তুমি আশীর্বাদ করো আমাদের!

সভা ভেঙ্গে যায়। ছেলেরা ঘরে ফিরে চলে।

ঘরে, রাত্রিতে শোবার সময়, দেখি, কিশোর বালক বালিশের তলা থেকে একটী ছোট্ট ছবি বার করে। পরিব্রাজক বিবেকানন্দের ছবি। নীরবে প্রণাম জানায়।

কিশোর সুভাষ ঘুমিয়ে পড়ে।

তার জাগরণ, নিদ্রা, স্বপ্নকে আচ্ছন্ন করে থাকে, সেই বিদেহী মহাপুরুষের অলোক-অস্তিত্বের ছটা।

(৫)

ক্রমশঃ বালকের আসা যাওয়া সম্বন্ধে জননী চিন্তিত হয়ে পড়েন।

কখন বেরিয়ে যায়, কখন বাড়ী ফিরে আসে, কিছুরই ঠিক নেই।

ছুটির দিন ভোর না হতেই, বাড়ীর কেউ শয্যা থেকে না উঠতেই, বালক বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে। ফেরে রাত্রিতে।

তখন বাড়ীর বৃদ্ধা ঝি ঘরে আলো জ্বেলে ওঠে।

এই বৃদ্ধা ঝির সঙ্গেই বালকের একমাত্র সম্পর্ক। বালক সম্বন্ধে বাকীরা জননী যা না জানেন, এই বৃদ্ধা ঝি তা জানে।

একদিন জননী স্থির করলেন, সুবি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে। তাকে শাসন করা দরকার। সামনে প্রবেশিকা পরীক্ষা। অথচ বাড়ীতে একদণ্ড সে থাকে না। কোথায় যায়, কি করে, তাও কেউ জানে না। স্বভাবতই সে গম্ভীর, স্বল্পবাক। জিজ্ঞাসা করলে, কোন উত্তর পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

তাই সেদিন জননী অপেক্ষা করে আছেন, কখন পুত্র বাড়ী ফিরে।

বহুক্ষণ অপেক্ষা করে থাকার পর দেখেন, নিঃশব্দে সুবি রাত্রির অন্ধকারে বাড়ীতে ঢুকছে।

বাড়ী ঢুকেই যথারীতি বালক বৃদ্ধা মি-র ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

সন্তর্পণে জননী এসে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখেন, প্রদীপের আলোয় বৃদ্ধা মি বালকের পায়ে কতস্থানে ওষুধ লাগাচ্ছে···বালকের পায়ে যে অতখানি ক্ষত হয়েছে, জননী তা জানেন না পর্য্যন্ত।

—দেখ তো দেবব্রতা, মা দেখলে কি বলবেন ?

সেই বৃদ্ধা মির কাছে সেই বালক ছিল দেবব্রতা। বাংলাদেশের মধ্যে সেই নামহীনা নারীই প্রথম দেখেছিল, সেই বালকের মধ্যে তার অনাগত ভবিষ্যৎকে···অঙ্কুরের মধ্যে দেখেছিল অরণ্যের মহামহীরুহকে।

দরজা খুলে জননীকে ঘরে ঢুকতে দেখে, দেবব্রতা এবং বৃদ্ধা দুজনেই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করেন। বালক গম্ভীর হয়ে শোনে।

সেখান থেকে ব্যাপারটা পিতার কাছে গিয়ে পৌঁছল। পিতার আদরে এবং ঔদাসিন্যেই বালক এতখানি বাড়াবাড়ি করতে সাহস পেয়েছে !

পরের দিন ভোর না হতেই পিতা ঠিক করলেন, পুত্রকে বকবেন !

ভোর না হতেই বালক নিঃশব্দে যথারীতি বাড়ী থেকে বেরুবার জন্যে পা বাড়িয়েছে, এমন সময় পিতার গম্ভীর আহ্বানে ফিরে দাঁড়াতে হলো।

—তুমি রোজ কোথায় যাও ?

বালক স্থির কণ্ঠে উত্তর দেয়, রুগীর সেবা করতে।

পিতা চমকে ওঠেন,

—রুগীর সেবা ! মানে

বালক অপ্রতিভ না হয়ে জানায়, আপনি জানেন না, শহরে বসন্তের মহামারী দেখা দিয়েছে ?

—তাতে তোমার কি ? জানো, বসন্ত অতি মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগ !

—জানি ! আমরা খুব সাবধানে কাজ করি ! আমাদের দলের ছেলেরা না থাকলে, কত লোক যে অকালে মরে যেতো তার ঠিক নেই !

পুত্রের স্থির মূর্ত্তির দিকে চেয়ে পিতা সে-সম্পর্কে আর কোন কথা তুলেন না। কৃত্রিম রোষে বলে উঠলেন,

—দুদিন বাদে তোমার পরীক্ষা, সেদিকে তোমার হুঁস আছে ? পরীক্ষা না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি আর বাড়ীর বাইরে বেরুতে পারবে না ! যাও !

আষাঢ়ের মেঘের মত মুখ ভার ক'রে বালক বাড়ীর ভিতর দিয়ে যায়।

বৃদ্ধা ঝিকে ডেকে বলে দেয়, আমার ঘরে খাবার দিয়ে যাবি ! আমি ঘর থেকে বেরুবো না !

নিরুদ্ধ অভিমানে তিনদিন সেই ঘরে বসে বালক পরীক্ষার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগলো·····

পরীক্ষার ফলাফল বেরুলে, দেখা গেল, বালক বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে, প্রথম হয়েছেন, প্রথম নাথ সরকার*, মোট নম্বর পেয়েছেন, ৬১১; দ্বিতীয় পেয়েছেন, তাঁর চেয়ে মাত্র দুনম্বর কম।**

---

* বর্ত্তমানে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সরকার

** তৃতীয় হয়েছিলেন অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন, যাঁর একনম্বর কম পেয়ে

(৬)

৩নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট……

মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের মেস।

সেখানে মেডিক্যাল কলেজের একজন ছাত্রকে কেন্দ্র ক'রে একটী আড্ডা গড়ে উঠেছে…

ছাত্রটীর নাম সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় • (১) —সেই আড্ডার প্রাণ…

সাধারণতঃ মেসের আড্ডা বলতে যা বোঝায়, ইহা নয়। দেশের মাথা তখন জেগে উঠছে, এক নতুন যৌবন। মৃত্যুঞ্জয়ী এক মহা-সম্ভব।

তাঁদের সামনে বিবেকানন্দের বীর-সন্ন্যাস… বঙ্কিমের আনন্দমঠের দুধ-মন্দির-চূড়া……অরবিন্দের নব-জাতীয়তা……

সুরেশচন্দ্র সঙ্কল্প করেছেন, আজীবন কৌমার্য্য ব্রত পালন করে দেশের কাজে জীবন-উৎসর্গ করবেন…

দেশ আজ চায়, সমর্পিত-প্রাণ শুদ্ধচিত্ত তরুণের দল……তাজা প্রাণ……

তাই এই আড্ডার মধ্যে দিয়ে সুরেশচন্দ্র আকর্ষণ করেন, সমধর্ম্মী তরুণদের…

নব-জাগরণ…নবীন উৎসাহ, আদর্শবাদের দিব্য-গন্ধে ভরপুর বাংলার আকাশ…বাঙালীর মন…তরুণ বাঙালীর মন জেগে উঠেছে এক নবীন স্বপ্নে…

মির্জাপুরের আড্ডায় একটী, দুটী করে আসতে থাকে এই ধরণের আদর্শবাদী যুবক……

কটক থেকে প্রবেশিকা-পরীক্ষায় পাস করে কলকাতার-কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুভাষও এই আড্ডায় এসে পড়লেন…

বিচিত্র যোগাযোগের ফল…

বেণীবাবুর আর এক প্রিয় ছাত্র হেমন্তকুমার সরকার থাকতেন কৃষ্ণনগরে। আদর্শবাদী কিশোর!

বেণীবাবুর কাছ থেকে তিনি শুনেছিলেন, কটকে সুভাষের কথা…তাঁরই মত আদর্শবাদী, অমৃত ছেলে। সমবয়সী। আলাপ করবার জন্যে উৎসুক হয়ে ওঠে মন।

সুযোগ জুটিয়ে দিলেন বেণীবাবু।

হেমন্ত সরকার কটকে এসে উপস্থিত হলেন। অবশ্য সুভাষদের বাড়ীতে নয়।

সুভাষ খবর পেয়ে ছুটে এলেন।

অনুযোগের সুরে বলেন, মাষ্টার মশাই লিখেছেন, তুমি আমাদের বাড়ীতে উঠবে, তা ওঠনি কেন?

হেমন্ত বলেন, ভাই, তোমরা এত বড় লোক যে আমার মত গরীবের ওখানে উঠতে লজ্জা হয়।

কথাটা বাজল সুভাষের কোমল অন্তরে গিয়ে লাগে।

—বড় লোকের ঘরে জন্মেছি বলে খোঁটা দিলে, আমার কি অপরাধ বলো তো ভাই?

সেই থেকে সুরু হলো এই দুটী কিশোরের মধ্যে এক অপূর্ব্ব প্রণয়……

• (১) ইনিই পরে কুমিল্লায় ভরত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিখিলভারত হৈতসুমিলনের সভাপতি হন।

তাই কটক ছেড়ে সুভাষ যখন কলকাতায় পড়তে এলেন, তাঁর এই কিশোর বন্ধুই তাঁকে নিয়ে এসে সুরেশদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন।

সমধর্মীদের মধ্যে নিমেষের আলাপই পরিণত হয়ে যায় জীবন-সম্বন্ধে……

সেই তিন নম্বর বাড়ীর ঘরে বসে, কলেজের অবকাশে, এই নব-জাগ্রত তরুণের দল, স্বপ্ন দেখে……

প্রত্যেকেই তাঁরা স্থির করেছেন, সংসার-সুখ তাঁদের জন্যে নয়……আজন্ম কৌমার্য তাঁদের প্রথম ব্রত… সেই ব্রত অনুসরণ করে তাঁরা দেশের মুক্তির সাধনায় জীবন উৎসর্গ করবেন।

তখন নতুন করে বাংলার ইতিহাস লেখা হচ্ছে। গৌড়-পাণ্ডুয়া-মুর্শিদাবাদের বন-জঙ্গলে পরিত্যক্ত ভগ্ন-প্রাসাদ আর জীর্ণ মন্দিরগুলি নতুন করে বাঙালীকে আকর্ষণ করছে… …

পলাশীর মুক্ত মাঠ, গৌড়ের বন জঙ্গল… মুর্শিদাবাদের গঙ্গার তীর…তখন তরুণ বাঙালীর কাছে তার শ্রেষ্ঠতীর্থ হয়ে উঠেছে…

কলকাতায় এসেই সুভাষ ঠিক করলেন, সে-তীর্থ-পরিক্রমণে তিনি বেরুবেন।

কলেজের প্রথম গ্রীষ্মের ছুটিতে এবং অজয়ের দলের সঙ্গে সুভাষ বেরিয়ে পড়লেন…বিস্মৃত-স্মৃতি বাংলার ধূলোর মধ্যে জননীর অশ্রুক-মাখা পায়ের চিহ্ন খুঁজে বার করতে……বাংলার তরু-পল্লবের সঙ্গে নিজেদের তরুপল্লব মেলাতে।

কৃষ্ণনগর থেকে পলাশী……

পলাশীর সে আম্র-কানন নেই… পড়ে আছে শুধু ধূ-ধূ মাঠ আর তার মধ্যে ইংরেজ-সরকারের তৈরী এক স্মৃতিস্তম্ভ…

দলের মধ্যে কে একজন আবৃত্তি করে উঠলো, মোহনলালের শেষ-উক্তি…

শুনতে শুনতে সুভাষের স্থির গম্ভীর মুখে দুচোখ বেয়ে ধারা গড়িয়ে পড়লো……

সুরেশদা একটা খড়ি নিয়ে সেই স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখলেন, Monument of Glaring Treachery…

তাড়াতাড়ি চৌকিদার ছুটে এসে মুছে দিল……

সেখান থেকে মুর্শিদাবাদ…

হাজার-দোয়ারি, মোতিঝিল, সিরাজদ্দৌলার কবর, বহরমপুরে রাণী ভবানীর মন্দির……

সেদিন বাংলার সেই স্মৃতির শ্মশানে দাঁড়িয়ে, তরুণ সুভাষের মনে যে কি সঙ্কল্প জেগে উঠেছিল…সেই পরবাক আদর্শবাদী ছাত্রের মনে সেদিন নিজের হতভাগ্য দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে কি নিবিড় দৃঢ়তি দুরাকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল, তা আমরা আজ সহজেই অনুমান করতে পারি!

ফিরতে রাত হয়ে গেল।

নৌকো করে তাঁরা বহরমপুরে ফিরলেন।

বর্ষার গঙ্গা। জ্যোৎস্নার রাত। অন্তর পরিপূর্ণ অপূর্ব স্বপ্নে।

সঙ্গীরা অনুরোধ করলো সুভাষকে গাইবার জন্যে। অনেক কাকুতি-মিনতি।

সুভাষ গাইলেন,—ধের দূরে চক্রবিরণে উদ্ভাসিতা গঙ্গা…

(৮)

এলগিন রোডের বাসা থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজ……ট্রামে আসতে হয়। বাড়ীর দরজা থেকে ট্রাম-লাইন পাঁচ-ছ' মিনিটের রাস্তা।

ট্রাম-ভাড়া নিয়েই সুভাষ বাড়ী থেকে বেরুন কিন্তু এই পাঁচ-ছ' মিনিটের রাস্তা পেরিয়ে ট্রাম-স্টপে আসতে আসতে অধিকাংশ দিন পকেটের পয়সা ফুরিয়ে যায়।

এটুকু পথের মধ্যে যত ভিখারীর সঙ্গে দেখা হয়, প্রত্যেকেই কিছু না কিছু পায়।

ক্রমশঃ তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে …তারা উৎসুক হয়ে বসে থাকে কখন দাদু আসবেন।

তাই দাদাবাবুকে অনেক দিনই হেঁটে কলেজে আসতে হয়।

কলেজে দেরী হয়ে যায়।

একদিন পড়বার ঘরে সুভাষচন্দ্র আর তাঁর সহপাঠী সহবয়সী ভাতুল চট্টোপাধ্যায় পড়ছেন।

হঠাৎ যতীন্দ্রের দৃষ্টি পড়লো, এক সার পিঁপড়ে দল বেঁধে চলেছে। তাদের অনুসরণ করে দেখলেন, তারা বই-এর আলমারী থেকে দল বেঁধে আসা-যাওয়া করছে। হঠাৎ বই-এর আলমারীতে তাদের কি প্রয়োজনীয় জিনিস থাকতে পারে, অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখেন, বই-এর থাকের পেছনে দু'খানি বাসি রুটী পড়ে রয়েছে।

অবাক কাণ্ড! বই-এর আলমারীর পেছনে রুটী কে রাখলো?

কথাটা সুভাষের কাণে যেতেই তিনি লাফিয়ে উঠলেন, আরে চুপ্ চুপ্, আমিই রেখেছি!

—উদ্দেশ্য?

—আমাদের বাড়ীর সামনে রাস্তার যে বুড়ী ভিখিরীটা বসে, রোজ বিকেলবেলা আমার জলখাবার থেকে তাকে দু'খানা রুটী দি! কাল যেতারা আসেনি, তাই রেখে দিয়েছি!

(৯)

কিন্তু ব্রহ্মই যদি একমাত্র সত্য হয়, যদি এই জগৎ সত্যই মিথ্যা, তাহলে অকারণ এই পুঁথি-পড়া আর পুঁথি-মুখস্থ করে কি লাভ?

সেই চরম সত্যকে জানাই তো পরম জানা।

কিন্তু গুরু ব্যতীত নাকি সে সত্য-পথের সন্ধান মেলে না…মানুষের প্রতিদিনের জাগতিক জ্ঞানের আড়ালে যে পরমরহস্যময় দুর্লোক আছে, সেখানে পৌঁছতে হলে চাই, আত্মার বন্ধুর সহায়তা। গুরু সেই আত্মার বন্ধু।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের গুরু-মিলনের অপূর্ব্ব কাহিনী তরুণ তন্ময়তায় করে পড়ে…সেখানে দেখতে পায়, স্পষ্টমনস্কে সেই কথা লেখা…গুরু চাই…জীবনের অন্ধকারে তিনিই পারেন জ্বেলে দিতে অবিনাশী আলো!

কোথায় সে-গুরু?

তরুণের বর্ণাঢ্য চিত্তে মহা-জিজ্ঞাসার মত জেগে ওঠে সেই প্রশ্ন।

কিন্তু সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বার করবার আগে নিজেকে করতে হবে প্রস্তুত···যোগ্য।

সামনেই খোলা রয়েছে বিবেকানন্দের জীবন···তাঁর কঠোর সাধনা···তীব্র বৈরাগ্য···

আকর্ষণ করে দক্ষিণেশ্বর··· তার বাতাসে তখনও রয়েছে সেই মহাপুরুষের নিঃশ্বাস··বিশেষী অস্তিত্ব···

নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে ভরে ওঠে চৈতন্য সেই দিব্য-প্রেরণায়। নীরবে ধ্যানে বসেন পঞ্চবটীর মূলে। যেখানে কিছুদিন আগেও মানুষ খুঁজে পেয়েছে নিখিল জটীলতার মধ্যে মিলনের শুভ্রপথ।

সেখান থেকে তাঁরা স্থির করেন, সকলে মিলে বৈরাগ্য-সাধন করবেন।

শতস্মৃতিবিজড়িত গঙ্গাতীরাশ্রিত শান্তিপুর। গুরু সন্ন্যাস-কামীর দল সেখানে গিয়ে সুরু করেন বৈরাগ্য সাধনা।

গঙ্গার ধারে ভারত গোস্বামীর একটা পোড়ো বাড়ী পড়েছিল। নির্জন, জনালয় থেকে দূরে। সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র। সেইখানে সুভাষ এবং তাঁর দলের বন্ধুরা সমবেত হলেন।

গৃহীর চিহ্ন শুভ্রবস্ত্র ত্যাগ করে সকলে গেরুয়া পরিধান করলেন। মাধুকরী বৃত্তি। গৃহস্থের দ্বার থেকে ভিক্ষা করে চাল, দাল সংগ্রহ। স্বপাক ভোজন। আবার গঙ্গাতটে ধ্যানে বসে যান।

অন্তরের মর্মমূলে জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত সুবিপুল কর্মশক্তি···আপনার আভিজাত্য খুঁজছে প্রকাশের পথ। কোথায় কখন কিভাবে ঘটবে তার দিব্য-প্রকাশ, তা জানে অধিকারী নিজে। কবি যেমন প্রথম প্রকাশ-ব্যাকুলতায় সামনে যা পায় তাকেই আশ্রয় করে—; খুঁজে মরে শত ব্যর্থ ছন্দে চরমছন্দটীকে···তেমনি চলে জীবনে সেই পরম-প্রয়াস·· চরম অনুসন্ধান·· নিজের মধ্যে নিজেকে খুঁজে বার করা···

গেরুয়া-ধারী সেই নবীন নিমাইদের দেখে, বৃদ্ধা দানার্থিনীরা অশ্রু-সজল চোখে তাঁদের জননীদের কথা ভেবে বলেন, ছিঃ, বাবা, এই বয়সে বা-বাপের বুকে শেল হেনে কি বাড়ী ছেড়ে বেরোয়! বাড়ী ফিরে যাও!

(১৩)

বাড়ী ফিরে আসতে হয়।

এতো শুধু পথের অনুসন্ধান···পথ-চলা নয়। তখন শতভাবে ডাকে শত পথ।

কিন্তু সুভাষের মনে স্থির ভাবে বাজতে থাকে বৈরাগ্যের সুর। ফিরে ফিরে আসে, সেই প্রশ্ন, গুরু কই? উপযুক্ত গুরু ছাড়া, এ-পথে অগ্রসর হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তাই সর্ব-প্রথম প্রয়োজন, সেই গুরুকে খুঁজে বার করা।

বন্ধু হেমন্তকুমার আগেই বেরিয়ে পড়লেন। কথা হলো, গুরুর দর্শন পেলেই তিনি চিঠি লিখে জানাবেন, সুভাষ গিয়ে যোগদান করবেন।

কিন্তু সে-পর্যন্ত অপেক্ষা করে আর থাকতে পারলেন না। একদিন কাউকে কিছু না জানিয়েই সুভাষচন্দ্র গুরুর অনুসন্ধানে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন।

হরিদ্বারে দুই বন্ধুতে আবার দেখা হলো।

দুই বন্ধুতে সেখান থেকে বৃন্দাবন, মথুরা, আগ্রা, কাশী পরিভ্রমণ করে সাধু খুঁজে বেড়াতে লাগলেন।

কাশীতে ব্রহ্মানন্দ স্বামীর কাছে ফিরে উঠলেন। মহাপুরুষ সরল-আদরে তাঁদের দুজনকে আশ্রমে বিশ্রামের স্থান দিলেন। সস্নেহে উপদেশ দিলেন, বাড়ী ফিরে যাও! সন্ন্যাসের জন্যে তোমাদের মন এখনও তৈরী হয় নি!

দুঃখ হয়ে তাঁরা কাশী ত্যাগ করে বোধগয়াতে উপস্থিত হলেন।

ভগবান বুদ্ধের স্মৃতি-ধন্য সেই-পুণ্য নগরী সুভাষচন্দ্রের অন্তরকে উদ্বেলিত করে তুলো। বোধি-দ্রুমতলে গিয়ে তিনি ধ্যানে বসলেন।

কয়েক বৎসর আগে, এই ভাবে, বাঙলা দেশ থেকে আর এক স্বপ্নাতুর উদাস তরুণ এইখানে এসে ভগবান বুদ্ধের আসনে এমনি ধ্যানে বসেছিলেন···আজ আবার তাঁরই অনুপ্রেরণায় এ-যুগের আর-এক তরুণ সেখানে শক্তি-আহরণের জন্যে ধ্যানে বসলেন

মহাকালের নিয়তিছিন্নতা কি সুভাষচন্দ্র সেদিনকার ধ্যানে অনুভব করেন নি?

(১১)

গুরুর বন্ধন মিলালো না। এখনও দগ্ধ হয় নি।

সুভাষচন্দ্র বড়ী ফিরে এলেন।

"ট্রাম হইতে নামিয়া বুকটান করিয়া বাড়ীতে ঢুকিলাম। মামা ও একটী পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে বাহিরের ঘরে দেখা হয়। তাঁহারা একটু আশ্চর্য্য হইলেন। মার কাছে খবর গেল; অর্দ্ধেক পথে তাঁহার সঙ্গে দেখা। প্রণাম করিলাম—তিনি থাকিতে না পারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে এইমাত্র বলিলেন, আমার মৃত্যুর জন্যই তোমার জন্ম। বাবার সঙ্গে দেখা। তিনি ত প্রণামান্তে আলিঙ্গন করিয়া নিজের ঘরের দিকে লইয়া চলিলেন। অর্দ্ধেক পথে কাঁদিয়া ফেলিলাম··বাবাও কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি শুইয়া পড়িলেন, আমি ধীরে ধীরে পায় হাত বুলাইতে লাগিলাম।" *

দ্বিপ্রহরে পিতা-পুত্রে কথা হয়। পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, সংসারে থেকে কি ধর্ম হয় না?

পুত্র উত্তর দিলেন, সকলের পক্ষে এক ঔষধ নয়···কারুর সকলের এক রোগ, এক সামর্থ্য নয়।

পিতা—ত্যাগের জন্যে preparation দরকার নেই?

পুত্র—সংস্কারের ওপর ত্যাগটা অনেকখানি নির্ভর করে।

পিতা—কর্ত্তব্য-ত্যাগ, সেটা কি ঠিক?

পুত্র—কর্ত্তব্য relative···higher call এলে lower call ভেসে যায়।

সেদিন পুত্রের কথা থেকে পিতা বুঝলেন, ক্ষণিক উত্তাপনা বা ক্ষণিক ভাবোচ্ছ্বাসের চেয়ে বেশী কিছু তাঁর পুত্রকে গৃহ-ছাড়া করেছিল। পিতার মনোভাব থেকে পুত্রও বুঝলেন, বিষয়বার যদি তিনি গৃহত্যাগ করেন, পিতা অন্তত তাঁকে ভুল বুঝবেন না।

শেষকালে পিতা পুত্রকে বলেছিলেন, বেশ, যখন তোমার higher call আসবে, তখন দেখবো!

হায়! তিনি আজ কোথায়?

---

* শ্রীদেবকুমার সরকারকে লিখিত পত্র হইতে

(১২)

অরুণ চিত্ত গুরুর সন্ধানে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো। এখনো হয়নি সময়!
উৎকর্ণ হয়ে থাকেন, কবে আসবে সে মহা-আহ্বান!
চিত্তকে উন্মুক্ত করে রাখেন···নীরবে অপেক্ষা করে থাকেন।
ভেতরে চলে যে তুমুল আন্দোলন···বাইরে ফুটে ওঠে না তার কোন চিহ্ন।
দেখে মনে হয়, শান্ত···নির্বিকার···চির অচঞ্চল।
অন্তরায় মধ্যে একা···চির-চঞ্চলের মধ্যে মহামৌন···
বাইরে গেরুয়া ধারণ হলো না···কিন্তু অন্তরে জেগে রইলো বৈরাগী···
ব্রতধারী ব্রহ্মচারী।

(১৩)

ওটেন সাহেব ক্লাসে পড়াচ্ছেন।
পাশের ঘরে তখনও অধ্যাপক আসেননি—ছেলেরা পরস্পর কথা বলছে।
অধ্যাপনা বন্ধ করে ওটেন সাহেব গর্জন করে উঠলেন, Disgusting!
কোনরকম বাড়তি শব্দ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। হয়ত অসাধারণ ছিল তাঁর শ্রবণ-যন্ত্র। আহত শ্রবণ-যন্ত্র তৎক্ষণাৎ মস্তিষ্কে খবর পাঠাতো। মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হয়ে উঠতো।
ক্লাসে পড়া শোনবার সময় ছাত্ররা বোবা হয়ে থাকতে পারে কিন্তু ক্লাসের বাইরে সব সময় বোবা সেজে ঘুরে বেড়াতে তারা পারে না।
তাই আর একদিন বাইরে কি গোলমাল হতে, ওটেন সাহেব রেগে বারান্দায় ছুটে এসে দেখেন, একদল ছেলে গল্প করতে করতে যাচ্ছে।
সাহেব রাগে গর্জন করে উঠলেন, Dont bowl like beasts!
ছেলেরা নীরবে চলে যায়।
আবার একদিন। ওটেন সাহেব পড়াচ্ছেন, পাশের ঘরে ক্লাস ভেঙ্গে যাওয়ায় ছেলেরা বেরিয়ে পড়েছে।
ক্ষিপ্ত হয়ে ওটেন সাহেব সামনে যাকে পেলেন, তাকেই ধাক্কা মেরে ক্লাসঘরের ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন।
প্রথম যাকে ধাক্কা মেরে ঘরে ঢোকালেন, তিনি হলেন সেই ক্লাসেরই অধ্যাপক।
রাগের মাথায় সাহেব তাঁকেও ছাত্র মনে করেছিলেন।
সুভাষ-ও সেই দলে ছিলেন। সাহেবের ধাক্কায় তাঁর হাত থেকে বই ছিটকে পড়ে গেল।
সাহেবের ধাক্কা চিরদিন তারা সয়ে এসেছে, সাহেব হয়ত ভেবেছিলেন, চিরদিনই তারা তা সইবে।
তাই ছেলেরা যখন অধ্যক্ষ রেভ্‌স্ সাহেবের কাছে গিয়ে নালিশ জানালো, রেভ্‌স্ সাহেব ছাত্রদের প্রতিনিধিকে জানালেন, ওটেন সাহেবের কাছে ক্ষমা চেয়ে তোমরা মিটমাট করে নাও!
সুভাষচন্দ্র শুনে বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন, বাঃ! চমৎকার বিচার! আঘাত হলাম আমরা, আর আমরাই ক্ষমা চাইবো!

আপোষ নিষ্পত্তি হয়ে গেল।

প্রত্যেক ধর্মঘটী ছাত্রকে পাঁচ টাকা করে জরিমানা দিতে হবে···ওটেন সাহেব সভায়, তাঁর ব্যবহারের জন্যে তিনি Sorry হয়েছেন বলবেন···

হলোও তাই।

কিন্তু ওটেন সাহেব পরের দিন ক্লাসে ঢুকেই একদল ছেলেকে ক্লাস থেকে বার করে দিলেন।

তাদের অপরাধ, তারা আগের দিন তাঁর ক্লাসে আসেনি।

বাঙালী হলেও, ধৈর্য্যের সীমা আছে।

ছাত্রদের মনের তাপ বাড়তে থাকে।

তার কয়েকদিন পরে। ওটেন সাহেব পড়াচ্ছেন। সেই আবার বারান্দার শব্দ।

ওটেন সাহেবকেই ক্ষমা চাইতে হবে।

জেন্‌স্ সাহেব বলেন, তা অসম্ভব!

ছাত্ররা ধর্ম্মঘট ঘোষণা করলো। প্রেসিডেন্সী কলেজ···কলকাতার অভিজাত-শ্রেণীর ছেলেরা যেখানে ইয়ং-ম্যাজিষ্ট্রেটের শিক্ষা পায়—সেখানে ধর্ম্মঘট। তাও কি না সাহেব-অধ্যক্ষের প্রতিবাদে!

ছাত্রদের অভিভাবকদের কাছে চিঠি গেল। কেউ রায়বাহাদুর, কেউ রায়সাহেব, কেউ নাইট, কেউ বা সামনের নব-বর্ষে নাইট হবেন! তাঁরা ছেলেদের ওপর চাপ দিতে লাগলেন।

এধারে কলেজে অন্য সব অধ্যাপক বিচলিত হয়ে উঠলেন।

ভারতীয় ছাত্র···যারা ওদের দেবতার মত দেখতে অভ্যস্ত··· তাদের এ কি কাণ্ড! বিশেষত প্রেসিডেন্সী কলেজে, সরকারের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে?

সাহেব ছুটে এসে চীৎকার করে উঠলেন, Dont chatter like monkies!

বলেই আবার ক্লাসে ঢুকলেন।

এমন সময় বাইরে কে কাকে ডাকলো, পঞ্চানন!

পঞ্চতেজী বাঘ সাহেবের মুখে গিয়ে বিধলো। তিনি ভাবলেন, তাঁকে অপমান করবার জন্যেই ঐ শব্দ।

তৎক্ষণাৎ ক্লাস থেকে বেরিয়ে এলেন।

সামনে পড়লো কমলাভূষণ বসু বাঘে একছাত্র।

ব্রাহ্মণ—বলে ঘাড় ধরে তাকে টানতে টানতে একেবারে ষ্টুয়ার্ডের ঘরে নিয়ে গিয়ে হাজির।

জরিমানা!

কলেজের অন্যত্র তখন সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে ওয়ার-কাউন্সিল বসেছে।

বারবার এই অপমান, এভাবে মাথা পেতে নেওয়া মনুষ্যত্বের বিরোধী:

সুভাষচন্দ্র পরামর্শ দেন, হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে কোন কিছু করা ঠিক নয়···যদি কিছু করতে হয় একটা প্ল্যান অনুযায়ী করতে হবে!

(১৪)

ঠিক আড়াইটার সময় ওটেন সাহেব সিঁড়ি দিয়ে নামছেন।

সিঁড়ি শেষ হতে আর ছ'সাতটা ধাপ আছে···এমন সময় পেছন দিক থেকে সাহেবের শাদা গায়ে কে সজোরে লাথি মারলো···সাহেব হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল···সঙ্গে সঙ্গে চড়···কিল···ঘুষি···

খবর পেয়ে প্রিন্সিপাল সাহেব তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন। দেখেন, ওটেন অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। কেউ কোথাও নেই। দারোয়ান ছুটে এলো। একজন ছাত্রও এলো। তিনজন ধরাধরি করে সাহেবকে ওপরে নিয়ে যাওয়া হলো।

অধ্যক্ষ জেন্‌স্ সাহেব বলে উঠলেন, I want to see the blood of the culprits!

(১৫)

হুলুস্থুল পড়ে গেল।

বিচার-সভা বসলো। সাক্ষী-সাবুদ, তদন্ত চলতে লাগলো। কোনমতেই সন্ধান পাওয়া যায় না, কে অপরাধী! শেষকালে একটা ক্লিস্ পাওয়া গেল। দারোয়ান বংশী দেখেছে।

সাহেব বংশীকে জেরা করেন।

বংশী বলে, দোহাই সাহেব, বলে আমাকে মেরে ফেলবে!

বংশীর মুখ থেকে অপরাধীর নাম বার করবার জন্যে তখন এক ফন্দী করা চলো। মাঝখানে একটা পর্দা। পর্দার ভেতর দিয়ে বিচার-ঘর দেখা যায়।

বিচার-সভায় এক একজন ছাত্রকে ডেকে এনে জেরা করা হতে লাগলো।

এক একজন চলে যায়, আর বংশীকে জিজ্ঞাসা করা হয়, এই ছেলে?

বংশী না-না বলে। শুধু দুজনের বেলায় হাঁ বলো, একজন সুভাষচন্দ্র···আর একজন জ্ঞানমোহন দাস।

বিচার-সভা সুভাষচন্দ্রকেই এই দুর্বিনীত দলের নেতা সাব্যস্ত করলো।

জেন্‌স্ সাহেব আলাদা সুভাষচন্দ্রকে আবার ডেকে পাঠান, সোজা জিজ্ঞাসা করেন,

—তুমিই প্রহার করেছ?

—না···আমি প্রহার করিনি!

—তুমি মারবার সময় সেখানে ছিলে?

—হাঁ ছিলাম।

—তা হলে বল কে কে মেরেছে?

—বলবো না!

—তুমি কলেজের কন্‌সাল্‌টিঙ্ কমিটীর মেম্বার··এবং সেই কমিটীর নিয়ম অনুযায়ী আমাকে সাহায্য করতে তুমি বাধ্য—তা জান?

—জানি।

—এক কথায় উত্তর দাও, তুমি দোষী কি না? আর কে কে মেরেছে?

—আমি দোষী কি নির্দোষ, কিছুই বলতে চাই না!

—কলেজের মধ্যে তুমিই হলে সব চেয়ে গণ্ডগোলের কারণ—তোমাকে চিরকালের মত কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো।

বিশ্বণীর প্রথম পুরস্কার!

বাড়ীতেই থাকেন। পড়াশোনা করেন। সংঘাত্রী ছাত্রদের পড়ায় সহায়তা করেন।

অল্প সময়, দরিদ্রদের সেবায় ভিক্ষায় বেরোন।

নগ্ন-পদ।

যে-আবহাওয়ার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন, যে-আবহাওয়ার মধ্যে বাড়ীতে লালিত-পালিত হয়েছেন, নিজেকে সজ্ঞানে সে-আবহাওয়া থেকে দূরে, আর-এক স্বতন্ত্র জগতের অধিবাসীরূপে গড়ে তোলেন।

বিবেকানন্দ তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরেছেন, নতুন করে তাঁর স্বদেশকে। দরিদ্র, নিরন্ন, নিঃস্ব ভারতবর্ষ। সেই ভারতবর্ষের অধিবাসী তিনি।

অহরহ সমুদ্র-গর্জনের মত কাণে বাজে সেই মহাসন্ন্যাসীর বাণী···লক্ষিত শব-দেহকে ফুল দিয়ে আর ঢেকে রেখো না···ঐ আসছে মহা-ভৈরব···বল···হে মহাযুগী, আমি প্রস্তুত···তোমার মধ্যে রয়েছে অনন্ত শক্তি···জাগিয়ে তোলো তাকে···

একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সুভাষচন্দ্র নীরবে নিজেকে প্রস্তুত করে চলেন···

অধ্যয়ন···দরিদ্র-সেবা···নিভৃত-ধ্যান···চিত্তশুদ্ধি···কামনার মধু-মোহ থেকে সযত্নে নিজেকে দূরে রাখেন···

জীবন-দেবতা বড় নিষ্ঠুর···সে চায় সম্পূর্ণ মানুষটীকে সমগ্রভাবে একান্তভাবে···তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে এমন কোন জিনিসই সে সহ্য করতে পারে না···

নিষ্ঠুর স্বামিনী।

তরুণ সুভাষচন্দ্র সে-কথা বুঝেছিলেন। তাই সেই তরুণ বয়স থেকেই তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবেই সেই নিষ্ঠুর জীবন-দেবতার হাতে সঁপে দিয়েছিলেন।

সম্পূর্ণভাবে এই আত্মনিবেদন তাঁকে এই সময় আচ্ছন্ন করে ফেলে। এই সময়কার তাঁর একখানি হাতের লেখা খাতা দেখেছিলাম। একটী অমূল্য স্মৃতি-চিহ্ন। সেই খাতায় টুকরো টুকরো প্রবন্ধের আকারে তিনি সেই সময় তাঁর অনেক মনের কথা লিখেছিলেন। সেখানি তাঁর এক কলেজের বন্ধু···মুসলমান···মহা-সম্পদের মত নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু অনন্তার দিব-বাহুতে সেখানি এবার পুড়ে গিয়েছে।

তাতে সুভাষচন্দ্র নিজের হাতে একটী সুন্দর চার্ট এঁকেছিলেন। সেই চার্টে তাঁর সেই সময়কার মনের চিত্র অতি স্পষ্ট ও নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছিল।

তাতেই দেখেছিলাম, চিত্ত-শুদ্ধি ও সংযমকে তিনি জীবনে কতখানি স্থান দিয়েছিলেন এবং জীবনের চরম লক্ষ্য স্বরূপ তাতে অঙ্কিত ছিল, দেশ ও মানবতার শেষ দানের ওপর আত্ম-মুক্তি।

সৈন্য যেমন যুদ্ধে যাবার আগে, নিজেকে সর্বতোভাবে প্রস্তুত করে, প্রতিদিনের নিয়মানুবর্তী অনুশীলনে—সুভাষচন্দ্র তেমনি জীবনের সূচনা থেকে প্রতিদিনের প্রতিকার্যের মধ্যে দিয়ে, এক সুনির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করে, নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকেন।

এই সংযম, এই নিয়মানুবর্তিতা···এই নীরব ধৈর্য···সেদিন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে শুধু তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার ধনস্বরূপ ছিল। বিশ্বের পট-ভূমিকায় একদিন যখন তিনি সহসা শান্ত অসহযোগ-আন্দোলনের নেতা থেকে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে জগতের শ্রেষ্ঠ রণ-পণ্ডিত সেনা-নায়কদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতিরূপে দেখা দিলেন, তখন বিস্মিত হয়ে আমরা তাঁর দিকে ফিরে চেয়েছি—কিন্তু সে-বিস্ময়ের বীজ তাঁর এই উন্মুখ-যৌবনের শান্ত জীবনের মধ্যেই সমাহিত হয়েছিল।

বীজ থেকে মহীরুহ—তার মধ্যে আকস্মিকতা কোথাও নেই।

বাংলার সোনা-মাটীতে যে-বীজ সেদিন রস পায়নি···বিশ্বের রক্ত-রাঙা নৈরিক মাটীতে প্রাণ-স্পর্শের অপেক্ষায় তাকে থাকতে হয়।

(১৭)

বছর খানেক কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়ে থাকার পর একদিন আর্কহার্ট সাহেবের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। আর্কহার্ট সাহেব তখন স্কটীশ চার্চ কলেজের অধ্যক্ষ। দর্শন ও সাহিত্যের অধ্যাপক শুধু নন্ সত্যসত্যই দার্শনিক ও সাহিত্য-রসিক।

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয়ে তিনি মুগ্ধ হলেন। কলেজ তৈরী হয়েছে যে-সব ছেলের জন্যে, তারাই কলেজ থেকে থাকবে দূরে?

তখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আবার ভাইস্ চ্যান্সেলার হয়ে এসেছেন আশুতোষ। তাঁর নির্দেশে সুভাষচন্দ্রের পুনর্বিচার হলো।

শাস্তি যতটুকু প্রয়োজন ছিল, তা হয়ে গিয়েছে। শিক্ষায়তন পুলিশ-বিভাগ নয়।

সুভাষচন্দ্র স্কটীশ চার্চে উর্ত্তিহবার অনুমতি পেলেন।

এই সময় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলেজের ছাত্রদের সামরিক শিক্ষা দেবার জন্যে "ট্রেনিং-কোর" খোলা হলো।

কলেজের পড়ুয়া ভাল ছেলে সুভাষচন্দ্রও নাম লেখালেন।

বেলঘরিয়ার মাঠে তাঁবু পড়লো।

বাঙালী ছেলেদের গায়ে খাকি-পোষাক। হাতে বন্দুক।

নিস্তব্ধ রাত্রি। সারিসারি তাঁবু। বৈশাখের অন্ধকার রাত্রিতে উঠেছে ঝড়।

অন্ধকারে পাহারা দিচ্ছে প্রাইভেট সুভাষচন্দ্র।

ঘুরে, বহু ঘুরে, য়ুরোপের মাঠ থেকে আসছে কামানের আওয়াজ। য়ুরোপের সব জাতি মেতে উঠেছে নতুন এক সামরিক জাতীয়তাবাদে। তার্দুনের আকাশে উড়ছে বিমান-পোত। তার সারথি একজন বাঙালী যুবক।

বাংলার অন্তরে গোপনে ঘুরছে বিপ্লবীদের হাতে বাঙালী ছেলে। পাঞ্জাবের পথে-প্রান্তরে বিপ্লবী হচ্ছে, তখন পাঞ্জাবের সঙ্গে তখন বাংলার। রক্ত-টীকায় হচ্ছে রাখী-বিনিময়। বাটাভিয়া, সুমাত্রা, জাভা থেকে চিনির বস্তার ভেতর আসছে রিভলভার।

অন্ধকারে বন্দুক হাতে পাহারা দিচ্ছে প্রাইভেট সুভাষচন্দ্র।

(১৮)

আই-এ পরীক্ষায় মাত্র প্রথম বিভাগ…

বি-এ তে অনার্সে দ্বিতীয় স্থান…

সম্ভ্রান্ত ধনীঘরের প্রতিভাবান্ ছাত্রের এর পরের ধাপ—নিশ্চিত থাকেই…

বিলেত… আই-সি- এস…কিম্বা ব্যার-এট্-ল'…

অন্তরের স্রোত যেদিকেই বয়ে যাক্ না কেন, হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত বাইরের স্রোতকে স্বীকার করে চলতে হচ্ছে…

বাইরের দিক থেকে, পরিচিত খাতে তাই বয়ে চলে সনাতন জীবন-ধারা…

সুভাষচন্দ্র আত্মীয়-স্বজনের শুভাশীষের মধ্যে বিলাতযাত্রা করলেন…

তার মাত্র চার মাস আগে,

ভারতবর্ষের দক্ষিণতীরে দাঁড়িয়ে তখন শুভ্র-শুষ্ক এক মহাকবি, জালিয়ানওয়ালাবাগে ভারতের বিদীর্ণ বক্ষ-পঞ্জরের রক্ত দিয়ে লিখছেন, সাম্রাজ্যবাদ-নিধন-যজ্ঞের মহামন্ত্র…

বহুদিনের তমসাচ্ছন্ন নিদ্রা পরিহার করে, গঙ্গা-যমুনা-নর্ম্মদা-কাবেরীর তীরে তীরে, জেগে উঠছে রিপ্ ভ্যান্ উইন্‌কল্……

এই আবহাওয়ায় সুভাষচন্দ্র যাত্রা করলেন বিলেত।

(১৯)

কিন্তু বন্ধুরা অবাক হয়ে গেল।

সুভাষের মনের খবর যাঁরা জানতেন, তাঁরা কখনই ভাবেন নি, সুভাষচন্দ্র ঢুকবেন আই-সি-এসে।

বন্ধু দিলীপকুমার বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেন, কি ব্যাপার?

সুভাষচন্দ্র বলেন, লোভ আমার দর্শন-শাস্ত্রে ট্রাইপোসের ওপর!

—কিন্তু আই- সি-এস?

—তা না হলে বাড়ী থেকে কি ইংলণ্ডে আসতে দিতো?

—কিন্তু পাস তো করবে…তখন?

—চাকরী তো কেউ জোর করে আমাকে নেওয়াতে পারবেনা! ট্রেনিংটা নিতে আপত্তি কি?

মনের কথা আর কেউ জানলো না।

ট্রাইপোস্ নিয়ে মাত্র আর আটমাস বাকি। আটমাসের মধ্যেই আই-সি-এস্ পরীক্ষায় বসলেন।

পরীক্ষায় কৃতী-ছাত্রদের মধ্যে চতুর্থস্থান অধিকার করলেন…প্রবন্ধ-রচনায় সকলের চেয়ে বেশী নম্বর পেলেন।

(২০)

সকলে ভারতীয় ছাত্ররা সেই স্বল্পবাক গম্ভীর-মূর্ত্তি তরুণকে সুভাষতই তাঁদের নেতা বলে গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু অসুবিধা হতো, নেতার গাম্ভীর্য্য এবং শিউরিট্যানিস্‌মে।

আড্ডা, তামাসা, ইয়ার্কি এবং বিলাতী ছাত্রদের অনুকরণে ঢোস্ত ইংরেজীতাবায় ইংরেজী-অশ্লীলতা করা··· সুভাষচন্দ্র আদৌ সহ্য করতে পারতেন না।

বলতেন, আমাদের এমন ব্যবহার করতে হবে, যাতে তারা প্রত্যেক কথায় বুঝতে পারে, আমরা ওদের চেয়ে চের বড়··চের বেশী সভ্য···

নিজেকে তাই একান্ত সতর্কতার সঙ্গে চালাতে হয়·· যেন কোন অন্যায়, যেন কোন স্থূল, যেন কোন অভ্যস্ততায় ব্যক্তিক্রম না হয়ে যায়।

ঘরের মধ্যে এতটুকু এলোমেলো অগোছালো ভাব নেই···যেখানকার যা, যেভাবে থাকা উচিত, ঠিক তাই আছে। বিছানায় ওপর অন্যমনস্কতার চিহ্নস্বরূপ কোন বই খোলা কখনো পড়ে থাকে না···বিছানা বা কোচের ওপর "বাম্‌সানোর" কোন চিহ্ন নেই···টেবিলে বই-পত্র, খাতা পেনসিল ঝাড়াঝাড়ি গোছানো···কোথাও একটা আলগা কাগজ পড়ে নেই···বই-এর শেল্‌ফে একটু ধুলো নেই·· এলোমেলো চড়িয়েও নেই। পোষাক খুব দামী নয়···কিন্তু নিখুঁত·· এতটুকু ভাঁজ নেই···ময়লার চিহ্ন নেই···যেন এই মাত্র ধোবার বাড়ী থেকে ইস্ত্রী করে আনা হয়েছে·· একটা বোতামও নষ্ট হয়নি।

সব সুনিয়ন্ত্রিত·· সুনির্দিষ্ট·· নিজের একান্ত চেষ্টায় ছন্দোবদ্ধ।

জীবনে একটা উদ্দেশ্য আছে···একটা পরিণতি আছে···একটা লক্ষ্য আছে।

সময় বড় কম···মাত্র একটা জীবনের আয়ু·· তাই তার একটা মুহূর্ত্ত ও অন্যমনস্কতায় খরচ করা চলে না। কে বলেছে, যৌবনেরই একমাত্র অধিকার বেহিসেবী খরচ করবার? দূর হয়ে যাক্, সেই রোমান্টিক বিলাসিতা··· অলস ভাব-প্রবণতা। ইয়ার্কি করে একটা বাজে কথা বলবার মত বিলাসিতা, আজকের যৌবনের শোভা পায়না।

বন্ধুরা আড্ডা দেয়, তরুণ কবিদের নিয়ে কাব্য-পাঠ হয়, থিয়েটারের আধুনিকতম নাটকের আলোচনা হয়···হাসি ঠাট্টা···বিদ্রূপ···রঙ্গরস···গান।

সুভাষচন্দ্র তখন ব্যস্ত ছাত্রদের নিয়ে ডিবেটিং ক্লাব গড়তে,·· রাজনীতির গূঢ় তত্ত্ব আলোচনা করতে··· লাইব্রেরী ঘেঁটে জানা-অজানা লোকদের জীবনী খুঁজে বার করে পড়তে···লণ্ডনে বসে লণ্ডনের ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল আবহাওয়ার ষোলো আনা সুবিধে আদায় করে নিতে···

পাশের ঘরে তখন চলেছে হাসির হল্লা।

মিঃ সিং আসর জমিয়ে বসেছেন। নতুন নতুন বিলিতী "কেচ্ছার" এক-একটা বুলেট ছাড়ছেন··শ্রোতারা না শুনলেও, তিনি ছাড়বেন না। সেইটাই তাঁর প্রতিভার বিশেষত্ব···বিলিতী অশ্লীলতার "অথরিটী" তিনি।

এমন সময় সুভাষচন্দ্র সেই ঘরে এসে ঢুকলেন।

এক মুহূর্ত্তে সব চুপ্।

মিঃ সিং-র মুখর প্রতিভা সেই প্রখর গাম্ভীর্য্যের সামনে ম্লান মূক হয়ে যায়।

বন্ধু নীরদরঞ্জন ছোট-খাট জলসার আয়োজন করেছেন।

দেশী ইংরেজ-বাঙ্গালী অনেকে এসেছেন।

দিলীপকুমার বাংলা গান গাইবেন—সুভাষচন্দ্রও নিমন্ত্রিত হয়েছেন।

দিলীপকুমার গাইতে সুরু করলেন।

বাঙলা গান···ভারতীয় সুর··ইংরাজ-শ্রোতাদের কাণে বিসদৃশ লাগে। সেটা কানাবার জন্যে তাঁরা বহুত করে ভ্যাংচানো সুরে নানারকম আওয়াজ করেন।

ক্ষিপ্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে সুভাষচন্দ্র বন্ধুকে ডেকে বলেন, কেন তুমি এখানে গাইলে? এ-জাতের সঙ্গে কোন-ভাবেই কো-অপারেট করা উচিত নয়···এদের সঙ্গে আমাদের কখনও মিলতে পারে না।

সে-ধারণা তখনই তাঁর অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে।

(২২)

আই-সি-এস পরীক্ষার ফলাফল বেরুলো। সুভাষচন্দ্র বন্ধুকে লিখলেন,

"হেমন্ত, তুমিও দুঃখিত হইবে যে আমি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করিয়াছি·····"

কিন্তু বন্ধুর দুঃখের কারণ বিশেষ কিছুই ছিল না। কারণ, সেই সঙ্গেই খবর পাওয়া গেল, স্বর্গে প্রবেশাধিকার পেয়েও তিনি সে-স্বর্গে প্রবেশ করবেন না।

সেই মহামূল্য তিনটি অক্ষর তিনি অর্জন করেছেন, অক্লেশ-মুহূর্তেই তাকে বিসর্জন করবেন বলে!

যে-নরকে তাঁর দেশবাসী অনশনে পড়ে মরছে, সেই নরকেই তিনি মহাস্ত-মনে এসে ঢুকলেন।

একদিন জীবনের আরম্ভমুখে তিনি বেরিয়েছিলেন গুরুর সন্ধানে···মঠে, মন্দিরে, তীর্থে, সন্ন্যাসীদের আখড়ায়, আশ্রমে।

সেখানে সেদিন মেলেনি গুরুর সন্ধান।

তবে সে-অনুসন্ধান থেমে যায় নি সেদিন সেখানে।

একলব্য-অন্তর গুরু-দ্রোণের জন্যেই নীরবে ছিল অপেক্ষা করে।

ভারতে পদার্পণ করেই তাই ছুটলেন, ভারতের নব্য কবিরের দ্বারে···তিনি তখন ঘোষণা করেছেন, বৃটীশের বিরুদ্ধে, সামরিক রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক নতুন সংগ্রাম···

প্রবাস থেকে প্রবাসী ফিরে বাড়ীতে না ঢুকে, প্রথম ঢুকলেন মহাত্মাজীর আশ্রমে। মহাত্মা তখন বন্দিতে। মহাত্মাজী বল্লেন, তুমি বাংলায় গিয়ে দেখা কর দেশবন্ধুর সঙ্গে।

বাওড়া ষ্টেশনে নেমেই সুভাষচন্দ্র ছুটলেন দেশবন্ধুর বাড়ী।

প্রণাম করে দাঁড়ালেন সামনে। তরুণের রাজার সামনে এসে দাঁড়ালো, বাংলার নব-জাগ্রত তারুণ্যের প্রতীক···

শিষ্য দেখা পেল গুরুর।

(২৩)

নিরস্ত্র দেশের সংগ্রামের নতুন অস্ত্র···নিষ্ক্রিয় অসহযোগ।

বাংলাদেশে সে-সংগ্রামের নেতৃত্ব পড়েছে দেশবন্ধুর ওপর।

নতুন রণ-নীতি···কর্মক্ষেত্রে তার পরীক্ষা।

জনতা জানে না তার প্রয়োগ-সংহরণ বিদ্যা। প্রয়োজন-প্রচারের।
দেশবন্ধু নবীন শিল্পকেই দিলেন সে ভার-তার। নব-যন্ত্রের প্রচার সচিব।
অসহযোগ নীতি বর্জনের নীতি। বর্জন মানেই নব-রূপে গ্রহণ।
বিদেশীয় বিদ্যায়তন বর্জন তখনই সম্ভব হবে যখন গড়ে উঠবে স্বদেশীয় সব-বিদ্যায়তন।
চলে তার আয়োজন।
কয়বেস্ ম্যানসন রাতারাতি পরিণত হয়ে ওঠে গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনে।
চারিদিকে উৎসাহ। নতুনের আকর্ষণ।
দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্রকে করলেন তার অধ্যক্ষ। তরুণ অধ্যক্ষ।
প্রবীণদের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিল।

জিতেন্দ্র লাল বন্দ্যোপাধ্যায় দেশবন্ধুকে ডেকে বলেন, একেবারে ছেলেমানুষ···সবে আই সি এস পাশ করেছে···কোন অভিজ্ঞতাই নেই···তার ওপর এতবড় গুরুদায়িত্ব দেওয়া···

দেশবন্ধু হেসে বলেন, আমি মানুষ চিনি। আপনারা উতলা হবেন না।

(২৪)

দলে দলে ছাত্র আসে।

বহুদিন পরে বাংলাদেশে এসেছে ভাবের জোয়ার। বাঙালীর আধ-শুকনো মন হঠাৎ একেবারে ভিজে উঠলো।

মন জাগে, নালন্দায়···বিক্রমশিলায়···
নানারকমের পরিকল্পনা তৈরী হয়···নতুন নতুন পরিভাষার সৃষ্টি হয়···
কয়বেস্ ম্যানসনের সিঁড়িতে পায়ের শব্দে সারা বাড়ীটা মুখরিত হয়ে ওঠে।
কিন্তু কয়েক মাস যেতে না যেতে দেখা গেল, সিঁড়িতে ছাত্রের ভিড় কমে আসছে···
যে-সব অধ্যাপক এসেছিলেন, দারিদ্র্যকে বরণ করে, জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে, নিজের আর্থিক জীবনের ভিত্তি শিথিলতর হওয়াতে, তাঁরা ক্রমশ অদৃশ্য হতে লাগলেন।
অধ্যাপকের অভাবে ক্লাস বসেনা।
যে কয়েকজন আসেন, নিয়মিত আসেন না।
ক্রমশ অধ্যাপকহীন ক্লাসে ছাত্রেরাও অদৃশ্য হতে থাকে।
কিন্তু এই কর্পূরীয়মান ছাত্র এবং অধ্যাপকদের মধ্যে একজন ঘড়ি ধরে নিয়মিত আসেন, ঘড়ি ধরে নিয়মিত ক্লাসে যান। অধ্যাপক সুভাষচন্দ্র।
একদিন দেখেন, ক্লাসে শুধু তিনিই আছেন, শূন্য বেঞ্চিগুলি আছে···বেয়ারা হয়ত দু'একটা সিয়াপিটি আছে···
নিয়মিত একঘণ্টা কাল সেই শূন্য ক্লাসে বসে তিনি আপনার মনে লিখতে সুরু করে দিলেন।
ঘণ্টা হয়ে গেলে ক্লাস থেকে নেমে এলেন।

বুঝতে পারেন, আদর্শের পথ এমনি নিঃসঙ্গ নির্জন।

(২৫)

তবু সেই পথেই চলতে হবে…

কংগ্রেসের নির্দ্দেশে সুরু হয় পিকেটিং।

সুভাষচন্দ্র ওলকতক স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে রাস্তায় পিকেটিং করতে বেরুলেন।
ক্রমশ স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা বাড়তে লাগলো…

সুভাষচন্দ্র দলে থাকেন…কিন্তু নীরব…কথা যা বলবার জন্য লোকে বলে…

কিন্তু সকলের দৃষ্টি সেই নির্বাক তরুণটীর ওপরই গিয়ে পড়ে।

ভবানীপুরের রাস্তা দিয়ে স্বেচ্ছাসেবকের দল পায়ে হেঁটে ফরবেশ ব্যানার্জনের দিকে চলেছে।

সুভাষচন্দ্র দলের আগে।

এলোমেলো যাবার হুকুম নেই…সারি বেঁধে, প্রত্যেক সারিতে দুজন করে…

হলেই বা নিরস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক …মানতে হবে সামরিক শৃঙ্খলা…

এমন সময় ভারতবর্ষে এলেন যুবরাজ। কংগ্রেস ঘোষণা করলো, সাধারণ হরতাল। যুবরাজ দেখে যান শূন্য নগরের মধ্যে জাতির তীব্র প্রতিবাদ।

কিন্তু হরতাল ঘোষণার সঙ্গেসঙ্গে কংগ্রেসের ঘাড়ে এসে পড়লো ভীষণ দায়িত্ব। ট্রেণে যারা আসছে… তাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেওয়া। গাড়ী নেই, কুলী নেই, খাদ্যের কোন দোকানই খোলা নেই।

সুভাষচন্দ্রের ওপর ভার পড়লো, যাতে যাত্রীরা কোনরকমে বিপন্ন না হয় তার আয়োজন করা।

রাত জেগে প্লান্ অফ্ এ্যাক্সন্ তৈরী হলো…সেনাপতি যুদ্ধের আগে যেমন প্লান তৈরী করেন…

পরের দিন ভোর বেলাতেই প্রত্যেক ষ্টেশনের সামনে দেখা গেল, মোটর গাড়ী…লরী তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা, on national service…স্বেচ্ছাসেবকেরা ট্রেণ আসতেই যাত্রীদের মাল-পত্র কাঁধে তুলে নিল… কারুর কোন অসুবিধা হলোনা…এমন কি শিশুদের জন্যে দুধ পর্য্যন্ত আগে থাকতে জোগাড় করা ছিল…

নিতান্ত যে চোখ বুঁজে না ছিল, সে ছাড়া প্রত্যেকেরই চোখে পড়লো, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীদের কাজে একটা নতুন প্রেরণা…কোলাহলহীন সুশৃঙ্খলা……

বিশেষ করে তা চোখে পড়লো বাংলা সরকারের।

(২৬)

বাংলা সরকার স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীকে বে-আইনী সঙ্ঘ বলে ঘোষণা করলো।

সভা করা, রাস্তা দিয়ে শোভাযাত্রা করে যাওয়া, রাজদ্রোহ।

দেশবন্ধু কংগ্রেসের নির্দ্দেশ অনুযায়ী ঘোষণা করলেন, এ আইন কংগ্রেস মানবে না।

স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীকে আরো দৃঢ়ভাবে গড়ে তুলতে হবে। সুভাষচন্দ্র হলেন সেই নিরস্ত্র বাহিনীর জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং।

প্রতিদিন পাঁচজন করে স্বেচ্ছাসেবক রাস্তায় বেরুবে…দ্বারে দ্বারে খদ্দর ফিরি করবে।

প্রথম দু'একদিন পুলিশ তাদের বাধা দিলনা।

সুভাষচন্দ্র নিজে বাধার জন্যে উৎসুক হয়ে পড়লেন। কিন্তু দেশবন্ধু বাধা দিলেন।

গম্ভীর মানুষটার চোখ ছল ছল করে উঠলো।

কিন্তু তারপর থেকে সুরু হলো ধরপাকড়।

যে-পাঁচজন যায়, তারা আর আসে না ফিরে।

দেশবন্ধু হেসে বলে উঠলেন, our crying captain!

কিন্তু অন্তরের সে আক্ষেপ অচিরেই বাংলাসরকার পূরণ করলেন।

যে দিন দেশবন্ধু বন্দী হলেন, সেদিন সুভাষচন্দ্র অন্যত্র কাজে ব্যস্ত ছিলেন। শুনলেন, পুলিশ তাঁর অনুসন্ধানে এসেছিল।

সন্ধ্যার সময় করবেস ম্যানসনে ফিরে এসেই নিজে পুলিশকে ফোন করলেন, আপনারা কি আমাকে খুঁজছেন?·· আমি প্রস্তুত···আসতে পারেন···

কিছুক্ষণ পরেই পুলিশের কালো গাড়ী করবেস্ ম্যানসনের সামনে এসে দাঁড়ালো।

নিজের দায়িত্ব পরবর্তী অফিসারকে বুঝিয়ে দিয়ে সুভাষচন্দ্র কারাযানে চড়ে বসলেন।

সুরু হলো অন্তরের আক্ষেপ, সুরু হলো···নতুন অভিযান।

(২৭)

আসামীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াতেই বিচারক রায় দিলেন,

বিনাশ্রমে ছ'মাস কারাদণ্ড!

আসামী ক্ষুব্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, মাত্র ছ'মাস?

—হ্যাঁ!

—কিন্তু লজ্জার কথা! Have I robbed a fowl?

শেষ হয়ে যায় বিচার।

সুভাষচন্দ্র ঢুকলেন কারাগারে···সেই প্রথম পরিচয়।

(২৮)

তাঁর আবছর রহিম বাংলাসরকারের তরফ থেকে জেল পরিদর্শনে এসেছেন।

দেশবন্ধুর কামরায় এসে দেখেন, তাঁর কাছে আর দুজন আর করেদী রয়েছেন। একজন তাঁর পাচক, আর একজন তাঁর ভৃত্য। সেই হিসেবেই তাঁরা দেশবন্ধুর সঙ্গে থাকতে পেয়েছেন।

পাচকটী, ভূত-পূর্ব্ব আই-সি-এস্ অফিসার···সুভাষচন্দ্র···ভৃত্য···বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেমন্তকুমার···

তাঁর রহিম রহস্য করে বল্লেন, দাশ, তুমি দেখছি অত্যন্ত costly prisoner···তোমার একজন attendant আই-সি-এস···আর একজন অধ্যাপক!

দেশবন্ধু হেসে প্রত্যুত্তর করলেন, যেহেতু অত্যন্ত costly একজন prisoner কে তোমরা এখানে নিয়ে এসেছ!

কিন্তু পাচক ও ভৃত্য, দুজনেই পরম সৌভাগ্য স্বরূপ সেই দুটী বিনা-মাইনের চাকরী নিজেরাই বেছে নিয়েছিলেন।

পাচক অবসর সময়ে, মনিবকে ধর্মনি-তত্ত্বের উচ্চাঙ্গতত্ত্ব সম্পর্কে পাঠ দিতেন।

সেই ছোট "সেলে"···সেই বন্দী-দশায়·· সেই একান্ত নৈকট্যের মধ্যে ..সেদিন যে-সম্পর্ক গড়ে ওঠে, রাজনীতির বাইরে, মানবতার ক্ষেত্রে তা চিরমধুর হয়ে প্রত্যেক বাঙালীর অন্তরে অক্ষয়রূপে বিরাজ করছে···

বাইশ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিক। পূজো আসন্ন।

উত্তর বাংলায় এলো বন্যা। বগুড়া, রাজসাহী, পাবনা, দিনাজপুর, রঙপুর ভেসে ডুবু ডুবু।

ঝড়ের মত ভেসে গেল ঘর, বাড়ী, গোয়াল।

নওগাঁয় তখন মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হাকরী। সেই বিশাল তরল মৃত্যুর আক্রমণে অসহায় হয়ে পড়লেন।

"মধ্য রাত্রিতে স্বয়ং এক কংগ্রেসকর্মীর ঘুম ভাঙিয়ে অনুরোধ করলেন, বেশ সাঁতার! বন্যা! সাহায্যের জন্যে কলকাতায় তার করো!

সে উঠলো। নেমে পড়লো জলে। নদীর সাঁকো দেখা যায় না। হাসপাতালের পথে সাঁতার জল। সাঁতরিয়েই সে কাটলো প্রায় দু' মাইল পথ।

হৈশনে আর্তনাদ···কলরব·· চারদিকে বন্যার জলের কলকল ধ্বনি।

হৈশনমাষ্টার বল্লেন, লাইন নষ্ট, ট্রাফ হবে না।

দুর্দান্ত যুবক ভয় দেখিয়ে, অনুরোধ করে, রাজসাহী পৌছল···তখন রাত শেষ হয়ে এসেছে। তার পরণে তখন ভেসে-যাওয়া একটা গামছা।

বুকে তার করলো সুভাষচন্দ্রকে···আর প্রফুল্লচন্দ্রকে।

—সহস্র নরনারী আপনাদের ডাকছে। বাঁচান!*

সুভাষচন্দ্রের কলকাতার বাড়ীতে তখন গ্রামের বাড়ীতে যাবার আয়োজন হচ্ছে।

গ্রামের বাড়ীতে দুর্গা পূজা। জানকীবাবু ঠিক করেছেন, সপরিবারে যাবেন। আয়োজন সম্পূর্ণ, রাত্রি প্রভাতেই রওয়ানা হতে হবে।

এমন সময় সুভাষচন্দ্র এসে তাঁকে প্রণাম করে দাঁড়ালেন।

—কি ব্যাপার? প্রণাম?

---

* বসুমতী·····ফাল্গুন ১৩৫২

—আমি সান্তাহারে যাচ্ছি!

—সে কি কথা! বাড়ীতে দুর্গাপূজা···সকলে মিলে যাব···এ সময় তোমার চলে গেলে চলবে কেন?

সুভাষচন্দ্র হেসে বল্লেন, তাতে কি! আপনারা বাড়ীতে প্রতিমা পূজো করতে যাচ্ছেন···আমি যাচ্ছি সত্যিকারের বিশ্বজননীর পূজা করতে!

জানকীবাবু জানতেন, বাধা দেওয়া বৃথা।

টেলিগ্রামের উত্তর না দিয়েই সুভাষচন্দ্র সান্তাহারে যাত্রা করিলেন।

সেখানে সেই ভয়াবহ মৃত্যুর অন্ধকারের মধ্যে সুভাষচন্দ্র রিলিফের কাজ সুরু করলেন। দেখতে দেখতে প্রায় দু' হাজার লোক স্বেচ্ছায় সেখানে সমবেত হলো···দু' হাজার তাজা প্রাণ!

রিলিফের কাজ এই দুঃস্থ দেশে অনেকেই করেছেন·· দুঃস্থের সেবায় অনেকেই অকাতরে দান করেছেন—কিন্তু উত্তরবঙ্গ-বন্যার এই রিলিফ কাজের মধ্যে সকলেই অবাক হয়ে দেখলেন, তার অদ্ভুত সুষমা···

সেই হতাশার মধ্যে, সেই হাহাকার আর নির্মম অসহায়তার মধ্যে, সুভাষচন্দ্র দেখলেন, দেশের তরুণদের··· দেশের তরুণরা দেখলো, তাদের ভবিষ্যৎ নেতাকে।

সেই নিদারুণ দুর্যোগের দিনে, সুভাষচন্দ্র খুঁজে পেলেন, দেশের অন্তরে পৌঁছিবার পথ।

এই পাথর-ভেঙে-বেরিয়ে-পড়া প্রাণের ঝর্ণাধারা বালিতে শুষে যাবার আগে, তাকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করা যায় না? কংগ্রেসের প্রচলিত মতবাদের আড়ালে মনে জেগে ওঠে, একটা স্বতন্ত্র মত···

এলো গয়া কংগ্রেস·· সভাপতি হলেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। সুভাষ হলেন তাঁর সেক্রেটারী।

কংগ্রেসের নির্দ্দিষ্ট পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন দেশবন্ধু। অতি পরিচিত ঘটনা···প্রত্যেক লোকেরই স্মরণে আছে তা।

কিন্তু তার মধ্যে থেকে একটা কথা, সুভাষচন্দ্রের মনে গাঁথা হয়ে গেল।

এশিয়ার সর্ব-জাতি-সম্মেলন। ভারতবর্ষকে আজ বাইরে বেরুতে হবে···এশিয়ার অন্যজাতির সঙ্গে তাকে মিতালি করতে হবে··এশিয়ার সব স্বাধীন জাতি মিলে গড়ে তুলতে হবে, প্রাচ্য জগতের জাতি-সঙ্ঘ।

পরাজিত হয়ে দেশবন্ধু ফিরে এলেন।

কিন্তু সেই পরাজয়ই তাঁকে দিল আর এক দিক থেকে মুক্তি। নিজের নির্দ্দিষ্ট পথে চলবার স্বাধীনতা। বাংলার এই স্বাতন্ত্র্যে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো, ভারতের অন্য সব প্রদেশ।

বাংলার মধ্যেই বিরূপ হয়ে দাঁড়ালো, পুরোণো কংগ্রেসী দল। পরিবর্তন তাঁরা চান না।

সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন দেশবন্ধু। তাঁর পেছনে দাঁড়ালো, বাংলার বিপ্লবী নেতারা।

এলো স্বরাজ্য দল। কাউন্সিল নির্বাচন প্রতিযোগিতা।

খড়ের সিপাহীর মত পাড় গেল সুপ্রতিষ্ঠিত সুপ্রাচীন সব নেতারা। ইস্তফা দিল।

তাঁদের জায়গায় এলো নতুন সব লোক। নতুন নাম। কাঁচা বয়স। ওজস্ব বাংলা আবার স্পষ্ট হয়ে উঠলো ভারতের মানচিত্রে।

অহিংস-নীতি আর চরখা নিয়ে তাড়া করে এলো কংগ্রেস। সরকার তাড়া করে এলো, বিপ্লবের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ নিয়ে।

সেই ঝড়ের দোলায় দেশবন্ধু তাঁর রথীদের নিয়ে প্রবেশ করলেন, কাউন্সিলে, প্রবেশ করলেন, করপোরেশনে।

সারা দেশে সংগ্রামের, সংঘর্ষের, একটা বিদ্যুৎ-ঝলক ক্ষণে ক্ষণে দীপ্ত হয়ে উঠতে লাগলো।

"পুরোণো বিপ্লবী দলের·· সকলেই স্বরাজ্য দলের ভিতর এসে পড়েছিলেন। তাঁদের ভিতরকার পুরাণো দলাদলির ভাব লোপ না পেলেও, তাঁদের সকলের টাঁক ছিল সুভাষচন্দ্রের ওপর···তাঁরা মনে করতেন যে সুভাষকে নিজের দলে টানতে পারলেই, বাংলা দেশে তথা বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীতে তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়ে যাবে। সুভাষচন্দ্রের চেষ্টা ছিল, কোন বিশেষ দলে যোগ না দিয়ে সব দলগুলিকে স্বরাজ্যদলের অন্তর্ভুক্ত করে দেশকে সঙ্ঘবদ্ধ করার কাজে লাগানো।" *

(৩২)

এলো করওয়ার্ড কাগজ। ভারতের সংবাদপত্রের ইতিহাসে শেষ উল্লেখযোগ্য স্মরণ-চিহ্ন।

সুভাষচন্দ্রের ওপর ভার পড়লো, তাকে গড়ে তোলবার!

মেসিন-কসানো থেকে আরম্ভ করে কম্পোজিটরের ঘর সাজানো···সুভাষচন্দ্র বাড়ী যেতেন না···সারারাত সেই নতুন অফিসেই। খিদে পেলে আসে মুড়ি। রাত্রিতে বেঞ্চি বা মেসিনের ওপরই শয্যা।

বেরলো করওয়ার্ডের প্রথম সংখ্যা।

---

* উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার খেয়ে-খাওয়া সংবাদ-পত্রের গতি, এক নিমেষে হয়ে উঠলো বেগবান্…

রাতারাতি যেন জ্বলে উঠলো হাজার বাতি…

ভেতরের সঞ্চিত বর্ম-শক্তি পেলো একটা বহির্গমনের পথ। সাংবাদিক-রূপে আনলের যুগান্তর। মন্ত্রাক্ষাগজ হয়ে উঠলো অ্যাক্ত আওয়ন।

যা কিছু ওাষা, যা কিছু নবীন, যা কিছু সংগ্রামশীল…ফরওয়ার্ড হয়ে উঠলো তার মুখপাত্র।

যেখানে থেমে গিয়েছিল, সন্ধ্যা, যুগান্তর, বন্দেমাতরম্ সেখান থেকে আবার নতুন করে সুরু হলো যাত্রা বৈপ্লবিক-চিন্তা ধারায়।

ঘরের ছোট্ট পাঁচিল ভেঙে দিয়ে সুভাষচন্দ্র ঘরের সাথে যোগ করে দিলেন বাইরের বৃহৎ বিশ্বের। জগতে যেখানে যে ভাবছে নতুন, যে করছে সংগ্রাম, যে চলছে এগিয়ে, আঘাত সয়ে এবং আঘাত করে, সকলের সংবাদ নিয়ে এলেন জড় করে ফরওয়ার্ডে। নবীন আয়ারল্যাণ্ড, তরুণ মিশর, সদ্য-জাগা তুরস্ক…তাদের সংগ্রাম-জীবনের প্রত্যেকটী সংবাদ প্রত্যেক সংখ্যায় তরুণ বাঙালীর কাছে এসে পৌঁছতে লাগলো।

স্বদেশকে ভালবাসবার অপরাধে এতদিন যে-সব বাঙালী পড়েছিল দূর বিদেশে, আজকের তরুণ যাদের ক্রমশঃ ধাক্কিল জুটে, সুভাষচন্দ্র তাঁদের সকলকে এনে জড় করলেন এই কাগজের চণ্ডীমণ্ডপে। জগতে যেখানে যে কেউ ভাবছে নতুন জগতের কথা, যে কেউ দেখছে নতুন স্বপ্ন, গতানুগতিক পথ ছেড়ে যে কেউ চলছে কণ্টক-পথে, তাদের সকলকে তিনি দিলেন ডাক। জার্মাণী থেকে বীরেন চট্টোপাধ্যায়, নাসিয়ার আর তারক দাস…জাপান থেকে রাসবিহারী বসু…চীন থেকে এগনিস্ স্মেডলী…আমেরিকা থেকে হৈমেন ঘোষ…সকলের সঙ্গে যোগসূত্র করলেন স্থাপন। ভারতবর্ষ থেকে পাঠালেন পুলিন শীলকে, সাক্ষাৎভাবে বিপ্লবী আয়ারল্যাণ্ডের সংবাদ সংগ্রহ করে পাঠানোর জন্যে।

বিদেশী সংবাদ-সংগ্রাহকদের একচেটিয়া ব্যবসায়ের পক্ষপাতিত্বের হাত থেকে ভারতীয় সংবাদ পত্রদের উদ্ধার করবার জন্যে দেশীয় সংবাদ-সংগ্রহ-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার আয়োজন করলেন। জন্ম হলো ফ্রী প্রেস্ অফ্ ইণ্ডিয়ার, ওরিয়েণ্টাল প্রেস সার্ভিসের।

অথচ, এমন নীরবে, নিজেকে সম্পূর্ণ আড়ালে রেখে, এই বিরাট সংঘটন গড়ে তুললেন যে, অনেকে আজও পর্যন্ত জানে না, এই সব যুগান্তকারী পরিবর্তনের নায়ক কে।

ফরোয়ার্ড হয়ে উঠলো, ভারতের অগ্রগামী বিপ্লবী চিন্তের বাণী-বাহক।

৩৩

হঠাৎ একদিন সেই সময় চৌরঙ্গীর ওপর একুশবছরের একটী বাঙালী ছেলে পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে খুন করতে গিয়ে ভুলক্রমে খুন করে ফেল্লো আর্নেষ্ট ডে নামে একজন সাহেবকে।

ছেলেটীর নাম গোপীনাথ সাহা।

বিচারে গোপীনাথের ফাঁসি হলো।

বিচারপতি শিহার্সনের দণ্ডাদেশ শেষ হতে না হতে আসামীর কাটগড়া থেকে গোপীনাথ বলে উঠলো, আমি চললুম···কিন্তু আমার রক্তের প্রতি বিন্দু থেকে যেন ভারতের ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠে!

যাবার সময় নিজের মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে গেল, মাগো, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো, যেন তোমার ছেলের মতন ছেলে বাঙলার ঘরে ঘরে জন্মায়।

গোপীনাথকে নিয়ে সারা দেশে পড়ে গেল সাড়া। কারুর কাছে তার খুনটাই বড় হলো, কারুর কাছে বড় হলো তার স্বদেশপ্রেম।

সংবাদ পাওয়া গেল যে, ফাঁসীর পর তার মৃতদেহ জেলের ভেতরেই সৎকার করা হবে। মুখাগ্নি দেবার জন্যে তার ভাই মদনমোহনকে জেলের ভেতরে যাবার অনুমতি দেওয়া হলো।

সুভাষচন্দ্রও জেলের দ্বারে উপস্থিত হলেন। অনুমতি চাইলেন, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় উপস্থিত থাকবার জন্যে।

সে-অনুমতি পাওয়া গেল না।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করে যখন মদনমোহন গোপীনাথের পরিত্যক্ত বস্ত্র হাতে নিয়ে কারাগার থেকে বেরিয়ে এলো, সুভাষচন্দ্র প্রস্তর-মূর্তির মত স্থির···শুধু ডান হাতটী এগিয়ে গেল ··অতি সন্তর্পণে স্পর্শ করলেন সেই পরিত্যক্ত বস্ত্র···স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থির শান্ত সৌম্য মূর্তি নৃত্য করে উঠলো।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও, উল্লেখ করবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

সিরাজগঞ্জে প্রাদেশিক সম্মেলন বসেছে। মাত্র বাইশ বছর আগে।

সম্মেলনের সভাপতি, মৌলানা আক্‌রামখাঁন···সেই সম্মেলনের সঙ্গে বিপ্লবী যুব-সম্মেলনও একটা সম্মিলনী বসে।

তার সভাপতি, সহিদ সুরাবর্দী সাহেব।

এই দুই সভাতেই গোপীনাথের প্রশংসা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়,

—অহিংসায় পূর্ণ আস্থা রাখিয়া, এই সম্মিলন···স্বর্গীয় গোপীনাথ সাহার দেশপ্রেমিকতায় উদ্বেলে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করিতেছে।

মাত্র বাইশ বছর আগে।

(৩৫)

স্বরাজ্যদলের নীতি-অনুযায়ী দেশবন্ধু নবগঠিত কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম নির্ব্বাচনে দলবলে দাঁড়ালেন।

নির্ব্বাচনে তিনি এবং তাঁর দলের প্রত্যেকটী মনোনীত লোকই নির্ব্বাচিত হলেন।

নবগঠিত কর্পোরেশনে তিনিই হলেন প্রথম মেয়র।

সুভাষচন্দ্রকে করলেন, চীফ এক্‌জিকিউটিভ্ অফিসর।

কর্পোরেশনের পুরোণো অফিসররা, সেরা এবং বিনিতী উভয় জাতিরই বয়োজ্যেষ্ঠ অফিসররা মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেন, ২৬।২৭ বছরের একজন ছোকরা, এত বড় এই কর্পোরেশন, এর দায়িত্ব বহন করতে কি পারবে?

কিন্তু এই ২৬।২৭ বছরের ছোকরাটী কর্পোরেশনের সর্বময়-কর্ত্তার আসনে বসার সঙ্গে সঙ্গে সারা কর্পোরেশনের মধ্যে ত্রাহি মধুসূদন রব পড়ে গেল।

চেয়ার আছে লোক নেই, লোকের বদলে শুধু চাদর বাঁধা···সুভাষচন্দ্র এসেই কলেজের প্রফেসরের রোল্-কলের মত প্রতিদিনের উপস্থিতির খাতা তলায়ক করেন। আসেন সকলের আগে। নিজে ঘুরে দেখে আসেন সমস্ত বিভাগ। প্রত্যেকটী ফাইল নিজে পড়েন। প্রত্যেকটী অর্ডার নিজে হাতে লিখে দেন। শুধু অফিসের মধ্যেই নয়···অফিসের বাইরেও ··যেখানে কর্পোরেশনের আসল দায়িত্ব···কাজ। সেখানেও ঘুরে ঘুরে তদারক করেন। দরকার হলে ম্যানহোলের মধ্যেও ঢুকে পড়েন।

দেখতে দেখতে সেই দাক্ষাতার আমলের জমিদারী সেরেস্তা সুইজারল্যাণ্ডের ঘড়ির কাঁটার মত চলতে লাগলো।

(৩৬ -)

চীফ এক্‌জিকিউটিভের আসন আগে ছিল না···সে-জায়গায় ছিল চেয়ারম্যান। কর্পোরেশনের বিভাগীয় উচ্চপদস্থ অফিসাররা, বিশেষত য়ুরোপীয় অফিসররা, নিজেদের চেয়ারম্যানেরই সমকক্ষ ভাবতেন।

অবশ্য চীফ্ এঞ্জিনীয়ার মিঃ কোট্‌স্ সেইভাবেই চলতে অভ্যস্ত ছিলেন। একে সিনিয়ার অফিসর, তারওপর খেতাঙ্গ। তবুও চীফের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর ঘরে এসেছেন...

হাতে চুরুট...পূর্ব্বাপর চেয়ারম্যানদের সামনে তিনি এই ভাবেই দেখা করে এসেছেন

সেদিন সুভাষচন্দ্র কিছু বল্লেন না।

তারপরের দিন, কি একটা দরকারে আবার তাঁর ঘরে এসেছেন, স্বয়ং সিগার হাতে···

ধীর গম্ভীরভাবে সুভাষচন্দ্র বলে উঠলেন, মিঃ কোট্‌স্ পুলিশ্‌রিয়ার অফিসারের সামনে সিগার খাওয়াটা কি ভব্যতা ?

মিঃ কোট্‌স্ তারপর থেকে আর সিগার হাতে তাঁর ঘরে ঢোকেন নি। অবশ্য তিনি সিগার খান জেনে, সুভাষচন্দ্রই সময় সময় তাঁকে 'অফার' করতেন !

আর একদিন।

ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর পা তুলিয়ে বসে পড়লেন।

সুভাষচন্দ্র বিরক্ত হলেন।

মিঃ কোটস্···পুলিশ্‌রিয়র অফিসারের সামনে এ-ভাবে পা তুলিয়ে বসা সঙ্গত কি ?

মিঃ কোট্‌স্ তারপর থেকে তাঁর সামনে দাঁড়িয়েই কথা বলতেন। সুভাষচন্দ্র বসতে বল্লে, বসতেন অবশ্য ঘরে ঢুকলেই, সুভাষচন্দ্র যথারীতি আসন গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানাতেন।

মিঃ কোট্‌সের সঙ্গে সঙ্গে করপোরেশনের প্রত্যেকটী লোকই বুঝলো, এই লাল-বাড়ীতে একজন লোক এসেছে বটে !

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সুভাষচন্দ্রের এই বিপুল-সংগঠন শক্তির পেছনে ছিল বাংলার বিপ্লবী দল···করপোরেশনের ভেতরে এবং বাইরে।

যে বিপুল শক্তি, অনাহারে, অর্দ্ধাহারে, কারাগারে বিদেশীর হাতে লাঞ্ছনায়, স্বদেশীয়দের ঔদাসীন্যতায় তখনও পর্য্যন্ত নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করছিল...বাংলার সেই ক্ষুব্ধ মনের প্রতিনিধিদের নিয়েই সুভাষচন্দ্র ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলেন···

সরকার এবং সরকারের চরেরাও সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণ করে চলেছিলেন।

কংগ্রেস এবং বাংলা দেশের কংগ্রেসের পুরাতন-পন্থী নায়কেরাও পর্য্যন্ত ক্রমশঃ প্রকাশ্যে বিরোধিতা ঘোষণা করলো।

সেই সময় দলের আভ্যন্তরিক গঠনকার্য সম্পূর্ণ করে, সুভাষচন্দ্র বাগবাজারে পশুপতি বোসের বিখ্যাত বাড়ীতে স্বরাজ্যদলের প্রধানকর্মীদের এক বিরাট সভা আহ্বান করলেন।

সেই সভায় উপস্থিত করা হলো, পরিষ্কার স্বচ্ছ ভাষায়, স্বরাজ্য দলের আদর্শ ও লক্ষ্য, পূর্ণ স্বাধীনতা··· ইংরাজ-সম্পর্ক-রহিত পূর্ণ স্বাধীনতা!

"কুইট্ ইণ্ডিয়া" প্রস্তাবের বাইশ বছর আগে।

কিন্তু এই সভার কয়েকদিন পরেই, সুরু হলো ধর-পাকড়। পুরোণো বেঙ্গল-অর্ডিন্যান্স বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রও কারারুদ্ধ হলেন।

দেশবন্ধু ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠলেন, নিজের দেশকে ভালবাসলে, যদি তা ক্রাইম্ হয়, আমিও ক্রিমিন্যাল। সুভাষ যদি ক্রিমিন্যাল হয়···আমিও ক্রিমিন্যাল।

নতুন অর্ডিন্যান্স তৈরী করে সুভাষচন্দ্র এবং তাঁর সহকর্মিদের গ্রেফতার করা হলো।

বিচার হবে না···অনির্দিষ্ট কাল বন্দীকে কারাগারে আটক হয়ে থাকতে হবে!

দেশবন্ধু সেন্ট্রাল জেলে অবরুদ্ধ শিষ্যের সঙ্গে দেখা করলেন।

বিদায়ের সময় গিরু বলে ওঠে, বোধ হয় শীঘ্র আর দেখা হবে না।

গুরু প্রতিবাদ করে, না···না··তা হতে পারে না···আমি আমার কাছে তোমাকে শিগ্‌গির ফিরিয়ে আনছি!

সেই শেষ দেখা!

দেশবন্ধু পরের বছর কাউন্সিলে স্বর্গমর্ত্য এক করে সেই কে-আইনী আইনকে তুলে দেবার জন্যে বদ্ধ-পরিকর হলেন।

ডোটের দিন তিনি শয্যাশায়ী। উত্থানশক্তি রহিত। বিন্দুমাত্র উত্তেজনায় ডাক্তারেরা আতঙ্কিত হয়ে উঠছেন।

পুরুষ সিংহ উঠে বসলেন, শির তাঁর···নাবক তাঁর···লৌহ-পিঞ্জরে বদ্ধ

আমি যাব কাউন্সিল হাউসে.. যদি আমার একটা ছোটে আমরা ফেরে যাই !

কোন নিষেধ...কোন বাধা শুনলেন না।

ট্রেগোয়ে ওইয়ে তাঁকে আনা হলো—কাউন্সিল-হাউসে। ভোটে তিনি জয়লাভ করলেন।

কিন্তু ভোটই তো শেষ-কথা নয়।

গভর্ণর নিজের ক্ষমতায় সে-আইন রদবং রাখলেন।

৩৯

মাসখানেক সুভাষচন্দ্র কলকাতায় সেন্ট্রাল জেলে ছিলেন।

তিনি তখনও করপোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসর।

তাই জেলে বসেই করপোরেশনের কাজ চালাতে লাগলেন।

জেলের গরাদের ভেতরে চেয়ারে বসে খদ্দরধারী ভারতীয় যুবক।

আর তাঁর সামনে খাতাপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে চীফ এন্‌জিনীয়ার কোট্‌স্ সাহেব !

জেলের ডিটেক্‌টিভরা মহানন্দে সে-দৃশ্য উপভোগ করে !

"ঠিক হয়েছে ! মামাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে, আমরা দাঁড়িয়ে থাকি···আর মামারা আমাদের ওপর গুষ্টি করেন। সুভাষ মামাদের ঠিক সায়েস্তা করেছে ! এখন দাঁড়িয়ে থাকো বাবা, সুভাষের সামনে টুপি খুলে, আর বলো, Yes Sir !"*

কিন্তু ডিটেক্‌টিভ মহাপ্রভুদেরও সে-আনন্দ বেশীক্ষণ থাকে না।

সুভাষের প্রত্যেক কথাটা রিপোর্ট করবার জন্যে তারা সেখানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতো।

যদি করপোরেশনের কাইলের মধ্যে কোন বিপ্লবিক প্ল্যান চলে যায় !

একদিন এক ডিটেক্‌টিভ অফিসর মহা-অসুবিধায় পড়লো।

কথাবার্তা যা হচ্ছিল, ভাল বুঝতে পারছিল না।

---

* উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়

তাই মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে উঠছিল, ওটা কি বললেন, স্যার!

সুভাষচন্দ্র কোন উত্তর না দিয়ে দিক-দৃষ্টিতে একবার শুধু চেয়ে দেখেন। আবার কাজ আরম্ভ করেন।

আবার কিছুক্ষণ পরে সেই জিজ্ঞাসা, ওটা কি বল্লেন স্যার।

সুভাষচন্দ্র গর্জ্জন করে উঠলেন, shut up! হতাশ হয়ে অফিসার বড় কর্ত্তাদের কাছে নালিশ করলো

সুভাষচন্দ্র কলকাতা থেকে বহরমপুরে বদলি হয়ে গেলেন।

বহরমপুর থেকে একেবারে দেশের বাড়ী···মাজোলয়ের জেলে।*

মানুষ জন্মের পর থেকেই সে সমস্ত প্রাণীজগতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে। সে খাড়া হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো। এমন কথা বলা চলে না যে দাঁড়াবে না তো কি। দাঁড়ানো সহজ নয়। চার পায়ের ওপর লম্বা দেহের ওজন সামনে-পিছনে ভাগ ক'রে দিলেই এমনতরো দেহটাকে একসঙ্গে বহন ও সঞ্চালন তার পক্ষে সহজ হ'তে পারত।

কিন্তু মানুষ আপন দেহের স্বভাবকে মানতে চাইলে না, এজন্যে সে অসুবিধে সইতেও রাজি। চলনের দীর্ঘ দেহটার ভার রক্ষার সাধনা করলে ঐ দুই পায়ের ওপরেই।

রবীন্দ্রনাথ

---

* [গল্প-ভারতীর দশমবর্ষে অপ্রকাশিত অংশ এখানে প্রকাশিত হইবে।]

প্রতিশোধ

ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

(১)

যৌবনে বিধবা ও পরিপূর্ণরূপে নিরাশ্রয় হইয়া অলকা আসিয়াছিলেন তাঁর শ্বশুরকুলের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় রামকিশোরের গৃহে। তাঁর কোলে ছিল এক বছরের শিশু রাজীব।

রামকিশোর গ্রামা জমীদার। তাঁর প্রকাণ্ড বাড়ী, বিস্তর ক্ষেত খামার। দিনরাত তাঁর বাড়ী আমলা, বরকন্দাজ, কি-চাকর, লোকে গমগম করে। তাঁর গৃহস্থালী অত্যন্ত বিস্তীর্ণ। ক্ষেত-খামারের ধান পাটের খবরদারী, ঠাকুরসেবার বিরাট আয়োজন ও পঞ্চাশটি লোকের নিত্য ভোগ প্রভৃতি কাজে আবশ্যকের অতিরিক্ত অনেক লোক কাজ করে। তাদেরই মধ্যে একজন হইয়া অলকা এখানে আশ্রয় পাইয়া বাঁচিলেন। এখানে খাইয়া পরিয়া ও ছেলেকে লালন করিবার সুযোগ পাইয়া অলকা ধন্য হইয়া গেলেন।

রামকিশোরের বিস্তীর্ণ আত্মীয়স্বজন গৃহস্থালীর মাঝার ছিলেন শুধু কর্তা ও গৃহিণী। সন্তান সন্ততি তাঁদের যা' ছিল তা' আর নাই। অলকা আসিবার কয়েক বৎসর পর জন্মিয়াছিল কন্যা অমিয়া, সেই ছিল এ সংসারের একমাত্র ভবিষ্যৎ।

রামকিশোর ও তাঁর স্ত্রী দুজনেই সদাশয়। বিশেষতঃ আত্মীয় পরিজন ও আশ্রিতের প্রতি তাঁদের যত্নের সীমা ছিল না। দুঃস্থ আত্মীয় আত্মীয়া ও আশ্রিতদের প্রত্যহ বিলাইতে অন্নবস্ত্র ও অর্থ দিয়া তাঁরা অত্যন্ত আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। কিন্তু তাঁদের এই উদারতার গৌরব সম্বন্ধে উভয়েই অত্যন্ত সজাগ ছিলেন এবং এ সম্বন্ধে সদাসর্বদাই মতপ্রকাশ করা তাঁদের ছিল অভ্যাস। এই ত্রুটিটুকু তাঁদের আশ্রিতদের কেউ দোষ মার্জিত না, বরং তাঁরা এ সম্বন্ধে একখানা কথা বলিলে তারা দশখানা করিয়া তার ব্যাখ্যান করিয়া তাদের কথায় সায় দিত।

তাই অলকার দিন বেশ কাটিতে লাগিল। অভাব কষ্টের মুখে তার দেখিতে হয় না। ছেলে রাজীবও শুধু খাইয়া পরিয়া নয়, লেখাপড়া শিখিয়াও মানুষ হইতে লাগিল।

রাজীব যে পড়াশুনায় উন্নতি করিতে লাগিল তাতে তার মায়ের বুকে যেমন গর্ব ও আনন্দ হইত তেমনি হইত ব্যথা,—এত সুখ তার সহিবে কি? গর্ব হইত রামকিশোরেরও, মনে হইত এ যেন তাঁরই কৃতিত্ব—তাঁরই যত্নের ফল। প্রত্যেক পরীক্ষার পর তাঁর গৃহিণী রাজীবকে বলিতেন 'বেঁচে থাকো বেশ, এমনি ক'রে মানুষ হও মায়ের দুঃখ দূর কর। তবেই জানবো যে তোমার পেছনে আমার টাকা পয়সা খরচ সার্থক।"

অমিয়ার যখন তেরো বছর বয়স তখনই রামকিশোর তাকে পাত্রস্থ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া চারিদিকে খোঁজ খবর লইতে লাগিলেন। রামকিশোর যতটা ধনী তার চেয়ে তাঁর দপদপানি অনেক বেশী, লোকের

কাছে তাঁর সম্ভ্রমের খ্যাতি ছিল। তাই যোগ্য পাত্রের সন্ধানের অভাব হইল না। এত বড় লোকের একমাত্র উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করিবার জন্য অনেক যুবক প্রস্তুত হইল। অনেক ছেলের বাপ তাহাকে বধূ করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন।

কিন্তু রামকিশোর ও তাঁর গৃহিণীর মন আর ওঠে না। তাঁরা চান ঘরে বরে ভাল, কন্দর্পের মত জামাই—অথচ এমন জামাই যে মেয়েটিকে একেবারে পর করিয়া লইয়া যাইবে না, ঘরজামাই হইবার মত দীনহীন হইবে না, অথচ এই বাড়ীতেই থাকিবে এমনি একটি বর।

এমন বর জুটিতে বিলম্ব হইল।

বি, এ পরীক্ষা দিয়া রাজীব বাড়ী আসিয়াছিল। এ বাড়ীর সবাই তাকে একটা দিগ্‌গজ পণ্ডিত বলিয়া মনে করে। এমন কি রামকিশোর পর্য্যন্ত তাকে ডাকিয়া সর্ব্বদাই নানাবিষয়ে পরামর্শ করেন। রামকিশোর নিজে বেশী লেখাপড়া করেন নাই। অথচ ইংরেজী-নবিশ সরকারী কর্ম্মচারীদের সঙ্গে তাঁর সতত কারবার। তাই একজন ইংরেজী-নবিশের সহায়তা তাঁর সর্ব্বদা দরকার হইত। রাজীব আসিতে সে এই অবৈতনিক সহকারীর পদে বহাল হইয়া গেল। আর মেয়েটিকে লেখাপড়া শিখাইতেও তার সাহায্য, কর্ত্তা গিন্নি সাদরে গ্রহণ করিলেন।

আশ্রয়দাতার সংসারে রাজীবের এতখানি আদর দেখিয়া অলকা তৃপ্ত হইলেন। পরিবারের ভিতর তাঁর নিজের মর্য্যাদাও কতকটা বাড়িয়া গেল। এত বড় পণ্ডিত ছেলের মা তিনি, ইহাতে তাঁর গর্ব্ব নিতান্ত অপ্রকাশ রহিল না।

যেদিন খবর আসিল যে রাজীব বি, এ পরীক্ষায় পাশ হইয়াছে সেদিন অলকা উল্লাসে আত্মহারা হইলেন। দুঃখের দিন তাঁর শেষ হইয়াছে—ছেলে এখন জজ ম্যাজিষ্টর হইয়া দশের একজন হইয়া বসিবে, তিনিও তার মা হইয়া দুহাতে সম্মান ও সমৃদ্ধি লুটিবেন এই স্বপ্ন তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করিয়া তাঁর বর্ত্তমান দীনতা একেবারে অভিভূত করিয়া দিল।

সেইদিন মেয়ে-বৈঠকে অমিতার বিবাহের আলোচনা হইতেছিল। তিন চারটি পাত্রের গুণাগুণ লইয়া অমিতার মা আলোচনা করিতেছিলেন।

একজনের কথায় তিনি বলিলেন, "সব তো ভাল, কিন্তু ছেলে যে বি, এ,টাও পড়েনি। লেখাপড়া জানা না হ'লে আজকালকার সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াবে কেমন ক'রে। নইলে এ ছেলে কেলবার নয়।"

একজন বলিলেন, "তা' ঠিক ব'লেছ মা। চার পাঁচটা পাশ না হ'লে আজকালকার দিনে লোকে যে মানুষ ব'লেই গণ্যি করে না। হোক গে ঘরে ঘরে ঘাটো তবু ওই উকীলবাবুর ছেলেই ভাল। এম, এ, পাশ —মেয়েকে অন্নেও যদ্ধ নয়, বাপেরও পশার আছে। ওই ভাল।"

"কিন্তু ও বাড়ীতে গিয়ে কি মেয়ের সুখ হবে। সেখানে, জানতো বাড়ীতে গিন্নী নেই, শাশুড়ী নিজে রান্না করেন। শুনেছি তারী কৃপণ।"

আর একটি ছেলের কথা উঠিল। ছেলে বি, এ পাশ, বাপটিও গণ্যিমাণ্যি লোক, কিন্তু রূপদর্শনে ছেলে সম্পন্ন নয়। সেই কথাটা তুলিয়াই গৃহিণী বলিলেন, "ওই ছেলে কি আমার মেয়ের মনে ধ'রবে।"

অলকা কোনও দিনই বুদ্ধিশুদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন না। তাতে আবার সেদিন ছেলের পরীক্ষায় সাফল্যের সংবাদে সব মাত্রাজ্ঞান তাঁর হারাইয়া গিয়াছিল। তাই তিনি তাঁর নির্বুদ্ধিতার পূর্বখ্যাতি সম্পূর্ণ ম্লান করিয়া ফেলিলেন এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিয়া। তিনি বলিলেন "আমি বলি দিদি, কোথায় তুমি কোন এক অজানা অচেনা বর খুঁজে মেয়েকে পর ক'রতে যাবে। তার চেয়ে রাজীবের সঙ্গে ওর বিয়ে দাও। তোমার মেয়ে তোমার কাছেই থাকবে, তার উপর একটি ছেলের মত ছেলে পাবে।

এ প্রস্তাবের অপরিসীম স্পর্ধায় গৃহিণী একেবারে হতবাক হইয়া গেলেন।

কিন্তু বৈঠকের একটি মহিলা একেবারে বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "শোন ছোট বউয়ের কথা! অমিয়ার বিয়ে হবে কি না, রাজীবের সঙ্গে!"

গৃহিণী তাঁর বিস্ময় ও বিরক্তি কতকটা হজম করিয়া কথাটা মৃদু হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়াই সঙ্গত বোধ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মজলিস উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

এ হাসির কথাটা পরিবারের সর্বত্র রটে করিয়া মুখে মুখে রটনা হইয়া গেল। যে শুনিল সেই হাসিল।

কর্তার কানে কথাটা তুলিলেন গৃহিণী।

রামকিশোর বৈঠকখানায় তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়াছিলেন। গৃহিণী তাঁর কাছে গিয়া বলিলেন, "রাজীবের মার কথা শুনেছ? ও বলে অমিয়াকে রাজীবের সঙ্গে বিয়ে দিতে। ছেলে বি, এ, পাশ ক'রেছে ব'লে হাতীর পাঁচ পা দেখেছেন।"

রামকিশোর চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া উঠিয়া বসিলেন, ধীরে সুস্থে তিনি বলিলেন, "সাধে কি লোকে বলে কুকুরকে নাই দিলে মাথায় উঠে বসে। সব তোমার দোষ!—তুমিই ওদের মাথা দিয়েছ খেয়ে, তাই এত বড় আস্পর্দ্ধা! এর পর আর ওদের এ বাড়ীতে থাকতে দেওয়া উচিত নয়।"

গৃহিণী বলিলেন, "যাও যাও। একটা গরীব কথা বলেই না হয় ফেলেছে। তাতে তো আর তোমার মেয়ে কেড়ে নেয়নি। চুপ ক'রে থাক। ওসব কথা কানে না তুললেই হ'ল।"

কর্তা এ উপদেশ কানে তুলিলেন না, বলিলেন, "পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে!"

• • • •

রাজীব তখন সেই ঘরেই ছিল, একটা আলমারীর ওধারে, তাকে তাঁহারা দেখিতে পান নাই। কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকটী কথা তার কানে বিষাক্ত ছুঁচের মত বিঁধিয়া গেল।

সে উঠিয়া দুম্‌দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ক্রোধে তার চক্ষু রক্তবর্ণ, কপালের শিরা দপ্‌দপ্ করিতেছে।

মাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া সে তাঁকে নানা ভবিষ্যতি করিয়া গালাগালি দিল। ভিখারীর বেটী চিরদিন ভিক্ষা করিয়া আসিয়াছে তাই এখনি করিয়া সে রাজীবকে অপমান করিয়া বসিয়াছে।

তারপর সে সবেগে জানাইল যে এ বাড়ীতে সে আর এক মুহূর্তও থাকিবে না। যেদিকে দুইচক্ষু যায় সে যাইবে—আর ফিরিবে না। টাকার গরমে অন্ধ রামকিশোর গরীব রাজীবকে যে অপমান করিলেন সেই অপমান যদি কোনও দিন সে নিজে বড়লোক হইয়া ফিরাইয়া দিতে পারে তবেই সে ফিরিবে।

বলিয়া দম্ দম্ করিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

পথে পড়িল অমিয়া। রাজীবকে দেখিয়া সে স্মিতমুখে বলিল, "রাজীবদা' এসেছ বেশ হ'য়েছে। এই অঙ্কটা বুঝিয়ে দাও না আমায়"—

অগ্নিময় দৃষ্টিতে সে অমিয়ার দিকে চাহিয়া বলিল, "অঙ্ক বুঝবে বড়লোকের বেটী? কত অঙ্ক জান তুমি—এক লাখ না দু'লাখ? যেদিন দশলাখের হিসাব মেলাতে পারবো সেইদিন এসে অঙ্ক বোঝাব।"

বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। কিছু না বুঝিয়া অমিয়া হতভম্ব হইয়া তার দিকে চাহিয়া রহিল।

বড়লোক হইবে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া রাজীব বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছিল।

সম্বল ছিল না কাণাকড়ি, দুটো উদরান্নের সংস্থান করিতেই তার হিমসিম খাইতে হইল। গোটা দুই প্রাইভেট টুইশন জোগাড় হইল। আর একটা দশটাকা মাহিনার চাকরী জুটিল এক সওদাগরের আফিসে। সওদাগর লোহালক্কড়ের কারবার করে—বিশেষ পুরাতন লোহার। তার ব্যবসাটা বেশ বিস্তীর্ণ। বছরে বেশ কিছু টাকার পুরাতন লোহা সে নানাদেশে রপ্তানী করে। এই উপলক্ষে সদাসর্বদাই তার ইংরেজী চিঠিপত্র লেখা পড়া করিতে হয়; কিন্তু সওদাগর বিষয়-বুদ্ধিতে যতই ওস্তাদ হউন ইংরাজী অঙ্কর কোনওদিন তার পেটে প্রবেশ করে নাই। তাই তিনি রাজীবকে বহাল করিলেন তাঁর ইংরাজী চিঠি পড়িবার ও লিখিবার কাজে।

এই সামান্য আয়ের সংস্থান করিয়াই রাজীব তার মাকে রামকিশোরের গৃহিত আশ্রয় হইতে আনিয়া কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত করিল।

দিন কাটিতে লাগিল—বড় কষ্টে। দুটি পেট চালাইয়া মাথার উপর একটি চালার ব্যবস্থা করিতেই রাজীবকে হিমসিম খাইতে হইল।

কিন্তু এমন দিন তার যাইত না যেদিন সে রামকিশোরের গৃহে তার অপমানের কথা দারুণ নিষ্ঠাসোর সহিত স্মরণ না করিত। তার অবসর যাপনের প্রধান আয়োজন ছিল এই অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধ লইবার স্বপ্ন আর শুধু তারই জন্য তার মস্ত বড়লোক হইবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

দশটি বৎসর দুঃখে কষ্টে উদরান্ন করিয়া কাটিয়া গেল। মাসিক ত্রিশ টাকা রোজগার পর্যন্ত উঠিল, কিন্তু তার স্বপ্ন সফল হইবার বা আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইবার কোনও সুদূরতম সম্ভাবনার ইঙ্গিত সে কোথাও দেখিতে পাইল না।

হতাশ হইল। সে কিন্তু যতই নিরর্থক যতই অলস হোক তার স্বপ্ন, স্বপ্ন দেখিবার তৃপ্তিটুকু সে ছাড়িতে পারিল না। প্রতিদিনই সে তার কল্পিত সম্পদের জৌলুস দেখাইয়া রামকিশোরকে মনে মনে তাক লাগাইয়া দিত—তাকে অপমান করিয়া বড়লোকে আত্মপ্রসাদ লাভ করিত।

বড়লোক কি সে কিছুতেই কোনওদিন হইতে পারিবে না? আলিবাবার আবিষ্কৃত ভাণ্ডার কি তার হইতে পারে না? মন্টিক্রিষ্টোর স্বর্ণময় দ্বীপ কি নাই জগতে?

সেই অপূর্ব সম্পদের ভাণ্ডারের কোনও ইশারা সে কোথাও দেখিতে পাইল না।

•

একদিন সে তার সওদাগরের আফিসে বসিয়া তার চিঠিপত্র দেখিতেছিল আর ভাবিতেছিল, এই নিরক্ষর মূর্খ তার জ্ঞানগোচরে বৎসরে ন্যূনপক্ষে লক্ষ টাকা রোজগার করে—আর সে বি, এ, পাশ করিয়া শুধু তার অন্নদাস হইয়া কলম ঠেলিতেছে। ইহার সম্পদটা যদি সে লুটিয়া লইতে পারিত তবে—তবে সে তার স্বপ্ন একদিন সফল করিতে পারিত। বহু লক্ষ টাকার মালিক হইয়া সে রামকিঙ্করকে তুচ্ছের মত ছুঁড়িয়া মারিতে পারিত।

ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্কভাবে সে চিঠিগুলি পড়িতেছিল। একটা চিঠি পড়িতে পড়িতে সে থমকিয়া গেল—একটা উজ্জ্বল খেয়াল তাকে পাইয়া বসিল।

চিঠি লিখিয়াছে এক বিরাট বিদেশী কোম্পানী—তাদের সঙ্গে রাঙাবের লুনিয়ার কিছু কারবার ছিল। সে কোম্পানী পুরাতন লোহা যত পায় কিনিতে প্রস্তুত। তাদের দর বাজারদরের দ্বিগুণ। হাজার টনের কম তাহারা লইবে না। তার উপর যত খুশী নিতে পারে।

বিচিত্র কল্পনা রাঙাবের মাথায় খেলিয়া গেল। সে চিঠিখানা একজন গাধেয়-করিল। তার নিজের একটা কল্পিত কোম্পানীর নামে সে সেই বিদেশী কোম্পানীকে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পুরাতন লোহা সরবরাহ করিবার প্রস্তাব লিখিয়া পাঠাইল, লিখিল দাম অগ্রিম দিতে হইবে। কলিকাতা হইতে জাহাজে মাল বোম্বাই হইবামাত্র কলিকাতার ব্যাঙ্ক হইতে বিল অফ লেডিং লইয়া টাকা দিতে হইবে।

লক্ষ্মী মুখ তুলিয়া চাহিলেন। চুক্তি হইয়া গেল। সেই চুক্তি দেখাইয়া সে ব্যাঙ্কে টাকার ব্যবস্থা করিয়া যত পারিল পুরাতন লোহা কিনিয়া গেল।

তারপরই লাগিল ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধ। তখন ব্যাঙ্কের গুদামে রাঙাবের কয়েক সহস্র টন লোহা মজুত।—অলক্ষ্মীর ঘরে লক্ষ্মীর আসন বসিল।

কুবেরের ভাণ্ডারদ্বার তার চক্ষের সম্মুখে খুলিয়া গেল, রাঙাবের লোহার কাঁড়ি দেখিতে দেখিতে রাশি রাশি সোণায় ভরিয়া গেল। একটা উগ্র নেশার ঘোরে সে হুহাতে সোণা কুড়াইতে লাগিল।

স্বপ্নবিলাস সে ভুলিয়া গেল। বিশ্বব্যাপী স্বর্ণসাগরের আবর্ত্তে পড়িয়া সে শুধু হাবুডুবু খাইতে লাগিল, নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর পাইল না।

দেখিতে দেখিতে যেন আলাদিনের প্রদীপের ইন্দ্রজালে তার গড়িয়া উঠিল বিরাট প্রাসাদ। মোটর গাড়ী ও নদীতে তার বিস্তীর্ণ কম্পাউণ্ড ছাইয়া গেল। তার মত বড় আফিসে কেরাণী মহাজন মোচাকের মৌমাছির মত ভন্‌ভন্ করিতে লাগিল।

মৌমাছির ঝাঁকের মতই তার কাছে আসিতে লাগিল মেয়ের বাপ ভাই ঘটক ঘটকীর দল। ঠিক তাল করিয়া বুঝিয়া উঠিবার আগেই এক মেয়ের বাপ তাকে বগলদাবা করিয়া তার মেয়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিলেন। ধনীর ঘরের সুন্দরী বিদুষী কন্যা আসিয়া তার ঘর আলো করিল।

কয়েক বৎসর তার নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর হইল না। ইহার মধ্যে বিশ্বের ব্যবসায় চক্র হঠাৎ যেন থামিয়া গেল। সেই সহসা থামার বেগ সামলাইতে না পারিয়া অনেক হঠাৎ ধনী হুমড়ী খাইয়া পড়িয়া কোথায় তলাইয়া গেলেন, কিন্তু রাজীব খাড়াই রহিল। তার যে সম্পদ জমিয়া উঠিয়াছিল পৃথিবীব্যাপী এই বিপর্য্যয়ে তার সমূহ বৃদ্ধি বন্ধ হইল কিন্তু কিছুই ক্ষয় হইল না।

(৩)

যখন রাজীব নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর পাইল তখন তার মনে আসিল। চাপিয়া বসিল তার সেই পুরাতন স্বপ্ন।

স্বপ্ন তার সফল হইয়াছে। আশাতীত ধনী সে হইয়াছে। কিন্তু রামকিশোরের কাছে সে যে অপমান হইয়াছিল তার প্রতিশোধ এখনও বাকী আছে।

অনেকদিন ধরিয়া সে তার প্ল্যান পাকা করিল। তারপর একদিন সে তার মাকে বলিল, "চল মা, একবার দেশে যাওয়া যাক।"

মা শুনিয়া অবাক হইলেন।

দেশে তাদের একটা মৃৎ ভিটা ছিল। পাখেয়াজ বলিয়া সেটা তখনও টিকিয়া আছে তার নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়াই বোধ হয় কোনও প্রতিবেশী তাহা গ্রাস করে নাই ইহাই তিনি জানিতেন। রাজীব যে ইতিমধ্যে তার আশে পাশে বিস্তর জমী কিনিয়া কলিকাতায় কন্ট্রাক্টর পাঠাইয়া সেখানে এক বিস্তীর্ণ প্রাসাদ গড়িয়াছে, ভাইস্রাণ্ডা বসাইয়া সেখানে বিজলী-বাতির রোশনাই করিয়াছে সে-সব খবর তিনি জানিতেন না।

রাজীব যখন তাঁকে সে সংবাদ দিল তাতে তিনি খুব বেশী অবাক হইলেন না, কেন না তাঁর এই অদ্ভুতকর্মা ছেলে যে এমন ইন্দ্রজাল করিতে পারে তাহা তিনি কলিকাতায় বসিয়াই দেখিয়াছেন।

অলকা বলিলেন, "তা বেশ চলনা"।

রাজীব বলিল, "তার আগে একবার যাব সেই রামকিশোরটার বাড়ী।"

অলকা রামকিশোরকে চিরদিন অনেকটা শ্রদ্ধা ও তার চেয়ে বেশী সম্ভ্রম ও ভয়ের দৃষ্টিতে দেখিয়া অভ্যস্ত,—তাকে তুই ও সম্বোধন করার অভ্যাস এত সম্পদের মধ্যেও সে ছাড়িতে পারে নাই। তাই রামকিশোরকে যে রাজীব "রাম কিশোরটা" বলিয়া উল্লেখ করিল তাতে অলকার বুকটা একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল।

বিস্মিত হইয়া সে শুধু বলিল, "কেন?"

রাজীব হাসিয়া বলিল, "কেন! কেন, সেই দিনকার সেই অপমানের কথা মনে নেই? তার শোধ দিতে হবে না।

এইবার সত্য সত্যই অলকার ভয় হইল। সে বলিল, "কি করতে চাস তুই?"

"সেটা ঠিক এখনও স্থির করিনি। সে টাকার গরমে আমাকে অপমান ক'রেছিল। একবার সেই গেঁয়ো জমিদারকে দেখিয়ে দেব টাকা কাকে বলে। তার সেই খাঁদা মেয়েটাকে আমার সঙ্গে নিয়ে দিতে বেটার

অপমান হ'য়েছিল—তাকে দেখাব তোমায় বউ! তারপর যেমন উপস্থিত সুযোগ পাই অপমান ক'রবো। মোটের উপর সে আমাকে যে অপমান ক'রেছিল চক্রবৃদ্ধির হিসাবে তা' শোধ দেব।"

অনন্তর পূর্বসংস্কারের ফলে একথা ভাবিতেই তার অঙ্গ হিম হইয়া গেল। যে রামকিশোরের সম্মুখে দাঁড়াইতে তার সঙ্কোচের অন্ত নাই—তাকে করিবে অপমান! এ ভয়ানক কল্পনার অসারতা শিহরিয়া উঠিল। সে বলিল, "থাক বাবা, কাজ নেই।"

মা যখন কিছুতেই রাজী হইলেন না তখন রাজীব একাই যাওয়া স্থির করিল।

•

ঘটা করিয়া রাজীব তার অপহৃত সম্মান পুনরুদ্ধারের অভিযানে গেল।

মোটর গাড়ী লরী ও বাস একটা স্রোতে দেড়শো মাইল দীর্ঘ পথ বাহিয়া চলিল এ অভিযানে। সঙ্গে গেল দুইজন সেক্রেটারী চারজন কেরাণী একদঙ্গল উর্দি পরা আরদালী খানসামা প্রভৃতি। রাম কিশোরের বাড়ীর সামনে মাঠের উপর তাঁবু ফেলিয়া শিবির বসাইয়া ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরে সমস্ত বেলুচী ও রাম কিশোরকে তাক লাগাইয়া দিবার প্রচুর আয়োজন লইয়া চলিল রাজীব।

পথের অনেকটাই গ্রাম্যপথ, মোটর যান বাহনের পথে মোটেই যোগ্য নয়। সুতরাং বারোটা মোটেই সরল বা মসৃণ হইল না। পথে মাঝে মাঝে মোটরের বহর থামিয়া গেল, গ্রাম হইতে লোকজন ডাকিয়া পথের বাধা দূর করা, স্থানে স্থানে পথের সংস্কার করা প্রভৃতি কার্য্যে অনেকটা সময় কাটিয়া গেল। পথে দুই স্থানে তাঁবু খাটাইয়া বিশ্রাম করিতে হইল।

রাজীব বসিয়া বসিয়া কেবলি স্বপ্ন দেখিতে লাগিল তার প্রতিহিংসার। মনে মনে সে কল্পনা করিতে লাগিল রামকিশোরের সঙ্গে সে কি কথা বলিবে, তার কোন কথার উত্তরে কি বলিয়া সে রামকিশোরের আঁতে ঘা দিয়া অপমান করিবে, কেমন করিয়া পদে পদে তার ঐশ্বর্য্যের জৌলুস দেখাইয়া রামকিশোরকে একেবারে ক্ষুব্ধ করিয়া দিবে।

ভাবিল সে, বাড়ীতে উঠিয়াই সে রামকিশোরের বাড়ীর দৈন্যের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিবে "বাড়ীটা একেবারে ভেঙ্গে নূতন ধরণের হাইলে বাড়ী করা উচিত—লাখখানেক টাকা খরচ ক'রলেই একটা চলনসই বাড়ী হবে।" লাখখানেক টাকাটা কি রকম সুরে বলিলে তাকে একটা তুচ্ছ সামান্য অঙ্ক—হ' কড়া ন' কড়ার মত শুনাইবে মনে মনে তাই ভাঁজিতে থাকিবে।

রামকিশোরের ঘোড়ার গাড়ীর আস্তাবলের দিকে চাহিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিবে "এ সব প্রাগৈতিহাসিক যান বাহন ফেলে দিন। মোটর গাড়ী আজ কাল খুব সস্তা হ'য়েছে।" বলিয়া সে সম্প্রতি যতগুলি মোটর গাড়ী কিনিয়াছে তার সবার দাম গড়্ গড়্ করিয়া বলিয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে বলিবে, "হাঁ তবে মোটর ক'রলে রাস্তা ঘাটের সংস্কার দরকার। যা রাস্তা এখানকার তাতে মোটর চালান যে কি বিড়ম্বনা তা' ভুগে এসেছি। আপনি লাখ দুই টাকা যদি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডকে দেন তবে হয় তো তারা রাস্তাটা মোটর চলবার যোগ্য করতে পারে। আমিও না হয় লাখ দুই দেবো।"

এমনি করিয়া রামকিশোরের সকল ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ করিয়া সে তার নিজের ঐশ্বর্য্য যখন তার পূর্ব্বতন অন্নদাতার কাছে বলাও করিয়া বসিবে, রামকিশোর তার কোন কথার কি উত্তর করিবেন তার সম্বন্ধে নানা রকম জল্পনা কল্পনা হইল। রামকিশোর নিশ্চয় খুব রাগ করিবেন। সে রাগ কি প্রকাশ করিবেন? না চাপিয়া গম্ভীর হইয়া যাইবেন। চাপিবার চেষ্টা করিলে রাজীব তাহাকে চেপেই দিবে না, অনর্গল খোঁচা দিয়া দিয়া তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করাইয়া তবে ছাড়িবে। যদি গালাগালী দেন তিনি তবে সে উত্তরে দিবে দশগুণ গালাগাল। তারপর—যদি তিনি লোক ডাকিয়া তাকে মারিবার চেষ্টা করেন তবে,—রাজীবের সঙ্গে এত লোক, এতগুলি বারোয়ান আনা তবে সার্থক হইবে।

কথা কাটাকাটি যাহা হইবে তাহা মনে মনে ভাঁজিতে ভাঁজিতে রাজীব এতটা উত্তেজিত হইয়া গেল যে সে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া আকাশে ঘুসি ছাড়িয়া তার কল্পিত বক্তৃতার পৃষ্ঠপোষণ করিতে লাগিল।

এমনি শত শত মনোজ্ঞ কল্পনার মাঝখানে একটি কল্পনাই তাকে সব চেয়ে বেশী আনন্দ দিল। অমিয়া এখানে আছে কি এখন? যদি থাকে তবে রাজীব তাকে ছাড়িবে না। রাজীবের সঙ্গে অমিয়ার বিবাহের কল্পনায় রামকিশোর বিপ্ত হইয়াছিলেন। রাজীব এখন অমিয়াকে শুধু তুচ্ছ করিবে না, তার রূপ নাই, বিদ্যা নাই বেশ ভূষা অলঙ্কার প্রতি নয়না সেকথা বেশ করিয়া গুছাইয়া বলিবে। আর তার স্ত্রীর রূপ বিদ্যা বেশভূষা প্রভৃতি একখানা যেন দশখানা করিয়া বলিবে। বলিতে ভুলিবে না যে ভাগ্যে রামকিশোর তখন অমিয়ার সঙ্গে তার বিবাহ দেন নাই তাই সে এমন পত্নী পাইয়াছে। অমিয়ার ও তার পিতার মুখখানায় ইহাতে যে দশা হইবে তাহা কল্পনা করিয়া রাজীব বিপুল উল্লাস অনুভব করিল।—এ কল্পনায় সে যে অপূর্ব্ব তৃপ্তি অনুভব করিতেছিল তার ভিতর একটি মাত্র খুঁৎ ছিল এই যে স্ত্রীকে সে সঙ্গে আনিতে পারে নাই।

কল্পনায় সে হাজারবার হাজার রকমে রামকিশোর ও অমিয়াকে অপমানিত করিয়া যখন উল্লাস ও প্রতীক্ষার শেষ সীমায় আসিয়া প্রায় বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছে তখন তার প্রকাণ্ড মোটরখানা ধপ করিয়া একটা গর্ত্তে পড়িয়া আবার লাফাইয়া উঠিল। তার ধাক্কায় রাজীব ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া গাড়ীর ছাদে মাথায় ঠোকা খাইয়া নিদারুণ বেদনার সহিত সংবিৎ ফিরিয়া পাইল।

"উঁহু! উঁহু" বলিয়া চাঁদিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে সে বলিল—"শালার গেঁয়ো রাস্তার নিকুচি ক'রেছে।"

কল্পনা করিতেছিল সে যে পাড়াগাঁয়ের রাস্তাঘাটের নিন্দা করিয়া রামকিশোরকে লাঞ্ছিত করিবে। এখন মাথার ব্যথায় অন্তরের সহিত সে সেই পথকে সহস্রগুণ তীব্রতর গালিগালাজ করিয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে সে আবিষ্কার করিল যে সে তার বর্ত্তমান সাধনার লক্ষ্যে আসিয়া পড়িয়াছে।

(৪)

এই সেই স্থান। তার শৈশবের ও প্রথম যৌবনের ক্রীড়াভূমি। দেখিয়া সে তৃপ্ত হইল, পুরাতন প্রিয়-স্মৃতির জন্য নয়, তৃপ্ত হইল এই দেখিয়া যে গ্রামের প্রাচীন দীনতার কোনও উন্নতি তো হয়ই নাই, বরং যেন গ্রামখানা আরও অনেক শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে। মনে মনে সে বলিল, "বেশ হ'য়েছে, হবে না।" যেন এই অচেতন গ্রামখানাই তার সেই প্রাচীন অপমানের হেতু। তাই ইহার শ্রীহীনতায় সে পাইল অপূর্ব্ব তৃপ্তি।

আমি বললাম, না খেলেও কেউ ভাববে না, জানে-আমি এখানে এসেছি। আগে আপনার কথা শেষ হোক, শেষ না শুনে আমি নড়ছি নে আজ।

কাকাবাবু বললেন, সাধু প্রস্তাব। কিন্তু ভাত আছে তো হাঁড়িতে, কি বল?

কাকিমা বললেন, আছে, সে তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি যা বলতিলে বল।

কাকাবাবু বললেন, বলি। প্রস্তাব করেছে, সবসময় স্পার্কিং প্লাগ ছিয়ে কাজ চলত না। সবসময় চলে না, ঠিকই। কিন্তু কিছু কিছু ব্যবস্থায় তারও ছিল ব'লে মনে হয়। যাদুদণ্ড বা ম্যাজিক ওয়াণ্ডের উল্লেখ পড়েছি—যাদুকর বা পরীরা এর ব্যবহার করত। যাদুদণ্ডটা ইলেকট্রিফায়েড হওয়া বিচিত্র নয়। তবুও এর ব্যবহার ছিল নিম্নশ্রেণীর মানে কম-শক্তিওয়ালা লোকেদের মধ্যেই। শক্তি যাদের বেশি তাঁদের এসব যন্ত্রপাতির দরকার হ'ত না। এখন এই শক্তিটা কি, তাই তোমাদের বলব।

ইন্টার-মলিকুলার স্পেসের কথা বলেছি। এ স্পেসটা ফাঁকা থাকে না, একটা অদৃশ্য জিনিসে ভরা থাকে আমরা বলি ইথার। ইথার পরমাণুগুলোকে যেমন পরস্পর থেকে আলাদা ক'রে রাখে, তেমনই আবার একত্র বেঁধেও রাখে। এখন এই ইথারকে যদি ইচ্ছেমত বাড়ানো-কমানো যায় তা'লে ইন্টার-মলিকুলার স্পেসকেও বাড়ানো কমানো যাবে, পরমাণুদের নতুন ক'রে সাজিয়ে রূপ বদলানো বা অদৃশ্য হওয়াও আর অসম্ভব থাকবে না। আমি বলব এই ইথারকে ইচ্ছেমত কন্ট্রোল করাই ছিল প্রাচীনকালের যোগসাধনা, এরই জোরে ঋষি বা যাদুকররা ওসব কাণ্ড করতেন।

আমি বললাম, কিন্তু পরমাণু ভেঙে নতুন পরমাণু গড়া?

কাকাবাবু বললেন, সেটা ইথার দিয়ে হবে না, তার জন্যে দরকার হবে ইলেকট্রিক এনার্জি। বাইরে থেকে এনার্জি দেহে ঢোকানো যায়; কিন্তু এদের সাধনা বোধ হয় ছিল অন্য ধরনের। দেহের ভেতরেই ইলেকট্রিক চার্জের একটা বড় ভাণ্ডার এরা তৈরি করে নিত—এক কথায় গোটা দেহটাকেই একটা প্রকাণ্ড স্টোরেজ ব্যাটারি বা ডায়নামো ক'রে তুলতো। সেই এনার্জি দিয়েই আবার দেহের ইথারকেও কন্ট্রোল করা সম্ভব হ'ত। এই দু'টো শক্তি আসলে বিভিন্ন—প্রথমটা যার হ'ত তার দ্বিতীয়টা সব সময়ে হতে হ'ত না, কিন্তু দ্বিতীয়টা যে করতে পারত প্রথমটা তার স্বভাবতই এসে যেত। এইজন্যেই যাদুকর পরীদের চেয়ে শক্তির তারতম্য দেখা যেত, একজনের শক্তি আরেক জনের শক্তির চেয়ে বেশি হ'ত।

আমি বললাম, কিন্তু সাধনা দিয়ে তো শুধু নিজের শক্তিই বাড়ানো যাবে। মানে নিজেকে নিজে বদলে না হয় নতুন রূপ ধরা যাবে। পরের দেহকে বদলে দেবে কি ক'রে?

কাকাবাবু বললেন, সেটা শক্ত কিছু নয়, নিজের মধ্যে যে এনার্জি জমে আছে তার খানিকটা চালান ক'রে দিলেই হ'ল। হীনশ্রেণীর যাদুকররা এর জন্যেই ম্যাজিক ওয়াণ্ড ব্যবহার করছে। দণ্ডটা হ'ত কণ্ডাক্টার। দণ্ড দিয়ে যাকে ছোঁয়া হ'ল, দণ্ড বেয়ে তার দেহে যাদুকরের দেহের এনার্জি খানিকটা চ'লে গেল। পরেই দেখবে, এই সব খেলা দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে যাদুকর—নিজে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ছে। মানে তার সঞ্চিত শক্তি খানিকটা খরচা হ'য়ে যাচ্ছে। আবার দুই যাদুকরে যেখানে লড়াই, যার শক্তি কম সে বেশি শক্তিওয়ালাকে কাবু করতে পারছে না, কারণ তার সঞ্চিত শক্তিকে ছাড়িয়ে উঠতে পারছে না। শুধিয়ের

বেদাও ভাই—ছোট দেবতার শাপে বা আশীর্বাদে বড়দের কিছু হয় না। একটু উচ্চস্তরের ধারা তাদের আর হওও দরকার হত না; তারা জল ছিটিয়ে বা খালি চোখের দৃষ্টি দিয়েই শক্তি সংক্রামিত করতে পারত—যেমন এখনকার দিনে রেডিও এনার্জি দিয়ে দূরের কল চালানো সম্ভব হচ্ছে।

আমি বললাম, কিন্তু সমস্তই যদি হয়, দেবের এনার্জিকে এভাবে বাড়িয়ে তুলত তারা কি ক'রে?

কাকাবাবু বললেন, সেইটেই তো এদের সাধনা। এ সাধনা এখন অনভ্যাসে লোপ পেয়ে গেছে। সম্ভবত একদল লোকের এই অস্বাভাবিক শক্তি দেখে অন্যদের ঈর্ষ্যা হত, সমাজের শৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে তাই একে তারা চেপে মেরেছে। যাদুকর ডাংনিদের পুড়িয়ে মারার ইতিহাস ইউরোপে অনেক পাওয়া যায়, এখনও এর চলন আছে ব'লে অনেকে মনে করেন।

এদের সাধনাটা কি ধরণের ছিল তা অবশ্য এখন আর জানা যায় না। কিন্তু এ-সাধনা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার কিছুই নয়। সাধারণ মানুষের শক্তিতে যা কুলোয় না এমন অনেক খেলা হঠযোগীরা দেখায়—বিষ খেয়ে হজম করে, কবরের মধ্যে ঘ্যান্ত থাকে, আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটে, শূন্যে ভেসে থাকে, হেঁটে নদী পার হয়। হঠযোগ মানে আর কিছুই নয়, বিশেষ রকমের একসারসাইজ দিয়ে শরীরে কতগুলো অসাধারণ শক্তি সৃষ্টি করা। হঠযোগের চর্চ্চা এখনও আছে। নিজের শক্তি দিয়ে অন্যকে বশ করার খেলা হিপনোটিস্টরা হামেশাই দেখাচ্ছে। এর পরেও কি বলতে চাও, এ-সাধনা একেবারেই মিথ্যে বা আজগুবি?

আমি বললাম, মিথ্যে না হ'তে পারে কিন্তু সম্ভবও হয়তো নয়।

কাকাবাবু হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে বললেন, কেন সম্ভব হবে না? একজনে মানুষ এর চর্চ্চা করেছে। সিদ্ধিলাভও করেছে। তারপর হয়তো চর্চ্চা ছেড়ে দিয়েছে, এর সিদ্ধিও কাজেই লোপ পেয়েছে। আবার যদি কেউ চেষ্টা করে, কেন পারবে না?

আমার হঠাৎ মহিচ্ছন্ন হ'ল। বলে বসলাম, আপনি পারেন?

কাকাবাবু বললেন, তা কি ক'রে বলব। চেষ্টা ক'রে দেখা যায়।

আমার জিভে তখন দুষ্টু সরস্বতী ভর করেছে। বললাম, করুন না চেষ্টা।

কাকাবাবু কেমন যেন অন্যমনস্ক সুরে বললেন, করতে পারি কোনদিন।

কাকীমা চুপ করে শুনছিলেন। তিনি হঠাৎ অদ্ভুতভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন। বিকৃত উত্তেজিত গলায় বললেন, না, না, ও চেষ্টা করতে হবে না।

আমরা দুজনেই অবাক হ'য়ে কিরে তাকালাম। কাকীমার মুখে চোখে কিরকম একটা উদ্ভেজিত ভাব চোখ দুটো যেন ভয়ে বড় বড় হ'য়ে উঠেছে।

কাকাবাবু বললেন, কি হ'ল?

কাকীমা ছেলেমানুষের মত মাথা নেড়ে বললেন, না, কক্ষনো হবে না তা। তারপর একটু থেমে বললেন, আমার ভয় করছে।

কাকাবাবু একটু হেসে বললেন, ছি ছি।

কাকীমা বললেন, না। ডাক্তার যে লিস্ট বারণ ক'রে গেছেন, নিশ্চয় খারাপ জেনেই করেছেন। তাকে আর খুঁচিয়ে তুলতে হবে না।

কাকাবাবু বললেন, আচ্ছা আচ্ছা! আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এসিড্‌স কিনে নিয়ে আসিস্ তো খানিকটা। খুড়ো বলে, পেলে তুতের হয়ে যায় তোমাকে! হুঁঃ!

কাকীমা কথা বললেন না। হঠাৎ উঠে নীচে চ'লে গেলেন।

আমি বললাম, কি হ'ল!

কাকাবাবু বললেন, শরীরটা খারাপ যাচ্ছে বোধ হয়।

আমি বললাম, থাক গে, আপত্তি যদি থাকে। কিন্তু আমাদের কথাটা শেষ হোক। সত্যি এর সাধনা করা এখনও সম্ভব, আপনি মনে করেন?

কাকাবাবু বললেন, অসম্ভব নিশ্চয়ই নয়, তবে শক্ত। হঠযোগের বই আমি কিছু কিছু নেড়ে চেড়ে দেখেছি। খুব বেশি প্র্যাক্টিক্যাল, মানেই বোঝা যায় না ভাল করে। বেশি জানাজানি হবার ভয়ে এরা সব কথা খুলে বলত না। তা'ছাড়া যে বস্তু নিছক অভ্যাস দিয়ে আয়ত্ত করতে হবে তাকে প্র্যাক্টিক্যাল ডিমনস্ট্রেশন ছাড়া খালি বই লিখে বোঝানোও যায় না। সেই জন্যেই বোধহয় এরা পরে পরে বলেছে, গুরু ছাড়া হবে না। হঠযোগটা আসলে ছিল একটা প্র্যাকটিক্যাল কাল্ট, গুরু-পরম্পরায় চলত। সেই প্র্যাকটিক্যাল ইন্‌স্ট্রাক্টরের দেখা যদি না মেলে, শুধু বই প'ড়ে আয়ত্ত করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপারই বটে।

রাত হচ্ছিল, দু'জনে নীচে নেমে এলাম। কাকীমাকে খুঁজতে গিয়ে দেখি, তিনি জানলার ধারে বাইরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কি যেন ভাবছিলেন, পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম তবু টেরই পেলেন না। বললাম, কি হ'ল, কাকীমা?

কাকীমা বললেন, কিছু না তো!

আমি বললাম, লুকোচ্ছেন। আচ্ছা, তখন কি হ'ল আপনার, চেঁচিয়ে উঠলেন কেন অমন ক'রে?

কাকীমা বললেন, কি জানি। হঠাৎ কেমন যেন মনে হ'ল বিপদ হবে।

আমি বললাম, কি কাণ্ড! হচ্ছিল তো সব গল্প। ওর এক্সপেরিমেন্ট করতে যাচ্ছেই বা কে!

কাকীমা ঘরা গলায় বললেন, না খেলেই হ'ল।

এর কিছুদিন পর আমাকে হঠাৎ কলকাতার বাইরে চলে যেতে হ'ল।

কবি. দেখতো ভাই কটা বাজল।

কবি কহিল সাতটা দশ।

সত্য সেন মৃদু হাসিয়া কহিলেন, আমি উঠব এবারে। একটু বাইরে যেতে হবে।

প্রভাতদা কহিলেন. উঠলে? হ্যাঁ, আমিও আজ চলি কবিরাজমশাই। আর একদিন হবে।

নিতাইবাবু কহিলেন, আরে দূর দূর তাই কখনও হয়। বলুন, শেষ করুন গল্পটা, শোনা যাক। সত্য, বোদো।

সত্য সেন কাঁচুমাচু মুখ করিয়া কহিলেন, একটু কাজ ছিল!

নিতাইবাবু কহিলেন, আহা, কাজ তো রোজই আছে। কই প্রভাতদা বলুন।

প্রভাতদা কহিলেন, সবটা বলতে কিন্তু অনেক সময় লেগে যাবে। সেইজন্যেই বলছিলাম আজ আর থাক।

কণী কহিল, না না, বলুন।

গোপেনবাবু কহিলেন, আহা বলই না গো, কেন মিছে ঘর বাড়াচ্ছ। ও তো জানা কথাই, নিতাইবাবুও শুনবেন, তুমিও না শুনিয়ে ছাড়বে না।

নিতাইবাবু কহিলেন, বটে! আর নিজে?

গোপেনবাবু কহিলেন, আমার শুনে হবে নেই। নেহাৎ না শুনলে প্রভাত রাগ করবে ব'লে তাই!

প্রভাতদা কহিলেন, তা, তুমি না হয় বাড়ীই চলে যাও না, পিসীমা বুড়ী আবার ভাত নিয়ে বসে থাকবেন।

গোপেনবাবু কহিলেন, পিসীমা মারা গেছেন একুশ বছর আগে।

প্রভাতদা কহিলেন, তাও তো বটে। তাহ'লে কি আর করা, ব'সেই যাক না হয়।

কবিরাজ অসহিষ্ণু হইয়া কহিলেন, আরে কি মুশকিল। গল্পটা গেল কোথায়?

প্রভাতদা কহিলেন, হচ্ছে হচ্ছে, ভয় পাবেন না। হ্যাঁ, কি বলছিলাম?

কণী কহিল, আপনাকে কলকাতার বাইরে যেতে হ'ল।

গোপেনবাবু কহিলেন, সে কি হে। তুমি আবার সঙ্গ পার হ'লে কবে, জানিনি তো?

প্রভাতদা কহিলেন, জানতে বই কি। ঐ সময়টাতে আমার জ্যাঠাইমার শরীর খুব খারাপ হ'য়ে পড়ে। পুরোনো অজীর্ণ ছিল, তার ওপর বুড়ো বয়সে যা হয়, একটু লোভ, একটু অত্যাচার,—একেবারে স্বাস্থ্য ভেঙে গেল। ডাক্তার বলে চেঞ্জে যেতে; শুনে তাঁরও যাই উঠল, তীর্থ করব। একা গিয়ে তো স্বস্তি নেই, তাই-ঝি, তাইপো-বৌ, নাতি-নাতকুড়, চাকর-বাকর নিয়ে সে এক অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী, আমি তার সেনাপতি। কাশী গিয়ে মাসখানেক থাকলেন, অনেকটা ভাল হলেন, তারপরই আবার মনে হ'ল এত ভাল থাকা ভাল নয় লোকে নিন্দে করবে, ব্যস্ শুরু হল—আমার এখানে দেহ টিকছে না—অন্য কোথাও চল। কাশী থেকে বৃন্দাবন, সেখান থেকে মথুরা,—হরিদ্বার, এলাহাবাদ, রামগিরি সেতুবন্ধ ক'রে ক'রে পাকা দেড়টি বছর না নিয়ে গেলে ফিরলেন না আমাকে ফিরতে দিলেন। তীর্থ অবশ্য খুবই করা হ'ল—এক ঘানির কেদার বদরী। তাও বলেছিলাম, জ্যাঠাইমা, শুটা আর বাকী থাকে কেন, চল। আশা ছিল যে পথে একবার পা বাড়ালেই নিশ্চিন্ত, চট ঈশ্বরপ্রাপ্তি ঘটে যাবে; তাতেও যদি না টাঁসেন তো তখন মানস সরোবরের ঘুরো ফুলব। তা বুড়ী পাকা ঘুঘু, ঠিক গোঁ ধরে বললে, যাব না। তখন আমরা সেতুবন্ধ রামেশ্বর থেকে ফিরে আসছি। চটেমটে বললাম, তা যাবে কেন; দেশ ছেড়ে গঙ্গা ছেড়ে বুড়ো বয়সে মরতে এলে রাবণ রাজার দেশে, ম'লে তখন যত মাদ্রাজী আর মেড়ো পুরুত এসে হিড়িক-মিড়িক মন্তর প'ড়ে শ্রাদ্ধ

করাবে, শুকনো চাকুর পিঠি খেয়ে, আর তাই সলায় খেয়ে বিদেয় পেয়ে মরবে খেখো। শুনে আঠাইয়ার প্রাণে ভয় হ'ল, ওরে বাবারে ব'লে এক দৌড়ে কলকাতায় এসে পৌঁছে হাঁপ ছাড়লেন।

গোপেনবাবু কহিলেন, হাঁ, এখন মনে পড়ছে বটে, মাস্তখানে বছর দেড়েক ছিলে না। আমরা জানতাম দেশে গেছ তোমরা। কিন্তু আসল কথা যে ছেড়ে চলে এলে।

প্রভাতদা কহিলেন, ছেড়ে আসিনি। বলছি। এই দেড় বছরকাল কাকাবাবুদের খবর বিশেষ পাই নি। কাকাবাবুর চিঠিপত্র লেখার অভ্যাস বেশি ছিল না, আমাদেরও ঠিকানার স্থিরতা নেই, কে আর কাকে চিঠি লেখে। মাস্তখানে একবার বাড়ীর চিঠিতে জেনেছিলাম কাকাবাবুরা হরিদ্বারে গেছেন কুম্ভমেলা দেখতে। আমরা তখন হরিদ্বার থেকে বহু দূরে চলে গেছি। হরিদ্বার থেকে আরও ওপরের দিকে যেতে পারেন, এমন আভাসও একটু যেন পেয়েছিলাম, তারপর আর জানিনি! কলকাতায় ফিরে এসে শুনলাম তাঁরা অনেকদিন ফিরেছেন, পুরোনো বাড়ীতেই আছেন। দেখা করতে গেলাম।

চৌধুরী দোর খুলে দিলে।

ওপরে যেতেই কাকীমার সঙ্গে দেখা হ'ল। প্রণাম ক'রে বললাম, কাকাবাবু আছেন তো?

বললেন, আছেন। আজই এলে বুঝি?

বললাম, কাল রাত্তিরে। কোথায় কাকাবাবু?

কাকীমা বললেন, ওপরে।

ল্যাবোরেটরীতে? ব'লে আমি সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়েছি, কাকীমা হঠাৎ আমাকে বাধা দিলেন, বললেন, এখন যেয়ো না।

একটু অবাক হ'য়ে গেলাম। বললাম, কেন?

কাকীমা বললেন, ল্যাবোরেটরীতে নেই তিনি। ছাতের ঘরে।

বললাম, বেশ তো। কি হ'য়েছে তাতে?

কাকীমা বললেন, একটু ব্যস্ত আছেন, ডাকাডাকি করলে রাগ করবেন

শুনে আমার ভয়ানক অভিমান হ'ল। অ্যাদ্দিন পর দেশে ফিরেছি, ফিরেই ছুটে দেখা করতে এলাম, তা এতই ব্যস্ত আছেন, ডাকাডাকি করলে রাগ করবেন। চোক গিলে বললাম, থাক তাহ'লে আপনি ব'লে দেবেন আমি এসেছিলাম।

কাকীমা হেসে বললেন, পাগলা ছেলে, অমনি রাগ হ'য়ে গেল! নাও বোসো এইখানে, কল তুমি কি কি দেখে এলে। তারপর একটু লাজুক হেসে বললেন, উনিও এখুনি এসে যাবেন, ভয় নেই।

আমার তখনও রাগ যায়নি, বললাম, যাক, দরকার নেই এসে।

কাকীমা বললেন, আঃ, এ কী পাগল নিয়ে পড়লাম গো! আচার খাবে?

বললাম, না।

বললেন, আচ্ছা থাক, না খেয়েই গল্প কর। কোথায় কোথায় বেড়ালে?

আমি সংক্ষেপে একটু-আধটু বললাম। ব'লে বললাম, আপনারা কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন?

কাকীমা বললেন, আমরা তো গেলাম কুম্ভমেলায় ; তারপর সেখান থেকে আমি কলকাতায় ফিরে এলাম। উনি সাধুবাবার সঙ্গে সঙ্গে—ব'লেই হঠাৎ থেমে গেলেন যেন অসতর্ক অবস্থায় একটা গোপন কিছু ব'লে ফেলেছিলেন।

আমি বললাম, সাধুবাবা কে ?

কাকীমা বললেন, কি জানি কে, উনি জানেন! নাও, ঐ বুঝি এলেন। তুমি বোসো একটু, আমি চা করে আনি।

ব'লে উঠে গেলেন। আমার কেমন যেন ভারি খারাপ লাগল। মনে হ'ল আমি যেন আর ঠিক তেমনিভাবে ঘরের ছেলেটি নেই, আগের মত যখন খুশি যেমন খুশি আসা-যাওয়া মেলামেশা আর চলবে না এখানে। মনে মনে বললাম, দুত্তোর দরকার নেই অনাহূত অতিথি হ'য়ে, চ'লেই যাই। উঠব কি উঠব না দোনামনা করছি, এমন সময় সিঁড়ি ব'য়ে কাকাবাবু নেমে এলেন। সিঁড়ি থেকেই ডেকে বললেন, কি রে, কখন এলি ? ভাল আছিস্ তো ?

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে সমস্ত রাগ চট ক'রে জল হ'য়ে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে প্রণাম করলাম। থাক থাক হয়েছে ব'লে একটা হাত আমার মাথার ওপর রাখলেন। বেশ ভাল ছিলি ? কই, মোটা ও হসনি ?

বলতে বলতে এধারে খাটের ওপর এসে বসলেন। আমিও এসে বসলাম। বসতে বসতে হঠাৎ চোখে পড়ল, কাকাবাবুর ভেতরে কি-যেন একটা পরিবর্তন হয়েছে। কি-সেটা ব'লে বোঝানো যায় না —মানে চোখে দেখা যায় না মনে ধরা পড়ে, এমনিতরো একটা পরিবর্তন। কথা বলতে বলতে বেশ লক্ষ্য ক'রে দেখলাম। খালি পা, খালি পা, শুধু একটি গরমের মুতি পরা, কোঁচাটিকে উল্টে তুলে তার মুড়োটিকে আবার পেট-কাপড় গুঁজে দিয়েছেন, বিয়ের সময় বরকে যেমন ক'রে কাপড় পরায়—কাকাবাবুকে এ রকম সাজে আর কখনও দেখিনি। পরিবর্তন কিন্তু আসলে এসেছে তাঁর চোখে-মুখে, এমন একটা অদ্ভুত আত্মসমাহিত দৃষ্টি, একটা ভয়ানক ভাব—যে আমি বর্ণনা দিয়ে বোঝাতে পারব না ; ছবি আঁকতে জানলে এঁকে দেখাতাম। সুপুরুষ তিনি এমনিতেই ছিলেন, হাল্কা দীর্ঘ গৌরবর্ণ দেহ; টিকোলো নাক, উজ্জ্বল চোখ, মুখে কপালে বুদ্ধির দীপ্তি ঝলমল করছে। কিন্তু এ-যেন খালি বাইরের সৌন্দর্য্য নয়, মনে হ'ল যেন ভেতর থেকে একটা অলৌকিক দীপ্তি ফুটে বেরুচ্ছে সমস্ত মুখ সমস্ত দেহটাকে ঘুঁড়ে ঘুঁড়ে।

কথাও বলছেন তেমনি—যেন খুব দূর থেকে, আস্তে আস্তে, তাতে আগেকার সে সতেজতা হয়তো আছে কিন্তু আগের মতো সহজ অন্তরঙ্গতা নেই। যেন সর্বদাই কি একটা ভাবছেন, বাইরে যে-আলাপটা ক'রে যাচ্ছেন সে তাঁর মনের ব্যানকে ভাঙতে পারছে না। এ রকম ভাব তাঁর আগেও দেখেছি, যখন কোন একটা নতুন তত্ত্ব নিয়ে মেতে উঠতেন তখনও এমনি ক'রে তাঁর মন কোথায় ডুবে তলিয়ে যেত। কিন্তু এবারকার মত দীপ্তি তাঁর চেহারায় আর কখনও দেখিনি। সেটা সত্যিকার তফাৎ না এতকাল পরে দেখলাম ব'লে আমারই চোখের ভুল, ভাল ক'রে বুঝবার আগেই কাকীমা ঘরে

এসে ঢুকলেন, হাতে চা আর খাবারের থালা। কেমনায় আর দেরী না করলাম, কাকীমার আতিথ্যের নমুনা ঠিক আছে, একটুও বদলায় নি।

খেতে খেতে আবার সেই আগেকার দিনের মত আড্ডা জমে উঠল, কাকাবাবুও আগের মতই সহজ সুরে কথাবার্তা ঠাট্টা তামাসা শুরু করলেন। কাকীমা বললেন, জান, প্রভাত কিন্তু তারি রাগ করেছে আজ, চলেই যাচ্ছিল।

কাকাবাবু বললেন, কারণ?

কাকীমা বললেন, তোমাকে ডাকতে বারণ করেছিলাম।

কাকাবাবু হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। আমার একটা হাতকে মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন, আচ্ছা আচ্ছা, কাঁদিসনে। তোকেই দিয়ে যাব সব।

কথাটা বুঝলাম না, বললাম, কি দিয়ে যাবেন?

কাকাবাবু বললেন, আছে আছে। শোন, তোকে কিছুদিন থেকেই মনে মনে খুঁজছিলাম। আমার এখানে কবে আসবি বল?

আমি বললাম, কবে আসব মানে? যখনই বলবেন। কেন?

কাকাবাবু বললেন, একটা জিনিস দেখাব তোকে।

কাকীমা বললেন, কি?

কাকাবাবু বললেন, আছে, সেই একদিনই দেখতে পাবে।

আমি বললাম, বেশ, এই রবিবারে?

কাকাবাবু বললেন, রবিবার? তার মানে হ'ল—বেহালে ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকালেন, মনে মনে কি হিসেব করলেন, তারপর বললেন, আচ্ছা। রবিবার ঠিক আটটায়।

আমি বললাম আরও আগে আসতে পারি।

কাকাবাবু বললেন, না, তার আগে নয়, তবে তার বেশিও দেরি কোরো না। আসতে হবে কিন্তু একেবারে শুদ্ধ হয়ে—পরিষ্কার চান ক'রে ধোয়া কাপড় প'রে।

আমি বললাম, সেলাম। ট্রামে চ'ড়ে আসবো তো?

কাকাবাবু বললেন, তা এসো। কাকীমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমিও সেদিন আটটার মধ্যে চান ক'রে তৈরী হয়ে নেবে। আর একদম খালি পেটে—কিছু খাওয়া চলবে না।

কাকীমা কাকাবাবুর কোন কিছুতেই বিস্ময় প্রকাশ করতেন না, তবু লক্ষ্য করলাম তিনিও অবাক হয়ে গেছেন। বাইরে অবশ্য শুধু ঘাড় নেড়ে বললেন, আচ্ছা।

আমি বললাম, ব্যাপার কি? বেশ পূজো-পূজো গোনাচ্ছে?

কাকাবাবু বললেন, দেখতেই পাবে। তারপর আবার বললেন, পূজো ঠিক নয়, তবু সাবধান হওয়াই ভাল, কে জানে কোথা দিয়ে কি ছুঁৎ লেগে যায়।

ওর পরে আর দেরি আড্ডা জমল না। বাড়ী চলে এলাম।

৬

রবিবারে ঠিক সময়মত গিয়ে পৌঁছালাম, মানে আটটার অনেক আগেই। কাকাবাবুর কথা বুঝি না বুঝি অবিশ্বাস বা অগ্রাহ্য করবার সাহস ছিল না, ভোরে উঠে স্নানটান ক'রে ধোপা কাপড় পরেই গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম, কাকীমাও তৈরী হ'য়ে ব'সে আছেন। মুখ দেখে বুঝলাম, উঁরও আগ্রহ কম নয় ভেতরে ভেতরে তিনিও আমার চেয়েও হয়তো বেশীই উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন।

বললাম, কাকাবাবু কোথায় ?

কাকীমা ঠিক আগের দিনের মত বললেন, ওপরে।

আমি বললাম, কাকীমা, একটি কথা জিজ্ঞাসা করব, রাগ করবেন না বলুন।

কাকীমা বললেন, কি কথা ?

আমি বললাম, ওপরের ঘরে কি করেন কাকাবাবু ?

কাকীমা বললেন, রাগ করলাম না, কিন্তু জবাবও দেব না।

আমি বললাম কেন ? জানেন না ?

কাকীমা বললেন সবটা না হোক কিছু হয়তো জানি, তবু সে বলবার হুকুম নেই। তা হোক, মন খারাপ কোরো না, আজই হয়তো জানতে পাবে।

একটু পরেই কাকাবাবু নেমে এলেন। ঠিক সেই আগের দিনের মত—খালি পা খালি গা পরণে পায়জামার ঢুঙ্কি, কপালে একটি রক্তচন্দনের ফোঁটা। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এসেছ! বোসো। তুমিও এসো, আর দেরী কোরো না।

ঘরের মাঝখানে একটি ছোট গোল টেবিল, তাকে ঘিরে তিনটি চেয়ার, আগে থেকেই সাজানো ছিল। সেই চেয়ারে তিনজনে বসলাম। ঘরের দোর আর জানালা কাকীমা সব বন্ধ ক'রে দিলেন, খালি ঘুলঘুলি আর খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে অল্প খানিকটা আলো ঘরে ঢুকে ঘরটাকে কেমন রহস্যময় ক'রে তুলল, ঠিক অল্প পাওয়ারের নীল বাল্‌ব জ্বাললে যেমন হয়। কাকাবাবু বললেন গোড়াতে একটি কথা তোমাদের দুজনকেই ব'লে সতর্ক ক'রে দিচ্ছি—আজ যা দেখবে, খবরদার কাউকে এ সম্বন্ধে একটি কথাও তোমরা বলবে না, অন্তত; আমার অনুমতি পাবার আগে।

কাকীমা বললেন, ওরে বলেছি ?

কাকাবাবু বললেন, জানি। তবু আর একবার সতর্ক ক'রে দিলাম। আর একটি কথা, যা দেখবে সেটা খুবই আশ্চর্য্য মনে হোক কোন রকম কথা বলবে না, শব্দ করবে না, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে না বা মনে মনেও আমাকে ডাকাডাকি করবে না, মানে কোন রকমেই আমাকে ডিস্টার্ব করবে না।

আমরা ভয়ে ভয়ে বললাম, আচ্ছা।

কাকাবাবু বললেন, বেশ, তাহ'লে এবারে ঠিক হয়ে বোসো। তোমাদের কিছু করতে হবে না, খালি মনকে যতদূর পার নিষ্ক্রিয় ক'রে, যা ঘটে দেখে যাও।

আমরা বসে চেয়ে রইলাম। কাকাবাবু দুটি হাত টেবিলের ওপরে রেখে বসলেন। ঘর সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ,

নদীর উপর গভেন্দ্রের হিংসা হওয়া স্বাভাবিক। সুমিতার অনুগ্রহ নদীর উপর যতটা বর্ষিত হত, আর কারুর উপর ততটা নয়।

—ওঃ, সেই জন্যেই তাকে hunt করবার এত চেষ্টা?

এক মুহূর্ত্তেই সুমিতার চোখ এবং ভ্রূ রাগে সঙ্কুচিত হ'য়ে এল। পর মুহূর্ত্তেই নিজেকে সম্বরণ ক'রে ফেললে। ও শিক্ষাটা মজ্জাগত।

পূর্ণ দৃষ্টিতে গভেন্দ্রের মুখের দিকে চেয়ে, তার বাহুতে হাত রেখে ব'ললে—শোন, গভেন, দিন কতকের জন্যে বিলেত ঘুরে এসনা কেন? সেখানে আর পাঁচ জনে যা' করে তুমিও তাই ক'রবে, তা'হ'লেই তোমার এই goody-goody স্বভাবটা ব'দলে যাবে। মানুষ হবে।

—আমাকে সরিয়ে দিতে চাও to clear the field?

—মনেও ভেবোনা, তুমি আমার এতটুকু অসুবিধার কারণ হতে পার।..... তোমার ভালোর জন্যেই ব'লছি, দিন কতক বিলেত ঘুরে এস।

নিজের ছেলেমানুষিতে গভেন্দ্র একটু লজ্জিত হ'য়েছিল। অনুতপ্তস্বরে ব'ললে—সুমিতা, তুমিতো জান, তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারিনা। তোমায় না দেখলে থাকতে পারিনা।.....তবুও আমি যাব যদি কথা দাও, ফিরে এলে আমায় আর প্রত্যাখ্যান ক'রবে না।

সুমিতা অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ব'ললে—সে কথা আমি দিতে পারিনা। তবে তোমার fifty fifty chance রইল।

সুমিতাকে তার বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে গভেন বাড়ী ফিরে গেল—বারটার আগেই।

তার পর দু'তিন বৎসর কেটে গেল।

• • • •

এতক্ষণ যা' বল্লুম, তা' কল্পনার-সাহায্যেই। এইবার-যা'ব'লব তা' নিজের-অভিজ্ঞতা থেকে। এ-গল্পের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এই খানেই আরম্ভ এবং এইখানেই শেষ।

আমি তখন থাকতুম কলিকাতার উপকণ্ঠে সস্তায় ঘর ভাড়া করে একটা ছোট বাগান বাড়ীতে।

সেইখানে একদিন হঠাৎ দুপুরবেলা সুমিতার আবির্ভাব। মোটরে নয় ট্রামে, এবং ষ্টেশন থেকে একখানা ছক্কা ভাড়া করে। এর আগে সে একলা কখনো আসেনি

সুমিতা মেয়েটীকে আমি বড়ই ভালবাসতুম। তাদের পরিবারের সঙ্গে আমার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল, বিশেষ ক'রে তার মা-কে চিনতুম বহুকাল ধ'রে। সুমিতা আমার Mon Oncle কে ছুঁচকে Monk ব'লে ডাকত

৭

লরেটোর পাঠ্যাবস্থা থেকে। আর—এই চঞ্চল-প্রকৃতি মেয়েটার সব আবদার আমাকেই সহ্য ক'রতে হত। তার-যা অনুরোধ ক'রত, আমিই তাকে আদর দিয়ে মাথাটী খাচ্ছি।

সুমিতার মুখে একটা ধম্‌থমে ভাব লক্ষ্য করলুম। বারান্দায় ব'সে চুপ ক'রে নদীর দিকে অনেকক্ষন চেয়ে রইল। তারপর ধীরে আমার কাছে স'রে এসে আমার বুকে মুখ লুকিয়ে সে কী কান্না।

কোন কথা না ব'লে তার মাথায় হাত রেখে চুপ ক'রে ব'সে রইলুম। বুঝলুম কোথাও একটা গভীর আঘাত পেয়েছে। কাঁদতে দেওয়াই ভাল!

ব্যাপারখানা কতকটা অনুমান ক'রলুম। নকী লোকটাকে আমি কখনো পছন্দ করিনি। ওকে একটা adventurer ব'লেই জানতুম। ব্যারিষ্টারিতে প্রতিষ্ঠালাভ হবার দুরাশা ছিল ওর মনে কিন্তু তার জন্যে ও ঘুরে বেড়াচ্ছিল বাজে পথে। কৌতুকপ্রিয় এবং দুরন্ত স্বভাবের খোঁজে ছিল এতোদিন। যাকে বলে খাঁটি,—লোকটা তাই ছিল সব দিক দিয়েই। নতুন আদাপে তাক লাগিয়ে দেবার ক্ষমতাও ছিল। সুমিতার জন্যে চায়ে ফেলেছিল অনেকদিন ধ'রে, এখন একটা বাঞ্ছনীয়তর জায়গায় বড়শী বিঁধিয়েছে, শুনিছি।

খানিকক্ষণ পরে সুমিতা নিজে থেকেই শান্ত হ'ল। নদীর দিকেই দৃষ্টি স্থির রেখে জিজ্ঞাসা ক'রলে—

Monk, Did you ever love, কখনো প্রেমে প'ড়েছ?

—কতবার! যতগুলো কবিতা লিখেছি, সব এক একজনকে লক্ষ্য ক'রে—জানোনা বুঝি?

—তার মানে তুমি কখনও—কাউকে ভালবাসনি।

হায়, এই তরুণীকে কি ক'রে বোঝাব যে আমিও একদিন তরুণ ছিলুম। এবং—না, বিশেষ ক'রে সুমিতাকে সে কাহিনী শোনাবার নয়।

ব'লনুম, Ma petite, তুমি এই কথাটা জানতে এতটা কষ্ট স্বীকার না ক'রলেও পারতে। আমাকে একটু লিখলেই—

—তাই বুঝি? আমি এসেছি তোমার সঙ্গে বিলেত যেতে। শুনলুম, তুমি শীগগিরই আবার যাচ্ছ।

—সেতো খুব ভাল কথা। তবে আমার যেতে এখনো মাস দু তিন দেরী।

—আমার অত দেরী সইবেনা। Next sailing-এ আমার যাওয়া চাই-ই।

—তা'হলে তোমার একলাই যেতে হয়, সুমিতা

—তাই যাব। তুমি এস আমার সঙ্গে। মা-কে রাজী করবার ভার তোমার উপর রিল। পারবেতো বল?.....আর গিয়ে সবেনকে বিয়ে ক'রব।

—সে যদি বম্বেতে গিয়ে থাকে এত দিনে ?

—সে তার আমার।

সুমিতার বাধা ছিলনা আমার সামনে তার দুর্ব্বলতা প্রকাশ ক'রতে। কিন্তু মা-র সামনে—কিছুতেই নয়। নারী মনের এ রহস্য আজও অবধি কেউ বুঝেছে কি না, সন্দেহ !

তার মাকে রাজী করেতে পারব আমি জানতুম। তাই সুমিতাকে আশ্বাস দিতে পারলুম।

—তবে এখনি চল আমাদের বাড়ী।

• • •

সুমিতার বিলাত রওনা হবার প্রায় মাস তিনেক পরে আমিও রওনা হবার উদ্যোগে ব্যস্ত এমন সময় একদিন সুমিতার মা-র টেলিফোন পেলুম—

—শোন—একটা সুখবর—এই মাত্র সুমিতার চিঠি পেলুম—গজেনেরও—তারা engaged হ'য়েছে। cable-এ সম্মতি জানাতে ব'লেছে। হ্যাঁ, তাই হবে—হঠাৎ দেখা—কোথায় কোন্ ষ্টেশনের ঘড়ির নীচে—ঠিক বুঝতে পারলুমনা—যাই হোক সম্মতি পাঠিয়েছি—ওরা সুখী হ'লেই ভাল—হ্যাঁ, বিয়ে হবে ওখানেই—গজেন called হবার পর দুজনে এক সঙ্গেই ফিরবে—তুমিও তো যাচ্ছ স্টাগির—বিয়েতে উপস্থিত থেকো। আমাদের হ'লে—তারপর ওদের সঙ্গেই একসঙ্গে ফিরে এসোনা কেন ?—গজেন ছেলেটীকে আমি বরাবরই ভাল-বাসতুম—ছেলেটী বড় ভাল, কি বল ? খুব desirable না ?

ব'লনুম—তার আর সন্দেহ কি ? আর তার বাপের অনেক টাকা আছে শুনেছি।

—যত বয়স বাড়ছে তোমার cynicism ততই বেড়েই চ'লেছে দেখছি। শোন—আজ ডিনারে এস। অনেক পরামর্শ আছে—আর কতকগুলো জিনিস দোব তোমার হাতে—ওদের দিও……।

দয়ালব্রহ্মচারী

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেক্রেটারিয়েটে চাকরী করাটা কেরাণী মহলে একটা বড় গর্ব্বের কথা। বিশেষ যাঁরা গরমের সময় সিমলার পাহাড়ে ছয়মাস নরমে থাকেন। আর শীতের সময় ফিতে-পেঞ্চে কোঁচা গুটিয়ে কলকেতায় কাটান।

আমাদের ব্রহ্মচারিজন দয়াল ব্রহ্মচারী মহাশয়ও সেইরূপ "সেক্রেটারিয়েট সাধু" ছিলেন। ছয়মাস সিমলা শৈলে ছয়মাস কাশীর মাঠে কাটাতেন। যেমন মিষ্টুক তেমনি আলাপী। তাঁকে পেলে সকলেই আনন্দে থাকতেন, তাই খুঁজতেনও। অনেক ভালো কথা তো শোনা যেতোই, আবার মজলিসী কথাও থাকতো। সুতরাং আমাদের মত কাশীবাসীর পক্ষে সর্ব্বাংশে উপভোগ্য।

আমি এখন কাশীতেই থাকি, কাশীবাসও করা হয় বাজারও করা হয়। ঘাটে আড্ডাও দি, সাধুও খুঁজি চাও খাই, সিগারেটও বাদ যায়না। সবই তিনি জানতেন, বলতেন "করেনে, করেনে—যতদিন চলে করেনে। যখন যেটা খসবার আপনিই খসবে।

দীর্ঘ ছন্দের গৌরবর্ণের পুরুষ, ছাপ্পান্ন-সাতান্ন-বয়স, পঞ্চষটির ওপারে পৌঁছে থাকবে। বেশ শক্ত ও সমর্থ। সাধুদের কথা শুনতে চাইলে বলতেন,—"কে কি-রকম তা শোনবার তোর দরকার কী? তাঁর সঙ্গে শেয়ারে কারবার করতে যাবেনা তো,—ঠকবার ভয় নেই। যিনি যে কারণেই হোক, জন্মভূমি, বিষয়-আশয়, ঘরবাড়ী, স্ত্রীপুত্র আত্মীয়স্বজনের মায়া কাটিয়ে সংসার সুখ ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে পেরেছেন, তাঁর ত্যাগটাই কী কম নাকী? আমিও তো তাঁদের একজন রে। তাঁদের সম্বন্ধে কিছু বলবার আমার কোন্ অধিকার আছে? ও সব নয়, মিছে অপরাধ বাড়াবার সখ্ রাখিস নি।" ইত্যাদি এইরূপ উপদেশ আপনিই এসে যেত।

একবার বোধ হয় বছর দুই তাঁকে দেখতে পাইনি, মাঝে মাঝে তাঁর কথা মনে হ'ত;—কারণ কী? আছেন তো?"

তখন কায়বংকল-ক্লাসের, অল্প ছোট ছোট- অবস্তিকর ঝোঁকায় ভুগছি! একজন ডাক্তার বললেন—"রক্ত দূষিত হয়েছে, একটা ভালো টনিক, দু তিন শিশি ব্যবহার করা দরকার।" দশাশ্বমেধ কালীতলায় দাঁড়িয়ে ভাবছি। পাশেই দণ্ডীদের মঠ। সহসা পিঠে কার হাত পড়লো—"কি রে কেমন আছিস?" ফিরে দেখি দয়াল ব্রহ্মচারী মশাই। সানন্দে তাড়াতাড়ি তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে—অবশ্য বলনুম ও দেখানুম।

"কাছে দুটো পয়সা আছে,—আয়, বলে বেনের দোকান থেকে দুপয়সার টুকরো টুকরো "পয়াকাটি" নিলেন। বললেন রোজ সকালে এক এক কুড়ি করে, একটুকরো, কলার সঙ্গে গিলে ফেলবি। আর একটা পয়সা হবে?" বললুম "হবে"। "তবে তো অসুখ সেরেই গেছে"—বলে বাজারে ঢুকে —"কুবল্ব" নামা ফল এক পয়সায় কিনে ফেললেন, ফেরালো কি আবশ্যক হবে। বললেন, এর দুগারটে করে রোজ গিলে ফেলে খাবি। পটলের

মত লাগবে, আহার ওষুধ দুই হবে। এক সপ্তাহের মধ্যেই ফল পাবি। আর টনিক খেতে হবে না। এখন তোদের খবর কী বল্।"

তারপর ঘণ্টাখানেক আমাদের গাড়ী রাখালগঞ্জ চললো। জিজ্ঞাসা করলুম, "এবার অনেক দিন পরে দেখা দিলেন, অন্য কোনোদিকে গিয়েছিলেন বুঝি? আমরা ভাবছিলুম।"

"তোদের আর ভাবতে হবে না, বেড়ানর বাধা পড়েছে, 'ক্যাটাগ্রাস্ট' হয়েছে। কেউ বেরুতে দেয় না, তাই কাশী পালিয়ে এলুম।

"বেশ জায়গা বেছেছেন তো—যেখানে এক্কার ধাক্কা সর্ব্বক্ষণ সামলাতে হয়। না না, সে হবে না মশাই, মঠে লম্বা হয়ে শুয়ে যা করতে হয় করুন। আহারাদির ব্যবস্থা এইখানেই হবে।

"অর্থাৎ একাকে না সামলে তোদেরি সামলাতে হবে। থাক্, ও সব বাজে কথা থাক্। যার নাম করে' তিরিশ বছর ঘর ছেড়েছি, সে কি খুঁজছে নাকি? কাশী এসেছিস কেনো, ফিরে যা,—বাণীগঞ্জ এখনো খালি আছে।"

"মাপ করবেন, আমরা তেমন আসিনি। ওর মধ্যে কথাটা এড়ানোটাই বোধ করি সত্য ছিল।"

"আর তার চেয়ে সত্য ছিল—সেই কথাটা সাধুদের ওপর চাপানো। যা বিরক্ত করিস নি।"

"আপনার কিন্তু বেপরোয়া রাস্তায় বেড়ানো চলবে না।"

ব্রহ্মচারী মশাই বললেন—"তোদের কল্যাণ হোক্। আমার মালিককে চিনলিনি—এই দুঃখ। যার মাল সে সামলাবেনা, কোথায় এমন দেখলি? আমার মালিককে এমন বোকা বৈঠস ভাবছিস কেনো? লোক একটা পয়সা সাত পাক দিয়ে উঁচুতে গোঁথে, মাঝে মাঝে হাত দিয়ে দেখে আছে কি না। আর যে দুনিয়ার ভার নিয়ে বসে আছে—সে আমায় দেখে রাখবে না, তবে সে কিসের মালিক? তার উপর এই বিশ্বাস যতদিন না আসে, ততদিন—দুঃখ কষ্ট তাপ। যা, আর বাজে জোঠামো করিস নি।"

"কি বুঝিস, মালিক তো জ্ঞান-বুদ্ধিও দিয়েছেন।"

"ওরে খাস্ খাস্। ওই একটা কথা সবাই কয়। তা নিয়ে দু'পক্ষে জ্ঞান-বুদ্ধির লড়াইও চলে। ও সব দুনিয়ার খেলা বজায় রাখবার সাহায্য করে। পরে ওই "বিশ্বাসটা" এসে নির্যাস ফেলে বাঁচে। যাক্, সে অনেক কথা, তাও যে final বা শেষ কথা তাই বা কে জানে! কেউ সকরে বাড়ে, কেউ তাগে বাড়ে,—ঘাটটা বটে স্বতন্ত্র। যা, চা খেগে যা।"

তিনি প্রাণের কথাটাই বলছিলেন,—তাই আনন্দের হাসিই সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো।

(৬)

এক বছর দেখা সাক্ষাৎ নেই। বৈকালে মনটা উদাস হয়ে যায়। কি যেন অভাব বোধ করি, সবই তো রয়েছে, মানুষেরও অভাব নেই। সেই বাজার হাট, সেই সদাব্রতের, সেই ঘোরা-ফেরা, সেই জিনিষের

চা খাওয়া, সেই দুধের কথা—আর ইংরেজের বকাবকা। এ রাজ্য থাকতনা, কেবল পেনসনটা দেয় বলে 'আজো' টেঁকে আছে!" ঘাটে বসলেই—ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়মিত আছে। অভাব কিছুরই নেই, স্বভাব সঙ্গেই এসেছে।

কিন্তু ব্রহ্মচারী মশাই গেলেন কোথায়—একবছর হয়ে গেল যে। বোধ করি "ক্যাটাক্যাম্ব" কাটিয়ে থাকবেন। একটু চিন্তাও এলো,—"না, সে লোকের কখনই তা হবে না,...হ'তে পারে না।"—মনটা তবু একটু হয়ে রইলো।

তার পরদিন বেলা প্রায় দশটা হবে—বাজারে ঢুকলুম। আলু পটলে সকলের অধিকার আর নাই, অটলবাবুরাই কুঁকে আছেন, থাকুন। শাকই আমাদের সম্বল রাখে—পরম আত্মীয়, গরীবের ডাক শোনে। দেখি, সেখানেও আজ মানুষে আর ষাঁড়ে মিশিয়ে ভীড় মন্দ নয়। কেনা বেচায় কিন্তু কারো তেমন মন নেই—সকলেই দাঁড়িয়ে স্মিতমুখে কি দেখছে। ব্যাপার কী?

এক আধাবয়সী শাকউলী গাড়ীখানেক বেতোশাক নিয়ে এসেছিলো। সে একটা ঝুড়ি করে, তা থেকে শাক নিয়ে নিয়ে—একটু তফাতে স্বতন্ত্র স্থানে ফেলে আসছিল আর দশ পনেরটা ষাঁড় আর গরুতে মহানন্দে খাচ্ছিল। ভাবছি মাগীর মানত ছিল নাকি—না বৈরাগ্য?

এমন সময় পিঠে এক মিঠে চাপড়—"চল, এখানে আর নয়!" চমকে দেখি—ব্রহ্মচারী মশাই। আনন্দে মুখে কথা বেরুল না, প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলুম।—এখানে আর কি দেখবি, চল্ বসবি'খন। কিছু কেনবার আছে?"

"কেবল—মাছটা।"

"ওটা আজ থাক।—সঙ্গে কতো আছে?"

"আনা ছয়েক হবে।"

"তার মালিক,—তাও ঠিক করে রেখেছ," বলে হাসলেন। বললেন 'দে'।

পয়সা নিয়ে—শাকউলীর কাছে গিয়ে বললেন—"নে, ঠকবি কেনো!"

"দশ আনা তো পেয়েছি বাবা" বলে' সে কেঁদে ফেললে।

"তার এ আমি দিচ্ছিনে, বিশ্বনাথ দিয়েছেন, আমি কোথা পাবো। তোর শাকের দাম দশ আনার অনেক বেশী, আমার এই গেরুয়া কাপড় তোকে ঠকাচ্ছিল। তুই বসে বেচলে অনেক পেতিস।"

"না বাবা, আমি সত্যি বলছি. সেই সন্ধ্যে পর্যন্ত বসে থাকতে পারতুম না। আমার খেতের জিনিষ, যা পড়ে থাকতো ফেলে চলে যেতুম—ষাঁড়েই খেতো।"

সেও নেবেনা, উনিও দেবেন। শেষে সাধুর চাল্ ধরলেন। "—সাধুর কথা শুনতে হয়, ঘুষ করতে নেই। নে, বাড়ী যা। তোর ভালো হবে।" তাকে নিতে হল'। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে সে চোখ মুছলে।

ফিরে এসে বললেন—"গরীবদের কাছে এখনো ধর্ম্ম আছেন, তবে সকলের কাছে নয়, অনেকেই তোদের ঠকার জ্ঞান-বুদ্ধিটাও পাচ্ছে।—চল্ এখন বাসায় চল, সেইখানেই আজ,—বুঝেছিস তো। আমাদের ওই করেই চলে।"

আমি কৃতার্থের মত পায়ের ধুলো-নিলুম। "ও আবার কি,—চল্।"

"তা তো চলছি, কিন্তু না-বলা, না-কওয়া, কোথায় সরে পড়েছিলেন বলুন তো? তাতে আমাদের লাগে না কি?"

"লাগালাগি থাকতে কাকী আসতে নেইরে, বন্ধন গুলো বাদ দিতে হয়।—যাকে বলা দরকার তাঁকে না বলেও যাইনি। গোপাল ডাক্তার যখন বললেন—"এখন 'ক্যাটারাক্ট' operation-এর ঠিক সময় হয়েছে" তখন আর একদিনও বিলম্ব করিনি।—অধিকারীর কথা শুনতে হয়। তাই....."

"তারপর?"

"তারপর নীচে এনে মালিক সব বেখিয়ে বা করিয়ে ছাড়েন, ফাঁকি দিয়ে ওপরে ফেরবার উপায় নেই! কলেজ কাকে বলে দেখা হয়নি, রাজধানীতে গিয়ে মেডিকেল কলেজ খানিতে নাম লেখাতে হ'ল। মঠ ঘুচে অট্টালিকায় শয়ন। সারা কালো মেয়ে-পুরুষের ভীড়। তারা যেন একটা মেলবার বস্তু পেলে। তিন দিন তাদের কথামত থাকতে হল—আলাপও হয়ে গেল। সকলেই চান তাঁর সঙ্গেই কথা কই। সে অনেক কথা।

রোজ বিছানায় তাদের বদলে দেয়, আমি বারণ করি, বলি—বদ-অভ্যাস আর বাড়িয়ে দিওনা বাবা. একটু ময়লা দেখে দিও, না হলে ঘুম হবে না। খাঁটি দুধ আর নানা রকম ফল খেতে দেয়—কমলা লেবু, বেদানা, আপেল, নাসপাতি। বলি এ আবার কি ফল? জাত মারবে নাকি? শশা, কলা, পেয়ারাই তো জানি। তা দাও, কিন্তু বেদানাটা বাদ দিতে হবে বাবা,—পরকালটা আর ক'রনা বা করিও না, অন্যের অধিকারে হাত দিইও না।"

"কেনো, ও কথা কেনো বলছেন, এখানে সব দরকারী জিনিস।"

"ওটা, বেদানা কি ঘোড়ার দানা, চোখ বোজবার আগে যখন বোঝবার অবস্থা থাকে না, তখন ছেলে বেটারা বেশ গলা ছেড়ে (যাতে পাড়ার লোক শুনতে পায়) বলে "বেদানার রস যতটা পার খাও বাবা, খেলেই উপকার।" সত্যি কথাই বলে। চামচের ঘাল চামচেই থাকে। তখন বাবাকে নাবাবার জন্য শ্মশান-বন্ধুরা ব্যস্ত। উপকারটা যে কার হয় তা তারাই দেখে।...তাই বলছি ওটা দিওনা, যাদের অধিকার তাদের থাক, অন্যের পাওনায় হাত দিতে নেই।"

হাসির হল্লা পড়ে যায়, কেউ নড়তে চায় না। চতুর্থ দিন সকাল থেকে সকলেই মহাব্যস্ত,—টেবিল চেয়ার ও নানা ঝকঝকে উপকরণে বা' অস্ত্রশস্ত্রে ঘর ভরে গেল। গায়ানের ব্রাশ আরম্ভ হ'ল। শেষে সব আস্তিন গুটিয়ে বলে—এইবার একটু অজ্ঞান হতে হবে।"—ওরে বাবা,—খুশীর চোটে নাকি? বললুম—

"ও আবার কি কথা— অজ্ঞান তো চিরকালই আছি, সজ্ঞান আবার কবে পেলে!"

"দয়া করে এখন আর হাসাবেন না।"

"অর্থাৎ—তোমরা কেবল দয়া করে কাঁদাবে! বেশ,—তথাস্তু।"

তারপর তারা কি করেছে না করেছে কিছু জানি না।

একদিন,—কদিন পরে তা জানি না, সব এসে বললেন "আজ বাঁধন খুলবো—আপনার মালিককে স্মরণ করুন, আমরাও জয় দুর্গা বলি।" বুঝলুম—তাদের হাত কাঁপছে। বললুম—ভয় নেই, বেদানা খাবার বিলম্ব আছে।"

কারুর মুখে কথা নেই, কারুর খুব সন্তর্পণে করলেন। "কটা আঙুল দেখছেন?" বললুম—"তিনটে,—কেবল আঙুলই নয়—নিষ্কলঙ্ক চাঁদমুখও দেখছি।" শুনে তাদের সে-আনন্দ আর লাফালাফি দেখে কে?—বাবু কিন্তু ছাড়লেন না, বলে "এখন শুয়ে থাকা, ইচ্ছামত আহার, আর আমাদের গল্প শোনানো, যখন নাম লিখিয়েছেন, ছাড়া পাওয়া শক্ত আমাদের হাতে।"

"মেসে রাজী হলুম, তাদের দুঃখ করতে পারিনা। অনেক করে—প্রায় মাস দেড়েক পরে ছুটি পাই ও পুরী চলে যাই। ফেরবার সময় দেখা দিতে হবে, কথা ছিলো। সে-কথা রক্ষা করে কাশী চলে এসেছি। এখন মা অন্নপূর্ণা কি দেবেন দিন, খিদে পেয়েছে।"

বললুম—"শাকউলীর ব্যাপারটা শুনতে হবে যে।" ব্রাহ্মণী তাঁর পূর্ব্বপরিচিতা, সব কথাই শুনছিলেন। হাসলেন—"এখন নয় বাবা, আমিও শুনবো। তাহলেড়ে আনি—খেতে খেতে বলবেন।"

"তাই হবে মা—সেটা তোমার শোনবার কথা।" পরে খেতে খেতে বললেন—"পুরী থেকে ফিরে, কলকাতায় ডাক্তার-বাবুদের 'মেসে' তিন দিন থাকতেই হ'ল। চতুর্থদিনে তাদের কি একটা বড় ব্যাপারে তিউটী পড়েছিল, ষ্টেসনে গিয়ে আমাকে গাড়িতে তুলে দেবার উপায় ছিলনা। আনে বেশী টাকা নেবেনা, তাই কাশী আসবার ভাড়ার মত কিছু রেখে দিয়েছিলো। টিকিট কিনে দেখি দশ-আনা পয়সা বাঁচলো। করি কি, ফেলে দিতেও পারি না, টাঁকে রাখতে হ'ল। সে যেন বিশ মণ বোঝা নিয়ে দোলা। তাই কাশী পৌঁছে সোজা দশাশ্বমেধে চলে এসে বাজারে ঘুরছিলুম—সেগুলোর একটা কিছু উপায় করবার জন্যে।

"আমার ঠিক আগেই—এক শাকউলী বেহোঁসকের প্রকাণ্ড একবোঝা নিয়ে এসে শাকগুলো চেলে ঘাম মুছছে আর বিরক্ত ভাবে আপন আপনি বলছে—"ছেলেটাকে বলাই আমার ভুল হ'য়েছিলো। একদিনে তিনদিনের জিনিস কেটে দিয়েছে, সন্ধ্যে পর্য্যন্ত বসে বেচলেও ফুরুবেনা,—আমার যেমন লোকসেনে বরাত!"

"আমার কিন্তু সেই শাক দেখে ভারী লোভ পড়েছিলো,—যেমন তাজা তেমনি নরম, আবার তার সবুজ রংটাও কি সুন্দর! তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—"মাই, কত দিলে এই শাকগুলি সব দিতে পারো?" সে আমার দিকে চেয়ে, বয়স আর গেরুয়া কাপড় দেখে হেসে ফেললে, বললে—"তুমি এ জঞ্জাল নিয়ে কি করবে বাবা!"

সে তো জানেনা—পয়সা গুলো আমাকে কি বিপদে ফেলেছে, কি অস্বস্তি এনেছে, তাদের ফেলতে পারলে আমি বাঁচি। বললুম-"আমার দরকার আছে মা।

সে আর একবার আমার দিকে ভালো করে দেখে বললে—"তোমার নিজের কাজে যদি লাগে, আমারো নিজের খেতের শাক, তুমি নিয়ে যাও বাবা, ও গুলোর জন্য সার্থক হবে, পয়সা আমার চাই না—দাম দিতে হবে না।"

"তবে ও শাক আমি চাইনা মা, মূল্য না দিলে আমি শান্তি পাবনা—আমার কাজও সফল হবে না।" শুনে তার সকল মুখখানি মলিন হ'য়ে গেল। সে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে—"তবে এক পয়সা দিন বাবা।"

আমাকে ঠিক করে বল,—বেচলে ওর দাম কতো আশা করচিস?"

আমি আন্দাজে বলছি—অতো শাক বিক্রি হবে না। হলে পাঁচসিকে কি দেড় টাকাও হতে পারতো। আহি তা পারব না বাবা, ঘণ্টা দুই দেখে বাকি যা থাকতো, ফেলে রেখে উঠে যেতুম। আমি থেকে গেছি, আবার ফিরে যেতেও হবে অনেকটা, আপনি দয়া করে নিয়ে যান।"

কি করবো মা, আমাকে একজন বেদড়াড়া দিয়েছিলেন তা থেকে দশ আনা পয়সা বেঁচেছে, আমি খাচ্ছে পারছি না—বড় বিপদে পড়েছি। কিন্তু তার বেশী কোথায় পাবো মা, তোমার লোকসানও করতে পারবো না।"

"বলেছি তো বাবা—আমার খেতের জিনিষ, আমার আবার লোকসান কি! এ ভাগ্য আমি আর পাব কবে? পয়সা না নিলে তুমি যখন নেবে না, রেখে যাও। কিসে করে নেবে?"

হাসতে হাসতে বললুম—"তকাতে ওই কাঁকা মাঠগাটার চেলে যে।"

"তারপর?"—তারপর দেখনা কি হয়।" সে খুড়ি করে, চেলে দিয়ে আসতে লাগলো, সঙ্গে সঙ্গেই দশ পনেরটা ষাঁড় আর গরু মিলে মহানন্দে খেতে আরম্ভ করে দিল।

"ও বাবা ষাঁড়ে যে সব খেয়ে ফেলছে, একটু দেখুন না।—সঙ্গে কেউ নেই কি?"

হাসতে হাসতে বললুম—"দেখছি তো—ওদের জন্যেই তো নিয়েছি মা। কেমন আনন্দে খাচ্ছে দেখনা।"

"সে চোখ কি আছে বাবা, এতক্ষণ লাটি-সোঁটা নেকতো।" বলে কাঁদতে বসলো। ভালো কথায় অনেক করে বুঝিয়ে সেই দশ আনা, আর এই বুদ্ধিমানের দেওয়া দুআনা তাকে দিয়ে ও তার কল্যাণ কামনা করে সরে আসতে পেরেছি।

"আচ্ছা এখন তোমাও একটা মাদুর পেতে যাও মা, শুয়ে পড়ি। তিনচার রাত ঘুমতে পাইনি।"

ঘরানে ব্রহ্মচারী মশায় কথা তুলতে পারিনি। মনে হয় শেষ অংশটার আগে পূর্বে যেন কোথাও দিয়েছি তাবা কিন্তু এবার আজ একটু ভিন্ন ভাবেই লিখলুম।

সর্প-রহস্য

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

সাপ দেখিলে বাপ বলিয়া লাফ দিবার উৎসাহ হয় না, এমন মানুষ সংসারে বিরল। বস্তুত, সাপের মত মানুষের এত বড় শত্রু প্রাণী-জগতে আর দ্বিতীয় কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয় না। উগ্র বিষধর সর্পের সামনা-সামনি পাল্লায় কখনো যে পড়িয়াছে, একথার সত্যতা তাহাকে স্বীকার করিতেই হইবে। জীবনে আমি পড়িয়াছি দুইবার। প্রথম বারের আমার অভিজ্ঞতা একেবারে দংশনের অভিজ্ঞতা; দ্বিতীয় বারের বর্ণনের। পাল্লা অবশ্য দুইবারই ছিল সর্পরাজ গোখুরার। প্রথমবার বাঁচিয়া গিয়াছিলাম সম্ভবতঃ কোনো প্রবল শুভগ্রহের আনুকূল্যে; দ্বিতীয় বার, আতঙ্কে, বিস্ময়ে এবং কতকটা আনন্দে, একেবারে পাথর বনিয়া গিয়াছিলাম। সে কাহিনী পরে বলিতেছি।

কথায় বলে, সাপের লেখা আর বাঘের দেখা। এ কথার তাৎপর্য এই যে, বাঘের সহিত নিতান্ত সামনা-সামনি দেখা হইলে তবেই বাঘের হাতে প্রাণ হারাইতে হয়, যথোপযুক্ত সতর্কতা এবং সাবধানতা অবলম্বন করিলে সে দুর্ঘটনা অনিবার্য্য নহে; কিন্তু অদৃষ্টে সর্পদংশন লেখা থাকিলে তাহা হইতে আর নিস্তার নাই। অবশ্য, এ কথাও সত্য যে, অদৃষ্টে বাঘের হাতে মৃত্যু লেখা থাকিলে তাহা হইতেও নিস্তার লাভ করা সম্ভব নহে; কারণ, অদৃষ্ট শুধু সাপের ক্ষেত্রেই নহে, পরন্তু সব ক্ষেত্রেই অনিবার্য্যীয় ব্যাপার। কিন্তু সে যাহাই হউক না কেন, 'সাপের লেখা' কথার মধ্যে যে খানিকটা সত্য আছে, তাহাও অস্বীকার করা যায় না।

পৌরাণিক কালে একথার প্রমাণ দিতে হইয়াছিল স্বয়ং রাজা পরীক্ষিৎকে। শৃঙ্গী মুনির নিকট হইতে অভিসম্পাতের ফলে সাতদিনের নোটিস্ পাইয়াও ছয়দিন নিরাপদে কাটাইয়া সপ্তম দিবসের দিন আহারার্থে একটি ভূমিষ্ট ফল কাটিবার কালে ফলের ভিতর হইতে ক্ষুদ্রদেহধারী তক্ষক নির্গত হইয়া রাজার প্রাণসংহার করে।

এক্ষেত্রে অবশ্য এমন কথাও বলা চলে যে, শৃঙ্গী মুনির অভিশাপেই যখন রাজার সর্পাঘাতে মৃত্যু হইল, তখন কোন্ যুক্তিতে বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব হইতেই রাজার অদৃষ্টে সর্পাঘাতে মৃত্যু লিখিত ছিল। এ কথার উত্তরে আবার বলা যাইতে পারে যে, রাজা পরীক্ষিতের অদৃষ্টে সর্পাঘাতে মৃত্যু লিখিত ছিল বলিয়াই ঘটনাচক্রে শৃঙ্গী মুনিকে ঐরূপ অভিশাপ দিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। এ যেন একটা vicious circleএর ব্যাপার,—একটা যুক্তির লিহনে আর-একটা যুক্তি অন্তহীন চক্রে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

এ সম্পর্কে একটি সুবিদিত বৈদেশিক কাহিনী মনে পড়িয়া গেল, যাহা এখানে বলিলে খুব বেশী প্রাসঙ্গিক না হইলেও, যাঁহারা নূতন শুনিবেন তাঁহাদের পক্ষে বোধ করি একেবারে অশ্রাব্য হইবেনা।

বহু প্রাচীনকালে গ্রীস্ দেশে একজন খ্যাতনামা দার্শনিক বাস করিত। সে প্রচার করিত Theory of Predestination, অর্থাৎ অদৃষ্টবাদ। যাহা ঘটিল, তাহা ঘটিবার ছিল বলিয়াই ঘটিল; এবং যাহা ঘটিবে, তাহা ঘটিবে বলিয়া পূর্ব হইতে স্থির হইয়া আছে বলিয়াই ঘটিবে; ভবিষ্যতের ঘটনার যে অনতিবর্ত্তনীয় ছক নিয়তি কাটিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে পরিবর্তন ঘটাইবার কাহারও সাধ্য নাই;—ইহাই ছিল গ্রীক দার্শনিকের মতবাদ।

একদিন তাহার এক দুঃ দৃষ্টা অনবধানতা বশত একটি কাঁচের গ্লাস ভাঙিয়া ফেলিলে দার্শনিক ক্রুদ্ধ হইয়া ভৃত্যের পালে একটি চড় বসাইয়া দেয়। এরূপ আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া ভৃত্য প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "প্রভু, অন্যায় করলেন কিন্তু!"

ক্রু-কুঞ্চিত করিয়া দার্শনিক বলিল, "অন্যায় করলাম কি রকম! তুই আমার অমন সখের গ্লাসটা ভাঙলি, আর আমি করলাম অন্যায়?"

মৃদুস্বরে ভৃত্য বলিল, "আমি ত' ভাঙিনি হুজুর।"

ক্রোধমিশ্রিত কণ্ঠে দার্শনিক বলিল, "তুমি ভাঙনি ত' আমি ভেঙেছি না-কি?

ভৃত্য বলিল, "আজ্ঞে না. আমিও ভাঙিনি, আপনিও ভাঙেননি; নিয়তি ভেঙেছে। আপনি ত' বলেন, যা-কিছু ঘটে, আগে থেকে তা ঠিক হ'য়ে থাকে ব'লেই ঘটে। আর গ্লাসটার ভাঙা আগে থেকে ঠিক হ'য়ে ছিল তাই ভেঙেছে। আমার কি দোষ প্রভু?"

মৃদু হাসিয়া দার্শনিক বলিল, "বাপু, এতটা ভাবতে পারলে, অথচ, ইকি দুবেক এগিয়ে গিয়ে আর অত একটু ভাবতে পারলে না? চড় ত' তোমাকে আমি মারিনি, নিয়তি মেরেছে। আর চড় খাওয়াটা তোমার অদৃষ্টে আগে থেকে লেখা ছিল তাই তোমার গালে চড় পড়েছে। আমার অপরাধ কি বল?"

বলা বাহুল্য, ভৃত্য এ কথার কোনো উত্তর খুঁজিয়া পায় নাই।

ঠিক এই পর্যন্ত লেখার পর আমার কিশোরী নাতনী পূরবী আসিয়া সমস্তটা পাঠ করিয়া বলিল, "তাসই হচ্ছে দাদামশাই, কিন্তু আপনার দার্শনিকের গল্পটা এমনি শুনতে ভাল হ'লেও শেষ দাগসই হয়নি। সত্যিই একটু অপ্রাসঙ্গিক হয়েছে।"

বলিলাম, "কঠিন কালো চকমকে পাহাড়ের গা ফুঁড়ে ছোট্ট একটি সবুজ চারাগাছ বেরিয়েছে, তার ডালে একটি টুকটুকে লাল ফুল.—এ তুমি দেখেছ পূরবী?"

পূরবী বলিল, "না, দেখিনি।"

"আমি দেখেছি! কঠিন কালো পাহাড়ের গায়ে তীক্ষ্ণ কাঁটার একটা ভাঙাচোরা কাঁটাগাছ বেরোলে হয়ত' খানিকটা প্রাসঙ্গিক হোত, কিন্তু পাহাড়ের কাটলে বীজ প'ড়ে সবুজ গাছ বেরোলে লাল ফুলের না ফুটে উপায় নেই, তা সে যতই অপ্রাসঙ্গিক হোক না কেন। দার্শনিকের গল্পটা হয়ত' একটু অপ্রাসঙ্গিক হয়েছে কিন্তু আমাদের অপ্রাসঙ্গিক মনোযোগের তুলনায় সেটুকুকে নগণ্য বলা যেতে পারে।"

বিস্মিত কণ্ঠে পূরবী জিজ্ঞাসা করিল, "অপ্রাসঙ্গিক মনোযোগ কি ব্যাপার?"

হাসিয়া বলিলাম, "অপ্রাসঙ্গিক রমেশের কথা জানোনা? অপ্রাসঙ্গিকতার কথা যখন তুলেছ, তখন অপ্রাসঙ্গিক রমেশের কথা বল্‌লে উপস্থিত তা খুব বেশি অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। রমেশ নামে আমাদের একটি বন্ধু আছে, বক্তৃতা করবার সময়ে প্রসঙ্গ হ'তে অবান্তর প্রসঙ্গে বেরিয়ে যাবার তার অদ্ভুত ক্ষমতা! ধর, 'সাহিত্যে অনাচার' এই বিষয়টি নিয়ে রমেশ বক্তৃতা আরম্ভ করলে; খানিকটা একরকম স্তানেই চল্‌ল; তারপর আরম্ভ হ'ল বিষয় থেকে অবান্তর বিষয়ে বারংবার বেরিয়ে যাওয়ার লীলা। অবশেষে ঘণ্টাখানেক পরে দেখা গেল গভীর উত্তেজনার সহিত হয়ত' দামোদরের বন্যার কথা বল্‌তে বল্‌তে, হপ্‌ ক'রে ব'সে পড়ল। 'সাহিত্যে অনাচার' শেষ পর্যন্ত দামোদরের বন্যার জলে ডুবে মরল।"

সকৌতুকে হাসিতে হাসিতে পূরবী বলিল, "কি রকম?"

"কি রকম? কতকটা এই রকম। ধর, রমেশকে একক, দশক, শতক ইত্যাদি ব'লে যেতে হবে। সে আরম্ভ করলে একক, দশক, শতক, সহস্র, অযুত—এ পর্যন্ত সে ঠিক এল, কিন্তু লক্ষ বলতে গিয়ে একটু পরিবর্তিত হ'য়ে বেরিয়ে গেল লক্ষ্মী; লক্ষ্মীর পর স্বভাবত এল সরস্বতী, তারপর এল কার্তিক; সরস্বতীর ভাই কার্তিক হঠাৎ মাসে পরিবর্তিত হ'য়ে এল অঘ্রাণ, পৌষ; তারপর আর একটু রূপান্তরিত হ'য়ে মাঘ হ'ল মাগ, শেষ পর্যন্ত মাগ থেকে ছেলেপিলে বেরিয়ে ঠেকল গিয়ে নিতাইয়ে। তা হ'লে রমেশের বক্তৃতাটা দাঁড়াল কতকটা এই রকম,—একক, দশক, শতক, সহস্র, অযুত, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, অঘ্রাণ, পৌষ, মাগ, ছেলেপিলে, নিতাই। কোথায় সুরু হয়েছিল একক, আর কোথায় শেষ হ'ল নিতাইয়ে! এই রকম প্রসঙ্গ-ছেঁড়া বক্তৃতার জন্যে আমরা রমেশের নাম দিয়েছি অপ্রাসঙ্গিক রমেশ।"

অপ্রাসঙ্গিক রমেশের কাহিনী শুনিয়া হাসিতে হাসিতে পূরবী প্রস্থান করিল।

সে যাহা হউক, তক্ষক দংশনে মহারাজ পরীক্ষিতের মৃত্যুকালে পুত্র জনমেজয় নিতান্ত অল্পবয়স্ক ছিলেন। বড় হইয়া আস্তীক সজন বন্ধুবান্ধবের মুখে সর্পদষ্টে পিতার মৃত্যুর করুণ কাহিনী শুনিয়া তাঁহার অন্তরে জাগ্রত হইল প্রবল হিংসা প্রবৃত্তি। সমূলে সর্পকুল ধ্বংস করিবার অভিপ্রায়ে তিনি সর্পযজ্ঞের ব্যবস্থা করিলেন। সর্পকুলের বিলোপ-সাধন ব্যাপারে দেবগণের উৎসাহের বিশেষ অভাব ছিল না বলিয়াই মনে হয়, কারণ যজ্ঞে আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহারা দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত সভায় একাংশ অধিকার করিয়া বেশ জাঁকাইয়া বসিয়াছিলেন। সর্পদংশনে মানুষের মতো তাঁহাদের মৃত্যু ঘটিবার আশঙ্কা ছিল না নিশ্চয়; কিন্তু হঠাৎ সর্পাঘাত ঘটিলে বিষ-সন্তপ্ত দেহে মর মর হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার দুঃখ হইতে আরোগ্য লাভের জন্য বোধ করি তাঁহাদের প্রচুর পরিমাণে অমৃত সেবনের প্রয়োজন হইত।

সে যাহা হউক, প্রাথমিক অনুষ্ঠান অতিক্রম করিয়া যজ্ঞ চরম স্তরে উপনীত হইল। ঋত্বিকগণের মন্ত্রশক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে সর্প আসিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রাণবিসর্জন করিতে লাগিল। বিপদ দেখিয়া প্রধান আসামী

তক্ষক দেবরাজ ইন্দ্রের উত্তরীয়ের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তক্ষকের সহিত ইন্দ্রের কিছু সৌহার্দ্য ছিল বলিয়া প্রথমটা ইন্দ্র তেমন কিছু আপত্তি করেন নাই; কিন্তু তক্ষক আসিয়া অগ্নিকুণ্ডে পড়িতেছে না দেখিয়া পুরোহিতগণ যখন আকর্ষণী শক্তির মাত্রা প্রচুরভাবে বাড়াইয়া তক্ষকের নামে ঘন ঘন আবাহন-মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন, তখন তক্ষক ত' তক্ষক, তক্ষক সহ আশ্রয়দাতা স্বয়ং ইন্দ্রের পর্য্যন্ত টান ধরিল। বেগতিক দেখিয়া ইন্দ্র ব্যস্ত হইয়া আত্মরক্ষার লোভে শরণাগতকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন নিরবলম্ব নিরাশ্রয় তক্ষক বেচারা হুতাশনে পড়ে আর কি। এমন সময়ে নাগরাজ বাসুকি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শান্তির শুভ্র পতাকা হস্তে প্রবেশ করিলেন মহামুনি আস্তিক। তাঁহার কাতর অনুরোধ-উপরোধে দ্রবীভূত হইয়া মহারাজ জনমেজয় বক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত করিয়া হাঁকিলেন, 'স্তিষ্ঠ'! যজ্ঞ নিবর্ত্তিত হইল। বেচারা তক্ষক মরিতে মরিতে কোনো প্রকারে বাঁচিয়া গেল।

সন্ধি বিষয়ে আস্তিক মুনি তৎপর না হইলে সেদিন মানবজাতির একটা মহোপকার সাধিত হইতে পারিত। ধরণী হইত নিঃসর্প, সুতরাং বাল্যকালে 'বসন্ত' অঙ্কুর কবিতার মধ্যে 'গর্ত্ত ছাড়ে সাপ এই বড় দুখ' ছত্রটি কণ্ঠস্থ করিবার কারণ থাকিত না।

'দাপের দেখা'র আধুনিক কালের বহু দৃষ্টান্ত অনেকেরই জানা আছে;—সুতরাং তদ্বিষয়ে কিছু না বলিয়া সর্পদংশন ও সর্পদংশন সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলি।

তখন আমরা পূর্ণিয়ায় বাস করি। আমার বয়স বছর সাতেকের অধিক হইবে না। গ্রীষ্মকাল; কিন্তু পূর্ব্বে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গৌর উঠিয়াছে। বেলা তখন আন্দাজ দেড়টা। পাকা রোয়াকের মধ্যস্থলে প্রশস্ত সোপানাবলী তিন চার ধাপে সুবিস্তৃত প্রাঙ্গনে নামিয়া গিয়াছে। তাহার উত্তর পার্শ্বে দুইটী বৃহৎ জুঁই ফুলের ঝাড়। শুধু ফুল গাছই নহে, প্রাঙ্গনের মধ্যে বিবিধ প্রকারের ফল-মূল তরি-তরকারি গাছের খেলা। মনে পড়ে, একবার সেই প্রাঙ্গনের একদিকে কিছু ভুট্টাগাছেও লাগানো হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত জুঁই-ঝাড়ের নিকটে আমি আমার ভগ্নীর সহিত সানন্দ নিশ্চিন্ত মনে খেলা করিতেছি। এমন সময়ে আমার জীবনের বোধ করি সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর ঘটনাই ঘটিল। জীবনের একেবারে অব্যবহিত পার্শ্বে অকস্মাৎ মৃত্যুর দূত আসিয়া সেলাম ঠুকিয়া দাঁড়াইল! সেদিন মৃত্যু দূতের সেলাম অগ্রাহ্য করিয়া তাহাকে ফেরৎ পাঠাইয়া ছিলেন শশীবাবুর মা,—আমাদের নিকটতম প্রতিবেশিনী, আমার দাতাঠাকুরাণীর অন্তরঙ্গ বান্ধবী। এ-কথা বোধ করি নিঃসংশয়েই বলা চলে, সেদিন যদি শশীবাবুর মা সেই সময়ে আমাদের গৃহে হাত কয়েকের মধ্যে উপস্থিত না থাকিতেন, তাহা হইলে এই দীর্ঘাভিজ্ঞতাময় জীবন-পথের প্রায় সবটাই অনধিগমিত রাখিয়া সেই দিনই সুন্দরী ধরণীর নিকট বিদায় লইয়া সরিয়া পড়িতে হইত।

সহসা আমার দক্ষিণ পায়ের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির নিকট একটা কোনও নরম অথচ ভারি পদার্থ আঘাত করিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠিক যেন ছুঁচ ফোটানোর যন্ত্রণায় সমস্ত শরীরটা চিন্ করিয়া শিহরিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখি খাট হইতে দীর্ঘ একটা সাপ আমার দেহের উপর সাম্প্রতিকতম অনিষ্টসাধন করিয়া ধীর লীলায়িত গতিতে চলিয়া যাইতেছে। "আমাকে সাপে কামড়েছে" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিয়া আমি দৌড়িয়া মার নিকট উপস্থিত হইলাম।

মা আমাকে দেখিলেন কি, উৎকট দুশ্চিন্তায় এবং আতঙ্কে আর্তনাদ করিয়া উঠিয়া তিনি মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া গেলেন। কিন্তু তৎপর হইয়া উঠিলেন শশীবাবুর মা। মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করিয়া ক্ষিপ্রবেগে সম্মুখস্থ ঘড়ির আলনাটা হিঁড়িয়া লইয়া মুহূর্তে এক প্রান্ত দিয়া তিনি আমার পা বাঁধিতে বসিলেন। সে কি অদ্ভুত ভয়-শান্ত অভিনিবেশের সহিত কার্যে নিযুক্ত হওয়া! শশীবাবুর মাকে পূর্বে এবং পরে অসংখ্য বার দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহার সেই সময়কার মূর্তি ভিন্ন আর কোনো মূর্তিই আমার মনে আসে না। যখনই তাঁহার কথা মনে করি, সেদিনকার সেই গভীর নিষ্ঠিত মুখখানি সুস্পষ্ট হইয়া আমার মানসপটে ফুটিয়া উঠে; এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যে ফুটিয়া উঠিবে, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।

শশীবাবুর মার বয়স তখন চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বৎসর হইবে। কায়স্থ বিধবা; শ্যামবর্ণ নিটোল মুখাবয়বে শান্ত কোমলশ্রী; উদ্বেগ এবং ব্যগ্রতা হেতু বিস্রস্ত মুখের ভিতরের সমস্ত পান একদিকের গালে আসিয়া ঠেলিয়া রহিয়াছে; ধপধপে থান শাড়ীর মাথার বেড়টি কাঁধের উপর স্খলিত। যদি চিত্রকর হইতাম, শশীবাবুর মার সেদিনকার সেই অপরূপ মাতৃমূর্তি বোধ করি আজও আমার তুলিকায় নিভুলভাবে ফুটাইয়া তোলা কঠিন হইত না।

ওঝা শুনিয়া একজন চাকর লাঠি লইয়া আসিয়া সাপটাকে মারিয়া ফেলিয়াছিল। শুনিয়াছি, বিষক্ষয়ের পর সাপ সাময়িকভাবে দুর্বল হইয়া পড়ে বলিয়া খুব দ্রুত চলিতে পারে না। মনে পড়ে, লাঠিতে মৃত সাপটাকে ঝুলাইয়া লইয়া আসিয়া চাকরটা বলিয়াছিল, "বাপরে বাপ! অমন গোখুরো সাপ হয়!" এ কথাও মনে পড়ে, তদুত্তরে ভ্রূকুটি ইঙ্গিত হাসিয়া শশীবাবুর মা সাপটাকে সরাইয়া লইয়া যাইবার উপদেশ দিয়াছিলেন।

আমার সমগ্র শরীর, আপাদমস্তক, থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। আমার মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া সান্ত্বনার সুরে শশীবাবুর মা বলিলেন, "ভয় কি বাবা? এই ত' ভাল হ'য়ে গেছ.—আর কোনো ভয় নেই।"

ইত্যবসরে ডাক্তারের নিকট খবর পৌঁছিয়া গিয়াছিল। আমাদের বাড়ির ঠিক দক্ষিণ দিকে ডাক্তার শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সুর বাস করিতেন। তিনি তখন কল্ হইতে ফিরিয়া সবেমাত্র আহার সমাপন করিয়া আঁচাইতেছিলেন। আমাকে সাপে কামড়াইয়াছে শুনিয়া মিনিট দুই তিনের মধ্যে তিনি তাঁহার অস্ত্র-শস্ত্র এবং ঔষধপত্র লইয়া উপস্থিত হইয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

শশীবাবুর মা আমার পায়ে দুইটি বাঁধন দিয়াছিলেন। একটি গোড়ালি হইতে ইঞ্চি ছয়েক উপরে, এবং অপরটি হাঁটুর নিম্নে পায়ের ডিমের উপর। বাঁধন দুইটি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া অম্বিকাবাবু বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন; এবং যতদূর মনে পড়ে, দুইটী বাঁধনের অতিরিক্ত তিনি আর একটি বাঁধন বাড়াইয়া দিলেন। তাহার পর কতক্ষণ কাটিয়া-কাড়িয়া চিরিয়া-পুড়াইয়া তখনকার দিনে সর্পাঘাতের যাহা কিছু চিকিৎসা ছিল সমস্তই প্রয়োগ করিলেন।

সংবাদ পাইয়া ঘণ্টাখানেক পরে কাছারি হইতে যখন পিতাঠাকুর মহাশয় উদ্বেগ-ব্যাকুল-চিত্তে বাড়ির ভেতর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন অম্বিকাবাবু আমাকে কাছে লইয়া অনেকটা নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া আছেন। দূর হইতে পিতাঠাকুরকে দেখিয়া হাত নাড়িয়া তিনি অভয়-বাণী জানাইলেন।

সারারাত্রি কাটিল জাগিয়া এবং জাগাইয়া রাখিয়া। তাহার মধ্যে কয়েকবার অম্বিকাবাবু আসিয়া আমার নাড়ী এবং অন্যান্য লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার পর হইতে আরম্ভ হইল যাহাকে বলে প্রসূত যন্ত্রণা, সে যে কি দুঃসহ ব্যাপার, একমাত্র ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কেহ তাহা ধারণা করিতে পারিবে না! যদি কেহ মনে করেন আমি বিষের যন্ত্রণার কথা বলিতেছি, তাহা হইলে ভুল মনে করিবেন। আমি বলিতেছি বাঁধনের যন্ত্রণার কথা। বিষের যন্ত্রণা যদি বলিতে হয় ত' তাহা দংশনান্তেই যাহা কিছু হইবার হইয়া গিয়াছিল; এবং সে যন্ত্রণা যে সর্পবিষের মর্যাদার উপযুক্ত তেমন কিছু অসহ্য ব্যাপার নহে, তদ্বিষয়ে আমি প্রামাণিক তথ্য সহযোগে বলিতে পারি।

যে কবি লিখিয়াছেন,

কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।

আমার বিশ্বাস, সে কবিকে কখনো আশীবিষে দংশন করে নাই। বৃশ্চিক বিষের অনিষ্টকারিতার মাত্রার সহিত সর্পবিষের অনিষ্টকারিতার মাত্রার যে অনুপাত, বৃশ্চিক বিষের যন্ত্রণার মাত্রার সহিত সর্পবিষের যন্ত্রণার মাত্রার সে অনুপাত নহে, এ কথা অন্তত আমার অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই বলে। আমার যাহা অভিজ্ঞতা, কাব্যের ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিতে হইলে বলিতে হয়,

কি ব্যথা বাঁধনে বুঝে কি সে-জনে
কভু বন্ধনে বাঁধেনি যারে।

পরাধীনতার বন্ধন সম্বন্ধেই শুধু নহে, সর্পাঘাতে রজ্জুর বন্ধন সম্বন্ধেও এ কথা একইভাবে খাটে।

৫

সেই রজ্জুর বন্ধন যেদিন করিয়া আমাকে মুক্তি দিতে পরদিন যখন অধিকাবাবু আর একজন ডাক্তার সহ উপস্থিত হইলেন, তখন বেলা প্রায় দশটা। পায়ের দুই দিকের মাংস ফুলিয়া প্রথম বন্ধনের রজ্জু এত বসিয়া গিয়াছিল যে, ছুরি দিয়া আড়াআড়িভাবে তাহা কাটা চলিল না, লম্বালম্বিভাবে ছুরি চালাইয়া কাটিতে হইল। উঠিবার সময়ে সে রজ্জু এতটা চামড়া এবং মাংস লইয়া উঠিল যে, কিছুকাল আগে পর্যন্ত সে দাগ সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়িত। এখনো সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির নিকট তাহা অস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

ইহার পর একমাত্র কথা, শেষ পর্যন্ত সে যাত্রার পার্টিতে বসিয়া রহিলাম,—যে কথা না বলিলেও বোধ করি সহজে পাঠকের অনুমান করিতে অসুবিধা হইত না।

আমার দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা সর্পদর্শনের অভিজ্ঞতা। সে অভিজ্ঞতা এমনই ভয়ের এবং সুন্দর, এমনই অপূর্ব এবং অদ্ভুত যে, তাহা নিষ্পত্তি হইলে সে অভিজ্ঞতার হাটে সর্পদংশনের অভিজ্ঞতা বোধ করি সাতবার বিকাইতে পারে।

তখন আমি ভাগলপুর গভর্মেন্ট স্কুল প্রবেশিকা শ্রেণীতে অধ্যয়ন করি। শ্রীপঞ্চমী; চৈত্র মাস; শুক্ল পক্ষের অষ্টমী কিংবা নবমী তিথি। বহুকাল ধরিয়া মহাসমারোহের সহিত বারোয়ারি রাজসূয়-দুর্গোৎসব চলিয়াছে। সমস্ত ভাগলপুর সহরের হিন্দুস্থানী-পুরুষ যেন ভাঙিয়া পড়িয়া সেই অষ্টপ্রহরব্যাপী আনন্দ-সলিলে নিমগ্ন।

তখনকার দিনে ভাগলপুরে বাঙালি জাতির প্রভাব এবং প্রতিপত্তি ছিল অটুট। আইন ব্যবসায়ের শীর্ষদেশ অধিকার করিয়া অবস্থান করিতেন বাঙালি উকিল-মোক্তার। আদালতে হাকিম, পুলিশে উচ্চকর্মচারী, ডাকঘরে পোস্টমাস্টার, রেলে ষ্টেশনমাস্টার, স্কুল-কলেজে অধ্যাপক এবং হেড মাস্টার, জমিদারীতে জমিদার, পথে-ঘাটে এঞ্জিনিয়ার, রোগীর পার্শ্বে ডাক্তার,—যেদিকেই দৃষ্টিপাত করা যাইত, কোথাও বাঙালীর প্রাধান্যের অভাব লক্ষিত হইত না। সুতরাং, এই সমৃদ্ধ সমাজে সমারোহের সহিত বারোয়ারি পূজার পথে অসুবিধার কোনো কণ্টক ছিল না। তদ্ভিন্ন, মুসলমান এবং শান্তশালী বিহারী জমিদারগণ এবং ভদ্রসমাজও এই সর্বজনোপভোগ্য উৎসবে শক্তিক হইয়া মোটা টাকার চাঁদা দিতেন। সর্বসমেত যে অর্থ সংগ্রহ হইত, দুই হাতে খরচ করিয়াও বারোয়ারী সমিতি তাহা শেষ করিয়া উঠিতে পারিত না।

কাজে-কাজেই বাঙলা দেশ হইতে নামজাদা যাত্রার দল, পাঞ্জার সুবিখ্যাত কীর্তন, চণ্ডীর গান প্রভৃতির আমদানী হইত। পুতুল খেলা, ম্যাজিক, স্থানীয় থিয়েটার প্রভৃতিও বাদ পড়িত না। পূজার মাস দুই পূর্বে কৃষ্ণনগর হইতে সুবিখ্যাত মূর্তিকর শশীভূষণ পাল সদলে আসিয়া প্রতিমা এবং সঙ গড়িতে আরম্ভ করিতেন। এই শশীভূষণ পালের একেকজন বংশধর বর্তমান কালে কলিকাতায় মূর্তি রচনায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। মনে আছে, এক বৎসর শশী পাল একটি ডাক-পিওনের সজীব জীবন-প্রমাণ মূর্তি গড়িয়া অনেকের অলক্ষিতে যাত্রাদর্শকদের মধ্যে দাঁড় করাইয়া দিয়াছিলেন। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া অভিনয়ের পর যাত্রা তখন শেষ হইয়া আসিয়াছে; পূর্ব উঠিয়াছে। সকালের দিকে এত ভিড় হইয়াছে যে, বসিবার স্থান ত' ছিলমাত্র নাই, প্রতিমার

দিক এবং মেয়েদের ঠিকের দিক বাদ দিয়া বাকি দুই দিকে তিন-চার সারি করিয়া লোক পালা শেষের গান শুনিতে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন সময়ে অদূরে উপবিষ্ট এক ভদ্রলোক হঠাৎ দেখিলেন, কাঁধে ব্যাগ ঝুলাইয়া ডাক পিওনও নিবিষ্ট চিত্তে যাত্রা শুনিতেছে। যেমন দেখা, অমনি অভ্যাস অনুযায়ী হাত বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করা, "এই পিওন, হামারা চিঠ্‌ঠি হ্যায়?" পর মুহূর্তেই তিনি অবশ্য তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু তৎপূর্বেই এমন একটা অট্টহাস্য রোলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, সেই হাসির ঝাপটে আর মিনিটটাক সময়ের জন্যে অভিনয় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

যেদিনকার কথা বলিতেছিলাম সেদিন বিখ্যাত ভূধরচন্দ্র দাসের যাত্রার অভিমন্যু বধ পালা হইবার কথা। আহুতির কিছু পর হইতে ঘণ্টা দুই কাল কীর্তন হইবে, তৎপরে যাত্রার আসর বসিবে। রাত্রি সাড়ে নয়টা দশটা হইতে না হইতেই আমাদের বাঙালীটোলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা স্ত্রী পুরুষ কাজকর্ম সারিয়া বারোয়ারী তলায় আসিয়া স্থান গাড়িয়া বসিয়াছে। আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু সুশীলকুমার মৈত্রের সহিত আমিও এককোণে স্থানাধিকার করিয়াছি।

বড় বড় চোখের এবং বড় বড় ভুরুর ধূপছায়া রঙে রঞ্জিত এই সুশীলকুমারকে আমার বড় ভাল লাগিত। সরস্বতী এবং দুষ্টসরস্বতী উভয়েই বোধকরি একই মাত্রায় তাহার উপর ভর করিয়াছিলেন। তাই রম্ভা গাছের মত সুঠাম বৃক্ষ প্রতিভার ফুল ফুটিত। কিন্তু ফল ফলিতনা। সুশীলের নিকট পড়া বুঝিয়া লইয়া সুশীলের বন্ধু পাশ করিত, কিন্তু সুশীল নিজে ফেল করিত। যৌবনকে স্পর্শ করিয়া সুশীলের জীবন আর অধিক অগ্রসর হইতে পারে নাই। জীবৎ প্রেত রোগে অকালে সে পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছিল।

সুশীল ছিল কালোয়াতি গানের অনুরাগী। কীর্তন-সঙ্গীত বোধকরি তাহাকে খুব দৃঢ় বন্ধনে বাঁধিতে সমর্থ হয় নাই। হঠাৎ এক সময়ে সে বলিয়া বসিল, "ওরে, লেমনেড্ খাওয়াবি?"

আবিষ্কিয়ার দিক দিয়া লেমনেড্ তখনো তাহার চমৎকারিত্ব হারায় নাই; তখনো লেমনেড্ বিলাসের বস্তু, সৌখিন পানীয়। বিলাতী দোকানদারেরা তখনো 'লিম্‌নেড্' বলিতে শিখে নাই, বলে 'মিঠা পানি'। বারোয়ারি-তলার পানের দোকানগুলির মধ্যে সেদিন যে দুই একটী দোকানে মিঠা পানির বোতল শোভা পাইতেছিল, সে দোকানগুলির কৌলীন্য অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না।

সুশীলের অনুরোধের উত্তরে বলিলাম, "সঙ্গে পয়সা ত' নেই সুশীল।"

সুশীল বলিল, "চলনা, বাড়ি থেকে নিয়ে আসবি।"

মাথার উপর বোধ করি অন্তত গ্রহ, অথবা শুভ গ্রহই আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল;—বলিলাম, "চল্।"

জনহীন পথ ভেদ করিয়া দুই বন্ধুতে গল্প করিতে করিতে গঙ্গা সমীপবর্তী আমাদের গৃহ-সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আমাদের ভাগলপুরের বাড়ী সেকেলে ধরণের বৃহৎ পরিবারের উপযোগী বড় বাড়ি। প্রথমে চাপরাশিদের মহল; তৎপরে একটুখানি সঙ্কীর্ণ গলিপথ অতিক্রম করিয়া শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত প্রথম পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত ছিনাথ বষ্টমীর লীলাক্ষেত্র চণ্ডীমণ্ডপের অঙ্গন; তৎপরে ভোগের ঘরের অঙ্গন; এবং সর্বশেষে অন্দর মহলের অঙ্গন। এই চারটি অঙ্গন পার হইয়া আমাকে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে হইবে।

দ্বারের পার্শ্বস্থ বাঁধানো মঞ্চের উপর বসিয়া পড়িয়া সুশীল বলিল, "কি রে, সঙ্গে যাব নাকি? ভয় করবে না-ত'?"

ভয় করিবার পক্ষে সমীচীন কারণ যে একেবারে ছিল না, সে কথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে কিন্তু নিজেকে ভীরু বলিয়া কবুল করিতেও প্রবৃত্তি হইল না; বলিলাম, "ভয় করবে কিসের? তুই বোস আমি আসছি।"

রাত্রি তখন এগারটার অধিক হইবে না, চাপরাশীরা জাগিয়া ছিল, কড়া নাড়িতেই দ্বার খুলিয়া দিল। ক্ষিপ্রপদে সব ক'টা উঠান পার হইয়া অন্দর মহলে উপনীত হইলাম। উঠানের খানিকটা অংশ সিমেন্ট দিয়া বাঁধানো; তাহার কোলে পাকা রোয়াক; সেই রোয়াকে উঠিয়া অতি ধীরে ধীরে দরজায় করাঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিলাম, "সরধারী, সরধারী! সরধারী, সরধারী!"

সরধারী পিতাঠাকুর মহাশয়ের পুরাতন প্রৌঢ় ভৃত্য। দালানের ভিতর তাহার নাসিকা স্পষ্ট শোনা যাইতেছে। আহারের ঢালের অনতিসিদ্ধ অন্ন এবং তদুপযুক্ত অড়হর ডাল উদরস্থ করিয়া নিদ্রা যাইতে পারিলে রাত্রিকালে পৃথিবীর আর কোনো বস্তুই সে কামনা করে না। তাহার নিকট পাড়ার কীর্তন অথবা ভূষণ দাসের যাত্রার বিশেষ কোনো মোহ নাই; মূল্য নিরূপণের দাগ-লিপিতে ঐ দুই পদার্থের নিম্নিখ রেখা ত' স্পর্শ রেখার সামান্য একটু ঊর্দ্ধে হইবে।

দালানের ভিতর দিয়া উপরে যাইবার সিঁড়ি। দ্বিতলের কক্ষে অসুস্থ পিতাঠাকুর মহাশয় সম্ভবত নিদ্রিতই আছেন। সুতরাং তাঁহারও ঘুম না ভাঙে অথচ সরধারীও জাগিয়া ওঠে,—অথচ, সাপও না মরে লাঠিও না ভাঙে, সেই অভিপ্রায়ে দৃঢ় করাঘাত করিতে করিতে নিম্নকণ্ঠে ডাকিতে লাগিলাম, "সরধারী, সরধারী! সরধারী, সরধারী!"

সরধারীর প্রথম ঘুমের নাসিকাধ্বনির সমাস্তরতায় কোনো প্রকার বৈলক্ষণ্য ঘটাইতে পারিবার সময় পাইলাম না। পিছন দিকের সিমেন্ট বাঁধানো উঠানে সহসা একটা প্রখর খস্‌খসানি শব্দে চমকিত হইয়া উঠিলাম। মাঝারি আকারের একটা শুকনা পাতার গাছের ডাল কঠিন মেঝের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া গেলে যে প্রকার খস্‌খস্ শব্দ হয়, ঠিক সেই রকম শব্দ। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া চাহিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে মুহূর্তের জন্যে পাথর বনিয়া গেলাম।

শাস্ত্রের নির্দেশ আছে, যেকথা সহসা বিশ্বাস করিবার মতো সাধারণ নহে। সে-কথা জন-সমীপে প্রকাশ না করাই ভাল। সেই নির্দেশ অনুযায়ী খস্‌খসানির শব্দের বিবরণটুকু চাপিয়া যাইলেই হয় ত' ভাল ছিল। কিন্তু 'কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী'। সুতরাং আমার মত অভিজ্ঞতা হয় ত' কাহারো কোনোদিন হইয়া থাকিবে; নয় ত' কোনোদিন কাহারও হইতে পারে। এই বিপুল পৃথিবী শুধু ভারতবর্ষ লইয়াই নহে,—সুতরাং ভারতবর্ষে কাহারো এ অভিজ্ঞতা না হইয়া থাকিলে আফ্রিকায় হইতে পারে, আমেরিকায় হইতে পারে।

চাহিয়া দেখি, রোয়াকের নিচে সিমেন্টের উপর উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎ যম আছাড়ি-পিছাড়ি খাইতেছে। দুঃসহ গ্রীষ্মের উত্তপ্ত আভ্রয় বিবর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া হাত পাঁচেক দীর্ঘ একটা কালান্তক গোখুরা সাপ সুশীতল সিমেন্টের উপর সমগ্র দেহকে উষ্ণ পার্শ্বে বিলুণ্ঠিত করিয়া শৈত্য গ্রহণ করিতেছে। তাহার দেহের বক্রগতি ভঙ্গে সাপ সম্মুখ দিকে অগ্রসর হয়, এতদিন তাহাই জানিতাম। প্রয়োজন হইলে তাহা যে আধার সমস্ত দেহকে একখানা লাঠির মত ঋজু করিয়া লইয়া দক্ষিণে-বামে এরূপ ভাবে আন্দোলিত হইতে পারে, আজ তাহা প্রথম দেখিলাম।

দালানের ভিতর অখণ্ডিত বড়িপাতের সহিত সহযোগী নাসিকাধ্বনি চালাইয়া যাইতেছে, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাহাকে জাগাইতে হইলে যে-পরিমাণ উচ্চ শব্দ করিবার প্রয়োজন হইবে, তাহাতে ভীত ক্রুদ্ধ হইয়া সর্পরাজ যদি তাড়া করিয়া আসিয়া আমার দেহে দুই-চারটা ছোবল বসাইয়া দেন, তাহা হইলে নিশ্চিত মৃত্যু হইতে আমাকে বাঁচাইতে এই নির্জন এবং নিদ্রিত পুরীতে কেহ নাই। জীবনে শশীবাবুর মা একবারই দেখা দেন, একাধিকবার তাঁহার দেখা পাওয়া সম্ভাব্যতার এলাকার বাহিরের বস্তু।

জনশ্রুতি আছে, বাস্তু সাপ বিনা অপরাধে অনিষ্ট করে না। এ সাপটিকে বাস্তু সাপ বলিয়া প্রত্যাশা করিলে খুব বেশি অসমীচীন হয় না। কিন্তু অপরাধ করিয়াছি কি-না, সে প্রশ্নের বিচার করিবে কে? অপর পক্ষ নিশ্চয়ই! তাঁহার সন্তাপ নিবারণের নিভৃত-নিশ্চিন্ত স্থলে মাত্র আমার উপস্থিতিই যদি অক্ষমনীয় অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে, প্রতিবাদই বা করে কে, আর রক্ষাই বা করে কে? তাহা ছাড়া, আমাদের এই বাড়িতেই আমার বড় জ্যেঠামহাশয়ের বিধবা কন্যা, শরৎচন্দ্রের আপন মাসী, সর্পাঘাতে মারা গিয়াছিলেন। বাস্তু সাপ তাঁহাকে ক্ষমা করে নাই। বড় মিসির মৃত্যুর এতদিন পরে তাহা হইলে আমার অদৃষ্টেই কি দ্বিতীয় বলি হওয়ার দুর্ভাগ্য লিখিত ছিল?

আপদকাল উপস্থিত হইলে শাস্ত্রের উপদেশ হইতেছে, যঃ পলায়তে স জীবতি। সুতরাং পলায়নের কথাটা সব সময়েই মনের মধ্যে প্রবল হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু যে পথে আসিয়াছি; একমাত্র সেই পথ ভিন্ন পলায়নের দ্বিতীয় পথ ছিল না। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। অর্থাৎ, পলাইতে হইলে একেবারে সাপের মুখের সম্মুখে অবতরণ করিতে হয়; এবং সে অবতরণের যে কি সাংঘাতিক এবং নিদারুণ অর্থ, সে কথা সহৃদয় পাঠক সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন।

সর্পের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছিলাম। একবার যেন মনে হইল, একটু মুখ উঁচু করিয়া সামান্য একটু ফণা দুলাইয়া সে আমার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। মনে হওয়া, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, দেহের সমস্ত রক্ত জল হইতে আরম্ভ করিয়াছে! সহায়-সম্বল-হীন হইয়া নিরস্ত্র অবস্থায় একটা ক্রুদ্ধ এবং সুবৃহৎ বিষদন্তধর সর্পের দ্বারা কোণঠাসা হইয়া আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা যে কত বড় বিপদের কথা, তাহা একমাত্র ভুক্তভোগী ভিন্ন অপর কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবে না। সাপুড়িয়ার নির্জীব বিষদন্ত-গোখুরা সাপের সহিত অথবা চিড়িয়াখানার খাঁচাবদ্ধ বেল-ষ্টিং কোব্রার সহিত সহসা চোখাচোখী হইলে প্রাণের ভিতরের একটা কোনো জায়গা শীতল হইয়া উঠে,—অথচ, এই উন্মুক্ত বন্য উগ্র বিষধরের তুলনায় সে সকল সাপ ত' জীবন্তের তুলনায় চিত্রের ন্যায় নিরীহ, আগুনের তুলনায় ধূপের ন্যায় নিঃসত্ত্ব।

অতি-বড় বিপদের অতর্কিত সূত্রপাতে বুদ্ধি এবং সাহস প্রথমটা ঘুলাইয়া যায়,—কিন্তু সে নিতান্তই সাময়িক ভাবে; পর মুহূর্তেই আত্মরক্ষার সহজ চেতনার প্রভাবে সেই বিপর্যস্ত বুদ্ধি এবং সাহস অবিচল ধৈর্যের সরল রেখায় ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়ায়। আমার ক্ষেত্রেও যখন ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, তখন স্থির করিলাম, সহজে কিছুতেই মরিব না; বেশ কিছুখানা লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া-ঝাঁকা-বাঁকা রেখায় বেশ খানিকটা ছুটাছুটি করিয়া আত্মরক্ষার ষোল আনা প্রচেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু সে চেষ্টা যদি একান্তই সফল না হয়, বিধাক্ত আক্রমণের সম্মুখীন হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর যদি নিতান্তই না থাকে, তাহা হইলে একা মরিব না; দুই হাতে আততায়ীর মুখের দুই চোয়াল টানিয়া কাড়িয়া চিরিয়া দিয়া দুইজনে জড়াজড়ি করিয়া এক সঙ্গে মরিব। কিন্তু সেরূপ হিংস্র মারাত্মক প্রতিশোধ গ্রহণ অপেক্ষা সংঘর্ষ এড়াইতে পারাই ভাল। সুতরাং শত্রুকে চোখে চোখে রাখিতে লাগিলাম।

শুক্ল পক্ষের নবমীর চন্দ্র পশ্চিম আকাশে অল্প একটু হেলিয়া পড়িয়াছে; তাহার অনতি-উজ্জ্বল কিরণপাতের আলো-আঁধারের রহস্যস্থলে একমুহূর্তে সাপটা যেন দৃষ্টির অন্তরালে মিলাইয়া যাইবার উপক্রম করে; আবার পরমুহূর্তেই, বিশেষ কোনো স্থান অবলম্বন করার ফলে, তাহার দেহের সাদাটে আঁশের সারি রূপালি-আভায় চকমক করিতে থাকে। এই স্পষ্টতা এবং অস্পষ্টতার মাঝা-পরিচ্ছন্ন ধারণ করিয়া বিপদের মূর্তি যেন সাম্প্রতিকতর রূপে আত্মপ্রকাশ করিবার সুবিধা পায়। খোলস ছাড়িবার প্রাথমিক উত্তেজনার আবেগে শিথিল আঁশের রাশি খড়খড় শব্দ করে,—মনে হয় কে যেন বাঁধানো মেঝের উপর দিয়া শুকনা পাতার ডাল টানিয়া চলিয়াছে। সেই অশ্রুতপূর্ব শব্দ এবং ভয়াবহ দৃশ্যের মিশ্রণে উৎসব অপরূপ পরিবেশের মাঝে অবস্থান করিয়া সেদিন যেন সময় আর কাটিতে চাহিতেছিলনা; মনে হইতেছিল সময়ের দুই পায়ে কেহ বুঝি বা পাথর বাঁধিয়া দিয়াছে। সেকেণ্ড মিনিটে, এবং মিনিট ঘণ্টায় পরিণত হইতেছিল।

আমাদের অন্দরমহলের পশ্চিমাংশে একটা বৃহৎ মিঠন মাটি-কোটা ছিল। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে আমরা যখন প্রথম ভাগলপুরে গিয়া বাস করি সেই প্রাথমিক যুগে বোধকরি ইহা নির্মিত হইয়াছিল। পরে যথেষ্ট সংখ্যায় পাকা ঘর নির্মিত হওয়ার ফলে কালক্রমে উহা ব্যবহারের বাইরে চলিয়া গিয়াছিল। মাটি-কোটার একতলার অংশ চাল-ডাল ময়দা-মাটা প্রভৃতির ভাঁড়ার ঘর রূপে ব্যবহৃত হইত; কিন্তু উপরের ঘর তালা দিবার পরের গুদাম রূপে পড়িয়াই থাকিত। সময়ে সময়ে আমাদের দাদারা উৎসাহের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া উপরের ঘরের একটা অংশ পরিষ্কার করিয়া লইয়া পড়িবার জায়গারূপে ব্যবহার করিতেন। দিনমান একরকম ভালই কাটিত। কিন্তু সন্ধ্যা হইবার পূর্বে, কারা এবং ছায়া, উভয়বিধ উৎপাতকারীদের সহিত অসহযোগ করিবার সৎপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া তাঁহারা প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি লইয়া নামিয়া আসিতেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন উক্ত মাটিকোটা অতীতের স্মৃতিচিহ্নরূপে অবহেলায় পরিণত হইয়া পড়িয়া ছিল। ছায়া-দেহীগণ স্থানান্তরে আশ্রয় লইয়া ছিলেন বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু কায়াধারীগণ অন্নগুলের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাহার প্রমাণ মাঝে মাঝে পাওয়া যাইত।

হঠাৎ একসময়ে দেখি, আমাদের দলের নায়ক শ্রীযুক্ত নাগ মহাশয় অগ্রগতি লাভ করিয়া বীর মন্থর চালে পশ্চিমমুখ হইয়াছেন। তিনি নিচে সিমেন্টের উপর দিয়া চলিয়াছেন; আর, তাঁহার প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখিয়া আমি চলিয়াছি ইকি দশেক উপরে উপরে। বোধকরি শীতল সিমেন্টের উপর যথেষ্ট পরিমাণে সন্তাপত্যাগ হইয়া গিয়াছিল, তাই এখন আশ্রয় বিষয়ে ফিরিয়া যাইতেছেন।

পাশে পাশে চলিতে চলিতে একেবারে রোয়াকের পশ্চিমপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলাম। মুহূর্ত পরে দেখি, নাগ মহাশয় আটকোটার ভাঙা সিঁড়ির উপর উঠিবার অভিপ্রায়ে মুখ উঁচু করিয়াছেন। যাহা দেখা আর-কিছুই বিবেচনা না করিয়া প্রায় তাঁহার দেহের উপর দিয়াই একটি দীর্ঘ এবং পরিচ্ছন্ন লাফ মারিয়া পড়িলাম উঠানের উপর; তাহার পর দুদ্দাড় করিয়া দৌড় দিলাম দরজার দিকে। আমার বিশ্বাস, আমার এই আকস্মিক আচরণের অতর্কিত তাড়নায় আমার চেয়ে অধিকতর সন্ত্রস্ত হইয়া নাগ মহাশয় অন্তরূপের দিকে গতি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই মহাশঙ্কট কালে কে কাহার খোঁজ রাখে! উঠি ত' পড়ি করিয়া ছুটিতে ছুটিতে পোটা তিনেক উঠান এক নিঃশ্বাসে অতিক্রম করিয়া পথে আসিয়া সুশীলের বিপরীত দিকের রকে বসিয়া পড়িলাম।

জ্যোৎস্না-স্নাত নিস্তব্ধ প্রসারণে সুশীল বোধ হয় মনে মনে খুসি হইয়াছিল মৃদুকণ্ঠে সে গান করিতেছিল। ওরূপ বিচলিত অবস্থায় আমাকে ফিরিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল, "ও কি রে! ভয় পেয়েছিস না-কি?"

মিনিট খানেক পরে দম লইয়া উত্তরে যে-কথা বলিয়াছিলাম, সুশীল রাখিয়া থাকিলে তাহার পুনরাবৃত্তি করা হয় ত' খুব বেশি অন্যায় হইত না।

সে যাহা হউক, আমার সেদিনকার ভয়ঙ্করের ও সুন্দরের একত্র জড়াজড়ির অভিজ্ঞতার তুলনা সত্যই বোধ হয় নাই! যেমন তাহা ভীষণ, তেমনি অপরূপ। যেদিন পড়িয়াছিলাম, The fascination of danger is at the bottom of all great passions. It is the mingling of terror with delight that intoxicates. সেদিন পুরীতে সমুদ্র দর্শনের কথা মনে পড়িবার পূর্বে মনে পড়িয়াছিল ভাগলপুরে সর্প দর্শনের কথা।

সাদা পৃথিবী

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

৬ আগষ্ট ১৯৪৬

কিং্ বেন্ ঘড়িতে ঘন্ট মন্থর শব্দে তিনবার ঘণ্টা বাজিল। রাত্রি তিনটা। সৈশ শওনের প্রলয়াচ্ছন্ন বাতাসে এই গম্ভীর নির্ঘোষ তরঙ্গ তুলিয়া বহুদূর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল।

স্যর জন্ হোয়াইট্ তাঁহার লাইব্রেরী কক্ষে একটি চামড়া-মোড়া চেয়ারে বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া ছিলেন। মাথার উপর একটিমাত্র বৈদ্যুতিক দীপ সাদা বিদ্যুৎরশ্মির স্নিগ্ধতা দিয়া স্যর জনের কেশহীন ভিষাকৃতি মস্তকের উপর আলোক প্রতিফলিত করিতেছিল। অশীতি বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ স্যর জন্ হোয়াইটের নাম জানেনা এমন লোক পৃথিবীতে কমই আছে। একাধারে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, কর্মী ও ভাবুক! পাশ্চাত্য জগতে তিনি একজন ঋষি বলিয়া পরিচিত। তাঁহার প্রাণের উদারতা ও জ্ঞানের গভীরতার সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা একবাক্যে তাঁহাকে আধুনিক যুগের সক্রেটিস্ বলিয়া স্বীকার করেন। এত বয়সেও তাঁহার দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক সজীবতা অক্ষুণ্ণ আছে।

বিগ্ বেনের শব্দ তরঙ্গ কানে আসিয়া আঘাত করিতেই স্যর জনের ধ্যানস্থির দেহ একটু নড়িয়া চড়িয়া উঠিল, তিনি দেয়ালের ঘড়ির দিকে চক্ষু তুলিলেন। রাত্রি তিনটা! পুরা ছয় ঘণ্টা তিনি এই ভাবে বসিয়া আছেন! কি ভাবিতেছিলেন? সহসা তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে সহস্র আণবিক বোমার সমস্ত আলোকের মত একটা গগন-বিদারী দীপ্তি জ্বলিয়া উঠিল। যে-প্রশ্ন গত ছয় ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতেছিল —যে-প্রশ্ন তাঁহার দীর্ঘ জীবনের অধিকাংশ সময় জুড়িয়া বসিয়া আছে—সেই প্রশ্নের পরিপূর্ণ উত্তর মন্ত্রদ্রষ্টা কবির মত তিনি চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইলেন।

'মানুষের শত্রু' করিয়া স্যর জন্ ঘড়ির দিকেই তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার বিস্তার গগনলেহী স্পর্ধা যেন তাঁহার মনকে ক্ষণকালের জন্য অভিভূত ও স্তম্ভিত করিয়া দিল। তারপর তিনি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ঘরে কেহ থাকিলে লক্ষ্য করিত তাঁহার দুই হাত ও হাঁটু থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

অস্থিরপদে স্যর জন্ কয়েকবার ঘরের কার্পেট-ঢাকা মেঝের উপর পায়চারি করিলেন, তারপর হঠাৎ ফিরিয়া ঘরের কোণের দিকে গেলেন। ঘরের কোণে একটি ছোট টেবিলের উপর টেলিফোন ছিল, স্যর জন্ কম্পিত হস্তে তাহা তুলিয়া লইলেন।

পার্লামেন্টে তখন গণসভার অধিবেশন চলিতেই ছিল। স্যর জন্ প্রায় পনেরো মিনিট অপেক্ষা করিবার পর টেলিফোনের অপর প্রান্তে গলার আওয়াজ শোনা গেল। বিস্মিত অধীর কণ্ঠস্বর বলিল,—'হ্যালো' স্যর জন্? এত রাত্রে কি হ'ল আপনার?'

স্যর জন্ ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন,—'কে, উনি? শোনো, তোমার সঙ্গে তখনি জরুরী কথা আছে—'

বিস্মিত কণ্ঠস্বর বলিল,—'কিন্তু এখন যে আমি ভারি ব্যস্ত, দশমিনিট পরে বক্তৃতা দিতে হবে। নতুন গভর্মেণ্ট ভারতবর্ষের কালা আদমি গুলোকে নাই দিয়ে মাথায় তুলেছে—তার বিরুদ্ধে বক্তৃতা—

স্বর জন্ বলিলেন,—'চুলোয় যাক তোমার বক্তৃতা—যেমন আছ তেমনি চলে এস। খবর আছে—বিরাট বিপুল খবর। এত বড় খবর পৃথিবীতে কেউ কখনও শোনেনি—'

ওদিকে কণ্ঠস্বর এবার আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল,—'কী খবর? কিসের খবর!'

একটু নীরব থাকিয়া স্বর জন্ বলিলেন,—'আমি মানুষের মুক্তিপথ খুঁজে পেয়েছি—শান্তি মানুষের মুক্তিপথ—'

তাঁহার গলা কাঁপিয়া গেল।

৫ জানুয়ারী ১৯৪৭

ইংলণ্ডে একটি সংবাদপত্রের ত্রিবার্ষিকীর সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। সংবাদপত্রটি মধ্যশ্রেণীর একটি চৌকী পত্রিকা। প্রবন্ধ লেখক একজন খ্যাতিমান সাংবাদিক; অতীতের কালে রাজনীতি সম্বন্ধে যেসব অনুমানমূলক অপিচ বিজ্ঞান সম্বন্ধে নিবন্ধ লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

তাঁহার বর্তমান রচনাটি সংক্ষেপে এইরূপ—

'মানুষের বিজ্ঞানবুদ্ধি তাহার বিবেকবুদ্ধিকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। ফলে সে আরাম বিলাস ও ভোগের বহু নূতন উপাদান পাইয়াছে, শত্রু ধ্বংস করিবার বহু ভয়ঙ্কর অস্ত্রলাভ করিয়াছে; তাহার জীবন উপভোগ করিবার লালসা শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু তদনুপাতে পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া ভ্রাতৃভাবে বাস করিবার কোনও উদ্যমই দেখা যায় না। খৃষ্টের অনুশাসন মানুষের জীবনে ব্যর্থ হইয়াছে।

'ইহা রূঢ় সত্য; ইহাকে এড়াইবার উপায় নাই। সুতরাং সত্যকে সহজভাবে স্বীকার করিয়া সতর্কতার সহিত তাহার সম্মুখীন হওয়াই সমীচীন। মানুষের পশুমূলক হৈরবৃত্তি দেড় লক্ষ বৎসরের কর্ষণের ফলেও যখন উন্মূলিত হয় নাই তখন আগামী দু'চার বছরে যে নির্মূল হইবে এমন সম্ভাবনা সুদূর পরাহত বলিয়াই মনে হয়। কোনও কোনও দিব্যদর্শী মননশীল ব্যক্তি মনে করেন মনুষ্যজাতি সমষ্টিগতভাবে অচিরাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

'মনুষ্য সম্প্রদায় কয়েকটি বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়া পৃথিবীপৃষ্ঠের ভিন্ন ভিন্ন ভূভাগ দখল করিয়া আছে। ইহাদের মধ্যে ক্রমাগত সংঘর্ষ চলিতেছে; যে জাতি ছোট সে বড় হইতে চায়, যে বড় সে আরও বড় হইতে চায়। ভূমির ক্ষুধা ইহাদের কিছুতেই মিটিতেছে না।'

'ইহার অর্থ কি? কোন্ নিগূঢ় প্রবৃত্তি জাতিকে জাতির বিরুদ্ধে, বর্ণকে বর্ণের বিরুদ্ধে এমন মারাত্মক ভাবে হিংস্র করিয়া তুলিয়াছে? সকলেই জানে এই বিস্তীর্ণা পৃথিবীতে সকলের জন্যই পর্যাপ্ত স্থান আছে—যৌথভাবে কাজ করিলে সকলের জন্যই প্রভূত খাদ্য উৎপন্ন করা যায়—তবু কেন এই মারামারি হানাহানি?'

'বর্তমান যুগের বুদ্ধিজীবী মানুষ বোধহয় বুঝিতে পারিয়াছে যে পৃথিবী বিস্তীর্ণা হইলেও সীমাহীন নয়; মানুষের জনসংখ্যা যে-হারে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীতে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিবার স্থানাভাব ঘটিবে। মানুষের নিশ্বাস পৃথিবীর সমস্ত বাতাস ভরিয়া লইবে।.....

'অন্যকে নিহত করিয়াও নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবার প্রবৃত্তি জীবের সহজাত। এমন কি, আত্মরক্ষার জন্য হত্যা করার অধিকার প্রত্যেক সভ্য জাতির আইনে স্বীকার করা হইয়াছে। ইহা মানুষের অবিসম্বাদী অধিকার।.....

'প্রত্যেক জাতি এই মৌলিক অধিকার রক্ষা করিবার জন্য অপর সকল জাতিকে বিদ্বেষ করিতেছে, তাহাদের বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। আণবিক বোমা আবিষ্কৃত হইয়াছে; আরও ভয়ঙ্কর অস্ত্র ক্রমে আবিষ্কৃত হইবে। হয় তো ইতিমধ্যে গোপনে গোপনে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং অস্ত্র হানাহানির ফলে সমগ্র মানবজাতি যে সমূলে বিনষ্ট হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। দিব্যদর্শী পণ্ডিতের ভবিষ্যদ্বাণীই ফলিবে।

'ইহার কি প্রতিকার নাই? পৃথিবী হইতে মানুষের বিলোপ কি অনিবার্য? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে হইবে। বুদ্ধ যীশু গান্ধীর পথে চলিবার আর সময় নাই। ভাবাতুতার বাষ্পোচ্ছ্বাসে এই সমস্যাকে ঘোলা করিয়া তোলাও নিরাপদ নয়; বিজ্ঞান যে-সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে বিজ্ঞানের বিবেচনা বুদ্ধি দিয়াই তাহাকে পরীক্ষা করিতে হইবে!

'ইহা কূট-বাক্য (paradox) বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর জনসংখ্যা কমানোই মানুষকে বাঁচাইয়া রাখিবার একমাত্র উপায়।.. ...জন্ম নিয়ন্ত্রণের দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারিত, কিন্তু কোনও জাতিই সজ্ঞানে নিজ জনসংখ্যা কমাইতে সম্মত হইবে না। পৃথিবী জুড়িয়া সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করিবার জন্য রেষারেষি চলিতেছে।..

'জনসংখ্যা কমাইবার দ্বিতীয় উপায়—কোনও কোনও বিশেষ জাতিকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সমূলে উচ্ছেদ করিয়া ফেলা। সমগ্রের কল্যাণে অংশকে বিনাশ করা নৈতিক অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয় না; মানুষের জীবন রক্ষার জন্য অনেক সময় অস্ত্রোপচার করিয়া তাহার হাত-পা কাটিয়া ফেলিতে হয়।.....

'এখন প্রশ্ন এই: কাহাকে রাখিয়া কাহাকে নিঃশেষ করিয়া ফেলা যাইতে পারে?

'আধুনিক বিজ্ঞান পাশ্চাত্ত্য শ্বেতজাতির সৃষ্টি; এই বিজ্ঞান মানুষকে যে-শক্তি দিয়াছে বর্তমানে একমাত্র শ্বেতজাতিই তাহার অধিকারী। অতএব জীবনযুদ্ধে বাঁচিয়া থাকিবার নিঃসংশয় দাবী যদি কাহারও থাকে তো সে শ্বেতজাতির। বহুজনা যীরভোগ্যা।

'পৃথিবী হইতে বর্ণযুক্ত জাতি—কৃষ্ণ পীত বাদামী মিশ্র—যদি বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া যায়, তবে পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ ভূমি শূন্য হইয়া যাইবে। অসুবিধা হয়তো কিছু ঘটিবে, কিন্তু সুবিধার তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর। প্রধান কথা, সমগ্র জাতি—অন্তত তাহার একটা অংশ—রক্ষা পাইবে। জৈব আইনের ধারা survival of the fittest—অব্যাহত থাকিবে। মানুষে মানুষে ভূমি লইয়া কাড়াকাড়ির আর প্রয়োজন থাকিবে না। বর্ণ-সমস্যা থাকিবে না। অন্তত দুই হাজার বৎসরের মধ্যে মানুষের আর নির্বাণ প্রাপ্তির ভয় থাকিবে না।

'এই দুই হাজার বৎসরে মানুষ কি নিজেকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিবে না ?'

—প্রবন্ধটি পাঠক মহলে কিছু আলোচনার সৃষ্টি করিল বটে কিন্তু অধিকাংশ পাঠকই উহা খেয়ালী কল্পনার উদ্ভট বিলাস মনে করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিল।

সন্ধ্যার সময় সংবাদপত্রের সম্পাদকের নিকট শিরোনামের কথা একটি চিঠি আসিল। চিঠি পড়িয়া সম্পাদক কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন; তাঁহার মুখ পাংশু হইয়া গেল। তারপর টেলিফোন করিয়া প্রবন্ধ লেখককে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

লেখক আসিলে সম্পাদকীয় কক্ষে দুই ঘণ্টা ধরিয়া দুইজনে নিভৃতে কথা হইল; কি কথা হইল কেহ জানিল না। তারপর লেখক টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেলেন।

গভীর রাত্রে রিভলবারের সাহায্যে লেখক আত্মহত্যা করিলেন।

২৫ জুন ১৯৪৮

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে তারযোগে রয়টারের অত্যন্ত সংবাদ আসিয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষ ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছে।

সকলেই জানেন, আমেরিকার নিগ্রোরা গত দুই বৎসরের অক্লান্ত আন্দোলনের ফলে নিজেদের জন্য একটি স্বতন্ত্র ষ্টেট বা রাষ্ট্র স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে; এই ষ্টেট আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উনপঞ্চাশ সংখ্যক রাষ্ট্র বলিয়া পরিচিত। আরিজোনা ও মেক্সিকোর সীমান্তে এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটি স্থাপিত হইয়াছে।

গত ছয় মাস ধরিয়া আমেরিকার সমস্ত নিগ্রো তাহাদের এই নূতন রাষ্ট্রে গিয়া সমবেত হইয়াছে; নিগ্রোজাতির আনন্দের সীমা নাই। গতকল্য তাহাদের নবগঠিত রাজধানীতে প্রথম রাষ্ট্র পরিষদের অধিবেশন ছিল। রাজধানীর জনসংখ্যা হইয়াছিল প্রায় দশলক্ষ।

অতঃপর রয়টারের যে সংক্ষিপ্ত সংবাদ আসিয়াছে তাহাই বিবৃত হইল—

সান্ ফ্রান্সিস্কো, জুন ২৪। নবনির্মিত নিগ্রো ষ্টেট মেক্সারিজ (Mexariz)এর রাজধানী হইতে একটি শোচনীয় দৈব দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। দ্বিপ্রহরে যে-সময় রাষ্ট্র-সভার বৈঠক বসিয়াছিল, সেই সময় রাজধানীর উপর দিয়া একটি Fortress শ্রেণীর এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতেছিল। এরোপ্লেনে কয়েকটি আণবিক বোমা ছিল; এই নবাবিষ্কৃত ভীষণ শক্তিশালী বোমাগুলি পরীক্ষার জন্য প্রশান্ত মহাসাগরের কোনও দ্বীপে

লইয়া যাওয়া হইতেছিল। এরোপ্লেনে মানুষ কেহ ছিল না; উহা রেডিও দ্বারা পরিচালিত হইতেছিল। দৈবাৎ এরোপ্লেনের পথ বিগড়াইয়া যায় এবং কোনও অজ্ঞাত কারণে আণবিক বোমাগুলি কাটিয়া পড়ে।

অনুমান হয়, এই বিষম বিস্ফোরণের ফলে রাজধানীতে কেহই জীবিত নাই। নানা জাতীয় প্রাণঘাতী রশ্মি-বিকিরণের জন্য ঐ স্থান এখন মানুষের পক্ষে সুগম নয়। দূর হইতে এরোপ্লেন ফোটো পরিদর্শনের ফলে জানা গিয়াছে যে নবরচিত, রাজধানী একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে।

• • • •

৩০ জুন ১৯৪৮

গত কয়েকদিন আমেরিকা হইতে আণবিক বোমা বিস্ফোরণ সম্বন্ধে আর কোনও নূতন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। মনে হয় আমেরিকার সংবাদের উপর কড়া censorship বসিয়াছে। রাশিয়ার টাস্ এজেন্সি কিন্তু নিম্নরূপ খবর দিয়াছে—

"আমেরিকায় সম্প্রতি যে দারুণ দুর্ঘটনা হইয়াছে তাহার ফলে আন্দাজ দশলক্ষ নিগ্রো মরিয়াছে। কিন্তু এ ব্যাপার সম্বন্ধে আরও একটি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা আরও চাঞ্চল্যকর। যে নূতন আবিষ্কৃত আণবিক বোমাগুলি কাটিয়া এই বিপত্তি ঘটে, জানা গিয়াছে সেই বোমার নাকি এক প্রকারের নূতন রশ্মি বিকিরণের উপাদান ছিল; বোমা বিস্ফোরণের বেড়শত মাইলের মধ্যে সকল মানুষকে এই রশ্মি প্রভাবিত করিবে। জীবদেহে এই রশ্মির ফল—যাহারা আক্রান্ত হইয়াছে তাহারা আর বংশবৃদ্ধি করিতে পারিবে না।

"মেক্সিকোর অধিকাংশ অধিবাসীও এই অভিনব রশ্মি দ্বারা প্রভাবিত হইবে।"

পূর্বোক্ত সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের গভর্মেণ্ট অস্বীকার করিয়াছেন।

১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮

দক্ষিণ আফ্রিকার শাদা কালো বিরোধ এতদিনে সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হইল; এজন্য প্রধানতঃ ইংলণ্ডের গণতান্ত্রিক মন্ত্রীমণ্ডলই প্রশংসার্হ। বৃটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌কে দীর্ঘায়ু করিবার ন্যায়সঙ্গত পন্থা এতদিনে অবলম্বিত হইল।

ইংলণ্ডের অক্লান্ত চেষ্টা ও উদ্যমের ফলে অষ্ট্রেলিয়া কানাডা প্রভৃতি কমন্‌ওয়েল্‌থের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্র সমূহের একটি বৈঠক হইয়া গিয়াছে। তাহাতে স্থির হইয়াছে: দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী সমস্ত শ্বেতাঙ্গ জাতির লোক

অষ্ট্রেলিয়ার গিয়া বসতি স্থাপন করিবে : দক্ষিণ আফ্রিকা অতঃপর স্বানীয় আফ্রি ও উপনিবেশী হিন্দুস্থানীগণ কর্তৃক শাসিত হইবে। আগামী দশ বৎসর ধরিয়া শ্বেতাঙ্গগণ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পাঁচ লক্ষ তোলা সোনা পাইবে।

এই সকল সর্তে আফ্রিকার আদিম অধিবাসিরা এবং ভারতীয় উপনিবেশীরা আনন্দের সহিত স্বীকার করিয়াছে।

সাউথ আফ্রিকা হইতে শ্বেতাঙ্গ দলের প্রস্থান আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গের জনসংখ্যা মুষ্টিমেয় ; আশা করা যায় মাস খানেকের মধ্যে আফ্রিকায় আর শ্বেতাঙ্গ থাকিবে না।

দেখা যাইতেছে, পাশ্চাত্ত্য দেশের রাজনৈতিক চিন্তাধারা এখন ভিন্নমুখী হইয়াছে ; এসিয়াখণ্ডে—অষ্ট্রেলিয়া ছাড়া—অন্য কোনও দেশে তাহারা উপনিবেশ বা অধিকার রাখিতে চাহে না। তাহাদের এই নূতন মনোবৃত্তি অতীব প্রশংসনীয়।

২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৮

গত কয়েকমাসে পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতে প্রাচ্যদেশে সংবাদ সরবরাহ অনেক কমিয়া গিয়াছে। বোধ হয় সকল পাশ্চাত্ত্য দেশেই সংবাদের উপর Censorship বসিয়াছে। বেড় বৎসর আগে বিপ্লবের নূতন রাষ্ট্রে বোমা বিস্ফোরণের পর যে বিপুল হৈ চৈ হইয়াছিল, তাহারই ফলে বোধ হয় পাশ্চাত্ত্য দেশের শাসক সম্প্রদায় সাবধান হইয়াছেন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সাউথ আফ্রিকা হইতেও সমস্ত খবর আসা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। একমাস হইতে বেতারও কেন্দ্রগুলি পর্যন্ত বন্ধ। সেখানে কী হইতেছে কেহ জানেনা।

তবু, অতর্কিতে দু একটি খবর বাহির হইয়া পড়ে। সম্প্রতি ভারতবর্ষে একটি উদ্বেগজনক সংবাদ পৌঁছিয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকায় নাকি এক প্রকার অদ্ভুত মারীভয় দেখা দিয়াছে। সহজ স্বাস্থ্যবান মানুষ রাস্তায় চলিতে চলিতে হঠাৎ পড়িয়া মরিয়া যাইতেছে! রোগের কোনও লক্ষণই এপর্যন্ত ধরিতে পারা যায় নাই। উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কোনক্রমে বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই মহামারীকে পানামা কানালের পরপারে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে।

মহামারী কিন্তু অন্যদিকে প্রসার লাভ করিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগর ডিঙাইয়া ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে দেখা দিয়াছে। আন্তর্জাতিক সমিতি সমূহের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে কোয়ারান্টাইন্ বসাইয়া এই মারীর প্রসার রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

১ জানুয়ারী ১৯৪৭

ইংলণ্ডেশ্বর ভারতবাসীকে তাহাদের স্বাধীনতা লাভের প্রথম বৎসর পূর্ণ হওয়ায় অভিনন্দন জানাইয়াছেন।

আর একটি সুখবর আছে। এতদিন, ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও অনেক ইংরেজ এদেশে বাস করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইতেছিলেন। আজ ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভা ভারত-প্রবাসী ইংরেজের উপর এক হুকুম জারি করিয়াছেন: আগামী একমাসের মধ্যে সমস্ত ইংরেজকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইতে হইবে, অন্যথায় বৃটিশ জাতির হইতে তাহারা খারিজ হইয়া যাইবে। ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের সম্প্রীতি রক্ষার উদ্দেশ্যেই এই আদেশ প্রচারিত হইয়াছে।

৩১ জানুয়ারী ১৯৪৯

করাচি বোম্বাই ও কলিকাতার বন্দর হইতে আজ য়ুরোপগামী শেষ জাহাজ ছাড়িল; ভারতবর্ষে যে-কয়জন ইংরেজ অবশিষ্ট ছিল তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া গেল। ফরাসী ও পোর্তুগীজরা ইতিপূর্বেই ভারত ত্যাগ করিয়াছে

এতদিনে ভারতবর্ষ কার্যত স্বপ্রতিষ্ঠ স্বয়ংপ্রভু হইল। ইংরেজ শেষের দিকে সত্যই আমাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিয়াছে।

৭ মার্চ ১৯৪৯

স্যর জন্ হোয়াইট তিরাশী বৎসর বয়সে নোবেল প্রাইজ লাভ করিয়াছেন।

স্যর জন্ সাংবাদিকমণ্ডলীকে বিবৃতি দিয়াছেন—জীবনের শেষ পঞ্চাশ বৎসর আমি মানব জাতির সেবায় অতিবাহিত করিয়াছি—এই পুরস্কারের টাকাও আমি সেই উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিলাম···আমার দিন ফুরাইয়া আসিতেছে তথাপি আমি আশা করি মৃত্যুর পূর্বে মানুষের পরম পরিত্রাণ দেখিয়া যাইতে পারিব।

১৫ মে ১৯৪৯

মহামারীকে আটকাইয়া রাখা গেলনা। চীন ও বর্মায় মহামৃত্যুর চড়া বাজিয়া উঠিয়াছে। পথে ঘাটে মানুষ মরিতেছে। বসিয়া বসিয়া মানুষ মরিয়া যাইতেছে। কেন্টনে একদিনে সাত হাজার লোক মরিয়াছে।

ভারতবর্ষের জাতীয় গভর্মেণ্ট চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে এই নামহীন মৃত্যু এদেশে প্রবেশ করিতে না পারে।

১৯১২

৭ জুন ১৯৪৯

আজ কলিকাতা সহরে একটি ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রাতঃকালে আন্দাজ দশটার সময় একটি ট্যাক্সি বেপরোয়া অ্যাক্সেল্য দিয়া যাইতেছিল; পথের মাঝখান দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ ট্যাক্সি পাশের দিকে ফুটপাথের উপর উঠিয়া একটি বালককে চাপা দিয়া দেয়ালে আঘাত করে। বালকের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়-কিন্তু ট্যাক্সির বেগ তাহাতেও শান্ত হইল না; বেপরোয়া হইয়া পিছন দিকে কিছুদূর ফিরিয়া আসিয়া ট্যাক্সি আবার বেয়াদব আক্রমণ করিল। এবার আর ট্যাক্সি ফিরিয়া আসিল না, ইঞ্জিন বন্ধ হইয়া যাওয়ায় সেইখানেই দাঁড়াইয়া পড়িল।

পথচারীরা এতক্ষণ সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল, এবার ক্রোধান্ধভাবে ছুটিয়া গিয়া ট্যাক্সি বালককে টানিয়া গাড়ী হইতে বাহির করিল। দেখা গেল, দেহ সম্পূর্ণ অক্ষত হইলেও তাহার দেহে প্রাণ নাই.....

৯ জুন ১৯৪৯

কলিকাতার লোক পালাইতে আরম্ভ করিয়াছে; মৃত্যুত্তরে উন্মত্ত হইয়া যে যেদিকে পারিতেছে। কিন্তু পালাইয়া যাইবে কোথায়? করাল মৃত্যুর বিষ দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে ··বোম্বাই মাদ্রাজ লাহোর-সর্বত্র এক অবস্থা·····হাহাকার করিয়া মানুষ চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে; কখন কাহার ললাটে মরণ-কাঠির স্পর্শ লাগিবে কেহ জানে না···

মাছির মত মানুষ মরিতেছে; সৎকার করিবার কেহ নাই। শীঘ্রই এই বিশাল ভারতভূমি শ্মশানের মত স্তব্ধ হইয়া যাইবে। কেবল যাহা নির্জীব যাহা ইট-কাঠ-পাথরে তৈরি তাহাই থাকিয়া যাইবে।

৩ আগষ্ট ১৯৫০

পৃথিবীর সবর্ণ জাতির আর একটি মানুষও বাঁচিয়া নাই। তাহাদের অস্থি-কঙ্কালে সমস্ত পৃথিবী সাদা হইয়া গিয়াছে।

লণ্ডনে একটি মহতী সভা আহ্বান করিয়া তাহার জন্ হোয়াইটকে সম্বর্ধনা করা হইয়াছে।

সভাস্থলে বিপুল আনন্দধ্বনির মধ্যে অধিকন্তু বৃদ্ধ তাহার জন্ উঠিয়া বলেন—বিজ্ঞান বিশ্বপ্রকৃতির দর্পণ। এই দর্পণে আমরা প্রকৃতির স্বরূপ দেখিতে পাই। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে দয়া মায়ার স্থান নাই; যে যোগ্য সেই বাঁচিয়া থাকে, যে অনধিকারী তাহার বাঁচিবার দাবী নাই। প্রকৃতির দরবারে আমাদের শ্বেত জাতীয় বাঁচিয়া থাকিবার দাবী মঞ্জুর হইয়াছে —'

এই পর্যন্ত বলিয়া হুয়ার জন্ থামিয়া গেলেন; তারপর সহসা ধরাশায়ী হইলেন। দেখা গেল তাঁহার দেহে প্রাণ নাই।

বিগ্ বেন্ ঘড়িতে মন্দ্র-মধুর শব্দে তিনটা বাজিল।

একটা বিড়াল পাতের কাছে বসে ভাত খেলে কোনো দোষ হয় না, অথচ একজন মানুষ সে-ঘরে প্রবেশ করলে তাকে ফেলে দিতে হয়…মানুষের প্রতি মানুষের এমন অশ্রদ্ধা এবং ঘৃণা যে ভাতিতেদে জন্মায়, সেটাকে ধর্ম বা বলে কি বলবো? মানুষকে যারা এমন অশ্রদ্ধা অবজ্ঞা করতে পারে তারা কখনই পৃথিবীতে বড় হতে পারে না…অন্যের অবজ্ঞা… তাদের সইতেই হবে।

রবীন্দ্রনাথ

একটি মেয়ের কথা

শ্রীমতী বাণী রায়

"কণ্টকে গঠিল বিধি, মৃণাল অবশে।
জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে।"

মৃণালিনী! মৃণালিনী! মৃণালিনী!

প্রভাতের প্রথম আলোর রেখা মৃণালিনীর মুদ্রিত চোখের পাতা স্পর্শ করলো। চোখ মেলে জেগে উঠে মনে হ'ল মৃণালিনীর জানালার পাশের কৃষ্ণচূড়া গাছের ডালে পাখী ডাকছে তাকেই নাম ধরে।

আকাশে বাতাসে সুখের ইঙ্গিত কোন কারুনের ধরণী যেন দূরের স্বপ্নকে আজকের মধ্যে এনে দিতে চায়। কটিনের চক্রান্তে মৃণালিনীর জীবন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল, কে তাকে জীবনের চরম প্রাপ্তির সন্ধান জানালো!

শয্যা ত্যাগ করে উঠলো মৃণালিনী। মনে তার উদিত হ'ল—বিগত রজনীর স্বপ্ন।—অনুর্ব্বর, রুক্ষ মরুভূমি একটি, কোন শ্যামলতার চিহ্ন নেই। সহসা সেই মরুভূমির আকাশে দেখা দিল একখণ্ড মেঘ, বালিপাতে শুষ্ক বালি সিক্ত হয়ে গেল। মরুভূমির বক্ষে জেগে উঠলো হরিৎ শস্য-সম্ভার।

এই শস্য-সম্ভার আজ তার জীবন, যে জীবন সামান্য কিছুদিন পূর্ব্বে মরুভূমির রুক্ষতায় ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল। প্রেম, তোমার শক্তি কি এতই অসামান্য?

শুধু প্রেম কেন? জীবন, জীবন। যে-জীবন পঙ্কতলে দলিত হয়েও মরে না, অসীম শক্তি যার। ধ্বংসস্তূপের নৈরাশ্য ভেদ করে যে জীবন সহস্র নূতন জীবন নিয়ে জেগে ওঠে, সেই জীবন মৃণালিনীকেও শক্তি দিয়েছে নূতন করে ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবার।

আজ তার একটি দুর্দ্দম মুহূর্ত্ত। সমস্ত জগতের বাধা, অপযশ তুচ্ছ করে আজ নিজেকে তার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পুরুষ প্রতিষ্ঠা নয়, আত্মার স্বকীয়তাকে প্রতিষ্ঠা। মৃণালিনী সে ক্ষমতা তোমার আছে কি?

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার এই প্রাচীন রাস্তার এই পুরাতন বাড়ীতে মৃণালিনী নামে একটি মেয়ে জন্মেছিল! সংস্কৃত কাব্যবিশারদ পিতা নাম রেখেছিলেন 'মৃণালিনী'। কলেজী হিন্দুঘরের উপযোগীভাবে বাল্যবিবাহ হয় তার পাশটি ধরে। সে-বিবাহ আজ অস্পষ্ট ছবি মাত্র মৃণালিনীর মনে। কেবল মনে আছে সে স্থির করতে চায়নি, সে তখন স্কুলে পড়তো। সে কেঁদেছিল—কিন্তু বিদ্রোহের সাহস ছিল না, বয়সও ছিল না।

স্বামীকেও মনে নেই তার। ভাল করে পরিচয় হ'বার আগেই মৃণালিনীর সমস্ত জীবন নিষ্ফলতায় জলাঞ্জলি দিয়ে স্বামী মারা গেলেন। স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুরকুল অলক্ষণা বধূর দায়িত্ব এড়িয়ে নিশ্চিন্ত হ'ল। এক শীতের প্রত্যূষে মৃণালিনী পিতৃগৃহে ফিরে এল।

কী ভীষণ সে দিন! কিশোরী মৃণালিনী আশা করেছিল, পিতৃস্নেহের হেমচ্ছায়ায় হয়তো তার জন্য সান্ত্বনা সঞ্চিত আছে। কিন্তু, তার শাদা থানপরা, নিরাভরণা বিধবার মূর্তি দেখে মাতা ঘরে ঢুকায় দিলেন। পিতা মনে মনে ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করতে লাগলেন। ভাইবোনেরা দূরে-দূরে স্তব্ধ হয়ে রইল। যেন মৃণালিনী মূর্তিমতী বিভীষিকা, কাছে গেলেই গ্রাস করে ফেলবে।

সেইদিন থেকে মৃণালিনী নিজের মধ্যে নিজেকে আবৃত করে পিতৃস্নেহের একটি সাধারণ আত্মবদ্ধিক হয়ে দিন কাটাতে লাগলো। সে আর মৃণালিনী রইলো না, যে-মৃণালিনী ক্লাশে প্রথম হ'ত, যার জীবনে অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল। সে হ'ল আচারপরায়ণ মাতাপিতার দুর্ভাগিনী, অলক্ষণা নামহীনা কন্যা মাত্র। বাংলার ঘরে-ঘরে তার মত মেয়ে শত-শত আছে, যারা মৃণালিনী নয়, মৃণাল নয়, কিছু নয়,—বিধবা।

পাশের ঘরে পিতার খড়মের শব্দে শোনা গেল—খটাখট, খটাখট। এই শব্দ চিরদিন মৃণালিনীর মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষে আঘাত করে ভোরবেলার মধুর স্বপ্ন থেকে জাগরিত করে তোলে। আজ তার মনে হ'ল, এই ধ্বনি তার বন্দী জীবনের লোহার শিকলের প্রতিটি গরাদ কেটে ফেলে দিচ্ছে। আবার সে মানুষের মত করে বাঁচবে।

পূজোর ঘরে সান্ধ্য-নৈবেদ্য করতে ঢুকলো মৃণালিনী হাত মুখ ধুয়ে। তার মাতা ধর্মকর্ম করতে ভালবাসেন, কিন্তু সেজন্য সামান্য পরিশ্রমটুকুও তিনি স্বীকার করতে চান না। ফুল তোলে দাসী, জোগাড় দেয় মেয়ে। আসনখানি পেতে ধূপকাঠি পর্যন্ত জ্বালিয়ে রেখে যেয় মৃণালিনী। তবুও কষ্টে টেনে নিয়ে মাতা আসনে বসে কোনমতে পরকালের ধর্মের খাতায় হাজিরা সই করেন! সংসারের অন্য দশটা কাজের চাপের মধ্যেও মায়ের ধর্মরক্ষার প্রতি চোখ রাখতে হয় মৃণালিনীর।

কি অমানুষিক চেষ্টায় এই আবহাওয়া থেকে প্রবেশিকা পাশ করে স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালয়ে মৃণালিনী শিক্ষয়িত্রীর কাজ জুটিয়ে নিয়েছে সে কথা ভাবতে এখনও হৃৎকম্প হয়। বাড়ীতে একটু একটু করে নিজে পড়াশোনা করে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পৌঁছেছিল সে। পরীক্ষা দেওয়াতে বাবা আপত্তি জানালেন,—"কি হবে কিম্বা মানুষের পরীক্ষা দিয়ে? কোন কাজে লাগবে ওর গুনি? এর চেয়ে যদি চায় কাশী যেয়ে থাক—"

সেদিন বড় ভাই মৃণালিনীর পক্ষ নিয়েছিল, "লেখাপড়া মানুষের সব সময়েই কাজে লাগে, বাবা। একটু বয়স হলেই কাশী যাবে কেন?" তুমুল বিতণ্ডার পরে বাবা বিরক্ত হয়ে চুপ করলেন।

পরীক্ষা দেবার অনুমতি পেল সে। কিন্তু সহরে মেয়ের মধ্যে পরীক্ষা দিতে বসে কি লজ্জা! হাসিখুশী, সুসজ্জিতা মেয়েদের দলে সে যে কতটা বেমানান, সেটা সে সেদিন উপলব্ধি করতে পারলো। তার পাকস্থল কাপড়, গহনাশূন্য শরীরের প্রতি সচকিত দৃষ্টিপাত করে সবাই সরে গেল।

এর মধ্যে আবার অঙ্কের পরীক্ষার দিন ভাগ্যক্রমে একাদশী পড়লো। তখন পর্য্যন্ত নির্জলা একাদশী করতো মৃণালিনী। সম্প্রতি কাজ করার অনুহাতে একবাটী মিছরি বা চিনির জল তার বরাদ্দ হয়েছে।

সেই অঙ্কের পরীক্ষার দিন তার জীবনের গতি যেন প্রথম মোড় ফিরলো। তাই সেদিন স্মরণীয়। টিফিনের সময় পরীক্ষার পরে আকণ্ঠ-পিপাসায় শুষ্কমুখে প্রশ্নপত্র আর কলম হাতে নিয়ে গেটের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল মৃণালিনী। অন্যদিন সে কোণঘরের আড়ালে আত্মগোপন করে বই খাতা নিয়ে বসে। আজ চারিপাশেই পরীক্ষার্থিনীদের জন্য সুশীতল পানীয়, শুধু তারি জন্য তীব্র-পিপাসা! কচি তালশাঁস এক ফেরিওলা বিক্রী করছে; ঘুরে শাড়ীপরা মেয়েটি ঘোলের সরবতের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। ডান পাশে একজন খেয়ে আইসক্রীম খাচ্ছে। সরে যেতে পারলো না মৃণালিনী, একদৃষ্টে চেয়ে রইলো। মনে হ'ল তার, চেয়ে থাকলেও পিপাসার লাঘব হবে বোধহয়।

কতকগুলি মেয়ে প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করছিল,—যাই বলিস্ ভাই, এটা কেউ কষতে পারেনি। কি ভাবে যে অঙ্কটা কষতে হবে!"

মৃণালিনী অঙ্কটা দেখতে গেল। ভাইপোদের মাষ্টারমশাই একদিন এই অঙ্কটা তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সে জানে এ অঙ্ক তার ঠিক হয়েছে। বলবে সে ওদের কি করে কষতে হয় অঙ্কটা? কাজ নেই, অস্পৃশ্য বিধবা সে। লোকের মধ্যে এগিয়ে কিছু বলা তার সাজে না।

কিন্তু এত মেয়ের মধ্যে একমাত্র সেই অঙ্কটা ঠিক করতে পেরেছে। কেন সে এগিয়ে যাবে না, নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবে না? সহসা সাহস করে মৃণালিনী এগিয়ে গেল,—"এটা এইভাবে করতে হবে—"

সকলে বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকালো, দ্বিধা-সন্দেহের দৃষ্টি। পরক্ষণেই মেয়েরা তাকে ঘিরে দাঁড়ালো,—"দেখি, দেখি!"

ধূলিধূসর রাজপথের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সেদিন জীবনে প্রথম উপলব্ধি করলো মৃণালিনী, সে একা নয়। যখনই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রসর হবে সে, তখনি তার চারপাশে দেখা যাবে অগণ্য বান্ধব।

আসন্ন-পরীক্ষার ঘণ্টা পড়লো। আর পাঁচমিনিট আছে। মেয়েরা তাকে অভিনন্দন করে ডাক দিয়ে হলে যেতে চলে গেল। কিন্তু এই আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে সে লিখবে কেমন করে? তার জন্য তো কেউ পিপাসার শান্তি বরফ-শীতল পানীয় আনেনি! কিন্তু জল তো আছে, কলের মাথা জল। ঈশ্বরের দান জল সকলের জন্যই—সে জল তারও জন্য আছে। সে জল থেকে সে আর নিজেকে বঞ্চিত করে রাখবে না।

আপাদমস্তক সর্বশরীরে একটা স্রোত বয়ে গেল মৃণালিনীর। সকল পদক্ষেপে সে উঠানের কলের নীচে অঞ্জলি পেতে জল গ্রহণ করলো, পান করলো। মানুষ হয়ে জন্মেছে সে, মানুষের অধিকার গ্রহণ করলো নিষ্ঠা সংস্কারের গণ্ডী ভেঙে। তাই সেদিন স্মরণীয়।

উনুনে আগুন জ্বলেছে। রাঁধুনী ওঠেনি। কেনই বা উঠবে? চা তৈরীর ভার বড়দিদি মৃণালিনীর ওপরে। সকাল থেকে কাজের চাপে মুখে যাওয়ার আগে পর্যন্ত নিশ্বাস নিতে পারে না সে। কিন্তু আজ কাজ তার কম। দশজন কাজের লোকের মধ্যে হেমচন্দ্র আছে। সেই সমাদরে আজ মৃণালিনী পৌঁছে যাবে।

প্রেমের নিরাপদ আশ্রয়ে আজ তার পথহারা তরী কূল পাবে। তার মূল্যহীন জীবন অমূল্য হয়ে উঠেছে হেমচন্দ্রের ভালবাসায়।

হেমচন্দ্র! তার হেমচন্দ্র! এতদিন শুধু মৃণালিনীর স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা ছিল—হ'ল তার প্রেমিক—আজ হবে স্বামী। হেমচন্দ্রের বাড়ীতে চলে যাবে আজ মৃণালিনী। আয়োজন প্রস্তুত আছে. আইনমতে তাদের বিয়ে হবে। একমাত্র পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে হেমচন্দ্রের মেহকুর্বলা মাতা অবশেষে মত দিতে বাধ্য হয়েছেন।

কি কষ্টে যে মাষ্টারী করবার অনুমতি পেয়েছিল মৃণালিনী! বড়বউদির দাদা হেমচন্দ্র, তাদের পাড়ায় একটা মেয়েদের স্কুল খুলেছিল উচ্চ আদর্শ নিয়ে। পড়াবার ভাল লোক পাওয়া যাচ্ছিল না: নিরুপায় হেমচন্দ্র বোনকে ধরলো,—"তোমার ননদ না ভালভাবে ম্যাট্রিক পাশ করে বসে আছেন? ওকে দাও না ঠিক করে।"

বোন শিউরে উঠলো,—"কি যে বলছ দাদা? শ্বশুরমশাই কখনও মত দেবেন না।"

"ওর নিজের কি মত?" হেমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলো।

"জানি না ঠিক। ওর মত থাকতে পারে। সারাদিন একা-একা কাটায়। একটা ছেলেপিলেও নেই। এই বয়েসেই নিজের মাকে খেয়েছে—"

"কেন, বেশ তো মাথা আছে ওর! আমার কাছে ডেকে আন, আমি বলছি।"

ভয়ে ভয়ে গোপনে সেদিন বড়বউদি ধরলো ননদকে বড় দাদার সামনে বার করেছিল বলে-কয়ে। এর আগে চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না। সেই প্রথম হ'ল, দুই বছর আগে। হেমচন্দ্রের দিকে কোনদিন আড়াল থেকে চেয়েও দেখেনি মৃণালিনী। পরপুরুষের দিকে চাওয়া বিধবার পাপ বলে ধারণা ছিল তার। সেদিন চেয়ে দেখলো উজ্জ্বল গ্রহতারার মত প্রদীপ্ত দুইটি চোখ, প্রতিভার ভাস্বর ললাট। সবল পুরুষ, যে প্রেম দিয়ে নারীকে আশ্রয় দিতে জানে।

সেদিনে হেমচন্দ্রের বলা-কথা আজও কানে বাজছে মৃণালিনীর—"আপনি যে মরে যাচ্ছেন কাজের জন্যে। আপনার কি নিজস্ব কোন ইচ্ছা নেই? অন্যে যা ভাল বলবে, নির্বিচারে সেইটে সারাজীবন মেনে যাবেন? কেন কুণ্ঠিত হয়ে থাকেন? আপনি তো কোন দোষ করেননি।"

আজ কানে বাজছে হেমচন্দ্রের অনেক কথা, প্রতিমুহূর্তে মনে তার সাহস আনছে,—"জগতে অনেক আছে, মৃণালিনী। নিজের জায়গা খুঁজে নিতে হয়।"

বড়বৌদির শিশুপুত্র কলরব করে ছড়া বলে উঠলো, "আতা গাছে তোতাপাখী, ডালিমগাছে বৌ—"

বড়দার ঘরের দিকে পা বাড়াতে যেয়ে মৃণালিনী ফিরে এল। আজ তিনদিন বাড়ীর কেউ তার সঙ্গে কথা বলে না। তিনদিন আগে সে বলে দিয়েছে হেমচন্দ্রকে সে বিয়ে করবে। আজ যে বিয়ে একথাও সবাই জেনেছে। তাই তাকে দেখেই যে যার শয়নমন্দিরে পুনঃপ্রবেশ করছে।

সুটকেসে অবশ্য-প্রয়োজনীয় কয়েকটী সামান্য জিনিষ তোলা আছে। সেটি হাতে নিয়ে, রাত্রের অন্ধকারে নয়, দিনের প্রখর আলোয় এখনই প্রকাশ্যে সে চলে যাবে হেমচন্দ্রের গৃহে, হেমচন্দ্রের মাতার

শুভ্রবস্ত্রে। কোন অন্যায় কাজ সে করছে না। যাকে মনে মনে স্বামী বলেছে, বাড়িতে, তাকে সেইভাবে গ্রহণ করায় যদি বাধা আসে সে বাধা মৃণালিনীকে বাঁধতে পারবে না।

তাদের বাগানের কৃষ্ণচূড়া গাছে নাম-না-জানা পাখী আবার ডেকে উঠলো। যেন মৃণালিনীকে ডাকছে সে। তারই সঙ্গে সারা-জগৎ তাকে ডাকছে, হেমচন্দ্রের প্রেম তাকে ডাকছে—

মৃণালিনী! মৃণালিনী! মৃণালিনী!

"আসিয়া বসিল হংস হৃদয়কমলে।
কাঁপিল কণ্টকদহ মৃণালিনী জলে।"

মৃণালিনী আজ পথে।

বিবাহ হয়েছে, লৌকিক অনুষ্ঠানের ত্রুটী হয়নি, শাশুড়ী গ্রহণ করেছেন। তবু জীবনের জটিলতার শেষ হ'ল না। অনাত্মীয় প্রতিবেশীর কৃপাবিভ্রিত কৌতূহলী কটাক্ষ, আত্মীয়বৃন্দের বিদ্রূপবিভ্রিত শোকপ্রকাশ কিছুরই অভাব নেই। গাড়ী ভাড়া করে জ্ঞাতিসম্পর্কে মাসীপিসীর দল মৃণালিনীর মায়ের দুর্ভাগ্যে শোকপ্রকাশ করতে আসেন। সে শোকপ্রকাশের ভাষা অথবা প্রণালী সঠিক না শুনতে হলেও অত্যাশ্চর্য্য ধৈর্য্যের বলে যত ওঁদের সামনে মৃণালিনীকে দর্শন দিতে হয়। দুই একজন হয়তো বলেন, "দেখতে শুনতে তো খুবই ভাল, কিন্তু—" সেই 'কিন্তুর' শুরুতেই মৃণালিনীর জীবনকে দুর্ব্বিসহ করে তোলে। কেউ বা ঈর্ষিত হয়ে পড়েন। হেমচন্দ্রের মাতৃভক্তি আদর্শ ছিল, আজ হেমচন্দ্রের মায়ের কপাল ভেঙেছে। দশজনের অপদার্থ ছেলেদের মধ্যে হেমচন্দ্র আদর্শস্বরূপ ছিল। আজ সেই হেমচন্দ্র নেমে এল দশের সঙ্গে অপদস্থের তালিকাভুক্ত হতে। স্বজনের এ-আনন্দ রাখবার জায়গা কোথায়? কিন্তু, কেন এই বিধবা শ্রীহীনা কুরূপা হ'ল না! তাহলেই তো ষোলকলা পূর্ণ হত। কেন এই বিধবার মুখে-চোখে উষার জ্যোতি, এর দৃষ্টি বুদ্ধিপ্রদীপ্ত! কেন এর দিকে তাকালেই আপনা থেকে মনে সম্ভ্রম উদয় হয়? নিজের চারিপাশে মহিমা ও গাম্ভীর্য্যের প্রাচীর দিয়ে যেন এ বিধবা সাধারণ পর্য্যায়ের বাইরে চলে গেছে। নির্ব্বাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন তাঁরা। সাধারণ গাম্ভীর্য্যে মৃণালিনী ধীরে ধীরে চলে আসে। তারপরে আরম্ভ হয় জনমতের বিষ-বিষোদ্গার বিস্তৃতি।

এতে দুঃখ ছিলনা মৃণালিনীর। কারণ, প্রথমে অনেক কিছুই সহ্য করতে হবে সে জানতো; সেজন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। কিন্তু জনমতের কেবলমাত্র বিষবিদ্বেষী সক্রিয় হয়ে ক্ষান্ত হয়নি, বিধাতাও তার কাজ করছে অলক্ষিতে। যে-শাশুড়ী উদার-আগ্রহে গৃহে স্থান দিয়েছিলেন, যে-জননী সন্তানের মুখ চেয়ে আত্মসম্পোষিত সংস্কার পদদলিত করতে দ্বিধা করেননি, সেই ব্যক্তির আচরণেও মধ্যে-মধ্যে অসহিষ্ণু ক্রোধ প্রকাশ পাচ্ছে। আশ্চর্য্য কি? অবিরাম বাক্যবাণ তাঁর উদ্দেশে বর্ষিত হচ্ছে, প্রতিমুহূর্ত্তে সন্তানের

অমঙ্গল আশঙ্কা তাঁকে অস্থির করে তুলেছে। সকলে তাঁকে বুঝিয়ে যাচ্ছে, মৃণালিনী অস্পৃশ্যা। বুদ্ধি দিয়ে তিনি বুঝেছেন, জগতের অন্য দশটা বস্তুর মত বিধবা-বিবাহ স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী। হেমচন্দ্রের পরিক্লিষ্ট প্রসন্ন মুখের দিকে চেয়ে বুঝেছেন, হেমচন্দ্রের সুখের চাবীকাঠি মৃণালিনীর হাতে। মৃণালিনীর লাবণ্যশ্রী প্রতিদিন যেমন সমাগমে কিশলয় দলের মত উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে। দেখে যা বুঝেছেন এ মেয়ের কোন অকলঙ্ক নেই। তবু, দুর্বল, স্নেহপ্রবণ চিত্ত বিরুদ্ধ কথার আঘাতে সাময়িকভাবে বিষাক্ত হয়ে ওঠে। আঘাত লাগে মৃণালিনী ও হেমচন্দ্রের প্রাত্যহিক দিন যাত্রায়।

মা বিরক্ত হয়ে ছেলের সঙ্গে কথা বন্ধ করেন, মৃণালিনীর জন্য বিবাহিতা কন্যার মুখ সন্দর্শনে বঞ্চিত হয়ে ভাগ্যকে দোষ দেন। মৃণালিনীর বৌদিকে পিতৃগৃহের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। মাতার অসন্তোষ হেমচন্দ্রের মনকে স্পর্শ করে, বিমনা বিষণ্ণ হয়ে যায় সে। সেদিন এই নব বিবাহিত দম্পতির জানালার বাইরে মিলন রজনী বিরলে নিঃশ্বাস ফেলে চলে যায়। মৃণালিনীর সুখ-স্বর্গে রাহুর মত একটা কালো ছাপ যেন ছায়া ফেলে। মায়ের সঙ্গে ছেলের বন্ধন এতই নিবিড় যে সামান্য আঘাতেই অশান্তির উদ্রেক ঘটে। স্বামীকে তো কেবলমাত্র প্রেমিক রূপেই প্রার্থনা করেনি মৃণালিনী, স্বামীর পরিবারের মধ্যেও আশ্রয় খুঁজেছিল।

রাস্তার পাশে একটি পার্ক, বৈশাখের অপরাহ্ণ নিজের রৌদ্রদাহে স্তিমিত হলে অজস্র কৃষ্ণচূড়ার রক্তা ঘনে অর্ঘপ্রদাহের রক্তরেখা এঁকে দিয়েছে। পার্কের বেঞ্চে মৃণালিনী একটুক্ষণ বসলো। ধীরে ধীরে আজকের ঘটনাবলী তার ক্লান্ত চোখের সামনে ভেসে উঠলো। গৃহত্যাগ সে করলো দ্বিতীয়বার। পিতৃগৃহ থেকে সে চলে এসেছিল হেমচন্দ্রের প্রেমের আহ্বানে নূতন করে ঘর বাঁধতে। আজ সেই ঘর ভেঙে আবার বেরিয়ে এল সে অনির্দ্দেশের সন্ধানে। সেই যাত্রায় সম্বল ছিল, প্রেম ছিল পাথেয়। তাই মনে তার সেদিন ব্যথা থাকলেও উত্তাপ ছিলনা। আজ কোন শান্তি নেই। নূতন করে জীবন রচনা করতে যেয়ে সে ব্যর্থ হ'ল। তার সঙ্গে ব্যর্থ হ'ল হেমচন্দ্রের সর্বত্যাগী প্রেম। হায় মৃণালিনী!

গতকাল হেমচন্দ্রের নিজের মাসীমা এসেছিলেন। মেয়েকন্যার সঙ্গে হেমচন্দ্রের বিবাহ দেওয়া তাঁর বহুদিনের বাসনা ছিল। সে ইচ্ছা পূর্ণ হ'লনা, শ্বশুরালয়ে যোগলো তাঁর মুখ দেখাবার পথ রাখলনা বিধবা বিয়ে করে। সুতরাং সুদীর্ঘ দুইঘণ্টা তিনি ভগ্নীর মনকে বিষাক্ত করে গেলেন। মাসীমা অনাচারের বাড়ীতে জলগ্রহণ করলেন না। চিররুগ্ন স্বামীকে এয়োতের জোরে এখনও ধরাধামে টিকিয়ে রেখেছেন তিনি। সুতরাং তেজ কিছু বেশী। মাসীমা যাবার পরে মা মাথা ধরেছে বলে ঘরে কবাট দিলেন, রাত্রের খাওয়া জলযোগের আয়োজন পড়ে রইলো।

তিনমাস বিবাহ হয়েছে মৃণালিনীর, কিন্তু শাশুড়ীর অপাঙ্গ স্নেহে সে হাত দেয়নি। প্রয়োজন হয়নি। সে কুণ্ঠায়, দ্বিধায় দূরে থেকে রান্নার জোগাড় করে দিত। আজ সকালে উঠে দেখলো শাশুড়ী তখনও ওঠেননি। আগুন দিয়ে উনুন ধরিয়ে দিয়েছে। মৃণালিনী তাড়াতাড়ি স্নান করে এসে শাশুড়ীর মাথা বোগনোতে খিচুড়ি চড়িয়ে দিল।

দরজা খুলে বাইরে এলেন শাশুড়ী, কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "এ সবে হাত দিতে কে তোমাকে বলেছে?" সারামুখ তাঁর বিদ্রূপে নিষ্ঠুরতা ও ক্রুরতাচিহ্নে মলিন।

অত্যন্ত ভীত ও কুণ্ঠিত ভাবে মৃণালিনী বললো, "কাল খাওয়া হয়নি, তাই তাড়াতাড়ি একটু খিচুড়ি—"

তীব্র ঘৃণার হিংস্রতায় শাশুড়ী ফেটে পড়লেন,—"কে তোমাকে আমার রান্না চড়াতে বলেছিল? তোমার ছোঁয়া খাব আমি? অনেক সহ্য করেছি, এতটা পারবোনা। চল বাড়ী থেকে তুমি যাও, নয় আমি। এত লাঞ্ছনা, এত কথা আমার শুনতে হবেনা।"

সঙ্গে সঙ্গে মৃণালিনীর সযত্ননির্ম্মিত আহার্য্য কলতলার আবর্জ্জনার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হ'ল। পিতল-কাঁসার থালা বাটি নিরামিষ রান্নার বাসনপত্র সেইসঙ্গে নিক্ষিপ্ত হ'তে লাগলো। সারা বাড়ী কেঁপে উঠতে লাগলো সেই শব্দে।

হেমচন্দ্র পড়বার ঘরে বসে একখানা বই পড়ছিল, সশব্দে ছুটে এল। একমুহূর্ত্ত সে স্থির হয়ে অগ্নিমূর্ত্তি মাতা এবং শঙ্কিতা পত্নীর দিকে তাকালো। পরমুহূর্ত্তেই অস্থির হয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মৃণালিনীর জগৎ চুরমার হয়ে ভেঙে পড়লো।

এই তার স্বামী! এই তাকে আশ্রয় দেবে! জগতের অত্যাচার থেকে সে তাকে বাঁচাবে, নিজের গৃহে সে কাপুরুষের মত পলাতক হল! সুতরাং এ গৃহে মৃণালিনীর স্থান কোথায়?

সেদিন কারুর খাওয়া হ'লনা। হেমচন্দ্র ফিরলো না। শাশুড়ী পাড়ী ডাকিয়ে অহেতুক গঙ্গাস্নান করতে গেলেন। বেলা একটায় শূন্য বাড়ী থেকে মৃণালিনী বার হয়ে গেল। পুরাতন ঠাকুর চাকর বাধা দিতে সাহস পেল না।

অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে পার হ'ল মৃণালিনী। কোথায় যাবে? পিতৃগৃহের দ্বার চিরদিনের মত রুদ্ধ। কোন মেয়েদের বোর্ডিং-এ একটি কাজ খুঁজে নিতে হ'বে। এখন বড় ক্লান্ত সে, একটু বিশ্রাম চাই। পার্কের বেঞ্চে যতক্ষণ বসা যায় বসে থাকবে সে।

হঠাৎ দূরের সাদা বাড়ীটার দিকে চেয়ে চমকিত হ'ল মৃণালিনী। এইখানে না জীবনে প্রথম সে নিজেকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য প্রথম পদক্ষেপ করেছিল! আবার আজ অজানিতে এই পথেই চলে এসেছে সে। সেই পুরনো স্কুল-বাড়ী, সেখানে তার প্রবেশিকা পরীক্ষার আসন পড়েছিল। এইখানে হিন্দু মেয়ের অনভ্যস্ত সংস্কার বিচূর্ণ করে একাদশীর দিন সে জল পান করেছিল। এইখানে পরিক্ষার্থী মেয়েদের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে সে নিজের কৃতিত্ব দেখাবার সাহস পেয়েছিল। সে সাহস আজ কোথায় গেল?

জীবনে পরাজিত হয়েছে মৃণালিনী। ঈশ্বর তাকে জগতে ব্যর্থ হ'বার জন্য পাঠিয়েছিলেন। সেই অযোঘ বিধাতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে নিজের জীবন নিজের হাতে গঠন করবার ব্রতে সে পরাস্ত হয়েছে। হায়, আজই কি না এই পরাজয় সে উপলব্ধি করলো তার জীবনের প্রথম অধিকার সাধনার জন্মক্ষেত্রে! কেন সে হেরে গেল? কি হ'ল? প্রেমের স্বপ্ন ভেঙে গেল তার তিনমাসের মধ্যে। ফাল্গুনের আকাশ-বাতাস মৃণালিনীকে সুখের ইঙ্গিত পাঠিয়েছিল, বৈশাখের রৌদ্রদাহে সব জ্বলে গেল। সব গেল। কেন?

চকিতে কানের কাছে অবচেতন মন যেন গুঞ্জরন করে উঠলো—"ফাগুন দিনের মধুর খেলায় কোনখানে কোন ভুল ছিল···ভুল চিল···সহসা বিদ্যুৎ চমকে মৃণালিনীর মনের প্রান্তে চরম সত্য জেগে উঠলো, ভুল হয়েছে তারই, হেমচন্দ্রের নয়। হেমচন্দ্রের প্রেম তাকে বাহিরে বিধবার বেশ খুলিয়েছে, কিন্তু অন্তরে সে এখনও সেই নিত্য, নিরাভরণ লাজ-সজ্জা আঁকড়ে ধরে আছে! কুণ্ঠা-ভরে মলিন সে। প্রেমের দৃঢ়তা কেবল শাসনের গণ্ডী পার করায় না, অহরহ বিপক্ষ আবহাওয়ার সঙ্গে সংগ্রামের শক্তি যোগায়। হেমচন্দ্র তাকে আশ্রয় দিয়েছে, নিজেকে প্রতিষ্ঠার ভার মৃণালিনীর ওপরে ছিল। দ্বিধা-সংশয়ে মলিন হয়ে গেছে সে হেমচন্দ্রের বন্ধু পরিজনদের সামনে। জোরের সঙ্গে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। তার সাহস ছিল কোথায়? হেমচন্দ্রের প্রেমকে সে-ই আশ্রয় দিতে পারেনি, কাপুরুষ সে নিজে।

মৃণালিনী! কেউ তাকে ডাকেনি তো। শুধু এই সুর মৃণালিনীর হৃদয়-তন্ত্রীতে বাঁধা, ক্ষণে ক্ষণে আপনি বেজে ওঠে। মৃণালিনী উঠে পড়লো। হেমচন্দ্র তাকে ডাকছে, গৃহ তাকে ডাকছে। ভয় কি?

অন্তস্থা শাশুড়ীর নির্বাক মূর্তির সামনে মৃণালিনী দাঁড়ালো নিজের তৈরি জলখাবারের রেকাব হাতে নিয়ে। সহজ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বললো, "মা, উঠুন খেয়ে নিন। আমি তৈরি করে এনেছি। আমার ছোঁয়া খেলে আপনার জাত যাবেনা। আমি আপনার পুত্রবধূ। আমার হাতে আপনার খেতেই হবে। না খেলে আমি ছাড়বনা, আমিও খাবনা কিছু। আপনি, আমি না খেলে আপনার ছেলেও খাবে না!"

মায়ের চোখ দিয়ে কয়েকবিন্দু অশ্রু ঝরে পড়লো। এতদিনে মা আবার নিজেতে ফিরে এলেন। হাত বাড়িয়ে মৃণালিনীকে তিনি বুকে টেনে নিলেন। এতদিন তিনি মৃণালিনীকে স্থান দিয়েছিলেন তাঁর মুখে, আজ স্থান দিলেন তাঁর অন্তরে।

দেড়বছর পরের কথা বলছি। সেই বাড়ী গৃহলক্ষ্মী মৃণালিনীর কল্যাণস্পর্শে নবরূপ ধারণ করেছে। শয়নকক্ষের দোলাতেও নবজাতক! পাশে মেঝের ওপর নিশ্চিন্তে ঘোনা শতরঞ্চে বসে মৃণালিনী স্কুলের কাগজপত্র দেখছে। হেমচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত তাদের যৌথস্কুল অনেক বড় হয়েছে। এখন মৃণালিনী তার সেক্রেটারী। হেমচন্দ্রের সময় আরও কম।

মায়ের ঘরে মা কর্দ্ধ করছেন নাতির আদর অন্নপ্রাশনের। মাসী আসেননি বটে, কিন্তু পিসী এসেছেন। আত্মীয়দের কতকাল দূরে সরিয়ে রাখা যায়? বিশেষতঃ 'মিনু' মেয়েটি ভাল, বিধবার কোন লক্ষণ নেই। অবশ্য বিধবার যে বিশেষ কি লক্ষণ থাকতে পারে সে বিষয়ে পিসীর ধারণা অস্পষ্ট।

জীবনের সার্থকতার প্রশ্নীথ মুখ মৃণালিনীর। আজ প্রথম বড়বৌদি তার পিতৃগৃহে আসবে, এতদিনে মত দিয়েছেন পিতা। হেমচন্দ্রের মা নিজে গিয়ে নাতির কল্যাণকামনায় বৈবাহিককে আনতে ও কন্যাকে পাঠাতে

অনুরোধ করেছিলেন। পিতা বলেছিলেন, "আপনার দোষ কি? আমার মেয়েকে আমি হিন্দু-বিধবার ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিতে পারিনি। দোষ আমার। আমি যেতে পারব না। আপনারা আপনাদের মেয়ে—আমার বউমাকে নিয়ে যেতে পারেন। মৃণালিনী ঘরের মেয়েকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছে।"

এখনি আসবে বড়বৌদি, হেমচন্দ্র আনতে গেছে। বড়বৌদির সঙ্গে, জানে মৃণালিনী, একতাড়া চিঠি আসবে সকলের কাছ থেকে। আরও দু' একদিন পরে বড়দা আসবে, তার সঙ্গে আসবে নবজাতকের জন্য উপহার আশীর্বাদী দ্রব্য। তারপরে ধীরে ধীরে,—মৃণালিনীর অধরে প্রসন্ন, মৃদু-হাস্য দেখা দিল, জানে মৃণালিনী, সবাই আসবেন, পিতা পর্য্যন্ত। কীর্তিযোগসূত্র বড়বৌদিকে তাঁরা আজ এ-বাড়ীতে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

জীবন অনেক দিয়েছে মৃণালিনীকে, সে-ও জীবনকে বঞ্চনা করেনি। অমর জীবনস্রোতের নিরবচ্ছিন্ন ধারাকে বহন করছে আজ তার সন্তান। হয়তো তারই সন্তান-সন্ততি ভবিষ্যতে নূতন পৃথিবী, মহত্তর পৃথিবী, গড়ে তুলবে।

উঠে দাঁড়াল মৃণালিনী। নীচে বড়বৌদি এসে গেছে। যে-প্রেম গৃহসংসারের বাহিরে জগতের বিশাল পরিধিতে, যাকে অভিসারিকা রাধার উদ্বোধনায় ডেকে এনেছিল, সেই প্রেম নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করে তাকে কল্যাণী জননীরূপে আবার গৃহেই ফিরিয়ে নিতে আহ্বান করছে আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে। হেমচন্দ্রের কণ্ঠে বেজে উঠছে প্রেমের সেই চিরপরিচিত আহ্বান—মৃণালিনী! মৃণালিনী! মৃণালিনী!

আপনি আমাকে আর সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই...যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না...যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি জগদ্ভক্তের দেবতা।

রবীন্দ্রনাথ

অপরাধী

শ্রীবিমলপতি চৌধুরী

গলিটা পার না হতেই হঠাৎ চড়বড়িয়ে বৃষ্টি এলো। ছাতা না নিয়ে পথে বেরিয়ে কি মুস্কিলেই পড়া গেছে!—তার ভিজতে হবে দেখছি!—হঠাৎ একটা চটাওঠা সাইনবোর্ড্ চোখের ওপর ভেসে উঠলো—'মনোরমা কেবিন।'

যাক্, মাথা-গোঁজবার জায়গা পাওয়া গেছে একটা। ছুটতে ছুটতে গিয়ে ঢুকে পড়লুম কেবিনটার মধ্যে।—স্যাঁৎসেতে একরত্তি ঘর। ভিজে মাথাটা কোঁচার খুঁট দিয়ে মুছতে মুছতে বসে পড়লুম একটা নড়বড়ে চেয়ারের ওপর।—হেঁকে বললুম—"এদিকে এক কাপ চা দেবেন ত!"

বেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে,—ম্যাড্‌মেড়ে মেঘলা বেলা। চায়ের দোকানে তখন পর্য্যন্ত আলো জ্বালা হয় নি।—আধ-আলো আধ-অন্ধকারে হঠাৎ একটা ভাঙা কণ্ঠস্বর কানে ভেসে এলো—"তোমাদের কথা আমি খুব মন দিয়েই শুনছিলুম এতক্ষণ।—'তুমি' বলে সম্বোধন করছি,—কিছু মনে কোরো না,—ছেলের বয়িসী তোমরা। তোমরা যে মড়ার কথা বলছিলে, তা খুবই অদ্ভুত সন্দেহ নেই, কিন্তু ব্যাপারটা তোমরা কেউই নিজের চোখে দেখনি,—পরের মুখে শুনেছ। না,—আমি তোমাদের অবিশ্বাস করছি না। আমি কেবল এই কথা বলতে চাই যে, ওর চেয়েও রহস্যময় এমন একটা মড়ার কাহিনী আমি তোমাদের শোনাতে পারি, যা কানে-শোনা নয়,—আমার নিজের চোখে দেখা।"

যে লোকটি এই কথাগুলি বললেন, তাঁকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না;—ঘরের এককোণে অন্ধকারের মধ্যে তিনি বসেছিলেন। লোকটির গলার স্বর কেমন যেন ধরা-ধরা, ভাঙা-ভাঙা।

যাদের সম্বোধন করে কথাগুলো বলা হয়েছিল, তারা আমার কাছ থেকে একটু তফাতে একটা কেরোসিন-কাঠের চারপয়সা চৌকো টেবিলের চারদিকে বসে চটলা করছিল। কলেজের ছাত্র বলেই মনে হয়।

তাদের ভিতর থেকে একটি ছোকরা বলে উঠলো—"বেশ তো, আপনার গল্পটা আরম্ভ করুন না।"

আর একটি ছোকরা বলে উঠলো—"এগিয়ে আসুন দাদা, নইলে গল্প ঠিক জমবে না।"

অন্যলোক সেইখান থেকেই উত্তর দিলেন—"দুশ্চিন্তা, কোণ ছেড়ে যেতে পারবো না। তোমরাই বরং চেয়ারগুলো টেনে নিয়ে এগিয়ে এসে বোসো।"

ছোকরার দল লোকটির কথা মত এগিয়ে গিয়ে বসলো—আমিও তাদের পদানুসরণ করলুম।

বাইরে তখন মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ঝাপটাটা আমাদের দিকেই; কাজেই দোকানদার রাস্তার দিকের দুটো দরজারই কবাট টেনিয়ে দিয়েছে। ঘরখানার অর্দ্ধেক একবারেই ঘুটঘুটে অন্ধকার।

এই সময় দোকানেরই একটি লোক সুইচ্‌টা টিপে দিলে। ঘরের কড়িকাঠে ঝোলানো ইলেক্‌ট্রিক্ বাল্‌বটা জ্বলে উঠলো। ২৫ ক্যাণ্ডেল পাওয়ারের সবুজ রংয়ের ছোট্ট একরত্তি বাল্ব; —মুখ পড়ে ঘোলাটে মেরে একটা অস্পষ্ট কিরে সবুজ-রংয়ের আলোয় ঘরটা কেমন যেন আপসা—আপসা দেখাচ্ছে!

সেই আপসা সবুজ আলোয় লোকটাকে প্রথম দেখলুম। মুখখানা শুকনো চিমসে; গালদুটো ভিতরের দিকে অনেকখানি ঢুকে গেছে; চোয়ালের হাড়গুলো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে বাইরের দিকে। টিম্‌টিমে সবুজ আলো মুখের হাড় বারকরা উঁচু অংশগুলোর ওপর এসে পড়েছে;—তোল খাওয়া নীচু অংশগুলোয় জমেছে কালো ছায়া। কালো আর সবুজের মেশামিশিতে ভদ্রলোকের মুখখানা কেমন যেন কিম্ভূতকিমাকার দেখাচ্ছিল।

লোকটির চোখে কালো-ফ্রেমের মোটা চশমা। কাঁচ দুটো অস্বাভাবিক পুরু,—যেন পকেট-ক্যামেরার দুটো লেন্স। তারি আড়ালে চোখ দুটো, মনে হচ্ছিল, যেন কোথায় তলিয়ে গেছে। গায়ে একটা মাঝারি আমলের ধূসরঙ্গে কালো আলপাকার চাপকান। পোষাক দেখে লোকটাকে আইনজীবী বলেই মনে হয়।

ভদ্রলোক চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে একটা মোটা উপন্যাস সিগারেট আগুন ধরিয়ে দুটো লম্বা টান দিয়ে সুরু করলেন—'সে আজ বহুকালের কথা! তখন বয়েস আমার তোমাদেরই মত, কি আর একটু কম হবে। স্কুল ছেড়ে সবে কলেজে ঢুকেছি।'

ছোকরাদের মধ্যে একজন বলে উঠলো—'আপনার বয়েস এখন কত হয়েছে?'

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে ভদ্রলোক বলে চললেন—'পূজোর ছুটিতে গেছলুম দেওঘরে হাওয়া খেতে;—একলা নয়, বাড়ীশুদ্ধ। ছেলে-পুলে, কাচ্ছা-বাচ্ছা নিয়ে প্রায় ২২।২৩ জন হবে।'

পূর্ব্বের সেই ছোকরাটি বলে উঠলো—'প্রকাণ্ড ফ্যামিলি ত আপনাদের!'

'হাঁ, প্রকাণ্ড ফ্যামিলি। আমরা আপন ভাই-ই ছিলুম সাত জন, তাছাড়া পুড়তুতো, জেঠতুতো ভাই-বোনও ছিল অনেকগুলি।'

আর একটি ছোকরা বলে উঠলো—'তখনই ২২।২৩ জন,—এখন তা হলে—'

কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ভদ্রলোক বলে উঠলেন—'যা ভাবছো তা নয়! সাত ভাইয়ের মধ্যে বেঁচে আছি কেবল আমি। ছ-ভাই মারা গেছে অবিবাহিত অবস্থায়; আমিও আজ পর্য্যন্ত বিয়ে করিনি।' এই পর্য্যন্ত বলেই ভদ্রলোক ঊর্দ্ধমুখ হয়ে সিগারটাতে ঘন ঘন টান দিতে লাগলেন।

ঘরখানা কয়েকালের জন্য নীরব হয়ে গেল। বাইরে কেবল গুড় গুড় করে মেঘ ডাকছিল, আর বৃষ্টির ঝুম্-ঝুম শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভদ্রলোক আবার আরম্ভ করলেন—'দেওঘরে বেলাবাগান বলে একটা কলোনির মত আছে। এই বেলাবাগানে আমরা একটা বাড়ী ভাড়া নিয়েছিলুম। যে সময়কার কথা বলছি, সে সময় ওঅঞ্চলে মাত্র চার-পাঁচখানা বাড়ী ছিল; বাকি সব খোলা মাঠ আর লাল-মন। এখন অবশ্য কি হয়েছে বলতে পারি না।

এই বেলাবাগানের ভেতর দিয়ে একটা পাকা রাস্তা বরাবর দারোয়া-নদীর দিকে চলে গেছে।—সেই

রাস্তাটা যেখানে গিয়ে নদীর সঙ্গে মিশেছে, প্রায় তারই কাছবরাবর একটা সাহেবী বাংলো বন্ধুদের বাড়ী ছিল। এখনও আছে কিনা জানি না।'

বাংলোটার গায়েই ছিল একটা ছোটখাটো গোড়ো শাল-বন; তারপরেই খানিকটা খোলা জমি; তারপরেই নদীর চর।

আমরা প্রতিদিন দলবেঁধে ঐদিকে বেড়াতে যেতুম। কোনদিন নদীর ধারে গিয়ে বসতুম, কোনদিন বা পায়ে হেঁটে নদী পার হয়ে চলে যেতুম ওপারে। নদীতে এক হাঁটুর বেশি জল কোথাও নেই, সুতরাং পার হোতে কিছুই অসুবিধে হোত না।

দলবেঁধে বেরোতুম সবাই;—মেয়েরা আর ছেলেছোকরার দল। বাবা-কাকারা সঙ্গে থাকতেন না; তাঁদের আলাদা দল ছিল।

প্রতিদিনের মত সেদিনও দলবেঁধে সব বেরিয়েছিলুম। হাঁটতে হাঁটতে বাংলোটার কাছ বরাবর এসে পড়েছি। আমরা ছোকরারদল চলেছি এগিয়ে, মেয়েরা একটু পেছিয়ে পড়েছে; মেয়েরা অর্থাৎ মা-কাকীমরদল। হঠাৎ ছোট-কাকীমা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলেন, সে এক ব্যাপার। একবার কোন কারণে হাসতে সুরু করলে, সে হাসি আর কিছুতেই থামতে চাইতো না। শুধু তাই নয়, যত সময় যেতে থাকে, কথা দূরের কথা, হাসির বেগ ততই বেড়ে চলে। বুঝলুম, পিছনে মেয়ে-মহলে একটা কিছু হাসির কথা হয়েছে এবং তাই শুনে ছোট-কাকীমার হাসির ফিট এসেছে।

আমরা তখন বাংলোটার ঠিক সুমুখে এসে পড়েছি। মেয়েরা রয়েছে হাত-চুড়িক পিছনে!—হঠাৎ একটা মোটা, গম্ভীর ভরার্ত কণ্ঠ কানে এলো—"কে অমন করে হাসে—কে ও!—কে ও!"

চেয়ে দেখি, খুরকি-ফেলা সোজা রাস্তাটা ধরে গেটের দিকে ছুটতে ছুটতে আসছেন একটি লম্বা-চওড়া প্রৌঢ় ভদ্রলোক। আদুড় গা; টকটক করছে রং; মুখখানা একেবারে রাঙা হয়ে উঠেছে; চোখে-মুখে একটা দারুণ উত্তেজনার ভাব। ভদ্রলোকের পিছু পিছু ছুটে আসছে একটা হিন্দুস্থানী দারোয়ান।

ভদ্রলোক গেট পর্য্যন্ত আসবার পূর্ব্বেই দারোয়ানটা পিছন থেকে তাঁকে সজোরে জাপটে ধরলে। বাধা পেয়েই ভদ্রলোক কেমন যেন এলিয়ে পড়লেন;—যেন কত দুর্ব্বল;—শরীরে যেন একটুও বল নেই। তারপর দারোয়ানটার কাঁধে মাথা রেখে ধীরে ধীরে ফিরে চললেন বাংলোর দিকে।

কিছুই বুঝতে না পেরে ফ্যাল্ ফ্যাল করে চেয়ে রইলুম সেইদিক পানে।

মেয়েরা যখন বাংলোটার সামনে এসে পৌঁছালো, তখন ভদ্রলোক আর দারোয়ানটা বাংলোর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে; কাজেই ওরা এসবের কিছুই জানতে পারলে না।

বাংলো ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে সব কথা খুলে বলে ছোট-কাকীমাকে খুব খানিকটা বকে দিলুম। লোকটা যে মাতাল কিম্বা পাগল, সে কথা না হয় স্বীকার করলুম, কিন্তু রাস্তায়-ঘাটে, যেখানে-সেখানে, যখন-তখন অমন বিটকেল ভাবে হাসাটাও তো ঠিক নয়!—ও কি অস্বাভাবিক হাসি? মাও খুব বকলেন,—মেয়েমানুষের ওরকম হাসি ভাল নয়,—লোকে শুনলে বলবে কি!

বাংলোর সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির চেহারা আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে। হ্যাঁ, মরদের মত চেহারা বটে! বয়সের দোষে শরীর একটু থলথলে হয়ে পড়েছে বটে, কিন্তু ষাঁড়খানি সত্যিই দেখবার মত। তার ওপর টক্‌টক করছে গায়ের রং। বুলখানা একটু রাশি-রাশি বটে, কিন্তু তাতে করে ভদ্রলোককে ভালই দেখাচ্ছিল। একটা আভিজাত্যপূর্ণ পৌরুষের ছাপ মুখে-চোখে ফেটে উঠেছিল।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই কলকাতা থেকে এলেন সেজমামা; বয়সে তিনি ছিলেন আমার চেয়ে চার-পাঁচ বছরের বড়। ভীষণ ফুটবল-প্রেমার ছিলেন তিনি। যেমন ডানপিটে, তেমনি আমুদে আর হুজুকে লোক। যেওদের এসেই বাড়ি একবারে সরগরম করে তুললেন। আজ ক্রিকেট-পাহাড়ে উঠতে হবে; কাল ডিগ্রিয়া-পাহাড়ে গিয়ে পিকনিক করতে হবে; পরশু চলো রেলের লাইন ধরে বহুদূর যাওয়া যাক; হঠাৎ হয়ত একদিন খেয়াল হলো—রাত-দুপুরে মাঠ-ভেঙে যেতে হবে নন্দন-পাহাড়ে; মোটকথা একটা না একটা হুজুক চাই।

কথায়-কথায় একদিন সেজমামার কাছে বাংলোর সেই ভদ্রলোকের কথা বলেছিলুম। সেজমামা একবারে লাফিয়ে উঠলেন—'ভারি ইন্টারেস্টিং লোক ত! আলাপ করতে হচ্ছে ভদ্রলোকের সঙ্গে।'

পরদিন দুপুরের দিকে ভাত খেতে-খেতে সেজমামা বললেন—"সকালে যেতে হবে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করতে।"

সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলুম—"কি বললেন ভদ্রলোক?"

"কি আর বলবেন?—চা খাওয়ালেন, তার সঙ্গে চানাচুর, টোষ্ট আর ডেভনের পেঁড়া; তোফা খাওয়া গেল।"

মা বললেন—"মিষ্টি সহজ কথা বললেন তোমার সঙ্গে?"

"হ্যাঁ, মিষ্টি সহজ কথা;—কোথায় বাড়ী,—কি করি এই সব কথা আর কি!—ফুটবল খেলি শুনে খুব খাতির। ভদ্রলোক এককালে খুব বড় শিকারী ছিলেন। কত শিকারের গল্প করলেন। খাসা লোক! ভদ্রলোককে সেদিনকার কথাটাও জিজ্ঞেস করেছিলুম। এমন ভাবে কথাটা পাড়লুম যেন আমিও সেদিন তোমাদের সঙ্গে ছিলুম।"

মা সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন—"তুই কি করে কথাটা পাড়লি?"

"কি করে আবার?—একেবারে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে বসলুম—আচ্ছা, সেদিন আমরা এইখান দিয়ে যাচ্ছিলুম, সেই সময় আমার এক আত্মীয়া হঠাৎ হেসে উঠেছিলেন মনে আছে বোধহয়……"

কথাটা আর শেষ করতে হোলো না, ভদ্রলোক হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে কেমন যেন টলতে টলতে বারান্দা থেকে একবারে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পরেই একটা হিন্দুস্থানী দারোয়ান এসে জানিয়ে দিলে, বাবু চানের ঘরে ঢুকেছেন, আজ আর তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না।

কাজেই গুটিগুটি বাড়ির দিকে ফিরলুম। মাতালের খেয়াল আর কি! তা হোক, লোকটিকে ঘোটের ওপর আমার বেশ ভালই লাগলো। মিষ্টি মাই-ডিয়ার লোক।"

সেদিন বিকেলে বেড়াতে যাওয়া হয় নি। সেজমামা কোথায় তাঁর এক আপীলী লোকের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়েছেন; ছোট-কাকীমার মাথা ধরেছে, বেরুবেন না। কাজেই কারুর বেড়াতে বেরুবার মেজাজ ছিল না। সন্ধ্যের দিকে মার সঙ্গে বৈদ্যনাথজীর মন্দিরে আরতি দেখতে বেরিয়েছিলুম। বাড়ি ফিরতে রাত প্রায় আটটা বেজে গেল।

বাড়ি ফিরে দেখি, সেজমামা আর ছোট-কাকীমা বৈঠকখানা ঘরে বসে আছেন। আমাদের দেখে বললেন—"ধারোয়ার দিকে বেড়াতে যাবি? দিব্যি জোছনা উঠেছে, এই তো ঠিক বেড়াবার সময়।"

বেরিয়ে পড়লুম সবাই। ফুটফুটে জোছনা। দূরের মাঠঘাটগুলো চাঁদের আলোয় একবারে ঝলমল্ করছে। পথের পাশের বড় বড় ইউক্যালিপটাস্ গাছগুলোর ডালে বসে কাকেরারা থেকে থেকে 'কা-কা' করে উঠছে।

চলেছি সব ধারোয়ার দিকে। ধারোটা পার হয়ে পাশের শাল-বনটার কাছবরাবর এসেছি, এমন সময় হঠাৎ কাকীমা বলে উঠলেন—"ওটা কি বলত?" তাঁর গলার স্বর ঠিক স্বাভাবিক নয়।

সেজমামাও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—"তাইতো, গাছের ডালে মানুষের মতন কি যেন একটা দুলছে মনে হচ্ছে!"

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখগুলো গিয়ে পড়লো শাল-বনটার দিকে। চাঁদের আলো জঙ্গলের সব জায়গায় প্রবেশ করতে পারেনি। যেখানে যেখানে প্রবেশ করেছে, সেই সব জায়গা বেশ ফটফট করছে; যেখানে যেখানে বাধা পেয়েছে, সেই সব জায়গায় পড়েছে কালো ছায়া। সেই আলো-ছায়ার মধ্যে দেখা গেল, একটা প্রকাণ্ড পুরানো শাল গাছের ডালে লম্বা হয়ে ঝুলছে একটি মানুষের মূর্তি।

ছোট-কাকীমা উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন—"মেয়ে মানুষ!"

সেজমামা কম্পিত কণ্ঠে বললেন—হাঁা, মেয়েমানুষই বটে, চওড়াপাড় শাড়ী দেখা যাচ্ছে।"

এই সময় অন্ধকারে নদীর দিক থেকে আসছিল একটি হিন্দুস্থানী বেপারী লোক, মাথায় কাঠের বোঝা। শালবনটার দিকে একবার চেয়েই লোকটা কাঠের বোঝা রাস্তার ওপর ফেলে দিয়ে হাউ-মাউ করে ছুটলো উল্টো দিকে। —বাস, আর যায় কোথা! সঙ্গে সঙ্গেই কাকীমার হাসির ফিট সুরু হোলো। বিটকেল রকমের হাসি।

কেমন যেন ভাবাচাকা খেয়ে গেলুম। গাছের ডালে ঝোলানো স্ত্রীলোকটি, হিন্দুস্থানীটার ভয়ার্ত চীৎকার, ছোট-কাকীমার অদ্ভুত হাসি, সবই যেন মনে হচ্ছিল, এক সুরে বাঁধা,—একই বীভৎস সুর।

পরক্ষণেই অন্ধকারে কে চেঁচিয়ে উঠলো—"কে হাসে অমন করে? কে? কে?"

সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের মধ্যে মানুষের পায়ের শব্দ শোনা গেল। তখনও ছোট-কাকীমার হাসি সমানে চলেছে।

সেজমামা পর্য্যন্ত কেমন যেন হকচকিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—"কিছু না, কিছু না, আমরা একটু—"

কথাটা আর শেষ করতে হোলো না, হঠাৎ বাংলোর সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি কোথা থেকে পাগলের মত চীৎকার করতে করতে এসে সেজমামার হাতখানা শক্ত করে ধরলেন। তারপর শালবনটার দিকে একবার মাত্র

চেয়েই বিকট শব্দে চেঁচিয়ে উঠলেন—"কে ওখানে?—কে ওখানে?—শীগ্‌গির বল কে ওখানে ঘুরছে—
—কে ও?" বলতে বলতেই ভদ্রলোক সেজমামার গায়ের ওপর এলিয়ে পড়লেন। ভদ্রলোকের পিছন পিছন ছুটে এসেছিল সেদিনকার সেই হিন্দুস্থানী দরোয়ানটা। —ঝপ করে সে ভদ্রলোককে জড়িয়ে ধরলে;—তারপর আস্তে আস্তে তাঁকে নিয়ে চললো বাংলোর দিকে।

কারুর মুখে কথাটি নেই। কাকীমা পর্য্যন্ত চুপচাপ। আমার মনের অবস্থা তখন যে কি রকম হয়েছিল, তা প্রকাশ করবার মত ভাষা আমার জানা নেই।

এই অস্বাস্তিকর নীরবতা প্রথম ভঙ্গ করলেন কাকীমা।—বললেন, "ওদের আর বেশি ভয় দেখানো ঠিক নয়;—সব কথা বলে দিই।

তারপর কাকীমা যা বললেন, তার সারমর্ম্ম এই যে, সেজমামা আর তিনি চুপি চুপি পরামর্শ করে সন্ধ্যের দিকে একটা পাশ-বালিসকে শাড়ী পরিয়ে মশারীটার ভাঁজে চুপি চুপি ঝুলিয়ে দিয়ে গেছেন।—মতলব আমাদের ভয় দেখানো। কিন্তু ব্যাপারটা যে এতদূর পর্য্যন্ত গড়াবে, তা তখন ভাবতে পারেন নি।

কথাটা শেষ করেই কাকীমা বললেন—"এখন পাশ-বালিসটাকে বাড়ী নিয়ে যাবার কি হবে?"

সেজমামা বললেন—"বেপেচেন আপনি!—কে কোথায় দেখে ফেলবে, তখন ফ্যাসাদে পড়তে হবে। ও যেমন ঝুলছে, তেমনি ঝুলতে থাকুক। আমরা যে ওকাজ করেছি; সে কথা জানাজানি হওয়া ঠিক নয়;—কি থেকে কি ফ্যাসাদ হয় কে বলতে পারে! এখন আমাদের এমন ভাব দেখাতে হবে, যেন কিছুই জানি না;—পথে চলতে চলতে হঠাৎ ঐ দিকে নজর পড়ে যাওয়ায় ভয়ে জাঁৎকে উঠেছিলুম। আর এক মিনিট দেরি করা ঠিক নয়,—চলুন এখান থেকে সরে পড়ি।"—সেজমামার কণ্ঠস্বর রীতিমত উত্তেজিত।

বাড়ী ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে চুপচাপ যে যার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছিলুম। কারুর মুখে কথাটি নেই।

রাত তখন চারটে হবে; হঠাৎ সোরার ঘরের দরজার টক্‌টক্ করে কিসের শব্দ হোলো। ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লুম। দরজা খুলে দেখি, আমাদের ছোঁড়া-চাকরটা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বুকটা কেমন যেন ছ্যাঁৎ করে উঠলো।—বললুম—"কি খবর রে বনমালী?"

বনমালী যা বললে, তার সারমর্ম্ম এই যে, একটা হিন্দুস্থানী দারোয়ান এসে ডাকাডাকি করছে;—বলছে, বাবুদের শীগ্‌গির তুলে দাও, বিশেষ দরকার।

বাইরের ঘরে শুতুম কেবল আমি আর সেজমামা।—তাড়াতাড়ি সেজমামাকে ডেকে তুললুম। আমার কথা শুনে সেজমামা বেরিয়ে পড়লেন। আমিও পিছন পিছন চললুম।

ফটকের বাইরে গিয়ে দেখি, বাংলোর সেই হিন্দুস্থানী দরোয়ানটা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে, হাতে তার একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন। তখনও সে হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতেই সে যা বললে, তার বাংলা তর্জ্জমা

করলে দাঁড়ায় এই যে, প্রতিদিনের মতই সে তার বাবুর ঘরে মেঝের ওপর মাদুর বিছিয়ে ঘুমোচ্ছিল, আর তার বাবু ঘুমোচ্ছিলেন খাটের ওপর। হঠাৎ মাঝ-রাত্তিরে তার ঘুম ভেঙে যায়;—চেয়ে দেখে, ঘরের দরজা খোলা, বাবুর বিছানা শূন্য। বাবুটি তার বাড়িতে কোনদিন একলা ঘরের বাইরে যেতেন না,—অত্যন্ত ভীতু লোক তিনি। কোন কারণে বাইরে যাবার দরকার হলে তাকে সঙ্গে নিতেন।

কাজেই সে রীতিমত চিন্তিত হয়ে উঠলো। বাইরে বেরিয়ে চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করতে লাগলো; কিন্তু বাংলোর মধ্যে কোথাও বাবুকে পাওয়া গেল না। বাবুর ঘরে সারারাত একটা লণ্ঠন জ্বলতো। লণ্ঠনটা নিয়ে সে বাগানে বেরিয়ে পড়লে। চলতে চলতে গেটের কাছে গিয়ে দেখে, ফটক খোলা। কেন কে জানে তার মনে সন্দেহ জাগে, হয়ত তার বাবু শাল-বনটার দিকেই গেছেন। কিন্তু সন্ধ্যার সময়কার সেই গাছে-কোলানো স্ত্রীলোকটির কথা মনে করে ওদিকে এগুতে তার সাহস হোলো না। কি করবে ঠিক করতে না পেরে অবশেষে সে আমাদের শরণাপন্ন হয়েছে।

সেজমামা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে কি ভাবলেন; তারপর হঠাৎ এক সময় বলে উঠলেন—"চল যাচ্ছি।" আমাকে বললেন, "তুই যাবি নাকি মন্টু?"

যাবার ইচ্ছে একটুও ছিল না,—তবু রাজি হলুম। সেজমামা একলা যাবেন, সেটা কেমন যেন ভাল লাগছিল না। বনমালীকে ভেতর থেকে ফটক বন্ধ করে দিতে বলে দুজনে দুটো টর্চ নিয়ে দারোয়ানজীর পিছন পিছন চললুম।

আকাশে মেঘ করেছে। সন্ধ্যের সময়কার সে ফটফটে জ্যোচ্ছনা আর নেই। মেঘের আড়াল থেকে চাঁদের আলো কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে পথের ওপর পড়েছে। তিনটি প্রাণী নিঃশব্দে পথ-বেয়ে চলেছি।

শাল-বনটার কাছে গিয়ে যখন পৌঁছলুম, তখন মেঘের আড়ালে চাঁদ ঢাকা গেছে। একটা কালো ছায়া পড়েছে শাল-বনটার ওপর। সেজমামা বাঁকা করে টর্চের আলো ফেললেন সেই দিকে। সেই আলোয় যা দেখলুম, তা জীবনে কোনদিন ভুলতে পারবো না।—দেখলুম, শাড়ী-জড়ানো পাশ-বালিশটা ঝুলছে যে গাছে, সেই গাছেরই আর একটা ডালে লম্বা হয়ে ঝুলছে একটি দীর্ঘাকায় পুরুষের দেহ। সে দেহ যে কার, তা বুঝতে আমাদের একটুও বিলম্ব হোলো না।

এই পর্য্যন্ত বলেই ভদ্রলোক চুপ করলেন।

একটি ছোকরা জিজ্ঞাসা করে উঠলো—"ভদ্রলোক অমনভাবে আত্মহত্যা করতে গেলেন কেন?"

আর একটি ছোকরা বলে উঠলো—"মাতালের খেয়াল আর কি!"

সিগারে একটা লম্বা টান দিয়ে ভদ্রলোক বললেন—"মাতালের খেয়াল?—না, না, মাতালের খেয়াল নয়।—এর পেছনে এক গভীর রহস্য লুকানো ছিল। সে কথা পরে জানতে পারি ভদ্রলোকের এক আত্মীয়ের কাছে। আত্মীয়টি তাঁর ভায়ে। দেওঘরের পুলিশ সন্ধান করে তাঁর ঠিকানা বার করে, এক দুর্ঘটনার কথা তাঁকে চিঠি লিখে জানায়।

ভদ্রলোকের এই ভাগ্নেটির কাছে তাঁর মৃত মামাটির পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধে যা জেনেছিলুম, সেই কথাই

এইবার তোমাদের বলবো। তা শুনলে তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে, এই আত্মহত্যার পিছনে কতবড় একটা রহস্য লুকোনো ছিল।

মৃত ভদ্রলোকের নাম ছিল মহিমারঞ্জন ঘোষাল। বেশ বড় জমিদার ছিলেন তিনি। বিবাহ করেন নি। শিকার আর নানারকম খেয়াল নিয়েই থাকতেন। দেশ ভ্রমণের বাতিকও ছিল যথেষ্ট। জমিদারি দেখাশুনো করতো বাপের আমলের বুড়ো নায়েব।

একবার কাশী না কোথা থেকে ফিরলেন এক বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যাকে নিয়ে। স্ত্রীলোকটির বয়েস প্রায় তিরিশের কাছাকাছি। এরকম সুন্দরী স্ত্রীলোক না কি সচরাচর মানুষের নজরে পড়ে না। সেই বিধবা স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে মহিমারঞ্জনবাবু বরানগরের কাছে গঙ্গাতীরে এক বাগান-বাড়ী ভাড়া করে বাস করতে লাগলেন।

এসব ব্যাপার ঘটেছিল মহিমারঞ্জনবাবুর আত্মহত্যার প্রায় ১৫ বছর আগে। তখন তাঁর বয়স ছিল চল্লিশের কাছাকাছি।

প্রায় দশ বছর এই বিধবাটিকে নিয়ে তিনি বরানগরের সেই বাগান-বাড়ীতে বাস করেন। তারপর কি কারণে কেউ বলতে পারে না, হঠাৎ একদিন স্ত্রীলোকটি গভীর রাত্রে বরানগরের সেই বাগান-বাড়ীতেই একটা গাছে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যার কারণটা আজও রহস্যময় থেকে গেছে।

মহিমারঞ্জনবাবুর ভাগ্নে শচীনবাবুকে আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলুম,—'আচ্ছা, বলতে পারেন, সেই স্ত্রীলোকটি কি খুব হাসতেন?'

এ প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রলোকটি একেবারে লাফিয়ে উঠেছিলেন—'হ্যাঁ, খুব হাসতেন। সে হাসি যে একবার শুনেছে, সে কখন ভুলতে পারবে না।—অদ্ভুত সে হাসি।—একবার শুরু হলে সে হাসি আর থামতে চাইতো না'।

ভদ্রলোকের গল্প এইখানেই শেষ হোলো। বাইরে তখনও সমানে বৃষ্টি চলেছে। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, পথে একহাঁটু জল দাঁড়িয়ে গেছে।

অভিশাপ

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

সীতাহাট !

তারের বেড়ার গায়ে রংচটা কাঠের বোর্ড সাঁটা। অনেকদিনের রোদ বৃষ্টি ঝড়, আর কর্তৃপক্ষের অবহেলার সাক্ষ্য দিচ্ছে—কাপসা হয়ে আসা অক্ষরগুলো। দীর্ঘ ঈকারের মাথাটা এমন পরিষ্কার মুছে গেছে যে চলন্ত ট্রেণের আরোহীরা 'সাতাহাট' বলে ভুল করে' অর্থবোধে অক্ষম হয়ে পড়ে।

সেল ট্রেণের এখানে থামার কথা নয়।

দৃকপাতও করে না, নাক তুলে বীর বিক্রমে এগিয়ে যায় রংচটা কাঠের বোর্ডের মিনতি-দৃষ্টি উপেক্ষা করে। অনাথের নাথ প্ল্যাটফোরখানা মিনিট খানেকের জন্যে একবার দাঁড়িয়ে যায়।

এখানে যারা ওঠানামা করে—প্রায়ই গ্রাম্য চাষী, ক্লাসের লোক, দু'চারখানা গ্রামের মধ্যেই তাদের গতিবিধি সীমাবদ্ধ। ভদ্রলোকের দেখা কদাচ মেলে।

সুকান্তর মতো—চকচকে সুট পরা, ঝকঝকে সুটকেস হাতে, এমন ভবিষ্যদ্বক্তা আরোহী দৈবাতের ঘটনা। হাতা বেডিং আর সুটকেসটা নিয়ে নিজেই এগিয়ে চললো সুকান্ত, শুধু কুলিখোলা বিড়ম্বনা বলেই নয়, দেশের মাটিতে নেমে মনের কোণায় কোথায় যেন বেজেছে একটু বৈরাগ্যের সুর।

সীতাহাটের মাটিতে—কোপ-কাড় ঘেরা-বন্ধ ডিঙিয়ে ভাঙলাধরা মজা পুকুরের পাড় ধ'রে খালি গায়ে আর খালি পায়ে যে ছেলেটা ঘুরে বেড়াতো—যার নাম ছিল 'কানু', তাকে যেন ওর মনে পড়ে গেছে।

রামচন্দ্র নাকি চৌদ্দ বছর নির্বাসনে ছিলেন····· কিন্তু সুকান্তরই বা কতটা কি? তেরশো উনচল্লিশ সালে ও সীতাহাট ষ্টেশনে এসে ট্রেণে চেপেছিল—যখন 'সাতাহাট' বলে ভুল করতে কত না লোককে—সেই ট্রেণ থেকে নামলো এই তেরশো তিরাত্তরে।

মনে মনে একবার হিসেব করে নিয়ে ফেলে উঠলো সুকান্ত।···চৌদ্দ বছর বটে, তবে রামচন্দ্রের মতো অমন গৌরবময় নির্বাসন নয়। না ছিল সঙ্গে না ছিল সঙ্গিনী, নেহাৎ দুঃখীর মতো নিঃস্ব সেই যাত্রা।

থাক্ সে সব দিনের কথা। বিস্মৃত অতীত হাতড়ে দুঃখের স্মৃতিকে ফেলিয়ে তুলে উদাস মনে ওঠবার মত ভাববিলাসী সুকান্ত নয়।·····চট্‌াৎ যেটুকু মনে পড়ে যায় থাক্।

ভাগ্যচক্রের অনেক চক্রে ভেদ করে দাঁড়াবার জায়গা করে নিতে হয়েছে তাকে।·····স্বপ্ন দেখার সময় কোথা?

দেশে এসেছে—উপেক্ষাকারীদের নাকের সামনে হঠাৎ ঋক্ষমাধুরী দেখাতে নয়, নিতান্তই কর্তব্যের খাতিরে।·····লাভ লোকসান খতিয়ে মেলে কষে হিসেব ক'রে মোটাকিছু নিয়ে এসেছে পরিত্যক্ত পিতৃভিটার সংস্কার করতে।·····ইচ্ছে করলে—পাঁচজনের চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মতো অট্টালিকা বাঁধাও হয়তো অসম্ভব ছিল না সুকান্তর পক্ষে, কিন্তু সে রকম বাজে খরচ তার নেই। নেহাৎ যেটুকু না করলে নয় তাই করা।

একাধারে সর্ব্বগুণসম্পন্ন যে মেয়েটিকে পদে আনার কথা, আসবার আগেই সে হটতাপা পড়লো ঘরে। একলাই তাই চলে এসেছে।.....দু'চারদিন অবিশ্যি ভাত জুটবেই কোথাও না কোথাও!.....মনে ভাবলে পাপ নেই—বিয়ে কৃতার্থই হয়ে যাবে হয়তো—চকচকে সুট পরে আর সুটকেস ভর্ত্তি নোটের গোছা সঙ্গে করে এনেছে যখন।

একটা মিস্ত্রী ডেকে কণ্ট্রাক্ট পোক্ত করিয়ে নিয়ে কাজটা লাগিয়ে দেবার শুধু যে ক'দিন লাগে। তারপর তো সুবোধই এসে দেখাশোনা করতে পারবে—সর্ব্বত্র সে সুকান্তর ডান হাত।

নিজের বাড়ী ঢোকার আগেই পড়ে মেজ জ্যাঠার সদর।

মল্লিকের বাড়ী, এক চৌহদ্দির মধ্যে ঘেঁসাঘেঁসি করে বাস করছে জেঠতুতো আর খুড়তুতোর দল। কাকা জ্যেঠা পিসি ঠাকুমার সংখ্যা কম নয়.....অবশ্য এই চৌদ্দ বছর ধরে যদি সকলে একযোগে বেঁচে থাকে।.....কে জানে কাকে দেখতে পাবে আর কাকে পাবে না!

এতদিন ধরে ওর ঠিকানাটা এত অনিশ্চিত আর পরিবর্ত্তনশীল ছিল যে—অবশ্যি এতটা পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও জাস্টিসগাঁয়ির দল থেকে ছিটকে গিয়ে কেউ না পেতেছে হাত, না দিতে পেরেছে কোনো মৃত্যু সংবাদ, যার জন্যে বুকটা খালি হয়ে না থাক পা দুটো খালি করতে হয় বাধ্য হয়ে।

বৃন্তচ্যুত পাখার মত ওকে সবাই ভুলেই ছিল, কে যে তাকে তুলে নিলে করেছে কলমের চোটা, জোগান দিয়েছে প্রাণরসের, কে জিরেন রেখেছে? এতদিন পরে সুকান্ত নিজেই তার হিসেব দিতে এলো না কি?

মেজ জ্যাঠার দরজার কাছে একবার থমকে দাঁড়ালো.....ঢুকবে নাকি? না সরাসরি নিজের বাড়ীতেই উঠবে আগে? কিন্তু উঠবেই বা কেমন করে? আগাছার জঙ্গলে ভরে গেছে সদর বৈঠক, দরজায় লাগানো তালাচাবিতে মরচের 'ধং' ধরে গেছে কিনা দেখতে হলেও আগে মহুয়া চাই।.....আগাছার বাড় এমনিই ঘটে।

মেজ জ্যাঠার বাড়ীই ঢুকে পড়া ছাড়া উপায় কি?

শুধুই কি নিরুপায়? ভিতর থেকে কিসের একটা তাগিদ পাচ্ছে না! ছোটবেলায় যার আকর্ষণে মেজ জ্যাঠার বাড়ীটা ছিল লোভনীয়?.....কিন্তু নতুন বৌদি কি এখনো নতুন আছে.....আছে সেই বিদ্যুৎ দীপ্তি? নাকি এবাড়ী-ওবাড়ীর আরো দশটা বৌয়ের মতো গণ্ডা গণ্ডা কুচো-কাচার আমদানী করে নিস্তেজ হয়ে গেছে?

দূর ছাই ঢুকে পড়লেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়।

অবশ্য দা' অবশ্য এ সময় বাড়ী নেই, জমিদারের নায়েবী, উপরন্তু সেখানেই বাস। তিন ক্রোশ পথ ভেঙে ক'বার আসবে যাবে! তবু নাম ধরে ডাকতে হ'লে তাকেই ডাকতে হয়।.....ছেলেবেলার মতো মৃদু-কুণ্ঠিত গলায় নয়, চাঁচা ছোলা চড়া সুরে—

(৬)

—অনন্তদা !

—কে রে ? কে ?

ঘরের ভিতর থেকে একটা ভীত স্বর ভেসে এলো—কে ডাকছে আমার নাম করে ?··· ··কে ? কে ?

মৃত মানুষের সহস্র প্রশ্ন রয়, রোগীর আর্ত্তনাদের মতো।·····তবু অনন্তেরই মতো।

হঠাৎ ভারী ভয় করলো সুকান্তর, ভাবলে পালাই·····কিন্তু সত্যি তো আর তাই পালানো যায় না ! আবার গলা তুলে ডাক দিলে—অনন্ত দা ! আমি। আমি সুকান্ত। সেজ জ্যেঠিমা ! জ্যেঠামশাই ! বাড়ীতে কেউ নেই নাকি ?

এবারে বেরিয়ে এলেন মহামায়া।

দৃষ্টি যতটা দুর্ব্বল, চাহনির ভঙ্গীতে তার চাইতে ঢের বেশী দুর্ব্বলতা ফুটিয়ে তুলে যতদূরভাবে বললেন—কে বাবা তুমি ? চিনতে তো পাচ্ছি না !

—আমায় চিনতে পাচ্ছেন না জ্যেঠিমা ? আমি কানু।

—কানু ! আমাদের কানু ? সেজ ঠাকুরপোর ছেলে ?

সুটকেসটা আর বেডিংটা মাঝখানে নামিয়ে রেখে ততক্ষণে সুকান্ত উঠে এসেছে দালানে ··আলগোছে একটা প্রণামের মত করে হেসে উঠলো—আপনি যে দেখছি বেজায় বুড়ো হয়ে গেছেন জ্যেঠিমা ! তা'পর—সব ভালো তো ?

—ভালো ? ও ভগবান ! 'ভালো' যে কী জিনিষ, সে কথা ভুলে গেছি বাবা। বাবার তো পথ নেই তাই দেখছি বসে বসে।

হঠাৎ চুকরে কেঁদে উঠলেন মহামায়া।

সুকান্ত অবশ্য খানিকটা প্রস্তুত হয়েই এসেছিল—আলাপের সঙ্গে সঙ্গে কিছু না কিছু বিলাপ হবার জন্যে।·····তবু বাড়ী ঢুকতেই এমন প্রচণ্ড বিলাপের মুখোমুখি হয়ে বসে গেল বেচারা।

অথচ তাকিয়ে দেখছে—বিলাপের সব চেয়ে যা বড় কারণ মেয়েদের জীবনে, এখনো পর্য্যন্ত তার হাত এড়িয়ে এসেছেন মহামায়া। দুগাছা মোটা শাঁখের শাঁখা, একটা বিবর্ণ পাড় শাড়ী ও চওড়া চাকের উপর অল্পস্বল্প সিন্দুর রেখাটুকু মাত্র সম্বল হলেও সৌভাগ্যের প্রধানপত্র তো বটেই।···তবে ?···ছেলেদের কেউ ? মদন ? হেমন্ত ? অনন্ত ?···কিন্তু অনন্তর গলা তো এইমাত্র শুনেছে সুকান্ত।

সোজাসুজি প্রশ্ন করা কঠিন, অতএব ঘোরালো করে ভূতোর কিস্তেটা তুলতে কিছু সময় নষ্ট করা চলে।

মহামায়াও অবশ্য কান্নাটা সম্বরণ করে নিয়েছেন ততক্ষণে।

—তুমি ভালো আছো তো বাবা ?

যদিও সুকান্তর পোষাকের পারিপাট্যে আর দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ দেহের লাবণ্যে সন্দেহের অবকাশ নেই, তবু কুশল প্রশ্নের প্রথা হিসেবেই এই প্রশ্ন মহামায়ার।

—ভালোই আছি জ্যেঠিমা, কিন্তু কাউকে দেখছি না কেন বলুন তো ?

—কাকেই বা দেখবে বাবা! যে যার পথ দেখেছে। হেমন্ত বলত দু'জনেই দেশছাড়া,—'অমন্তে' 'অমন্তে' 'নক্ষেত্তোদা' ক'টা পড়ে আছি এখানে।···আছে—নতুন বৌমা আছে, সে আর কোন্ চুলোয় যাবে! তার ছেলেমেয়েগুলো কোথায় ঘাটে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে কে জানে! কথা তো শোনে না কেউ, দাড়-বজ্জাত ছেলেমেয়ে সব···হঠাৎ কণ্ঠস্বর খাটো করে বলেন—হবে না কেন, যেমন মা তেমনি ছা হবে তো?

তারী অস্বস্তি বোধ করতে থাকে সুকান্ত। কি বিশ্রী! পুরনো মানুষগুলোকে দেখতে পাবে বলে যে-আগ্রহ মনে ছিল তার এক ছটাকও খুঁজে পাচ্ছে না যেন।

হয়তো না এলেই ভালো ছিল·····আর কারো বাড়ী উঠলেও হ'ত। তবু চুপ ক'রে থাকা চলে না, তাই কথার পিঠেই কথা কয়—

—তা তিনি গেলেন কোথায়?—'মা'টি? তিনিও 'ছায়েদের' সঙ্গে ঘাটে-বাটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন না কি?

—জানি না। হয়তো বা শুয়েই আছেন, নবাবজাদীর মন মর্জি।···চাল বাড়ন্ত বলে—পেরায় ওরের বৌ বেলা দুপুর অবধি শুয়ে থাকে শুনেছ কখনো?

অনেককথা একসঙ্গে কয়েই বোধকরি মহামায়া হাঁফাতে থাকেন।···

পরক্ষণেই ঘরের ভিতর থেকে অনন্তর নিষ্করুণ চীৎকার ভেসে আসে—কে কথা কইছে ওখানে? কে কে?

সুকান্ত অভিভূতের মত চারিদিকে তাকায়···"চালবাড়ন্ত" এ কোন্ ভাষা? সুকান্তর বাবা শ্রীকান্ত মারা গেলে এমনি একটা রুঢ় কর্কশ শব্দ মাঝে মাঝে মায়ের মুখে শুনতে পেতো না? কিন্তু সেজ জ্যাঠার বাড়ী! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধানের গোলা দুটো তবে গেল কোথায়?···'খামারবাড়ী' বোকাই মুগ কলাই ছোলা অড়রের বস্তা! জালা ভর্ত্তি গুড়! উঠোনে প্রে পড়া পেয়ার পেয়ারা কই কাতলা···চাষার ওরের বাগানের কল, পুকুরের মাছ, ঘরে তোলা ওরের গাওয়া ঘী—কোথায় সদ্গতি লাভ করবে—নায়েবের পাদপদ্ম ছাড়া? 'নায়েব' হবার স্বপ্ন কবে ভুলেছে সুকান্ত? ··মা বলতো—"নায়েব হতে যাবি কি দুঃখে কানু, নিজে কুই জমিদার হবি—" মায়ের কথা পছন্দই হত না। মানুষ যদি হ'তে হয় সেজ জ্যাঠার মতো।

অনন্ত তখনো ছেলেমানুষ—স্কুলে পড়ে··মোটেও প্রতাপ নায়েব হচ্ছেন সেজ জ্যাঠা যাধাকান্ত হত। জমিদারী যত দামান্য হোক প্রতাপটা সামান্য ছিল না। কালীপূজো আর জগদ্ধাত্রী পূজো করতেন যাধাকান্ত, সমারোহ হ'ত প্রচুর।···তখনকার সমৃদ্ধির চেহারাটা স্মরণ করতে চেষ্টা করে সুকান্ত চারিদিকে তাকিয়ে।

কেমন যেন শ্রীহীন বিস্বাদ ভাব, তবু শুধু এক মিনিট দালানে দাঁড়িয়ে সমস্ত সংসারের বৈভবের ছবি এত স্পষ্ট হয়ে উঠত না সুকান্তর চোখে, যদি দালানের দাওয়ায় অমন নির্লজ্জভাবে মেলে দেওয়া না থাকতো হলুদের ছাপ লাগা পাড়ের রং উঠে যাওয়া আর ময়লা শাড়ীখানা। যার সর্ব্বাঙ্গে হড়া হড়া সেলাইগুলো ফুটে আছে ভাগ্যের নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের মতো।

চকচকে সুটপরা সুকান্তকে কেমন অসহায় অপ্রতিভ দেখতে লাগে।

মহামায়া আবার এক পালা সুরু করবার উদ্যোগ করছিলেন—কিন্তু অনন্তর বীভৎস চীৎকারে থেমে

থেকে এল···অপরিচিত কণ্ঠের পরিচয় জানবার জন্যে উৎকণ্ঠার শেষ নেই তার। বারে বারে আর্তনাদের মত প্রশ্ন করছে···কে-কে-কে ?

—এই দেখ বাবা, আমার কপালের জোর—বলে মহামায়া বার্দ্ধক্যের ভারে কুঁকে পড়া দেহ নিয়ে আস্তে আস্তে অগ্রসর হ'ল। অসভ্য সুকান্তই বা করবে কি···পিছন পিছন না গিয়ে ?

কিন্তু কী ভয়ানক !···সুদীর্ঘকাল পরে এই বীভৎস দৃশ্য দেখবার জন্যেই সীতাহাটে ফিরে এলো না কি সুকান্ত !

হাঁটুর নীচে থেকে দু'খানা পা-ই কাটা অনন্তর, আর সেই আধখানা দেহ নিয়ে বিছানা থেকে উঠবার জন্যে কী প্রাণান্তকর চেষ্টা তার। দু'খানা হাতের উপর ভর দিয়ে এলোমেলো ধড়টাকে নিজেকে নিয়ে।

ওধারে জানলার গরাদে ধরে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে যে মানুষটা অবিচল নিশ্চিন্ততায় দাঁড়িয়ে আছে—নতুন বৌ ভিন্ন আর কে হ'তে পারে সে ?···কিন্তু ধড় না বধির ? না কি এই অমানুষিক অসহায় জীবটার প্রাণান্ত কাকুতিতেও কর্ণপাত মাত্র করবে না এই প্রতিজ্ঞা তার ?

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না সুকান্ত।···দেশের কথা ভাবতে গেলেই যে হঠাৎ মনে পড়ে যেতো এই নতুন বৌকে। হাসে লাস্যে উজ্জ্বল মুখ, বুদ্ধিদীপ্ত বাচনভঙ্গী, কাজে আর অকাজে সমান তৎপর। ছেলেরা মুগ্ধ হতো··মেয়েরা হিংসা করতো। সে নতুন বৌ কোথায় ? মারা যায়নি তো ? অনন্তর দুর্ঘটনার উদাহরণ দ্বিতীয়পক্ষ নয় তো এটি ?

অনন্তর দুর্ঘটনার প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই মহামায়া হতাশ ক্ষোভের সুরে বলে ওঠেন—নতুন বৌমা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ ? আর বাছা আমার একটা কথার 'পিত্যেশে' প্রাণটা বার করে ফেলছে !

এতক্ষণে বোধকরি নতুন বৌমার চমক ভাঙে ; মুখ ফিরিয়ে সুকান্তর দিকে দৃকপাত না করে মহামায়ার উদ্দেশ্যে মুখকে হেসে বলে—তবুও পোড়া প্রাণ আর বেরোতে চায় না···এই বড়ো আশ্চর্য্য মা !

স্তম্ভিত সুকান্তর মুখে কথা ফোটেনা। ও যে একটা পশু লোক, একটা কোম্পানীর হাজার লোক ওর কথায় ওঠে বসে··মৃদু কথার যাদুমন্ত্রেই যে ও সাহেব চরিয়ে খায়···এ সব কথা বিস্মৃত হয়ে অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে নতুন বৌয়ের মুখের পানে—পনের ষোলো বছর আগে একটি কিশোর বালক যেমন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতো··তরুণী নববধূর দীপ্তোজ্জ্বল কর্ণভূষাবঞ্চিত রাজটীকা মুখের পানে···

অন্যদিন অনন্ত সুকান্তর মতো হতবাক হয়ে যান না। অত্যন্ত কানে কথাটা হয়তো বিষ বর্ষণ করে কিন্তু তাকে গায়ে করে নেয় না।·····বয়সের আঘাতে জর্জ্জরিত কুৎসিত মুখ ঘৃণায় আরো কুৎসিত করে বলেন—ঘরে যে তোমার কেন হয় না মা, এও এক মস্ত আশ্চর্য্য।···কাল্লু মেথরটি তো বাবা ? ও পাপিষ্ঠির নরকেও ঠাঁই হবে—তুই ভাবিস ?···কিসের তেজে এত মুটমট করছেন তাই ভাবি।···রূপ তো নেই···গুণেরও সীমে নেই।···যেদিন থেকে ঢুকেছে—সেদিন থেকেই যেন সব উল্টে পুল্টে যাচ্ছে। লক্ষ্মী কোন্ পথ দিয়ে উধাও হয়ে গেলেন দেখতে দিলে না। নইলে আজ এই দুর্দ্দশা ! উনি আজ পাঁচ বছর পক্ষাঘাতে পঙ্গু,

টাটকা ছেলেটার এই অবস্থা, গোবাল ভর্তি গরু গুলো সুদ্ধু পট্ পট্ করে মরে গেল!···এ সংসারের সুখ ঐশ্বর্য্য তোরা তো দেখেছিস বাবা?···আর এখন এই দেখ! লোহার অলঙ্কার পরে এসে—

অজন্তা এদের দেখেই নিশ্চল হয়ে শুয়ে পড়েছিল—মার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বিরক্ত স্বরে বললে—সব সময় ঘ্যান্ ঘ্যান্ কোরোনা বাবু ভাল লাগে না, গিয়েছে—বেশ হয়েছে: পাপের ধন 'প্রাচিত্তে' গেছে!·····কানু এতদিন পরে এলো—কোথায় একটু বসতে বলবে, ওর সময় নেই—তা' নয়—নিজের কথাই সাত কাহন!·····কানু ভালো আছিস তো ভাই? এতদিন পরে বোনকে মনে পড়লো?···

—কিন্তু না পড়লেই যেন ভালো ছিল অনন্ত দা'!

—কি আমার জন্যে বলছিস? সবই অদৃষ্ট! নইলে—রেলে চড়লাম না—এক্সিডেন্ট হল না—লাইনটুকু পার হ'তে গিয়ে দু'খানা পা বিসর্জ্জন দিয়ে এলাম!···মস্তিষ্কের! দেখছি ইঞ্জিনটা আসছে ছুটে—তাকালাম ছুটে পার হয়ে যাবো—ব্যস!···

—তোমার এই গানানো কথাগুলো হাজার বার শুনতে শুনতে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে·····যাকে মাঝে হঠাৎ সত্যি বলেই মনে হয়। প্রত্যেক শব্দটা বুঝে শুনে করে বেরোচ্ছে কি করে বলোতো? একবারো ভুল হয় না!···বয়স্থ লোককে নির্ব্বাক করে দিয়ে নতুন বৌ ওদিকের দরজা দিয়ে উঠোনে নেমে যায়।

বাক্‌স্ফূর্ত্তির অবস্থা ফিরলে—অনেক আলাপ আলোচনা···ঈর্ষা বিস্ময়···সময়-অসময়ের বিনিময় শেষ করে সুকান্ত ওর নিজের বাড়ীর চাবিটার খোঁজ করলে·····মজুর না ডাকলে দোর খোলা যাবে না বৌঠান, কি বলেন?···কিন্তু চাবি যে কার কাছে আছে—কে জানে! জানেন নাকি আপনি?

—চাবি!

মহামায়া হতাশ ভাবে মাথা নাড়েন—চাবির খবর বলতে পারিনি বাবা। আজ একযুগ বন্ধ পড়ে আছে।···তবে···হ্যাঁ···এদিক দিয়ে ঢুকতে তুমি পারো। মাঝখানের পাঁচিল ঘেসে এবাড়ীর উঠোন এক হয়ে গেছে কিনা।

শেষের কথাটা প্রায় অনিচ্ছাসত্ত্বেই বলতে হয় মহামায়াকে।

এ-বাড়ীর লোকের যে ও-বাড়িতে গতিবিধি আছে সে তো বাড়ী ঢুকলেই বলা পড়বে। সুকান্তদের উঠোনে শ্রীকান্তর অনেক সাধ করে গাঁথানো প্রকাণ্ড ইঁদারাটা একটু লোভনীয় বৈকি!···এবাড়ী এবং আরও পাঁচটা বাড়ীতে মাত্র পাতকুয়া।···তাই না মহামায়াদের প্রয়োজন পড়ে ভাঙা দেয়ালের সুযোগ নেবার!

অগত্যা সুকান্তও সেই সুযোগ নেয়।

কিন্তু ঠিক এই সময়টাই কি জল নেবার দরকার পড়লো নতুন বৌয়ের? চকচকে ছোট্ট পিতলের ঘড়া নিয়ে এসেছে ইঁদারার পাড়ে।

আশ্চর্য্য! হাসতে লজ্জাও করছে না?···

—কি গো ব্যাপারটা হবে না কি? বলো তো দু'ঘড়া জল তুলে দিয়ে যাই?

কোটটা খুলে টাঙিয়ে রাখবার মতো একটা ধুলো অল্গানহীন গাবদা খুঁজে বেড়াছিল সুকান্ত। অবশেষে একটা পেয়ারা গাছের নীচু ডালের 'কৈফড়ি'তে আটকে দিয়ে সুটকেস খুলে সাবান তোয়ালে বার করতে করতে বলে—জল তুলে দেবার দরকার নেই, আমি নিজেই পারবো।

—কল কি ঠাকুরপো, জল তুলবে? তোমার ময়ূরপুচ্ছের সন্ধ্যবলানি রবে না তো? না ভাই, না থাক্! আমরা থাকতে মিথ্যে কষ্ট করবে কেন? বোসো ওবাড়ী থেকে বড় বালতি এনে দিই একটা—

—ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আপনার কাজ সেরে নিয়ে যান, আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি।···আচ্ছা যার কতকগুলো এই সব কলসী-টলসী ছিল না? সে কি আছে এখনো? ভাঁড়ার খুঁজলে পাবো?

—কি জানি পেতেও পারো—

একটা ঘড়া উপুড় করে মজুদের ওপর জল মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকে নতুন বৌ।···

কিন্তু হাসিটা এমন প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ-মিশ্রিত কেন?

নানা কারণে নতুন বৌয়ের উপর মনটা প্রসন্ন ছিল না···তা ছাড়া—এরকম জনমানব বর্জিত গোছো জায়গায় একলা বসে গল্প করাটা অস্বস্তিকর। পাড়াগাঁয়ের মাটিতে গড়া সমস্ত সংস্কার···দরজার সভ্য হাওয়ার চাপা থাকতে পারে—একেবারে উড়ে যাওয়া সম্ভব কি?

—কাজ হ'ল আপনার?

—কেন? তাড়াতে পারলেই বাঁচো বুঝি? যাচ্ছি গো যাচ্ছি, এখুনি হয়তো আমার দরাদরী শাশুড়ী, মেহময় শ্বশুর, আর প্রেমময় পতিদেবতা আমার অদর্শনে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখবেন।···কিন্তু ঠাকুরপো, মিথ্যে মেহ করছো, জলটা আমি তুলে দিয়ে যাই, এতদিন পরে এসে কেনই বা কষ্ট করবে আমরা থাকতে—

—হঠাৎ রীতিমত গম্ভীর হয়ে উঠে সুকান্ত বলে—আপনি ভুল করছেন বৌদি, আপনাদের অতিথি হয়ে আসিনি আমি, নিজের বাড়ীতে নিজের কাজে এসেছি। অসুবিধে তো চবেই সইতে।

—বেশ তো সইতে পারলেই ভালো—বলে ভারী ঘড়াটাকে টেনে টেনে তুলতে থাকে নতুন বৌ।

কিন্তু অসুবিধের চেহারাটা যে এত প্রখর হবে সেইটাই ধারণা ছিল না বেচারীর।···চৌদ্দ বছর কমদিন নয়; ঘরের মেজের অবিশ্রান্ত পুরু ধুলোর স্তর তার প্রমাণ দেবে।···তবু—জানলার গরাদ-গুলোর পর্যন্ত চিহ্ন থাকবে না? থাকবে না দরজার কপাটের?···খাঁ খাঁ করবে সুকান্তগুলো?··· শ্রীকান্তর মৃত্যুর পর সুকান্ত আর তার মা ভাঁড়ারে 'চাল বাড়ন্ত' হ'ত সত্যি, কিন্তু সংসারের দরকারী জিনিষগুলো? খেতে না পেয়েও তার মা প্রাণপণে যেগুলো আগলে রেখেছিল?···কোথায় সেই পিতল কাঁসা লোহালক্কর আসবাব পত্র?···জীবনযাত্রার অবশ্য খুটি নাটি?···সেই বাড়ীভর্ত্তি জিনিষের চিহ্নও থাকে না চৌদ্দবছর বাড়ীছাড়া থাকলে?···'আড়ায়' তুলে রাখা বিছানাগুলো সুদ্ধ চোরে চুরি করে?··· শুধু অবিকল পড়ে থাকে একটা মাটির কুঁজো?···ধুলো আর মাকড়সার জালে যার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা পড়ে গেছে···যার থেকে—মারা যাবার আগে পর্যন্ত জল খেয়েছে সুকান্তর মা।···গভীর রাত্রে যখন সমস্ত

পাড়া নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল···মেসার মেসার জল মাখছিল সুকান্ত নিজে, আর ফোঁটা ফোঁটা করে দিচ্ছিল মার মুখে।···অদ্ভুত! এই কুজোটা তা'হলে কেউ নেয়নি? সুকান্তর মার শেষ চিহ্ন হিসেবে রেখে গেছে বুঝি?···কদাট-হীন দরজায়, 'হা হা' করা খোলা ঘরের মেঝেয় বসে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে কুজোটার দিকেই তাকিয়ে থাকে সুকান্ত।···

পাড়ার আরও অনেকের সঙ্গে দেখা করে আর অনেকের বিদ-বিধান জেনিয়ে বেশীরাত্রে সুকান্ত বাড়ী ফিরে দেখলে দোতলার একটা ঘর যথাসম্ভব পরিষ্কার করে তার বিছানাটা রয়েছে পাতা। মাথার কাছে একগ্লাস জল, আর আধখানা মোমবাতি।···কিছুক্ষণ থেকে জলে যাওয়ার হিসাব দিচ্ছে।···

মহামায়ার উপরোধে সামান্য কিছু খেয়ে এসে শুয়ে পড়লো।···জ্বলতে লাগলো বাতিটা।

কিন্তু মোমবাতি তো এক সময় শেষ হয়!···

গাঢ় অন্ধকারে ধরা পড়বার ভয়টা কি? নিঃশ্বাসের শব্দটা শাসন করে বন্ধ করা যায় যদি? ভয় হয়তো থাকতো না—পোড়ো বাড়ীর নিশ্চিন্ত বাসিন্দা—ইঁদুর, বেজি, পায়রা, চামচিকেদের অবাধ সঞ্চরণের সুযোগে মিশিয়ে যেত সতর্ক পদধ্বনি, কিন্তু মাথার বালিশের তলায় টর্চ্চ নিয়ে শুয়ে থাকবে সুকান্ত একথা কে ভেবেছিল?

বালিশের তলা হাতড়ে সংগ্রহ করা সুটকেসের চাবিটা সমেত হাতখানা চেপে ধরে আচমকা টর্চ্চটা জ্বালবার কি দরকার ছিল সুকান্তের!···আলো জ্বেলেই অবশ্য হাত ছেড়ে দিয়েছে সে, কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার পথ কোথায়?···ঘুমন্ত মানুষকে ডিঙোনো যায় বলে তো আর জাগ্রত মানুষকে যায় না?

—এই রকমই সন্দেহ করেছিলাম আমি।

বিছানায় উঠে বসে মিনিটখানেক চুপ করে থেকে গম্ভীর গলায় বললে সুকান্ত।

ধূর্তধাক্কি একটা কঠিন হাসি হেসে তীক্ষ্ণ সুরে উত্তর করে—তাই বুঝি ঘুমের ভাণ করে পাহারা দিচ্ছিলে?

—নাঃ। ভাণ করা আমার স্বভাব নয়, ভাগ্যক্রমে ভেঙেই গেল ঘুমটা, কিন্তু একটা কথার উত্তর দেবেন?···এ রকম অদ্ভুত প্রবৃত্তি কেন? মুখের কথা খসালেই তো কাজ হতো। একবার চেয়ে দেখলে পারতেন।

—চেয়ে? ছিঃ! আমি কি ভিখিরী? চাইতে আমার ঘেন্না করে।

—আশ্চর্য্য! আত্মসম্মান-জ্ঞান! চাইতে লেগে···করে না চুরি করতে!

—চুরি!

হঠাৎ তীক্ষ্ণ হাসির ঝাঙ্কার পান্ পান্ করে বাড়ির ঘরের অন্ধকার। ঠিকটা কখন মিলিয়েছে—মনে ছিল না সুকান্তের, খেয়াল হ'ল হাসির শব্দে।

—চুরি কে না করছে? এই যে তুমি, একমুঠো ভাতের জন্যে ঘোরে ঘোরে ঘুরে ফেল ছাড়া হয়ে আজ এসেছো বড়মানুষী দেখাতে—এর মূলে চুরি নেই কে বিশ্বাস করবে?···চুরি?·····চুরি না করলে খাবে কি?

—বরং উপোস দিয়ে মরা ভালো।

রাগ লুকোবার চেষ্টা করেনা সুকান্ত।···বিড়ালে লজ্জার সমস্ত শরীর জলতে থাকে তা'র। অপেক্ষন মানুষেরই হয় সত্যি কিন্তু মেয়েমানুষের এত অধঃপতন সহ্য করা শক্ত। তা'ছাড়া নিজের তুলনাটাও অসহ্য লাগে। কিন্তু আরও সহ্য করতে হয়···

নতুন বৌ হেসে উঠে বলে—ওসব ধর্ম্মকথাগুলো বড় সেকেলে হয়ে গেছে ঠাকুরপো, লোক-ঠকানো ছেঁদো কথা মাত্র।···একজন খেয়ে ফুরোতে পারে না, রাখবার জায়গা পায় না, আর একজন না খেয়ে মরে, এর বিরুদ্ধেই না শুনছি আজকাল লড়ালড়ি চলছে তোমাদের?

—সে সব হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের বড় কথা—বুঝলেন? অন্যের ঘরের ঘটিবাটী চুরির সপক্ষে কোন নীতিই নেই।

—আছে শুধু উপোস দিয়ে মরার উদার নীতি কেমন? আচ্ছা কাজ, আন্দাজ করতে পারো, তোমার জ্যেঠির সাধের সংসারটী চলে কিসের জোরে?···বাগদী পাড়ার লোক এসে ঘরের মেয়ের অপমানের জবাব দিয়ে গেল তোমার দাদাকে পঙ্গু করে···তার আগে শ্বশুর বিছানা নিয়েছেন।···আচ্ছা ঠাকুরপো, পক্ষাঘাত কেন হয় জানো?

বিরক্তি-বিরস কণ্ঠে সুকান্ত উত্তর করে—থাক্ বৌদি, গুরুজনের কথা নিয়ে আলোচনা করবার প্রবৃত্তি আমার নেই।

—প্রবৃত্তি আমারও নেই ঠাকুরপো, শুধু কথার কথা জানতে চাইছিলাম। দাদাও কম গুরু নয়, তাঁর কথাও থাক্ কিন্তু উপার্জ্জনের পথ বন্ধ হয়ে গেল, রইল শুধু খাওয়ার মুখ—এর কি শুধু জোটাই দাদি তাই বলো তো?···অথচ যোগান দিতেই হবে—যোগান দিয়ে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে মাংসপিণ্ডের ভেতর ধুকধুক করা সেই প্রাণটুকু।···অনুষ্ঠানের ত্রুটি হ'বার তো নেই, চিরকাল ভালো খেয়েছেন—তার ব্যতিক্রম সহ্য হয় না। আদি অনন্তী আমার নিশ্বাসে নাকি সব উড়ে পুড়ে যাচ্ছে···পৃথিবীতে বাধলো লড়াই, বাজারে লাগলো আগুন, সেও বোধকরি আমার অপরাধ।···এই চার বছর ধরে—তিলতিল করে সব গেছে। অবশেষে যেতে বসেছে নীতি-ধর্ম্ম, সভ্যতা, ভব্যতা।

—কিন্তু দেবর দা—বলুন দা? তাঁরা কি কিছুই দেন না?

—দিতেন হয়তো সামান্য কিছু, কিন্তু শ্বশুর আমার মানী লোক, বেইমান ছেলেদের এক পয়সা

নেন না—তাদের অপরাধ তারা সক্ষম। অহরহ দু'টো জ্যান্তমরা পশুর কান্নাকাটি শুনতে শুনতে নিজেদের জীবনটা পশু করে ফেলতে চায় নি, স্ত্রীপুত্র নিয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে।

—কিন্তু এ ভাবে ক'দিন চলবে?

—দেখি তো—হয়তো শেষ পর্যন্ত ধরতে হবে—বেরোবাড়ুয়ের সেই আদি ও অকৃত্রিম পথ।…বাঁধা রাস্তায় বাইরে গিয়েই না এত বিড়ম্বনা? কিন্তু রুচিতে যে বড্ড বাধে, করি কি। যাকগে—ওসব কথা। আজ যখন ধরে ফেলেছ তোমার কাছে তখন দয়াভিক্ষা ছাড়া উপায় কি? দয়া করে পথ দাও আমি যাই।

—পথ আপনার আটকাইনি আমি—সুকান্ত অভিভূতের মতো বলে—শুধু ভাবছি ধন্য আপনার সাহস! হঠাৎ যদি এ অবস্থায় কেউ দেখে, দুর্নামের কিছু বাকী থাকবে কি?

আবার খান খান হয়ে যায় অন্ধকার! কাঁচের বাসন ভেঙে যাওয়ার মত তীক্ষ্ণ শব্দ ওর তীক্ষ্ণ হাসির।

—বাকী থাকবে না বলেই তো রাতদুপুরে আসা গো—দুর্নামই যে আড়াল। দুপুর রাতে একলা তোমার ঘরে মনচুরি করতে না এসে—বাক্স ভেঙে তুচ্ছ টাকা চুরি করতে এসেছি, বুঝ মানুষে কখনো বিশ্বাস করে এ কথা?…চরিত্রের অপবাদ তো বাঙালীর মেয়ের অঙ্গের ভূষণ, তোমায় দেখে একবার হেসে কথা কইলেই তো জাত যাবে—কিন্তু হেসে তো হবে না? বস্তিবাড়ীর বৌকে হাতে খড়ি দিয়ে নিয়ে যাবে—বস্তিবাড়ীর এত বড় অপমান কি করে হটাই বলো? দুর্নামের আড়ালে তাই আত্মরক্ষা করছি

—তাই বলে ইচ্ছে করে মিথ্যে দুর্নামের বোঝা বইবেন?…সুকান্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে…বলে, আপনি কি পাগল?

—পাগল! বলো কি, অসম্ভব ঠাণ্ডা মাথা, নিজেই অবাক হয়ে যাই মাঝে মাঝে। আর একটু কম ঠাণ্ডা হলে—সংসারের আর পাঁচ জনের মতো হয়তো একটা গেরোমী করে বসতাম কোনোদিন।—জল, আগুন, বিষ, দড়ি এতো আর কেড়ে নেবনি কেউ? কিন্তু লো কি তার? বংশে বাতি দিতে অপগণ্ডের সংখ্যাও তো কম নয়?—এতোগুলো মাংসপিণ্ডের পিণ্ডির জোগাড় করে কে তবে?

—আচ্ছা তাও বাড়ী মেরামত করবার কী এত দরকার সুকান্তর? এ যাত্রায় নাই বা হল? একেবারে না হলেই বা ক্ষতি কি? সুকান্তর মায়ের সমস্ত চিহ্নই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে যখন! আরো চৌদ্দ বছরের কড়-কুটি ভূমিকম্পে ধসে পড়ে যাকনা কাটুরো নোনা-লাগা পচা দেওয়ালগুলো! এই নোটের তাড়াগুলো বাসি খবরের কাগজ মনে করলেই বা কি এসে যায়? তুচ্ছ এই টাকা কটার বিনিময়ে কিছুটা সংস্কার যদি হয় তো হোক না—ধ্বংসোন্মুখ একটা জীবনের…কড়বাগট আর ভূমিকম্পে যার চারিদিকের দেওয়ালে ধরেছে ফাটল…লেগেছে লোনা।

টাকা তো সুকান্তর কাছে খোলামকুচি…আর অজস্র আসছে—হয়তো একদিন কিছুই আসবে না, খুব বেশী তফাৎ কোথায়?

টর্চ্চের আলোয় নবগুলো উল্টে পাল্টে দেখে নিয়ে হঠাৎ হেসে উঠলো নতুন বউ—সত্যি নোট তো ঠাকুর পো? জাল টাল নয় তো?

—না: সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। খাঁটিই।

—কতো আছে এতে?

—হাজার পাঁচেক আছে হয় তো!

—বড়ো আনন্দ হ'ল ঠাকুর পো, ইচ্ছে করলেই পাঁচ দশ হাজার নষ্ট করবার মতো অবস্থা তোমার হয়েছে দেখে···এই নাও!

—কি আশ্চর্য্য! ফিরিয়ে নেবার জন্যে দিলাম নাকি?···ধান ধান পালান! চলুন আলোটা ধরি আপনাকে।···নিন পাপলামী করবেন না।

—ছিঃ ঠাকুর পো, অবশেষে হাত পেতে তোমার কাছে নেবো টাকা?···বরং একটু যদি ভালবাসা দিতে পারো দেখো চেষ্টা করে—

মুচকি হেসে নোটের গোছাটা ঘরের মেজের ফেলে দিয়ে চলে যাবার জন্যে পা বাড়াল নতুন বৌ।

—নেওয়া কি কিছুতেই চলে না?

—না গো মশাই না। টের পেলে রাক্ষসের খিদে ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করতে চাইবে, তা জানো?···মজা কি জানো? আমার রোজগারের অন্ন খেতে ওঁদের গলায় বাধে।···নিষ্কর্মার অপমানের বিকারটা হয়তো এমনিই হয়।

—কিন্তু জেঠিমা—অনন্ত দা এঁরাও কি সন্দেহ করেন যে—আপনি···

সঙ্কোচে চুপ করে যায় সুকান্ত।

হাসি নতুন বৌয়ের স্বভাব, হেসে উঠে বলে—এই এক আচ্ছা ছেলেমানুষ, সন্দেহ কি গো? ঘুষ বিশ্বাস বলো। ওঁরা তো আর সংসার ছাড়া মানুষ নয়?—কিন্তু কতদিন আর ঘুষ করি বলো তো?

···রংচটা কাঠের বোর্ডটা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে চোখের সামনে থেকে···ট্রেন ছেড়ে চলে গেল সীতাহাট ষ্টেশন।···হয়তো এই শেষ। অন্য কোন দিন···বহু বহু দিন পরে বৃষ্টিতে সমস্ত লেখাটা একেবারে ঘুছে কাপসা হয়ে গেল কি না দেখতে আসবে কি সুকান্ত? আর কোনদিন?

বাইরে থেকে ছোট্ট গ্রামটাকে একটা আগাছার জঙ্গল ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে না···আগাছা—তবু সবুজ পাতার সমারোহের অভাব নেই।···কে বলবে ওই শীতল আচ্ছাদনের তলায় লুকিয়ে আছে জলন্ত আগুন!

আগুন না অঙ্গার? জলে জলে নিজেকে কখন একদিন নিঃশেষে ভস্ম করে ফেলবে কে জানে!

দুই হাত জোড় করে সীতাহাটের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করলো সুকান্ত। হয়তো জন্মভূমি বলেই।

ছায়া

শ্রীসুবোধ বসু

বম্বের 'গেট অব ইণ্ডিয়া'র ঠিক পিছনে দাঁড়াইয়া বাঙালী সুরেশ্বর উহার দুই স্তম্ভের মধ্য দিয়া সমুদ্র নিরীক্ষণ করিতেছিল। সে স্পষ্টই টের পাইতেছে, পেরাম্বুলেটার-ঠেলা আয়া হইতে আরম্ভ করিয়া অ্যাপোলো বন্দরের বেকার ব্যক্তি যাহারাই চারপাশের অপরিচয়ের বেড়াগুলি অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, তাহারা সকলেই একে অন্যের পিঠের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছে, 'এটা দেখিতেছি আনাড়ি! নহিলে সমুদ্র দেখিতেছে কেন? আমেরাও তো সমুদ্রের কিনারায় দাঁড়াইয়া আছি। কই, সমুদ্র পড়ুক দেখি চোখে?'

ইহাতেও সুরেশ্বর দমিল না। সংবাদপত্র-রিপোর্টারদের সম্মেলন উপলক্ষে বম্বেতে আসিয়াছে। ইহার সকল দ্রষ্টব্য দেখিয়া তবে ফিরিবে, এইরূপ সংকল্প। অত্যন্ত তাড়াতাড়ি সব কিছু চিনিয়া ফেলিতে হইতেছে। ইতিমধ্যেই ইলেকট্রিক ট্রেনে শহরের এবং সহরতলীর বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করিতে শিখিয়াছে, কিন্তু গন্তব্য ষ্টেশন ফস্‌কাইয়া বাহিরে ভয়ে বাহির হইতে এখনও চোখ ফিরাইতে ভরসা পায় না। মহালক্ষ্মীর রেস কোর্স, মালাবার হিলের অভিজাত পল্লী, প্যারেলের মিল ও মজুর বসতি, ওরলির সমুদ্রতট, দাদারের ফ্লাওয়ার-মার্কেট এবং মাহিম ও মাটুঙ্গার বাগ-পল্লী সম্বন্ধে সুরেশ্বর ক্রমেই একজন বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠিতেছে। বাড়ি পরিবার ধরণ দেখিয়া ওমরাতি ও মহারাষ্ট্রি মেয়েতে তফাৎ করিতে শিখিয়াছে, এবং আরও কিছুকাল চেষ্টা করিলেই বম্বের কোন্ অক্ষরবিশিষ্ট বাস কোন পথে কোন গন্তব্যস্থলে যায় সেই জটিল বিদ্যার পাস-মার্ক পাইতে পারিবে। পূর্বে কেহ আসিয়া গন্তব্যস্থানের পথ-নির্দেশ জানিতে চাহিলে সুরেশ্বর অজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া মনে মনে সে ব্যক্তির মুণ্ডপাত করিত। এখন শতকরা পঁচিশটা প্রশ্নের জবাব এমনভাবে দিতে পারে যেন বম্বের সকল জায়গাই তাহার নখ-দর্পণে।

—'এটাই কি গেট অব ইণ্ডিয়া?

সুরেশ্বর তাকাইয়া দেখিল, বছর ত্রিশের এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক ও দুটি মহিলা তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রশ্ন শুনিয়া সুরেশ্বর বুঝিল, ইহারাও তাহার স্বগোত্র অর্থাৎ বম্বের নতুন আমদানি। নহিলে গেট অব ইণ্ডিয়ার নীচে দাঁড়াইয়াও ইহাকে সনাক্ত করিতে এমন ভয় পাইবে কেন? এক সপ্তাহ পূর্বে তাহারও এই অবস্থা ছিল। 'এটা কি সমুদ্র?' এই প্রশ্ন যে কাহাকেও করিয়া বসে নাই এজন্য ভূগোলের মাষ্টারমশায় গর্ব বোধ করিতে পারেন। কিন্তু এখন এই আনাড়িসুলভ প্রশ্ন শুনিয়া সুরেশ্বর বেশ কৃপা বোধ করিল। কোথাকার বাঙাল রে, গেট অব ইণ্ডিয়াও চেনে না। ইহার পর তো বেআক্কেলে প্রশ্ন করিয়া বসিবে 'ফোর্ট কোথায়?' বস্তুত ফোর্ট কোথায় তাহা সুরেশ্বরও জানে না, তবে ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস হইতে আরম্ভ করিয়া গেট অব ইণ্ডিয়া পর্যন্ত আশেপাশের সকল অঞ্চলকেই ফোর্ট বলা হয়, এইটুকু শিখিয়াছে। অথচ ফোর্ট বলিতে সে কেল্লাই বুঝে।

সুরেশ্বর গেট অব ইণ্ডিয়া সনাক্ত করিতে তাহাদের সাহায্য করিল।

ভদ্রলোক ঈষৎ খোঁড়া; হাঁটিতে হইলে লাঠির সাহায্য লইতে হয়। তিনি লাঠির উপর ভর করিয়া ঘূর্ণ্যমান রঙ্গমঞ্চের মতো একবার ঘুরিয়া লইলেন এবং শাড়ি-পরা ভদ্রমহিলাটির দিকে চাহিয়া আবিষ্কারের কৃতিত্বে সগর্ব্ব হাসি হাসিলেন। মহিলাটি যে ভদ্রলোকের স্ত্রী ইহা সুরেশ্বর পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিল, এবার নিঃসন্দেহ হইল।

মহিলাটি ট্রেজ-হইসপারের মতো করিয়া কহিলেন, 'ওকে জিজ্ঞাসা করো না, তাজমহল হোটেল কোন্‌টা?'

'ঐ তো ডান দিকে!' সুরেশ্বর পাকা গাইডের মতো করিয়া সরাসরি তাহাকেই কহিল এবং আঙুল নির্দ্দেশ করিয়া দালানটা চিনাইয়া দিল। 'ও-চূড়োতে যে ডোমটা দেখছেন, রাত্রিবেলা আগে ওখানে লাইট-হাউসের মতো চড়া আলো জ্বলত। সমুদ্রের জাহাজগুলি এ-আলো দেখে বন্দর দূর থেকেই টের পেতো বন্দর বন্ধ আর দূরে নয়। কিন্তু ব্ল্যাক-আউটের সময় এই আলো বন্ধ করে দেওয়া হয়।

বস্তুত এই খবরটি সুরেশ্বর মাত্র গত কাল সংগ্রহ করিয়াছিল, কিন্তু সুযোগ পাইয়া ইহা পাকা অঙ্কের বাসিন্দার ভঙ্গিতে আওড়াইয়া দিল।

'কোণারার দিকে কি করে' যেতে হবে?' মহিলাটি এবার তাহাকে সরাসরি প্রশ্ন করিলেন 'ক্যানটনমেন্টে আমার এক পিসতুত ভাই আছে।'

স্পষ্টই বোঝা গেল উনি সুরেশ্বরকে খুব ওয়াকিবহাল ব্যক্তি ঠাওরাইয়াছেন।

'তাজের সামনে দিয়েই চলে যান না। ট্রাংকটা চমৎকার রাস্তা। সমুদ্রমুখী বাড়িগুলো সবই সুন্দর। রেডিয়ো স্টাবের কাছে ডানদিকে মোড় নিয়ে সামান্য এগুলেই কোণারা যাবার বড় রাস্তা। ওখানে বাস ধরতে পারবেন। আপনারা বুঝি এখানে নতুন?'

হাঁ—মহিলাটি ঘাড় নাড়িয়া সশ্রদ্ধভাবে স্বীকার করিলেন।

—তাতে কিছু অসুবিধা হবে না, সুরেশ্বর অভয় দিয়া কহিল, যাকেই জিজ্ঞাসা করবেন, সে-ই যথাসাধ্য সাহায্য করবে। জানা না থাকলে ভুল পথ বলে দিয়ে হয়রাণ করবে না। এটা অঙ্কের বৈশিষ্ট্য।'

এই তত্ত্বটা সুরেশ্বরও প্রথম দিন বম্বে পৌঁছিয়া এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর নিকট পাইয়াছিল এবং ইহার উপর ভরসা করিয়া একাধিক দিন নাকাল হইয়াছে। এখন পরোপকারে উদ্বুদ্ধ হইয়া সেই তত্ত্বটার কথাটি ইহাদের নিকট চালান করিয়া দিল।

লালোয়ার-পরা যে তরুণীটিকে সুরেশ্বর খোঁড়া ভদ্রলোকের বোন এবং তাহার প্রেমকর্ত্রীর বদলে বলিয়া সান্ত্বনা করিয়াছিল, দেখা গেল, সুরেশ্বরের জ্ঞানের বহর দেখিয়া এবার সেও অভিভূত হইয়াছে। সন্তর্পণে রাঙা মুখ বৌদির কানের কাছে লইয়া সে কিস্‌কিস্‌ করিয়া কি কহিল তাহা শোনা গেল না বটে, কিন্তু উহার মুখভাবীয় পরের প্রশ্ন হইতেই উহার মর্ম্ম টের পাওয়া গেল।

—অঙ্কের বিল্ডিংটা ডিয়োগুলি কোন্‌ দিকে? ভদ্রমহিলা সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—এখান থেকে অনেকটা ঘুরে হবে কি?

ঘুর মৈকি? সুরেশ্বর প্রশ্নের কণ্ঠে কহিল, যাদারের নাম শুনেছেন? ওখানের প্রত্যেকটা অলিগলির রাস্তায়ই দু-চারটা করে কিন্ন-কোম্পানী আছে।

ওখানে গেলে কি কিন্নর-ঠাকুরের দেখা পাওয়া যায়? মজুমদিদা আমাদের মনের বেদনাখানা কি ভাবে প্রশ্ন করিলেন।

কিন্নর-ঠাকুরের সুরেশ্বর কোনও দিনই লাভ করিতে পারে না। উহাদের অতিস্ফীত কীর্তি এবং আর ছুটোকেই তার ফাঁকি দিয়া পাওয়া মনে হয়। এই প্রশ্নে কিন্নর-ঠাকুরের উপর তাহার আক্রোশটা যেন নাড়া দিয়া উঠিল।

চেহারার জন্য সুরেশ্বরেরও নাম আছে; ভালো রিপোর্টারের পোষাক-পরিচ্ছদও ভালোই করিতে হয়। যে হলিউডের ঠাকুরদের দেখিয়া এদেশের ঠাকুরেরা দাঁত বাহির করিতে এবং চোখ মারিতে শেখে, সুরেশ্বরও তাহাদের নিকট হইতেই ও-দুটি বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছে। কোনও তরুণীর দর্শনলাভের পর দেড় মিনিটের মধ্যেই কি করিয়া তাহার প্রেমে পড়িতে হয় ও দুমিনিট (বা মুখো কুট কিন্নর) পার হইবার পূর্ব্বে কি করিয়া তাহার সহিত প্রবল মাখামাখি করা যায়, তাহা সে ভালোই জানে (এবং ইহাও জানে বাস্তব জীবনে ইহা পরখ করিতে গেলে মার খাইতে হইবে)! তবে কিন্নর-ঠাকুর তাহার চেয়ে কোন্ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ? জীবিকার্জ্জনের জন্য তাহাকে বুকে বল (কখনও কখনও চুলকানি) বাঁধিতে হয়, সুরেশ্বরকে হয় না, কাজেই কালির আঁচড় কাটিতে হয়। কিন্তু ইহাই কি কোনও তরুণী মেয়ের আগ্রহে এতখানি পার্থক্যের সৃষ্টি করিবে?

—বম্বের কোন্ জায়গায় আর ঠাকুর নেই—সুরেশ্বর একটু ঈর্ষ্যার সঙ্গেই কহিল—পথে ঘাটে, ইরাণী রেস্তর্াঁতে, বাস-এর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে-থাকা 'কিউ'-তে, ইলেকট্রিক ট্রেণের পাদানিতে ঠাকুরেরা গিস্‌গিস্ করছে। আপনার পাশের লোকটাই যে একটা ঠাকুর নয় তাই বা কি করে বলবেন? বলিয়া সে তিক্ততা হ্রাসের জন্য হাসিয়া ফেলিল।

তাহার তিক্ততা উহাদের স্পর্শ করিল না; ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ এবং ভগ্নী সকলেই চকিতে আশেপাশে তাকাইয়া দেখিল। বম্বের কিন্নর দেখিয়া উহারা বম্বের আকাশটাকেই চিত্র-শগন বলিয়া কল্পনা করিতে শিখিয়াছে। সুরেশ্বরের কাছ হইতে ইহার সমর্থন লাভ করিয়া নিকটবর্ত্তী সকল সম্ভাব্য ব্যক্তির দিকেই তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। গেট অব ইণ্ডিয়ার অলস-ভ্রমণকারী, বেকার বেঞ্চ-দখলিকার ও 'নারিকেল' বা নারিকেলওয়ালার খদ্দেরদের প্রতি একে একে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া অবশেষে তরুণী আড়চোখে একবার সুরেশ্বরকেও লক্ষ্য করিয়া দেখিল। এই সরেজমিন তদন্তের আশুফল হিসাবে বৌদি ও ননদ দুজনেই দূরে সরিয়া গিয়া নিজেদের মধ্যে নিম্নস্বরে কি পরামর্শ করিতে লাগিল, এবং বার কয়েক উহারই সুরেশ্বরের দিকে সন্দিহান চোখে তাকাইবার পর বৌদিটি ইঙ্গিতে তাহার স্বামীকে কাছে ডাকিলেন। ভদ্রলোক খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গিয়া আপন পরিবারের সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং কিছুক্ষণ পরামর্শের পর তিনিও সুরেশ্বরের দিকে বার বার তাকাইতে আরম্ভ করিলেন। সুরেশ্বর কড়ই ঘাবড়াইয়া গেল। উহারা কি সহসা তাহাকে গুণ্ডা-বদ্‌মাশ ঠাওরাইতে শুরু করিয়াছে? তাহার বিবৃতি ও বর্ণনার মধ্যে প্রবঞ্চনার সুর শুনিতে পাইয়াছে? তাহার পরোপকার-প্রবৃত্তিটাকে উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছে? রিপোর্টার সুরেশ্বর অন্যের ব্যাপারে নজর দিতে অভ্যস্ত; কিন্তু অন্যে তাহার

প্রতি নজর দিলে সে স্বভাবতই ঘাবড়াইয়া পড়ে। সুন্দরী মেয়েদের কটাক্ষ লোভনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা এমন সন্দেহে ভরিয়া নিক্ষেপ করিতে থাকিলে কোন কবিই তাহা অধিকক্ষণ সহ্য করিতে পারিত না। সুরেশ্বর সহসা হাতের ঘড়িটা দেখিয়া সময় লক্ষ্য করিয়া লেখিয়া উঠিবার ভাণ করিল, এবং হঠাৎ যেন একটা জরুরি প্রয়োজনের কথা মনে পড়িয়াছে, এমনি ভঙ্গি করিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল।

—শুনছেন?

পিছনে ঈষৎ ফিরিয়া তাকাইয়া সুরেশ্বর লাভের দেখিল, খোঁড়া ভদ্রলোক আশ্চর্য্য তৎপরতার সঙ্গে ছুটিয়া আসিতেছেন। তিনি যে এমন দ্রুত ছুটিতে পারিবেন, ইহা সুরেশ্বরের কল্পনাতীত ছিল। তবে কি তাহার খোঁড়াইয়া চলাটা খঞ্জত্বের দরুণ নয়, উহা একটি কষ্টার্জ্জিত ষ্টাইল?

শুনছেন, একটু দাঁড়ান। একটু অপেক্ষা করুন।

কি ব্যাপার? সুরেশ্বর দাঁড়াইয়া পড়িয়া একটু সন্দেহের সহিত কহিল।

—দয়া করে একটা স্বাক্ষর দিন, ভদ্রলোক হাঁফাইতে হাঁফাইতে ছুটিয়া আসিয়া চাদরের বাঁধান একটা 'অটোগ্রাফ'-খাতা সম্মুখে বাড়াইয়া দিয়া কহিল, আমরা আপনাকে প্রথমে চিনতেই পারিনি। আমার বোন শৈলাই প্রথম চিনেছে। সেই তার 'ভাবীকে' ডেকে বললে, দেখ তো, ইনিই বিখ্যাত ফিল্ম-ষ্টার বরুণ মোদী না? তখন আমার স্ত্রীও চিনলেন, আমাকে ডেকেও চেনালেন। ব্যাপারটা সত্যই আশ্চর্য্য জায়গা। নইলে এমন অদ্ভুতভাবে আপনার মতো ষ্টারের সঙ্গে দেখা হয়! আমার বোনের খাতায় একটা স্বাক্ষর না করে দিয়ে আর আপনার উপায় নেই। ওর সিনেমার ব্যতিক আমার বাতিককে পর্য্যন্ত ছাড়িয়ে গেছে। ষ্টারদের নাম, ধাম, গোত্র, উচ্চতা, চুল ও চোখের রং, বিবাহিত অথবা অবিবাহিত, চা অথবা কফি পছন্দ করেন, এমন কি প্রত্যেকের মুদ্রাদোষের খবর পর্য্যন্ত ওর জানা। এজন্যই এমন চট করে আপনাকে চিনতে পেরেছে। অবশ্য আপনি নিজেও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন; বলেছিলেন, আপনার পাশের লোকটাই যে ষ্টার না, তাই বা কি করে বলবেন? এই নিন কলম। স্বাক্ষরের সঙ্গে যদি দুটো লাইনও লিখে দেন, তবে মেয়েরা আরও খুসি হবে।

আচ্ছা ফিল্ম ম্যান তো! নোংরা দৃষ্টিতে দেখে সুরেশ্বরকেই ইহারা ফিল্ম-ষ্টার বানাইয়া ছাড়িয়াছে! বরুণ মোদীকে সে জীবনে কখনও দেখে নাই, তবে খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের দৌলতে তাহার নামটা শুনিয়াছে। ইহার সহিত কোন অত্যাশ্চর্য্যরূপে তাহার চেহারার সাদৃশ্য দেখা গেল, ভগবান জানেন, কিন্তু এই সাদৃশ্য লইয়া সুরেশ্বর কি করিবে, বুঝিতেই পারিল না। ঘুরে চাহিয়া দেখিল, তরুণী শৈলা সমস্ত সগর্ব্ব মুগ্ধদৃষ্টিতে বরুণ মোদীর দিকে চাহিয়া আছে, যেন জগতের সপ্ত আশ্চর্য্যের অন্যতম একটি আশ্চর্য্য হাঁটিয়া আসিয়া তাহার আবাসের তলায় একমাত্র তাহার মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যেই উপস্থিত হইয়াছে।

সুরেশ্বর এইবার মনে মনে ভাবিল: কেন বেচারীকে হতাশ করি। বাস্তবের চেয়ে যে ছায়ার প্রতিই সমধিক, প্রকৃতি হইতেই যে ভালবাসে, আর্ক-ল্যাম্প ও মেক-আপের ঔজ্জ্বল্যকেই যে গৌরব দীপ্তি মনে করিয়া থাকে, তাহাকে মেকী জিনিষ দিয়াই সন্তুষ্ট করি না কেন? সামান্য একটা স্বাক্ষর করিয়া যদি তাহাকে

ধন্ত করিতে পারি, তবে আপত্তি কি? এক মিনিটের জন্ত ধৈর্যশীলা সাজিয়া পরের মুহূর্তেই "কাট" করিয়া দৃশ্যের (এবং দৃষ্টির) বাহির হইয়া পড়িতে পারিব; তারপর শত খুঁজিলেও ইহারা আর আমার টিকিরও দেখা পাইবে না. উহার মতো আমি চিত্র-গগন হইতে চিরতরে খসিয়া পড়িব।

'শেষ করেছে! আপনারাও টের পেয়েছেন!' সহসা সুরেশ্বর আর্তস্বরের ভান করিয়া কহিল। 'কিন্তু চুপ। এখানের আর কেউ যেন না জানতে পারে। তবে এক্ষুনি একটা মারামারি কাড়াকাড়ি প'ড়ে যাবে। আশেপাশের সব লোক ভিড় ক'রে এসে আমাকে পিষে মেরে ফেলবে। দিন আপনার বোনের অটোগ্রাফ-খাতা। নামটা সই ক'রে দিচ্ছি। কিন্তু সর্ত এই যে, আমি দৃষ্টির বাইরে চ'লে না যাওয়া পর্যন্ত এ-খবরটা আর কাউকে জানাতে পারবেন না। জনপ্রিয়তা যে কি ভয়ঙ্কর জিনিস, আপনারা তা জানেন না। অথচ প্রত্যহ আমাদের এর ধকল সেমে উঠতে হয়; বাজার বেরুতে ভয় পাই। তাড়াতাড়িতে কোনও বাপ্পীই মনে আসছেনা। শুধু নামটাই লিখে দিলাম।'

'তাতেই হবে, মিঃ বোধী। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।' ভদ্রলোক মৃদুকণ্ঠে বলিলেন। 'আমার নাম, নিরঞ্জন শর্মা'। আমরা পাঞ্জাবের বইস্-পরিবার; মুম্বিয়ানাতে যাদেরই আমার নাম জিজ্ঞেস করবেন, সেই বলে দেবে। যদি কখনও যান—'

'ধন্যবাদ! মনে থাকবে।' সুরেশ্বর যাইবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া কহিল। 'মিসেস শর্মা আর শ্যালাদেবীকে আমার নমস্কার জানাবেন। আমার অভিনয় অন্তের ভালো লাগে, আর্টিষ্টের পক্ষে এটা আনন্দের কথা। ...কিন্তু আর দেরি করার উপায় নেই। আমার গাড়িটাকে ঠিক সাড়ে দশটায় 'রিগেল' সিনেমার সামনে উপস্থিত থাকতে বলেছি।' বলিয়া যোড়হাতে একটু বেশি আড়ম্বর পূর্ণ নমস্কার করিয়া সুরেশ্বর রওনা হইয়া পড়িল। এমন বিখ্যাত একজন সিনেমা-ষ্টার পাছে হাঁটিয়া যাইবে, এই অসঙ্গতি দূর করিবার উদ্দেশ্যেই গাড়িটা আমদানি করিয়াছিল, নচেৎ অনাবশ্যক মিথ্যা কথা বাড়ান তাহার অভিপ্রায় নহে। শতকরা পঁচিশ ভাগের বেশি অতিরঞ্জন সে তাহার রিপোর্টেও করে না।

জনতার মধ্যে একটা নির্জনতা আছে বলিয়া কবি এবং দার্শনিকরা মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। একদিক দিয়া ইহা সুরেশ্বরের মতো গল্পময় ও অদার্শনিক রিপোর্টারের কাছেও সত্য বলিয়া মনে হইয়াছে। বড় সহরে টাকা ধার করিয়া বা দোকান হইতে জিনিষ বাকিতে ক্রয় করিয়া বহুদিন পর্যন্ত যেমন নিরাপদে গা-ঢাকা দিয়া থাকা সম্ভব, এমন আর কোথাও নহে। উত্তমর্ণ এড়াইবার পক্ষে জনতার ভিড়ই সবচেয়ে কার্যকরী। কিন্তু এই ভিড়ও সুরেশ্বরকে রক্ষা করিতে পারিল না। যুদ্ধের কল্যাণে বম্বের লোক সংখ্যা বাড়িয়া নাকি প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। কিন্তু এই লোক-বৃদ্ধি সত্ত্বেও যে একই গোঁড়া ভদ্রলোক ও তাহার পরিবারের দুইটি মহিলাকে আবার দেখিতে হইবে, ইহা সুরেশ্বর ভাবিতে পারে নাই।

রবেল অপেরা হাউসে সকাল সাড়ে নটার খিয়েটার দেখিতে গিয়াছে। অপেরা হাউস নতুন কালের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া নাটকের বদলে সিনেমা পরিবেশন করিয়া থাকে; দৌভাগ্যক্রমে এক

সম্প্রদায় সপ্তাহের কোনও কোনও দিন ষ্টেজ ভাড়া লইয়া এখানে সকালবেলায় চিত্রপ্রদানী নাটক দেখাইয়া থাকেন। সম্প্রতি এইরূপ একটি নাটক অভূতপূর্ব্ব জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে; এবং সুরেশ্বরের ন্যায় অধিবাসীদিগকে পর্য্যন্ত আকৃষ্ট করিয়া ছাড়িয়াছে।

তাহার টিকিট পূর্ব্বেই কেনা থাকায় সে কৌতূহলের সহিত টিকিটপ্রার্থীদের 'কিউ' লক্ষ্য করিতেছিল। উত্তেজনার 'কিউ' ও কলিকাতার 'কিউ' সম্বন্ধে তুলনামূলক এক রিপোর্ট মাথিল করা। এমন সময় 'হুইস' করিয়া একটা মোটর তাহার ঠিক খানিক দূরে আসিয়া সজোরে ব্রেক কষিয়া ফেলিল। সুরেশ্বরের শরীরের ধমনির ও শিরার প্রত্যেকটি সায়ুগুলি চমকাইয়া উঠিল; পৃথিবী অন্ধকার বলে হইল। কিন্তু অচিরেই পৃথিবী আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; দেখিল, গাড়ির দরজা খুলিয়া অপূর্ব্ব-প্রসাধনময়ী, চোখ-ঝলসানো শাড়ি-পোষিতা, রঙিন-মলাটযুক্তা একজন অনিন্দিষ্ট বয়স্কা যুবতী বাহির হইয়া আসিলেন এবং সুরেশ্বরের প্রতি এক সেকেণ্ডকাল নীরব তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া গটগট করিয়া সিঁড়ির দিকে আগাইয়া গেলেন।

কে রে বাবা? চাপা দিবার উপক্রম করিয়া আবার চোখ-রাঙানি! হবে তো ইনি একজন কেউ কেটা না হইয়া যান না। সুরেশ্বর বিরক্তিতে নাক কুঁচকাইল। পিছনে পিছনে গিয়া ত্রুটি-স্বীকার করিয়া বলিবে কি, আরেকটু হইলেই আপনার গাড়ীটাকে জখম করিতাম, এজন্য বড়ই লজ্জিত হইয়া আছি। কিন্তু তিনি অবিলম্বে প্রেক্ষাগৃহের গহ্বরে অদৃশ্য হওয়ায় সে সুযোগ হইল না। হতাশ হইয়া পিছনে চাহিয়া কিন্তু সে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। দেখিল, ভিড়ের প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তির দৃষ্টি একবার প্রেক্ষাগৃহের প্রবেশ-দ্বারের দিকে ও একবার তাহার দিকে যাকুর মতো ঘাতায়াত করিতেছে।

ইতিপূর্ব্বেই একাধিক যুবকের গলা হইতে বিষুক্ত বিদ্রূপোক্তি তাহার কানে আসিয়াছিল: শান্তিবাঈ ফাড়্‌কে! শান্তিবাঈ ফাড়্‌কে! তবে এ মেয়েটাই শান্তি ফাড়্‌কে! সিনেমা ষ্টার! অকস্মাৎ সিনেমা-ষ্টার ফাড়্‌কের প্রতি সুরেশ্বরের স্বাভাবিক আক্রোশটা উদ্যত হইয়া উঠিল। ইহার সুন্দর মুখ দেখিয়া একটু পূর্ব্বে মোটর-চাপা পড়িবার উপক্রম হওয়া সত্ত্বেও সুরেশ্বর তাহাকে ক্ষমা করিয়াছিল। এইবার তাহার পরিচয় জানিয়া উহার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য মনে হইল। তাহার বিরক্ত দৃষ্টির বিনিময়ে সে নিজেও ক্রোধরক্ত দৃষ্টি হানে নাই কেন, এ জন্য আফসোস করিতে লাগিল। সুরেশ্বর স্থির করিল, অডিটরিয়মের অভ্যন্তরে তাহার সহিত দেখা হইলেই আকার-ইঙ্গিতে তীব্র বিরাগ জানাইয়া ছাড়িবে।

ইতিমধ্যেই বেল্ শুরু হইয়াছিল। ক্রোধ মুলতুবি রাখিয়া পিছনের লোকগুলির ফিস্‌ফিসানিতে কান না দিয়া, সুরেশ্বর অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করিল এবং প্রবেশ-দ্বারের দিকে আগাইয়া গেল।

মেয়ে সিনেমা-ষ্টারেরা যে অবিশ্বাস্য পারিশ্রমিক পাইয়া থাকে, তাহা আংশিক ভাবে তাহাদের নির্লজ্জতার মূল্য ও আংশিক ভাবে প্রডিউসারদের পুরুষীয় বিহ্বলতার ফল, সুরেশ্বরের ইহাই বিশ্বাস। পুরুষ ষ্টারেরা অপেক্ষাকৃত কম টাকা পাইয়া থাকে বলিয়া তাহাদের উপর সুরেশ্বরের রাগটা কম; বিশেষতঃ কোনও স্বাভাবিক সুস্থ পুরুষের পক্ষে অন্যের হুকুম মত উঠ-বস করা কত কঠিন এবং কখন, তাহা বিবেচনা করিয়া বেচারিদের কষ্টার্জ্জিত পারিশ্রমিককে বেশ অন্যায় মাত্রায়ীন মনে করে না। কিন্তু সাধারণ যে কোনও

মেয়েমানুষ মাত্র তাহার দৈহিক আকর্ষণের সম্পর্কে ভাবিয়া আসিতেছে। তাহার প্রতি পুরুষের চক্ষে ও মনে যে-দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিবে ইহা তাহার নিকট অসহ্য বোধ হয়। এই কাপালো জনপ্রিয়তার মধ্যেও কি শান্তিবাঈ কাড্‌কে তাহার কাছে ত্রুটি-স্বীকার করা দূরে থাকুক, রাগ দেখাইয়া চলিয়া গেল না? শান্তিবাঈ কাড্‌কের মনকষ্ট শান্তিতে নাটক দেখা সুরেশ্বরের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে। দুই চোখে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ঘনাইয়া সুরেশ্বর প্রথম বিরতির অপেক্ষা করিতে লাগিল; যবনিকের মধ্য হইতে শান্তি কাড্‌কেকে আবিষ্কার করিয়া তাহাকে প্রথম সুযোগেই ভস্ম করিয়া ফেলিবে।

ইন্টারভ্যালের যবনিকা পড়িবার সঙ্গে-সঙ্গেই দূরীটা সে পংক্তির শেষ প্রান্তে পাঠাইয়া দিয়াছিল; নীচের রঙ্গ অনুসন্ধান করিয়া তাহা ব্যর্থ হইয়া প্রথম পংক্তির প্রথম আসন হইতে অনুসন্ধান সুরু করিল। অর্ধেক আসিবার পূর্বেই কিন্তু সুরেশ্বরের পাশের আসনের ভদ্রমহিলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার একাগ্রতা ভঙ্গ করিয়া দিলেন। এইবার বিরক্ত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া সুরেশ্বর চমকিয়া উঠিল। ইনিই শান্তিবাঈ কাড্‌কে! অন্ধকারে তাহার পাশেই বসিয়া আরামে নাটক উপভোগ করিতেছিলেন সুরেশ্বর তাহার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিটা তাহার উপর ফেলিতে গেল, কিন্তু তার পূর্বেই শান্তিবাঈ কাড্‌কে তাহার বঙ্কিম বেণী চাতুর্যের ঝাঁকা সুরেশ্বরের আসনের দিকে তাগ্‌ করিয়া গট্ গট্ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ক্রোধে হতাশায় সুরেশ্বর বেড়ালি ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। দুঃখ লোক যেমন তৃণ আঁকড়াইয়া ধরে, সে-ও সেইরূপ ভাবে শান্তি বাঈয়ের ছাতা আঁকড়াইয়া ধরিল। অর্থাৎ সজোরে তাহার ছাতাটা ঠেলিয়া দিয়া তখনকার মতো গায়ের ঝাল মিটাইল।

ঠেলাটা একটু হয়তো বেশি জোর হইয়াছিল; ছাতাটা গড়াইয়া মেঝেতে পড়িয়া গেল। সুরেশ্বর প্রায় আনন্দিত বোধ করিল। পরের আসনে অনধিকার প্রবেশ করিলে ইহাই উপযুক্ত শাস্তি। কিন্তু এই আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হইল না। ভদ্রতা নামক বস্তুটি সোনদাস বাঁধাইল। একজন ভদ্রমহিলার (তা না হয় সে ফিল্মস্টারই হইল) অবর্তমানে তাহার ছাতার প্রতি কি এইরূপ দুর্ব্যবহার করা উচিত? এতো প্রায় পিছন হইতে ছোরা মারার মতো। অগত্যা ঝুঁকিয়া পড়িয়া ছাতাটা তুলিয়া সুরেশ্বর তাহাকে শান্তি বাঈয়ের আসনে শোয়াইয়া রাখিয়া রুমালে হাত মুছিয়া ফেলিল।

'ভনচেন, মিঃ মোদী?

গত অর্ধ মিনিটে সুরেশ্বর তাহার অতি কাছাকাছি এই আহ্বান অন্তত বার পাঁচেক শুনিয়াছে এবং ভাবিয়াছে আহূত মোদী মহাশয় সাড়া দিলে তাহার জানটি বাঁচে। এমন সময় কাঁধে হাতের স্পর্শ পাইয়া সুরেশ্বর চমকিয়া পিছনে ফিরিল। দেখিল, ঠিক পিছনের সারিতে তাহার পূর্বপরিচিত মিঃ শর্মা সপরিবারে বসিয়া আছেন, এবং একটি বাহু সুরেশ্বরের স্কন্ধে স্থাপন করিয়াছেন।

'কি খবর?' সুরেশ্বর পরিচিতের হাস্য করিবার প্রচেষ্টা করিয়া কহিল।

উঃ, কতক্ষণ ধরে আপনাকে ডাকছি, কিছুতেই শুনছেন না', মিঃ শর্মা হাসিয়া কহিলেন। 'আমার বোন, অন্ধকারেই বলেছিল, সামনে কে, মিঃ মোদী না? আমরা আলো হওয়ার অপেক্ষা করছিলাম।'

এইবার সুরেশ্বর উপলব্ধি করিল, শুধু মোদী হওয়া সত্ত্বেও 'মিঃ মোদী' ডাকে সাড়া না দেওয়া তাহার পক্ষে কতখানি অস্বাভাবিক হইয়াছে। যেন এই ত্রুটির জন্যই লজ্জিত হইয়া সে তাড়াতাড়ি অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে মিঃ শর্মা, স্ত্রী ও ভগ্নীর দিকে চাহিল। উত্তরেই তাহাকে নমস্কার জানাইল, মিসেস শর্মা পুরাতন পরিচিতের ধরণে, এবং নবম নীলা ভীরু সঙ্কোচের সঙ্গে। অগত্যা মিঃ মোদীও প্রতি-নমস্কার করিলেন এবং চাহিয়া দেখিলেন, আশে-পাশের বহু জোড়া চোখ, এবং বহু ঘাড় তাহার দিকে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। সুরেশ্বর সভয়ে সেদিকে চাহিয়া মিঃ শর্মাকে কহিল, 'আমি বড়ই অন্যমনস্ক ছিলাম বলে আপনার ডাক শুনতে পাইনি।'

'তা তো হবেই', মিঃ শর্মা প্রশ্রয়ের কণ্ঠে কহিলেন। 'আপনার যা অশান্তি চলছে, তাতে অন্যে হলে আরও মুষড়ে পড়ত।'

'অশান্তি!' বিস্মিত হইয়া সুরেশ্বর কহিল।

'আপনার পারিবারিক অশান্তির কথা বলছি,' মিঃ শর্মা কানের কাছে মুখ লইয়া আসিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিলেন। 'নিতান্ত খবরটা কাগজে বেরিয়েছে বলেই বলছি, নইলে আপনাদের দাম্পত্য-ব্যাপারে কিছুতেই নাক গলাতাম না। মাফ্ করবেন, আপনার পাশে যিনি বসেছিলেন, তিনিই তো মিসেস্ মোদী, বিখ্যাত চিত্র-তারকা শান্তিবাঈ ফাড্‌কে? আপনাদের মধ্যে যে বনিবনা হচ্ছে না, তা আমার বোন শীলা মাত্র কাল আমাকে এ সপ্তাহের 'ফিল্ম্-গেজেট' খুলে দেখালে।...শীলা জিজ্ঞেস করছিল, ওর সঙ্গে কি শান্তি দেবীর একটু আলাপ করিয়ে দেবেন?...'

সুরেশ্বর প্রমাদ গণিল। আতঙ্কে কহিল, 'ওরে সর্ব্বনাশ! শান্তি কি সে রকমই মেয়ে। তবে আর আমার সঙ্গে এত সব কাণ্ড হবে কেন? ওর মেজাজই তো অশান্তির...

'ওঃ, তবে ফিল্ম্-ডিরেক্টার গিরিধারী লালকে নিয়ে যে-সব গুজব রটেছে, সে সব বাজে?' মিঃ শর্মা জ্ঞত প্রশ্ন করিলেন।

'গুজব সম্পর্কে আমি কোনও কথা বলতে চাই না।' সুরেশ্বর খুব গম্ভীর স্বরেই কহিল। ভাবটা এই যে, নিজের স্ত্রী সম্পর্কে এ ধরণের আলোচনার সে পক্ষপাতী নয়।

'মেয়েরা বলছেন, মিটিয়ে ফেলুন না আপনাদের কলহটা! আপনাদের ছুটিতে এমন খুঁড়ি যাবার।' মিঃ শর্মা সহানুভূতির সঙ্গে কহিলেন। 'এতক্ষণ দুজনে পাশাপাশি বসে আছেন, অথচ একটা কথা পর্য্যন্ত বলছেন না দেখে শীলার তো চোখে প্রায় জল আসার উপক্রম। কিন্তু উনি চলে যাবার পর ওর ছাতাটা ঘাটিতে পড়ে গেলে যেমন যত্নের সঙ্গে আপনি তা উঠিয়ে রাখলেন, তা থেকেই আপনার প্রকৃত ভালবাসার পরিচয় পাওয়া গেছে। অথচ তারপরই যেমন করে' রুমাল দিয়ে হাত মুছে ফেললেন তা থেকে...'

সুরেশ্বর ঘামিয়া উঠিল। সাক্ষিয়াছে! এই সিনেমা-পাগল পরিবার তাহার অভ্যোষ্টির সকল যোগাড়ই করিয়া রাখিয়াছে। ক্ষীণ প্রাণ-বায়ুটি বাহির হইলেই হয়। সে একবার ভাবিল, কোনও

অনুহাত করিয়া বাহিরে যাইয়া অগত্যা যাত্রা করি। কিন্তু তরসা হইল না। তাহার অবর্তমানে শুভ-মুহূর্ত পাইলে সাবধানবাণী উপেক্ষা করিয়া শান্তিবাঈ কাড্‌কের সহিত আলাপ করিতে অগ্রসর হইবে না, কে বলিতে পারে? সুরেশ্বর উপস্থিত থাকিবে না বটে, কিন্তু ইহার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে তাহা কল্পনা করিয়াও সে শঙ্কিত ও লুক্কিত হইয়া উঠিল। সে স্থির করিল, যত কষ্টকর এবং বিপজ্জনকই হউক, নাটকের শেষ পর্যন্ত সেও নাটক করিয়া যাইবে, এবং দুইপক্ষের সংযোগ আটকাইবে।

অবশিষ্ট দুইঘণ্টা নাটক উপভোগ করা তো দূরের কথা, সুরেশ্বর অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে কাটাইল। যবনিকা পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু পিছনেই শর্মা-পরিবার নাটকীয় ভাবে পরবর্তি ঘটনাবলী লক্ষ্য করিবার জন্য দাঁড়াইয়া থাকায় শান্তি-বাঈকে পরিত্যাগ করিয়া ভিড়ের মধ্যে উধাও হইতে পারিল না। ভিড়ের দেওয়ালের মধ্য দিয়া শান্তিবাঈদের পিছনে পিছনে যখন সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন আর এক বিপদ। কয়েকজন যুবক ইতিমধ্যেই বিখ্যাত চিত্র-তারকা শান্তি বাঈকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছিল, এইবার অনেকজন যুবক সুরেশ্বরকে আক্রমণ করিল। যুদ্ধ-হুঙ্কারের মতো চেঁচাইয়া করিল, 'বরজমোদী'! 'বরজমোদী!' বরজমোদী কোথায় এবং কি করিলেন ভগবান জানেন, সুরেশ্বর ছুটিয়া গিয়া সম্মুখের ট্যাক্সিতে চাপিয়া বসিয়া করিল, 'জলদি চালাও।' একটা ভিড়ের তরঙ্গ বহু-বাহু উদ্যত করিয়া পিছনে ছুটিয়া আসিল; ট্যাক্সি-চালক নিজের ট্যাক্সি বাঁচাইবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বশতঃ মুহূর্ত সময়ক্ষেপ করিল না; ভিড় পৌঁছিবার পূর্বেই একটা ঝাঁকুনি মারিয়া ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিল।

বার্থ জনতা রসভঙ্গটা উপভোগ করিল। তাহারা সহর্ষে চেঁচাইতে লাগিল, 'পালিয়েছে, পালিয়েছে!' এই পলায়নের ফলে তাহাদের আর কোনও সন্দেহ থাকিবে না যে, সুরেশ্বরই তাহাদের প্রিয় অভিনেতা বরজ মোদী। শান্তিবাঈ কাড্‌কের নিকট গিয়া নিশ্চয়ই তাহারা সে-ই বরজ মোদী কিনা, এ প্রশ্ন করিতে সাহস পাইবে না। আর করিলেই বা ক্ষতি-কি। সুরেশ্বর ততক্ষণে পগার পাড় হইয়াছে। অভিনেতার ভূমিকা অভিনয় করিয়া প্রাণ চোরের উপর বাটপাড়ির কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে।

কিন্তু ইহার প্রতিক্রিয়াও শীঘ্রই দেখা দিল। নাটকীয় মুহূর্তে নাটকীয় ঘটনাকে যতটা মূল্যবান মনে হয়, স্বাভাবিক অবস্থায় তাহা হয় না; ন্যায় অন্যায়, সৌজন্য অসৌজন্য, সামাজিক-অসামাজিক প্রভৃতি নানা প্রশ্ন উপস্থিত হইয়া ভদ্র মানুষকে বিব্রত করিয়া তোলে। রিপোর্টার সুরেশ্বরকেও করিল। ধরনের সঙ্গে কিছু ভেজাল চালাইলেও ঠকামি তাহার ব্যবসা নহে; ছায়া-জগতের বাসিন্দাদের প্রতি শর্মা পরিবারের, বিশেষতঃ শর্মামহাশয়ের সুন্দরী ভগ্নীটির, অতি শ্রদ্ধাই তাহাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাদের শ্রদ্ধার বস্তুর সম্পূর্ণ অযোগ্যতা ও অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণ করিবার জন্যই সে গেট অব ইণ্ডিয়ার ছায়ার মতো মোদী সাজিয়াছিল; ইহা তাহার ব্যঙ্গ-মিশ্রিত এক প্রতিবাদ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু ইহার পর ঘটনাচক্রে আবর্তিত হইয়া সে কি সম্পূর্ণ এক ঠক হইয়া উঠে নাই? অপেরা হাউস হইতে অমন ভাবে পলায়নের পর

কে বিশ্বাস করিবে, সুরেশ্বর চেষ্টা করিয়াই জনসাধারণকে প্রতারণা করে নাই? জনপ্রিয়তা লইয়া অন্যায়ভাবে ছিনিমিনি খেলে নাই?

যতই নিজের নাটকীয় আচরণের উত্তাপনা কাটিয়া যাইতে লাগিল, ততই নিজেকে সুরেশ্বরের অপরাধী বোধ হইতে লাগিল। শর্মাপরিবারের মেয়েদের চোখে-মুখে প্রভার যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইতে দেখিয়া আগের দিনও সে মনে-মনে হাসিয়াছে, এখন তাহাই যেন কাঁটা হইয়া তাহার বিবেককে খোঁচা মারিতে লাগিল। মিসেস শর্মার প্রসন্ন হাস্য এবং তাহার ননদের সপ্রশ্ন চোরা-চাহনির কথা যতই মনে পড়িতে লাগিল, ততই নিজেকে তাহার একটা ভয়ঙ্কর প্রবঞ্চক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। প্রতারণা করিয়া যে নারীর শ্রদ্ধা অর্জন করে, একটা রাস্তার জুয়াচোরের সাথে তাহার তফাৎ কোথায়? উহারা যদি অহেতুক ভাবেই কোনও কিম্ভূত-কীর্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, তাহাতে তাহার কি? কেন সুরেশ্বর তাহাদের প্রশংসার বস্তু সাজিয়া তাহাদের ঠকাইতে আসিল?

কিন্তু সময়ের মতো এমন নিরাময়ক আর নাই। সুরেশ্বরের অপরাধী বিবেকও ক্রমে শান্ত হইয়া আসিল। গতস্য শোচনা নাস্তি! ভবিষ্যতে এ ধরণের তামাসা না করিলেই বিপন্ন ভদ্রতা সুস্থ হইয়া উঠিবে। অভিনয়ের ছোঁয়াচ সর্বাংগে এড়াইয়া চলিতে হইবে।

ইহার পরে বোধহয় সপ্তাহ খানেক কাটিয়াছে সুরেশ্বরের বম্বে প্রবাসের মেয়াদ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। দ্রষ্টব্য স্থানের যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহা চেড়াতে ভরিয়া গিয়াছে। সহসা চমকিয়া সভয়ে সে আবিষ্কার করিল, জুহুর সমুদ্রতীরই দেখা হয় নাই। যেন একটা গর্হিত অন্যায় করিয়াছে, এমন মনে হইল। বম্বে আসিয়া জুহু না দেখিলে গৃহে ফিরিয়াছে, ইহা বম্বে বা কলিকাতার কেহই সমর্থন করিবে না। ভাগ্যে ইতিমধ্যে এ-সম্পর্কে কেহ প্রশ্ন করিয়া বসে নাই, নহিলে অপদস্থ হইতে হইত! তাড়াতাড়ি ট্রেশনে গিয়া সুরেশ্বর সান্টা ক্রুজ ট্রেশনের টিকিট কিনিল। সেখান হইতে বাস-এ চাপিয়া বম্বের উপকণ্ঠের এই নিরাতরণ বেলাভূমিতে উপস্থিত হওয়া যায়।

জুহু বম্বেবাসীদের পিকনিকের জায়গা। নারিকেল গাছ-ছাওয়া সমুদ্রতীরে কিছু হোটেল ও বাংলো, তাহার জন্য কিছু পাতার ঘর, একটা বিস্তৃত সৈকত, ইহাই সুবিখ্যাত জুহু।

জুহুর আকর্ষণে বৈকালিক চা না খাইয়াই ছুটিয়া আসিয়াছিল; দেখিল, এই অঞ্চলের পাকদণ্ডী রীতিমত নষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সমুদ্রতীর হইতে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া সে সামনের হোটেলের হাতায় প্রবেশ করিল এবং খোলা আকাশের তলায় বেতের চেয়ারে বসিয়া একাধিক লোক চা এবং তাহার চাইতে আরও উত্তেজক অন্যান্য পানীয় পান করিতেছে দেখিয়া সেদিকেই অগ্রসর হইল।

সেখিরে!

চমকাইয়া সুরেশ্বর তাকাইল। দেখিল, মিসেস্ শর্মা ও তাহার ননদ দুই গ্লাস লেমনেড লইয়া বসিয়া আছেন, এবং তাহাকে দেখিয়া যেন বিস্মিত হইয়া গিয়াছেন।

আইয়ে। হিঁয়াই বৈঠিয়ে। মিসেস শর্মা সদয় মিষ্টকণ্ঠে আত্মীয়জনত আহ্বান করিলেন।

মিঃ শর্মা কোথায়? সুরেশ্বর নিরুপায়ভাবে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল।

'ওরা তিনজনে তিন ঘোড়া নিয়ে বালুর উপর দিয়ে ছুটতে বেরিয়েছেন।' মিসেস শর্মা কহিলেন।

'তিনজন!' সুরেশ্বর একটু বিস্মিত হইয়া কহিল; পূর্বে তাহাদের দলে মেয়েদের লইয়াই সে মোট তিনজন দেখিয়াছে।

'হ্যাঁ'। মিসেস শর্মা কহিলেন, কোলাবা ক্যান্টনমেন্টে আমার এক পিসতুত ভাইয়ের কথা বলেছিলাম না, সে-ও আছে। তাছাড়া তার এক বন্ধুও আছেন। উনি তো কাল আপনার মতো প্রতিভাশালী লোককে না দেখে অস্থির হয়ে উঠেছেন বলিয়া মনটির দিকে ছুট ইঙ্গিত করিয়া খুব টিপিয়া হাসি গোপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

শীলার গৌরবর্ণ মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। টেবিলের আড়ালে হাত বাড়াইয়া সে বৌদির আঙুলে চিমটি কাটিয়া প্রতিবাদ জানাইল; টেবিলের নীচ দিয়াই পা বাড়াইয়া ভুরোতে ঠোকাঠুকি করিল। এবং সুরেশ্বর অকস্মাৎ বিবেকের দংশনে এতটুকু হইয়া গেল। বন্ধুর মোটা দাদিয়া শেষে কি তরুণীর জন্য লইয়াও টানাটানি করিবে? প্রবঞ্চনা করিয়া একটা ট্রাজিডির সৃষ্টি করিবে? ছি, ছি!

দেখুন, সুরেশ্বর গলা সাফ করিয়া মিসেস শর্মার উদ্দেশে কহিল, আমি আপনাদের সঙ্গে একটা বিশ্রী প্রবঞ্চনা করেছি। ফিল্ম-ষ্টারদের প্রতি আপনাদের অহেতুক শ্রদ্ধা দেখেই আমার এই প্রবৃত্তি হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও এখন ভোক্তুরির কোনও কৈফিয়ৎ নেই। আমি মোটেই বন্ধুমোদী নই।

তা আমরা জানি। সমস্বরেই মিসেস শর্মা কহিলেন।

জানেন! এইবার সুরেশ্বর প্রকৃতই চমকাইয়া উঠিয়া আনত-মুখ তুলিয়া সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিল। কি করে জানলেন? কে বললে?

বন্ধুমোদীর সঙ্গে আজ দুপুরে আমরা তাদের ষ্টুডিয়োতে শুটিং দেখতে গিয়েছিলাম, মিসেস শর্মা কহিলেন। তিনি আমার পিসতুত ভাইয়ের বন্ধু। ওরা দুজনও আমাদের সঙ্গে ভুরোতে এসেছেন।

বলেন কি! এইবার তবে আমি পালাই, সুরেশ্বর উঠিবার উপক্রম করিয়া যথাসাধ্য রঙ্গের সুরে কহিল, আমি শুটিং ষ্টার। এক মুহূর্তে চক্‌মকিয়ে উঠে ভস্ম হয়ে গেলাম। এইবার আপনারা উল্কাপাত নক্ষত্রের সন্ধান পেয়েছেন। প্রস্তাবণা মাফ করবেন। নমস্কার। ভাগ্যে রিপোর্টারদের চামড়া মোটা হয়, নইলে ইহার পর আর তাহার গলা দিয়া কথা বাহির হইত না।

বসুন, মিসেস শর্মা তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া কহিলেন। শীলাদেবী বাস্তব ফিল্ম-ষ্টারের পরিচয় পেয়ে হতাশ হয়েছেন। মেক-আপহীন মুখের রুক্ষতা, কথাবার্তায় ফিল্ম-ডায়ালোগের মসৃণতার অনুপস্থিতি, চলন-চালনে ডিরেকটারের নির্দেশের অভাব, রঙের মূলতা এবং নাতকোচিত বুদ্ধির এবং পালিশের অভাবের ফলে পর্দার বাইরের কোন মোদীকে আমাদের শীলাদেবীর পছন্দ হয়নি। তার বরঞ্চ বন্ধুমোদী অভিনেতাকেই কল্পনায় বন্ধুমোদী বলে মনে হচ্ছে···উঃ, এ রকম চিমটি কাটলে ব্যথা লাগে না বুঝি? তবে বলছিলে কেন, এর চেয়ে তো সে-ই ভালো ছিল।

সুরেশ্বর সমস্ত ফিল্ম-ষ্টারদের ক্ষমা করিল।

প্রেত-প্রেমার

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

নীরদকান্তি……ক'দিন শরীর কেমন বেজুত। খিদে নেই···মাথা ধরে' দপদপ করছে···কেমন যেন ক্লান্তি···অবসাদ···অফিসে কাজ করতে করতে চোখের সামনে খাতা-পত্রে লেখা কাপসা হয়ে মিলিয়ে যায়। তার উপর রাত্রে খেয়ে দেয়ে শুতে যাবে মাথা এমন ঘুরে গেল যে খাটের ছৎকীতে লেগে রগটা ফুলে যেন আমড়া-আঁঠি!

স্ত্রী সুরমা মেঝের ধারে ঘুমন্ত ছোট খোকাকে কোলে শুইয়ে দুধ খাওয়াচ্ছিল···ছেলে রেখে ছুটে এলো স্বামীর কাছে। স্বামী তখন রগে হাত চেপে বিছানায় হেলে পড়েছে!

সুরমা বললে,—কি হলো গো?

নীরদকান্তি বললে—মাথাটা কেমন ঘুরে গেল হঠাৎ···

সুরমা বললে,—দেখি···

রগে ফুলো দেখে সুরমা আঁৎকে উঠলো··বললে,—আলিকা নিয়ে আসি···চলে আলিকা দিয়ে পটী ভিজিয়ে দি···না হলে ব্যথা না যাবে!

পরিচর্য্যা শেষ করে' সুরমা উজাড় করে' দিলে তার বুকের পসরা:··কি-রূপেই যে দুজনে দেখা হয়েছিল! একমিনিট শান্তি পেলুম না! কেদিন থেকে সেই এ-বাড়ীতে মাথা গলিয়েছি

গজগজ করতে করতে খোঁচা দিয়ে ছোট খোঁকার কুম্ভকর্ণ ঘুম ভাঙিয়ে তাকে দুধ গিলিয়ে বিছানায় ফেলে সুরমা আবার এসে দাঁড়ালো স্বামী নীরদকান্তির কাছে···বললে,—হঠাৎ মাথা ঘুরলো যে?

নীরদকান্তি বললে—বলছি তো, ক'দিন ভয়ানক কনষ্টিপেশন···তোমরই মাথা ধরছে···কাজে কেমন গা লাগে না! অথচ···

স্বামীর পানে ক্ষণেক-অবিচল দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে সুরমা নিশ্বাস ফেললে···আতঙ্কে বুকখানা ছমছম্ করছে। নিশ্বাস ফেলে সে বললে—শরীরের উপর অত্যাচার তো কম করোনি!···তা যাক, শোনো আমার কথা···কাল সব কাজ ফেলে যাও ডাক্তারের কাছে। না যাও, তোমার ঘর-সংসার নিয়ে তুমি থেকো··· আমার যেদিকে চোখ যায়, চলে যাবো!

বলতে বলতে সারা জীবনের দুঃখ-দুশ্চিন্তাগুলো সরীসৃপের মতো মনের মধ্যে কিলবিল্ করে' উঠলো! সুরমা বললে,—কবে আমাকে একটু সুখী করেছো, বলতে পারো? নিজে সুস্থ থেকে একটুখানি সোয়াস্তি দেছে, তাও সহ্য হয় না···কি এমন অন্যায় করেছি তোমার সঙ্গে? বাসুকির মতো এই যে তোমার সংসারখানা মাথায় করে' রেখেছি!···তা'ও বলতুম যে হাঁ, দু'হাতে তোমার সর্ব্বস্ব লুটিয়ে দিচ্ছি···কিম্বা

একালের আর পাঁচজনের মতো রোজ রোজ সিনেমা দেখতে যাচ্ছি!···আমার কি দিয়েছো বলতে পারো··· আমায় এখানে এনে ইস্তক? আমার জন্ত কি তুমি করেছো?

নীরদকান্তি চুপ···কোনো জবাব নেই। কথাগুলো শুনতে লাগলো নিঃশব্দে···শুনে একটা নিশ্বাস ফেললো···বেশ বড় নিশ্বাস!

সুরমার মনে জাগলো মমতা···তাহার হোক স্ত্রী! সুরমা বললে—কোনো ওজর আমি শুনবো না··· বলো আমার গা ছুঁয়ে—যাবে কাল ডাক্তারের কাছে···তোমার ঐ হোমিওপ্যাথিক নটবর দাস্তালের কাছে নয়···স্পেশ্যাল-কেসের ডাক্তার—সকলে বলে, ধন্বন্তরী···হেমন্ত মুখুয্যে···রাসবিহারী এভেন্যুতে···পার্কের একটু পূব-দিকে তাঁর চেম্বার···বলো!

নীরদকান্তি বললে—জানো তাঁর ফীয়ের রেট?

—জানি। বাড়ীতে আসলে বত্রিশ টাকা···আর তাঁর চেম্বারে গিয়ে দেখালে নেন ষোল!

নীরদকান্তি বললে,—কোথায় কি অসুখ, ঠিক নেই···শুধু শুধু ষোলটা টাকা জলে দেবো?

সুরমা বললে—হ্যাঁ, দেবে! কোন্ খরচটা তোমার বাঁচছে শুনি?···বেশ, ফীয়ের টাকা তোমায় দিতে হবে না···আমি দেবো।·· বলো তোমার কি অসুখ!···এই যে আজ একটা, কুড়ি একটা···নিত্য কোনো-না-কোনো উপসর্গ চলেছে!···ভেবেছ কি, রোগে চুপে চুপে একদিন আমাদের পথে বসিয়ে চলে যাবে!

এ-কথায় নীরদকান্তির বুকখানা ধক্ করে' উঠলো! ঠিক এ ভয় তারো মনে মাঝে মাঝে জাগে ···স্ত্রী সুরমা···তিনটি ছেলে···দুই মেয়ে। বড় ছেলে জলদের এই খার্ড-ইয়ার···নেক্সো মেবে ম্যাট্রিক···বড় মেয়ে বিরণের বয়স চলো পনেরো বছর···বিয়ে দিতে হবে তার! রোজগার সে করছে সত্যি···সৌখিন কারবার···রাধাবাজারে কাঁচের আর চীনামাটীর বাসনের কারবার! এক কালে উড়নচণ্ডীর দলে ভিড়ে বহু পয়সা অপব্যয় করেছে···এ্যাসেটার বিয়েটার···রেসের মাঠ···মুইজিং ক্লাব···বাড়ি বসে হরেক-রকমের তাস খেলা···শেয়ার মার্কেট···তারপর এই সব ছেলেমেয়ে ভাগর হয়ে উঠলো! ছোট খোকা হবার সময় সুরমাকে নিয়ে ধমের দক্ষে যুদ্ধ—টাকার দাম তালো করে' বুঝে নীরদকান্তি সেদিন থেকে হুঁশিয়ার হয়েছে···আড্ডার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে কারবারে মন দেছে! নিজেকে সংযত করেছে। সন্ধ্যার পর দোকানের কাজ চুকিয়ে দোতা এখন বাড়ী ফেরে···ডোমাইল্ ফ্যামিলি-ম্যান! জীবনের গ্রন্থে নতুন পাতা উল্টে বসেছে!

সুরমা বললে,—ভাবছো কি? বলো যাবে কাল ঠিক ডাক্তার মুখার্জীর কাছে?

—হেমন্ত মুখার্জী?

—হ্যাঁ। তাঁকে সব কথা খুলে বলবে···কোনো-কিছু লুকোবে না! তারপর তিনি যেমন-যা ব্যবস্থা করেন—অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবে!

নীরদকান্তি নিরুত্তরে চেয়ে রইলো খানিকক্ষণ সুরমার মুখের পানে! সুরমার চোখের দৃষ্টিতে ঐ যে উদ্বেগ···উৎকণ্ঠা···ও যে সব যাতনার উপর প্রলেপ বুলিয়ে যায়!

সুরমা বললে—এত কি ভাবছো আমার পানে চেয়ে, শুনি! না—বলো···না হলে আমি মাথা-মুণ্ড খুঁড়ে মরবো!

নীরদকান্তির কি মনে হলো! সে বললে—যদি না যাই?

সুরমা ফোঁস করে' উঠলো! বললে,—না যাও, পরশু আমি ডাক্তার মুখার্জীকে বাড়ীতে ডেকে আনাবো। তখন ষোল টাকার জায়গায় তোমাকে বত্রিশ টাকা দিতে হবে।

নীরদকান্তি বললে—না, না, আমি যাবো!···সত্যিই তোমাদের দারিদ্র আমার হাতে···ডিউটি···আর ভাবো, আমি ডিউটি করবো না?

—বেশ,···তাহলে এই কথা পাকা! কোনোমতে নড়চড় হবে না!

—না—না—না!

পরের দিন। বাসবিহারী এভেন্যুর শেষ মুখার্জীর চেম্বার। কটকে পেতলের ফলকে লেখা নামের সঙ্গে আঁটা ইংরেজী এ্যালফেবেটের প্রায় ছাব্বিশটা অক্ষর···তাগাতাগি করে' কটা অক্ষরের পর লণ্ডন, বার্লিন, প্যারি, মাদাচুসেটস্···প্রায় গোটা পৃথিবীখানা! চেম্বারে রোগী দেখেন সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত্রি নটা পর্য্যন্ত···আধা-দর্শনী ষোলটি মাত্র টাকা নিয়ে!

সাড়ে ছটায় নীরদকান্তি এলো ডাক্তারের চেম্বারে···পাগড়ি-পরা বেয়ারা এগিয়ে দিলে সাদা স্লিপ আর একটা ছোট পেন্সিল। স্লিপে নীরদকান্তি লিখলো নাম···বেয়ারা তাকে এনে বসালো ওয়েটিং-রুমে··· বসিয়ে সে গিয়ে ঢুকলো ডাক্তারের পাশ কামরায়।

ওয়েটিং-রুমে গোল একখানা টেবিল ঘিরে আরো পাঁচ সাতজন ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন···সবে গম্ভীর মূর্ত্তি···যেন ডাক্তারের মুখে পরমায়ু সম্বন্ধে কি-সংবাদ শুনবেন,—তারি আশায় নিস্পন্দ!

টেবিলের উপর রাশিকৃত বাজে ম্যাগাজিন···মোটর গাড়ীর ক্যাটালগ থেকে সুরু ক'রে তিন-বছর আগেকার ব্যাক-ডেটেড ইলাস্ট্রেটেড উইক্‌লী···পাতা উল্‌টানো ছাড়া এ-সব কেতাব নিয়ে আর কিছু করা চলে না!

অগত্যা নীরদকান্তি ঐ সব কেতাবের পাতা উল্‌টোতে লাগলো।

ঘণ্টা খানেক পরে বেয়ারা এসে জানালো—আসুন···নীরদকান্তি ঢুকলো ডাক্তারের কামরায়।

পাঁচ-সাতটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর! তারপর ডাক্তার একটা বাক্স খুললেন। বাক্স থেকে এটা-ওটা টেনে চওড়া একটা রবারের ব্যাণ্ড বার করে নীরদকান্তির হাতে টাইট করে' এঁটে জড়িয়ে দিলেন···দিয়ে বাক্সর-আঁটা হাপরের মত কি একটা টিপতে লাগলেন। টেপার সঙ্গে সঙ্গে নীরদকান্তির মনে হচ্ছিল, হাত-খানা বুঝি তার মুচড়ে ভেঙে যাবে!

পাঁচ মিনিট···সাত মিনিট···দশ মিনিট···ডাক্তারের হাতের চাপে···সরু একটা কাঁচের নল···যেন রক্ত একটা থার্মোমীটার···সেই নলের মধ্যে লাল রঙের যেন জমাট লাইন! ডাক্তারের হাতের চাপে সেই লাল

সাইরনটা সাপের জিভের মতো লক্‌লক্ করে' একবার উঠছে নীলের ভগায় পরক্ষণে নেমে তলিয়ে চলেছে!

প্রায় পনেরো মিনিট কাটলো! তারপর ডাক্তার একটা নিশ্বাস ফেললেন···ফেলে নীরদকান্তির হাতের বাঁধন খুলে বাহু নড়িয়ে রেখে বললেন,—বয়স কত হলো?

নীরদকান্তি বললে,—সাতচল্লিশ।

—হুঁ···বেশ হাই-প্রেশার! প্রেসক্রিপশন দিচ্ছি···ওষুধ···তার ওপর ডাই ডায়েট সম্বন্ধে বিশেষ কড়াকড়ি···কোয়ানটিটি কম···ব্রেক দিতে। আপনার জেনারেল হেল্‌থ্ মন্দ নয়···তবে সাবধান—হেট্ নিতে হবে···মাথা খাটানো নয়···পরিশ্রম নয়···নো ওরি—নো এক্‌সাইটমেণ্ট···নো শক্···অর্থাৎ কোনো কিছুতে এতটুকু উত্তেজনা নয়!···মানে, যদি কিছুকাল বাঁচতে চান!···একটা ওষুধ আছে···ইন্‌জেক্‌শন্···আপনার ফ্যামিলি-ডক্টরকে দিয়েই ইন্‌জেক্‌শন্ চলবে!···

প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনের কাগজ-পত্র নিয়ে ষোল টাকা কী দিয়ে নীরদকান্তি বেরুলো···ডাক্তার বলে দিলেন,—সামনের হপ্তায় এমনি সময়ে আবার আসবেন···মানে, দিস্ ডে উইক্!

ডক্টর মুখার্জী টেবিলে ঘণ্টা টিপলেন—এলো সেই বেয়ারা···একখানা স্লিপ হাতে তুলে দেখে ডক্টর মুখার্জী বললেন,—ভগবন্ত ছাড়ুয়া···বোলাও!

নীরদকান্তি এলো বাইরে পথে···মাথার-কপালে বিন্-বিন্ করে ঘাম ছুটে বেরিয়েছে···কেমন, যেন অবসাদ···শ্রান্তি! বাইরের খোলা বাতাসে একটু আরাম মিললো! মনের মধ্যে বাজের মতো বাজতে লাগলো ···ব্লড্-প্রেশার! ব্লড-প্রেশার! তার মানে, জীবনের বাকী দিনগুলো মেপে-গুণে নির্দ্ধারিত হয়ে গেছে! পথের দু'ধারে গাছের বাতি···মনে হলো, দারুণ দুঃখে তার পানে চেয়ে আছে ঘোলাটে চোখে! এ-পথে কত দিন চলেছে···দু'পাশে এই সব বাড়ী-ঘর···ঐ পেট্রোল পাম্প···চায়ের দোকান···বেস্তরাঁ···এ-সব এমনি থাকবে···শুধু এদের কাছ থেকে সরে ছিটকে নীরদকান্তি কোথায় যাবে চলে!

একটা বড় নিশ্বাস···কোনোমতে সে রুখতে পারলো না! মনে হলো সুরমা···ছেলেমেয়ে···বাড়ী ফিরে কোন্ মুখে তাদের বলবে,···তার ফাঁসির হুকুম হয়েছে! সুরমা সেদিন বলছিল,—যাই বলো, বি-এ পাশ করলেই অলকের বিয়ে দেবো আমি!···তোমাদের বাড়ীর কোনো বৌ শ্বশুর-শাশুড়ীকে খায়নি!···এ-কথা সুরমা কেন বললে? যা ঘটবে, তারি পূর্ব্বাভাস?···কিন্তু ছেলের বিয়ে পরের কথা! নীরদকান্তি এখন মারা গেলে সংসারটা কি করে' দাঁড়িয়ে থাকবে? কারবারের কি বোঝে ছেলেরা? অলক পাশ করলে তাকে দোকানে নিয়ে যাবে···দোকানের কাজ শেখাবে···ভেবে রেখেছে! তার কিছু হবে না?

এমনি নানা চিন্তা মাথার মধ্যে মৌমাছিদের মতো ভন্‌ভন্ করছে···নীরদকান্তি চলেছে···বিশ্রান্তের মতো! ···হঠাৎ চোখে পড়লো, পার্ক···দেশপ্রিয় পার্ক! চাঁদের অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় পার্কও আজ মলিন, ম্লান!···

লোকজনের কলরব নেই!···নিশ্বাস ফেলে নীরদকান্তি চুকলো পার্কে। একটা থেকে বললো ··ওদিককার কোন্ বাড়ীতে রেডিয়ো ছিল খোলা। গান বাজছিল···রেকর্ডের গান···কাণা কেষ্টর গান:

কাহ্নে পাখী কহিছে গাহি—
মরণ নাহি, মরণ নাহি!
জীবনে মরণ, মরণে জীবন
তার কি-না? কি-না হুঁশ রে?

রাগের একটা ঝলক বিদ্যুতের মতো ঝল্‌সে উঠলো!—মিথ্যা কথা! মরণ নেই? ডুভিক্ষ, কীপের ভলা, পুলিশের গুলি—তার উপর এই ব্লড্-প্রেশার!···মহাভারতের যুগে যুধিষ্ঠির পর্য্যন্ত বলে গেছেন, মানুষ প্রতিনিয়ত যাচ্ছে যম-মন্দিরে!·· আর যিনি গান লিখেছেন, তিনি বলেন; মরণ নাহি! মরণ নাহি! ইন্‌কেমপ্‌!···

সঙ্গে সঙ্গে জোরা দিয়ে কে বললে—নীরদ না?

চম্‌কে তাকিয়ে নীরদকান্তি দেখে,···গ্যাসের আলো মুখে পড়েছে···বহুদিনের পুরোনো বন্ধু অভয়···মুক্তি বিশুক বিমলিন!

যেন ভূত দেখেছে···এমনি চাপা গলায় নীরদ বললে,—অভয়!

জবাব শুনলো,—হ্যাঁ—অভয় ইন্ ফ্লেশ্, এ্যাণ্ড ব্লড!

নীরদকান্তি বললে,—হঠাৎ আকাশ থেকে নেমে এলে না কি?

—এক-রকম তাই। বলে' জায়গা করে' অভয় বসলো নীরদকান্তির পাশে। বললে,—তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা···বোধহয় সাত বছর আগে···পুণায় রেসের মাঠে···না?

স্মরণ করে' নীরদকান্তি বললে,—হ্যাঁ।

অভয় বললে,—তারপর কি কড়ই না বয়ে চলেছে আমার ঘিরে! পুনায় দেবার বহুৎ পয়সা কামিয়েছিলুম! তারপর পুণা থেকে গেলুম বম্বে···বম্বে থেকে লাহোর! লাহোরের আলাপ হলো গাঙ্গুলির সঙ্গে···পাকা খেলোয়াড়। তার সঙ্গে বখরাদারিতে খুললুম কার্নিভ্যাল-শো। সেই শো নিয়ে দিল্লী, বম্বে, পুনা ঘুরলুম! কার্নিভালে কত রকমের খেলা না খেলেছি··মা লক্ষ্মী তখন আমাদের হাতে বাঁধা···পুলিশকেই নজরানা দিতুম ডেলি আড়াইশো করে'···বার নাম, মাসে সাত-আট হাজার টাকা!···তার পর এলুম কলকাতায়—বছর পাঁচেক আগে। শুধু কার্নিভাল নয়, এলাচির দলের সঙ্গেও ভাগে কারবার সুরু করি।··· কিন্তু কি যে দুর্গ্রহ ঘটলো এই যুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গে···তাগীদার কমলো বেইমানী···পড়ে গেলুম কটা প্রেশিকিউশনে···মোটা-মোটা জরিমানা···সঙ্গে সঙ্গে গুরুতরাম সিন্ধীর সঙ্গে চলছিল ব্ল্যাক-মার্কেট···চাল-চিনি আর কাপড়ের নিয়ে···বেটকরে পড়ে' তার সঙ্গে শেষে জেল অবধি ঘুরতে হলো!···নানা বিপাকে এখন যাকে বলে, সর্ব্বস্বান্ত!···পাঁচ দিন আগে একজনকে সিভিল-সাপ্লাইয়ে চাকরি করে দেবো ভোগা দিয়ে আমার করেছিলুম গোটা পঞ্চাশ টাকা···পকেট-মারের পাল্লায় সে টাকা খুইয়েছি···সারাদিন আজ উপোসী আছি ভাই! বলে, লক্ষ্মীর বরপুত্তুর আজ ভিক্ষা মাগতে চলেছে!

দীর্ঘ কাহিনী শেষ করে' অভয় একটা নিশ্বাস ফেললো। নীরদকান্তি কাঠ! ভাবলো, ভগবান রক্ষা করেছেন। সেও ঐ পথে একদিন ছিল অভয়ের সাথী···ভাগ্যে ছেড়ে দিয়ে পৈত্রিক কারবারটিকেই সার বলে গ্রহণ করেছিল!···নাহলে এই অভয়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকলে···

শিউরে উঠলো নীরদকান্তি···

অভয় বললে,—তুমি? ওনলুম, পৈত্রিক কারবার নিয়ে আছো! ভালো করেছো ভাই! এ মার্ত ইন্ হাণ্ড ইজ্ ওয়ার্থ টু ইন্ দী বুশ্। দু' পয়সা কম পেলেও—এ দু' পয়সা সুনিশ্চিত···আর আমার লাখ টাকার স্বপ্ন···যেমন অনিশ্চিত···তেমনি সঙ্কটাচ্ছন্ন!···

অভয় একটা নিশ্বাস ফেললো। নীরদকান্তি নিরুত্তর···বুকের স্পন্দন বেশ দ্রুত এবং গভীর···মাথার মধ্যে এলোমেলো কত কি যেন ঘূর্ণী-চক্র রচনা করেছে···তাদের না যায় ধরা···না যায় ছোঁওয়া!···

অভয় বললে—এখনি আসছি ঐ কাস্তির বৈঠকখানা থেকে···ফুরে যেলছে ওরা···ও বেলার ফুরফুরে আমার নখদর্পণে! কি বলবো···টাকা গড়ের মাঠ···পেকুম দশটা টাকা···তিন ঘণ্টার মধ্যে দশ-দশে কোন না শ'খানেক রোজগার করে ফেলি!···

এই পর্য্যন্ত বলে' অভয় চেপে ধরলো নীরদকান্তির হাত···বললে—বন্ধুকে বন্ধু না রাখলে কে রাখবে বলো? লক্ষ্মী ভাই···দেখা যখন হলো···এমন আন্‌এক্সপেক্‌টেড···বিধাতার ইঙ্গিত···দশটি টাকা আমায় দাও ···দান নয়···ধার···তিন ঘণ্টার মধ্যে তোমার টাকা শোধ করে দেবো···প্রাণ ইন্‌টারেষ্ট···বলো যদি তো সেণ্ট-পার্সেণ্ট···দশের জায়গায় বিশ টাকা যদি না তোমায় ফেরত দি, আমার কান ধরে' ঘুতো-পেটা করো!

কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে হাত ছেড়ে অভয় চেপে ধরলো নীরদকান্তির পকেট···

নীরদকান্তি বললে,—কিন্তু টাকার অভাব ভাই! এ টাকা মানে, সদ্য ডাক্তারের কাছ থেকে আসছি ···পকেটে প্রেশক্রপ্‌শন্—একটি গাধা ওষুধ কিনে বাড়ী ফিরতে হবে···স্ত্রী দেছেন মাথার দিব্যি!···

অভয় বললে—বেশ, ওষুধ কিনে নিয়ে যেয়ো···এক ঘণ্টার জন্য দাও যায়···এক ঘণ্টার তোমার এ দশটাকা আমি শোধ করবোই···করে-খেলায়···আমায় সকলে বলতো, অভয়ের পোকা! বিশ্বাস করো···আমার সঙ্গে তুমিও চলো কাস্তির ওখানে···সেখান থেকে তোমার টাকা উশুল করে' সোজা ডিস্‌পেন্সারিতে যেয়ো। এটুকু ভরসা না করো যদি তাহলে লেকের জলে ডুবে মরা ভিন্ন গতি নেই!···ওয়ার্ড অফ্ অনার দিচ্ছি।

মাছোড়বান্দা!···নীরদকান্তিকে দিতে হলো টাকা···দশটি টাকা! অভয় বললে—ভাবছো, ঠকিয়ে নিচ্ছি? তা হবে না···আমার সঙ্গে আসতে হবে···আমি ছাড়বো না···হাতে-হাতে তোমার এ ধার আমি শোধ ক'রে দেবো। জেলে গেলেও আমি চোর বা জোচ্চোর নই···স্কেলুলেটর···বুদ্ধিজীবী এবং জেণ্টলম্যান্‌স্ সন্!···

নীরদকান্তি মুক্তি পেলেনা···অভয়ের সঙ্গে তাকে যেতে হলো···

কান্তির বৈঠকখানা···ম্যাণ্ডভাউন রোডের উপর বাড়ী—সেই বাড়ীর দোতলায় প্রশস্ত ঘর।···

জমাট ভিড়···সাহেবী-সুটপরা···আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে অনেক ভদ্রলোক! আহার-আপ্যায়নের

শুক্ল আষ্টে চা-সিগারেট-চুরুট ··চপ্-কাটলেট···স্যাণ্ডুইচ্···চিউয়িং-গাম চকোলেট···কফি···ঘাস লঙ্গেশ্ পর্য্যন্ত !

অভয়কে দেখে একজন চীৎকার করে উঠলো—আরে, এই যে ! এতক্ষণে অভয় পেলুম !···

আর একজন বললে—খেলবে ? না, শুধু দর্শনভাদি ?

অভয় বললে,—খেলবো ।

—রেজো কত ?

—দশ টাকা ! বলে' অভয় দেখালো নীরদকান্তির কাছ থেকে আদায়ী দশ টাকার নোটখানা !

লিক্‌লিকে-চেহারার এক ভদ্রলোক···তার বুকে ঝুলছে চামড়ার একটা ব্যাগ···সে বললে—দে আও নোট··· কেত্না আংতা ? এক-রুপি নোট্ ! অন চেঞ্জেস্ ?

অভয় বললে—এক-রুপি নোট !

তার হাতে অভয় দিলে দশটাকার নোট···দশ টাকার নোটের বদলে সে দিলে অভয়কে দশখানা এক টাকার নোট ।

মুস্তো নোট নিয়ে অভয় ভিড় গেল খেলোয়াড়দের দলে···নীরদকান্তির পানে চেয়েও দেখলো না ! নীরদকান্তি ভাবলো, চলে যাবে ! না···

কিন্তু না, দশ টাকার এমন অমূর্জ্জন সাধন করে' যাওয়া চলে না ! কোথায় থাকে অভয় কে জানে ! সদ্য ডাক্তারের ফী দিতে খরচ হয়েছে ষোল-ষোল টাকা···এখনো ওষুধ কেনা বাকী···এ-অবস্থায় এক বাউণ্ডুলে বন্ধুর জন্য দশ টাকা খোয়ানো···অসম্ভব ! গায়ে বাজে ।

নীরদকান্তি চাইলো চারিদিকে···তাকে একটা প্রশ্নও করলো না কেউ । ঘরের কোণে হাল্কা-তাপ্পা একখানা খালি কৌচ···নীরদকান্তি গিয়ে সেই কৌচে বসলো !···কোন দিকে তার মন নেই···অভয়ের কাছে ঐ দশটি টাকা আদায় করতে পারলেই তার ছুটী !···

কৌচে বসে সে চেয়ে রইলো খেলোয়াড়দের প্রমত্ত ভিড়ের পানে । সেখানে যা হচ্ছে···যে উৎসাহ, যে আশা, যে নিরাশা···ওয়ারক্রণ্টেরও বুঝি এমন হয় না !···সে মনে মনে বলতে লাগলো—ঠাকুর···ঠাকুর··· অভয়কে পাইয়ে দাও টাকা···টাকা···টাকা···

বাড়ীর কথা মনে হলো । সুরমা কি অধীর প্রতীক্ষায় বসে আছে । ডাক্তারের রিপোর্ট···শোনবার জন্য তার কতখানি আকুলতা । বাড়ী থেকে নীরদকান্তি যখন বেরোয়, তার মাথায় একটি টাকা ছুঁইয়ে সুরমা অন্তিমরে ঠাকুর দেবতার কাছে মানত্ জানিয়েছিল । নীরদকান্তি ফিরছে না দেখে না জানি সে কত-কি-ভাবছে !···

বুকের মধ্যে দশ্‌দপানির সীমা নেই···মাথা কেন ধরে উঠেছে···মাথা আজ ভালো ছিল···ধরেনি ! মনে হলো কি মুহূর্ত্তে পার্কে ঢুকে বেঞ্চে বসেছিল ! ডাক্তারের বাড়ী থেকে বেরিয়ে কেন সোজা ডিস্‌পেন্সারিতে গেল না ? তা গেলে···

চিন্তার পর চিন্তা···পোকের মতো মাথায় ঢুকে সজোরে মার্চ করে' ফিরতে লাগলো···

এবং এখনি চিন্তার মধ্যে ঘড়িতে বাজলো দশটা…ঢং ঢং করে'! নীরদকান্তি যেন ক্ষেপে উঠলো। আর নয়…দশটা টাকা না হয় গেল। তার জন্য

দারুণ অধৈর্য্য তাকে স্পন্দিত করলো…বিদ্যুৎ-প্রবাহের মতো। নীরদকান্তি উঠে দাঁড়ালো…এগিয়ে গেল অভয়ের দিকে…

ডাকতে হলো না! অভয় উঠলো…হাতের টাকা বাজিয়ে বললো—আজ আর নয়। অতি লোভ অকর্ত্তব্য…বিশেষ আমার গ্রহ এখন বক্র।

ফিরতেই নীরদকান্তির সঙ্গে চোখাচোখি…বললে—সাঁইত্রিশ টাকা পেয়েছি…এ থেকে তোমার দশ টাকা দিলে যার নাম নেট সাতাশ টাকা! বিনা কড়িতে আর কি চাই…এইটুকু সময়ে? সোল্লাসে নীরদকান্তির হাত ধরে' অভয় এলো বাইরে পথে। বললে—তোমার দশ টাকার পর আছে ভাই…এখনি ছাড়ছি না…বুকে চোট লেগে আছে…শ্রীনাথের আসরে কাল রাত্রে সতেরো টাকা হেরে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি—তোমার ঐ দশ টাকা নিয়ে সে আসর থেকে কালকের সতেরোটি টাকা ফিরিয়ে আনবো…তার বেশী আর একটা পয়সার লোভ করি যদি, আমায় বলো কুত্তা কি কুত্তা!

নীরদকান্তি বললে—কিন্তু বুঝছোনা অভয়…ডিসপেন্সারি যেতে হবে আমাকে…

হো-হো হেসে অভয় বললে—রাত দশটায় কোন্ ডিসপেন্সারি খোলা, তোমার জন্য খুলে রেখেছে? জানি হে জানি, রাত দশটার পর ওন্‌লি প্রেশক্রপসন্‌স্ টু-বী সার্ভড্। এসো—আর একটা পাটি…শ্রীনাথের আড্ডা ঐ পদ্মপুকুর মোড়ে! হাটিয়ে নিয়ে যাবো না…হিক্‌মা নিচ্ছি পকেটে যখন পয়সা আছে তখন হাটবো কি দুখে?

নীরদকান্তিকে ছাড়লো না…পাকড়াও করে' হিক্‌মত তুলে অভয় এলো শ্রীনাথের আড্ডায়।

একটা গেরাজের মাথায় ঘর…ছাদ থেকে মাথায় সেই ঘরে যাবার ছেঁড়া তালির পাতা…গা-ঘিন্‌ঘিন্ করছে প্রায় বিশজন লোক…ধনীর নন্দদুলাল থেকে মোটর-মিস্ত্রী পর্য্যন্ত আছে এ-দলে! খেলা চলেছে, ভয়ানক হাঁকডাক! ডাইস্ হচ্ছে,…সঙ্গে সঙ্গে সাত আটজন ধরা করে' ঝুঁকে পড়ছে!…

অভয় বললে নীরদকান্তিকে—বসে পড়ো বন্ধু…ঘণ্টাখানেক…ব্যস্…তারপর যা বলেছি, ইয়োর মনি আই ব্যাক্ উইথ্ ইন্‌টারেষ্ট সেন্ট-পার-সেন্ট!…

অভয়ের কি মূর্ত্তি! নীরদকান্তি সে মূর্ত্তি দেখে হতভাব! সিল্কের হাফ-হাতা শার্ট গায়ে চাঁদা-তোলা এক মূর্ত্তি এসে অভয়কে প্রশ্ন করলো—মনি—মনি—মনি…?

অভয় বললে—না…আমি ফাঁকা-তেন্তোয় আসিনি! এ কথা বলে' অভয় গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো খেলার মধ্যে। মূর্ত্তিটিকে চিনলো নীরদকান্তি…বটকেষ্ট…এদের আড্ডার মহাজন…যাকে বলে শাইলক! টাকা যার ধার…খেলায় হেরে যাদের পকেট খালি হয়,—তাদের…ঘড়ি, চেন, আংটি, বোতাম…যার সার্ট-কোট রেখে।…

শাইলক চাইলো নীরদকান্তির দিকে…চিনলে। বললে—নীরদবাবু! আরে ব্যস্! খেলবেন না কি?

গম্ভীরকণ্ঠে নীরদ বললে—না।…

—হবে ?

—অভয়ের সঙ্গে এসেছি···টেনে আন্‌লে...দেখা হলো পথে···

—ও···

শাইলক্ সেলা সরে'···নীরদকান্তি কি করে ? এখানকার আবহাওয়া অসহ···কিন্তু উপায় নেই'···নিরালা একটু কোণ পেয়ে সেইখানে গিয়ে বসলো···দেয়ালে ঠেশ্ দিয়ে।···

চোখের সামনে ছুয়ার তাণ্ডব···হাসি···গালাগালি···চীৎকার···মদের বোতল-গেলাসও আছে···বাঃ !

ঘরের মধ্যকার বাতাস যেন বিষিয়ে আছে···নীরদকান্তি ভাবছিল, কেন এলো এ নরকে ? বাড়ীতে সুরমা ওদিকে···

কিন্তু ডিসপেন্সারি বন্ধ হবে গেছে···ওষুধ আজ রাত্রে মিলবে না ! যখন তাই হলো এবং এত দেরী হয়েছে, তখন আরো না হয় একঘণ্টা ! ছুবাড়ির হাত থেকে টাকা দশটা আদায় করা চাই ..ঠকিয়ে দশ দশটা টাকা নেবে···এমন কাপ্তেনী-পাত্র নীরদকান্তি নয় নিশ্চয় !

মাথা দপ্‌দপ্ করছে··চোখে কে যেন লঙ্কাবাটা পুরে দেছে···পেটের মধ্যে যাতনা···আর বুকে কে যেন ঘুষ্‌ঘুষ্ করে' বুশুয় মারছে ! সমস্ত শরীর এমন যে খাড়া হয়ে বসে থাকা চলে না ! এই ব্লড-প্রেসার··· ! হতাশাসে নীরদকান্তি চোখ বুজলো !

চোখ খুললে, গায়ে ধাক্কা খেয়ে ; চম্‌কে চোখ মেলে দেখে অভয় !

অভয়ের হাসি মুখে—অভয় বললে—এই নাও নীরদ কুড়িটা টাকা ··তোমার প্রিন্সিপাল্-ফিস দশ··· প্লাস্ ইন্‌টারেষ্ট দশ।

নীরদকান্তি উঠে দাঁড়ালো—বললে—ইন্‌টারেষ্ট নয়···শুধু ঐ প্রিন্সিপাল দশ—

—না—না···না···সে কি হয় ? ওয়ার্ড দিয়েছি···ওয়ার্ড অফ্ অনার···

রীতিমত বচসাধস্তি···

দুজনে এলো পথে। অভয় বলে—তোমার পত্র···আমি তোমার কেনা গোলাম, ভাই নীরদ। তোমায় ছাড়বো না···দশটা টাকা ছেড়ে দিলে আমিই বা কেন তা নেবো ?···অল্ রাইট···আমায় বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিতে হবে তোমায়···ভয় নেই ট্যাক্সি নেবো···সেখানে দুই বন্ধুতে বসে এক সঙ্গে খাবো—পথে চীনা হোটেল পড়বে···চাউ-চাউ আর মাংস···ব্যস্ !

নীরদকান্তি ভয়ে কাঁপে ! বলে—না ভাই বাড়ীতে সকলে ভাবছে···জানে না তো তোমার সঙ্গে আছি ! ডাক্তারের কাছ থেকে সোজা বাড়ী ফেরবার কথা ! ভাববে, জীপ্ চাপা পড়েছি নির্ঘাৎ !

—আরে, না, না—তাও কি হয় ?···বলে' সবলে অভয় পাকড়ালো নীরদকান্তির হাত···নীরদের কাকুতি··· মিনতি···কিন্তু খাসি হাতে অভয় আজ কুবেরের ভাণ্ডার লুটেছে···ছাড়লো না !

একখানা খালি ট্যাক্সি মিললো···মিলনী সিনেমার সামনে। ট্যাক্সিতে নীরদকান্তিকে তুলে অভয় বললে—চালাও সিধা···

ট্যাক্সি ছুটলো তীরের বেগে···আশু মুখার্জী রোড চৌরঙ্গী পার হয়ে···

বৌবাজারে চীনা হোটেল···অভয় কিনলো এক থালা খাবার···সেই সঙ্গে একটি বোতল। ট্যাক্সিতে বসে ড্রাইভারকে হুকুম দিলে,—পটলডাঙা···

নীরদকান্তির মাথায় যেন বাজ পড়লো!···কোন্ বাড়ীর ঘড়িতে বাজলো ঢং করে' একটা! নীরদকান্তি ভাবলো মিছা ভাগ···দুর্গা আজ চরমে উঠবে।

পটলডাঙার এক গলির মধ্যে জীর্ণ একখানা বাড়ী···ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া চুকিয়ে অভয় সে-বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়তে লাগলো···বিরাট রেটে···মনের উল্লাসের সঙ্গে তাল রেখে!

আশপাশের দুচারখানা বাড়ী থেকে তীব্র প্রতিবাদ উঠলো, জ্বালা আপদ! মাতলামির আর জায়গা নেই··· কড়া নেড়ে রাজ্যের লোকের ঘুম ভাঙানো!

অভয় চাইলো নীরদকান্তির দিকে, বললে—বাড়ীটা তারী বনেদ···

নীরদকান্তি বললে,—তাই দেখছি!

অভয় বললে—একটু শাঁস ভরাতে পারলেই দেবো এ পাড়া ছেড়ে···

সহসা দরজা খুলে গেল···একটি বাচ্ছা-চাকর দিলে দরজা খুলে। নীরদকান্তিকে নিয়ে অভয় করলো গৃহপ্রবেশ। ছোট্ট একটু উঠান···তার কোলে ঘর···ঘরের সামনে এক রমণী মূর্ত্তি। ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছিল··· সে আলোয় যেমন দেখা যায়, নীরদকান্তির মনে হলো যেন সেই ফিয়েটারে কবে দেখেছিল প্রফুল্ল-নাটকে জগদ্ধাত্রী... হুবহু তারি প্রতিচ্ছবি!

মূর্ত্তির মুখে ভাষা ফোটবার পূর্ব্বেই অভয় বললে,—ওল্ড ফ্রেণ্ড···নীরদকান্তি···সাত বছর আগে পুণায় শেষ দেখা···তারপর আজ···ধরে নিয়ে এলুম···একসঙ্গে বসে দুজনে খাবো বলে।···

যেন বারুদে আগুন পড়লো! দাউ দাউ করে মূর্ত্তি উঠলো জ্বলে···সম্ভাষণ জানালো,—ও···তাই বটে। পুরোনো ইয়ারকে পেয়ে ঘরসংসার ভুলে থাকা হয়েছিল! আমি কোন্ বাঁদী···বটে···তোমার শিক্ষাই বাটবো আর তোমরা করবে আমোদ! তোর বন্ধুর নিকুচি করেছে যে···

সুর-ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তি এলো এগিয়ে—নীরদকান্তি কাঠ—ঠিক যেন কুমার সম্ভবের পার্ব্বতী···ন যযৌ, ন তস্থৌ-ভাব! অভয় বললে—আ-হা-হা, শোনো আগে কথা! তারী পরমস্থ বন্ধু গো···ট্যাঁক ছিল গড়ের মাঠ··· এর পরেই দেখছো···হাতে এই চীনা হোটেলের খাবার···চাউ-চাউ···

গ্র্যাণ্ড কীর্ত্তি সোনাগণি···

সোনাগণি সে-কথা কানে তুললেন না···নীরদকান্তিকে উদ্দেশ করে সম্ভাষণ করলেন,—কেমনধারা মানুষ তুমি! ভদ্দর লোক? রাত একটা পর্য্যন্ত ধরে ইয়ার্কি! সে-দিন রোগ থেকে···

এই পর্য্যন্ত বলে' রণমূর্ত্তিতে এলেন এগিয়ে···নীরদকান্তি তবে দু'পা পেছিয়ে গেল···অভয় দিয়ে অভয় দাঁড়ালো রণরঙ্গিনীর সামনে···বললে,—কি যে বকো পাগলের মতো! ভদ্রলোক···বন্ধু···ওঁর খাতিরেই আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছি আবার···ওঁকে নেমন্তন্ন করে আনলুম—একসঙ্গে দুজনে বসে খাবো···

কথা শেষ হলো না···হাত নেড়ে রীতিমত ফিয়ে-টারের ভঙ্গীতে রণরঙ্গিনী বললেন—নেমন্তন্ন করে এনেছেন!

হাড়ি ওদিকে চল্‌চল্‌···পাশের বাড়ীর গিন্নী আমার ডেকে নিয়ে গিয়ে খাওয়ালেন···তাঁর ছিল এক উদ্‌যাপন··· সধবা খাওয়াচ্ছেন···তাই !···নিজে কি খাবেন, ঠিক নেই···বন্ধু এনেছেন নেমন্তন্ন করে···

অজয় বললে—আহারে চাঁদে খাবার এনেছি গো, চাউ-চাউ···আর কি কাই'লাশ দব জিনিষ !···কিছু করতে হবেনা···তুমি শুধু কষ্ট করে উনুন ধরিয়ে একটু গরম করে দেবে···তোমার তাগও এনেছি মনে করে !···

খাবারের প্যাকেটটা অজয় দিলে এগিয়ে···

কিন্তু ফল হলো যেন সেই অন্নয়ে বাহা···অর্থাৎ ঘৃতাহুতি ! সবলে প্যাকেটটা রণরঙ্গিনী দিলেন ঠেলে··· প্যাকেট ছিটকে গিয়ে পড়লো নীরদকান্তির গায়ে···পাৎলা কাগজ ছিঁড়ে জামা-কাপড়ে সেই চাউ-চাউ···

নীরদকান্তি ছুটলো সোজা সদরের দিকে···দুম্‌ করে পায়ে এসে পড়লো শক্ত কি যেন একটা···পায়ে চোট্ লাগলো···চকিতে চেয়ে দেখে, সেই বোতলটি !

ও-দিকে রণরঙ্গিনীর মুখে চলেছে ঝঙ্কার—বাড়ীতে বোতল আনা হয়েছে·· দুই বন্ধুতে বসে মদ গিলবেন !··· ভদ্দরনোক···বন্ধু···ওরে আমার সাতপুরুষের কুটুম রে—হতভাগা মাতাল···বেরো···বেরো···বলছি···

পিছনে বজ্র-হুঙ্কার···নীরদকান্তি ছিটকে বেরিয়ে এলো যেন দম-খাওয়া পুতুল !

হ্যারিসন রোডের মোড়ে ট্যাক্সি মিললো···খালি ট্যাক্সি··ভবানীপুরে পৌঁছে দিতে ভাড়া নেবে বললে দশ টাকা !

কুছ্ পরোয়া নেহি ! নীরদকান্তি ট্যাক্সিতে চড়ে বসলো !

বাড়ী ঢুকছে ঢং ঢং ঢং করে বাজলো তিনটে···

সুরমা মলিনমুখে দোতলার পড়খড়ির ধারে দাঁড়িয়ে ··যেন চাতক-পক্ষী !

দোতলায় আসতে সুরমা বললে,—ব্যাপার কি ?

নীরদকান্তি বললে—কাল বলবো···আজ কোনো কথা জিজ্ঞাসা করোনা···আমার মাথা ঘুরছে···

সুরমার দু-চোখ উঠলো কপালে ! নীরদকান্তি বললো—খাবো না···খেয়ে এসেছি···এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো···ছাড়লে না···তার স্ত্রীর ছিল ব্রত···বললে, খাদশটি ব্রাহ্মণ খাওয়াবে···একটি ব্রাহ্মণ আসেননি,···অসুখ করেছে···তাই !

সুরমা অবাক···নিশ্বাস ফেলে ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম···বহু প্রণাম করলো।

পরের দিন···ঘুম ভাঙলো বেলা তখন নটা···

ঘুম ভাঙতেই কথাবার্তা কানে গেল···বারান্দায় সুরমা কার সঙ্গে কথা কইছে···পুরুষের গলা ! কার গলা চিনতে পারলে না ! বারান্দায় বেরিয়ে এলো ।

সুরমা বললে—চিনতে পারছো? চুনীদা···বড় পিসিমার ছেলে। ডাক্তার···ঢাকা থেকে বদলি হয়েছে কলকাতার মেডিকেল কলেজে।

—বটে!

কটা দুই পরে নীরদকান্তি বললো রাতের কাহিনী···শুনে সুরমা অবাক···চুনী ডাক্তার হেসে অস্থির!

হেমন্ত ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন্ দেখে চুনী বললে—আমার সঙ্গে বন্দুকটা আছে···আমিও একবার এক্সজামিন করতে চাই আপনার প্রেসার···সুরো আমায় বলেছে আপনার অসুখের কথা।

আবার এক্সজামিন···হাতে আবার সেই প্রেসারের বন্ধনী···সাপের লক্লকে জিভের মতো আবার সেই লাল-তরঙ্গিকার নৃত্যলীলা···

পাঁচ মিনিট···সাত মিনিট···দশ মিনিট···

বন্ধনী খুলে চুনী বললে,—চাই কোথায় নীরদদা···আপনার বাবার যে প্রেসার বেশ ভালো ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশ?

—সাতচল্লিশ!

—অথচ দেখলেন তো, প্রেসার পেলুম একশো তেইশ!

নীরদকান্তি বললে—কাল হেমন্ত ডাক্তারের বন্ধনীতে স্পষ্ট দেখেছি যে, একশো ছেষট্টি!

চুনী বললে—বলেন কি?

হেসে নীরদকান্তি বললে,—কাল ঐ অসুখের পাল্লায় পড়ে যা-যা ঘটেছিল···শেষ-অঙ্কে অসুখের রণচণ্ডী মূর্ত্তিতে আক্রমণ···তাতেই প্রেসার গো হয়ে গেল!

চুনী বললে,—বিচিত্র নয়!

ভাবীকালের মানুষ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

কলকাতা তখন প্রায় জন বিরল। জাপানী বোমার ভয়ে একে একে পাড়ার সবাই পালিয়েছে।

সিঙ্গাপুরের পতনের পরও যে সব সাহসী পরিবার শহরে ছিল আমরা ছিলাম তাদেরই মধ্যে। অর্থাৎ তখনো পালাই নি।

অবশ্য আমার থাকার একটা বিশেষ কারণ ছিল এই যে আমি ডাক্তার। কলকাতায় প্র্যাক্‌টিস্ করি। হাসপাতালেও ডিউটি দিতে হয়। তাছাড়া এ-আর-পি তে ও ঢুকেছি। শহরের অনেকগুলো সেণ্টারে আমাকে কার্ড এডের লেকচার দিতে হয়। 'ইন্‌সেণ্ডিয়ারী' বম্, এ্যাণ্টি-গ্যাস বোমার' বম্ প্রভৃতি বোমার তালিকা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। ব্লাষ্ট ষ্ট্রেণ্টার, ষ্ট্রিট ট্রেক্, ব্যাকস্-ওভার্ সাইরেণ একতাগুলো তখন সর্বদা আমার জিহ্বাগ্রে যেন লেপটে ছিল।

এ হেন আমাকেও শেষটা কলকাতা শহর ছাড়তে হল। সিঙ্গাপুরের পর রেঙ্গুনের পতন নিয়ে এল আমার এই অধঃপতন।

দিদি এসে বললেন নেপু 'আরত' থাকা চলেনা। পাড়ার কোনো বাড়ীতে জনমানব নেই। বাড়ী তালা বন্ধ করে চলে গেছেন সব। একমাত্র সামনের বাড়ীর জয়দেববাবুরা টিকে ছিলেন এতদিন। কাল রাত্রে তাঁরাও ঘরভাঙা চলে গেলেন। এখন এই জনশূন্য পাড়ায় ছেলেমানুষ বউটা আর ঐ কচি ছেলেটাকে নিয়ে কোন ভরসায় একলাটি থাকি বল্? তুই তো সারাদিন বাইরে বাইরেই ঘুরিস। দিন দুপুরে কেউ বাড়ী ঢুকে এসে আমাদের কেটে রেখে গেলেও কাক-পক্ষীতে টের-পাবে না।

দিদির যুক্তি গুলো হেসে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। পাড়ার সেই অবস্থাই দাড়িয়েছে! তবু আমি তাঁর কথায় কান দিইনি। কিন্তু পত্নী কল্যাণী দেবী রাত্রে যখন নোটিশ দিলেন যে ঠাকুর চাকর ও ঝি কিছুতেই আর এ জনশূন্য শ্মশানের মাঝখানে পড়ে থাকতে রাজী নয়। এ সপ্তাহের মধ্যেই যদি কোনও ব্যবস্থা না করতে পারি, তাহলে তারা মাইনে না থাকী আছে ফেলে রেখেই পাড়ার জমিদার বাবুদের সঙ্গে কাশী চলে যাবে। তখন আর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সম্ভব হল না।

অনেক চিন্তা ও গবেষণার পর স্থির হল যে পালাতেই যদি যদি হয় তবে এমন জায়গায় যেতে হবে যেখানে ইংরেজ রাজত্বের অবসান হ'লেও বাঙালীর রাজত্ব অটুট থাকবে। কারণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বাঙালী-বিদ্বেষ তখন বেশ কঠোর হয়ে উঠেছে। জাপানীদের আক্রমণে দেশে যদি রাষ্ট্র বিপ্লব ও অরাজকতা সুরু হয় তাহলে নির্বান্ধব অবাঙালী প্রদেশে থাকা নিরাপদ হবে না। লুঠ-তরাজ ও খুন জখম আরম্ভ হলে সেই বিদেশে বিভূঁয়ে অবাঙালী প্রতিবেশীরা আমাদের মুখ চাইবে কেন? বরং আমাদের যা আছে তা ওরাই সর্বাগ্রে কেড়ে কুড়ে নেবে।

স্থির হলো যে—আমার মামার বাড়ী কোচবিহার রাজ্যই সবচেয়ে নিরাপদ। বাঙালীর রাজা সেটা। মাদারা সেখানকার তিনপুরুষের প্রজা। সবাই রাজ সরকারে কাজ করেন। অধিকাংশ অধিবাসীও বাঙালী। সুতরাং রাজ্য ভাঙা পড়ার ভয়ঙ্কর দুর্যোগে স্বাধীন রাজ্য কুচবিহারই সবচেয়ে নিরাপদ। ওদের পুলিশ নিজস্ব, ব্যাঙ্ক নিজস্ব কোর্ট নিজস্ব। আমি ওদের সেখানে রেখে নিশ্চিন্ত হয়েই চলে আসতে পারবো। যদি রেল বন্ধ হয়ে যায়, 'ডাক ও তার' না চলে, মনি-অর্ডার না যায়, তাহ'লেও খরচের টাকার জন্য ওদের বিব্রত ও বিপন্ন হ'তে হবে না। মামারা আছেন। চালিয়ে নেবেন।

একটা শুভদিন দেখে সপরিবারে কোচবিহারেই বেরিয়ে পড়া গেল। মামার বাড়ীর কাছেই একখানি ছোট বাড়ী আমার অনুরোধে তাঁরা ভাড়া করে রেখেছিলেন। বেশ ভালো বাড়ী, উঁচু প্লিন্থের উপর বড় বড় ঘর। ইলেকট্রিক ফিট করা সামনে কম্পাউণ্ড। পিছনে বাগান। তারপরই তোরষা নদী। মনোরম স্থান! তারী ভালো লাগলো।

কলকাতার সর্বপ্রকার কাজ থেকে মাত্র এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে এসেছি। ওদের এখানে সুব্যবস্থায় গুছিয়ে বসিয়ে দিয়ে আমার চলে যাবার কথা। কিন্তু কোচবিহারে পৌঁছেন কল্যাণীর সে কি কান্না! আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় নয়। নিদারুণ অভিমানের বন্যা!···তুমি ফিরে যেয়োনা। আমি তাহলে বাঁচবো না। দুর্ভাবনায় দুশ্চিন্তায় আমার এখানে ঘুম হবে না। ডাক-তার বন্ধ হয়ে গেলে তোমার খবর পাবো কেমন করে? রেল যদি না চলে তাহলে সে গোলমালের সময় কি করে তুমি আসবে ওখান থেকে? উপরন্তু নেবার টাকার জন্য ভেবনা। লক্ষ্মীটি, সে আমি যেমন করে হোক চালিয়ে নেবো। গায়ের গহনাগুলো তো রয়েছে আমার। সেতো কেউ কেড়ে নেয়নি এখনো। তোমাকে সেই বিপদের মুখে পাঠিয়ে আমার এ গহনা রেখে কি সুখ? কোনো প্রশ্নেরই সদুত্তর দিতে পারলুম না। সমস্যা বরং আরও জটিল হয়ে উঠলো। দিদি পরেরদিন খাবার কাছে বসে বলতে শুরু করলেন—পুরুষ মানুষ তোমরা। বাইরের কাজ কর্মের ভার রয়েছে তোমাদের কাঁধে। জানি, না গেলে রোজগার বন্ধ হবে। কলকাতায় আমাদের ভাত-তিক্তি। তবু, কি জানিস ভাই, বউ যা বলছে কথাটা বেশ করে ভেবে দেখ। যদিই ভগবান না করুন, ভালোমন্দ কিছু একটা ঘটেই যায়, কে দেখবে তোমার স্ত্রীপুত্রকে—কে তাদের জন্যে ভাববে? তার চেয়ে, তুই যদি প্রাণে বেঁচে থাকিস! আমাদের কতখানি বল ভরসা বলতো? মুড় একদিন কিটে যাবেই। তখন আবার কাজে নামলেই হবে। উপস্থিত তুই ভাবিসনি। তোর সংসার চালাবার ভার আমি নিলুম। ভারীত সংসার! আপনি আর কপনি। বাচ্ছাটাত পাতের খেয়েই মানুষ হ'তে পারবে—

হেসে বললুম—ভাইপোটি নেহাৎ বাচ্ছা নয়। বারো উত্তীর্ণ হয়েছে দিদি। আর সংসার চালাবে যে বলছো—তোমার তো ঐ ক'খানি কোম্পানীর কাগজের সুদ ভরসা; ইংরেজের রাজ্য উঠে গেলে কে তোমাকে সুদ দেবে? দিদি বললেন—মেয়ে ছেলে হয়ে জন্মেছি বলে কি আমাদের এতটুকু বুদ্ধি নেই ভেবেছিস; এখানে এসেই আমি বড়মামাবাবুকে দিয়ে সমস্ত কাগজ ব্যাঙ্কে বেচিয়ে ক্যাশ করে নিয়েছি। তোর সংসারের পাঁচবছরের খরচ আমি সুখে-স্বচ্ছন্দে চালিয়ে নিতে পারবো। তুই আর কলকাতায় ফিরে যাসনি ভাই, কথা শোন্।

(৯)

মনটা আমার কি যেন এক অপূর্ব্ব বেদনাময় আনন্দে কানায়-কানায় ভরে উঠলো! আজ প্রায় পনেরো বছর হয়ে গেল কল্যাণীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। প্রথম যৌবনের প্রেমস্বপ্নের দিনগুলোকে আজ স্মরণেই আনতে পারিনি। লাজুক মেয়ে কল্যাণী, ব্রীড়াবনতমুখী নববধূ। কথা কয় সে খুব কম। ভালোবাসার কথা তার মুখে কোনো দিনই শুনিনি। মনোকথা যা কিছু একতরফা আমার দিকেই ছিল। ওর কাছে পেয়েছি শুধু নিঃশব্দ আত্ম-নিবেদন। দীর্ঘ পনেরো বছরের মধ্যে একদিনও সে মুখ ফুটে আমায় বলেনি—যে ওগো আমি তোমায় এ পৃথিবীতে সবার চেয়ে বেশী ভালোবাসি। আজ তার অন্তরের অব্যক্ত কথাটাই যেন মুখর হয়ে আমার কানে ক্রমাগতই বাজছিল।

নিঃসন্তান বালবিধবা দিদি আমার, যেদিন আমাদের বাড়ী ফিরে এসেছিল, সেদিন ওকে ঠিক 'অনুগ্রহ' বলে মনে না হলেও একটু কঠোর কর্ত্তব্যের গুরু দায়িত্ব-বোধ যে তাগেনি একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। আমার ছেলে রতনকে দিদি যে বুকে করে মানুষ ক'রছে এর জন্য দিদির প্রতি আমার কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা বোধও ছিলনা। বরং ওর নিঃসহায় জীবনে ওকে একটা অবলম্বন ও আশ্রয় দিতে পেরেছি বলে মনে মনে একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করতুম। আজ বুঝলুম—কি গভীর স্নেহের অপরিমিত ঐশ্বর্য্যে তিনি আমাকে ও আমার স্ত্রী-পুত্রকে আপনার চেয়েও অধিক প্রিয় করে নিয়েছেন।

সংসারে মানুষের জীবনে এর চেয়ে বড় কাম্য আর কি থাকতে পারে! আপনাকে বিলিয়ে-দেওয়া এই যে স্নেহ—সর্ব্বস্ব উজাড় করে দেওয়া এই যে প্রেম—যুগে-যুগে মানুষ তো এরই জন্য কাঙাল হয়ে ফিরেছে। নাম, যশ, খ্যাতি, গৌরব—কিছুই মানুষকে এর চেয়ে বেশী তৃপ্তি দিতে পারে না। রাজার ঐশ্বর্য্যও এর কাছে তুচ্ছ।

সিভিল সাপ্লাইএর সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দিয়ে শারীরিক অসুস্থতার অজুহাতে সব কাজে ইস্তফা দিয়ে কোচবিহারেই রয়ে গেলুম। শহরের একঘেয়ে জীবন যোগায় হিজিবিজি বেশ একটা বৈচিত্র্য এনেছিল—সন্দেহ নেই। কেমন যেন অজানা বিপদের আশঙ্কায় অনিশ্চিকাল নিরবিচ্ছিন্ন উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে চলে আসা। আকাশ পথে উড়ে যাওয়া প্রত্যেক বিমানের কর্ণভেদী গুরু গুরুনে সচকিত হয়ে উঠে মেঘলোকে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ, বিমানের পক্ষ-পুটে লাল, নীল চক্র-চিহ্ন আবিষ্কার ক'রে তার জাতি নির্ণয়ের এবং গতি নির্ণয়েরও চেষ্টা, সনাক্ত করার গৌরব নিয়ে পরস্পরের সে কি ধাক্কাধাক্কি আস্ফালন!—দিন কাটছিল বেশ। কিন্তু এখানে এসে পর্য্যন্ত মোটেই যেন বেকার-জীবন যাপন করছি। ডাকের চিঠিপত্রের সঙ্গে খবরের কাগজ আসে অনেক বেলায়। তাগ্যে রেডিওটা সঙ্গে এনেছিলুম কল্যাণী আমার নিষেধ অগ্রাহ্য করে, তাই সকালের দিকে চায়ের সঙ্গেই যুদ্ধের টাটকা খবরগুলো পাচ্ছি। তারপর ছেলেটাকে নিয়ে বসি একটু পড়াতে। হাট-বাজার দিদিই করে আনেন ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে। খাওয়া-খাওয়া কলকাতার চেয়ে ভালোই হচ্ছে। কারণ, দুধ আর মাছ এখানে সস্তা। দুপুরে ঘুম দিই। বিকেলে ঘুরে বেড়াই এপাড়া-ওপাড়া, নয়ত রিক্সা নিয়ে এপাড়া-ওপাড়া। সন্ধ্যায় আবার রেডিও নিয়ে বসি যতক্ষণ না খাবার ডাক পড়ে।

ইতিমধ্যে যুদ্ধের উত্তেজনাকে ম্লান ক'রে দিয়ে প্রচার হ'ল কংগ্রেসের অবিস্মরণীয় আগষ্ট রেজোলিউশন—'কুইট ইণ্ডিয়া!' জু-অর-ডাই! সেই আগষ্ট যখন বেতারে শোনা গেল—কংগ্রেস ওয়ার্কিং

কমিটির সমস্ত সভ্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কথাটা বিশ্বাস করতে পারলুম না। সংবাদপত্রের প্রত্যাশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলুম। আমার বারো বছরের ছেলে রতন পর্যন্ত খবরটা শুনে অবধি যেন ছটফট করতে লাগলো।

খবরের কাগজ এলো সেদিন একটু বিলম্বে। প্রেস সেট ছিল। এমন প্রায়ই হয়। দেখা গেল খবরটা সত্যই। বিভিন্ন প্রদেশের বাছা-বাছা বাহাত্তর জন কংগ্রেস সেবককে বন্দী করা হয়েছে। এবং আরও ধরপাকড় চলছে। সমস্ত কংগ্রেস-কমিটি ও সভা-সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হয়েছে।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের এই অবিমৃষ্যকারিতার সংবাদ পেয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠলুম। এ আর-পির ব্যাপারে নানা সম্প্রদায়ের ও নানা সমাজের লোকের সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল। গভর্ণমেণ্টের উপর লোকের মনোভাবের পরিচয় কতকটা যা পেয়েছিলুম—তাতে বুঝেছিলুম দেশের লোকেরা এ-অপমান নীরবে সহ্য করবে না। কংগ্রেসকে তারা দাসত্বের বন্ধন—পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্তি দেবার অকৃত্রিম নিঃস্বার্থ বন্ধু বলেই জানে-মানে-শ্রদ্ধা করে ও ভালোবাসে।

আমার আশঙ্কা মিথ্যা হল না। ভারতের সমস্ত প্রদেশে আগুন জ্বলে উঠলো। প্রতিদিন খবর আসতে লাগল কোথায় টেলিগ্রাফের তার কেটে দিয়েছে—রেল লাইন উপড়ে ফেলেছে কোথায় কোথায় বা উন্মত্ত জনতা থানা জ্বালিয়ে দিয়েছে, পোষ্ট অফিস পুড়িয়েছে, ট্রেজারী লুট করেছে, রেল ষ্টেশনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, ট্রামগাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ডাকবাক্সগুলো ধ্বংস করেছে। পুলিশ-ব্যারাক ও সৈন্যশিবিরও জ্বালিয়ে দিয়েছে—হুলস্থুল কাণ্ড বেধে গেছে চারিদিকে। কলকাতা-কানপুর দিল্লী-লাহোর-বোম্বাই মাদ্রাজ-নাগপুর-এলাহাবাদ সর্বত্র চৈ চৈ শুরু হয়েছে। ভারত জুড়ে যেন এক প্রলয়! মহা-বিপ্লব হয়ত একেই বলে।

ব্রিটেনের সমস্ত সামরিক শক্তি ও পুলিশ বাহিনী এই বিদ্রোহ দমনের জন্য দেশে দেশে ফ্যাসিস্টদের চেয়েও নিষ্ঠুর উৎপীড়ন শুরু করে দিলে। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের প্রায় আট লাখ লোক সেদিন সরকারী কয়েদখানায় বন্দী হল। কত গ্রাম জ্বলে গেল, কত গৃহ ভস্মীভূত হ'ল; কত পরিবারে একটিও পুরুষ আর বেঁচে রইল না। বন্দুকের গুলিতে, লাঠির আঘাতে, বৈমানিক সৈন্যদের বোমা বর্ষণে ও মেশিনগানের মুখে কত যে নিরীহ নির্দোষীও প্রাণ দিলে তার সংখ্যা হয় না।

১৯৪২ সালের সারা আগষ্ট মাস ধ'রে চললো সশস্ত্র শক্তিমান ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ কত নিরস্ত্র নেতৃত্বহীন বীর্যবান যুবকদের বিশৃঙ্খল অসম সংগ্রাম। জাতীয় যজ্ঞ আগুনের মতো সবার মুখের বুলি তখন—ভু-অর-ডাই! নগরে-নগরে, গ্রামে-গ্রামে ইংরেজ শাসনের বীভৎস রূপ তার প্রচণ্ড উগ্রতা নিয়ে করাল মূর্ত্তিতে দেখা দিলে। মৃত্যুঞ্জয়ী দেশপ্রেমিকদের তাজা রক্তে রাজপথগুলো লাল হয়ে উঠলো।

জাপানের আক্রমণ থেকে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য ব্রিটিশের বিপুল সমরসজ্জা তখন ভারতের সর্বত্র সম্পূর্ণ সুসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল। কাজেই ভারতযোড়া এ আগুন নেভাতে ওদের তিনটি মাসও লাগেনি। রক্ত শাসনের সে ভৈরব চণ্ড-নীতি মানব সভ্যতার এক নিষ্ঠুরতম নিষ্পীড়নের ইতিহাস রচনা করে গেল। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের নির্দেশ মেনে নিয়ে কংগ্রেস যদি ১৯৩৯ সালে এই প্রস্তাব গ্রহণ করতো কে জানে

ভারতের ইতিহাস হয়ত অন্যরূপ ধারণ করতো। কিন্তু ১৯৪২এর এই বিলম্বিত কংগ্রেস নির্দেশ—এই স্বতঃস্ফূর্ত গণ-অভ্যুত্থান এই বিপুল নির্যাতন—শুধু ভারতের অপরিমেয় ক্ষয় ক্ষতি হত্যা ও রক্তপাতেই পর্য্যবসিত হল। তারপর চললো দীর্ঘকাল ধ'রে এর চরম শাস্তি ভোগ—পাইকারী জরিমানা, জেল, বেত্রদণ্ড ও ফাঁসির রজ্জুর কঠিন বন্ধনে গলা দিয়ে এ হঠকারিতার নির্মম প্রায়শ্চিত্ত।

দেখতে দেখতে কোচবিহারের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে দীর্ঘ দু'বছর আমরা কাটিয়ে দিলুম। মহাকালের অনন্ত বিস্তৃতির সব-ভোলানো প্রলয়ের আগষ্ট আন্দোলনের কথা জনসাধারণের মন থেকে প্রায় মিলিয়ে এসেছে তখন। রেডিওর কল্যাণে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সংবাদ তখন ছড়িয়ে পড়েছে ভারতের সর্ব্বত্র। নেতাজীর বক্তৃতা শোনবার জন্য নিঃশব্দে ভিড় জমছে রেডিওবান বন্ধুদের গৃহে গৃহে অতি সঙ্গোপনে।

চিঠিপত্রে মাঝে মাঝে খবর পাচ্ছি বোম্বাইতে পলাতকেরা একে একে ফিরে আসছেন কলকাতায় ধনে-প্রাণে অভিগ্রস্ত হয়ে।

আমিও ফিরবো ফিরবো ভাবছি, এমন সময় অত্যন্ত চিন্তিত মুখে একদিন দিদি এসে বললেন—নেপু! খোকার সম্বন্ধে বড় ভাবনায় পড়েছি ভাই।

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—কেন বলো ত? কী হয়েছে ওর? দিব্যি ত সুস্থ শরীরে খেলে বেড়াচ্ছে—

দিদি একটু কুণ্ঠিত হয়ে বললেন—তাত' বেড়াচ্ছে, কিন্তু

কিন্তু কি? ব্যস্ত হয়ে আমি জানতে চাইলাম।

কণকাল ইতস্ততঃ করে দিদি বললেন -আজ কদিন হ'ল, ওর খাওয়া যেন অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে—

হো হো করে হেসে উঠে বললুম –এই কথা? তা' এতে এত ভয় পাবার কি আছে? ওদের শরীর যে এখন বাড়তির মুখে, খাওয়া তো এখন একটু বাড়বেই! তা ছাড়া ছিল ত' কলকাতার সেই ইটের খাঁচায় বন্ধ হয়ে, এখানে খোলা বারান্দার ফাঁকায় থেকে বোধকরি ওর চেহারটা ভালোই লেগেছে।

দিদি যেন একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন—আমিও তাই ভেবে চুপ করেছিলুম। কিছুই বলিনি তোকে এতদিন। কিন্তু আমার এখন সন্দেহ হচ্ছে নেপু, আমরা যা ভাবছি হয়ত তা নয়। যে ছেলে ছ'খানা-আটখানার বেশী রুটি খেত না কোনোদিন, সে হঠাৎ বিশ-বাইশখানা রুটি খেয়েও বলছে, পিসিমা আরও দাও, পেট ভরেনি! সকালে চায়ের সঙ্গে দু-স্লাইস রুটির বেশী নিত না, এখন আস্ত একখানা পাঁউরুটিতেও ওর কুলুচ্ছে না। জলখাবারের লুচি পেলে তো বিকেলে গোনা আটখানা তাও কতদিন ফেলে রাখতো দু-একখানা। এখন কুড়িখানা লুচি খেয়েও বলে আরও দাও! এসব লক্ষণ তো ভালো নয়! একে বলে 'রাক্ষুসে-খিদে'। একটা কঠিন ব্যামোয় ধরবে ওকে শেষে! তুই নিজে ডাক্তার। বুঝে দেখ কি করা উচিত। আমি বলি কি—সিভিল সার্জ্জন-ডাক্তার ধরকে দেখালে হ'ত না?

হুঁ! কথাটা ভাববার বটে। ব্যাপারটা ঠিক স্বাভাবিক নয়! বললুম—আচ্ছা, তুমি আরও দিন আষ্টেক দেখ—

বাধা দিয়ে দিদি বললেন—আমার সাহস হয় না নেপু। আমি আজ দশ-বারোদিন থেকে এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করছি। কিছু বলিনি তোদের। ছেলেপিলের খাওয়া নিয়ে খুঁতখুঁতে নেই। কিন্তু আর চুপ করে থাকা চলে না। এই পরিমাণ খাওয়ার পরও দেখি ও ভাঁড়ারের একটা খাবার জিনিসও রাখে না। নিঃশব্দে কখন ঢুকে সব খেয়ে আসে। সন্দেশ, রসগোল্লা, বাতাসা, মুড়ি মায় চেলিগুড় পর্যন্ত বা থাকে নিঃশেষে সব চেঁচে-পুঁছে খেয়ে বেরিয়ে যায়। আমি বড় ভয় পেয়েছি নেপু। ও বয়সের ছেলের পক্ষে এটা স্বাভাবিক লক্ষণ নয়।

—তা বটে, তাহলো নয়-ই। বলে আমিও অকূল চিন্তা-সাগরে তলিয়ে গেলুম! Voracious eater! ইংরাজীতে একটা কথা আছে বটে। হঠাৎ কি খোকার প্যানক্রিয়েটিক গ্ল্যাণ্ডস গুলো অস্বাভাবিক প্রবল হয়ে উঠলো? বেশী খাওয়া হয়ত শক্ত নয়, কিন্তু সেটা হজম করাই কঠিন।

বললুম—আচ্ছা দিদি! আমি তো ভেবে পাচ্ছিনি। সিভিল সার্জেনকেই জিজ্ঞাসা করবো খোকার কথা। আর, আজকে রাত্রে তুমি খোকাকে আমার সঙ্গে খেতে দেবে বুঝলে?

বেশ! তাহলে কিন্তু তোমার আজ রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত রেডিওর কান পেতে বসে থাকলে হবে না! রাত্রি আটটার মধ্যে খেয়ে নেওয়া চাই। নইলে খোকা ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুমুলে ওকে তুলে খাওয়ার কার সাধ্যি।

সেই রকম ব্যবস্থাই হ'ল। রাত্রে খোকা আমার পাশে বসেই খেলে। এক এক করে গুণে গেলুম। বাইশখানা রুটিই খেলে বটে! এ যে অবাক কাণ্ড!

এবার আমিও ভয় পেলুম। সকালে উঠেই দৌড় দিলুম সিভিল সার্জন ডাঃ ধরের চেম্বারে। তিনি সব শুনে বললেন—Absurd! এ হতেই পারে না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি সব জেনে নিলেন—রুটির সাইজ কত বড়, আটার ওজন কত ইত্যাদি। তারপর বললেন, ছেলেটিকে আজ রাত্রেই নিয়ে আসুন আমার কাছে আমি পরীক্ষা করে দেখবো, তারপর নিজের সামনে বসিয়ে খাওয়াবো।

কথামত রঞ্জনকে নিয়ে ডাঃ ধরের বাড়ী হাজির হলুম। ডাঃ ধর খুব ভালো করে খোকাকে পরীক্ষা করে দেখে তার সঙ্গে নানা গল্প জুড়ে দিলেন। কথায়-কথায় জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, সব চেয়ে বেশী খেলে—তুমি ক'খানা রুটি খেতে পারো?

খোকা বলে ফেললে—তা আট-দশখানা অনায়াসে খেতে পারি!

কিন্তু আমি যে তোমার বাবার মুখে শুনলুম—তুমি আজকাল চুড়ি-বাইশখানা খাচ্ছো! আমি যে তাই তোমার জন্যে আজ তিরিশখানা রুটি করিয়েছি। তোমার আজ আমাদের বাড়ী নেমন্তন্ন যে! আমাদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাবে—কেমন?

কথাটা শুনে খোকার মুখ শুকিয়ে গেল। বললে—না আমি এখানে খাব না। আমি পিসিমার কাছে যাবো।

আমি ধমক দিয়ে বললুম—ছিঃ খোকা। ওকথা বলতে নেই। ডাক্তার সাহেব আজ আমাদের নেমন্তন্ন করেছেন যে!

খোকা রেগে উঠে বললে—নেমন্তন্ন বুঝি কেউ লুচি খাওয়ায়? নেমন্তন্ন বাড়ী তো সবাই লুচি খায়!

ডাঃ ধর হাসতে হাসতে বললেন—তুমি ঠিক বলেছো খোকন। আমার বলবার ভুল হয়েছে। তোমার জন্যে আমি আজ ডিফিনখানা লুচিই করিয়েছি। চলো, হাত চল! খাবে চলো।

টেবিলে বসে খাওয়া হচ্ছিল। আমি আর রঞ্জন বসেছি একদিকে, আর ডাঃ ধর বসেছেন আর একদিকে, অর্থাৎ ঠিক রঞ্জনের সামনে। রঞ্জন একটুও ভাবতে পারবে না যে, ডাঃ ধর লক্ষ্য করছেন তার প্রত্যেক গ্রাসটি—মুখে তোলা,—প্রত্যেক হাত নাড়া—নড়া-চড়া - এদিক ওদিক চাওয়া, উসখুস করা—এবং সুযোগ বুঝে একেবারে চারখানা, ছ'খানা করে লুচি পাত থেকে তুলে নিয়ে নিজেদের মধ্যে নীচের হাত নামিয়ে বাঁ হাতে চালান করা এবং পকেট থেকে রুমাল বের করার অছিলায় বাঁ হাতের সেই লুচিগুলি পকেটস্থ করা।

রঞ্জন নিজে খেলে অবশ্য আট-দশখানাই, কিন্তু, বারবার তিনবার হাত সাফাই করে, পকেটে পুরলে প্রায় খান পনেরো ষোলো লুচি। রঞ্জনের পাশেই বসে আমি খাচ্ছিলুম। আমি কিন্তু এসব কিছুই টের পাইনি।

খাওয়া-দাওয়ার পর ডাক্তার ধর বললেন, রঞ্জনকে আমার ড্রাইভার গাড়ী করে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসুক। আপনি একটু বসুন। এখনও তো রাত বেশী হয়নি। এই সবে আটটা বাজলো।

রঞ্জন বললে—গাড়ী চাই না আমার। একটুখানি ত পথ। আমি হেঁটেই যেতে পারবো।

ডাঃ ধর জিজ্ঞাসা করলেন, রাতে তোমার একলা যেতে ভয় করবে না?

রঞ্জন বুক ফুলিয়ে গর্ব করে বললে—আমি এর চেয়েও রাতে একলা নদীর ধারে জঙ্গল পর্যন্ত যেতে পারি। আমরা আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ব্যাণ্ডেট! আমাদের ভয় বলে কিছু নেই।

ডাঃ ধর হাততালি দিয়ে বলে উঠলেন—শুভ! এই ত চাই! স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ সৈনিক তোমরা!—তোমাকে তোমাদের ওপর করতে হবে। যাও, তবে তুমি একলাই বাড়ী যাও। তোমার বাবা পরে যাবেন।

রঞ্জন ডাঃ ধরকে নমস্কার করে চলে গেল।

আমি হেসে বললুম—বেটা আমার বেশ চালিয়াৎ হয়ে উঠেছে দেখছি! এর চেয়েও রাতে নদীর ধারে জঙ্গল পর্যন্ত একলা যেতে পারেন—না হাতী! ওর বাবাই পারে না। তা'ছাড়া নটা বাজতে না বাজতে তো বাবাজীর অর্ধেক রাত! ঘুমিয়ে কাদা হয়ে যায়—কিন্তু কতগুলি লুচি খেলে দেখলেন ত স্বচক্ষে। উঃ!

ডাঃ ধর গম্ভীর ভাবে বললেন—আপনার ছেলে আর যাই হোক, মিথ্যাবাদী সে নয়। ও সত্যি কথাই বলেছে। আট-দশখানা লুচি ও অনায়াসে খেতে পারে এবং খেয়েছেও তাই। কিন্তু, আর সময় নষ্ট করলে

আমরা ওকে ধরতে পারবো না। উহুঁ। এখনি ওর পিছু নিতে হবে। ও প্রায় খানকুড়ি পুঁচি পকেটে পুরেছে। আমি দেখতে চাই সেগুলো নিয়ে ও কি করে? খুব সম্ভব রাস্তার ধারে খানাে ফেলে রেখে। পাইয়ে দাম কেনবার জন্যে এ একটা বোধহয় ওর ছেলেমানুষী-খেয়াল।

উঠে পড়লেন ডাঃ ঘর। আমিও চললাম তাঁর পিছু পিছু। রাস্তায় নেমেই দেখি কিছু দূরে বাবাজী চলে গেছেন ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকারে উল্কা ফেলে। আমরা নিঃশব্দে তার অনুসরণ করলুম।

রঞ্জন যখন আমাদের বাড়ী ছাড়িয়ে চলে গেল এবং মোড়ফুরে শিহুনের নদীর পথ ধরলে, আমি বিস্মিত হয়ে ডাঃ ঘরের গা'টিপে অতি মৃদুস্বরে বললুম—ব্যাপার কি ডাক্তার সাহেব? ও চললো কোথায় এত রাত্রে একলাটি?

ডাঃ ঘর তেমনি মৃদু স্বরে আমাকে জানালেন—আমার ছেলে মিথ্যে কথা বলে না। অনুমান হয় ও নদীর ধারে জঙ্গল পর্যন্ত যাবেই। আসুন দেখা যাক।

নদীর ধারে খুব ঘন জঙ্গলের মধ্যে সেখানে অনেক দিনের পরিত্যক্ত এক সাধুর ভাঙা আস্তানা আছে। বাবাজী সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালো। আমরা একটা গাছের আড়ালে আত্মগোপন করলুম। রঞ্জন সাবধানে এদিক-ওদিক চেয়ে একটা শিস দিলে।

চারিদিক নিস্তব্ধ। একটু পরেই দেখি জঙ্গল থেকে কে একজন লোক বেরিয়ে এলো। মাথায় বড় বড় চুল উস্কো-খুস্কো। একমুখ দাড়ি গোঁফ। পরণে অতি জীর্ণ মলিন কাপড় জামা।

লোকটি পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বললে—স্বাগতম্! কিশোর বীর! আজ যে এত শিগ্‌গীর এসে পড়লে? তোমার আসার সময় তো রাত সাড়ে ন'টায়।

রঞ্জন তাকে আজকের ঘটনা সমস্ত অকপটে বললে। তার সঙ্গে একথাও বললে যে ডাক্তার সাহেবের বাড়ী থেকে আজ আমার লুকিয়ে খাবার আনতে বড্ড লজ্জা হচ্ছিল। নিজেদের বাড়ী থেকে আনতে লজ্জা করে না।

লোকটি রঞ্জনের পিঠ চাপড়ে বললে—নাই বা খাবার আনতে তাই আজ! একদিন না খেলে মানুষ মরে না। আমাকে ত' বহুদিন না খেয়ে কাটাতে হয়েছে। তুমি দয়া না করলে হয়ত আরও কতদিন উপবাসে কাটাতে হ'ত! হয়ত অনাহারে মরেই যেতুম!

রঞ্জন বললে—আপনার জীবন মূল্যবান। আপনার মতো একজন দেশভক্ত যদি না-খেয়ে মারা যায় তবে সে-পাপ যে আমাদের লাগবে।

লুচিগুলি পকেট থেকে বার করে দিলে রঞ্জন! আর এক পকেট থেকে বার করে দিলে খবরের কাগজে মোড়া বাতাসা, সন্দেশ, খানিকটা ছোলা। এক পুরিয়া চিনি, একখানা পাঁউরুটি। এগুলো কাল সকালে খাবেন। আজ বাতাসা আর সন্দেশ দিয়ে লুচি খান। আমি ঠিক করেছি, কাল থেকে বাবার খালি সিগারেটের টিনে ভরে তরকারী নিয়ে আসবো! নইলে আপনার বড় কষ্ট হবে!

লোকটি তখন খেতে শুরু করে দিয়েছে। দীর্ঘ উপবাসী বুভুক্ষুর ক্ষুধা পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে বললে—ধন্যবাদ!

রঞ্জন বললে—আমার কাপড় জামা যে আপনার গায়ে হবে না, নইলে এনে দিতে পারতাম। আপনার জামা কাপড় বড্ড ছিঁড়ে যখনা হয়ে গেছে—

লোকটি হেসে বললে—ছ'মাস যে এই এক কাপড়ে রয়েছি ভাই। কোথায় আগষ্ট ১৯৪২—আর আজ জানুয়ারী ১৯৪৩! ছ'মাস পুলিসের চোখ এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি—দেশ-দেশান্তরে অনশন—অর্দ্ধাশন—বিবসন—এইত অধিকাংশ ভারতবাসীর ভাগ্যে!

রঞ্জন বললে—মাকে বলেছি—বাবার এক সেট পুরণো জামা কাপড় আমাকে দিতে হবে। মা কাল খুঁজে দেখে বার করে দেবেন বলেছেন! যদি পাই, আমি কাল দুপুরেই নিয়ে আসবো।

লোকটি বললে—আমরা যদি জন্মভূমিকে স্বাধীন করতে নাও পারি, দুঃখ নেই। তোমাদের মতো ছেলে যখন জন্মেছে দেশে—ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই—

রঞ্জন সাগ্রহে প্রশ্ন করলে—স্বাধীন হবে আমাদের জন্মভূমি? আপনি ঠিক বলছেন ত?

—নিশ্চয়! লোকটির কণ্ঠে সুদৃঢ় প্রত্যয়।

খাওয়া শেষ হয়ে গেল। লোকটি বললে—তুমি একটু দাঁড়াও ভাই! এগুলো তোমার কাছেই থাক। আমি নদীতে জল খেয়ে আসি।

সেই ফাঁকে আমরা দুজনে ছুটে গিয়ে রঞ্জনকে আমাদের পরিতৃপ্ত বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলুম!

———

অনুরাগের

শ্রীসীতা দেবী

বাপ মায়ের একমাত্র সন্তান, কাজেই ঐশ্বর্য শৈবাল বিবাহ দিয়া ঘরে বধূ আনিবার ইচ্ছাটা স্বাভাবিক নহে। সুতরাং শৈবালের বিবাহের ব্যবস্থা হইতে কিছু দেরিই হইল। পনেরো বৎসরের মেয়ে; মাইনর পর্যন্ত তাহাকে বাপ মা বরাবরই দিয়াছেন, অতএব তাহাকে পুরাপুরি পনেরো বৎসরের দেখায় না। চড়িও কলিকাতার বাস নয়, তবু কলিকাতার খুব কাছে, সভ্যতার আলোক সেখানে অবধি দিবা পৌঁছিয়াছে। শৈবাল এত দিন বসিয়া থাকে নাই, বাড়ীতেই মাষ্টারের কাছে এবং বাবার কাছে সামিকটা পড়াশুনা করিয়াছে। মেয়ের রং পরিষ্কার নয় শ্যামবর্ণ, এই তাহার একটা বড় খুঁত। অবশ্য দেহের গঠন ও মুখশ্রী বেশ ভাল, চুল ও একরাশ আছে, তবু ফরসা বা বাড়িয়ে সুন্দরী বলিয়া কেহ তাহাকে স্বীকার করেন না। প্রথম দুচার জন যাহারা তাহাকে দেখিতে আসিল, তাহাদের মেয়ে পছন্দ হইল না। একজন বলিল, "বড় চাপা মেয়ে, আমরা একটু ছোটখাটো খুঁজি।"

তৃতীয় বারের পরীক্ষায় শৈবাল উত্তীর্ণ হইল। ছেলের মামা ও বাপ স্বয়ং দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা মেয়ের দিকে একবার তাকাইয়া বলিলেন, "বেশ মেয়ে," পেট ভরিয়া জলখাবার খাইয়া বাহিরে তাঁহারা প্রস্থান করিলেন। তবে স্থানীয় একটি পরিচিত লোকের সঙ্গে ছেলেরা বসিয়া খানিক পরামর্শ করিলেন। ঐ ত একমাত্র সন্তান, বাড়ীঘর সম্বন্ধে কতটা কি আছে তাহা ভাল করিয়া জানা দরকার। জানিতে পারিলেই ছেলের বাবা কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় পাকা কথা দিয়া দিবেন।

শৈবালের মা স্বামীকে বলিলেন, "ওদের ত খুকীকে পছন্দ হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে— নয় গা?"

শুভঙ্করবাবু বলিলেন, "তাইত কথাবার্ত্তার মনে হল। আমার কিন্তু বর ততটা পছন্দ হয় নি, অল্প-পাড়াগেঁয়ে, ছেলেই বোধহয় সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র পড়াশুনো করেছে। আমরা খুকীকে একটু অন্যরকম করে মানুষ করেছি কিনা, ওদের ঘরে কি মানিয়ে চলতে পারবে।"

শৈবালের মা বলিলেন," ছেলে যদি ভাল লেগে সম্বন্ধ কিরিও না বাপু, শ্বশুরের ঘর আর ক'দিনের? এরত কলকাতায় ছেলে কাজ করবে, তার কাছেই থাকবে। অমন এক আধটা খুঁৎ থাকবেই। আমাদেরও ত মেয়ে কালো।"

শুভঙ্করবাবু চটিয়া বলিলেন, "আমাদের খুকীর মুখে যা শ্রী আছে, একশটা ফরসা মেয়ে খুঁজলে তেমন পাবেনা। ঐ ত রাজেনের মেয়ে ঝিনুকী, ফরসা ত বটে, কিন্তু খুকীর পাশে দাঁড়াতে পারে?"

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "তোমার মেয়ে তুমি ত বলবেই বাপু, লোকে কিন্তু রং ফরসা না হলে সুন্দর বলে স্বীকারই করে না।

কালীপদ বাড়ুজ্যে বাড়ী গিয়া গৃহিণীর কাছে শৈবালদের বাড়ীঘর বাগান পুকুর প্রভৃতির প্রচুর বর্ণনা করিলেন, কি কি খাইয়া আসিয়াছেন তাহা ও বিশদ ভাবে বুঝাইয়া বলিলেন। বারবার করিয়া এক কথার পুনরুক্তি করিলেন, "ঐ একটাই মেয়ে, সব ঐ পাবে।

গৃহিণী বলিলেন, "তা ত বুঝলাম, মেয়ে দেখতে কেমন?"

কর্ত্তা বলিলেন' "তাহলে হ. বড় বড় চোখ, নাক মুখ ভাল, খুব চুল আছে, গা ভরে গহনা পরিয়ে দিয়েছিল।"

ছেলের মা বলিলেন, "গহনা ত লোকে চেয়ে চিন্তেও পরায়। গায়ের রং কেমন?"

কালীপদ বলিলেন, "তা খুব কালো কিছু নয়, তোমার আমার মতন হবে?"

গৃহিণী বলিলেন, "তবেই হয়েছে! কনে দেখাতে যায় করেছে, একটু কি আর রং-টং আসায়নি? হয়ত একে যারে কুচকুচে কালো। তোমার যা ইংরিজি নবীন সাহেবী মেয়াদের ছেলে, তার হয়ত পছন্দই হবেনা। আমরা বিয়ে দিলাম বেন, ছেলে যদি একেবারে অপছন্দ করে?"

কালীপদ হাসিয়া বলিলেন, "তবে বেটা নিজে গিয়ে দেখে আসুক। বাঙালীর ঘরে মেমসাহেব কোথা পাব? আবার কুটুম্বের অবস্থাও ত দেখতে হবে? চাষরে ছেলে ত চলবে না? মেয়ের বিয়ে দিতে আমার ত তিটেমাটি উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। বোয়ের রূপ নিয়ে তখন ধুয়ে খাবে?"

গৃহিণী বলিলেন, "সে ত ঠিক। তবু ঐ আমাদের এক ছেলে ত? একেবারে তার অমতে চলা ঠিক নয়। দেখেই আসুক না হয়। পছন্দ না হয়, তখন বোঝান যাবে।"

মিহিরের তখন ও পড়াশুনা শেষ হয় নাই। এম্, এস্, সি পরীক্ষা দিয়া একটা চাকরিতে ঢুকিয়া তবে বিবাহ করিবার তাহার ইচ্ছা ছিল কিন্তু মা বাবা অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। ছোট বোনের বিবাহে অনেক ঋণ হইয়াছে, মিহিরের উচিত সুপুত্রের মত বড়লোকের মেয়ে বিবাহ করিয়া বাপকে ঋণমুক্ত করা। অগত্যা সে আর আপত্তি করিতেছেনা, পরিণত মন তাহার মোটেই প্রবণ নয়।

কনে দেখিতে যাইবার প্রস্তাবে প্রথমে সে রাজীই হইলনা। তাহার পর অনেক বলা কহার একজন বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া মেয়ে দেখিতে চলিল।

শৈবালের মা তাহাকে এবার আরো বেশী করিয়া সাজাইয়া দিলেন। নিজে সেকেলে মানুষ, যদি আধুনিক রুচিমত ঠিক সাজাইতে না পারেন, সেই জন্য দুইচারজন আধুনিকাতরুণী প্রতিবেশিনীকে ডাকিয়া আনিলেন। শৈবালকে তাহারা টানিয়া আনিয়া চুল বাঁধিতে বসাইল। শৈবালের মা তাহাদের উপকরণ জোগাইতে লাগিলেন।

শৈবাল বলিল, "কি বাপু রোজ রোজ এই এক উৎপাত আমার সহ্য হয়না।"

পাশের বাড়ীর বৌ মন্দাকিনী বলিল, "উৎপাত আবার কি? মেয়ে হয়ে জন্মেছিস্, সাজ-গোজ ও চিরকাল করতে হবে। একে উৎপাত ভাবলে চলবে কেন?"

শৈবাল হাসিয়া বলিল, "সাজতে কেন খারাপ লাগবে? তবে সেজে গুজে সংয়ের মত যার তার সামনে দাঁড়াতে ভাল লাগে না।"

আর একজন বৌ বলিল, "ঐ যে-সে ছেলের ভিতরই একজন সর্দার হয়ে উঠবে যে?"

শৈবাল মুখ লাল করিয়া চুল করিয়া রহিল। প্রচুর রসিকতা গল্পগাছার ভিতর দিয়া ঘণ্টা-দুই পরে মেয়ের সাজসজ্জা সমাপ্ত হইল। তরুণীরা মহা খুশি, কি চমৎকার দেখাইতেছে! শৈবাল বলিল "প্রায় চেনাই যায় না যেন" শুধু মেয়ের মা বলিলেন, "বাপি ঐ কাঁথানা গহনা দিলি? অন্তওনিও পরিয়ে দে।"

নন্দরাণী বলিল, "না খুড়ী মা, অমন করে সাজালাম, একগাদা গয়না পরিয়ে বেড়োনী বানিয়ে দিও না। দেখ দেখি কেমন দেখাচ্ছে, যেন পটে আঁকা ছবি। তোমার ভয় জামাইয়ের মুণ্ডু ঘুরে যাবে একেবারে।"

মিন্টির মাথা ঘুরিল কিনা তাহা অবশ্য তখনি কিছু বোঝা গেলনা। মেয়েটিকে তোরে তাহার ভালই লাগিল যেন। গোবরসের মত একটি মুখ পাউডার ও চন্দনের অনকা তিলকাং ভূষিত হইয়া যে তাহার সামনে হাজির হইল না, ইহাতে সে পরম তৃপ্তি অনুভব করিল। মেয়েটি স্মার্টও হইয়াছে, গান গাহিতে পারে, ইহাকে অপছন্দ করিবার কি আছে? বন্ধুটির তাবিক করিতে লাগিল, মিন্টির অবশ্য মুখে কিছু বলিলনা। অল্পক্ষণ পরেই তাহারা চলিয়া গেল।

শৈবালের বন্ধুরা তাহাকে চাঁপিয়া ধরিল, "কি গো, বর পছন্দ হল?"

শৈবালের বর পছন্দই হইয়াছিল। কিন্তু বলিল, "আমি তো কাউকে বলিনি। আমাকে তো পছন্দ করার তার কেউ দেয়নি?"

একজন বলিল, "ইস্, স্বয়ম্বর হবার সাধ হয়েছে নাকি? তবে চিঁড়ের ফলে ফলালি কেন?"

শৈবাল বলিল "স্বয়ম্বর যাদের হত তারা কি সব বিলেত থেকে আসত নাকি? তারা তো চিঁড়ের দেশেই ছিল!"

"এ মেয়ের সঙ্গে কথায় কে পারবে?" বলিয়া লজ্জিতার মত এক একজন করিয়া চলিয়া গেল।

বরপক্ষের পছন্দের খবর আসিয়া পৌঁছিল। বিবাহের আয়োজন চলিতে লাগিল। আত্মীয় বিষয় কালীপদ বাঁড়ুয্যে দাবি-দাওয়া বিশেষ কিছু করিলেন না। বলিলেন, "ভদ্রলোক উনি, ধরে সুতে দেবেন, নিজের মেয়ে জামাইকে তো আর ঠকাবেন না? তা ঝিয়ের খরচ বলে কিছু যেন দিয়ে দেন।"

গুরুদয়াল সেইরকম ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। স্ত্রীকে বলিলেন, "এই আমাদের শেষ। আর কোনো-দিন কিছু করতে হবে না। খুঁৎ কোথায় কিছু রাখব না।"

স্ত্রীরও তাহাতে আপত্তি বিশেষ কিছু ছিল না। কাজেই মাসিকপত্রের দিন হইলেও কোনো আয়োজনের ত্রুটি হইল না। মেয়ের ও মেয়ের মায়ের গহনা-গাটি যত ছিল না, ভাবিয়া চুরিয়া শৈবালের গা-ভরা গহনা হইল। শাড়ী জামা—যত রকমের সব ছিল তাহাও সংগ্রহ করা হইল। বাসন কোসন, আসবাব প্রভৃতি পাড়া গাঁয়ের গৃহস্থ ঘরে যাহা প্রয়োজন হইতে পারে, সমস্ত কিছুই কেনা হইল। আত্মীয় বন্ধু, যে যেখানে ছিল, নিমন্ত্রণ হইয়া গেল সকলের। অনেককে দূর দেশ হইতে ট্রেণ ভাড়া দিয়া আনান হইল। সর্বোপরি খাওয়ানোর আয়োজনও বন্ধ হইল না। কন্যার গায়ে-হলুদের দিনও খুব ঘটা করিয়া প্রতিবেশিনীদের খাওয়ানো হইল।

বিবাহের দিন মহোৎসবের ব্যাপার দেখিয়া কালীপদ নীচু গলায় শ্যালক তারাপদকে বলিলেন, "এ যে বেজায় ঘটা দেখি ভায়া। অবস্থাটা খুবই ভাল হবে বোধহয়?"

ফালিক বলিলেন, "বৌকা শক্ত বাড়ুয্যে, অনেকে অমন বাইরে খুব আড়ম্বর করে, পেটে কি আছে তা ধরি জানেন।"

কালীপদ একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি না বলেছ, বিষয়-আশয় বেশ আছে। খোঁজ নিয়ে দেখেছ ত?"

তারানাথ বলিলেন, "যতটা খোঁজ করা সম্ভব, ডিটেকটিভ লাগান যায় না ত?"

যাহা হউক, বিবাহ ভালয়-ভালয় হইয়া গেল। বরযাত্রীরাও বাস্তবিকই নিন্দা করিবার কিছু খুঁজিয়া পাইল না। পরের দিন মা বাপকে কাঁদাইয়া, নিজেও দুই চোখ ভরা জল লইয়া শৈবাল এতদিনের পরিচিত সংসার ছাড়িয়া, নূতন ঘর বাঁধিবার আশায় অচেনা অজানা মানুষগুলির সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল।

বরপক্ষ খুব বেশী ঘটা করিল না। বিবাহের পরও বলিয়া তাঁহারা যাহা ধরিয়া লইয়াছিলেন, তাহার সবটাই প্রায় পাওনাদারেরা আদায় করিয়া লইয়াছে, সুতরাং ঘটা আর হইবে কি দিয়া? তবু পাড়াপ্রতিবেশী একদিন খাইয়া গেল, গ্রামের মেয়েরা দিনকতক নূতন বৌকে ঘিরিয়া আদর জমাইয়া বসিয়া রহিল। সমালোচনা ভাল মন্দ কতরকম যে হইল তাহার ঠিকানা নাই। কেহ বলিল ভাল, কেহ বলিল কালো, কেহ বলিল মিহিরের পক্ষে বড় বেমানান হইয়াছে, কেহ বলিল এই রকমই ভাল, একেবারে পুতুী হইলে কি এখন মানাইত?

মিহিরের ঠাকুরমা সোনার চাঁদ দিয়া নাতবৌয়ের মুখ দেখিলেন, মা দিলেন জমুস্তি-পাকের বাটা; গ্রামের লোক বিস্মিত হইল, বলাবলি করিল, "এত টাকা দরাজ তা'ত জানতাম না। নিজেদের মেয়েকে ও ছিটেফোঁটা ভাকের গহনা দিয়ে বিদেয় করেছে।"

আর একজন বলিল, "তেমনি কাঁটাও আছে মেয়ে।"

শৈবালের শ্বশুরবাড়ী জিনিষটাকে বড় ভয় ছিল। কিন্তু এখানের আদর যত্নে তাহার মন আশ্বস্ত হইল। মিহিরের সঙ্গে তাহার বড় শীঘ্রই বনিয়া গেল, কতটা তাহার নিজের গুণে এবং কতটা মিহিরের গুণে তাহা অবশ্য বলা যায় না। যেন দুই জনই এতকাল পরস্পরের জন্যই পথ চাহিয়া বসিয়াছিল।

মিহিরের বোন কিরণ বলিল, "এই না দাদার বিয়ের মত ছিল না? এখন যে দেখি বৌদির আঁচল আর ছাড়তেই চায় না"

মায়ের এতটা বাড়াবাড়ি ভাল লাগিতে ছিল না, তবু বলিলেন, "পছন্দ হলেই ত ভাল বাপু, এদেই কোনদিন ছেড়ে গেলে কি আর ভাল হত?"

শৈবাল ছেলেমানুষ হইলেও বুদ্ধিমতী মেয়ে, সমালোচনার সাপটাটার ঘাড় তাহার গায়ে লাগিল। মিহিরকে বলিল "তুমি দিনের বেলা আমার ঘরে এসো না!"

মিহির হাসিয়া বলিল, "কেন? তবে কার ঘরে যাব?"

শৈবাল বলিল, "না, ঠাকুরঝি কেউ এঁরা পছন্দ করেন না। বাংলাদেশে নিজের বৌকে ভালবাসা বড় নিন্দের কথা।"

মিহির বলিল, "অন্যের বৌয়ের ভালবাসলেও ত বেশি কেউ খুসি হয় না। তাহলে ভালবাসা ফোটা যাবে কোথায়?"

শৈবাল বলিল, "ওটা বোধহয় মফঃস্বলের আমদানী কিনিস, আমাদের দেশের ভদ্রলোকরা ঠিক চলন করতে পারছেন না।"

মিহির বলিল, "তা কেন বলে? কালিদাস, ও ভবভূতি, এঁরাও সব আমাদের দেশেরই কবি। তাঁদের কাব্যে প্রেমের ছবি তা'হলে এমন করে ফুটল কি করে?"

এত বড় মেয়ে, তাহাকে আর বাপের বাড়ী ফেলিয়া রাখা কাহারও মত নয়। তবু বিশেষমত কয়েক দিনের জন্য শৈবাল বাপের বাড়ী গেল। অবাক হইয়া দেখিল, এই চিরবিদেয় ঘরে ফিরিয়া আসিয়া তাহার মন কেমন করিতেছে। সন্ধ্যাবেলা চোখ দুইটা বাপসা হইয়া আসে কেন? ফিরিয়া যাইবার দিন যখন আসিল, তখন সকলকে বিস্মিত করিয়া একরকম হাসিমুখেই শৈবাল শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেল।

সঙ্গিনীরা বলিল, "কলির মেয়ে বাবা! কেমন নিজের ঘর চিনেছে দেখেছ?"

মিহির চোখের পাশ টিপিয়া দিয়া বলিল, "এত দেরি করলে কেন? আমি ত আর পাঁচ ছ'দিন পরেই কলকাতা চলে যাবো।"

শৈবালের গলাটা কেন ধুইয়া আসিতে লাগিল। কোনো মতে জিজ্ঞাসা করিল, "ঝুমি, রবিবারে আসবে না?"

মিহির বলিল, "আগে ত প্রতি সপ্তাহে আসতাম না, এখন এলে যদি মিস্ করো? তোমার যে বড় ভয় নিজেকে?"

শৈবাল দুই হাতে তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "তবু তুমি এসো। নইলে আমি থাকতে পারব না।"

মিহির বলিল, "এইবার পথে এস।"

দিন কয়েক ভালভাবেই কাটিল। তাহার পর চৈত্র নিষ্ঠুর আকাশ হইতে রক্তপাত।

তারানাথ সকালবেলাই চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। কালীপদ বাহিরের ঘরে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কি ব্যাপার ভায়া? অমন করছ কেন? বোসো, তামাক খাও।

তারানাথ বলিলেন, "আর তামাক। এদিকে যে তরাডুবি হতে চলল।"

কালীপদ রীতিমত ভয় পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন কি হয়েছে? খুলে বল।"

তারানাথ বলিলেন, "বলছি খুলে। এই যে তোমার বেয়াই মশাই বংশপুত্তুর দুর্দিষ্টির, সব বিষয়-আশয় বাঁধা দিয়ে বসে আছেন। চাকরিও ত ছেড়ে দিয়েছেন, ক'টা টাকা কি পেন্সন্? কোনদিন ও বিষয় আর ছাড়াতে হবে না। বিয়েতে ঘটা দেখে যখন আহ্লাদে গলে যাচ্ছিলে, তখন তোমারও গলায় ছুরি চালিয়ে ঘটা হচ্ছিল।"

কালীপদ অগ্নিমূর্তি হইয়া বলিলেন, "তোমাকে তাহলে আমি খোঁজ নিতে বলেছিলাম কি করতে? এর নাম খোঁজ নেওয়া?"

তারানাথ বলিলেন, "আমি কি করব? আমি কি C. I. D. পুলিশ? গ্রামের যারদার কাছে জিজ্ঞেস করেছি সবাই এক বাক্যে বলেছে, বিষয় আশয় বেশ ভাল আছে যার কিছু নেই। গাঁয়ের মহাজনদের কাছে

শুদ্ধ খোঁজ করেছি, তাহাও বলেছে তারা শুকদয়ালকে একপয়সা ধার দেয়নি। এখন সাত গা ডিঙিয়ে, নিজের শ্বশুর বাড়ীর গায়ে গিয়ে যে সব বাঁধা দিয়ে টাকা নিয়ে এসেছে, তা জানব কি করে?"

কালীপদ ছুটিলেন পৃথিবীর কাছে। এমন সুসংবাদ একলা হজম করা দুঃসাধ্য। তারানাথ বিরস কিন্তু মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে পিছন পিছন চলিলেন।

পৃথিবী ত একেবারে সমস্বরে চেঁচাইয়া মহা কাটিয়া পড়িলেন। নীচু গলায় কথা বলা এখনিতেই তাঁহার আসে না, আজ তাঁর গলা সপ্তমে চড়িয়া গেল। পাঁচ ছ'মিনিটের মধ্যে গ্রামের কাহারও আর জানিতে বাকি রহিল না যে কোন এক "অলুপেয়ে ডাকরা মিন্‌সে কালীপদ দস্তীকে নিদারুণ ঠকাইয়াছে এবং ভগবানের মনে কি করিতে আছে যদি ইহাদের মাথাতেই পড়িতে না পারে?

মিহির ঘরে বসিয়া পড়িতেছিল, অদূরে বসিয়া বৈবাল মাকে চিঠি লিখিতেছিল। মায়ের চীৎকারে মিহির চমকাইয়া উঠিল, বৈবালের চোখ হইতেও কলমটা পড়িয়া গেল, ভয়পাণ্ডুর মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "অমন করে কি আমার বাবাকে গাল দিচ্ছেন?"

মিহিরের সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না, তবু সংক্ষিপ্ত মুখে বলিল, "বেরোচ্ছি" বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মা তাহাকে দেখিয়া হাঁক দিয়া বলিলেন, "তোমার ধন্যপুত্তুর যুধিষ্ঠির শ্বশুরের কাণ্ড শোন বাছা!

জোচ্চোর মিন্‌সে। এখনও চন্দরসূর্যি উঠ্‌ছে গা।"

মিহির বলিল, "হয়েছে কি? এত না চেঁচালেও ত চলে।"

মা বলিলেন, "কেন চেঁচাব না, একশ বার চেঁচাব। কারো খাই, না পরি? ওরা কোথায় যাব? এমন করে গলায় ছুরি দিলে গা? অমন ঘটার মুখে ঝাঁটা মারি, অমন মানুষের মুখে ঝাঁটা মারি। হে ভগবান তুমি দেখো, যারা এমন করে আমাদের বুকে দাগা দিল, তাদের বুক যেন পুড়ে যায়, যারা এমন করে মিথ্যে বলে, তাদের জিভ যেন খসে যায়।"

মায়ের দিকে তাকাইয়া মিহির জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে আপনি খুলে বলুন ত? শুধু চেঁচালে কি হয়েছে তাও ত বোঝা যাবে না।"

তারানাথ বলিলেন, "তোমার শ্বশুর বিষয়-সম্পত্তি সব বাঁধা দিয়ে দিয়েছেন।"

মিহির বলিল, "তাতে কি হয়েছে? তাঁর নিজের সম্পত্তি তিনি দরকার হলে বাঁধা দিতেই পারেন।"

মা ভ্যাঙাইয়া বলিলেন, "তাতে কি হয়েছে? ঐ কালপেঁচা মেয়েকে নিয়ে এখন তবে কি করতে? এত রকম কিনা শেষেই হু এনেছি। ঐ ক'টা টাকা কি তোর মত ছেলের খুশী পণ হল? ঘুঘুড়োর মেয়ের জন্যে ত দু'হাজার টাকা নগদই দিতে চেয়েছিল। মেয়ে আর এর চেয়ে কি সুন্দর ছিল? না হয় এর ক'গাছা চুল বেশী আছে। আর রংটা তার চেয়ে এক পোঁচ ফরসা? তা ধোয়ের রূপ নিয়ে কি ধুয়ে যাব, না চুল পেতে শোব? ওমা, আমার যে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে গো!"

তারানাথের এত চীৎকার সহ্য হয় না, তিনি বলিলেন, "ডাক ত যথেষ্টই ছাড়ছ, এ গা ছাড়িয়ে পরের গায়ে পৌঁছল এতক্ষণ। একটু শলা-পরামর্শ দরকার, শুধু হাউ-মাউ করে লাভ কি? আমি যদি একবার চাটুয্যের কাছে যাওয়া যাক।"

মিহির জিজ্ঞাসা করিল "কেন ?"

তারানাথ বলিলেন, "কেন আবার ? কেন এমন কাজ করলেন সেটা জানা ও দরকার ! বিষয়-সম্পত্তি এখন আইনতঃ তোমার প্রাপ্য, তিনি অমনি ভাসিয়ে দিলেই হল ?"

মিহির বলিল, "বিষয়-সম্পত্তি আমাকে দেবেন এমন কোনো কথা কি বিয়ের সময় হয়েছিল ?"

কালীপদ এতক্ষণ পত্নীর চীৎকারে এবং ভাবুকের বক্তৃতায় কোনো কথা বলিবার ফাঁক পায় নাই। ছেলের কথায় এবার অলিন্দ উত্তীর্ণা বলিলেন, "থাকো দেওো না বাপু, যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছ, এত বোকা তুমি নও। তোমার বাবার বিষয়-সম্পত্তি বেশ আছে, আর ঐ এক মেয়েই সব পাবে এই ভেবেই আমরা এ বিয়েতে মত দিয়েছিলাম। নইলে ওর চেয়ে ভাল মেয়ে কত পাওয়া যেত ছ'ভাজার পণ নিয়ে লোকে সাধাসাধি করেছে, তোমার মা ঐ যা বললেন। এখন তোমার যদি তুলে তুলে সর্বস্ব খুইয়ে বসে থাকেন, তাহলে সেটা অন্যায় হয় না ? এতে আমাদের বলবার কিছু নেই ?"

মিহির বলিল, "দেনা-পাওনার কোনো কথাই সেখানে হয়নি, সেখানে কেন যে তিনি নিজের সম্পত্তি বাধা দিতে পারবেন না, তা আমি কিছু বুঝলাম না। সম্পত্তির লোভেই যদি তোমরা বিয়ে দিয়ে থাক, তাহলে সে কথা তখন তাঁকে বলা উচিত ছিল। সেটা জেনেও, তারপর যদি তিনি সম্পত্তি বাধা দিতেন, তখন অবশ্য তোমাদের কিছু বলবার অধিকার থাকত।"

পৃথিবী হাত নাড়িয়া আবার চেঁচাইয়া উঠিলেন, "চুপ কর ছোঁড়া। বক্তিমে করছে যেন শ্বশুরের হয়ে, যেন ও পাড়ার রাখু মোক্তার। লজ্জাও নেই, বৌ ছুঁড়ি একে একেবারে গুণ করেছে যা !"

মিহির বিরক্ত হইয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, শৈবাল এক কোণে জড়সড় হইয়া বসিয়া কাঁদিতেছে। কাছে গিয়া তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "কাঁদছ কেন ? ওরা অসুখের মত চেঁচামেচি করছেন, তোমার বাবার সত্যিই কোনো দোষ নেই।"

শৈবাল সাড়ম্বরে বলিল, "এই সব কথা শুনলে কখনও সহ্য হয় ? গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে যে ?"

মিহির তাহার চুলের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "পৃথিবীতে বুদ্ধিহীন মানুষ চিরকালই ছিল, এবং চিরকালই থাকবে। তার জন্যে অন্যের গলায় দড়ি দিতে হলে ত বিপদ। যা হোক, এ সব কথা যাতে তোমায় যেন শুনতে না হয়, তার ব্যবস্থা করছি।"

শৈবাল জলভরা চোখে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ব্যবস্থা করবে ?"

মিহির বলিল, "আমি পরশু যাব ভেবেছিলাম, তার বদলে চল আজ রাত্রেই তুমি আর আমি বেরিয়ে পড়ি।"

শৈবাল কান্নার মধ্যেই হাসিয়া বলিল, "আমি কি তোমার মেসে গিয়ে থাকব ?"

মিহির হাসিয়া বলিল, "না, মেসে থাকতে হবে না, গিয়ে আমার এক মেসোমশাই আছেন, তাঁর বাড়ী উঠব। তোমাকে একবার নিয়ে যেতে তাঁরা বলেওছেন অনেক বার। তারপর ধীরে সুস্থে ব্যবস্থা করা যাবে। আমার পরীক্ষা হতে ত চারমাস মাত্র বাকী। দেখতে দেখতে কেটে যাবে। ওখানে অসুবিধা হয় ত তুমি তোমার মা বাবার কাছেও গিয়ে থাকতে পার।"

শৈবালের চোখে আবার জল আসিয়া পড়িল। বলিল, "না, ওখানে যাব না। সবাই হাজার কথা জিজ্ঞেস করবে, আমি কি উত্তর দেব?"

মিহির তাহাকে আদর করিয়া চোখের জল মুছাইয়া দিল। বলিল, "বেশ, কলকাতাতেই থেকো। কটা টাকাই বা খরচ? আমি চাকরি নেব। গোটা কতক সোনার মেডেল আছে, বেচে দিলেই হবে।"

শৈবাল বলিল, "এক গাদা গহনা ত আমারও রয়েছে।"

মিহির বলিল, "ও থাক্ এখন। জিনিষপত্র যা-যা নিতে হবে, চটপট গুছিয়ে ফেল দেখি। আমি যাই ষ্টেশনে, গোটা তিন কুলি জোগাড় করতে পারি কিনা দেখি। যা বিটকেল সময়ে ট্রেণ, লোক পেলে হয়। একদিক দিয়ে ভাল অবশ্য, চুপচাপ চলে যাওয়া যাবে, কোনো গণ্ডগোল হবে না।"

শৈবাল দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "ওমা, সে কি? ওদের বলে যাবে না? চুপি চুপি চলে যাবে?"

মিহির বলিল, "বলতে গেলে অনেক হাঙ্গাম। তার চেয়ে চিঠি লিখে রেখে চলে যাব, কলকাতায় পৌঁছেই খবর দিয়ে দেব।"

শৈবাল বলিল, "যাবার সময়ও ত ওরা টের পেয়ে যাবেন?"

মিহির বলিল, "আরে না! এই শীতের রাত্তিরে বারোটা অবধি আমার মা বাবা জেগে থাকবেন? হয়েই হয়েছে! একবার লেপের তলায় ঢুকলে, বাড়ীতে ডাকাত পড়লেও তাঁদের ঘুম ভাঙে না। তুমি জিনিষপত্র গোছাও, আমি ষ্টেশনের কাজটা সেরে আসি।"

মিহির বাহির হইয়া গেল। তাহার মায়ের ঘর হইতে তখনও গুঞ্জন-গর্জনের শব্দ শোনা যাইতেছে। পাড়া প্রতিবেশী যাহারা আসিয়া জুটিয়াছে, তাহারাও সব সেইখানেই! মিহিরকে যাইতে দেখিয়াও কেহ বিশেষ কিছু বলিল না। দুই একজন বোধ হয় এমন পরিস্থিতিতে শৈবালের অবস্থাখানা দেখিবার আশায় দুই একবার তাহার দরজায় একটু ঠেলা দিল। কিন্তু দরজা ভিতর হইতে বেশ ভালভাবে বন্ধ দেখিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেল।

বুড়ী দুই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া, গাল দিয়া মিহিরের মা শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, পেটও কাঁদিতে সুরু করিয়াছিল। অগত্যা বাহির হইয়া রান্নাঘরে গিয়া বসিলেন, এবং নিজের মনে বকিতে বকিতে রান্নাবান্না সারিতে লাগিলেন। অন্যদিন শৈবাল আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করে, আজ সে আসিল না, তিনিও তাহাকে ডাকিলেন না।

যাইবার সময়ও কাহারও নাম না করিয়া এক হাঁক দিয়া বলিলেন, "যাচ্ছ যাচ্ছ খাবার খেয়ে নাও বাপু। কারো খোসামুদী করা আমার পোষায় না, কারো দাসীও নই, বাঁদীও নই।" বলিয়া দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া নিজের শয়নকক্ষে চলিয়া গেলেন। মিহির আসিয়া যাইয়া গেল, শৈবাল ঘর হইতে বাহির হইল না। বুড়ী ঠাকুরমা অবশেষে আসিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গেলেন। বলিলেন, "তাদের সঙ্গে রাগ করতে নেই দিদি, খেয়ে নাও। শাশুড়ীর পাশ আবার কোন মেয়ে না খায়? ও ধরতে নেই।"

অন্ধকার রাত্রে মিহির বুটের মাপের জিনিসপত্র চাপাইয়া শৈবালের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গেল

প্রথম কয়েক পদ আঁধারে পথ চলিতে বড়ই অসুবিধা হইল, কারণ পাছে টর্চ্চ আলিলে কেহ দেখিতে পায়, এ ভয় ছিল। বাকী পথ কুলীদের ও ইলেকট্রিক টর্চ্চের সাহায্যে তাহারা বড়রাস্তাই পার হইয়া গেল। ষ্টেশন বাড়ী হইতে বেশী দূর নয়, মাইল খানেক হইবে।

সকালবেলা উঠিয়াই গৃহিণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"ওগো দেখ এসে, কি সর্ব্বনাশ হল আবার! সদর দরজা হাঁ করে খোলা! যখনই ও ভোচ্চোরের বেটিকে ঘরে ঢুকিয়েছি, তখনই জানি আমাদের আর মঙ্গল নেই।"

কালীপদ কাপড়খানা কোনোমতে জড়াইতে জড়াইতে ছুটিয়া আসিলেন। বলিলেন, "হাঁ ত! দেখ দেখি খোকা ঘরে আছে কিনা? সে কোথাও বেরোয়নি ত?"

"সে আমার এই সাত-সকালে কোথায় বেরোবে? এত ভোরে সে ওঠে কোনদিন? দেখছি তবু", বলিতে বলিতে গৃহিণী গিয়া মিতিরের দরজায় ঘা দিলেন। ভেজান দরজা ঠেলা দিয়া খুলিয়া গেল। ভিতরে কেহ নাই। খাটের উপর বিছানা নাই, মিতিরের ট্রাঙ্ক নাই, বোসের বড় ট্রাঙ্কটা নাই, চাঁদ বাক্সটা নাই, আরও টুকিটাকি অনেক জিনিষ নাই।

"ওগো পালিয়েছে গো, সর্ব্বনাশী আমার বাছাকে নিয়ে পালিয়েছে গো! ওমা কোথায় যাব আমি! এইটুকু মেয়ের পেটে এত! ছেলেকে আমার পর করে দিলে গা!"

কালকার মত আজও আশেপাশের লোক ছুটিয়া আসিয়া কালীপদর উঠানে জমা হইল। তারানাথও আসিয়া জুটিলেন। ভগিনীর পদ্মনেত্রে আঙুলনাড়া দিয়া বলিলেন, "নাও বাপু, গায় তাতে চেঁচিয়ে সাতপাড়া মাথায় কোরো না। গেছে ত গেছে, তাতে হয়েছে কি? শ্বশুরবাড়ী গেলই না হয় দুদিনের জন্যে? হাঁকাহাঁকি না করলে তোর যেমন পেটের ভাত হজম হয় না! বলেই ত ছিল যে, আমরা ক'দিনের জন্যে বৌটাকে পাঠিয়ে দিয়েছি, তারপর কথাবার্ত্তা কওয়া যেত। তুমিই বা কি লোক বাপু, একটু সামলে চলতে বলতে পার না?"

কালীপদ মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, আমার কথা শোনবার জন্যে ত তোমার বোন বসে আছে! আমি উঠতে না উঠতেই চেঁচিয়ে হাট বসিয়ে দিয়েছে।"

কালীপদর বৃদ্ধ মাতা বলিলেন, "ঐ এক স্বভাব বৌমার। আমি বুড়ী মাগী এখনও বেঁচে আছি, তা ছুটো কথা কোনোদিন আমাকে জিগ্যেস কর? তা না, সব তাতে নিজের বুদ্ধি খাটান। তুই এখনও ঘেঁষাল্লুণ, তোর এত গলা কেন বাপু?"

স্বামী, ভ্রাতা, শাশুড়ী সকলের দিকে বিদ্রূপের হাসিতে হাসিতে কালীপদ-গৃহিণী তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া গেলেন। লোক যাহারা জমা হইয়াছিল, তাহারা তামাসাটা শান্তিপথে ফসকাইয়া যাওয়াতে ক্ষুণ্ণ হইয়া যে যাহার বাড়ী চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল।

কালীপদ নীচু গলায় বলিলেন, "গহনাগাটি সব ত নিয়েই গেছে দেখছি। আগে যদি ঘুণাক্ষরেও জানতাম, তাহলে আটকে রেখতাম। তা ঘরের লক্ষ্মী বিসর্জ্জন, ছেলেই আমার বাদ সাধল। শিগ্গীর কি কোনো দিকে চোখ আছে? জানে খালি চেঁচাতে।"

তারানাথ বলিলেন, "সব আমার কিরে তোমারই ঘরে আসবে ভাবা, চিন্তা কোরো না। গুরুপরাণ লোকটা ভাল আদলে, সে যে মেয়ের গহনা বেচে খাবে, এমন মনে কোরো না। তার আগে মুটেগিরি করবে। বিবাহ-আশ্বা যারা যে দিয়েছে, তা কিছু অস্বীকার মনে করে যেয়নি। সত্যিই খোলাখুলি কোনো কথা ত হয়নি? ছাড়াবার ব্যবস্থা কিছু করে রেখেছে কিনা তাই বা কে জানে? আগেই গালমন্দ দিয়ে তাদের বিগড়ে দিলে, এর ফল ভাল হবে না, বিশেষ ছেলেও যখন খানিকটা তোমার বেহাত হয়ে গেছে দেখছি।"

কাদাপদ হাত উল্টাইয়া বলিলেন, "সবই অদৃষ্ট, তুমি আমি কি করব? এখন মনটা বড় অস্থির হয়ে রইল যে! লোক পাঠাব নাকি খোঁজ নিতে?"

তারানাথ বলিলেন, "আরে না না, তুমি ত স্থির হয়ে বোসো দেখি তোমরা। ওরা নিজেরাই খবর দেবে, তাদের মনেও তোমরা ছেলের মা বাপ, এত উতলা হওয়া তোমাদের সাজে না। আর ছেলে ত তোমার আর যাবে কোথা কলকাতাতেই চলে যাবে, কত খবর নেবে তখন নিও। চাঙ্গায় করে তার পরীক্ষাটার মাথা খেয়ো না যেন।

তাহাই হইল। বিকালের দিকে একটা টেলিগ্রাম আসিয়া তাঁহাদের আশ্বস্ত করিল। ছেলে-বৌ কলিকাতায় গিয়া উঠিয়াছে জানিয়া তাঁহারা আরো খানিকটা অবাক হইয়া গেলেন, তবে তারানাথের পরামর্শমতে ইহা লইয়া উচ্চবাচ্য করিলেন না। "লেখা বেশী কচলালে তেতো হয়ে যায় বুঝলে তারা" বলিয়া তারানাথ তাঁহাদের সাবধান করিয়া দিলেন। "বেশ, কলকাতাতেই থাক এখন, বেশী বকাবকি কোরো না। ছেলেটি তোমার একটু মৈথিই হয়ে পড়বে বোধ হচ্ছে। তবু তোমাদের ও ভালবাসে, বেশী ঘেঁটিয়ে পর করে দিও না। সুখো, তুমি একটু বুঝে চলো বাপু।"

সুখো অর্থাৎ বাড়ুজো-গৃহিণী সুখদার বুঝিয়া চলিবার ইচ্ছা বা ক্ষমতা খুব বেশী ছিল তাহা নয়, তবু পরিবারের সকলের মতের বিরুদ্ধে ইচ্ছামত চীৎকার করিতে তিনিও সাহস করিলেন না, ঘরে ঢুকিয়া আপন মনে গজ্‌গজ্‌ করিতে লাগিলেন। ঝেঁটাকে আচ্ছা করিয়া গালাগালি দিয়া সব ক'খানা গহনা কাড়িয়া লইবার সম্যগবগত অধিকার যে তাঁহার আছে, অথচ পেটের সন্তান ভয়ে যে তাহা করিতে পাইতেছেন না, ইহার মনস্তাপ সারাক্ষণ তাঁহাকে কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল। ঐ একটাই ছেলে, বার্দ্ধক্যের একমাত্র ভরসা, তাহাকে পর করিয়া দিবার সাহসও হয় না যে! ইহারই মধ্যে ত সে আধীন, নিজের স্কলারশিপের জোরে আর টিউশনির জোরে পড়াশুনা করে। পাশ দিয়া যখন চাকরী করিবে তখন ত আরো হাতে মাথা কাটিবে! এমন ভাল ছেলে, বিদ্বান ছেলে না হইত, মূর্খ হইয়াও যদি বাপমায়ের বাধ্য থাকিত, সেই বুঝি ভাল ছিল। কিন্তু তাহা হইলে বুড়া বয়সে তাঁহাদের খাওয়াইত কে? বিধাতার বিধান এমন উল্টা-পাল্টা হওয়ায় সুখদা আরও চটিয়া গেলেন।

দিদির তোরঙ্গো বৌ লইয়া মেসোমশায়ের বাড়ী হাজির হইয়া সকলকে বিস্ময়ে অবাক করিয়া দিয়াছিল। তবে সুখের বিষয় অবাক হইবার জন্য বেশী লোক সেখানে ছিল না। মাসীমা, ছোট ছেলে-মেয়েদের লইয়া দিন কয়েকের জন্য বাপের বাড়ী গিয়াছিলেন, বাড়ীতে ছিলেন খালি মেসোমশায়

এবং কোর্ট-ইয়ারের ছায় একটি ছেলে। চাকর একজনই ছিল, সে পৃথিবীর অন্তপস্থিতিতে গেল ছুটা-মাসকতন্ত্র গুছাইয়া লইয়াছিল। শৈবাল আসাতে সে একদিক দিয়া অসন্তুষ্ট হইল, তবে চা করা, তরকারি কোটা ও মাঝে মাঝে রান্না করা, বাড়ীঘর পরিষ্কার রাখা প্রভৃতি কাজে আপাতত সাহায্য পাইয়া তাহার মনের ভার কিছু কমিয়া গেল। শৈবালও এখানে আসিয়া বেন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

মেসোমশায়ের অবস্থা ভাল নয়, চার পাঁচমাস তাঁহার ঘাড়ে ভর করিয়া থাকা চলে না। মিহির তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া খরচ লইতে রাজী করিয়া ফেলিল। হাতে যা টাকা ছিল তাহাতে একটা মাস চলিয়া গেল, দ্বিতীয় মাস হইতে যেভেদ কিস্তী সুরু হইল। কলিকাতায় খরচ কি বেশী হয় সে বিষয়ে স্বামী বা স্ত্রী কাহারও পরিষ্কার ধারণা ছিল না। একটু ভয়মিশ্রিত বিস্ময়ের সঙ্গে তাহারা এখন আবিষ্কার করিল যে যত টাকায় চারমাস চলিবে তাহারা ভাবিয়াছিল, দুই মাসের মধ্যে তাহা ফুরাইয়া গেল।

শৈবাল প্রৌঢ়-গৃহিণীর মত স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "ভাবনা আবার কিসের? আমার এক গাছি গহনা রয়েছে না?"

মিহির হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা থাক্, অত সিন্নীপণা করতে হবে না। আপাতত মা আর ঠাকুরমা তোমাকে যে গহনা দুখানা দিয়েছিলেন, সেই দুটো আমাকে এনে দাও দেখি। এখন বার দিয়ে রাখি, পরে ছাড়িয়ে নেব চাকরী হলে।"

শৈবাল মুখ কালো করিয়া বলিল, "যদি চাকরী হতে অনেক দেরী হয়?"

মিহির তাহার খোঁপা ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া বলিল, "তখন তোমার গহনা বেচে খাব। না, না, তোমার ভয় নেই, অনেক দেরী হবে না। চাকরী আমাকে করতেই হবে তাই তা. আমি তের আগে থেকেই তার সন্ধান করছি। দু'-চারটে সন্ধান পাওয়াও গেছে, একটা না একটা লেগে যাবে।"

শৈবাল ট্রাঙ্ক খুলিয়া স্বামীর নির্দ্দেশমত গহনা দুখানা বাহির করিয়া দিল। চা খাইয়া, কাপড়-চোপড় বদলাইয়া মিহির সেগুলির ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে চলিল।

ফিরিয়া আসিল যখন তখন রাত হইয়া গিয়াছে। শৈবাল ভাহার ভাত লইয়া বসিয়া আছে, বাড়ীর আর সকলের খাওয়া হইয়া গিয়াছে। শৈবাল দেখিল স্বামীর মুখ বড় গম্ভীর। জিজ্ঞাসা করিল "কাজ কি হয়েছে? টাকা পেলে না বুঝি?"

মিহির সংক্ষেপে বলিল, "না।"

শৈবাল বলিল, "কেন? তাহলে এখন কি করবে?"

মিহির বলিল, "খাবারটা দাও দেখি, আগে খেয়েনি, বেজায় খিদে পেয়েছে। তারপর ও সব ভাবনা ভাবা যাবে।"

খাওয়া দাওয়ার পরও কোনো ভাবনা ভাবিবার তাহার উৎসাহ দেখা গেল না। বাতি নিভাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িল। শৈবালও আর বার বার এক কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইল না, সেও ঘুমাইয়া পড়িল।

সকালে উঠিয়া মিতির বলিল "আচ্ছা, এই শেষ মাস দুটো বাড়ীতে থেকে এলে হয় না? তাহলে এ সব ঝঞ্ঝা ঝেঁচাঝেঁচি করতে হয় না। জিনিষটা আমার মোটেই ভাল লাগছে না।"

মাতৃত্বের কণ্ঠস্বরের শক্তি মনে আসিতেই সৈবালের বুক শুকাইয়া গেল, বলিল, "যা বলছ বুঝেশুনে বলছ তো?"

মিতির বলিল, "এমন ধারণা যদি করা যায় যে তিনি বকবেন না? তাহলে আপত্তি আছে?"

সৈবাল মাথা নাড়িয়া জানাইল যে তাহার আপত্তি নাই। স্বামীকে বিদায় করিতে সে একেবারেই চায় না, কিন্তু তাহার কান্না পাইতেছিল।

পরদিন রেলোয়েবাবের কাছে বিদায় লইয়া তাহারা দুইজনে যাত্রা করিল। বলিয়া গেল দরকার কিনিয়া আসিতেও পারে।

বিকাল বেলা মনে সুখদা দিবানিদ্রা সারিয়া উঠিয়া বসিয়াছেন, এমন সময় ক্যাচ্ ক্যাচ্ করিতে করিতে একখানা গরুর গাড়ী বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধা গাড়ীর বাম্পিয়ের ধাওয়ায় বসিয়া পরম আরামে পোহাইতেছিলেন, তিনি ডাকিয়া বলিলেন, "বৌকা এল না বৌমা।"

সুখদা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত লাফাইয়া উঠিলেন, কালীপদরও তন্দ্রাটা ছুটিয়া গেল। মিতির তখন নামিয়া পড়িয়াছে, জোয়াল দিয়া সৈবাল ভিতরে বসিয়া আছে। সুখদা গিয়া বরণ আগলাইয়া দাঁড়াইলেন, কালীপদ পিছন হইতে সাবধান করিলেন, চেঁচো, "আকাশ কাটিও না যেন চেঁচিয়ে।"

সুখদা গলা যথাসম্ভব নীচু করিয়া বলিলেন, "বৌকা এলে কিরে? কিন্তু ও জোচ্চোরের বেটিকে আর কেন?"

মিতির তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল, "তোমাকে শক্ত কথা বলতে আমার ভাল লাগে না মা, কিন্তু তুমি আমাকে বলিয়ে ছাড়লে। জোচ্চোরের বেটি ও নয়, সে তোমরা যাই বল, কিন্তু জোচ্চোরের বউ বটে। এখনও বুঝে রেখ, আমাদের ঘরে ঢোকে না বিদায় করবে! থাকলে দুজনের থাকব, গেলে দুজনেই যাব।"

সুখদার অনিচ্ছাসত্ত্বেও গলাটা চড়িয়া গেল, "এতবড় কথা! কুলাঙ্গার ছেলে, বাপমাকে তুই জোচ্চোর বলিস?"

মিতির বলিল, "ওর বাবা নিজের বিষয় বাঁধা দিলে যদি জোচ্চোর হয়, তা'হলে বৌকে মুখ দেখে নিজের বাবা আর হাত দিলে—তোমরা জোচ্চোর নও? কলকাতায় তাকরার কাছে জিনিষ বাঁধা দিতে গিয়ে আমি প্রায় পুলিশের হাতে ধরা পড়তে বসেছিলাম।"

সুখদা আবার কি একটা বলিবার জন্য হাঁ করিতেছিলেন, কালীপদ তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন, "হচ্ছে হয়েছে, এখন বেটা বৌকে ঘরে ঢুকতে দাও। তোমার বুদ্ধিতে একদিন তরাডুবি হব আমি।"

সুখদা উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ঢুকিলেন। গাড়োয়ান জিনিষপত্র নামাইতে লাগিল মিতিরের সাহায্যে। বৃদ্ধা দিদিশাশুড়ী আসিয়া সৈবালের হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া গেলেন।

দেশলাই-এর বাক্স

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রশান্তবাবু হঠাৎ মুখ তুলে তাকালেন।

ঘরের উজ্জ্বল আলোটা এখানে তাঁর সমস্ত মুখখানার ওপরে প্রতিফলিত হয়ে পড়ল। আর সেদিকে চোখ পড়তেই আমার শরীরের ভেতর দিয়ে ঠাণ্ডা একটা শিহরণ বয়ে গেল। এত বিবর্ণ তে পাণ্ডুর মুখ আমি দেখিনি। মনে হ'ল শ্মশান থেকে একটা শবকে কুড়িয়ে এনে কেউ চেয়ারটার ওপরে বসিয়ে দিয়েছে। কোটরের ভেতরে নিষ্প্রভ চোখ দুটো হারিয়ে গিয়েছে—অতি প্রসারিত শুষ্ক চর্মাবৃত কপালটার নেপথ্যে যেন মৃত-করোটির ইঙ্গিত।

প্রশান্তবাবু বললেন, সত্যি বলুন তো, এভাবে বাঁচবার কি কোনো অর্থ আছে?

আমি আশ্বাসের সুরে বললাম, কিন্তু আপনি এত কষ্ট পাচ্ছেন কেন? সত্যি সত্যিই আপনি তো খুন করেন নি। কোর্টরের নেপথ্যে চোখ দুটোই যেন দেখা গেল একটুখানি জীবনের স্পন্দন: সেকথা বিশ্বাস করেন আপনি?—আবেগে প্রশান্তবাবুর স্বর কাঁপতে লাগল।

আমি বললাম, কেন করব না? কোর্টই তো প্রমাণ করে গেছে।

—ঠিক কি প্রমাণ করে গেছে? না—রেমিজিয়াস অব ডাউটে ছেড়ে দিয়েছে! লোকে আমার দিকে সন্দেহের বাঁকা চোখে তাকায়। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় কি জানেন? এর চাইতে আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিলেই ছিল ভালো, সন্দেহের এই যন্ত্রণা থেকে আমি মুক্তি পেতাম! রাত্রে ঘুমোতে পারি না—মস্তিষ্কের মধ্যে যেন হাজার হাজার পিন ফুটতে থাকে। খেতে পারি না, মুখের গ্রাস বিস্বাদ হয়ে যায়। পথে বেরুলেই টের পাই চারদিক থেকে অসংখ্য কুটিল ঘৃণার চোখ—

—কিন্তু আপনি তো···

—না, না, আমি খুন করিনি, কখনোই করিনি।—প্রশান্তবাবু প্রায় পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন: কেন আমি খুন করতে যাব আমার স্ত্রীকে? তাকে যে আমি কতখানি ভালোবাসতাম তা আজ আমি পৃথিবীর লোককে বোঝাবো কি করে? অমন স্ত্রী কারো হয় না। সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, শিক্ষিতা। তাকে পেয়ে আমি পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলুম—আমাদের দু'জনের বাইরে যে আর কোনো জগৎ আছে তা যেন আমাদের মনেই ছিল না। একটা বছর যেন স্বপ্নের মতো দিয়ে কেটে গিয়েছিল আমাদের। আজ সে নেই, আজ আমার জীবনের কিছুই নেই। আর তাকে আমি খুন করব?

দু'হাতে মাথা লুকিয়ে দুলিয়ে দুলিয়ে কাঁদতে লাগলেন প্রশান্তবাবু। সান্ত্বনা দেওয়া বৃথা। আমি শুধু অত্যন্ত অস্বস্তিভরে উসখুস্ করতে লাগলাম। সামনের দেওয়ালেই প্রশান্তবাবুর স্ত্রীর ফটো একখানা। সুন্দরী একটি আধুনিক মেয়ে, হাস্যোজ্জ্বল মুখে তাকিয়ে আছে। টানাটানা বড় বড় দুটি চোখ, মুখের

মেয়েটি অত্যন্ত সুকুমার—একটা মার্জিত স্নিগ্ধ-শ্রীতে অপরূপ। এমন মেয়েকে কেউ কখনো খুন করতে পারেনা—এ কল্পনাতীত।

প্রশান্তবাবু বললেন, এ পাড়ায় নতুন এসেছেন আপনি···আপনি আমার প্রতিবেশী। আমি জানি, এর ভেতরই পাড়ার অন্যান্য লোকেরা অনেক কথা হয়তো আপনার কাছে লাগিয়েছে আমার নামে। তবু আপনাকে আমার বাড়িতে ডেকে নিয়ে এলাম। কেন, জানেন? নিজের ওপরে এই বোঝা আমি বইতে পারছি না, কাউকে এর ভাগ দিয়ে কারো কাছে নিজের মনটাকে একান্তভাবে মুক্ত ক'রে নিতে চাই···! হয়তো আপনিও আমাকে ঘৃণা করেন, হয়তো আপনারও মনে হয়েছে—

তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বললাম, না, না।

প্রশান্তবাবুর মনে উৎসাহ প্রকাশ পেল না। বিবর্ণ-প্রেত-পাণ্ডুর মুখটা যেন আরও নিষ্প্রভ, আরও বর্ণহীন হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে বললেন, বেশ বুঝতে পারছি আপনি আমার মন-রাখা কথা বলছেন। তবু সত্য ঘটনাটা আমি আপনাকে খুলে বলব। বিশ্বাস হয়তো আপনি করবেন না, তবু একজনের কাছে নিজের সব কথাটা যে অকপটে বলতে পেরেছি, এই সান্ত্বনাই আমার থাকবে।

মাত্র ছেড় বছর আগে আমি বিয়ে করেছিলাম। প্রথম যৌবন, প্রথম প্রেম। টাকার অভাব আমার নেই, বিদ্যা সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর চাইতে কম আছে বলে মনে করি না। আর স্বাস্থ্য! তার কথা আজকে আর বলে কি হবে। এখন আপনি যাকে দেখতে পাচ্ছেন এ আমি নই, আমার কঙ্কাল, আমার প্রেতমূর্তি। মাত্র ছয়মাস আগে আমি পরিপূর্ণ যুবক ছিলাম, আজ আমি স্থবির—চলমানের ভেতরে ষাট বছর বয়েস জেড়ে গেছে আমার।

আমার স্ত্রী—মীরা। তার সম্বন্ধেও বেশি কিছু বলবার দরকার নেই, বলবার ক্ষমতাও আমার নেই। শুধু বলতে পারি জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতি না থাকলে অমন স্ত্রী হয় না। শুধু রূপ নয়, অমন বিদ্যা, অমন কালচার আর অমন একটি মন নাথে একটি মেয়ের ভেতরেও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

সুখী হয়েছিলাম আমরা, গড়িয়ে গিয়েছিলাম নিজেদের মতো। আমাদের ভালোবাসার ফাঁকি ছিল না কোথাও, মনোমালিন্য ছিল না একবিন্দু। আমাদের কোষ্ঠিতে ছিল রাজযোটক, আর সত্যি সত্যিই যে রাজযোটক হয়েছিল, তাতেই বা সন্দেহ কি! যে দেখত সেই আমাদের হিংসে করত! হয়তো তাদের হিংসার সেই আগুনেই এত সুখ আমাদের কপালে সইল না।

তারপরে একদিন এল সেই কাল রাত্রি।

অথচ সেই সন্ধ্যায় আসন্ন রাত্রির অমন ভয়ঙ্কর বীভৎস পরিণতি কি কল্পনাও করতে পেরেছিলাম আমরা। বিকেল থেকেই ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল—অদ্ভুত বৃষ্টি, রোমান্টিক বৃষ্টি। আমাদের ঘরের জানলার কাচের শার্সিতে মুক্তোর রেণুর মতো বৃষ্টির কণা এসে জমছিল, আমাদের লনে বিলিতী গাছের চারাগুলো বিচিত্র মর্মর শব্দ তুলছিল, ভিজে বাতাসে যেন একটা মাদক-সুখের মতো আসছিল যুঁইয়ের গন্ধ, দুলছিল দরজার সবুজ রেশমের পর্দাটা। ঘরের ভেতরে কস্তুরীর স্মৃতি ছড়াচ্ছিল জলন্ত ধূপকাঠিগুলো, ফুলদানীতে তাজা রজনীগন্ধাগুলো যেন হাসছিল আনন্দে। আর আমার পাশে বসে সেতারে মীরা বাজাচ্ছিল মল্লার।

অপূর্ব সন্ধ্যা—আমাদের জীবনের বহু-স্মরণীয় সন্ধ্যার একটি। আমি চোখ বুজে সেই সুর শুনছিলাম। আপনার কি মনে হয় তখন আমি মীরাকে খুন করবার কালো চক্রান্তটাকে কেমিলে তুলছিলাম মনের ভেতরে?

প্রশান্তবাবুর প্রশ্নের উত্তরে আমি অভিভূত গলায় জবাব দিলাম, না, এ অসম্ভব কথা।

আপনিই বলুন। যে মুহূর্তে জীবনকে মানুষ সব চাইতে প্রিয় বলে মনে করে—যে মুহূর্তে বাঁচাটাকে একান্ত সার্থক, একান্ত পূর্ণ বলে মনে হয়, সে মুহূর্তে কেউ এমন একটা পাশবিক কল্পনা করতে পারে কি? না—পারে না!

রাত বাড়তে লাগল। বৃষ্টি সমানে পড়ছিল—এক সময় উঠে নিজের হাতেই চমৎকার খিচুড়ি আর চিংড়ি মাছের কাটলেট তৈরী করলে মীরা। অসংখ্য গুণের সঙ্গে এ গুণটাও ওর ছিল, খেয়াল-খুসি মতো এক-একদিন ও আমাকে রান্না করে খাওয়াত। অনেক তারকায় অনেক ভালো রান্না খেয়েছি, কিন্তু মীরার সঙ্গে কারো তুলনাই হয় না। আমার স্ত্রী বলে মিথ্যে দম্ভ করছি না—যদি আজ মীরা বেঁচে থাকত তাহলে ও নিজেই এটা আপনার কাছে প্রমাণ করে দিতে পারত!

অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে খেলাম দুজনে। তারপরে ঘরে এলাম, অনেকক্ষণ গল্প করলাম, মীরাকে আমার দেশলাই-এর বাক্সের কালেকশনটা দেখালাম। বলুন, এর ভেতরে কি কিছু অস্বাভাবিকতা আছে?

আমি বললাম, কিছু না।

বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল। আকাশে বাতাসে যেন বাজছিল মীরার সেতারের সেই সুরটা। বাইরে থেকে তেমনি আসছিল যুঁইয়ের গন্ধ, ঘরের ভেতরে ভাসছিল ধূপ আর রজনীগন্ধার সুরভি। আলো নিভিয়ে দিয়ে সেই শব্দ আর গন্ধের মাঝখানে আমরা দুজনে ঘুমিয়ে পড়লাম। আর সেই ঘুমই আমার কাল হল।

টং টং করে দেওয়াল ঘড়িতে যখন দুটো বেজেছে তখন হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল।

খেয়াল হল, মীরা আমার পাশে নেই। প্রথমটা মনে করলাম ওরও বাথরুমে গেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যেন চটকা ভেঙে গেল। এত দেরী করছে কেন মীরা? তা ছাড়া আরো খেয়াল হল বাথরুমে যাওয়ার আগে নির্ভুল-নিয়মে সে বারান্দার আলোটা জ্বালিয়ে রেখে যায়। কিন্তু বারান্দায় কালো অন্ধকার থমথম করছিল। তা হলে ব্যাপারটি কি?

সন্দিগ্ধ আর উৎকণ্ঠিত হয়ে আমি উঠে বসলাম, আরো কয়েক মিনিট প্রতীক্ষা করলাম। কিন্তু মীরার দেখা নেই।

ঘরের আলোটা জ্বালালাম, বারান্দায় এসে বারান্দার আলোও জ্বালিয়ে দিলাম। তারপর বাথরুম—কী আশ্চর্য, মীরা বাথরুমে যায়নি!

বাইরে জোরে বৃষ্টি পড়ছিল। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল আকাশে—গুম্ গুম্ করে গর্জাচ্ছিল মেঘ। সন্ধ্যার সেই স্বপ্নের মতো মৃদু মধুরটা যেন দুর্যোগের রূপ নিয়েছে। আমার ভয় করতে লাগল, উৎকণ্ঠায় আমার বুকের ভেতরটা অবধি শুকিয়ে উঠল। বার বার চেঁচিয়েও ডাকলাম, কিন্তু মীরার সাড়া পেলাম না।

আমি যেন পাগলের মতো হয়ে গেলাম। চারিদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজে এলাম আমার পড়বার ঘরে। তার দরজা খুলে বেই সুইচে হাত দিতে গিয়েছি, অমনি আমার পায়ে কী ঠেকল, আমি ঘরের মেজেতে ঠাণ্ডা একটা নরম জিনিষের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম।

লাফিয়ে উঠে টেনে দিলাম সুইচটা। অন্ধকারের কালো পর্দাটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল, তীব্র উচ্চ আলোতে একটা অবিশ্বাস্য দুঃস্বপ্ন আমার চোখের সামনে জেগে উঠল।

মেজেতে পড়ে আছে মীরা। তীব্র মৃত্যু-যন্ত্রণায় অপূর্ব্ব সুন্দর মুখখানা যেন সাপের বিষে নীল হয়ে গেছে। আকাশী-রঙের শাড়ীপরা ফোটা ফুলের মতো দেহটা স্নান করছে রক্তে। সর্ব্বাঙ্গে পাঁচ সাতটা গভীর ক্ষতচিহ্ন—একটা ধারালো অস্ত্র দিয়ে পাগলের মতো তাকে কুপিয়েছে কেউ। বুক-কোমর, শাদা মেঝেতে চন্দনের ছিটের মতো রক্তের বিন্দু লেগেছে।

ঘর থেকে পালাবো মেকেও যে বুকের দিকে আমি তাকিয়েছিলাম কিনা সন্দেহ। তারপরেই সমস্ত ঘরটা আমার চোখের সামনে তালগোল পাকিয়ে পিণ্ডাকার হয়ে গেল, মনে হল আমার ঘাড় ধরে মাথাটা কেউ সট করে পেছন দিকে ঘুরিয়ে দিল। একটা বোধ আর্ত্তনাদ চেপে যা করে থাকব, তারপরেই অচৈতন্য হয়ে আমার সেই রক্তাক্ত মেঝেটার ওপরেই পড়ে গেলাম।

জ্ঞান হল ঘণ্টাখানিক পরে। তখন মনটা আশু কর্ত্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে কিছুটা। কাঁপতে কাঁপতে রক্তমাখা শরীরে আমি উঠলাম. টেলিফোন ধরলাম, কোনো রকমে থানায় জানিয়ে দিলাম হত্যাকাণ্ডের খবরটা। বলুন তো, কিছু অন্যায় হয়েছে নাকি ?

—না, না, অন্যায় হবে কেন !

—তারপরে এল পুলিশ। লাস পরীক্ষা করলে, তদন্ত করলে, জবানবন্দি নিলে, তারপর—তারপর আমাকেই গ্রেপ্তার করলে ! তাহতে পারেন, আমাকেই গ্রেপ্তার করলে। আমার মীরা, আমার জীবনের আলো মীরা, তাকে আমি খুন করেছি এ রকম কল্পনাও ওরা করতে পারল !

দুহাতের মধ্যে মুখ ঢেকে প্রশান্তবাবু আবার কাঁদতে সুরু করলেন, আর আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম মেঝেরালের গায়ের সেই ছবিখানাকে। উজ্জ্বল, সুন্দর, স্নিগ্ধ, সুকুমার। এমন একটি মেয়ে বেঁচে নেই, একথা ভাবতেও কষ্ট হয় !

প্রশান্তবাবু আবার সুরু করলেন : আমাকে ধরে নিয়ে গেল—আমিন দিলে না। ওদের স্থির-বিশ্বাস আমি ছাড়া এ খুন আর কেউ করতে পারে না। সুতরাং পরম-উৎসাহে খুন করবার তাৎপর্য্য এবং রহস্য উদ্‌ঘাটন করবার জন্যে লেগে গেল।

মেয়ার জেরায় অস্থির করে তুলল। যত ফুট প্রশ্ন, যত নানা রকমের মন্তব্য, ঠিকুজী-কুষ্টী পর্য্যন্ত পুরুষের খবর নিয়ে কত টানাটানি ! কোন্ সেলুনে আমি দাড়ি কামাই, আমার পায়ে কত নম্বর জুতো লাগে, দৈনিক আমি কত ছটাক মাখন খাই আর ঘুমুলে আমার নাক ডাকে কিনা—এ সমস্ত তথ্যই ওরা আবিষ্কার করে ফেলল। কিন্তু যেটা আসল কথা—সেই খুনের কোনো কিনারা ওরা করতে পারল না !

ভাগ্য আমার সব দিকেই প্রতিকূলে। যে খুন করেছিল, ঘরে কিংবা বাইরে কোথাও সে এতটুকু

চিহ্নও রেখে যায়নি! একটা পায়ের ছাপ নয়, একটা আঙুলের ছাপ পর্যন্ত নয়! সে যেন হাওয়ার ভেতর দিয়ে এসেছিল, আবার হাওয়া হয়েই মিলিয়ে গিয়েছে!

কাজেই ওদের স্থির বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গেল, বাইরের কেউ এমন কাণ্ড কখনো করতে পারে না। অতএব এ খুন আমিই করেছি। ভাবুন—ওরা বিশ্বাস করলে, আমিই আমার মীরার হত্যাকারী! উঃ, মানুষ কী অবিবেচক, আর কী অসাধারণ নিষ্ঠুর!

তারপর হত্যার উদ্দেশ্য সম্পর্কে চলতে লাগল জল্পনা-কল্পনা!

সে আরো ভয়ঙ্কর, আরো অমানুষিক। প্রথমে সন্ধান করলে আমার আর কোনো প্রণয়িনী ছিল কিনা, এবং তাকে পাবার পথ নিষ্কণ্টক করবার জন্যে আমি মীরাকে খুন করেছি কিনা। কিন্তু এদিক থেকে আমার নিষ্কলঙ্কতার প্রমাণ পেতে ওদের দেরী লাগল না। শুধু তাই নয়, পুলিসের উর্বর মস্তিষ্কে এমন ধারণাও গজালো যে মীরার কোন পূর্ব প্রণয়ীর সন্ধান পেয়ে হয়তো হিংসাবশে আমি ওকে খুন করেছি। কিন্তু ফুলের মতো নিষ্পাপ ছিল মীরা, তার চরিত্রে এমন অপবাদ স্বয়ং শয়তান এলেও দিতে পারত না।

তাহলে কেন আমি স্ত্রীকে খুন করলাম? আমিই যে খুন করেছি তাতে ওদের সন্দেহ নেই। শুধু কেন খুন করেছি এইটে একবার জানতে পারলেই নিশ্চিন্তে আমাকে ফিতে বেঁধে ঝুলিয়ে দিতে পারে ফাঁসিতে। মার্ডারারকে পাওয়া গেছে, এবার তার মোটিভটা আবিষ্কার করতে পারলেই ঘড়িতে ওরা সময় দেখতে পারে।

উঃ—কী যন্ত্রণার দিনগুলোই যে গেছে আমার! ফাঁসির আসামীদের সেলের পাশেই একটা ঘরে আমাকে আটকে রেখেছিল ওরা, হয়তো একটা মরাল্ এফেক্ট সৃষ্টি করবার জন্যে আমার স্নায়ুকে বিকল করে দিয়ে একটা পরিষ্কার কনফেশন আদায় করে নেবার জন্যে। রাত জেগে জেগে শুনতাম আসন্ন মৃত্যু-ভীত মানুষগুলোর পৈশাচিক আর্তনাদ, তাদের কান্না!—ছেড়ে দাও, জান দেও দে, আর কখনো এমন করব না। হে ভগবান, ইসা মসীহ! অসহায় কাতরতায় কেউ লোহার গরাদেতে মাথা ঠুকত, পাগলের মতো প্রলাপ বকত কেউ, কখনো চীৎকার করে কাঁদত, কখনো বা হেসে উঠত উন্মাদের হাসি। সেই পটভূমিতে আসন্ন কালো মৃত্যুটার ছবি যেন স্পষ্টই দেখতে পেতাম আমি। একটা কথা বলি, মনে রাখবেন। যদি খুনী আসামী হিসেবে কখনো ধরা পড়বার সম্ভাবনা বোধ করেন, তার আগে নিজেকেই খুন করতে ভুলবেন না।

তারপর বিচার হল। আইনের দোহাই দিয়ে আমাকে হত্যা করবার চেষ্টা ওরা অনেক করেছিল, কিন্তু সুবিধে হয়নি। এক চিলতে কাগজ, একখানা চিঠিও ওদের সাহায্য করেনি, মনোমালিন্য, বিষয়-সম্পত্তির কোনো ঝামেলাও সন্ধান করে বার করতে পারেনি ওরা!

আমি খালাস পেলাম—সকলকে নিরাশ করেই খালাস পেলাম। কিন্তু এখন কি মনে হয় জানেন। এই সন্দেহের কুটিল কলঙ্ক নিয়ে বেঁচে থাকার চাইতে ফাঁসি হওয়াই আমার ছিলো ভালো, আমি আমার মীরার কাছে চলে যেতে পারতাম, বেঁচে যেতে পারতাম যন্ত্রণার এই দুঃসহ পীড়ন থেকে।

প্রশান্তবাবুর গলার স্বর আবার কান্নায় ভারী হয়ে গেল।

চা খেয়ে উঠতে যাচ্ছি, প্রশান্ত বললেন, একটু দাঁড়াবেন দয়া করে?

—কেন বলুন তো ?

—একটা জিনিষ দেখাবো। আমার দেশলাই-এর বাক্সের কালেকশন। আপনি নিশ্চয় মুগ্ধ হয়ে যাবেন—বলবেন, হাঁ একটা সংগ্রহ বটে !

সামনেই একটা দামী আলমারী। একটানে সেটাকে খুলে ফেললেন প্রশান্তবাবু। গরগর বিহ্বল স্বরে বললেন, দেখেছেন ?

দেখলাম। নিতান্তই ছেলেমানুষি খেয়াল। তাকে তাকে হাজার দশেক দেশলাই-এর বাক্স সাজানো ! মুগ্ধ হওয়ার মতো কিছু নয়, আমার দশ বছরের ভাইপোটাও এই রকম সিগারেটের বাক্স কুড়োতে ভালবাসে। তবু ভদ্রতা করে বলতে হল, হাঁ, বেশ কালেকশন। খুব যত্ন করে করেছেন মনে হচ্ছে।

—যত্ন !—প্রশান্তবাবুর চোখ দুটো অপার উত্তেজনায় জ্বল জ্বল করে উঠল : শুধু যত্ন ! এ আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বাসনা। কত পরিশ্রম করেছি এর জন্যে, কত টাকা খরচ করেছি। জাপান থেকে, মালয় থেকে পর্যন্ত আনিয়েছি। নিতান্ত অন্তরঙ্গ ছাড়া দেখাই না, সকলে এর মর্যাদা বুঝবে না।

—তা বটে।

প্রশান্তবাবু চকলস্বরে বললেন, তবু অনেকে বলে এ আমার পাগলামি—এ আমার ছেলেমানুষি ! ছেলেমানুষি ! ত্রিশ বছর ধরে আমার এত নিষ্ঠার ব্যাপার, এ হল ছেলেমানুষি ! যারা এমন কথা বলে তারা আমার সব চেয়ে আপনার লোক হলেও আমি তাদের—আমি তাদের

হঠাৎ প্রশান্তবাবুর চোখে যেন হিংস্র একটা বন্য আগুন জ্বলে উঠল : তাদের মুখ আমার দেখতে ইচ্ছে করে না। আমার—আমার মনে হয় সে-সব লোকের বাঁচবার অধিকার নেই। আমার এত সাধনা, এত চেষ্টার জিনিস, তার কোনো মূল্যই নেই ! এ আমি সহ্য করতে পারব না—তা যাই বলুন, আমার কত বড় অন্তরঙ্গই সে হোক !

যেন হত্যাকারীর দৃষ্টি নিয়ে প্রশান্তবাবু তাঁর দেশলাই-এর বাক্সগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। মেজ্জালে মীরার সুকুমার মুখে, নিবিড় কালো চোখ দুটোর ওপরে ইলেকট্রিকের আলো ঝলমল করছিল।

আপন-পর

শ্রীশান্তা দেবী

দুটি মাত্র ছেলে মেয়ে। রেবাঙ্গিনী ও অমরনাথ বাপের অতিরিক্ত যত্ন আদরে তাদের মানুষ করেছিলেন। মফস্বলের ডাক্তার, কি বা আয়? দুশটাকার বেশী কেউ ভিজিট দেয় না। বাঁধা ঘর কয়েকটা আছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ দুবার ফেলে অবে দু'টাকা দেয়। বলে—অসুখ বিসুখ করলে ন'মাসে ছ'মাসে দেখানে ত আর চলে না, যতক্ষণ না সারছে ততক্ষণ রোজ ডাকতে হবে, দরকার হলে একেলা ওবেলাও ডাকতে হবে। আমরা ছাপোষা মানুষ, পারব কেন কি-বার দুটো দুটো টাকা বার করতে?

অমরনাথ কিছু বলতেন না, বুঝতেন গৃহস্থ মানুষের বাঁধা আয়ের দুঃখ। তাঁরাও জানিতেন বেশী কড়াকড়ি করলে এসব মানুষ চুপে চুপে বরং মরবে তবু ডাক্তার ডাকবে না। এদের ভাবগতিক কষ বিলে হয়ে হয়ে লাভই হয়। যাই হোক লাভ হয়েও তাঁর মোট আয়টা খুব বেশী ছিল না। কখনও তিন শ' কখনও চার শ' হয়ত হাতে আসত। নিতান্ত সেকালের সংসার তাই তারি মধ্যে সব করতে পেরেছিলেন। আজ কালকার দিন হলে পেতে আর পরতেই কুলোত না।

ছেলে কলকাতায় কলেজে পড়ে। এম্ এ, পাশ করে আরবার বয়স বিলেত যাবে। পড়াশুনোয় ভালই ছিল ছেলে, কিন্তু স্কলারশিপ নিয়ে যাবার ভাগ্য ঘটল না। অথচ বাবার এত টাকা মাসে মাসে দেবার কিছু সাধ্য ছিল না। তাঁর বাঁধা রুগীদের মধ্যে একজন ছিলেন জমিদার আর একজন ছিলেন চা বাগানের মালিক। অমরনাথ দুজনের বাড়ী হাঁটা-হাঁটি সুরু করলেন। তাঁরা ইচ্ছে করলেই টাকাটা বার করতে পারেন। কিন্তু কোন আশা না রেখে অকারণ তাঁরা টাকাই বা দেবেন কেন? কথা হ'ল ছেলে যদি আই-সি-এস গোছের কিছু হয়ে ফিরে আসতে পারে তাহলে জমিদার মশায়ের টাকাটা মাসে মাসে সুদ শুদ্ধ ফেরত দেবে, যদি না পারে তাঁর কাছারীতে বিনা বেতনে চাকরী করে শোধ দেবে। চা বাগানের মালিক মহাশয় আহার ভাড়া দিতে রাজি হলেন যদি অমরনাথ ছেলে ফিরে আসা পর্য্যন্ত বিনা ভিজিটে তাঁর সংসারের ডাক্তারীর ভারটা নেন। জোড়া-তালি দিয়ে ছেলের বিলেত যাওয়া ঠিক হল। দুই বাড়ীতেই বিবাহ যোগ্যা মেয়ে ছিল। ছেলে ফিরে এলে প্রত্যুপকার হিসাবে এঁদের বাড়ীতে বিয়েও করতে পারে, এমন আভাসও তাঁদের দিতে অমরনাথ ত্রুটি করেন নি। তবে জমিদার এবং চা-ওয়ালাকে একত্রে বলেননি অবশ্য। যাই হোক তাঁদের জোরেই পুত্র সোমনাথ ভবিষ্যৎ সুখের অনেক স্বপ্ন দেখতে দেখতে বিলেত চলে গেল।

মেয়েটিকেও বাপ মা, বি এ পাশ করিয়ে গান বাজনা শিখিয়ে বেশ আধুনিক ভাবেই গড়ে তুলেছিলেন। তার উপর বিদ্যাতাও তাকে নিপুণহাতেই সাজিয়েছিলেন। মেয়েটিকে যে দেখত সেই বলত, এ মেয়ের রাজরাণী হবার কথা, তবে রাজা ত আর আজকালকার ফ্যাশন নয়, বড় ম্যাজিষ্ট্রেট কিছু একটা কপালে আছে।

সোমনাথ আই সি এস হবেই ফিরল। কন্যা মীরার বিবাহ হল এক বড় কারবারীর সঙ্গে। যিনি সোমনাথের জাহাজ ভাড়া দিয়েছিলেন ফিরে এসে তাঁর কন্যাকে বিবাহ করে সোমনাথও সংসার পাতল। তবে মফস্বলের বৃদ্ধ ডাক্তারের সংসারের সঙ্গে তার আর বেশী যোগ রইল না, বদলি হয়ে নানা জায়গায় বড় বড় জজ-কুঠিতে তাকে ঘুরতে হত! সঙ্গে থেত স্ত্রী রানসী, বাপ মা দেকেলে মানুষ নিজেদের চিরকালের সংসারেই নিরিবিলিতে থাকতেন। কেউ জিজ্ঞাসা করলে সোমনাথ বলত, "এ বয়সে সাত-ঘাটের জল খেয়ে বেড়াতে পারবেন কেন তারা?"

কালেভদ্রে ছেলেমেয়েরা মা বাপের সংসারে আসত। সোমনাথ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বদলি হবার সময় দু'দিন মায়ের সংসারে থেকে যেত। নূতন জায়গায় যে সব জিনিষপত্র ভাড়িয়ে নেওয়া যায়, যাকে খুসী করবার জন্য তার কিছু কিছু সোমনাথ রেখে যেত মায়ের জিম্মায়; শ্বশুরবাড়ীতে রেখে যাবার যদিও জায়গা ছিল, বড় লোকের বাড়ী নিরাপদও বেশী, তবু মেয়াজিনী পাছে ভাবেন বড়লোক শ্বশুর হয়েছে বলে ছেলের গরীব মা আর কোন কাজে আসে না, তাই শিলবোটা, গ্রামোফোনটা, এমনি দু'চারটা জিনিষ হয়ত মা'র কাছে সে রেখে যেত। তাঁর ছোট বাড়ী, দুটো ভিনটে জিনিষ রাখতেই একটা ঘর জোড়া হয়ে যেত। তবু খুসী হয়ে ভাবতেন, "বড়লোকের সংসারে কেউ ত চাইতে করে জানবে ঘুছবে না, তাই সোম আমার কাছে জিনিষগুলো রেখে গেল।"

ছেলে বউ এলে মা আগে পাশের আত্মীয়-স্বজনকে ডেকে খাওয়াতেন, বোঝাতে ইচ্ছা করত, কেমন রাজা-রাণীর মত ছেলে বউ। কিন্তু মায়ের ছেলের মতামত অন্য রকম; সে বলত, তুমি যত বাগবাজারের মাসি আর উলুবেড়ের পিসিদের ডাকবে না। শ্বশুরবাড়ীতে বাবা জমিদার মহলে ঐ সব গল্প উঠবে ত!" মা ক্ষুণ্ণ হয়ে তাদের ডাকা ছেড়ে দিলেন।

মেয়ে মীরার বিয়ে হয়েছিল আরও বড় লোকের বাড়ী। প্রথমটা মধ্যবিত্তই ছিল তারা, শ্বশুরের ব্যবসা ছিল প্রফিটের। নিজেদের ঘরবাড়ী আসবাব সবই কাঞ্চনজা গোছের ছিল। কিন্তু দ্রব্য পাওনার অতিরিক্ত তাঁর খুব লোভ ছিল না বলে বেশী পাবার উৎসাহ কখন করেন নি। মীরার বিয়ের পর বৎসরই তার হল। সঙ্গে সঙ্গে বাথরুম—পৃথিবীজোড়া মহাসমর। মীরার স্বামী সামরিক জাহাজের স্নানের ঘর সাজানোর ভার নেন। এক-একটা ঘর সাজাতে খরচ যেখানে একশ হ'ত, সেখানে বিল করত পাঁচ সাত'শ টাকা করে! এত টাকা যে হাতে এসে পড়তে পারে অতটা কল্পনাও করে নি। মনে হ'ত চাই বা না চাই, টাকাগুলো যেন হুড় হুড় করে আপনি হাতে এসে পড়ছে। নিজেই বলত, 'এত টাকা নিয়ে কি যে করব ভেবে পাচ্ছি না।' এক বছরেই কলকাতা সহরে দু'তিনখানা বাড়ী কেনা হয়ে গেল।

মীরা বিয়ের পর কলকাতায় এসে রিকুল চড়া অভ্যাস করেছিল। যতবারই চড়ত, ততবারই বলত, মাথাটা পিছনে আর পা দুটো সামনে বাড়িয়ে সকলকার সামনে দিয়ে যেতে হাড়গুদ্ধ জ্বলে যায়।" এখন তার সে দুঃখ দুর শুদ্ধ মিটে গেছে। ঘরজোড়া সারাক্ষণ দু'খানা ডেসপোর আর সেভরলেট বাঁধা থাকে, কোথাও

বাবার নাম করলে ছুটো ড্রাইভার ঠা ঠা করে ছুটে আসে। মুন্নের কাকের অর্ডার আছে, সেক্রেটারও তাই অনুরোধ। লোকে দেখছে, বাজারে সোনার দর বাড়ছে, মীরা ততই গয়না গড়াচ্ছে। গরমে মানুষের প্রাণ আই-টাই করলেও তখন লোকে পাখা পায় না, বরফ পায় না। মীরার ঘরে-ঘরে নূতন পাখা ঝোলানো হচ্ছে, রিফ্রিজেটারে আইসক্রীম-বরফ-বরফই, দরকার সারাক্ষণ তৈরি হচ্ছে। এসব ফেলে বাপের বাড়ী সে কতক্ষণ থাকতে পারে? ঐশ্বর্য দেখাতে মাঝে মাঝে যেত, কিন্তু যেদিন যেত, তার পরদিনই ফিরে আসত। হেমাঙ্গিনী বলতেন, "খুকী, বাপ মাকে কি একেবারেই ভুলে গেলি?" খুকী বলত "কি করব মা, নিজের সংসার সাত ভূতে নষ্ট করছে, এতো আর দেখা যায় না। তা'ছাড়া ছেলে ছুটো—একরত্তি হলে কি হয়—কোনোখানে থাকতে চায় না। নবাবী চালচলন, বাড়ী ছাড়া সব জায়গাতেই তাদের অসুবিধা।" নিজেও যে এই গৃহস্থের সংসারে সে অসুবিধা বোধ করত এটা আর মার কাছে মীরা বলত না।

সন্তানের সুখেই মায়ের সুখ। মা ভাবতেন, "আহা, আমার মীরা সুখে থাকুক! আমার বুকটা খাঁ-খাঁ করে বটে, ইচ্ছে করে ওদের আঁকড়ে ধরে রাখি। কিন্তু আমার এই বুড়ো মুখটার দিকে তাকিয়ে থেকে ওদের কি সুখ হবে? কি আনন্দ আমি ওদের দিতে পারব? নিজের হাতে ছুটো রাঁধা-বাড়া বেঁধে খাওয়াতে ইচ্ছে করে বটে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক ভাল ওরা হোটেলে, পার্টিতে ডিনারে খেয়ে বেড়ায়। গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে পারি, কিন্তু সে কি হিন্দি-পাখার হাওয়া, মোটরে চড়ে গঙ্গার বাতাস খাওয়ার মত মিষ্টি লাগবে?"

অভিমানী মন বলত বটে মায়ের ভালবাসা এ সবলের চেয়ে মিষ্টি। কিন্তু সে অভিমানকেও তিনি দমন করতেন। ভাবতেন "আহা, ওরা নূতন সংসার করছে। দুজনের হাত দুজনে ধরছে, একজন আনবে, আর একজন সাজাবে-গোছাবে আর একটা গড়বে, কাল একটা ভাঙবে, নূতন করে করবার স্বপ্ন দেখবে। তার মাঝখানে আমি গিয়ে গুরুমশায়ের মত উপদেশ দিতে বসলে নিজের হাতে গড়ার আনন্দ কোথায় থাকবে? দরকার নেই আমার ওদের। সুখের হোক, দুঃখের হোক, আমার সংসারের খেলা ত শেষ করে এনেছি। যে কটাদিন বাকি আছে, সুখে দুঃখে যার সঙ্গে জোড়া থেকে চলেছি, তারই হাত ধরে চলব। আমাদের পুরানো চোখে যতটুকু দেখতে পাই, দুজনের সঙ্গে দুজনের মিলবে। ওদের নূতন চোখের সঙ্গে পাল্লা দিতে ত আমরা পারব না।"

আর কিছু বড় সৌভাগ্য না থাকলেও হেমাঙ্গিনীর স্বামী-সৌভাগ্য ছিল। ছোট সংসারে ছোট মাপে হলেও তাঁরা ত সবই করেছেন। মনে পড়ে না—কোনোদিন তাঁরা পরস্পরকে না জিজ্ঞাসা করে কিছু কাজের সূচনা করেছেন। পাড়াপড়শীর সঙ্গে যত মেয়েলি কলহই হেমাঙ্গিনীর হোক না কেন, দিনের শেষে অমরনাথের কানে ত উঠতই, আর অমরনাথের লম্বা লম্বা বিলিতি নামওয়ালা রোগের গল্পও হেমাঙ্গিনীর শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। জীবনে ও কর্মে প্রেরণা যোগাবার জন্য অমরনাথ শক্তিস্বরূপিনী পরকীয়ার অভাব কখনও অনুভব করেন নি, হেমাঙ্গিনী ও আই-সি-এস-এর মা হয়েও পুরুষ দেখলেই একগলা ঘোমটা দিয়ে ফেলতেন। স্বামীকে অতিক্রম করার লোভ তাঁর হত কেবল মাত্র নকুড়ের সন্দেশ

দেখলে। কিন্তু সে-লোভও তিনি সর্ব্বদাই সম্বরণ করে চলতেন। ওঁদের ভালবাসার নিদর্শনপত্রগুলো, গহনা গড়ানো কিম্বা মানভঞ্জনের কোনো আড়ম্বর ছিল না। তা যেন 'কবিকা'র কবির ভাষায় ছিল, "তোমার আমার এই যে প্রণয় নিতান্তই এ দোঁহাকার।" নিজেদের অগোচরেই তাঁরা নিজেদের বুঝিয়ে ছিলেন যে একদিন যেমন একত্রে জীবনযাত্রা সুরু হয়েছিল, তেমনই একত্রে জীবনযাত্রা শেষ হয়ে যাবে, কারুর জন্য কারুকেই চোখের জল ফেলতে হবে না। ওঁদের জীবনের এই সহজ সুখের সুধার মতই সহজভাবে মৃত্যু একদিন এসে দুজনকেই মুক্তি দিয়ে যাবে। জীবনেও যেমন আড়ম্বর তাঁরা করেন নি, মরণও তেমনি দুর্ভোগ নিয়ে আসবে না!

পৃথিবীতে এমন একত্রে মহাযাত্রার সুযোগ খুব কম মানুষের ভাগ্যেই ঘটেছে। এঁদের ভাগ্যেও ঘটল না। প্রতিদিনের মত সেদিনও দুজনে একত্রে চা খেয়ে ছিলেন, অমরনাথ পেয়ালায় চা ঢাললেন, হেমাঙ্গিনী গরম ঝালুয়া রেকাবিতে সাজালেন। দাঁতের কষ্টে অমরনাথ শক্ত জিনিষ খেতে পারতেন না বলে হেমাঙ্গিনী ও খেতেন না। এক চামচ ঝালুয়া মুখে তুলে অমরনাথ বললেন, "শরীরটা ভাল লাগছে না, আমি একটু শুই গিয়ে।" হেমাঙ্গিনী বললেন, "ফুলের টবগুলোয় জল দেওয়া হ'ল না, পাখীটাকে খাবার দেওয়া হয় নি, আমি একলা কত আর পারি? এ-কাজগুলো সেরে যাই চল, না হয় খাটে বসেই তুমি চা খেও এখন।"

অমরনাথ কোনো জবাব না দিয়ে চলে গেলেন। হেমাঙ্গিনী পাঁচ মিনিট পরে ঘরে গিয়ে দেখেন খাটের উপর স্বামী আড়ষ্ট হয়ে পড়ে আছেন। হেমাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে তোমার, অমন করছ কেন?"

কোনো জবাব পাওয়া গেল না। অমরনাথের মুখের কোণে ম্লান একটু হাসি ফুটে উঠল এবং দু-চোখ দিয়ে খানিকটা জল গড়িয়ে পড়ল। তারপর তাঁর প্রাণ যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রটা মাত্র চলে ছিল, অন্য যন্ত্রগুলির কাজ কিছুই বোঝা যায় নি।

ছেলেমেয়ে দুজনের একজনও কাছে ছিল না; অমরনাথ নীরবে চলে গেলেন, হেমাঙ্গিনীও নীরবে দেখলেন। মৃত্যুকে তিনি যেন প্রথমটা মৃত্যু বলেই বুঝতে পারেন নি। অমরনাথ কতবারই ত রোগে ভুগেছেন, কতবার উঠেছেন। এবার উঠবেন না, সকালবেলা চেয়ারটি নিয়ে বাগানের দিকের বারান্দায় আর বসবেন না, চায়ের সঙ্গে হেমাঙ্গিনীর পেয়ালার আগে চা-টা ঢেলে দেবেন না, কণী দেখতে যাবার সময় পোষাক পরতে পরতে পৃথিবীর সব কথা হেমাঙ্গিনীকে শোনাবেন না, সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরেই সিঁড়ি থেকে দোতলা পর্য্যন্ত—সব ঘরের সব আলো একসঙ্গে জ্বালিয়ে দেবেন না, ছাড়া কাপড়গুলি বিছানায় মেঝেতে আর টেবিলের উপর ছড়িয়ে রাখবেন না, এও কি হতে পারে? পাড়াপ্রতিবেশী যারা এসে পড়েছিল, অমরনাথের মৃত্যুর পরই তারা ওষুধ ও পথ্যের শিশিবোতল গুলো ঘর থেকে সরিয়ে দিলে। আইস-ব্যাগ, হটওয়াটার ব্যাগ গুলোকে বিছানার উপর থেকে তুলে একটা ঝুড়ির মধ্যে যেন অবজ্ঞাভরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। হেমাঙ্গিনী চমকে উঠলেন। এগুলোর প্রয়োজন কি সত্যই শেষ হয়ে গিয়েছে? সে কবে চলে গিয়েছে!

ছেলেমেয়েরা এল। এসে যেন আরও বুঝিয়ে দিল তিনি নেই। অমরনাথ ত শুধু একা তিনিই ছিলেন না, এই ঘরসংসার, জিনিষপত্র, জীবজন্তু, টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড় বই-মহাভারত—সব নিয়েই ওঁর সত্তা। সোমনাথ ডাক্তারি বই-এর আলমারীটা খুলে বলল, "এই বইগুলো কোনো নূতন ডাক্তারকে দিয়ে দিলে হয়, অনেক কাজে লাগবে তার।" মীরা বাবার সোনার ঘড়িটা নিয়ে বলল, "এটা বাবার স্মৃতি-চিহ্ন হিসাবে আমি রাখব।" বধূ মানসী বলল, "প্রচুর কাপড়ের বড় দাম, পোষাক গুলো একেবারে নূতন রয়েছে, এগুলো অন্টার করে উনি ব্যবহার করতে পারেন।" তাঁর পাখীটা, কুকুরটা দু' ভাইবোনে ভাগ করে নিল। টেবিলক্লোথটা সমস্তক্ষণ টেবিলের উপর থাকত, সেটা সোমনাথ আলমারীর মধ্যে বন্ধ করে চাবিটা নিজের পকেটে রাখল। সেটা ছিল অমরনাথের একান্ত নিজস্ব, হেমাঙ্গিনীও তাতে কখনও হাত দিতেন না। দেরাজে তাঁর যে-সব দাতাপত্র চিঠি শুধু নিজের চোখের তৃপ্তির জন্যই তিনি রেখেছিলেন—নিজেদের সেগুলোও খুলে খুলে ছেলেমেয়েরা বাছতে বসল। এই নূতন নূতন আঘাত বুঝিয়ে দিচ্ছিল—এই যে সব কিছু ভড়িয়ে সমগ্রভাবে অমরনাথ ছিলেন, তাঁর প্রাণশক্তি আজ সূত্র হয়ে এগুলোকে যেখানে যে ভাবে ছড়িয়ে গেছে, তাই তাঁর এই টুকরা-টুকরা অংশ নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ছে! এই যে দশভুজা হাত এরি মধ্যে যেন তিনি সহস্রকরের হারিয়ে ফেলেন, নাহলে যদি তিনি শুধু সরে যেতেন, যেন নিজের ঘরের জিনিষগুলি গুছিয়ে রেখে ক্ষণিক ডাকে বিদেশে গেছেন, আর অন্য কোনো গণ্ডগোল হত না, তাহলে তাঁর হারানোটা এমন করে বোঝা যেত না। এই যে তাঁর ইচ্ছা, অনিচ্ছা, অনুমতি, বিনা-অনুমতি—সব কিছুকে অগ্রাহ্য করে, সব কিছুর মধ্যেই সেই অমরনাথকে অস্বীকার করা, এতেই হেমাঙ্গিনীর চোখে জল এল। মৃত্যু সত্য হয়ে দেখা দিল।

অমরনাথ যেন আছেন—হেমাঙ্গিনীর মনের এই স্ব-কল্পিত ভ্রান্তির কাঁচ আঘাতকে নিষ্ঠুর হাতে ছিন্নভিন্ন করে ভেঙে দিয়ে ছেলেমেয়েরা চলে গেল। এ-সত্যে তিনি যে একা, এবিষয়ে তাঁর মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না।

দিন চলতে লাগল, কিন্তু তার রূপ বদলে গেল আগাগোড়া। বাগানের দিকের বারান্দায় কেউ আর বসে না, বেতের চেয়ারটা ঘরেই পড়ে থাকে। সকালে চা না খেলে মাথা ধরে, তাই চা খাওয়া হেমাঙ্গিনী ছাড়তে পারেন নি। সেয়ালাতে খান না, পাথর-বাটিতে নিয়ে ঢেলে খান। হালুয়া দেখলে চোখে জল আসে। তাই চিড়ে ভিজিয়ে দুধ চিনি দিয়ে খান। যে কি চাকরের সঙ্গে কথা তিনি কোনোকালে বলতেন না, কথা বলার লোকের অভাবে তাদের সঙ্গেই ভাল চাল চুলোর দর নিয়ে কথা বলেন, যদিও সে-সব কথার কোনোই রস তিনি পান না। ঘর-দোর একথায় গোছালে সারাদিনে কেউ এলো-মেলো করে না, কেমন যেন ছাড়াপড়া মত দেখায়। সেবে হেমাঙ্গিনী নিজেই এখানেরটা ওখানে করে অদল বদল করে রাখেন। একঘর থেকে আর একঘরে ঘুরে বেড়ান, অকারণেই এটা-ওটা নেড়ে দেখেন, মনে হয় তাঁর জীবনের কাঁটা এই পর্য্যন্ত চলে যেন আর রস পাচ্ছে না, এর পরের চলাটুকু হাতে করে কাঁটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চালাতে হবে। দুঃখ হয় জীবনের সেই সব দিনগুলোর জন্যে যাতে প্রাণশক্তি সুখে, আনন্দে, মিলনে, বিরহে, দুঃখেও উচ্ছলিত হয়ে

উঠেছিল। তেমন যে সত্য সার্থক দিনগুলি, মনের পটে তার একটা ক্ষীণ ছায়া ছাড়া আর কোন অস্তিত্ব নেই কেন? সেই যে দুজনের জীবনের ছটি হৃদয় দুটি মস্তিষ্ক আর দু' জোড়া হাত—তা যদি এতদিন ধরে মাটি কোপানোর কাজেও লাগান হ'ত তাহলেও একটা দিঘী হয়ে তার অস্তিত্বের দাবী চিরদিন দিত. কিন্তু আজ তাদের এত হাসি, এত কান্না, এত অভ্রান্ত কথা, অভ্রান্ত কাজের কোনোই চিহ্ন নাই! থেকে থেকে মনে হয়, "আছে, আছে চিহ্ন আছে। সোমের সংসারে, বীরার সংসারে সেই দিনগুলিই ত ফিরে এসেছে। আমাদের দুজনের সংসার আজ চারজনের সংসারে রূপান্তর হয়ে দেখা দিয়েছে। সেই প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্তের উচ্ছ্বসিত জীবন, সেই সুদীর্ঘ ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্ন. সেই সৃষ্টির আনন্দ, সঞ্চয়ের নেশা, দানের গৌরব, কর্ম্মের উৎসাহ ওই দুটি শূন্যে হয়ত একটু ভিন্নরূপে দেখা দিয়েছে। আজ আমার তাতে হাত নেই, কিন্তু সে ত আমারই জীবনচক্র অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে আর একবার চলেছে।"

এ কল্পনায় সান্ত্বনা আছে বটে, কিন্তু সহায়হীন ভগ্নদেহের প্রাত্যহিক সমস্যার সমাধান ত এতে হয় না!

সকালে উঠে হয়ত দেখা গেল ঘরে কয়লা নেই, ঝি কাল মাইনে পেয়েই বাড়ী পালিয়ে গেছে, উনুনটা ধরিয়ে চাল কটা যে সিদ্ধ করে নেবেন এমন উপায়ও নেই। নামকরা ডাক্তারের গৃহিণী, তিনি কি ঝুড়ি হাতে করে কয়লা কিনতে বেরোবেন? সঙ্কোচ কাটিয়ে কোনো রকমে পাড়ার কোনো ঝি চাকরকে ডেকে অনেক বেলায় কিছু কয়লা পান। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দিনটা চলে যায়।

চিকিৎসা বলে একটা জিনিষের জন্য কারুর কাছে কখনও যে তাঁকে ছুটোছুটি করতে হবে এ কল্পনাও মনে কোনোদিন তাঁর আসে নি। তিনিই বরং স্বামীর কাছে থেকে দু'চারটে ওষুধ লিখিয়ে পাড়াপড়শী গিন্নিদের অসময়ে কত উপকার করেছেন। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে আর পাঁচ জনের মত তিনিও বুঝলেন যে, এ বয়সে চিকিৎসাটা প্রায় খাদ্যের মতই প্রাত্যহিক প্রয়োজন। পায়ে বাত, চোখে ছানি, মুখে ঘা লেগেই আছে, পেটটাও থেকে থেকে হঠাৎ খাপসা হয়ে আসে; বুঝতে পারেন না কাকে দিয়ে কোথায় কোন ডাক্তারকে ডেকে পাঠাবেন, ওষুধ-বিষুধই বা কেমন করে যোগাড় করবেন! ছেলে চিঠিতে খোঁজ করে, "মা কেমন আছ?" যদি উত্তরে পাঁচটা অসুখের কথা লেখেন, গোটা কতক টাকা বেশী আসে চিকিৎসার খরচ বলে. কিন্তু ব্যবস্থাটা যে কে করে দেবে, তা কেউ লেখে না। মা মনে করেন, ছেলে নূতন সংসার করছে, নূতন বৌ, নূতন ছেলেপিলে, তার মাঝখানে বুড়ো মা গিয়ে সব সুখের তাল কেটে দেবে, এ কল্পনাটাই তাদের ভাল লাগছে না। আহা ছেলেমানুষ!"

এ কল্পনায় সান্ত্বনা আছে বটে, কিন্তু সহায়হীন ভগ্নদেহের প্রাত্যহিক সমস্যার সমাধান ত এতে হয় না!

সকালে উঠে হয়ত দেখা গেল ঘরে কয়লা নেই, ঝি কাল মাইনে পেয়েই বাড়ী পালিয়ে গেছে, উনুনটা ধরিয়ে চাল কটা যে সিদ্ধ করে নেবেন এমন উপায়ও নেই। নামকরা ডাক্তারের গৃহিণী, তিনি কি ঝুড়ি হাতে করে কয়লা কিনতে বেরোবেন? সঙ্কোচ কাটিয়ে কোনো রকমে পাড়ার কোনো ঝি চাকরকে ডেকে অনেক বেলায় কিছু কয়লা পান। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দিনটা চলে যায়।

চিকিৎসা বলে একটা জিনিষের জন্য কারুর কাছে কখনও যে তাঁকে ছুটোছুটি করতে হবে এ কল্পনাও মনে কোনোদিন তাঁর আসে নি। তিনিই বরং স্বামীর কাছে থেকে দু'চারটে ওষুধ লিখিয়ে পাড়াপড়শী গিন্নিদের অসময়ে কত উপকার করেছেন। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে আর পাঁচ জনের মত তিনিও বুঝলেন যে, এ বয়সে চিকিৎসাটা প্রায় খাদ্যের মতই প্রাত্যহিক প্রয়োজন। পায়ে বাত, চোখে ছানি, মুখে ঘা লেগেই আছে, পেটটাও থেকে থেকে হঠাৎ খাপসা হয়ে আসে; বুঝতে পারেন না কাকে দিয়ে কোথায় কোন ডাক্তারকে ডেকে পাঠাবেন, ওষুধ-বিষুধই বা কেমন করে যোগাড় করবেন! ছেলে চিঠিতে খোঁজ করে, "মা কেমন আছ?" যদি উত্তরে পাঁচটা অসুখের কথা লেখেন, গোটা কতক টাকা বেশী আসে চিকিৎসার খরচ বলে. কিন্তু ব্যবস্থাটা যে কে করে দেবে, তা কেউ লেখে না। মা মনে করেন, ছেলে নূতন সংসার করছে, নূতন বৌ, নূতন ছেলেপিলে, তার মাঝখানে বুড়ো মা গিয়ে সব সুখের তাল কেটে দেবে, এ কল্পনাটাই তাদের ভাল লাগছে না। আহা ছেলেমানুষ!"

কিন্তু বিফলায় হয়েই শেষে হেমাঙ্গিনীকে লিখতে হল, "বাবা সোম, চন্দ্র-সূর্য্য থাকিয়ে থাকে না, কাজেই দিন কোন না কোন প্রকারে কেটে যাবেই, কিন্তু আমার চলবার ক্ষমতা শেষ হয়ে এসেছে। তোমরা ছেলেমানুষ, এখন তোমাদের সুখের দিন, আনন্দের সময়। আমার এই শোকব্যাধি-জড়িত দেহটা তোমাদের সুখের সংসারে নিয়ে গিয়ে কেলত আমার ইচ্ছা করে না। তোমরা আমায় দেখে কষ্ট পাবে এ আমি চাই না। কিন্তু আমার এই দেহটার প্রতি শেষ কর্ত্তব্য করবার মানুষ তোমরা ছাড়া আর কে আছে? যা হয় একটা উপায় কোরো।"

অফিসের পর খেলাধুলো সেরে এবং বন্ধু ও বান্ধবীদের সঙ্গে হুল্লোড় করে সোমনাথ রাত্রি এগারটায় বাড়ী ফিরল। মানসী তখনও তার প্রতীক্ষায় জেগে বসে। চিঠিখানা তারই হাতে ছিল, কিন্তু সে খোলে নি। এত রাত করে বাড়ী ফেরার জন্য অনুযোগ করার অভ্যাসটা তার পুরানো হয়ে গিয়েছে। আজ আজ সে বিষয়ে কিছু না বলে মানসী শুধু চিঠিটা তার হাতে দিয়ে বললে, "সারাদিন চিঠিখানা পড়ে আছে। মা কি লিখেছেন দেখ। বুড়ো বয়সে সাধ্যি ত কিছু করলে না—চিঠিগুলো পড়বারও একটু সময় রেখো।"

সোমনাথ চিঠিখানা খুলে মানসীর কথার জবাব না দিয়ে বললে, "অনুরোধ-বিনুরোধ কিছু একটা বাড়িয়েছেন। স্পষ্ট করে লিখলেই হয়, তা না যত সব হেঁয়ালি। তোমরা ত এই সব কাজের লোক, দুটো ছেলেপিলের উপর তৃতীয় ব্যক্তি আমি, তাও কোনো একটা কাজে সাহায্য চাই না।" মানসী বললে, "সকালে নটায় বিছানা থেকে উঠে—দশটায় বেরোও আর রাত্রি ১১টায় বাড়ী ফের, কাজে সাহায্য চাইবার সময় কোথায়?" সোমনাথ চটে বললে, "আচ্ছা, আচ্ছা, সে সব কথা পরে হবে। মাকে এনে ঘাড়ের উপর ফেললে দেখতে পারবে?"

মানসী বললে, "তোমার মা, তোমার বাড়ী, তুমি যদি এনে ফেল—দেখতেই হবে। কিন্তু তোমার বোতল টোতলগুলো সামলে ফেলো; ছেলের সুখের সংসারের এই সব সরঞ্জাম যেন তাঁর চোখে না পড়ে। সুখের ছবি দূর থেকে দেখাই ভাল।"

সোমনাথ একটু থতমত খেয়ে বললে, "ছেলেদের নার্সারি ছাড়া বাড়ীতে আর ঘরই বা কোথায়? অফিস রুম কিম্বা ড্রইং রুমে ত মার কথাকে রাখতে পারি না। ছেলেপিলেগুলো তোমার ঘরে ঢোকলেও নার্সটা ত ঘরে সেখানে থাকতে পারবে না।"

মানসী বললে, "খাবার ঘরে একটা ক্যাম্পখাট পেতে শোবে এখন, কি আর করবে?"

সোমনাথ বললে, "হুঁ, শোবে বই কি। পরশুদিনই দেখবে পোটলা-পুঁটলি নিয়ে বাড়ী রওনা হবে। ওদের ত আর কাজের ভাবনা নেই, কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিলেই কাজ জুটে যাবে। পারি না আর আমি দুপুর রাতে বসে বসে অত ভাবতে! আসবার কথা ত মা স্পষ্ট লেখেননি। ব্যবস্থা করতে বলেছেন, ব্যবস্থা নানা রকমেই করা যায়।"

সোমনাথ সকালে উঠে মাকে লিখলে, "মা, তোমার জন্যে একটা নার্সের জোগাড় করছি। বাস্তবিক এ বয়সে একলা থাকা শক্ত। আমাদের এখানে এসে আমি তোমাকে দেখতে পারতাম। কিন্তু মানসী বলছে যে বাড়ীতে জায়গা বড় কম, ছেলেদের ঘরে তোমায় থাকতে দিতে হয়। তাতে তোমার বিশেষ আরাম হবে না, আর ছেলেরা শুদ্ধ মানসীর ঘরে ঠাসাঠাসি করে থাকলে তুমি নিশ্চয় দেখে খুসী হবে না। তাই তোমাকে আনবার ইচ্ছাটা জোর করে ঠেকিয়ে রাখলাম।"

চিঠিটা অবশ্য মানসীকে না দেখিয়েই ডাকে ফেলা হল। সোমনাথ তার বোতলপ্রীতি ও নৈশবিহার সম্বন্ধে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমতে ফিরে গেল। মানসী ত সবই জানে, মা অন্ততঃ তাকে যেন সুপুত্র জেনেই জীবনটা শেষ করেন।

হেমাঙ্গিনী চিঠিখানা পড়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মীরাকে চিঠি লিখতে বসলেন, "মা মীরা, তোদের কত কষ্ট

করে সর্বস্ব পণ করে মানুষ করেছি তা তোরা জানিস্ না। শিশু ছিলি, বুঝবি কি করে মা-বাপের ত্যাগের মর্ম? কিন্তু এখন ছেলেপিলের মা হয়েছিস, হয়ত মায়ের প্রাণ কি সেটুকু অন্ততঃ বুঝতে পারবি। ছেলে-পিলেদের ঐশ্বর্যের মধ্যে মানুষ করছিস, আমাদের কিন্তু মানুষের ত্যাগ শোধা যদিও তোদের পক্ষে শক্ত। মা সন্তানের জন্য করে কোনো আশা না রেখেই, কিন্তু প্রতিদান গুনে করে পাব এই ব্যবসাবুদ্ধি নিয়ে সন্তানকে কেউ দেয় না। কিন্তু যখন অসময় আসে তখন মানবপ্রকৃতিই তাকে বলে সন্তানের কাছে স্নেহের দাবী করতে। সেই প্রকৃতির তাগিদেই আজ তোদের কাছে আবার ফিরে আসতে চাইছি। জানি তোরা আমাকে ভুলে যাস্নি। কিন্তু নিজের গর্ভজাত সন্তানও যখন নূতন সংসার পাতে তখন বোঁটা ছেঁড়া ফলের মত সে স্বতন্ত্র হয়ে যায়। শুধু স্বতন্ত্র ধরণে ফুল হবে, অন্যত্র তার শিকড় গজায়।

সোম আমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু বউমার ছেলেপিলেদের থাকবার কষ্ট হবে বলে বউমা আপত্তি করছেন। করাই স্বাভাবিক, কোন্ মা নিজের ছেলেপিলের কষ্ট দেখতে চায়? আমি যদি সোমের মা না হয়ে বউমার মা হতাম, তবে বউমা একটা কোনো উপায় বার করতেন, রান্নাঘর-টান্নাঘর দিয়েও একটু জায়গা করতেন। কিন্তু তাই বলে আমার আর্জি পেশ করতে আমি ভাই না।

তোদের ত বাড়ীতে জায়গার অভাব নেই, তুই কি আমার একটা ব্যবস্থা করতে পারিস্ না! ছেলেমেয়ে মানুষ করবার সময় দুজনের মধ্যে আনন্দঃ আমি ত কোন তফাৎ করিনি। অবিশ্যি তোকে বিলেত পাঠাইনি বটে, কিন্তু সেটা তুই ছেলের চেয়ে কম বলে নয়, তোকে একলা পাঠিয়ে দিতে সাহস ছিল না বলে। ছেলেমেয়ের কাছে নিজের জন্যে ওকালতী করতে লজ্জা হয়। কিন্তু অদৃষ্ট খারাপ হলে মানুষের আত্মমর্য্যাদাও থাকে না, লজ্জাও থাকে না। আমি এখানে একলা থেকে মরলে তোরাও ত কষ্ট পাবি! দেখ, ভেবে কোনো উপায় আছে কিনা!"

যীরা চিঠি পেয়ে গল্প গুজব করতে করতে আমার কাছে এসে বললে, "দেখ দেখি মায়ের কি কাণ্ড! ছেলের বাড়ী জোর করে চড়াও হয়ে গিয়ে থাকবেন, তাতে তাঁর আত্মমর্য্যাদার লাঘবে, আর মেয়ের বাড়ী ত কুটুম্ববাড়ী, এখানে বলছেন ব্যবস্থা করে দিতে? আমারই মা যদি তোমার মায়ের বাড়ীতে হাত পেতে এসে দাঁড়ান তাতে যেন আমার ভয়ানক মর্য্যাদা বেড়ে যাবে! বুড়ো হলে মানুষের বুদ্ধি-শুদ্ধি সব লোপ পেয়ে যায়। নইলে ছেলের মর্য্যাদার কথাই বা ভাবছেন না কেন? আই-সি-এসের মা, কুটুম্ববাড়ীর দরজাও ত তাঁর মাড়ানো উচিত নয়। বৌদিরও বিবেচনাকে বলিহারী যাই! মেমসাহেবী করতে হবে বলে শাশুড়ীকেও ঘরে ঢুকতে দেবেন না! তাঁর মা [redacted] চিরজন্ম শাশুড়ীর কাঁথা কেচে আর বকুনির হাঁড়ি ঠেলে কাটিয়েছেন। কোর্টী ইংরিজী বলতে [redacted] বলে সোসাইটিতে ত পাত পাননি। সঙ্ঘের যেন উদ্ধার করে কাগজে নাম ছাপাতেও পারেন নি।" [redacted]

অজয় বললে, "যাও, যাও, আর বকর-বাকর দিতে হবে না। তুমিও ত একশ' টাকার পেট্রোল পুড়িয়ে মহিলা-সমিতির জন্যে দশ টাকা চাঁদা তুলে বেড়াও। তোমার সমালোচনা করবার লোকের কি অভাব আছে মনে কর? মানুষ যখন কোমর বেঁধে অপরের সমালোচনা করতে লাগে, তখন ভুলে যায় যে, তারও ব্যবহারে

সমালোচনা করবার তিনিষের অভাব নেই। নিজের সম্বন্ধে মানুষ অন্ধ বলেই পরের নিন্দা করবার অতখানি জোর তার অনায়াসেই আসে।"

মীরা বললে, "আচ্ছা, তুমি ত খুব সাধুপুরুষ! পরের গাট কেটে ইমারত বানাচ্ছ, আমি ক' টাকার পেট্রোল পুড়িয়ে তার চেয়ে পাপী হয়ে যাইনি।"

অভয় বললে, "সাধুপুরুষ যে নই, তা আমি বলেই পরের ঘুঁৎ ধরতে যাই না। আমি চিরোটি খাঁসলেট পাটকেলটি খেতে হয়। তাছাড়া পৃথিবীর টাকাগুলো যখন বানরের দোঁয়া হয়ে শূন্যে মিলোবার জন্যে বস্তা বস্তা এসে পড়ছে তখন কিছু টাকা মৌমাছির মতো নিজেই সোনা-রূপোর ইমারত হয়ে থাকে—একাজে আমি যদি সাহায্য করে থাকি সেটা কি খুব অন্যায়? অন্যায় উপায়ে টাকা এনে মাকে খেতে দেওয়ার চেয়ে, সাধু উপায়ের টাকাগুলো মধুর মৌতাতের পিছনে ঢালাকে আমি বেশী প্রশংসনীয় মনে করি না।"

মীরা গাল ফুলিয়ে বললে, "জানি, তুমি কোনো না কোনো প্রকারে দাদার ঘাড়ে দোষ চাপাবে। বউদি যদি এতই ভাল ত তাকে তুলে নিয়ে এস না একবার। তোমার মায়ের কথাটা ত আমি বলেছিই, তার উপর আমার মায়ের পাপোষির বোঝাও আমার ঘাড়েই পড়বে এটাও ঠিক ন্যায়বিচার নয়।"

অভয় বললে, "এখন ন্যায়বিচার মাথায় উঠেছে, যখন বিয়ে বুড়ো হয়ে তখন এসব নৈতিকের যুক্তি মনে থাকবে না। তখন বেহাই প্রাণ দায় কাছে বেতে চায়, সেইটাও সেইদিকেই টুটবে। তবু তুমি যখন এতই নারাজ থাকে আনতে তখন আমি একবার বউদিকে বলে দেখব।"

মীরাকে যে চিঠিখানা হেমাঙ্গিনী লিখেছিলেন সেইটেই মানসীকে পাঠিয়ে দেওয়া ছাড়া নূতন কিছু বলবার চেষ্টা অভয় করল না। মানসীকে সে কিই বা বলতে পারে ভেবে পেল না। এর মধ্যে সোমনাথের হাত কতখানি তাও সে ঠিক বুঝতে পারছিল না। মীরা যে মাকে আনতে চায় না একথাটা বলতেও তার একটু সঙ্কোচ হচ্ছিল। কাজেই কারুর বিষয়ে কিছু না বলে, শুধু চিঠিখানা পাঠিয়ে দিয়ে কি ফল হয় তাই সে প্রথমে দেখবে ঠিক করল।

চিঠিখানা পেয়ে মানসীর ব্যাপারখানা বুঝতে এক মুহূর্তও দেরী হল না। সে স্বামীকে এ বিষয়ে কোন প্রশ্নই করলে না। সোমনাথ যা করতে চায় না তার জন্য সে কখনও মিথ্যা বলতে কখনও পিছপা হয় না, এখনও হবে না, তা মানসী জানত। তর্কের ভিত্তি যেখানে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেখানে তর্ক করতে সে ভয় পায় না; কিন্তু মিথ্যার বিরুদ্ধে তর্ক করতে তার জোর আসে না। তা ছাড়া সে জানত যে কিসের ভয়ে সোম মাকে এড়িয়ে চলতে চায়। মায়ের কাছে তার এইটুকু মুখ রক্ষার মানসীর বাধা দেবার ইচ্ছাও ছিল না! যাই হোক, মানুষটা অন্ততঃ একটা মানুষের কাছে নিজেকে খাঁটি দেখাতে চায়! মিথ্যা উপায়ে হলেও সেটা সত্যেরই সন্ধান।

ছেলেমেয়েদের নার্স শুদ্ধ নিয়ে মানসী সেইদিনই হেমাঙ্গিনীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। হেমাঙ্গিনী যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বৌ যে এতখানি [illegible] হতে পারে, তা বিশ্বাস হল না। সকলের আগে মনে হল কিছু বুঝি দুর্ঘটনা ঘটেছে! তাড়াতাড়ি [illegible] জিজ্ঞাসা করলেন, "সোম কই? সে কেমন আছে?"

মানসী তাঁকে আশ্বস্ত করে বললে, "তিনি [illegible] আছেন। ঘরে চলুন মা, ভয় পাবেন না।"

শাশুড়ীকে নিয়ন্তে নিয়ে গিয়ে সে [illegible], আমি পরের মেয়ে, আমার কথা আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না। তবু আমার যা বলবার [illegible] এসেছি। এইখানে আমাকে, আর আপনার নাতি-নাতনীকে নিয়ে দিন কতক থেকে যেতে, আপনার [illegible] থাকতে তাদের কত আনন্দ! তারপর আপনি আমার বিচার যদি করতে চান, করবেন।"

হেমাঙ্গিনী লজ্জিত হয়ে বললেন, "মা, আমি যদি কোনো ভুল করে থাকি, অজ্ঞানেই করেছি।"

বীজমন্ত্র

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১

ইস্কুলের বার্ষিক উৎসবে কয়েকজন উৎসাহী শিক্ষক মিলে ঠিক করলেন—ছেলেদের দিয়ে স্বাধীনতা-বর্জিত একখানি নাটক অভিনয় করাতে হবে। 'গড় সেভ মি কিং' কিংবা আপেকধাওয়ার ও রবারের আবৃত্তি—ওসব বড় পুরোনো হয়ে গেছে। বন্দেমাতরম্ গানটা চলছে। কিন্তু—ইস্কুলে—যেখানে সভায় সরকার বাহাদুরের প্রতিকৃতিকে নৈবেদ্যের চূড়ান্ত মতন বসিয়ে সরকারী সাহায্যকে নিয়মিত পাবার ও সেই অঙ্কটা যথাসম্ভব বাড়িয়ে নেবার চেষ্টাই প্রকট—সেখানে বন্দেমাতরম গাওয়া বোমার মত মারাত্মক তো বটেই। ইস্কুলের ছেলেদের দিয়ে কোন অভিনয় করাতে হলে—প্রেম বা রাজনীতির ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে যতটা সম্ভব নীতিকথার মালমশলা-ভরা একখানি নাটক নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচনের ভার নিয়েছেন, সৌরীন বলে একজন ছোকরা মাষ্টার। তবে তিনি জানিয়েছেন—দেশপ্রেমমূলক কোন নাটককে যথাসম্ভব নির্বিষ করে মঞ্চস্থ করবার ব্যবস্থা করবেন। রাণা প্রতাপ নাটকখানি অবশেষে নির্বাচিত হয়েছে।

অতি বৃদ্ধ সেক্রেটারি আপত্তি জানিয়েছিলেন, ওই বই স্টেজ করলে ইস্কুলের এড্ বন্ধ হয়ে যাবে? এস-ডি-ও নিজে অভিনয় দেখতে আসবেন।

সৌরীন বলেছিলেন, এসেই যান। প্রতাপের প্রতিভাটুকু ছাড়া আর কোন বারুদের গন্ধ তো বইতে রাখা হয়নি। তা ছাড়া তিনিও বাঙালী।

কয়েকজন মেম্বারও তাঁর কথা অনুমোদন করলেন। এই সামান্য কারণে সদাশয় সরকার বাহাদুর যে ইস্কুলের সাহায্য বন্ধ করে দেবেন—এই বিশ্বাস কয়েকজন মাষ্টার অকাট্য যুক্তির সাহায্যে বিদায় করে দিলেন।

যথা সময়ে নির্বিঘ্নে অভিনয় সুসম্পন্ন হলো।

২

কতদিন না চিতোর উদ্ধার হয়—এই আবহাওয়াকে কেউ অভিনয় আসরের বাইরে এনে উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠলেন না।

সবাই বলাবলি করতে লাগলেন, সুন্দর অভিনয় করেছে ছেলেরা। কেমন গলা কাঁপিয়ে প্রতিজ্ঞা করলে—বুকের মধ্যে রক্ত যেন তোলপাড় করে উঠলো। গা কাঁটা দিয়ে উঠলো।

শুধু সেটা অভিনয় বলেই দু'-চারদিন আলোচনার বিষয় হ'য়ে অন্য প্রসঙ্গের মধ্যে চাপা পড়ে গেল। কেবল প্রতাপবেশী অজিতের নামটাই সন্ধী-মহলে আলোচিত হতে লাগলো।

যা বক্তৃতা করলি তাতে পাবলিক থিয়েটারে তোর চাকরী হবেই হবে।

এসব আলোচনার মারকতা থাকেই। বিশেষ করে অপরিণত বয়সের ছেলেদের চিত্তে যশের পিপাসা অত্যন্ত প্রবল। অজিতের মনও কি যেন কিসের নেশায় দিন কতক আচ্ছন্ন হয়ে রইলো। বড় হয়ে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে খুব বড় ঘরের একজন অভিনেতা হ'য়ে সাধারণের কাছ থেকে হাততালি আর মেডেল লাভ করবে—এই ধরণের নেশাও হতে পারে। কিন্তু তাই কি যশের জন্য মনের মধ্যে কি-যেন-কি-হারানো গোছের অনুভূতি জাগছে ক'দিন ধরে? মঞ্চের সুর মঞ্চের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকছে না তো! আলো সুর ও সজ্জার অপরূপ সেই প্রতিবেশ—আনন্দ-উত্তেজনায় ঘেরাই প্রখর হয়েছিল এবং বেদনাও তাতে যথেষ্ট ছিল। কি সে বেদনা অজিত বুঝতে পারেনি—এখনও বুঝতে পারছে না। সে কি স্বদেশহারা প্রতাপের মর্মবেদনা—না চিতোর উদ্ধারের প্রতিজ্ঞা পাঠের ধ্বনিতে যে শক্তি নিহিত ছিল, তারই অন্তর্গূঢ় ব্যঞ্জনা? আলো সজ্জা ও সুর সঙ্গতের সঙ্গে সেও বুঝি মিশেছিল আবুল। বাংলার বাসে সে বুঝি চিতোর উদ্ধারের স্বপ্ন দেখছিল!

যাই হোক, এই ভাব ক্রমে বিলীন হয়ে এল।

৩

তারপর মাট্রিক পাশ করে অজিত মেসো-মহলের কলেজে ভর্তি হয়েছে। তার মত মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের এ ছাড়া গতিই বা কি! তাদের উচ্চশিক্ষা দেবার মূলে অভিভাবকদের যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নিহিত থাকে তার অর্থও বেশ প্রাঞ্জল। কোনরকমে টেনে-টুনে ডিগ্রীটা নিতে পারলে—তাঁরা দায়িত্ব থেকে মুক্তিলাভ করলেন এতো স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম।

উনিশ-শো-একত্রিশে আইন অমান্য আন্দোলন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। গোলাঘরখানা বর্জনের যে ঢেউ কয়েক বছর আগে উঠেছিল—তাতে উচ্চশিক্ষা ও যে কোন চাকুরিরা ছেলেমেয়েদের জন্য বিশেষরূপে চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন। রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের দূরে থাকবার নির্দেশ থাকলেও—আইন-অমান্য-প্রবণতা তাদের মধ্যে স্বতস্ফূর্তভাবে দেখা দিতে লাগল। ইস্কুল কলেজে—বাড়িতে বা ক্ষেত্রান্তরে হয়তো অন্যায়ের প্রতিবাদে—হয়তো বা খেয়াল-খুশিতে এই মনোভাব পল্লবিত হবার সুযোগ খুঁজতে লাগল। আর দু'-চারজন ছেলে এই সুযোগে কলেজ ছাড়লে।

অজিতের কয়েকজন সহপাঠী ঠিক করলে, কাছাকাছি নীলার তারা নবণ-আইন ভঙ্গ করতে যাবে। একজন প্রফেসার তাদের পরিচালনা করবেন। নতুন উদ্দীপনায় ছেলেরা চঞ্চল হয়ে উঠল। অজিতকে ওরা দলে টানবার চেষ্টা করলে।

কিরে,—জাতির জীবন-মরণ সমস্যা—আর তুই পার্সেন্টের মিনে তুতের বাগান পাটবি?

অজিত মৃদুস্বরে প্রতিবাদ করলে, নেতারা তো, ইস্কুল কলেজ বন্ধ করতে এলেন নি।

নাই বলুন—কখনসেন্সে যাবে না?

আরও অনেক বিদ্রূপ বাণ বর্ষিত হ'লো। অজিত বিচলিত হ'লেও—আঘাতে মুষড়িয়ে পড়লো না সে আবর্তে।

এক্ষেত্রে তার দূর-দৃষ্টির প্রশংসা কেউ কেউ করলেন—কিন্তু অজিত জানে, ভবিষ্যৎকে সামনে রেখে সে মনের আবেগ দমন করে নি। তার মত ছেলেরা ভবিষ্যৎকে নিয়ে বাজী খাটায় না। অভাব দুঃখ প্রতি পদক্ষেপে শাসন করছে যাদের—তারাই কল্পনায় সুখের ছবি আঁকতে ভালবাসে হয়তো, কিন্তু সে রকম অভাব দুঃখও তো অজিতদের সংসারে ছিল না। বাপের চাকরির আয়ে সংসার ভালভাবেই চলছে। বোনেদের বিয়ে হ'য়েছে ভাল করে, ভাইরেরা পড়ছে ইস্কুল কলেজে। তারপর বিদ্যাশিক্ষা শেষ হলে—উপার্জনের রাস্তায় নেমে পড়বে সবাই—যার যেমন সুবিধা। শিক্ষার দ্বিতীয় বর্ষে সে-চিন্তা অবান্তর। এখনকার চিন্তার মধ্যে কলেজ-জীবনে বল পেল—ক্লাসে ডিবেট করে বা বাৎসরিক উৎসবে অভিনয় করে কিছু নাম বা যশ সংগ্রহ করা। খাতির পেয়ালাখানি এইসব উপচারে সবে পরিপূর্ণ হয়ে আসছে—বাইরের অনিশ্চিত লক্ষ্যে তাই সে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে নি।

তারপর সঙ্গীরা ফিরে এল একে একে। নেতাদের জেলে পুরে ভারতের বড়লাট কঠোর হস্তে দমন করলেন আন্দোলন। দেশের ওপর দিয়ে কাল বৈশাখীর একটা ঝড় বয়ে গেল। উত্থিত হরকরের নির্ঘাতন চিহ্নটা কিছুদিন ধরে অনুভূত হ'লো শুধু। যারা ঝড় ফিরে আসবার অপেক্ষায় দিন গুণছিল—তারাও অবশেষে আকাশের প্রশান্ত-নীল রূপে আশ্বস্ত হয়ে নিত্যকর্মে মনোযোগ দিলো।

যারা বিদ্রূপ করেছিল অজিতকে, তারা সবাই অবশ্য ফিরে আসেনি—কিন্তু যারা এসেছে—তাদের দিকে চেয়ে বিদ্রূপ ফিরিয়ে দেবার প্রবৃত্তি অজিতের হ'লো না। ওরা ভাগ্যী হ'লে হয়তো তার আনন্দই হ'তো। কার না আনন্দ হয়। নিশ্চিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর আগে ভয়-উদ্বেগ থাকে—আর তা নিয়ে সমালোচনা, মত ভেদ ইত্যাদি চলই—কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছে গেলে সেই দুঃসাহসিক অগ্রগামীদের পূজো করে সবাই ধন্য হয়। তখন তাদের হঠকারিতাকে মহত্ত্ব মণ্ডিত করে প্রচার করাতেও কতই না গৌরব! আর ব্যর্থ হলেও ওদের সাহসকে অস্বীকার করবে কে? সফলকে ফণ-বিলাস বলে উপহাসই বা করবে কে?

প্রমোদ বললে, আমরা হেরে গেলাম অজিত, তোর কথাই ঠিক হ'লো।

অজিত ম্লানমুখে বললে, না না।

কি না—না! আজ কোথাও কাউকে ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে বাজী খাটাতে দেখছ? একে? থেমে বললে, যাকে শক্তি মনে করেছিলাম—তা উচ্ছ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়।

অজিত মনে মনে ভাবলে, তবুও কি ক্ষমতা সেই উচ্ছ্বাসের যা সমস্ত ভারতবর্ষকে নাড়া দিয়ে গেল!

৪

পরের ক'টি বছরে ভারতবর্ষের নীল-আকাশে প্রশান্তি ফিরে এসেছে। নেতারা অনেকেই কারা-প্রাচীরের বাইরে এসেছেন—নতুন পরিকল্পনা চলছে—কি করে কংগ্রেসকে বাঁচিয়ে তোলা যায়। কংগ্রেস এবং কংগ্রেস সংশ্লিষ্ট যত প্রতিষ্ঠান আছে সবই বে-আইনী বলে ঘোষিত হয়েছে। সভাসমিতি বন্ধ—কাগজে গরম-গরম লেখা বার হচ্ছে না। যাঁরা কর্মী, তাঁরাও নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েছেন। বাইরে থেকে মনে হয় ভারতবর্ষ প্রচার-ভীত ছেলের মত অত্যন্ত নিরীহ আর শান্তশিষ্ট হ'য়ে কাল যাপন করছে। সবাই নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে দিন যাপন করছে—তখন কি নবেম্বর-আইন ভঙ্গ করার জন্য যে ছেলেরা নীলায় নির্য্যাতিত হয়েছে—তাদের কথাটাও কারো মনোযোগ আকর্ষণ করছে না। ওরা যার স্বীকার করেই নিরস্ত হলো কি!

এই ক' বছরে অজিতের জীবনেও পরিবর্ত্তন সামান্য হয় নি। আই, এ পাশ করে ও বৃত্তি পেয়েছে—এবং বি, এ তেও প্রফেসাররা আশা করছেন ও কলেজের সম্মান বাড়িয়ে দেবে। জেলা-সহরের কলেজ—ছাত্র কৃতী হলে কলেজ তো বটেই—সারা জেলাও ধন্য হয়ে যাবে

প্রফেসার ঝিত্র ওকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা তাঁর বহুদিনের। শতাব্দীর প্রতি দশকে ও তাদের একটি ছাত্রও জন্মায় না কলেজে। এরা দুর্লভ। উচ্চ শিক্ষার দুয়ার খুলে যদি সুযোগ দেওয়া যায়—এই সব ছেলেরা কি না হ'তে পারে! আর্টস—কমার্স—সায়েন্স—যে-কোন লাইনে এরা দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে।

প্রফেসার নিজে বসে নিয়ে পড়ান অজিতকে। প্রফেসার-পত্নী ওকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন—ছেলে মেয়েরা ভাইয়ের মত ভালবাসে।

সুরমা তো বলেন, এমন ছেলে সাথে একটি মেলে না। যেমন নম্র-স্বভাব—তেমনি চরিত্রবান।

লেখা পড়ার কথাটা পরীক্ষান্তে প্রমাণিত হচ্ছে বলে তা নিয়ে উচ্ছ্বাস কম।

মেয়ে সুমিতা বলে, আচ্ছা মা, এত বিদ্যে নিয়ে অজিতদা করবে কি?

সুরমা মেনে যান মেয়ের কথায়। অজিতের দৃষ্টান্ত দেখিয়েও মেয়েকে বিদ্যানুরাগী করতে পারছেন না—এ মনস্তাপ ওঁর বেড়েই চলেছে দিন দিন। মেয়েটা যদি সুরূপাও হ'তো! রূপহীনা এবং বিদ্যাবিমুখ এমন মেয়েকে কে আদর করে ঘরে ঠাঁই দেবে! সূচি-শিল্পে ওর হাত আছে—আর গানের গলাটাও ভাল—কিন্তু ওগুলি তো গাছের শাখা প্রশাখা মাত্র!

ঈষৎ উষ্ণ স্বরে মেয়ের কথার জবাব দিলেন।—তোমার মত ধিঙ্গী হয়ে বেড়াবে না নিশ্চয়।

মেয়ে হেসে বললে, বাঃ রে, এই বুঝি আমার কথার জবাব হলো।

সুরমা বললেন, লেখা-পড়ার ভণ-তো বুঝলে না—তোমাকে জবাব দেব কি। বিলেত থেকে বড় ডিগ্রী নিয়ে ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরতে পারে।

মেয়ে বললে, তাতে আর পরিশ্রমটা কি! খোটা কতক ভাল ভোজ দিলেই তো বার-এ্যাট-ল হওয়া যায়।

সুরমা হেসে বললেন, ডাক্তারী ডিগ্রী নিতেও পরিশ্রম হয় না? আই-সি-এস হলেও—

সুমিতা বললে, মা—তুমি বড্ড বেগেছ—আমি শুধু অজিতদার কথা জিজ্ঞাসা করছি। জানি—পয়সা যাঁদের আছে—তাঁরা ছেলেকে অনেক কিছু তৈরী করবার চেষ্টা করেন। সাত সমুদ্রের-ঢেউ না খেলে প্রকাশ্যে কিছু হওয়া যায় না—এ আর কে না জানে!

সুরমা বললেন, পাকা-পাকা কথা শিখেছ অনেক, কিন্তু বলে রাখছি ওতেই পার হওয়া চলবে না।

তিনি দুম দুম করে পা ফেলে চোখের বাইরে যেতেই সুমিতা হাসি চাপতে পারলে না। অজস্র হাসির বেগে ছিটকে সে বাইরের ঘরে এসে একখানা চেয়ারে বসে পড়লো।

চেয়ারের শব্দের সঙ্গে হাসির শব্দ মিলে অজিতের তন্ময়তা ভেঙে গেল। সে সচকিতে সুমিতার পানে চেয়ে···জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপার কি?

সুমিতা অনেকক্ষণ ধরে হাসতে লাগলো—অজিতও বিস্মিত হয়ে তার পানে চেয়ে রইলো। কিসে প্রশ্ন করে লাভ নেই, সুমিতাকে ও জানে।

অবশেষে হাসির বেগ কমলে—সুমিতা বললে, আচ্ছা অজিতদা—লেখা-পড়া কি বাইরের লোক—সেটা জিনিসের আসল পরিচয়ের থেকেও বেশি?

তবু অজিত চেয়ে রইল বিমূঢ়ের মত।

সুমিতা হেসে বললে, কিছু বোঝ না তুমি! এই পর-পর পরীক্ষায় পাশ করে করবে কি—বলতে?

অজিত এবার হাসলে। বললে, যা হয় একটা কিছু করবো অবশ্য।

সুমিতা সে কথায় কান না দিয়ে বললে, বিলেত থেকে ফিরে এলে কথা কবে তো আমাদের সঙ্গে?

বিলেত!

হাঁগো—মা বলছিলেন—

অজিত বললে, বিদ্যা অর্জ্জনের জন্য বিলেত যাবার দরকার কি। তবে কন্টিনেন্ট-ট্যুর করলে বেশ-অভিজ্ঞতা হয়—

সুমিতা বললে, বিলেত গেলে মস্ত বড় একটা ডিগ্রী লাভ করবে—এ দেশে বড় চাকরী পাবার পথ সেটা।

অজিত হেসে বললে, তা হ'লে আমি মস্ত বড় হব বল?

হবেই তো। টাকার মাপে মানুষের মান—

কচু। বলে অজিত হো হো করে হেসে উঠল।

সুমিতাও হাসলে।

৫

কৌতুক ছলেও কথাটা মনের কোণায় লেগে রইল। যশের না অর্থের আশা বাষ্পপুষ্ট অগ্নির মত। অজিত ভাবলে, ক্ষতি কি দেশান্তরে যেতে। এ দেশের ডিগ্রী এ দেশের মানুষকে যেখানে মুগ্ধ করে না, আয় উপার্জনের ক্ষেত্রে তাকে উঁচুতেও তোলে না তখন ক'টা বছর প্রবাসে কাটিয়ে নতুন মানুষ হয়ে এলে ক্ষতি কি! উপার্জন তাকে করতেই হবে—তবে ভাল ভাবেই করা যাক না। যশের অর্দ্ধ পথে এগিয়ে পিছনের দিকে চেয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ কিংবা সম্মুখে বন্ধুর পথের দুর্গমতার কথা ভেবে আশার পরিসমাপ্তি কোনটিই তো বাঞ্ছনীয় নয়। যা হয়েছে যথেষ্ট—এই মনোভাব কালনেমির লঙ্কাস্তর।

দেশের আবহাওয়া এখন প্রশান্ত—স্থির। ঝড় মসগানিস না হ'লেও বাতাসে ঝড়ের আভাস নেই। আকাশে বিদ্রোহবহ্নির কুলিঙ্গ দেখা যায় না। হয়তো আর একটা ঝড় উঠবে—তারই প্রস্তুতি চলছে। কতবার তো ঝড় উঠলো—যারা ঝাঁপিয়ে পড়ল সে তাণ্ডবে—তারা মুছে গেলো কোথায়? তাদের কর্ম্মশক্তি একটি আঘাতে লুপ্ত হয়ে গেল কেন? সংসার-নদী স্নেহ-বাহু বাড়িয়ে আবার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে টেনে নিয়ে তাদের লুপ্ত করে দিল—ঝুরোর মত। পিছনে তার ছিল না বলেই—অত সহজে তারা ভেঙ্গে গেল—মুছে গেল! না, এভাবে কর্ম্মশক্তি নষ্ট করে আগুপিছু না ভেবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বার সার্থকতা কি? কাঁচা বাঁশে শক্ত লাঠি তৈরী হয় না—কে না জানে। আগে নাম—আগে অর্থ যশ দু'হাতে যত পার কুড়িয়ে নাও; নিজেকে মহিমায় কর প্রতিষ্ঠিত—গৌরবে কর বিস্তারিত। তারপর তোমার কথার মূল্য দিতে দু'পাশে ভিড় জমবে—উঁচুপরওয়ালারা পর্য্যন্ত অবাক হয়ে শুনবেন তোমার বক্তৃতা—ঘুড়িটাকে তাল করে আকাশে উড়াতে চাও তো অনুকূল আবহাওয়া ও শক্ত সুতো—এ তোমাকে সংগ্রহ করতেই হবে।

সেই সাধনায় অজিত মন দিলে।

৬

সুস্মিতা বললে, অজিত দা—তুমি তো যত বড় একজন এ্যাক্টর—আমাদের কিছু শিখিয়ে দেবে?

ডিরেক্টার করবে?

হাঁ—রবীন্দ্রনাথের "অরূপ রতন" প্লে করব। সেকেণ্ড-ইয়ারের সঙ্গে থার্ড-ইয়ারের কম্পিটিশন।

অজিত বললে, তা'হলে তাল মাষ্টার দেখ।

না, তোমাকেই শেখাতে হবে।

অনুরোধ এড়ানো গেল না—শিক্ষকতা করতেই হ'লো। প্রতিযোগিতায় সুস্মিতার দল জয়লাভ করলে।

অজিত হাসতে হাসতে বললে, তোমরা তো জিতলে—আমার পুরস্কার?

সুমিতা বললে, আমি যদি কাই ত্তাম তো—

অজিত বললে, তা রাণীর পার্ট নিলেই পারতে।

সুমিতার মুখের উপর দিয়ে ম্লান একটি ছায়া ভেসে গেল।···হেসে বললে, রাণীর মত চেহারাই বটে—আমার। বলেই সে আর সেখানে দাঁড়ালে না।

কথাটা সামান্য—তবু কথার সুর—আবহাওয়াটাকে ভারি করে দিলে। কৌতুক করতে এসে সুমিতা ছোট্ট আঘাত দিয়ে গিয়ে গেল। এতদিনে রূপের অভাবটা ওকে পীড়া দিতে আরম্ভ করেছে।

কথাটা অবশ্য কৌতুকের মতই মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেছে—আঘাত দেবার অভিপ্রায় অজিতের ছিল না। সুমিতার রূপ আছে কি নেই—সে খেয়াল অজিতের ছিল না। অবিচ্ছিন্ন সঙ্গ দিয়ে সুমিতা—তার রূপ-গুণের প্রভাবটা অজিতকে অনুভব করতেই দেয় নি। যে আলো নিত্য জ্বলে—বিশেষ দৃষ্টি নিয়ে কে চায় সে আলোর পানে। সে আলোয় নিত্য প্রয়োজনীয় কাজগুলি সুসম্পন্ন হলেই যথেষ্ট। কিন্তু যে আলো দূরে জ্বলে প্রয়োজনের বাইরে—অন্ধকারের ভালে উজ্জ্বল টিপের মত—তাকে দেখবার চোখ আলাদা। নিত্য-কর্ম থেকে বিযুক্ত হয় বলেই মন সে আলোর পিছনে অসামান্য কিছু আবিষ্কার করে খুশি হয়—বার বার চেয়ে দেখে। রাণীর ভূমিকা নিয়ে যেয়েছিল যে মেয়েটি—রেখা—সে যেন দূরের আলো। তাকে তাই বেশি করেই মনে পড়ে আজকাল। সুমিতার রূপ আছে কি নেই—কখনো অজিতের চৈতন্যে তা প্রজ্বলিত হয় নি, কিন্তু রেখা—ওর কথা ভাবতে গেলেই মনে হয়—রাণীর ভূমিকা গ্রহণের যোগ্যতা ওর আছে। ও অপরূপ।

৭

এই উপলক্ষে আলাপ হ'লো—যাতায়াত চলতে লাগল ওদের বাড়িতে। আসছেবারে আর একটি এমনি প্রতিযোগিতামূলক অভিনয় হবে, এখন থেকেই তার আলোচনা সুরু হ'য়েছে। কি যে বই এবং রেখারা কে কোন ভূমিকা নিয়ে নামবে তার জল্পনা-কল্পনা প্রতিদিনই হয়। একটা অভিনয় শেষ হ'য়ে গেলে, আর সে অভিনয়ে যশ প্রাপ্তি ঘটলে—পরবর্তী অভিনয়ের আলোচনা অমনি প্রবল হ'য়ে ওঠে।

রেখার পিতা এন, বাসু নামজাদা ব্যারিষ্টার। প্রাসাদ ও মোটর ছাড়াও তাঁর সম্পর্কে অনেক দিক থেকেই প্রত্যক্ষ করা যায়।

একদিন তিনি বৈঠকখানায় প্রবেশ করে অজিতকে একান্তে পেয়ে বললেন, ইয়ংম্যান, তোমার প্রতিভা আছে—অতঃপর তুমি কি করবে?

প্রতিভা থাকলে অতঃপর কি করা কর্তব্য অজিত তা বুঝতে পারলে না। কিম্ভূতের মত এন, বাসুর পানে চেয়ে রইল।

এন, বাসু বিলিতি কায়দায় কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, অমন করে চেয়ো না। তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে, বিলিতী ডিগ্রী না নিলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। স্বীকার কর কিনা?

মাথা হেলিয়ে স্বীকার করলে অজিত। সেই সঙ্গে মৃদুস্বরে বললে, কিন্তু বিলেতে শিক্ষা পাবার সৌভাগ্য সকলের হয় না স্যার।

ওর না—না এ ছেলের ভীক ছেলেরা যে সুযোগ নেয় না? কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসলেন এন. বাসু।

সবাই ভয় পায় না সার। মৃদু অথচ দৃঢ়িকার গলায় অজিত প্রতিবাদ জানালে।

হঠাৎ এন, বাসু এগিয়ে এসে ওর দু'কাঁধে দু'খানি হাত রাখলেন। বললেন, তোমার সাহস আছে?

অজিত ঘাড় হেলাতেই তিনি তাঁর হাতের আঙুল ওর কাঁধের মাংস সাপটে ধরে কয়েকটা ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, ভাল ইয়ংম্যান—রেডি হও। আমি তোমাকে সাজাবো।

অজিত মুখ তুলে তাঁর পানে চাইলে। তিনি পাইপ ধরিয়ে তখন পিছন ফিরেছেন। যা কিছু আনবার অজিতের ঘাড় নাড়ার ভঙ্গিতেই সব জেনে নিয়েছেন তিনি।

আপত্তি এলো বাপের তরফ থেকে। ছেলেকে বিলেত পাঠানোর মধ্যে বিন্দুমাত্র আনন্দ খুঁজে পেলেন না তিনি। ভবের খাটনী বেশি যেখানে সেখানে। ছেলে উন্নতি করবে নিঃসন্দেহে—পড়ার ব্যবস্থায় তাঁকে বইতে হবে না। আর ব্যারিষ্টার এন, বাসুর কন্যা তাঁদের ঘরে বেমানান হলেও পাঁচ জনের কাছে বুক ফুলিয়ে প্রচার করবার মত এই আত্মীয়তা-বন্ধন। অবশ্য বিলেত প্রস্তাব নিয়ে এন, বাসু তাঁর ছেলেকে বিলেত পাঠাবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন নি। ওটা উহ্য থাকলেও মুখ্য উদ্দেশ্য বলে এ বাড়ির সবাই ধরে নিয়েছেন। এটা তো মানুষের দ্বিতীয় স্বভাব। শুধু শুধু কেউ কারো উপকার করে না। পরের ছেলে উন্নতি করবে এই হিত কামনায় কে কবে নিজের তহবিল অযাচিতভাবে মুক্ত করে দিয়েছে? ওসব কিছু নয়—ওঁর মেয়েটির একটি যোগ্য পাত্র চাই তো! আর টাকা আছে যার—সুপাত্র তৈরি করে নিতে তাঁর অসুবিধেই বা কি? বিবেচনা করে দেখা গেল—ছেলের উন্নতি বড়জোর হবার এই সম্বন্ধের আনুকূল্যে হবে—কিন্তু বংশ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে যে গৌরব তা নিয়ে থাকা সত্ত্বেও—মন ভরবে কি? অত উঁচুতে উঠে পিতৃকুলে প্রতিষ্ঠিত থাকবে না ছেলে—কিছুতেই না। এ প্রধান হাতের কাছে অনেকগুলি রয়েছে। সুতরাং তিনি আপত্তি করলেন।

সুমিতার পিতা হেসে বললেন, তোমার সৌভাগ্যে আমি আনন্দিত—ভারি আনন্দিত।

সুমিতার মা গোপনে একটি নিঃশ্বাস বুকের মাঝে টেনে নিয়ে বললেন, সুখী হও বাবা।

সুমিতা হেসে বললে, বিলেত থেকে আমার জন্যে কি আনবে অজিত বা?

অজিত বললে, আগে যাই সেখানে। একটু থেমে বললে, কি চাও—বল?

সুমিতা বললে, বললেই তো দেওয়া সহজ হয় না। যা তোমার খুশি এনো।

অজিত বললে, তোমার খুব আনন্দ হয়েছে বুঝি?

নিশ্চয়। যেদিন বোধে রওনা হবে—সেদিন তোমাকে স্টেশনে ওয়েলকাম দেব। হ্যাঁ—ভাল কথা, সেদিন একটি ছোট খাটো অভিনয় করলে হয় না? রবীন্দ্রনাথের কোন ছোট্ট নাটক?

অজিত বললে, তা বিদায় অভিশাপটা মন্দ কি। বলেই ওর মন রূঢ় আঘাত খেয়ে জেগে উঠলো। মুখ তুলে চাইতে গিয়ে দেখে—সুমিতা সেখানে নেই।

৯

রেখার মূর্তিটা সামনে এসে দাঁড়ালো। অধরে হাসি ফুটিয়ে সে বললে, তুমি যদি কচের ভূমিকা নাও তো আমি দেবযানীর ভূমিকা নেব।

মিষ্টি হাসির ঝঙ্কার এস্রাজের তৈরবীতে করুণ হ'য়ে বাজছে। হাঁ—এস্রাজ বাজছে; কল্পনায় নয়—পাশের ঘরেই। কে বাজাচ্ছে—এই মুহূর্তে তাকে মনে পড়ছে না। শুধু বিরহ ব্যথাতুরা যদি কন্যার মানবীসত্তা চির বিদায়ের মুহূর্তে সুরের স্রোতে ভেসে এসে মনের তটে আঘাতের পর আঘাত করে চলেছে। দেবযানীরূপিনী রেখা বারে বারে উজ্জ্বল হয়ে ফুটছে।

বেদনা—অত্যন্ত বেদনার ভারে মন নুয়ে পড়েছে—গলে পড়বে হয় তো।

প্রফেসার মিত্র ওর সমাধি ভেঙ্গে বললেন, একলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর বাজনা শুনছো বুঝি? ভারি মিষ্টি হাত মিত্তার—আর রাগিনীটাও ভারি করুণ—নয়?

চোখে দু' ফোঁটা জল টলটল করছিল। বিগলিত মনের চিহ্ন এতক্ষণে টের পেলে অজিত। অপ্রস্তুত ভাবে রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বললে, ভারি সুন্দর।

যে ঘরে সুমিতা এস্রাজ বাজাচ্ছিল—ওঁরা দু'জনে সে ঘরে এলেন। সুমিতা বাজনায় তন্ময় হয়ে গিয়েছিল ওঁদের দেখে ওর মনোযোগ কিছুমাত্র শিথিল হ'লো না, ও বাজিয়ে চললো।

বাজনা থামলে কারো মুখ থেকে প্রশংসার ধ্বনি বার হ'লো না। সুর নিন্দা-প্রশংসার উপর দিয়ে চলে গেল—ঘরের মধ্যে অখণ্ড নিস্তব্ধতা থম থম করতে লাগলো।

প্রথম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলে ক্লক ঘড়িটা। টং করে একটা শব্দ হ'তেই সুমিতা কোলের ওপর থেকে এস্রাজটা নামিয়ে রেখে বললে, মিটিঙে যাবে তো বাবা?

মিটিং! নিশ্চয় যাব। অজিতের পানে ফিরে প্রফেসার মিত্র বললেন, তুমিও চল না অজিত। রাজ-বন্দীদের কারামুক্তির জন্য আজ—

অজিতের চৈতন্যে পূর্ণ বিকশিত হ'লো—সুমিতার মূর্তি। ফ্যাকাশে লাল পাড় মোটা (এবং খাটোও) খদ্দরের শাড়ী ওর পরণে। ঐ ভাতীয় একটা ব্লাউজ কিম্বা সেমিজ গায়ে দিয়েছে। পূর্ণ প্রসাধিতা হয়েও কোনদিন ও অজিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি—তবু অজিত ওর পানে মিনিট দুই চেয়ে রইলো। লাবণ্য ওর বেশবাসে নয়, দেহ স্বর্ণেও নয়। মুখের স্নিগ্ধ বাপাতুরভাবেই কি লাবণ্য ভেসে বেড়াচ্ছে? দেহ-লাবণ্য নিশ্চয় নয়। তবে?

প্রফেসার মিত্র বেশ পরিবর্তন করতে কক্ষান্তরে গেলেন। অজিত ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালো—সুমিতার সামনে। কি ছিল ওর দৃষ্টিতে? মোহ, না প্রশংসা-মেদুর কোন ভাব? সুমিতা মাথা নামিয়ে নিলে।

অজিত বললে একটা কথা বলবে সুমিতা?

কি? মুখ না তুলেই সুমিতা জবাব দিলে।

তুমি—মানে প্রফেসার মিত্র কতদিন থেকে কংগ্রেসের মেম্বার হয়েছেন?

কংগ্রেসের মেম্বার! কৈ—না ত!

তবে তোমরা পদ্মর পারেছ কেন ?

এবার বুঝ ভুলে হাসলে সুমিতা। বললে, পদ্মর পরলেই যে কংগ্রেসের মেম্বার হতে হবে তার মানে কি। কংগ্রেসের মেম্বর না হলে কি দেশের কথা ভাবা যায় না ?

অপ্রস্তুত-কণ্ঠে অজিত বললে, না—তা বলিনি। মানে তোমরা তো আগে···কিন্তু জান তো ওপথে গেলে নির্য্যাতন—কারাবরণ, অনেক কিছু—

তাতে কি। সুমিতা কলকণ্ঠে হেসে উঠল।

কিন্তু লাভই বা কি ? অজিত প্রতি-প্রশ্ন করলে।

সুমিতা পূর্ণ-দৃষ্টিতে অজিতের পানে চেয়ে বললে, লাভ-ক্ষতির হিসেব তো করিনি অজিত দা! তাল লাগল বলেই, কথাটা শেষ না করেই সে বললে, মানুষের রুচিই তো প্রতিদিন বদলাচ্ছে। আমরা কি করতে পারি বল!

সুমিতার কথা শেষের দিকে ভারি হ'য়ে এলো। জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে সে একটু সরে বসলো।

১০

সত্যিই মানুষ কিছু করতে পারে না। মানুষের রুচি প্রতিদিনই বদলাচ্ছে। মানুষের প্রতিজ্ঞার আশা তার সত্তার ওপর চাপ দিচ্ছে প্রতিমুহূর্ত্তে। একই প্রতিজ্ঞার নানা রূপ—মানে অর্থ সে আবিষ্কার করছে দিনান্তরে। একই আশাতে বহু বর্ণের বিকাশ ঘটছে খণ্ডে খণ্ডে। এরই নাম কি এগিয়ে চলা ?

টেবিলের ওপর বাবার খোলা চিঠিখানা পড়ে রয়েছে। এই মুহূর্ত্তে গ্রামসম্পর্কে সেই বাড়িখানি ভাসছে মনের আয়নায়। তবু সে বাড়ি বা গ্রাম স্পষ্ট নয়। বাপের দিকে বৈশব কেটেছে তারাই বা কোথায়! স্লেটের ওপর জলের দাগ শুকিয়ে গেলে কিছুই তো থাকে না। কিন্তু স্মৃতি ঠিক জলের দাগ নয়। অস্পষ্ট হ'য়েও সম্পূর্ণ মুছে যায় না। ভাবতে ভাবতে মনটা খারাপ হ'য়ে গেল।

রেখা তাকে অনুরোধ করেছিল—সন্ধ্যের সময় একবার আসতে। তার পরিবর্ত্তে রাজবা পার্কে বন্দীমুক্তি-সভাতে সে যোগদান করলে।

সভা থেকে ফিরে আসবার মুখেই মনে পড়লো—রেখার অনুরোধ। ঠিক কথা—নিমন্ত্রণের কথাটাই সে ভুলে গেছে। আজ রেখার ছোট ভাইয়ের জন্মতিথি। অবশ্য পরোচিত মর্য্যাদায় ব্যারিষ্টার সাহেব নিমন্ত্রিতের সংখ্যা বাড়ান নি। যাঁরা একান্ত অন্তরঙ্গ কিংবা আত্মীয়তাসূত্রে মাকে অথবা ছেলের বন্ধু-পোষিকুক তাঁরাই নিমন্ত্রিত হ'য়েছেন।

বাইরে থেকে দেখলে বাড়িটাকে প্রতিদিনকার মতই সাধারণ বোধ হবে, ওর অভ্যন্তরে উৎসবের সজ্জা-বাহুল্য চোখে পড়বে। বাড়ির কাছে এসেই অজিতের মনে হ'লো—জন্মতিথির নিমন্ত্রণ বিনা-উপহারে রাখা চলে না। একটা কিছু দেওয়া রীতি। শুধু মুখের শুভেচ্ছা—শুধু অন্তরের আশীর্ব্বাদ—ক্ষেত্রান্তরে সুবিধে হ'লেও—সম্পদের স্তূপে নিরর্থক। কি উপহার দেবে সে ? দাম কম অথচ মর্য্যাদাবান। ছেলেটি ক্লাশ

এইট এ পড়ে—একটা দামী শেন দিতে পারলেই মানায়। কিংবা বই দিতেও বাধা নেই। কি বই দেওয়া যায়? ভাবতে ভাবতে মিটিঙের কথাটাই মনের চিন্তারাশির মাঝে ভারি গোল পাকিয়ে দিলে। আজকালকার দিনে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ছাড়া—অন্য কিছু চিন্তা করা চলে না। মহাত্মা গান্ধী—জওহরলাল—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—সুভাষচন্দ্র এঁদের কথাই বার বার মনে পড়ছে। মিলিতা কারদার যে-উৎসব জন্মদিনকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে—তার মধ্যে এঁরা ভিড় করে দাঁড়ান কেন? এইরকম জন্মতিথির উৎসবে এঁদের কোন স্থান নেই; ভারতবর্ষের একটি ধনীর ছেলে, তথাকথিত সংস্কৃতিবান পরিবারের দুলাল—ভারতের মাটিতে জন্মেও যে ভারতকে ভালবাসার দায়িত্ব গ্রহণ করবে না—তিন দেশের আকাশে ফুটবে যার খ্যাতির নক্ষত্র—তার নামের সঙ্গে ওদের নাম জড়িয়ে বার বার ভুল করছে কেন অজিত? চিন্তা-জর্জরিত অজিত সভাই একটা গুরুতর ভুল করে বসলে।

১১

উৎসব-আসরের বাতি নেভেনি কেননা বিদ্যুৎ-বাতির উৎস তেল সলতে-ভরা প্রদীপের মত অগভীর নয়, অতিথিরা চলে গেছেন। আলোর তীব্রতা সত্ত্বেও আসরকে ম্লান দেখাচ্ছে। এন, বাসু মিসেস বাসু, রেখা তার দুই বোন আর দুই এক জন আত্মীয়-আত্মীয়া মিলে টেবিলের উপর স্তূপীকৃত উপহার গুলির পাঠোদ্ধার করছেন। এন, বাসুর স্মৃতিশক্তি প্রখর হলেও বাসুগৃহিণী একখানি নোট-বই ও পেন্সিল নিয়ে উপহার-দাতাদের নাম ও উপহৃত বস্তুর বিবরণ লিখে যাচ্ছেন। এটা দরকার। তাঁদের পরিচয়ের পরিধি সঙ্কীর্ণ নয়। সে পরিধিতে ছেলেমেয়ের জন্মতিথির উৎসব বারো-মেসে পার্বণের মত। আর আদান-প্রদানের দ্রব্য মূল্যবাচক না হলে সমাজে অখ্যাতির সম্ভাবনা প্রচুর।

কর্ম মেলাতে মেলাতে এন, বাসু হঠাৎ চমকে উঠলেন। একি—এ খদ্দরের মলাটের বইখানা কে দিয়েছে!

তাঁর কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে বাসু গৃহিণী বিস্ময় প্রকাশ করলেন দু'বার,—খদ্দরের বই!

হাঁগো—গান্ধীর জীবনী। কে দিলে এ বই?

তাঁর রোষ-মিশ্রিত চীৎকারে ছেলেমেয়েরা সেদিকে সরে এলো। একটা মিশ্র কলরব উঠলো, তাইতো, কে দিলে এ বই?

লাট-ভবনে যাঁর ডিনারের নিমন্ত্রণ হয়, ছুটে-চাপচলনে, আহারে, সমাজ-রীতিতে বাঙালীত্ব বর্জন করবার চেষ্টা যিনি সর্বপ্রকারে করে থাকেন—তাঁকে কে কললে এমন নিদারুণ উপহার! স্পর্ধা বটে!

অবশেষে উপহার পৃষ্ঠায় নাম পাওয়া গেল। নামটার পানে কয়েক মিনিট চেয়ে থেকে সশব্দে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করে রেখার পানে চেয়ে এন, বাসু বললেন, এ আমি আশা করিনি, রেখা।

এ দীর্ঘ নিশ্বাসের গভীর অর্থ রেখা জানে। লজ্জায়—বেদনায় তার মাথা নুয়ে পড়লো।

১২

এখানে কখন একটা সুর বাজছে। জানালার ধারে সুমিতা তন্ময় হয়ে ছড়ি টানছে। বাঁ-হাতের আঙুল গুলি ক্রত উঠানামা করছে। অপরাহ্নের কোমল আলো এসে পড়েছে ওর মুখে—চূর্ণ কুন্তলে। বিদায় নিতে গিয়েও সূর্য্য বিদায় নিতে পারছেন না বুঝি।

সন্তর্পণে দুয়ার খুলে অজিত এসে দাঁড়াল ওর পাশে। মুখ না ফিরিয়েও সুমিতা বুঝলে সে এসেছে। করুণ সুরের স্রোত একটুও বাধ্যত হ'লো না—ও আপন মনে বাজিয়ে চললো।

অজিতের বড় ভাল লাগলো। এই ম্লানমুখী অপরাহ্নের মন-উদাস-করা সুর, ঘরে কেউ নেই, ঘড়িটা টিক্ টিক্ করছে—কিন্তু সুরের স্রোতে ওর ধ্বনিও প্রায় লুপ্ত। সমস্তের স্রোত ঠেলে চির বিরহ চিত্তের আর্ত্তধ্বনি শুধু ঐ সুরের তালে তাল রেখে বুকের স্পন্দনে বেড়ে উঠছে। ভারি ভাল লাগছে অজিতের।

বাজনা থামলো—অজিত সুমিতার পাশে মেঝের উপর বসে পড়ে মৃদু কণ্ঠে বললে, চমৎকার!

সুমিতার মুখের মধুর বিষণ্ণতা অধরলীন হাসিতে অপরূপ হয়ে উঠলো। এস্রাজটা কোল থেকে নামিয়ে ও বললো, প্যাসেজ নেয়া হ'য়ে গেছে অজিত বা?

মাথা নেড়ে অজিত বললে, না—দরকার হবে না। একটু থেমে বললে, জেনে রেখেছি, যেখে এত কাজ থাকতে বিলেত যাওয়ার কোন মানে হয় না।

সুমিতা বিস্মিত কণ্ঠে বললে, এস, যাদু কিন্তু—

অজিত হেসে বললে, ওঁদের কথা থাক। আজ চলনা আমার সঙ্গে—কিছু পরের কেনা থাক।

পরের! বিস্ময়ে সুমিতার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। পরবে তুমি!

নিশ্চয়। একটু হেসে বললে, মানুষের রুচিই তো প্রতিদিন বদলাচ্ছে। আমি কি করতে পারি বল!

সূর্য্য অস্ত-গিরিতে আত্মগোপন করেছেন। তরল অন্ধকারের বন্যায় ঘর ভাসছে আলো-আঁধারের, এই সন্ধিক্ষণে সবই রহস্যময় বোধহয়—তবু অজিতের চোখে সুমিতা অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। বিদ্যুৎ গতিতে উঠে ও আলোর সুইচ টিপে দিলে। অন্ধকারের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো একরাশ আলো। সুমিতার মুখমণ্ডল থেকে বিষাদের অণুতম অংশটুকুও মুছে গেছে। উজ্জ্বল আলোর মতই ওর চোখের প্রসন্ন-দীপ্তি অজিতের সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করে দিচ্ছে।

অজিতের হাত নিয়ে সুমিতা বললে, চল।

অজিত চমকে উঠে হাত টেনে নিচ্ছিল—আনন্দের আতিশয্যে সুমিতা ওর ভাবান্তর লক্ষ্য করলে না।

এই আলো এই হাসি সুমিতার লাবণ্য অপহরণ করে নিয়েছে। আবলুসকালোপাড়ি পরা শ্যামলা মেয়েটিকে এত উজ্জ্বল আলোয় মানাচ্ছে না। অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে সুমিতা।

সুমিতা বলছে, তোমার জন্য নিজের হাতে খদ্দরের জহরলালী একটা কোট তৈরী করে দেব। আর একটা শাদা টুপি। বেশ মানাবে তোমায়।

অত্যন্ত সাধারণ কথা, তবু শুনতে ভালই লাগলো তো! প্রশ্নও উঠেছে মনে, মানুষ প্রতিদিনে যা বলে, যা করে—তা সবই কে অকৃত্রিম? হৃদয়ের আবেগই বল—আর কর্ত্তব্য বা দায়িত্ববোধই বল—ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল-বৃত্তির স্রোতে যা ভেসে আসছে, যা দূরে সরে যাচ্ছে তাদের প্রকৃত মূল্য কি? প্রকৃত মূল্য কোথায়?

মনে হচ্ছে, ওর দেহের লাবণ্য এই অতি সাধারণ কয়েকটী বাক্যের মধ্যে বুঝি আশ্রয় নিয়েছে।

অজিত সুমিতার হাতে আর একটু চাপ দিয়ে প্রীতি প্রকাশ করলে নীরবে। মনে মনে বললে, ভারি ভাল লাগছে তোমার কথা।

দুজন সৌম্য

শ্রীনরোজকুমার রায়চৌধুরী

সুব্রত এবং মহম্মদ একই স্কুলে একই সঙ্গে পড়ে।

বয়স তাদের চৌদ্দ-পোনেরো।

দুজনে ভারি ভাব। তার কারণ আছে :

ওরা শুধু যে একই পাড়ার সামনা-সামনি বাড়ীতে থাকে তাই নয়, দুই পরিবারের মধ্যেও আত্মীয়তা আছে।

সুব্রতর বাবা রোহিণীকান্ত এবং মহম্মদের বাবা মেহতাবউদ্দিন কলেজে একসঙ্গে পড়তেন এবং একই বৎসর মুন্সেফী চাকুরী পান। তারপর চাকুরীকালে পরস্পরের মধ্যে দেখা-শোনার সুযোগ কম ঘটলেও ছাত্র-জীবনের বন্ধুত্ব হৃদয় থেকে সরে যায় না। এই সত্যটি প্রমাণিত হয় ওদের চাকুরী পাওয়ার প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে, যখন উভয়েরই অবসর নেবার আর দেরী নেই।

সেই সময় আসাম মেলের একটি দ্বিতীয়-শ্রেণীর কামরায় হঠাৎ দুজনের দেখা হয়ে গেল।

রোহিণীকান্তর মাথায় তখন প্রকাণ্ড চকচকে টাক, আর মেহতাব-উদ্দিনের দাড়ি কাশফুলের মত ধপধপ করছে।

চেনা কঠিন, কিন্তু কারও চিনতে বিশেষ বিলম্ব হ'ল না। মুহূর্ত মধ্যে দুইবন্ধু পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কী আশ্চর্য, দুজনেই দুজনকে প্রায় ভুলে গেছলেন। জীবনের অপরাহ্ণ-বেলায় আবার দুজনে দেখা। এ কী বিধাতার খেলা!

খেলাই বটে!

সারাটা জীবন মফঃস্বলের শহরে-শহরে ঘুরে দুজনেই শেষ ক'টাদিন কাটাবার জন্যে স্থান খুঁজছিলেন। চাকুরীর মেয়াদ তো আর বেশি নেই!

স্থান পাওয়া গেল। যেমন স্থান খুঁজছিলেন, ঠিক তেমনি স্থানই। কলকাতা শহরের কোলাহল থেকে দূরে, পার্ক সার্কাস অঞ্চলে, সামনা-সামনি দুটি প্লট পাওয়া গেল।

সেই রাত্রাতেই দুজনে জায়গা দুটো কিনে ফেললেন। এবং জীবনের বাকী ক'টাদিন দুইবন্ধুতে আবার সহজ প্রতিবেশিত্বে ফিরে আসতে পারবেন ভেবে উল্লসিত হয়ে নিজের নিজের চাকুরীর জায়গায় ফিরে গেলেন।

যুদ্ধ তখনও বাধেনি। জিনিসপত্র সস্তা এবং সহজেই তখন পাওয়া যেতো।
সুতরাং দেখতে দেখতে সামনা-সামনি দুখানা বাড়ী উঠে গেল।
সুন্দর ছোট ছোট দুখানা বাড়ী। অবিকল এক রকমের।
যেন দুই যমজ ভাই পরস্পরের দিকে গভীর স্নেহে চেয়ে আছে।

তারপর দুজনে অবসর নিলেন, এবং সেই দুটি বাড়ীতে বাস করতে লাগলেন।
সুব্রত এবং মহাস্বৎ তখন ছোট।
তারা দুজনে এক সঙ্গে খেলা করে, ঝগড়া করে এবং ভাব করে। এক সঙ্গে স্কুলে যায়, টিফিনে পরস্পরের খাবার ভাগ করে খায় এবং স্কুলের শেষে এক সঙ্গে বাড়ী ফেরে।

যত দিন যায় উভয় পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তা ততই ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে। সুব্রতর মায়ের সঙ্গে মহাস্বতের মায়ের সখিত্ব গড়ে উঠলো। কর্তারা ঘুরে ফিরে ওরা কোনোদিন ও বাড়ীতে কোনোদিন এ বাড়ীতে মিলিত হয়। সংসারের সুখ-দুঃখের গল্প করে।

আর সরকারী চাকুরীর কোয়াল থেকে মুক্তি পেয়ে কর্তাদের তো অফুরন্ত অবসর। সময় কাটানোই দায়! ভোরে দুজনেই এক সঙ্গে পাশের পার্কে বেড়ান, ফিরে এসে চা খেয়ে দুজনেই একসঙ্গে বাজার যান। তারপরে খবরের কাগজ পাঠ। দুপুরে দিবানিদ্রা। বিকেলে চা-পান এবং হাবা খেলা।

দেখতে-দেখতে উভয় পরিবার ভুলেই গেল তাদের সাম্প্রদায়িক বৈষম্য।

মনে থাকবে কি ক'রে?

দুর্ভিক্ষ কি সম্প্রদায়ের বিচার করেছে? না, সম্প্রদায়ের বিচার করেছে মহামারী?

কালো-বাজারে হিন্দুরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তেমনি হয়েছে মুসলমানেরা।

তারপরে জাপানী বোমার···সে যে বেছে বেছে মুসলমানদের বাড়ীর উপরই বোমা ফেলবে, এমন কল্পনা কোনো হিন্দুর মনেই জাগেনি।

সুখে-দুঃখে দুজনেরই একই দশা। জিনিসপত্রের দুর্মূল্যতা এবং দুষ্প্রাপ্যতায় সেদিনের টাকায় দুজনেরই ফুলফুলে মা। দুই বুড়ো বসে সেই গল্পই করেন।

যুগের হাওয়া ওদের শিশু-মনকেও স্পর্শ করে।
মাঝে মাঝে এই নিয়ে দুই ছোট্ট বন্ধুর মধ্যে তর্কও হয়:
—জানিস ভাই, তোরা আর আমরা এক নই।—মহাস্বৎ বলে।
—তবে কি?—সবিস্ময়ে সুব্রত জিজ্ঞাসা করে।
—আমরা আলাদা লোক।
—সে কেমন ক'রে হবে?

—তা জানিনে, চল্ স্কুলে যাই।

ওরা সব কথা ঠিক বোঝে না। কিন্তু টিফিনে একই সঙ্গে খাবার খেতে খেতে দুজনেই অস্পষ্টভাবে অনুভব করে, কী যেন একটা প্রকাণ্ড দুষ্ট শক্তি ওদের দুই ভায়ের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টির চেষ্টা করছে। সেই শক্তি ওদের দুই ভাইকে বুঝি একসঙ্গে থাকতে দেবে না।

ওদের চোখে দুঃখের ছায়া ঘনিয়ে আসে। অমঙ্গলের আশঙ্কায় মন ভারী হয়ে ওঠে।

কারা এরা?

কারা এরা···যারা ভায়ের থেকে ভাইকে নেয় ছিনিয়ে? রাজনীতির দাবী কি হৃদয়ের দাবীর চেয়েও বেশি?

ওরা ভাবে নিজের মনে-মনে। কেউ কাউকে মুখ ফুটে স্পষ্ট বলতে পারে না। তার ফলে ওদের মনের মধ্যে সোনার শিকলের যে সংযোগ তা যেন ঢিলে হয়ে আসে।

পরস্পরের কাছ থেকে ওরা যেন ক্রমেই দূরে সরে আসছে।

এখনও দুজনে ওরা এক সঙ্গে স্কুলে যায়, এক সঙ্গে খাবার খায়, একই সঙ্গে স্কুল থেকে ফেরে। কিন্তু দুজনের হৃদয়ের সেই নিবিড়তা ধীরে ধীরে কিকে হয়ে আসছে।

ওরা তা বুঝতে পারে। বুঝে মনে-মনে কষ্ট পায়। কিন্তু প্রতিকারে কি যে করবে ঠাহর পায় না।

আর শুধু কি ওরাই?

রোহিণীকান্ত এবং মেনলাওউদ্দিনের মধ্যেও সেই অবস্থা।

পরিবর্তন ঘটেনি শুধু মেয়েদের মধ্যে।

বাংলার মেয়েদের, বাঙালী মেয়েদের ভগবান যে কি ধাতুতে গড়েছেন, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। তারা বোধহয় হৃদয় দিয়ে দেখে, হৃদয় দিয়ে শোনে, হৃদয় দিয়েই কাজ করে।

বাইরের জগতে এত বড় একটা আলোড়ন যে ঘটে চলেছে, তার কিছুই উত্তর পরিবারের গৃহিণীদের স্পর্শই করলো না। তাঁদের কাজ আগের মতোই চলতে লাগলো—সেলাই এবং গল্প।

সেদিন স্কুল যাবার সময় সুব্রত মহম্মদকে ডাকতে গিয়ে মহম্মদের মাকে বললে:

—কাকীমা, মায়ের খুব জ্বর। আপনি দুপুরে একবার যাবেন।

মহম্মদের মা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন:

—তাই নাকি রে? তাই সকাল থেকে তোর মাকে একটিবারও বারান্দায় দেখতে পাইনি। কখন থেকে জ্বর?

—কাল রাত্রি থেকে।

—জ্বর কি খুব বেশি?

সুব্রত ঘাড় নেড়ে জানালো, হ্যাঁ।

তারপরে দুজনে ঘুমে চলে পেল নিস্তা দিনের মতো।

মহব্বতের মা ও সংসারের কাজকর্ম সেরে দুপুরবেলা দেখতে গেলেন সুব্রতর মাকে।

বৃদ্ধ রোহিণীকান্ত বসেছিলেন রোগিণীর পাশে। মহব্বতের মাকে দেখে তিনি নীচে নেমে গেলেন বসবার ঘরে।

জ্বর খুবই বেশি, ১০৪° এর কম নয়। মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। মহব্বতের মা ওর উত্তপ্ত ললাটে ওডিকলোনের পটি দিয়ে ধীরে ধীরে বাতাস করতে লাগলেন।

—একটু আরাম পাচ্ছ দিদি?—মহব্বতের মা জিজ্ঞাসা করলেন।

—কিচ্ছু না দিদি, এতটুকু না। বরং আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, এ যাত্রা আমি আর বাঁচবো না।

—পাগলের মতো বোকো না। কী হয়েছে তোমার! কাল তো ঘোটে জ্বর ছিলো। তাও এমন কিছু বেশি নয়।

—কি জানি দিদি, বেশি কি কম। কিন্তু আমার মন যেন কি রকম করছে। সুব্রত রইলো। ওকে তোমার মহব্বতের মতোই মহব্বতের পাশাপাশি মানুষ কোরো।

সুব্রতর মায়ের কথা শেষ হ'ল না। নীচে বহু-কণ্ঠের 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনির মধ্যে বাকী অংশটুকু ডুবে গেল।

তারপরে পোনেরো মিনিট ধরে যে পৈশাচিক কাণ্ড ঘটলো, তা চোখে দেখা যায় না,—দেখলেও বিশ্বাস করা যায় না। পোনেরো মিনিট পরে যখন বাড়ী স্তব্ধ হ'ল, তখন বাড়ীর জিনিসপত্র কতক লুট হয়ে গেছে, কতক ভেঙে তছনছ হয়েছে এবং হাউ হাউ ক'রে বাড়ী জ্বলছে।

আর,—

বাড়ীর একটি প্রাণীও জীবিত নেই,—মহব্বতের জননীও না।

আর ঘণ্টার মধ্যেই পাশের হিন্দু-পল্লীতে এই দুঃসংবাদ পৌঁছে গেল।

এবং এক ঘণ্টার মধ্যেই আর একটা হল্লা গোল। এবার আর 'আল্লা হো আকবর' নয়, 'বন্দেমাতরম্'।

দেখতে দেখতে মেনহাজউদ্দিনের বাড়ীতেও ঠিক অনুরূপ কাণ্ড ঘটে গেল এবং সে বিষয়ে সাক্ষী দেবার জন্য একজনও জীবিত রইলো না। বাড়ী হাউ হাউ ক'রে জ্বলতে লাগলো। এবং যারা এই কাণ্ডের নায়ক, তারা পোনেরো মিনিটের মধ্যে ভোজবাজির মতো কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল!

জ্বলছে দুটো বাড়ী।

যেন তাদের মতো যে দুটো বাড়ী দীর্ঘ দশবৎসর পরস্পরের দিকে সন্দেহ-দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল, আজ তাদের মাথায় জ্বলছে আগুন।

সে আগুন উঠছে আকাশের দিকে, ভগবানের দরবারে।

ধ্বংস এসে যেতালে সে আগুন।

স্কুলের ছুটি হয়ে গেল।

দুটি ভাই মহব্বৎ আর সুব্রত সেই ভস্মস্তূপের সামনে এসে অবাক হয়ে গেল।

এ কী তাদের বাড়ীর রূপ!

দরজা-জানালা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কড়ি-বরগা ঝুলছে। জানালার লোহার শিকগুলো বেঁকে ঝুলছে। দুধের মতো ধপধপে দেওয়ালে আগুনের কালো কালচে চিহ্ন।

এ কী রূপ!

কে এমন করলে!

সুব্রত চেয়ে দেখলে, কালো কাঠ-কয়লা দিয়ে কে লিখে রেখে গেছে: হিন্দুস্থানের এই দশা হবে।

মহব্বৎ চেয়ে দেখলে, তাদের বাড়ীর দেওয়ালেও ঠিক অমনি ক'রে কে লিখে রেখে গেছে: পাকিস্থানের এমনি দশা হবে।

অসহায়ভাবে ওরা পরস্পরের মুখের দিকে চাইলে। কারও মুখ থেকে একটি কথাও বার হোল না,—না শোকের, না ক্রোধের।

হঠাৎ দেখলে, একটি বুড়ি লাঠিতে ভর দিয়ে ঠুক ঠুক ক'রে তাদের দিকে আসছে।

পরণে তার ছেঁড়া কাপড়। হাড় বেরুনো। কুঁজো পেটে-পিঠে এক হয়ে গেছে। গায়ের রং পোড়া কাঠের মতো। মাথার শনের নুড়ির মতো এক মুঠো পাকা চুল।

শুধু চোখে জ্বলছে আগুন।

বুড়ি কাছে এসে ওদের দিকে চাইলে।

সুব্রতকে জিজ্ঞাসা করলে, এইটি বুঝি তোমার বাড়ী?

বুড়িকে দেখে ওদের ভয় করছিল।

সুব্রত ভয়ে ভয়ে বললে, হ্যাঁ।

—আর এইটি বুঝি তোমার বাড়ী?

—হ্যাঁ। মহব্বৎ জবাব দেয়।

—আহা! একেবারে ছাই হয়ে গেছে! বেঁচেও কেউ নিশ্চয় নেই। তোমাদের বাপ-মা সবাইকে তারা নিশ্চয় কেটে ফেলেছে!

—কারা কেটে ফেলেছে?

—সেই তারা। চেনো না তাদের? চিনবে দুদিন পরে, তখন চোখ খুলবে। তখন বুঝবে কে আপন, কে পর। পালাও, পালাও,—এখন পালাও, যেদিকে দু'চোখ যায়। হাঁ···যাবার আগে এই ছাই ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে যাও: তোমরা দুই ভাই, শক্তিমান বাহু দিয়ে এই ধ্বংসস্তূপের উপর আবার তোমরা নতুন সৌধ গড়ে তুলবে,—সে সৌধ হিন্দুস্থানেরও নয়, পাকিস্থানেরও নয়,—মানবস্থানের।

বুড়ি ঠুক ঠুক ক'রে পাশের গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বিচিত্রানন্দ

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

গল্প বলব ?

কাল যা ছিল জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয় আজ তা স্মৃতির ছবি মাত্র। যাঁর উপস্থিতি এই যুগকে পূর্ণ করেছিল নূতন উপলব্ধি, নূতন প্রেরণার আনন্দ সঙ্গীতে। যাঁর উপস্থিতি বন্ধু-পরিজন ও শুভাদের জীবনকে উৎসব রাগিনীর মত মধুর করে রেখেছিল—আজ তাঁর কথা স্মৃতির কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছে। সেই স্মৃতিতে, যে-স্মৃতি সুখ-স্বপ্নের মত আচ্ছন্ন করে রেখেছে হৃদয়, কত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ঘটনা গল্পের মত ভেসে ওঠে। সৎসঙ্গে যে সুখ, সৎ-আলোচনায় তার কিছু মেলে, আর এই ছোট-ছোট গল্প-কথিকা সেই বিপুল জ্যোতি-র্লোকের আনন্দ-সংবাদ মুনিয়ে বহন করে আনে। অল্প তা অবসরানে বসে করে সংগ্রহ করে রাখিনি। আজ তারা স্মৃতির ধরতাস এসে আঘাত করে—এবং সেই ছোট-ছোট সামান্য ঘটনার মধ্যেই এক করুণাময়, আনন্দময় স্বরূপ বসন্তে থাকেন—জয় অহং ভো !

(১)

সে ছিল বোধহয় ১৯৩৩ সালের গ্রীষ্মকাল। দার্জিলিং-এ 'মেনাইডেন' নামে একটি বাড়িতে গুরুদেব অবকাশ-যাপনের জন্য এসেছেন। 'মালঞ্চ' গল্পটি তখন সদ্য রচনা শেষ হয়েছে একদিন তাই দার্জিলিং-এ উপস্থিত বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ এল গল্প শোনবার। কবি প'ড়ে শোনাবেন 'মালঞ্চ'। 'বাঁশরী' ও 'মালঞ্চ' এ দুটি গল্পই সেবার দার্জিলিং-এ লেখা হয়। বাঁশরীর আগের নাম ছিল 'পলাশের লিখন'। তারপর অনেক পরিবর্তন কাটা-ছাঁটা সংযোগ ও বিয়োগ ক'রে আজকের 'বাঁশরী' ও 'মালঞ্চের' রূপ দাঁড়িয়েছে।

সন্ধ্যা হ'তে এস—বসবার ঘরে জনসমাগম হচ্ছে। একে-একে সবাই এসে নিজের আসন গ্রহণ করছেন। গুরুদেব ঘরের এক কোণে একটি চৌকিতে ব'সে আছেন। বাহাত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ হয়েছে তবু দীর্ঘ দেহ-যষ্টি তখনও তেমন নুয়ে পড়েনি। পাশে একটা ছোট্ট টুলের উপর নানা রংএর খাতাগুলিতে পাণ্ডুলিপি রয়েছে। তাই উল্টে-উল্টে দেখছেন ও মাঝে-মাঝে সমাগত ব্যক্তিদের সঙ্গে অত্যন্ত নীচুস্বরে কথা বলছেন। পথে বা সভাস্থলে সর্বদাই তিনি অতি মৃদুস্বরে কথা বলতেন। যখন সভাগৃহে কেহই নিয়মাবর্তী নয় অর্থাৎ সভারম্ভের পূর্বে বা সভাভঙ্গে সমাগত ব্যক্তিগণের পরস্পর উচ্চৈঃস্বরে কথোপকথন যখন গৃহকে কোলাহল-মুখর করেছে, তখনও তাঁকে কোনোক্রমেই একটুও জোরে কথা বলতে শুনি নি। অতি মৃদুস্বরে পার্শ্ববর্তীদের সঙ্গে কথা বলতেন। আভিজাত্যের সমস্ত নিয়ম তাঁর স্বভাবের একেবারে স্বাভাবিক অঙ্গ ছিল। তার কখনো ব্যতিক্রম হত না।

সভাস্থলে ক্রমে ক্রমে সবাই এসে বসলেন। তাঁদের মধ্যে নানা শ্রেণীর লোক ছিলেন—কারু বা মনের আভিজাত্য কারু বা মানের, কারু বা দুই আছে। কারু বা দুই-এরই অভাব। পরস্পর বিরোধী নানা শ্রেণীর লোক তাঁর নিকটে সর্বদাই একত্র হতেন। সেদিন সেই জনতার মধ্যে একটি অল্প বয়সের মেয়ে ছিল। সেই বিশিষ্ট জন-মণ্ডলীর মধ্যে সে নিতান্তই সামান্য এবং লক্ষ্য যোগ্য নয়। কিছুদিন থেকে ইন্ফ্লুয়েঞ্জায় ভুগছে তবু এ-নিমন্ত্রণের লোভ সংবরণ করতে পারে নি, তাই নিজের অসুস্থতা নিয়েই লজ্জিতভাবে একপাশে ব'সে আছে

আর বারবার রুমাল দিয়ে কাশির বেগ রুদ্ধ করছে। পড়া সুরু হয়ে গেল। গম্ভীর স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ আশ্চর্য্য কণ্ঠস্বরে গল্পের যবনিকা উত্তোলন হয়েছে—এমন সময় একদল অতিথি এসে পড়লেন।

বিলম্বিত অতিথিরা সদম্ভোরে পিছনে বসে পড়ায় সেই বালিকাকে সামনে এগিয়ে তাঁর দৃষ্টি-গোচর হ'য়ে বসতে হল। কবি তাকিয়ে দেখলেন, সে হাঁটুর উপর মাথা নীচু করে কষ্টে কাশির বেগ নিরুদ্ধ করে পাশের ঘরে উঠে গেল। সেখানে জানালার উপর মাথা রেখে অনেকক্ষণের রুদ্ধ-কণ্ঠের নিবৃত্তি করছে হঠাৎ একটা শব্দ শুনে ফিরে দেখে কবি সেই ঘরে এসেছেন। টেবিলের কাছে কি যেন খুঁজছেন। সেটা তাঁর শয়ন কক্ষ, একপাশে বিছানা আর জানালার কাছে লেখবার টেবিল—তার উপরে কাগজপত্র বই ছড়ান রয়েছে আর সারি সারি বায়োকেমিক ওষুধের শিশি রয়েছে সাজান। বালিকার মনে হল, হয়ত তিনি কোনো খাতা ফেলে গিয়ে থাকবেন তাই খুঁজছেন, সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল—"কি খোঁজ?" "এই যে পেয়েছি, এই নাও।" ব'লে একটা ওষুধের শিশি খুলে কতগুলি বায়োকেমিক ওষুধের বড়ি একটি কাগজে ঢেলে তার দিকে এগিয়ে দিলেন—"এই নাও, দু'ঘণ্টে করে মাঝে-মাঝে মুখে দিলে এখনই কষ্ট কমে যাবে।" ব'লে তৎক্ষণাৎ ফিরে চলে গেলেন।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বিস্ময়াভিভূত বালিকা। সেই অপসৃয়মান-মূর্ত্তি আজও তার চোখের সামনে আছে। সুদীর্ঘ দেহে দীর্ঘ পরিচ্ছদ আপাদলম্বিত হয়ে আছে। দুটি হাত পিছনে একত্র করা, একখানি নীল রংএর খাতা আঙুল দিয়ে চিহ্নিত ক'রে ধরে আছেন। ফিরে গিয়েই আসন গ্রহণ করে পড়তে বসলেন। এই বাধা-সৃষ্টির কারণ হয়েছে মনে করে নিতান্ত লজ্জিত সঙ্কুচিত হ'য়ে দরজার একপাশে সে বসে রইল। কাণের ভিতর মাথার ভিতর দ্রুত সঞ্চালিত হ'তে লাগল রক্ত। মনে হতে লাগল ঘর সুদ্ধ লোক যেন তার দিকে ভ্রূকুটি পূর্ণ ভর্ৎসনা নেত্রপাত করছে। অবশ্য তখন সত্যই কেউ চেয়ে ছিলেন না, কারণ অনেকেই হয়ত ব্যাপারটা বুঝতে পারেন নি; আর যদিও কেউ পেরে থাকেন তাঁরাও তৎক্ষণে পড়া শুনতে মন দিয়েছেন। তবু তার আনন্দিত অশান্ত হৃদয় দীর্ঘক্ষণ পর্য্যন্ত ধক-ধক করতে লাগল। তারপর কখন বালকের কল্পনা গল্পস্রোতের মধ্যে মন ডুবে গেল। অদ্ভুত কল্পনা বল। শেষ যেখানে আছে "শেষিত-পরা-পাণ্ডুবর্ণ দীর্ঘমূর্ত্তি বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল। অদ্ভুত গলার বলনে, পালা পালা পালা এখনই, নইলে দিনেদিনে দেব বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলব রক্ত।"

মৃত্যুমুখ গল্পের নায়িকার আর্ত্তস্বর এল তার কণ্ঠে—সে আজও কানে বাজে। কী আশ্চর্য্যই পড়ার শক্তি ছিল তাঁর। সমস্ত রচনা—যেন প্রাণ গ্রহণ ক'রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মত সজীব হয়ে উঠত।

রাত্রি হ'য়ে এল। আর্দ্র হৃদয়ে গল্পের করুণ রসে দ্রবীভূত-চিত্তে সবাই বাড়ি ফিরছেন। দীর্ঘ নির্জ্জন ছাতাছন্ন অন্ধকার অঙ্গনও বোড় দিয়ে মোড় ঘুরে ঘুরে এক-একটি রস আলোচনা করতে করতে চলেছেন। সেদিন রাত্রি ছিল পরিষ্কার। সন্ধ্যা বর্ষণশেষ মেঘমুক্ত আকাশে অগণ্য তারা। গল্পের নীরক্ততার দুঃখের কাহিনীকে ছাপিয়ে সেই বালিকা-হৃদয়ে এই আশ্চর্য্য স্পর্শ অপূর্ব আনন্দে মথিত হয়ে উঠেছিল। সামনের আলোকিত নক্ষত্রখচিত সহরের দৃশ্যের চাইতেও মনের মধ্যে ঝকমক করে উঠছে বিস্ময় ও পুলক। হয়ত তার মধ্যে অহঙ্কারও ছিল। হয়ত সে মনে করেছিল, তারি জন্য সভাগৃহ থেকে উঠে এসে তাকেই

বিশ্বপ্রেমে তিনি স্নেহ করেছেন। কিন্তু সে অহংকার সত্তা নয়। তাঁর হৃদয়ে নিয়ত যে প্রীতি-নির্ঝর বয়তো, সে স্বতঃ উৎসারিত ধারা আপন আনন্দে বয়ে গেল। দৈববশতঃ যারা নিকটে ছিলেন, তাঁরা তাতে অবগাহন করেছেন বটে, কিন্তু সে উপলক্ষ্য, উপলক্ষ্যই মাত্র।

সমস্ত মানব-চিত্তের সঙ্গে প্রেমে নিজেকে মিলিত করাই ছিল তাঁর সাধনা। তাই কেউ কোনো কষ্ট পাচ্ছে, তা শারীরিক হোক বা মানসিক হোক এবং সে আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয় হোক, নিজ অন্তরে তিনি সে-বেদনা অনুভব করতেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপেও সর্ব-মানবের মধ্যে পরিব্যাপ্ত মানবসত্তার একটি ঐক্যরূপ ছিল তাঁর ধ্যানে। তাই কুচ্ছ কেহই ছিল না তাঁর কাছে।

(২)

এক পাগল তাঁকে প্রায়ই বড় বড় চিঠি লিখত। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা—কত কি যে লিখত। সে তার অস্তিত্ব-হীন বিষয়-সম্পত্তি বারবার তাঁকে দানপত্র করে দিত। তার সংসারের কাহিনী, দুঃখ সুখ, তার পাগলের প্রলাপ অসংবদ্ধভাবে অপরিচ্ছন্ন লেখায় সে প্রায়ই লিখিত। সে চিঠি পড়াও হতেনা এবং সে সম্বন্ধে করবারও কিছু ছিল না। পাগলের চিঠি এলে সবাই হাসতেন তারপর ছেঁড়া কাগজের টুকরীতে পড়ে থাকত। গুরুদেব মাঝে-মাঝে ঠাট্টা করে বলতেন যে, এই আমার একমাত্র যথার্থ ভক্ত, যে তার সমস্ত সম্পত্তি বারবার আমায় দান করছে। তবে সম্পত্তিটা নিরাকার, তাই দানটা এত সহজ!

একদিন দুপুরবেলা হঠাৎ ঘরে ঢুকে দেখি সেই পাগলের একটা বিরাট চিঠি হাতে নিয়ে বসে আছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখে যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন "এখন হাতে কিছু কাজ নেই কিনা তাই এর মনস্তত্ত্বটা বোঝবার চেষ্টা করছি। সেদিন সেই সূত্রে অনেক কথা বলেছিলেন। যা তেমন করে সংগ্রহ নেই। তবু সেদিন বুঝেছিলাম ওই পাগলের প্রতি করুণায় তাকে তিনি বাহ্যদৃষ্টিতে দেখে একেবারে বাদ দিতে পারছেন না। যা তাঁর বিপুল কর্মস্রোতে একেবারে আবর্জনার মত ভেসে যাবার যোগ্য, তাও তিনি ফেলে দিতে পারতেন না। ঘটনাচক্রে কেউ মূর্খ, কেউ পাগল, কেউ নির্বোধ—কিন্তু যে আত্মিকলোকে ছিল তাঁর বাস সেই "সর্বমানব চিত্তের মহাদেশে" সকলকেই তিনি স্থান দিতে পারতেন। তাই সেদিন বলেছিলেন "এই যে এর নির্বুদ্ধিতা, এ একটা আকস্মিক ঘটনা। যে মানবলোকের মধ্যে আমি আছি, তুমি আছ, এ পাগলও তারি অন্তর্গত। সঙ্কীর্ণতার বেড়া, তামসিকতার অন্ধকার দিয়ে কারু-কারু মন আবৃত কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি ব্যাপক সত্তা আছে যা সমস্ত ভেদ অতিক্রম করে। সেই সত্তার অস্তিত্ব আমরা তখনই উপলব্ধি করি যখন অসম্ভব স্থানে অবিশ্বাস্যভাবে হঠাৎ কোনো মহত্ত্বের প্রকাশ দেখতে পাই। মূঢ়ের মূঢ়ত্বই তার চরম সত্য নয়—সেটা তার একটা অস্থায়ী আংশিক প্রকাশ……

৩

একদিন খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল একটি ছোট খবর। চীনদেশে জাপানীদের অত্যাচারের ছোট একটি ঘটনা। এক কৃষক পরিবারে স্বামীকে আবদ্ধ রেখে তার সামনে রেখে তার স্ত্রীকে লাঞ্ছিত ও শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। রবিবারবেলা সেই ঘটনা কাগজে পড়লেন। তারপর সমস্ত সন্ধ্যা বসে

নীরবে! সেই গভীর নীরবতার সঙ্গে আর একটি দিনের মাত্র তুলনা—পরে মনে হয়েছিল—যেদিন তাঁর অভিপ্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু সংবাদ পান। পরদিন অতি প্রত্যূষে নিষ্প্রোথিত হয়ে বসেছেন, বাহিরে দৃষ্টি আনত, প্রভাতের প্রথম সূর্যালোক পড়েছে তাঁর শুভ্র দেহের উপর। সেই নিষ্কম্প শুভ্রতা, সেই গভীর স্থৈর্য্য, এমন একটি মহিমাপূর্ণ ছিল যা ভাষায় বোঝান কঠিন। সেদিনকার কথা মনে আছে—স্থির বসে আছেন আর বড় বড় পাহাড়ী কেরুই-লোকা হাতের উপর, পিঠের উপর ঘাতায়াত করছে নির্দ্বিধে তাতেও ঈষৎমাত্র সঞ্চালিত হচ্ছে না কোনো অঙ্গ। সেই আশ্চর্য্য হিমালয়-সদৃশ অচল স্থির ধ্যান-নিবিষ্ট মহাপুরুষের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি ক্ষুদ্র জনের মনের মধ্যেও বিরাটের উপলব্ধি আনতে পারত।

সেদিন প্রথম যখন কথা বললেন, তখন বললেন—"য এক: স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু···মানুষ জানে, যে বুদ্ধি মিলনের, ঐক্য সাধনের, সেই শুভ বুদ্ধি। তাই মানুষ প্রার্থনা করেছে যেন সেই পরম এক শুভ-বুদ্ধিতে আমাদের সকলকে এক করে দেন। এই মিলনের কল্যাণ ইচ্ছা মানুষেরই মধ্যে আছে—আবার সেই মানব চরিত্রেই একি তার বৈপরীত্য।"

সেদিন বেশী কথা বলেন নি। শুধু বেখেছিলাম উপলব্ধির বেদনা। তিনি সর্ব্বদা নিজের যে সাধনার কথা উল্লেখ করতেন, তাঁর কাব্যে ও নানা রচনায়, কখনও স্তবে কখনও সুরে ছন্দে গানে আনন্দে মানবের যে ধর্ম্মকে তিনি "মানুষের ধর্ম" বলে উল্লেখ করেছেন, সে ধর্ম্মের সাধনা সকল মানবের মধ্যে পরিব্যাপ্ত বিশ্বসত্তার সঙ্গে যোগ সাধনে। "বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো, সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।" নানা ছাঁদে তিনি বলেছেন যে দেশেকালে বেহবিভিন্ন সীমার বিভক্ত মানুষের মধ্যেও একটি ঐক্য নিশ্চয় আছে—তা'না হোলে জগতে এত আত্মবিসর্জ্জন এত ত্যাগের কাহিনী আমরা পেতাম না। ভোগ করে তার দেহে কেন্দ্রীভূত ক্ষুদ্র স্বরূপ কিন্তু ত্যাগ করে সে কার জন্য? যখন অনাগত সুদূর ভবিষ্যতের কল্যাণ কামনায় অনায়াসে প্রাণ বিসর্জ্জন করে তখন দেখি মানুষের বিশ্বরূপকে। মানুষের মধ্যে এই বোধ নিশ্চয় আছে যে তার ক্ষুদ্র স্বরূপ তার একমাত্র সত্য নয়।—তাই তিনি বলেছেন "যে মানুষ আপনার আত্মার মধ্যে অন্যের আত্মাকে ও অন্যের আত্মার মধ্যে আপনার আত্মাকে জানে, সেই জানে সত্যকে।"

জীবনে কত ছোট-ছোট ঘটনায় কবির এই সত্য-সাধনার অন্তর্রূপ বাহিরে প্রতিবিম্বিত হত তার কতটুকুই বা লক্ষ্য করবার শক্তি এবং সুযোগ আমাদের ছিল? তবে সেদিন সেই চীন পরিব্রাজের দুঃখের বেদনা যখন আত্মীয়-বিয়োগের মতই আঘাত হানতে দেখলুম, তখন মনে হয়েছিল এ সেই বড় আমির রূপ, এ সেই বিশ্বসত্তা, এই সেই আত্মসীমায় আবির্ভূত অনন্ত। অথচ ব্যক্তিগত দুঃখ-কষ্ট সে কখনো অতিকায় হয়ে উঠত না—ব্যক্তিগত শোকে তিনি অধৈর্য্য হতেন না। কারণ সুখের মধ্যে পরের মধ্যে প্রসারিত তাঁর চৈতন্যে ব্যক্তিগত দুঃখের তার হাল্কা হয়ে যেত। তাকে প্রাধান্য দিতে কখনই চাইতেন না। সর্ব্বমানবের আত্মীয় তাঁর আত্মায় ছিল সেই বাণী—"বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর—?"

আজ যখন তাঁরই জন্মভূমিতে ভ্রাতৃহত্যার নিরন্ত অবিশ্রাম হননের কাহিনী মনকে কঠিন ও হৃদয়কে পঙ্গু করে তুলেছে, তখন মনে হয়, ব্যর্থ কি হয়েছে এদেশে তাঁর আবির্ভাব?

তাঁরই ব্যথিত কণ্ঠস্বরে মনে পড়ে—

"ভগবান তুমি যুগে-যুগে দূতে
পাঠায়েছ বারেবারে
দয়াহীন সংসারে—"

সমানুভূতি

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মধ্যযুগের বর্বরতার নাটাশালায় পরিণত আলোকোজ্জ্বল আধুনিক সহরের পোড়া আকাশে কুৎসিৎ রাত্রি নেমে আসছে ফোঁটা ফোঁটা রক্তমরা অশুপতি লক লক ছিদ্র মেলে, মানুষের জগতের আপসোষ ও আন্তিকে আদিম গোপনতায় কবর দেবার ইঙ্গিতের মত। সহরের কতটুকু অংশই বা সে পার হয়েছে হেঁটে, কতটুকুই বা সে দেখেছে, তারই তাপ যেন উগ্র জ্বরের মত হু হু করে বেড়ে তাকে বহনে দিচ্ছে, নিজেকে সে চিনতে পারছে না। রাগ করবে, হিংস্র হয়ে উঠবে, না কাতর হয়ে পড়বে—ঠিক করতে পারছে না।

তিনদিন আগে জীবন্ত কর্মব্যস্ত সহরকে রেখে দরকারী কাজে বাইরে গিয়েছিল, আজ ফিরে এসে দেখছে নিজের বুকে আগুন জ্বেলেছে সহর, ভেঙ্গে চুরে লুটপাট করে গিয়েছে লাভানো লোকান পাট, ঘরে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে পড়া শব হয়ে পথে পথে। তারপর নিঃশব্দ আতঙ্ক যেন গায়ে অসহ্য পচা গন্ধ হয়ে চুঁটি চেপে ধরে দম আটকে দিতে চাইছে তার। ষ্টেশনে নামা পর্যন্ত আপনজনদের জন্য আশঙ্কায় শিরা-উপশিরা তার টন-টন করছিল, বাড়ীর দিকে চলতে চলতে এখন যেন আর তাদের কথা ভাবতেও পারছে না। বিরাট ব্যাপক ও গভীর এক দুর্ভাবনার মধ্যে মিলিয়ে-মিশিয়ে গেছে কয়েকটি নিজের লোকের কুশল-অকুশলের ব্যক্তিগত ভাবনা চিন্তা।

মানুষ চলছে দু'চারজন, তারা যেন আরও স্পষ্ট আরও রোমাঞ্চকর করে তুলেছে পরিচিত রাজপথের অদ্ভুত অকথ্য স্তব্ধতা নির্জ্জনতা, জীবনে কোনদিন ভোর থেকে সারারাত্রি পর্যন্ত যে পথকে কখনো সে জন-যানে বুধর ছাড়া অন্যরকম রাখে নি। ১৯ শে জুলাই-এর হরতালের দিন কর্মমুখরতা সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পথ নির্জ্জন ছিল না একমুহূর্ত্তের জন্য, মৃত পুরীর স্তব্ধতা এমনভাবে জমাট বেঁধে থাকে নি পথে।

তারইমধ্যে হয়তো মরিয়া হয়ে যারা পথে নেমেছে, কি শঙ্কিত সচকিত তাদের সেই দু'চারটি পথচারীর। কি সন্ত্রস্ত ভাবে তাদের পথ চলা! কি ভোঁতা নির্ব্বোধ মুখের ভঙ্গি, চোখের ভঙ্গি আকস্মিক আঘাতে হতজ্ঞান মানুষের মত। ভয়ের কলে চালিত ঠিক কলেরই মত এদিক ওদিক চাইছে, ভয় যেন দাঁড়িয়ে গিয়েছে একটা দৈহিক প্রক্রিয়ার।

বাড়ীর সামনে পৌঁছে সেও দাঁড়িয়ে থাকে নির্ব্বোধের মত ভোঁতা দৃষ্টিতে বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে। সদর দরজার একটা পাট ভেঙ্গে পড়ে আছে নীচে, আরেকটা পাট নীচের একটা কব্জায় লেগে কাত হয়ে ঝুলছে। তাদের একটা বাক্স পড়ে আছে দরজার সামনে রাস্তার ঠিক তার পায়ের কাছে, চেনা বাক্স,

ন' বছর ধরে তার স্ত্রী এই বাক্সর তালা খুলেছে বন্ধ করেছে। বাড়ীর নীচের দোকানটি নিশ্চিহ্ন, ফাঁকা ঘরটি শুধু খাঁ খাঁ করছে। দোতলার তার ফ্ল্যাটটির দিকে চোখ তুলে সে চোখ নামিয়ে নেয়। এই খানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে বুঝতে পারে তার ঘর সংসার, তিন দিন আগেও যার অস্তিত্ব ছিল, যা সত্তা ছিল, শূন্যে মিলিয়ে গেছে, দোকানটির মতই খাঁ খাঁ করছে তিনটি ঘর।

ঘুরে দাঁড়িয়ে সে পথের দিকে তাকায়। এপাশের মোড়ের কাছ থেকে উগ্রত জনতার কোলাহল ভেসে আসছে। ছটি তেতলা বাড়ীর মাঝখানের সঙ্কীর্ণ ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ছে অদূরে এক বস্তির আগুন। উপরে আকাশের খানিকটা লাল হয়ে গেছে, রক্তের ফুলিঙ্গ-ঝরা লকলকে শিখার জিভের তুলি বুলিয়ে আগুন যেন রঙ মাখাচ্ছে আকাশে। রাস্তায় কতগুলি মৃতদেহ পড়ে আছে, দেখতে না চেয়েও তার চোখে পড়েছে, তার মধ্যে স্ত্রীলোকের এবং শিশুর দেহও আছে। ওদের মধ্যে কি তাকে খুঁজতে হবে তার বৌ ছেলেমেয়েকে? এই চিন্তাটাই সে প্রাণপণে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সে জানে চিন্তাটাকে দু'চার মিনিট এড়িয়ে চলা যেতে পারে, ওই রাস্তায় শোয়ানো দেহগুলির মধ্যে বৌ ছেলেমেয়েকে খোঁজার কাজটা এড়ানো চলবে না।

হঠাৎ সে বুঝতে পারে রাস্তায় শুয়ানো দেহগুলি সব মৃতদের নয়, দু'একটা দেহ এখনো অতি মৃদু, অতি ক্ষীণস্বরে কাতরাচ্ছে। কয়েক পা এগিয়ে সে বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে পড়ে ডাইবিনের উপচানো ঘৃণ্য আবর্জনার পা দিয়ে। একটা সন্তিকারের মড়ার চাও সে মাড়িয়ে দিয়েছে মানুষটা তার চেনা। নীচের তলার দোকানটার মালিক।

কে যেন বলে কানের কাছে, এখানে দাঁড়াবেন না এভাবে। শুনছেন? এক জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবেন না। ও, আপনি বাকি!

সে তাকিয়েও আগে না। এতক্ষণ পরে একটা স্পষ্ট বোধগম্য অনুভূতি তার মধ্যে উদ্যত হয়ে উঠেছে, মানুষের ওপর তীব্র ঘৃণা, নিজেকেও মানুষ ভাবতে চাওয়ার দুরন্ত ক্ষোভ। নিজের বাড়ীর সামনে প্রকাশ্যে রাজপথে তার চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার অধিকার নেই, হিংস্র পশুতে পরিণত হয়ে মানুষ এমনি বিপদসঙ্কুল জঙ্গলে পরিণত করেছে তাদের চলার পথকে? একদিকে চলছে লুণ্ঠতরাজ, আগুন দেওয়া, এদিকে পথে-শোয়া না-মরা শব ক্ষীণস্বরে কাতরাচ্ছে! ওদের তুলে নেবার মতও মানুষ অবশিষ্ট নেই মানুষের, সত্য মানুষের—এই সহরে? আহত কুকুর বেড়ালের মত এদের মরতে হবে রাস্তায় পড়ে?

হঠাৎ চারিদিকের সমস্ত হিংস্র কলরবকে বাঁশির রবে, ঘুনে ধরা লুণ্ঠতরাজের বস্তু-অভিনয়কে ক্ষুব্ধ করে, ত্রস্ত হতাশায় আঁধারকে হেডলাইটের জোরালো আলোয় মিলিয়ে দিয়ে প্রায় তার সামনেএসে দাঁড়ায়—রোগী ও আহতের জন্য মানুষেরই মিলেমিশে গড়ে-তোলা প্রতিষ্ঠানের ছাপ লাগানো গাড়ী। তিনটি পুরুষ আর একটি মেয়ে নামে গাড়ী থেকে। রাস্তায় শোয়া-দেহগুলির মধ্যে কোনটাতে প্রাণের স্পন্দন আছে খুঁজে নেয়ে সযত্নে গাড়ীতে তুলে নিয়ে তারা চলে যায়।

পায়ের নীচে পৃথিবীটাই টলমল করতে আরম্ভ করেছিল, এবার যেন অন্ততঃ মাটিটা স্থির হয়।

"শুনছেন? এখানে দাঁড়াবেন না"

এবার সে তাকায়, চিনতেও পারে। তার ফ্ল্যাটের পাশের একতলা বাড়ীটার সামনে ছোট একটি

লণ্ড্রী আছে, তার মালিক। ছোট একটি কুঠরি, টিনের ছাওয়া, উপরে ছোট একটি টিনের পাতে আঁকা-বাঁকা হরফে লেখা যে এই লণ্ড্রীতে সুলভে সুন্দররূপে কাপড় ধোয়া হয়। আজ কত বছর লোকটিকে সে দোকানে বসে থাকতে দেখেছে সামনে দিয়ে যাতায়াত করার সময়, মাঝে মাঝে বিশেষ জরুরী দরকারে ওর সাধারণ ছোট লণ্ড্রীতেই দু'একটি জামা-কাপড় ধুতেও দিয়েছে। দোতলার ফ্ল্যাট থেকে চোখেও পড়েছে সঙ্কীর্ণ নোংরা উঠানে এই অশিক্ষিত গরীব পরিবারের জীবন-যাত্রার সংক্ষিপ্ত সাধারণ দৃশ্যছবি। কিন্তু লোকটির নাম পর্যন্ত সে জানে না!

'এদিকে চলে আসুন।' লণ্ড্রীর মালিক আধার বলে শঙ্কিত ঔৎসুক্যের সঙ্গে।

'কোথা যাব? বাড়ীতে গিয়ে একবার দেখে আসি কি হয়েছে?'

'সবাই ঠিক আছেন। চলে আসুন।' লণ্ড্রীর মালিক যেন এবার ধমক দিয়ে হুকুম দেয়।

তার সঙ্গেই যান সে। একবার থমকে দাঁড়ায় ছোট দরজাটি দিয়ে বাড়ীর ভেতরে ঢুকবার আগে। মনে হঠাৎ সন্দেহ জাগে, কোন মতলব নেই তো লোকটার? ভেতরে নিয়ে গিয়ে শেষ করে ফেলে না তো তাকে? তখন মনে পড়ে তার ফ্ল্যাটের নীচে মুদি দোকানটির কথা, তাদের বাস্তুটির কথা। দ্বিধা না করে সে ভেতরে ঢুকে যায়।

ওনারা সবাই এখানে আছেন। ভাল আছেন। লণ্ড্রীর মালিক বলে ঘরে ঢুকবার আগে।

ভাল আছে? সবাই ভাল আছে? কলের পুতুলের মতই সে লণ্ড্রীর মালিকের পিছু পিছু তার দোতলার ফ্ল্যাট থেকে দেখা ভিন্ন সেঁতসেঁতে একরত্তি উঠানটুকু পার হয়ে লণ্ড্রীর ঠিক পিছনের ঘরে ঢোকে। ঘরটি ছোট, আসবাবের মধ্যে একটি তক্তপোষ, লোহার একটা চেয়ার। ছাদ থেকে ঝোলানো সেডহীন অল্প পাওয়ারের একটি বাল্‌ব জ্বলছে। তার আলোই যথেষ্ট, চোখের পলকে দেখে নিতে হয় যে। তক্তপোষের ছাঁটি থেকে তার বৌ আর ছেলেমেয়ে তিনটি বেঁচেই আছে, অনাহত সুস্থ অবস্থায়। তার স্ত্রীর বাঁ গালের চামড়াটা শুধু ছড়ে গেছে চিবুক থেকে চোখের পাশ দিয়ে কপাল পর্যন্ত:

'এসেছো তুমি!' তার স্ত্রী বলে ধড়মড়িয়ে উঠে আসে। তক্তপোষের একপাশে একটা চাদর গায়ে দিয়ে সে শুয়েছিল। দুঃখের সীমা যেন তার পার হয়ে গেছে এমনিভাবে সে নিজেকে সঁপে দেয় তার বুকে। সে বুঝতে পারে তার জ্বর হয়েছে।

লণ্ড্রীর মালিক বলে, 'একটু আস্তে, চেঁচামেচি করবেন না! আস্তে কথাবার্তা বলুন'।

ইনি আমাদের বাঁচিয়েছেন। তার স্ত্রী বলে চাপা গলায়, 'আশ্রয় দিয়েছেন। নিজের বিপদের কথা ভাবেন নি। কি যে হত তা না হলে!'

লণ্ড্রীর মালিক দেখে তার এক পা থেকে অন্য পায়ে যায়। বোঝা যায়, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সূত্রপাতেই তার অস্বস্তির সীমা নেই। লণ্ড্রীর মালিকের স্ত্রী এসে দাঁড়িয়েছিল দরজার কোণ ঘেঁসে, সে ক্ষীণভাবে একটু হাসবার চেষ্টা করে মাথা নাড়ে। তার বড় মেয়ে ঘরের কোণে খেলা করছিল অচেনা একটি

বালিকার সঙ্গে, খেলা ফেলে তারা উঠে এসেছে। ঠিক যে অঞ্চলে মেয়েটি তা নয়, গলির সামনের ছোট রোয়াকটিতে মেয়েটিকে সে মাঝে মাঝে দেখেছে। কিন্তু ঘোড়ালা ফ্ল্যাটের ভাড়াটের জীবন আর সামান্য একটা গলির বাসিন্দের জীবনে ব্যবধান এত বেশী যে সমবয়সী মেয়ে দুটি বোধহয় একসাথে খেলা করছে এই প্রথম।

তার কিশোর ভাইটি এতক্ষণে কথা বলে, 'শেষমুহূর্তে আর উপায় না দেখে ভাবলাম, প্রাণে বাঁচবার শেষ চেষ্টা করা যাক। এঁদের বাড়ীর উঠানে নেমে খিড়কির দরজা দিয়ে পাশের গলি ধরে কোনমতে যদি কোনদিকে চলে যেতে পারি—'

'এদের বাড়ীর উঠানে নামলি কি করে?'

বেশ একটু বাহাদুরী করার ভঙ্গির সঙ্গেই কিশোর ভাইটি বলে, 'কাপড়ে গিট বেঁধে ঝুলিয়ে দিলাম পিছনের বারান্দার রেলিং থেকে। বেয়ে বেয়ে আমরা নেমে এলাম। উনি তখন আমাদের এখানে লুকিয়ে রাখলেন। গলি দিয়ে যাওয়া যেত না।'

গলির মালিক বলে, 'কারো মাথার ঠিক নেই। সবাই ক্ষেপে আছে। আপনি খবর পেয়ে ওদের দিলেন? সে বলে, খবরের কাগজে পড়লাম কাল বারটার সময়। ছুটতে ছুটতে এসে দুটোর গাড়ী ধরলাম। আজ দুপুরে পৌঁছতে গাড়ী লেট করেছে।' শুনে গলির মালিকের বৌ কি যেন ভাবে, তার কালিমাখা মুখের দিকে ছেলেমানুষী চোখ কুলে চেয়ে দেখে দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। খানিক পরে নিয়ে আসে এক কাপ দুধহীন চা। তাকেই মৃদুস্বরে বলে, দুধ তো নেই জানেন। একটু গুড় মিশিয়ে দিলে যদি ভাল লাগবে মনে করেন—

জীর্ণ শীর্ণ একটি শিশু ঘুমোচ্ছে কাঁথার নীচে ডাক্তারের হুকুমে অতি কষ্টে একটা গুড় গলির মালিক যোগাড় করেছিল অনুমান করা যায়। প্রায় অতিভূত হয়ে সে মাথা নাড়ে, চা'টুকু দিয়েই আমায় বাঁচালেন। গুড় চাই না।

গলির মালিক কি যেন ভাবছিল আনমনে, সে বলে, 'আপনাদের কোথাও সরিয়ে দিতে পারলে ভাল হত।'

তার গভীর দুশ্চিন্তা-ভরা মুখ দেখে এতক্ষণে প্রথম যেন তার খেয়াল হয় যে তাদের এভাবে আশ্রয় দিয়ে লুকিয়ে রাখা ওদের পক্ষেও কতবড় বিপদের কথা। স্ত্রীর মুখেও তারই ছাপ। তাদের আশ্রয় দেওয়া ওদের পক্ষে যে কি ভয়ঙ্কর দুঃসাহসিক কাজ বুঝতে পেরে তার মুখেও এখন গাম্ভীর্য দেখা দেয়,নতুন আতঙ্কের ছাপ নয়। মানুষের সঙ্গ পেয়ে তার আতঙ্ক কম-বেশী হয়ে গিয়েছিল।

কিছুক্ষণ পরেই বাজা পড়ে বাইরের দরজায়। কতগুলি হাতের উদ্যত আঘাত একটিমাত্র ধাক্কা। বড় কোলাহলটার আওয়াজ তখনো ভেসে আসছিল কিছু দূর থেকে। ছোট একটা কোলাহল, কতগুলি কণ্ঠের উত্তেজিত কথার আওয়াজ যে এই বাড়ীর দিকেই আসছে টের পাওয়া গিয়েছিল দরজায় ঘা পড়বার আগেই। তার ভাবনা সে ভুলে গিয়েছিল গলির মালিকের ও তার স্ত্রীর ভয়-ব্যাকুল অথচ দুঃসাহসী দৃঢ়তা দেখে। নিজেকে তার অবিবেচক, অপরাধী, পরের অনিষ্টকারী মনে হচ্ছিল।

দরজা খুলে পথ আটকে দাঁড়ায় লণ্ড্রীর মালিক। সঙ্গে সঙ্গে ঠেলে সাত আটজন দাঙ্গাকারী এ-ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দেখে কিন্তু মনে হয় কিসের দাঙ্গা কিসের কি কিছুই তারা জানে না, তারা শুধু নেশা করেছে, মারবার, মরবার নেশায় চুর চুর হয়ে গেছে। দু'জন বয়স্ক লোক ছিল তাদের মধ্যে, বিকার ও ক্রুরতার ছাপ মারা মুখে সাপের মত চোখের দৃষ্টি, বাকী সব কজনেই তরুণ। বয়স্করা কিছু বলে না, তরুণদের একজন মারী জানায় ঘরে যারা বাইরের লোক আছে সবকটিকে বার করে দিতে হবে।

দরজার দুদিকে হাত রেখে তাদের পথ আটকে দাঁড়িয়ে লণ্ড্রীর মালিক অতি স্পষ্ট ভাষায় জানায়, ঘরে আছে তার বন্ধু ও বন্ধুর পরিবার। ওদের মারতে হলে আগে তাকে মেরে তার মৃতদেহের ওপর দিয়ে গিয়ে ওরা তাদের নাগাল পাবে। বাইরের লোক কেউ নেই। আমার নিজের লোক।

একজন বয়স্ক লোক গর্জ্জন করে ওঠে রক্তপিপাসু নেকড়ের মত। একজন তরুণ হাতের ডাণ্ডা উঁচু করে।

স্বামীর হাতের ডাণ্ডা দিয়ে গলে লণ্ড্রীমালিকের স্ত্রী সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। স্পষ্ট ভাষায় সেও ঘোষণা করে যে আগে তাকে মেরে তারপর তার স্বামীকে মেরে তবে ওরা নাগাল পাবে তার অনেকদিনের বন্ধু পরিবারের। সেই নিমন্ত্রণ করে ওদের বাড়ীতে এনেছে, সব দায়িত্ব তার, কাজেই আগে তাকে মারতে হবে।

বয়স্ক দুজনেই এবার গর্জ্জন করে হুকুম দেয়। কিন্তু তরুণেরা তখন থতমত খেয়ে গিয়েছে একটু ইতস্তত: করে, লণ্ড্রীর মালিকের ওপর কয়েকটা কথার বাণ ছেড়ে তারা ফিরে যায়।

বয়স্ক দুজনকে একরকম ঠেলেই সঙ্গে নিয়ে যায় তারা।

ঘরের ভিতরে ছোট ছেলেকে কোলে নিয়ে স্ত্রীর হাত ধরে মরবার জন্য সে প্রস্তুত হয়ে ছিল। একা নয়, সপরিবারে মরবার জন্য। মরতে আর তার ভয় নেই। চারিদিকের বীভৎসতার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে, প্রাণের এই আসন্ন সঙ্কটে, শুধু ভাবনা কোন আক্রোশ আশপাশের অন্ধকার দেখতে দেখতে, নাম পর্য্যন্ত না জানা লণ্ড্রীর মালিক ও তার বৌয়ের এই মানুষিক আচরণ তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। মানুষের ওপর বিশ্বাস আঁকড়ে ধরতে পারায় প্রাণটা তার হালকা হয়ে গেছে।

মহানুভবের কলঙ্ক

শ্রীসাহিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

মহানুভবের কলঙ্কের ছাপ
সরসীর সারা মুখে আঁকা,
দেহ তার ভেঙ্গে গেছে।
মূল্যবান শাড়ীর আবরণে—
ঢাকা পড়েনা তার জীর্ণ দেহ,
এ যেন ভাঙ্গা বাড়ীতে চূণকাম—
সেকালীন ধনাঢ্য মালিকের সার্টিফিকেট_
কিন্তু নিলামী ইস্তাহারখানিও তার সাথে আঁটা।
এসেন্স পাউডারের উগ্র গন্ধে
পাশের লোক ত্রস্ত হয়ে ওঠে
ফিরে চেয়ে দেখে—
সুস্ত্রী সুডৌল মুখখানিতে
আয়ত চোখ দুটির নীচের
কালো হয়ে আছে
একাধিক সহস্র রজনীর ইতিহাস।
ফেনিল উৎসবের উন্মত্ততা
স্থির হয়ে গেছে—
কঙ্কালের জীর্ণ কারাগারে।
অপাঙ্গের মদির দৃষ্টি
মধুস্রাবী কণ্ঠের অস্ফুট আলাপন—
প্রগল্ভ আত্মনিবেদনের অন্ধকারে আজ বিলুপ্ত।
কিন্তু সরসীর পরিচয় সে আজ নিজে।

অন্ধকারে আত্মগোপন ক'রে
যে জীবনের সূচনা—
সেখানে প্রতি মুহূর্তে উঠছে
উদ্ভিন্ন যৌবনের জয়গান,
ভোগবতী দেহের অবিরাম প্রশস্তি।
ক্ষণিক সুখের দুর্বার আকর্ষণে
সরসী—সেখানে স্বতন্ত্রা।

দেহের মূল্য পেয়েছে সরসী হাতে হাতে
হয়ত তার প্রত্যাশা ও প্রয়োজনের অনেক বেশী :
অনিশ্চিত জীবনকে—
স্বল্পকালীন যৌবনকে
নানা রসে জারিয়ে নিয়ে সরসী
আস্বাদ করতে দিনের পর দিন—
এই লোভই তার বেড়ে যেতে লাগল
"হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মের"
জ্বলন্ত আগুনে ঘৃত সংযোগের মত।

অন্ত বিদ্যা ভয়ঙ্করী—
বিবিয়ানার উপর ঝোঁক ছিল তার বরাবর।
সান্তপাকের সময় সাহেবীয়ানা দেখিয়ে
বধূর কাছে বর পেয়েছিলেন
সপ্রশংস দৃষ্টি-বিনিময় ;
কিন্তু বনিবনাও রইল না বেশী দিন।
অর্থাৎ স্ত্রী-স্বাধীনতার বড়াই কেবল ঘরের বাহিরে
ভিতরে থাকে সন্দিহান চোখের সজাগ পাহারা।
সেখানে মাছি উড়লে ঘুম ভেঙ্গে যায়।
হাসি বা প্রসন্ন-দৃষ্টির গোপন বিনিময়
ধরা পড়ে গেল একদিন প্রকাশ্য দিবালোকে
পরকিয়ার রসভঙ্গ হোল মধ্যপথে ;

তাই নিয়েই স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া—
সে-ঝগড়ার অমধুর বাক্যবিন্যাস
অবিমিশ্র আদিরসে পরিপূর্ণ,
তবুও—
বস্তী-কলের বারি-বাহিনীরাও—
অবগুণ্ঠিত-লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে।

শোভন সইতে পারলে না—
চলে গেল সেই দিনই অন্য পাড়ায়
কিন্তু এইখানেই শেষ নয়।
ড্রয়িংরুম থেকে এবম্বিধ ঝগড়া
আদালত পর্য্যন্ত গড়াল—
বিচারে—শোভন নিষ্কৃতি পেলে—
কিন্তু মিণ্টুকে মানুষ করবে সরসী:
উকিলের বক্তৃতা ও শোভনের আবেদনে
জজ্ সাহেবের এ রায় বদ্‌লাল না।

যৌবন-মদে মাতাল সরসী
মাটির পৃথিবীতে তার পা পড়ে না।
স্বাধীন জীবনের স্বপ্ন
বৈরিণী সরসীকে বিভোর করে দেয়;
লঘু পক্ষ পরীর পাখায়
উড়িয়ে নিয়ে চলে তাকে দুরন্ত বেগে
অবিরাম—অবিশ্রান্ত;
সেখানে মিণ্টুর ঠাঁই নেই,
একমাত্র শিশু কন্যার অস্তিত্ব বোধ
তাও বুঝি আজ মায়ের কাছে লুপ্তপ্রায়।

নিম্নে কঠিন মৃত্তিকা
সেখানে দু'বছরের মেয়ে মিণ্টু
ফ্যাল ফ্যাল ক'রে মার দিকে চায়—
নিত্য নূতন অতিথিকে দেখে
অগ্রবৃদ্ধ মনে জাগে তার কৌতূহল
জাগে বিস্ময়-বিহ্বল কাতরতা।

যে সমাজে সৌদামিনী মানুষ হয়েছে
সেখানে জীবনের বাঁধাধরা নিয়ম নেই।
অল্প বয়সে বিধবা হয়ে
ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিল সৌদামিনী
গতর খাটিয়ে খাবে ব'লে।

যুদ্ধের বাজারে হাল ফিরে গেছে তারও
সাদা সেমিজে কালের টাপে,
সে এখন ধোপ-দোরস্ত আদ্যা
চল্‌তি কারবারের মুনাফার টাকায়
সেও দেখেছে পৃথিবীকে রঙীন ক'রে
কিন্তু তারো চোখে বিজ্ঞী ঠেকে
মেয়ের উপর সরসীর এই
ক্রমবর্দ্ধমান উপেক্ষা ও অনাদর;
কারণ সংসার মরুতে—
ওয়েসিসের সন্ধান পেয়েছে সৌদামিনী—
মায়া পড়ে গেছে তার মিণ্টুর উপর।

সদর দরজায় ট্যাক্সি এসে দাঁড়ায়
রাত্রি তখন দু'টো:
সৌদামিনী তখনো ঘুমায়নি।

দরজা খুলে সরে দাঁড়াবে
সরসী তাকে জাপ্‌টে ধ'রে বল্‌লে—
Darling ! don't get
annoyed please !
মুখে তার উৎকট গন্ধ।
শোবার ঘর থেকে মিণ্টুকে কোলে নিয়ে
ঘরে এসে খিল দিয়ে দিলে সৌদামিনী।

মিণ্টুর চোখে মুখে ফুটে ওঠে—
অনাথা শিশুর বিষণ্ণ ছায়া,
শীর্ণ হয়ে আসে তার দেহ,
এ যেন মৃত্যু-শিয়রে স্তিমিত প্রদীপ।
সৌদামিনীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে—
হয়ত বা চোখেও আসে জল,
কিন্তু সরসীর সেদিকে দৃকপাত নাই,
সে চ'লে দুঃখের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে।
সংসার তার কাছে আজ বিস্মৃত ইতিহাস—
অতি তুচ্ছ, হয়ত বা অতি সংক্ষিপ্ত ;
তার পাতা সে উল্টে দেখ্‌তে চায় না,
ফিরে চায় না সে মিণ্টুর দিকে।
তিন দিনের প্রবল জ্বরে
অজ্ঞান অভিভূত হয়ে আছে মিণ্টু
ডাক্তার এসে প্রেস্‌ক্রিপসন দিয়ে যায়—
কিন্তু সে ওষুধ আর আন্‌তে হয় না।
মাকে নিষ্কৃতি দিয়ে পালিয়ে গেল মিণ্টু—
নিষ্ঠুর পৃথিবী থেকে
চিরদিনের মত সে চোখ ফিরিয়ে নিলে।

বৃষ্টিতে ভিজে জ্বর-গায়ে যখন
সরসী বাড়ী ফিরে এল
তখন সব শেষ হয়ে গেছে।
স্নেহময়ী মায়ের সেবা পায়নি সন্তান;
সৌদামিনী বসে—
মিণ্টু গেছে সেই অভিমানে,
সরসী রোগশয্যায় শুয়ে হাসে—
আজ তার চোখে জল,
একেবারে নিঃসঙ্গ সে আজ পৃথিবীতে।
নিত্য নূতন পরিচয়ের মধ্যে
ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল যাদের সঙ্গে
আজ তারা কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে।
"Cosy Corner" হোটেলে
"পেগ"এর গ্লাসের উপর ওঠে গুঞ্জন
Jolly good Girlএর জন্য;
হয়ত বা আসে রঙীন ডায়লো
নৈরাশ্যের তিক্ত আস্বাদ;
হয়ত বা মনের পর্দায়
উৎসব-মুখর রজনীর ছবিগুলি
চঞ্চল করে দেয় কারো মন;
কিন্তু সে-মনও ভয়-চকিত হয়ে ওঠে।
অস্পৃশ্য হয়েছে আজ—
বহু-বাঞ্ছিতা রূপসী সরসী।
কলঙ্কিত জীবনের চিহ্নে চিহ্নে
রটে গেছে তার নূতন পরিচয়।

ইতিহাসের এইখানেই শেষ নয়:
বুক থেকে মিণ্টুকে নামিয়ে দিয়ে
বিদায় নিয়ে গেছে সৌদামিনী।

নির্দয় হাতে যে সন্তান-স্নেহকে
হৃদয় থেকে উপড়ে ফেলেছিল সরসী,
তারি অপূর্ব্ব আস্বাদ পেয়েছিল
নিঃসন্তান সৌদামিনী।
কোথায় চলে গেল সে—
কেউ জানে না।

কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতে
শোভনের সঙ্গে হঠাৎ দেখা সরসীর
কোথায়? সে কথা নাই বল্‌লাম!
মিলিটারি কন্‌ট্রাক্টার শোভন সরকার
দুহাতে তখন টাকা উড়াচ্ছে মরিয়া হয়ে।
সবান্ধবে দেখা হ'ল স্ত্রীর সঙ্গে
সহরতলীর বাগান-বাড়ীতে।

সরসীর পায়ের তলা থেকে তখন
আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে পৃথিবী,
এত আলোর মধ্যেও সে দেখ্‌ছে অন্ধকার,
ঘর থেকে বেরবার জন্য সে হাঁপিয়ে উঠেছে,
টল্‌তে টল্‌তে এল দুয়ারের কাছে,
পথ আগলে দাঁড়াল শোভন,
হাতে তার গুলিভরা পিস্তল।
বন্ধুবান্ধব হা হা করে উঠ্‌ল,
কিন্তু এমন কঠিন হ'তে পারে শোভন
সে-কথা সে নিজেও জান্‌ত না।

ডিটেকটিভ্‌ উপন্যাসের মত শোনালেও
বিয়োগান্ত মিলনে শেষ হ'ল সেদিন
মহা-যুদ্ধের কলঙ্কের ইতিহাস।

মূলেন মুখার্জি

'বনফুল'

[বেশ চাকা জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক ফটফটে। মণিবাবুর বাড়ির বাহিরের প্রশস্ত বারান্দায় মণিবাবুর কন্যা কণা রাস্তার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর সে গুনগুন করিয়া গান ধরিল—'আজ জ্যোছনায় পূর্ণিমাতে কি এসেছিস বল'। গানটা যেন তাহার অন্তর হইতে আপনা হইতেই উথলিয়া উঠিল। চমৎকার মিষ্ট কণ্ঠস্বর। সহসা কথার মা প্রবেশ করিলেন]

কথার মা। [রাগত কণ্ঠে] এখানে উনি চেয়ারে শুয়ে শুয়ে গান গাওয়া হচ্ছে ওদিকে যে বাসনের কাঁড়ি পড়ে আছে। কখন মাজা হবে সেগুলো

[কণা উঠিয়া দাঁড়াইল]

কণা। এই যাচ্ছি—

কথার মা। অত বড় মেয়ের যদি এতটুকু হুঁস আছে। উনি এখুনি খেতে পুড়ে এসেই ভাত চাইবেন

কণা। এখুনি মেজে দিচ্ছি আমি। আচ্ছা, বাবার আজ ফিরতে এত দেরি হচ্ছে কেন মা

কথার মা। নন্দরগঞ্জে গেছেন বোধ হয়

কণা। কেন

কথার মা। তোমারই জন্যে, আবার কেন। কি যে আছে তোমার অদৃষ্টে ভগবানই জানেন। যেখানে সম্বন্ধ করছেন সেখানেই একটা না একটা ঝামেলা লাগছে

[কথার বাবা শ্রীকুমার বাবু প্রবেশ করিলেন। প্রৌঢ় মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। কথা চিহ্নের ভিতর দিয়া চলিয়া গেল]

কথার মা। এত দেরী যে, নন্দরগঞ্জে গিয়েছিলে না কি

শ্রীকুমার। হ্যাঁ, ঠিক করে' এলুম

কথার মা। ওই মহেন্দ্র গাঙুলীর সঙ্গে ?

শ্রীকুমার। হ্যাঁ

কথার মা। কেন খগেন বলে যে ছেলেটি ছিল

শ্রীকুমার। সেখানে আমরা পেরে উঠব না। তার বাবা নগদ পাঁচটি হাজার টাকা চায়, তার ওপর গয়না দিতে হবে। তাছাড়া তোমার মেয়ে কালো। মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম গান বাজনা শিখিয়েছিলাম যদি বিয়ের বাজারে কিছু সুবিধে হয়। কিন্তু এখন দেখছি রূপ আর রুপিয়া এ দুটি না থাকলে কিছু হয় না

কথার মা। আমার মেয়ে কালো হোক কিন্তু ক'টা মেয়ের অমন মুখ চোখ গড়ন—

শ্রীকুমার। লোকে মুখ চোখ গড়ন চায় না রং চায় এবং তার সঙ্গে টাকা। এই দোষ বরে' মহেন্দ্র গাঙুলীই যা চায় তাতেই তোমার গয়না বন্ধক দিতে হবে। অথচ লোকটা প্রায় আমার বয়সী, এক ঘর ছেলে মেয়ে—

নেপথ্যে নন্দলাল। শ্রীকুমার বাড়ি আছ……

শ্রীকুমার। কে নন্দ, এস এস। এই কিছুক্ষণ ভাই, এস বস। আমি কাপড় জামাটা ছেড়ে আসি

[শ্রীকুমারের বন্ধু ও প্রতিবেশী নন্দলাল প্রবেশ করিয়া চেয়ারে উপবেশন করিলেন। কথার মা ও শ্রীকুমারবাবু ভিতরে চলিয়া গেলেন। বারান্দায় ইলেকট্রিক আলোটা জ্বলিয়া উঠিল। সেখা গেল বারান্দার আরও দোটা দুই চেয়ার রহিয়াছে। একটা চেয়ারের উপর একখানা খবরের কাগজ ছিল, নন্দলাল সেটা তুলিয়া লইয়া তাহাতেই মনোনিবেশ করিলেন। কণপরেই তাঁহার মুখে ক্রোধ ও বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, কাগজটা তিনি রাখিয়া দিলেন। এর সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীকুমার পুনঃপ্রবেশ করিলেন। তিনি জামা কাপড় ছাড়িয়া আসিয়াছেন]

নন্দলাল। তোমার কিন্তুতে আজ এত দেরি যে—

[শ্রীকুমার একটি চেয়ার টানিয়া বসিলেন]

শ্রীকুমার। পাত্রের চেষ্টায় নবদ্বীপে গিয়েছিলাম ভাই

নন্দলাল। হল কিছু ?

শ্রীকুমার। ওই যদের পাঁড়ুলীর সঙ্গেই ঠিক করে' এলাম

নন্দলাল। [বিস্মিত] আরে, তুমি পাগল না কি

শ্রীকুমার। কি আর করি বল ভাই। বামন হয়ে আকাশের চাঁদ চাইলে তো চলবে না

নন্দলাল। লোকটার গালে একটা প্যাড আছে দেখেছ ?

শ্রীকুমার। দেখেছি, টুলি টুলি বোধ হয়

নন্দলাল। বীরেন ডাক্তার বলছিল সেপ্রসি

শ্রীকুমার। আরে না না, তুমি আর ঘাবড়া দিও না। আমারও ওই রকম একটা হয়েছিল বুকে। সেরে গেছে এখন—

নন্দলাল। আমি এসব তোমার সঙ্গে এক দান পাশা খেলে চিত্ত বিনোদন করতে কিন্তু তুমি যাঁধাটি একদম ঘুরিয়ে দিলে যে—ছি ছি—যদের পাঁড়ুলী অক্ষ অন মেন !

শ্রীকুমার। এতে মাথা ঘোরবার কি আছে

নন্দলাল। তুমি তোমার মেয়েকে যদের পাঁড়ুলীর হাতে দেবে। তুমি—যে মেয়েকে খরচ করে' লেখাপড়া শিখিয়েছ—তারতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যার বক্তৃতা শুনে তাক লেগে যায় সকলের—

শ্রীকুমার। আমার দুরবস্থার কথাটা ভেবে দেখ। ফ্যাক্টকে তো অগ্রাহ্য করতে পারি না। টাকা না হলে' মেয়ের বিয়ে হবে না এই হল ফ্যাক্ট। আমার টাকা নেই অথচ মেয়ের বিয়ে না দিলেও নয় সুতরাং যা জুটছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে আমাকে—তা সে পাত্র বুড়োই হোক আর কুষ্ঠব্যাধি-গ্রস্তই হোক

নন্দলাল। কেন ওই নিখিলের সঙ্গে দাও না। এম. এ. পড়ছে, পণ চাইবার মতো গার্জেনও কেউ নেই তেমন। ওকে বললে ও আপত্তি করবে না বোধহয়। কথার সঙ্গে ওর ভাবও আছে। নিখিলের মা অবশ্য আছেন—

শ্রীকুমার। আরে ও বামুনের ছেলে হলে কি আর ভাবনা ছিল, কিন্তু ওরে কায়স্থ

নন্দলাল। হলেই বা। তোমার মুখেই শুনেছি আমাদের জাতিভেদ যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তা ওপগত। তোমার মহেন্দ্র গাঙুলীর তুলনায় নিখিল ঢের ঢের বেশী ব্রাহ্মণ

শ্রীকুমার। কিন্তু যে হিন্দুসমাজে বাস করি তার এতকালের প্রথাকে ওলটাবার সাহস আমার নেই, ইচ্ছেও নেই।

নন্দলাল। আমাদের দুরবস্থার আসল কারণ কি জান?

শ্রীকুমার। কি

নন্দলাল। সাহসের অভাব। ভীরুতা। আমরা চিন্তায় যা উচিত বলে' মনে করি বক্তৃতায় যা বলি কাজে সেটা করতে পারি না। যে সমাজে পৌরুষের স্বাধীন চিন্তার স্থান নেই সে সমাজ কি হিন্দু সমাজ? নির্বোধ নপুংসক হওয়াটাই হিন্দুত্বের লক্ষণ না কি। প্রায়ই কাগজে মুসলমান গুণ্ডারা হিন্দু মেয়েদের ধরে' ধরে' নিয়ে যাচ্ছে, হিন্দু মন্দির অপবিত্র করছে—আরও আছে একটা পবর, কই হিন্দুসমাজে তা নিয়ে তো কোনও আন্দোলন দেখি না। কোনও হিন্দু যুবক তার জন্যে প্রাণ দিয়েছে এ রকম খবরও বড় একটা চোখে পড়ে না তো। এই নির্বীর্য সমাজের প্রথাকে মানবার কি সার্থকতা আছে? এ সমাজ ভেঙে ফেলাই তো উচিত। একবার ভাঙতে আরম্ভ করলেই হুড়মুড় করে' ভেঙে পড়বে সবটা ঘুণ-ধরা বাড়ির মতো

শ্রীকুমার। ভয় করে। তাছাড়া আমার স্ত্রী আছে তারও একটা মতামত আছে সেটাকে উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়।

নন্দলাল। তোমার স্ত্রীর মতামত মেনে তুমি চল? ওই কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত কোতবের মহেন্দ্র গাঙুলীতে তার মত আছে?

[এক্ষেত্রে সাধারণত যারা হয় তাহাই হইল। শ্রীকুমার টেম্পার লুজ করিলেন]

শ্রীকুমার। এ নিয়ে বৃথা তর্ক করছ কেন। ওইখানেই বিয়ে ঠিক করে' এসেছি ওইখানেই বিয়ে হবে। কেউ আটকাতে পারবে না

নন্দলাল। আমি যদি তোমার স্ত্রীকে বুঝিয়ে ওই নিখিলের সঙ্গে রাজি করাতে পারি তাহলে?

শ্রীকুমার। না, তাহলেও আমি দেব না

নন্দলাল। কেন

শ্রীকুমার। পাত্র হিসাবে ওই 'সোফাইটা'র চেয়ে মহেন্দ্র গাঙুলী ঢের বেশী নির্ভরযোগ্য

[কথা প্রবেশ করিল]

কথা। আপনাদের খাবার দেওয়া হয়েছে। নন্দ কাকা আপনাকেও যা খেতে বলেছেন, যা মুগের ডালের পুলি করেছেন আজ—

নন্দলাল। বেশ চল

[নিখিল ও কথা উঠিয়া দিয়ে গেলেন। কথা বারান্দার আলোটা নিবাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে জোৎস্নায় চতুর্দিক প্লাবিত হইয়া গেল বেন। প্রহরের শেষ সরিয়া গিয়াছে। কথাও ভিতরে চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ নিখিলকে আসিতে দেখিয়া সে দাঁড়াইয়া গেল। নিখিল আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার হাতে কয়েকটী করবী ফুল]

কথা। নিখিল দা ?

নিখিল। হ্যাঁ

কথা। চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছে, নয় ?

নিখিল। আজ যে খুলন পূর্ণিমা। তোমাদের বাড়ির পিছনের কেতকী গাছটা দেখেছ ? অপরূপ হয়ে উঠেছে

কথা। না দেখি নি

[কিছুক্ষণ উভয়েই চুপ চাপ। কেহ আসিয়া উহাকে ডাকিল। জ্যোৎস্না ম্লান হইয়া গেল]

নিখিল। [আর একটু কাছে সরিয়া আসিয়া] তোমাকে আজ বড় বিমর্ষ দেখাচ্ছে, কি হয়েছে

কথা। [হাসিবার চেষ্টা করিয়া] বিমর্ষ দেখাচ্ছে ? বিমর্ষ দেখানো তো উচিত নয়। আমার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে আজ

নিখিল। কোথায়, কার সঙ্গে ?

কথা। নক্ষত্রগঞ্জে [হাসিয়া] বিয়ে হবার আগে তো নাম করতে দোষ নেই, না ? নক্ষত্রগঞ্জের মহেন্দ্র পাঁড়ুলীর সঙ্গে

নিখিল। কি সর্ব্বনাশ ! সেই ধার মহাজনী কারবার আছে ? ওই বুড়োর বিয়ে করবার সখ আছে নাকি এখনও

কথা। নন্দ কাকা বলছেন শুনতে পেলাম তার না কি কুষ্ঠও আছে। বুড়ো বয়সে সেবা করবার লোক চাইতো একটা

[কথা যাহা বলিল নিখিলের সামনে তাহার প্রকাশ করিবার ইচ্ছা তাহার ছিলনা। কিন্তু কিছুতেই সে আত্মসংবরণ করিতে পারিল না]

নিখিল। [একটু ইতস্তত করিয়া] মানে—

কথা। [ব্যাধ-ভীতা হরিণীর মতো] আমায় বাঁচাও তুমি নিখিল দা

নিখিল। বিশ্বাস কর, আমার দিক দিয়ে চেষ্টা আমি যথেষ্ট করেছি। মায়ের কিছুতেই মত হলো না। নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন তাঁর মন, তাঁর কেবলই ভয় পাছে কিছু অমঙ্গল ঘটে। আমি তাঁর এক মাত্র ছেলে তাঁর মতের বিরুদ্ধে যাই কি করে' বল।

কথা। [সক্রোধে] সেদিন তুমি খুব ঠাট্টা করেছিলে কৌরবের রাজসভায় দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করছিল তখন ভীষ্মের মতো লোকও চুপ করে' ছিলেন বলে'। এখন তুমি যেমন যুক্তি দেখালে ভীষ্মেরও সেদিন তেমনি একটা যুক্তি ছিল। এদেশে মহা মহা রথী চিরকালই আছেন কিন্তু কার্য্যকালে সবাই মা বাঁচিয়ে চলতে জানেন বেশ। এদেশের দুঃশাসনদের হাতে এদেশের দ্রৌপদীদের লাঞ্ছনা তাই আজও সমানে চলেছে। কিছুই হবেনা তা আমি জানতাম, কিন্তু তবু কেন আমি না তোমার কাছে একটু অন্য রকম প্রত্যাশা করেছিলাম

[তাহার গলার স্বর কাঁপিয়া গেল]

নিখিল। আমার মনের ভাব তোমায় ঠিক বোঝাতে পারছি না। বিশ্বাস কর আমিও কষ্ট পাচ্ছি খুব। মনে হচ্ছে যেন একটা অদৃশ্য কারাগারে বন্দী হয়ে আছি—কিছুতেই মুক্তি পাচ্ছি না।

কথা। ইচ্ছের তেমন জোর থাকলে মুক্তি পাওয়া যায় বই কি। তোমরা অকর্মণ্য কাপুরুষ। সাধে হিন্দু মেয়েরা মুসলমানদের সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছে, তাদের বর্বরতার মধ্যে তবু খানিকটা পৌরুষ আছে

[চিঠিখানা ফেলিয়া দেয় এবং পরমুহূর্তেই আবার তুলিয়া আনিয়া]

কিছু মনে কোরোনা নিখিল দা, এসব কথা আমার বলা উচিত ছিল না তোমাকে। বড় দুঃখে কথাগুলো বেরিয়ে গেছে মুখ দিয়ে। তোমারও দুঃখ হচ্ছে বুঝতে পারছি। রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি

নিখিল। এই বুলন পূর্ণিমায় কত সুখী হতে পারতাম আমরা। কিন্তু এমন এক অদ্ভুত সমাজের অদ্ভুত সংস্কারের বেড়াজালে বন্দী হয়ে আছি—

কথা। আমি যাই নিখিল দা

নিখিল। এই ফুলগুলো নেবে না, তোমার জন্যেই এনেছিলাম

কথা। দাও

নিখিল। এস তোমায় পরিয়ে দিই—

[কথা মাথা পাতিয়া দাঁড়াইল, নিখিল ফুলগুলি তাহার খোঁপায় গুঁজিয়া দিতে লাগিল। ঘরিতের মধ্যে চোখেরা অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। সহসা বারান্দায় আলোটা জ্বলিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকুমার এবং নন্দলাল প্রবেশ করিলেন]

শ্রীকুমার। এ কি !

[কথা ও নিখিল দুইজনেই অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীকুমারের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি ক্ষেপার মতো লাফাইয়া পড়িলেন]

এ কি কাণ্ড ! নিখিল তুমি ভদ্রলোকের ছেলে না ? এই সব করতে এখানে আসা হয় ? হারামজাদা শুয়ারকা বাচ্চা, বেরিয়ে যাও এখান থেকে। বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও—

[নন্দলাল বাধা দিবার পূর্বেই তিনি নিখিলকে ধাক্কা দিলেন। নিখিল ছিটকাইয়া বাহিরে পড়িয়া গেল]

নন্দলাল। [শ্রীকুমারের হাত ধরিয়া] ছি ছি কি যে কর তুমি

[শ্রীকুমার এক ঝটকায় নন্দলালকে ঠেলিয়া দিয়া কথার প্রতি ধাবমান হইলেন]

শ্রীকুমার। বেরিয়ে যা বেরিয়ে যা, তুইও দূর হয়ে যা। নাকুনী ভাইনি, হাড় মাস কালী করে দিলে আমার। বেরো—

[কথাও সভয়ে মাঠে নামিয়া পড়িল। নন্দলাল শ্রীকুমারকে টানিয়া চিত্রের মধ্যে লইয়া গেলেন এবং যাইবার সময় বারান্দার বাতিটা নিবাইয়া দিলেন। ঘোর-লাগা জ্যোৎস্নার চাপা হাসিতে চতুর্দিক ভরিয়া গেল। নিখিল অথবা কথা কাহাকেও দেখা গেল না। তাহারা দুজনেই অন্তর্ধান করিয়াছে। একটি বৃদ্ধা আদিবাসী লোক প্রবেশ করিল]

ভৃত্য। শ্রীকুমারবাবু, শ্রীকুমারবাবু—

[নন্দলাল বাহির হইয়া আসিলেন]

নন্দলাল। কে

ভৃত্য। আমি সাঁওতালী মশাইয়ের কাছ থেকে এই চিঠিখানা এনেছি

নন্দলাল। কোথাকার গাড়ুলী

ভৃত্য। নক্ষত্রগড়ের মহেন্দ্র গাঙুলী শ্রীকুমারবাবুকে এই চিঠিখানা দিয়েছেন

[একটী পত্র বাহির করিয়া দিল]

নন্দলাল। আচ্ছা আমি দিয়ে দেব এখন

ভৃত্য। আমি কি অপেক্ষা করব?

নন্দলাল। না, অপেক্ষা করবার দরকার নেই। শ্রীকুমারের শরীরটা ভাল নেই। কাল না হয় এসো বরং একবার

ভৃত্য। আচ্ছা

[চলিয়া গেল। শ্রীকুমার প্রবেশ করিলেন। তিনি একটু শায়লাইয়াছেন]

শ্রীকুমার। কে ডাকছিল আমাকে

নন্দলাল। মহেন্দ্র গাঙুলীর বাড়ী থেকে এই চিঠিখানা দিয়ে গেল

[চিঠিটা দিলেন]

শ্রীকুমার। [পত্র পাঠান্তে হাসিলেন

নন্দলাল। কি হল

শ্রীকুমার। লিখেছে আরও অন্তত পাঁচশ' টাকা না দিলে সে বিয়ে করতে পারবে না। দু'হাজার চেয়েছিল আমি হাতে পায়ে ধরে' বলে এসেছিলাম যে এক হাজার টাকার বেশী দিতে পারব না। চুপ করে' রইল, তারপর বুঝি রাজি হয়ে গেল।

[হেসে টলিয়া হসিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিলেন

(সহসা অযৌক্তিকভাবে) কেন করব আমি ব্যাটার নামে

নন্দলাল। [এদিক ওদিক চাহিয়া] কথা কোথা গেল

শ্রীকুমার। যাবে আবার কোন চুলোয়, আসবে ঠিক

নন্দলাল। অত উত্তেজিত হ'য়ো না, স্থির হও। গান-টান শোন বরং দু'একখানা। লতা কোথায়

শ্রীকুমার। [সবিস্ময়ে] গান!

নন্দলাল। হোক না, প্রকৃতিস্থ হও একটু

শ্রীকুমার। মি ইউ এন্ 'গান' বরং জোগাড় করতে পার তো দেখ একটা

নন্দলাল। [ভিতরের দিকে চাহিয়া ডাকিলেন] লতা লতা—

[কথায় বোলতা প্রবেশ করিল। বারো বছরের কিশোরী]

নন্দলাল। দিদি কোথা

লতা। কি জানি

নন্দলাল। আচ্ছা, তুমি একটা গান শোনাও দেখি। বস ওইখানে

[লতা সিঁড়ির ধারে রেওয়াজ যেন দিয়া বসিল এবং শ্রীকুমারের দিকে সভয়ে আড়চোখে চাহিতে লাগিল]

নন্দলাল। না, তোমার বাবা কিছু বলবে না, গাও

[শ্রীকুমার একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জ্যোৎস্না-প্লাবিত আকাশের দিকে চাহিয়া ছিলেন। এক দল কালো মেঘ চাঁদটাকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। চাঁদ হারিয়েছে। লতা গান ধরিল 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, বন্যা এসে যায়ে ভাসায়ে'। হরর দিয়া চমৎকার করিয়া গাহিল। গান শেষ হইলে সকলেই বাহবা করিলেন। শ্রীকুমার নীরব নির্নিমেষে মাঠের দিকে চাহিয়াছিলেন।

নন্দলাল। বাঃ চমৎকার। আর একটা গাও

[লতা গান ধরিল—'আজ্ঞানের গহনেতে কোথায় প্রদীপ'। অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রাণ দিয়া গাহিল। শ্রীকুমারবাবুও তন্ময় হইয়া শুনিলেন]

নন্দলাল। [গান শেষ হইবার পর] বাঃ বেশ। সুন্দর। আচ্ছা কথা গেল কোথা? ভিতরে এসেছে কি না দেখ তো···

[লতা ভিতরে চলিয়া গেল ও মিনিটখানেকের মধ্যে ফিরিয়া আসিল]

লতা। না দিদি তো বাড়ীতে নেই

নন্দলাল। আমাদের বাড়ী গেছে বোধ হয়। দেখে এসো ত' থাকলে ডেকে আনো—

[লতা চলিয়া গেল]

শ্রীকুমার। [নিশ্বাস ফেলিয়া] মনের গাড়ুটী তো হাতছাড়া হল। কি যে হবে, আর পারি না

নন্দলাল। আমার পরামর্শ শুনবে?

শ্রীকুমার। কি

নন্দলাল। ওই নিখিল ছোকরার সঙ্গে চেষ্টা কর

শ্রীকুমার। আবার ওই কথা তুলছ। নিখিল তোমাকে ঘুস দিয়েছে না কি কিছু?

নন্দলাল। [হাসিয়া] তার সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপও নেই। আমার বক্তব্য হচ্ছে আমরা শিক্ষিতরা যদি সমাজসংস্কার না করি তা হলে কে করবে

শ্রীকুমার। ব্রাহ্মসমাজ সে চেষ্টা একবার করেছিল এখনও করছে, ফল কি হয়েছে দেখতেই পাচ্ছ

নন্দলাল। ইয়োরোপ আমেরিকার দিকে চেয়ে দেখ

শ্রীকুমার। এতদূর থেকে চেয়ে দেখলে কিছু দেখা যাবে না। সে সমাজে গিয়ে বাস করলে বোঝা যেতে পারে খানিকটা। সে সুযোগ আমাদের এখন নেই আমাদের

নন্দলাল। তাহলে ওদের সভ্যতার নকল করে' ছেলেমেয়েদের বিলাতী শিক্ষা দিচ্ছ কেন। শিক্ষা দিচ্ছ অথচ শিক্ষা অনুসারে কাজ করতে গেলে বাধা দিচ্ছ, কোন মানে হয় এর?

শ্রীকুমার। ছেলেদের শিক্ষা দিয়েছিলাম চাকরি পাবে বলে'। মেয়েদের শিক্ষা দিয়েছিলাম কতকটা অনুরূপ পড়ে' কতকটা ভাল পাত্রের আশায়। এখন দেখছি দুটো আশাই মরীচিকাবৎ শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তা-ও বিশেষ কিছু হয় নি। সুতরাং পথ এবং মত বদলাবার সময় এসেছে

নন্দলাল। তাহলে কি করতে চাও তুমি

শ্রীকুমার। ভাল পথের যতক্ষণ না সন্ধান পাচ্ছি, ততক্ষণ প্রাচীন পথেই চলবার চেষ্টা করব তা ছাড়া সে গেঁয়ো মেটো পথ

নন্দলাল। কিন্তু তোমার মেয়ে যদি ওপথে না চলতে চায়

শ্রীকুমার। চলতেই হবে

নন্দলাল। অন্য পথে যায় যদি, কি করবে?

শ্রীকুমার। বাবা বেধ

নন্দলাল। পারবে?

শ্রীকুমার। নিশ্চয়

[উৎফুল্লে ছুটিতে ছুটিতে লতা প্রবেশ করিল]

লতা। বাবা শিগ্‌গীর এস। আমাদের বাড়ীর পিছনের কদম গাছটায় যিনি আর মিনিদিদি ঝুলছে

শ্রীকুমার। [সবিস্ময়ে] ঝুলছে!

লতা। পরনের কাপড় খুলে গলায় দড়ি দিয়েছে দুজনেই!

নন্দলাল। অ্যাঁ সে কি! চল চল—

[সকলে ব্যস্তভাবে বিস্ফারিত হইয়া গেলেন]

প্রত্যহ সাক্ষ্যে

প্র, আ, বি,

বিমন্ত্রিত অতিথিগণের আহারাদি শেষ হইলে সিন্দবাদ তাঁহার দশম সমুদ্রযাত্রার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন—মহোদয়গণ, এবার সমুদ্রযাত্রা করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই আমি নবম দেশে গিয়া পৌঁছিলাম। সেখানকার জাহাজ ঘাটায় আমাদের জাহাজগুলি নোঙ্গর করিয়া তীরে উপস্থিত হইলাম। এই দেশে ইতিপূর্বে আমি যাই নাই, কিম্বা গিয়াছে এমন কাহারো মুখে এদেশের কথা শুনি নাই। কাজেই এদেশের সবই আমার কাছে নূতন লাগিল। তখন সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। সমুদ্রতীরে যে-সহরে আমাদের জাহাজ লাগিল, সেখানকার পথঘাট প্রায় নির্জন। আমাদের খাদ্য দ্রব্যাদির প্রয়োজন ছিল—অথচ কাছাকাছি কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। তখন কি করিব ভাবিতেছি এমন সময়ে একব্যক্তিকে দেখিলাম। তাহাকে বলিলাম, মহাশয় আমরা বিদেশী, সবেমাত্র পৌঁছিয়াছি, কিন্তু খাদ্য দ্রব্যের প্রয়োজন কোথায় পাইব। ভদ্রলোকটি বলিলেন, এখন খাদ্য পাইবার আশা নাই, দেখিতেছেন না দোকান পাট সব বন্ধ, পথ ঘাট সব নির্জন, আর একটু পরেই কোটালের বন্দুক চলিতে আরম্ভ করিবে।

আমি বলিলাম, সে আবার কি? তিনি বলিলেন, সে অনেক কথা, এখানে দাঁড়াইয়া বলিতে গেলে দুই জনকেই বন্দুকের গুলিতে মরিতে হইবে। ইচ্ছা করিলে আজ আমার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারেন, তখন সব শুনিবেন।

সিন্দবাদ বলিলেন, কৌতূহলবৃত্তি আমার মনে চিরকাল প্রবল, এবং তজ্জন্য অনেক বিপদে আমাকে পড়িতে হইয়াছে। আমি সে দেশের কাহিনী শুনিবার জন্য ভদ্রলোকের গৃহে যাইতে সম্মত হইলাম। জাহাজের মাঝি-মাল্লাদের সে রাত্রির মতো কোনমতে চালাইয়া লইতে বলিয়া আমি লোকটির সঙ্গে রওনা হইলাম। সহরটি বড়ই কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে দেখিলাম সত্যই সব দোকানপাট বন্ধ, এবং পথঘাট জনবিরল হইয়া আসিয়াছে। তখনো দু'চার জন লোক পথে ছিল তাহারা শঙ্কিত চিত্তে, দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে চলিয়াছে। আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া দেখিলাম বহু ঘণ্টাবশেষ অট্টালিকা দণ্ডায়মান, বহুতর দোকান পাটের দরজা ভাঙ্গা, ভিতরে কিছুই নাই, আর পথ পূতিগন্ধময় আবর্জনা স্তূপে পরিপূর্ণ।

আমি শুধাইলাম পথে এত আবর্জনা কেন?

আমার নিমন্ত্রণ কর্তা বলিলেন—যাহাকে আবর্জনা মনে করিতেছেন তাহা মনুষ্যদেহের স্তূপ। তখন ভালো করিয়া তাকাইয়া দেখি সত্য সত্যই মৃত নর নারী বালক বালিকার স্তূপীকৃত দেহে পথ ঘাট আচ্ছন্ন। ভাবিলাম, এ কি! কোথায় আসিলাম? একটু একটু ভয়ও করিতে লাগিল। এমন সময়ে পথের এক দিকে গর্জন উঠিল—জয় খণ্ড্ মাতাকী জয়। তাহার প্রত্যুত্তরে পথের অপর দিক হইতে গর্জন উঠিল—জয় অখণ্ড্ মাতাকী জয়! এবং তার পরেই তুমুলরবে শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর, ঝাঝর বাজিয়া উঠিল—তখন সে এক বিষম হুলস্থূল উপস্থিত হইল।

সেই শব্দে ভীত হইয়া ভদ্রলোকটি ছুটিতে সুরু করিলেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন আমরা দুই জনেই হাঁপাইতেছিলাম। কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া আমি এই সব ব্যাপারের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, আগে আহার সমাধা করুন, তার পরে সব হইবে। আহারাদি শেষ হইলে আমি জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার নিকট বসিলে ভদ্রলোকটি বলিতে আরম্ভ করিলেন। ভদ্রলোকটির নাম নাদুস দাদা। এখন হইতে নাদুস দাদা বলিয়াই তাঁহার উল্লেখ করিব।

নাদুস দাদা বলিতে লাগিলেন—আমাদের এই সহরে কয়েক দিন হইল বিষম দাঙ্গা চলিতেছে। পাঁচ হাজারের উপর লোক নিহত, বিশ হাজার আহত, আর লুণ্ঠন ও ক্ষয়ের পরিমাণ কোটি কোটি মুদ্রা হইবে। আজ রাত্রেই একটা বিরাট রকমের মারামারি হইবার আশঙ্কা আছে।

আমি শুধাইলাম— এ সবের কারণ জানিতে পারি কি?

তিনি বলিলেন, সবই আপনাকে বলিব। আমাদের মাতাকে একজন স্নেহহীনা দীর্ঘ কাল বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছিল, সম্প্রতি তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছে। তাঁহার সন্তানগণ এখন দুই ভাগে বিভক্ত। একদল বলিতেছে যে তাহারা মাতার ন্যায্য অংশ আধাআধি ভাগ করিয়া লইবে। অপর দল বলিতেছে সে কি কথা? তাহাতে যে মাতার মৃত্যু ঘটিবে। ইহাতে সেই পূর্বোক্ত দল বলিতেছে মরিলে আর কি করিব? তাই বলিয়া ন্যায্য ভাগ ছাড়িব কেন? আমরা; অর্থাৎ যাহারা অখণ্ড মাতাকে চাহি, এমন সর্বনাশা পন্থায় রাজি হইতে পারিলা। এই সমস্যাকে অবলম্বন করিয়া মাতার সন্তানগণ দুই দলে বিভক্ত—একদল চাহে খণ্ড মাতা, অপর দল চাহে অখণ্ড মাতা। খণ্ড মাতার দলে এবং অখণ্ড মাতার দলে আজ কয়েক দিন হইতে হানাহানি চলিতেছে—সহরের যে দুরবস্থা দেখিলেন এই দাঙ্গাই তাহার একমাত্র কারণ।

এমন সময়ে অদূরে গর্জন উঠিল—খণ্ড মাতাকী জয়—এবং পর মুহূর্তেই তাহার প্রত্যুত্তরে রব উঠিল—অখণ্ড মাতাকী জয়। নাদুস দাদা বলিলেন—ওই শুরু দুইজনে উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতেছে—দাঙ্গাদারি বাধিবার ইহা সূত্রপাত। এখন সকলের মনের অবস্থা এমন ভীতিজনক হইয়াছে যে কোন মুহূর্তে, যে কোন কারণে একটা বিষম গোল বাধিয়া যাইতে পারে। তবে আপনার কোন ভয় নাই, আপনি আমাদের মাতার সন্তান নহেন, বিদেশী, আপনাকে কেহ কিছু বলিবে না। আপনি নিশ্চিন্তে নিদ্রা যান। আমাদের ঘুমাইবার উপায় নাই, সারা রাত্রি জাগিয়া পাহারা দিতে হইবে। এই বলিয়া নাদুস দাদা বিদায় হইলেন, আমি বিছানায় শুইয়া সমস্তক্ষণ অপূর্ব মাতৃভক্তির কাহিনী স্মরণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু ঘুম আসিল না, আসিবে কেমন করিয়া! ঘন ঘন জয় খণ্ড মাতাকী জয়, আর অখণ্ড মাতাকী জয়। ঘন ঘন শঙ্খ কাঁসর! ঘন পথের পাথরে লাঠি ঠুকিবার শব্দ! মাঝে মাঝে জানলা দিয়া আলোর ঝলকা প্রবেশ করে, বুঝিতে পারি—অদূরে একদল মাতৃভক্ত অপর দলের গৃহে আগুন দিয়াছে! ক্ষণে ক্ষণে শুনিতে পাই—'ওই আসিল, ওই আসিল' কিম্বা—'আসিতেছে, আসিয়া পড়িয়াছে', অথবা 'কুমারপাড়ায় ঢুকিয়াছে, চলো, চলো'। আবার কিছুক্ষণ পরেই বলিয়া ওঠে, 'না, না, কেহ নয়, ভুল হইয়াছে' কখনো বা রব ওঠে—'সব প্রস্তুত তো?' অমনি একবাক্যে সকলে চাঁকিয়া ওঠে—'জয় অখণ্ড মাতাকী জয়!' ভাংগটিক মেরিয়া বুঝিতে বিলম্ব

হইল না সামান্য একটি পুলিশের সমস্ত দল, করিয়া জলিয়া উঠিবে। আর ইহাদের যেমন মনের অবস্থা যোনাকীর আলোককে পুলিশ বলিয়া মনে করিতে ইহাদের বাধিবে না। ভাবিতে লাগিলাম—অপূর্ব এই নবজ দেশ। কেবল ভয় হইল জনশ্রুতি আকারেও এদেশের কথা অন্যদেশে পৌঁছিলে—তাহার না আজি কি দুরবস্থা হইবে।

কিন্তু একটা বিড়াল কেন? ঘরের মধ্যে একটা বড় আলমারি ছিল তাহার মাথায় একটা বিড়াল আসিয়া বসিয়াছে। আমি তাহাকে তাড়া দিতেই সে একলাফ মারিল, এবং পাশের অপর একটি আলমারির উপরে গিয়া পড়িল। সেই আলমারির মাথায় পানের বাটা ও অন্যান্য কাঁসায় বাসন ছিল। সেগুলি ঝন ঝন ঝনাৎ শব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল—নীচে পিকদানি ও জলপাত্র ছিল—দুই সেট বাসনের সম্মিলিত শব্দ আরও বিকট হইল—আর সেই নিস্তব্ধ রাত্রির পটভূমিতে এই সম্মিলিত শব্দ বিকটতর প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিল। অমনি রব উঠিল—'আসিয়াছে; আসিয়াছে, শঙ্খ বাজাও, কাঁসর বাজাও, ঢাক বাজাও, ঢোল বাজাও, 'অগ্রসর হও'—'জয় অখণ্ড মাতাকী জয়!' কেমন করিয়া কি হইল ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিবার জন্য যখন উঠিয়া বসিয়াছি দেখিলাম পাড়া শূন্য—সবাই লাঠি সোটা, কাটারি হাতে খণ্ড মাতার পাড়ার দিকে ছুটিয়াছে।

তারপরে সে এক বিষম কাণ্ড! অখণ্ড মাতার দল অগ্রসর হইতেই খণ্ড মাতার দল তাহাদের আক্রান্ত হইয়াছে—তাহারাও যথোপযুক্ত উপকরণাদি সহ অগ্রসর হইল—তখন দুইদলে ভীষণ লড়াই বাধিয়া গেল।

এইরূপে রাত্রি অতিবাহিত হইল। ভোরবেলা শয্যাত্যাগ করিয়া শুনিলাম যে প্রায় দশ হাজার খণ্ডমাতা আসিয়া অখণ্ড মাতার পাড়া আক্রমণ করিয়াছিল; তাহারা উচিত শিক্ষা পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে, কেবল হতাহতগণ ফিরিতে পারে নাই। বলাবাহুল্য বাস্তবিক সৈন্যগণের মুখে সে কী হিটলারী তৃপ্তি।

এমন সময়ে প্রাতাতিক সংবাদপত্র আসিয়া পৌঁছিল। অখণ্ড মাতার দলের প্রধান সংবাদপত্র লিখিতেছে—'গতকল্য রাত্রে প্রায় বিশ সহস্র দুর্বৃত্ত খণ্ডমাতা এই পুণ্যপল্লী আক্রমণ করিয়াছিল—তন্মধ্যে দশ সহস্র নিহত পঞ্চদশ সহস্র আহত হইয়াছে, সামান্য কয়েকজন কোন মতে পালাইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছে।' সবই বুঝিলাম, কেবল বুঝিলাম না বিশ সহস্র আততায়ীর মধ্যে পঞ্চবিংশ সহস্র হতাহত হয় কেমন করিয়া আর 'সামান্য কয়েকজনই' বা কোথা হইতে আসে? ভাবিলাম নবজ দেশের সমস্ত ব্যাপারের মতো এখানকার গণিতও স্বতন্ত্র নিয়মে পঠিত।

এমন সময়ে একখানা খণ্ডমাতার দলের সংবাদপত্র হাতে পড়িল। (আগে একদল অপর দলের কাগজ পড়িত না, এখন পড়ে। বিচ্ছেদের সূত্রেই যে মিলন আসে—ইহা কি তাহারই প্রমাণ!) খণ্ডমাতার সংবাদ-পত্র লিখিতেছে—'গতকল্য প্রায় চল্লিশ হাজার দুর্জন (অর্থবোধ হইল না) পাড়া আক্রমণ করিয়াছিল—ভগবানের দোয়ায় (তবে ইহারা ভগবানও মানে দেখিতেছি।) একজনও ফিরিয়া যাইতে পারে নাই। সমস্ত ব্যাপার চোখে দেখিয়া এবং সংবাদপত্রে তাহার বিবরণ পড়িয়া আমার মাথার মধ্যে কেমন যেন তাল গোল পাকাইয়া গেল। একবার আবার মনে হইল গত রাত্রের আক্রমণের ব্যাপারটাই সন্দেহজনক—মূলে

আছে সেই আদদারির মাথার উপরের মার্জ্জার। বিড়ালটার বাসন কোদন ফেলিয়া দিবার শব্দেই লোকের শঙ্কিত মন আক্রমণ কল্পনা করিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছে—আর দুই বিপক্ষ দল লাঠি হাতে অগ্রসর হইলে যাহা হয়—হলে তাহাই হইয়াছে। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি আমার এই সংশয়ের কথা প্রকাশ করিয়া বলিবার সাহস হইল না। যাহাদের পক্ষে দিন হাজারের মধ্যে পঁচিশ হাজার হত্যাতে করা সম্ভব—সামান্য একজন বিদেশীকে মারিয়া ফেলিতে তাহাদের কতক্ষণ!

কিন্তু একটি কৌতূহল নিবৃত্ত না করিয়া দেশে ফিরিব না স্থির করিলাম। যে-মাতার এমন সব অকৃতপুত্র তাহাকে তো দেখা চাই-ই। এমন সময়ে নাদুস দাদা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে আমার মনের ইচ্ছা জানাইলাম। তিনি বলিলেন—ইহা আর শক্ত কি? চলুন মাতাকে দেখিয়া আসি। তখন খণ্ডখণ্ড মাতাকে দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে দুইজনে রওনা হইলাম।

প্রায়ান্ধকার একটি প্রকোষ্ঠে একটি অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিতা নারী উপবিষ্টা। তাহার পরণে জীর্ণ-চীর, হাতে পায়ে শৃঙ্খলের দাগ, তাহার চক্ষু নিমীলিত। নাদুস দাদা বলিলেন—ইনিই আমাদের জননী। বহুকাল শত্রু হস্তে বন্দিনী থাকিয়া ইনি সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত।

আমি শুধাইলাম—ইনি নড়িতেছেন না কেন?

নাদুস দাদা বলিলেন—বহুকাল শৃঙ্খলিত থাকিয়া নড়িবার অভ্যাস এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি এখনো বিশ্বাস করিতেছেন না যে তাঁহার শিকল খুলিয়াছে—তাই হাত পা নাড়িতে সাহস করিতেছেন না। তারপরে একটু থামিয়া বলিলেন যে—খণ্ডমাতার দল ইঁহাকে কাটিয়া নিজেদের ভাগ স্বতন্ত্র করিয়া লইতে চায়। সেইজন্যই আজ কয়েকদিন হইল দুইদলে বিষম দাঙ্গা চলিতেছে।

আমি অবাক হইয়া নারীকে দেখিতেছিলাম এবং তাঁহার মাতৃভক্ত সন্তানদের কথা ভাবিতেছিলাম এমন সময়ে একদল যুবক যুবতী 'শান্তি চাই, স্বাধীনতা চাই, রেজকি চাই' ধ্বনি করিতে করিতে ঘরে আসিয়া ঢুকিল। তাহাদের পোষাক লাল, মাথার চুল লাল, চোখ দুটা লাল, কথাবার্ত্তাও রক্তাক্ত, হাতে তাহাদের একটা শিকল। আমি নাদুস দাদাকে শুধাইলাম ইহারা কে?

নাদুস দাদা বলিলেন- এই নূতন এক আপদ দেখা দিয়াছে। ইহারা মাতাকে নূতন এক শিকলে বাঁধিতে চাহে।

আমি বলিলাম—ইহাদের বাধা দিবার কি উপায় নাই?

—এই নেন্ সেগুন না, বলিয়া তিনি তাহাদের হাতে এক প্যাকেট সিগারেট দিলেন। অমনি তাহারা খুশী হইয়া শান্তি, স্বাধীনতা ও রেজকির দাবী করিতে করিতে ধ্বনি তুলিয়া ফিরিয়া গেল।

আমরা বাহির হইয়া আসিলাম। মৃত ও ধ্বংসস্তূপে পূর্ণ সহরের পথ দিয়া চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিলাম—ইহাদের মিলনের উপায় কি? ইহারা দুই পক্ষ মিলিত হইয়া জননীর সেবা কি করিতে পারে না?

ইহারা কি চিরকালই এমনি কাটাকাটি করিয়া মরিবে? কখনোই, কোনো উপলক্ষ্যেই কি মিলিত হইতে পারিবে না?

এমন সময়ে চোখে পড়িল পথের পাশে একটি স্থানে নীল পোষাকধারী খৃস্ট মাতার সন্তান ও গেরুয়া পোষাকধারী অখণ্ড মাতার সন্তান গঙ্গা যমুনার যুগল স্রোতের মতো পাশাপাশি গিয়া মিশিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! সে চীৎকার নাই, দাঙ্গা নাই, মারামারি কাটাকাটি কিছুই নাই। দিব্য শান্তশিষ্ট ভাবে তাহারা পাশাপাশি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমার বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রহিল না।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দাদা তুলিয়া একটী তাহাদের সৌম্য শান্ত ভ্রাতৃ-মৎসল মূর্ত্তি; এ কোন্ স্থান? এ অট্টালিকা কি মন্দির? না গ্রন্থালয়? তাড়াতাড়ি কৌতূহল নিবৃত্ত করিবার জন্য তাকাইয়া দেখিলাম লোহার গরাদে দেওয়া দরজার উপরে লেখা আছে—'এখানে বিশুদ্ধ গীতা বিক্রয় হইয়া থাকে।' তবে গীতার প্রভাবেই ইহারা দ্বন্দ্ব ভুলিয়াছে—তবু লোকে গীতাকে অবজ্ঞা করে। গীতাই হোক আর বাই হোক—তবু যে ইহাদের একটা মিলনের উপলক্ষ্য আছে জানিয়া মনে সান্ত্বনা পাইলাম।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সিঙ্কবাদ থামিলেন। তাঁহার বিস্মিত শ্রোতাদের মুখ দিয়া সমস্বরে ধ্বনিত হইল—'মার হাব্বা, মার হাব্বা—ধন্য এই দেবের দেশ!'

আমরা বাইরের পাশ থেকে যে ধর্ম পাই সে কখনোই আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবলমাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্মকে চিত্তের মধ্যে উদ্ভূত ক'রে তোলাই মানুষের চির জীবনের সাধনা। তার বেদনায় তাকে অহরহ ব্যাকুল হতে হয়, শক্তির শেষ দিয়ে তাকে লাভ ক'রে তবে তার পরে জীবনে যখন পাই আর না পাই আনন্দে চরিতার্থ হয়ে মরতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ

পূজারিণী

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

সামনে পূজার সরঞ্জাম সাজানো ঘৃত প্রদীপ হইতে পুণ্য ধূম উত্থিত হইতেছে, ধূপের সুরভিতে বায়ুস্তর ভারাক্রান্ত। ক্ষৌমবাস পরিয়া, কুমারী একাগ্রচিত্তে স্তব পাঠ করিতেছে, 'ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজত গিরিনিভং ……দেবাদিদেব মহাদেবের রজত গিরিসন্নিভ প্রশান্তরূপ ধ্যান-নেত্রের সামনে যেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে।

পাশের ঘর হইতে জননী স্নেহ কণ্ঠে ডাকিলেন, ওমা, উমা তোর পূজো শেষ হলো? বেলা যে অনেক হ'নি হয়েচে, তোর জন্য সরবত তিনিয়ে কতক্ষণ থেকে বসে রয়েচি।

বৈশাখের প্রভাতবেলা, উমা ধীরে পূজা শেষ করিয়া একটি প্রণামী চাঁপা ফুল লইয়া উঠিয়া আসিল। কয়দিন হয় খুব অন্ধকার থাকিতে তাড়াতাড়ি পূজা শেষ করিয়া লইতে হয়, নয়তো কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া অনেকখানি বেলায় পূজা করিতে হয়। যতক্ষণ পূজা শেষ না হয় সে জল খায়না এজন্য কলেজের সহপাঠিনীরা কতবার কত বিদ্রূপবাণে তাহাকে বিঁধিয়াছে। কাল হইতে গ্রীষ্মের বন্ধের জন্য কলেজ বন্ধ হইয়াছে, আজ তাই নিশ্চিন্ত মনে শিব পূজায় বসিয়া তাহার একটু বেলী হইয়াছে।

উমাদের বাড়ী সাধারণ উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবার যেমন হয়। আজকালকার যুগ-প্রভাব অনুসারে মেয়েদের বিবাহের বয়স অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। তাহারা পড়াশোনা করিতেছে। উমার দিদি কুমার বি, এ, পড়িতে পড়িতে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। উমা এবছর বি, এ, পরীক্ষা দিবে। তাহার জন্যও পাত্র খোঁজার পালা স্বাভাবিক নিয়মে চলিতেছে। বাড়ীর ভিতরে মা, দিদিমা আছেন। বছরের মধ্যে পুণ্যমাস বৈশাখমাস। এই মাসটা অন্ততঃ কুমারী মেয়েদের শিবপূজা করিতে হয়। মেয়েরা কলেজে পড়িতেছে বলিয়াই যে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবে তাহা হইতে পারে না। বিয়ের আগে যেমন যথা নিয়মিত পূজা করিয়াছে, উমাও করে। তাহাদের মা অনুযোগ করিয়া বলেন, তোদের কালে সব সময়েই তাড়া-হুড়ো। এই ইস্কুলের গাড়ী এলো, এই কলেজের বাস ফিরে যাচ্ছে। সকল সময়েই হৈ, চৈ, হট্টগোল। আমাদের সময়ে আমরা কত উৎসাহে চারমাস করে বছরে শিবপূজা করতুম। বৈশাখ থেকে আরম্ভ করে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ এই চারমাস সে কী উৎসাহ ছিল আমাদের। কোথায় নতুন কচিবেল পাতা পাওয়া যায়, কোথায় ভালো ফুল আছে, ভোরে উঠে সাজি নিয়ে সেই সব খুঁজে যার করা।

ছোট মেয়ে টুনু নিকটে ছিল—সে অর্থ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, আচ্ছা মা, শিব পূজো করিলে কি হয় মা? শিবের মত বর হয়, না?

—উমার লজ্জা পাইবার কিছুই ছিলনা কিন্তু হঠাৎ সে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া উঠিল। টুনুকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, যাবা, পাঁচ বছরের মেয়ে, এরই মধ্যে যা পাকা হয়েছে।

উমার মা কৌতুকহাস্যে কন্যার লজ্জানত মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, কেন টুনু ঠিক কথাই তো বলেচে। হিঁদুর ঘরের মেয়ে ছোটটি থেকেই এসব জানে। হয়ইতো। শিবপূজো করলে শিবের মত বর হয়।

উমা অন্যমনস্ক হইয়া গেল। সেকালের কথা প্রত্যক্ষ ভাবে সে জানেনা। কাব্যে পুরাণে কাহিনীতে পড়িয়াছে, উমার তপস্যার কথা। পড়িয়াছে সাবিত্রীর স্বামী-অন্বেষণ, ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর। দময়ন্তীর দেবতাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া মানবের গলে বরমালা অর্পণ করা। বৈশাখের বিমল নিদাঘ প্রভাতে সেই সব বহু দূর বিস্মৃত অতীতের কাব্য কাহিনী মনের মাঝে মোহ ঘনাইয়া আনে। পূজার ধূপ সুরভির সহিত মিশিয়া প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার একবেণীধরা তপস্বিনী মূর্তি মনে পড়ে। মাদন্তী ফুলের সুবাসের সঙ্গে মদনভস্মের পর তপঃক্লিষ্টা উমার বিশীর্ণ রূপজ্যোতি স্মরণের পথে ভাসিয়া আসে। চন্দন ঘষিতে ঘষিতে মনে পড়ে মহাভারতের উপাখ্যান, তপস্বীর জন্য রাজা সমরণের সহস্রবর্ষব্যাপী দুষ্কর তপস্যা। আধুনিক যুগের দোক্তাদোক্তায়ি, কলকোলাহল কোথায় যেন বাষ্পের মত মিলাইয়া যায় তাহার স্থানে সারা অন্তঃকরণ জুড়িয়া থাকে প্রেমের মহান ত্যাগ, সুমহৎ তপস্যা, সুদুঃসহ আনন্দবেদনার এক বিরাট রূপ। রজতগিরির ধ্যান করিতে করিতে পুণ্যপ্রবাহের এক জ্যোতির্ময় মন্ত্র ধারা সারা দেহ মন প্লাবিত করিয়া কুমারী চিত্তে এক অনির্বচনীয় আবেশ জাগাইয়া তোলে। বৈশাখী ভোরের বেলায় এই শিবপূজা তাহার দিদি করিয়াছে, তার মা করিয়াছেন, তাহার ঠাকুমা, দিদিমা করিয়াছেন। যুগ যুগান্তের গাঁথা একখানি পারিজাত মালা তাহার শেষ ফুলটি গাঁথিয়া দিবার জন্য যেন তাহার পানে চাহিয়া প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

জীবন বিধাতার প্রাঙ্গণে বিচার নয়, বিতর্ক নয়, পরীক্ষা নয়, কেবল ধ্যানস্তব্ধ মহিমায় অবগাহনের মত করিয়া আপনাকে নিঃশেষে নিবেদন করিয়া দিবার এই যে একটি সুর কুমারী-চিত্তে ঘনাইয়া আসিয়াছিল অকস্মাৎ তাহার সুর কাটিয়া গেল। পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখিতে আসিতেছে। মা সস্নিতমুখে কহিলেন, উমা অত রাত্রি পর্যন্ত জেগে না পড়লে কি নয় মা? চেহারা যে দিন দিন শুকিয়ে কালি হয়ে যাচ্ছে।

উমা মৃদু হাসিয়া কহিল, কি করবো মা, টেষ্ট যে এসে পড়লো।

ঠাকুমা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করিয়া কহিলেন, থাক্ অত লেখাপড়ার আর দরকার নেই। যেখানে বিয়ের কথা হচ্ছে—এখানে যদি লেগে যায় তা হলে অমন কত গণ্ডা বি-এ, এম-এ, তাদের মোড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে। এখন কথা হচ্ছে চোখে লাগা নিয়ে। রাত জেগে জেগে মেয়ের চেহারার যা ছিরি হয়েছে তাতে পছন্দ হওয়াই শক্ত। বৌমা তুমি উমার খাতাপত্রগুলো এখন দিন কতকের জন্যে বাক্সে তুলে রেখে দাও দিকি বাছা।

মা বোধকরি সেই আদেশই পালন করিতে আসিয়াছিলেন, উমা তাঁহার দিকে ফিরে দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, আর যদি তাঁরা পছন্দ না করে ফিরে যান, তখন তো আবার আমাকে টেষ্ট দিতে হবে! তখন কেমন করে দেব শুনি?

মা সেকথার উত্তর দিতে পারিলেন না। তখন বড়দিদি রমার ডাক পড়িল। কলিকাতায় ভবানীপুরে অকূলে তাহার শ্বশুর বাড়ী। রমা তাহার মায়ের মত নিরুত্তরে থাকিবার পাত্রী নয়। সে একালের মেয়ে উমার মতই কুল কলেজে পড়িয়া এ যুগের আওতায় মানুষ হইয়াছে। আসিয়া সে বোনের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইল। কহিল, আচ্ছা বিয়ে জিনিষটাকে তোর অত কাব্যের চোখে দেখবার দরকার কি? মেয়েদের বিয়ের সময় দেখতে আসে, নানাভাবে পরীক্ষা জিজ্ঞাসাবাদ করে তাতে দোষটা যে কোথায় রয়েছে আমার মাথায়

চু কচে না। ছেলেদের চাকরি খোঁজার সময় কতবার কতভাবে ইন্টারভিউ দিতে হয়। তারা কি আপত্তি করে? আর করলেই বা শুনবে কে?

উমা আর কোন তর্ক করিল না, তাহার চুড়িবহুল ফর্সা হাত দুটিতে উঠিল। যাই হোক শেষ অবধি কিন্তু পাত্রপক্ষের পছন্দ হইয়া গেল। উমার বিশীর্ণ পাণ্ডুর মুখ এবং ক্ষীণ দেহলতার মাঝে আধুনিক যুগ-সম্মত সৌন্দর্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহারা পুলকিত হইলেন। উমার আর টেষ্ট পরীক্ষা দিবার প্রয়োজন হইল না। বাড়ীর সকলে অতি মাত্রায় উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। ঠাকুমা বলিলেন, শিবপূজো করবার ফল এতদিনে ফলেছে। মাতা সন্তোষনে আনন্দাশ্রু মুছিলেন! দিদি বিজয়গর্বে হাসিয়া কহিলেন, তোমরা তো কেউ পেরে ওঠনি। আমি এসে সব ঠিক করলুম।

মেয়ে পছন্দ হইয়াছে বটে কিন্তু সভ্য সমাজের কায়দাকানুন মাফিক দেনা-পাওনার প্রশ্ন এখনও মিটে নাই। নগদ টাকা লইয়া তুচ্ছ বাদ-প্রতিবাদ করিবার মত এঁদের শিক্ষা দীক্ষা কৌলিন্য বা রুচি নয়। তবে ফার্নিচারস্ যাহা দেওয়া হইবে তাহা অনেক বিলিতী কার্মের সহিত কারবার করিলেই ভালো হয়। কার্মটীর নাম এবং ঠিকানা এঁরা কষ্ট করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। অন্তরতার অবধি নাই বলিতে হইবে। জুয়েলার্স ঠিক করাও এঁদের পারিবারিক রীতি-নীতি অনুসারে হওয়াই ভালো হীরার গয়নার ঠিক ব্যবহার এই দোকান ছাড়া অপর দোকানে সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে না। জুয়েলার্সের নাম ঠিকানাও তাঁরা পাঠাইয়াছেন।

উমা সব শুনিয়া যায়, কিছুই বলিতে পারে না। সর্বত্রই একটা দোকানদারির ছাপ। এই ফার্নিচার আর গয়না আর বেনারসীর মাঝে তাহার রজত-গিরির ধ্যান কোথায় হারাইয়া গেছে, কোন মরীচিকা অন্ধকারে তাহা লুপ্ত হইয়াছে কে জানে!

সমস্ত বাধা বিঘ্ন কাটাইয়া কাল নির্বিঘ্নে মহাসমারোহে বড়ঘরে মেয়ের বিবাহ সমাধা হইয়া গেছে এই আনন্দে উমার বাপের বাড়ীর সকলেই আনন্দে অধীর। আজ উমার ফুলশয্যা। বড়ঘরের উপযুক্ত ফুলশয্যার তত্ত্বের আয়োজনে আজ সকাল হইতে বাড়ীর সকলে বড় ব্যস্ত। উমার শ্বশুরবাড়ী কলিকাতার অভিজাত অঞ্চলে। আজ ফুলশয্যার রাত্রি, কত ধরণের কত বিচিত্র বেশ-বাস পরিয়া এত মেয়ে আসিয়া জড়ো হইয়াছে। উমা অবাক চক্ষে চাহিয়াছিল। পাশের-ঘরে গ্রামোফোন একটা বিলাতি রেকর্ড বাজিতেছে। বাজের সুরের বাজনা। কে দু'টি মেয়ে মিহি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হাসিতে হাসিতে গল্প করিতেছে। একজন বলিতেছে, আহা আমাদের নটিকে তো দেখতে নতুন বৌয়ের চেয়ে ঢের ভালো। এঁদের কেবল মুহূর্তের পণ ছিলো ছুটে তিনটিকির মধ্যে বৌ-করবোনা নইলে তো····· আর একজন কে চুপি চুপি ফিস ফিস করিয়া বলিল, চুপ চুপ। নতুনবৌ শুনতে পাবে। পাশের ঘরেই রয়েছে। সেই মিহি কণ্ঠে কহিল, নতুনবৌ তো বাথরুমে।

কে একজন কহিল, না, তারতো গা-ধোয়া কাপড় ছাড়া হয়েগেছে। সে পাশের ঘরেই আছে। অত জোরে জোরে কথা না বলাই ভালো। উমার ক্লান্ত চোখের সামনে ম্লান-নেত্রে ভাসিয়া ওঠে, সেই পূজার ঘর, সেই চন্দন, ধূপ, ফুলের সুরভি। সেই মনে মনে কত স্বপ্ন-দেখা পূজারিণীর পূজা কি এই ব্যর্থতার মধ্যেই নিঃশেষিত?

মা কিন্তু ব'লেন, ভাগ্যে উমা শিবপূজা করিয়াছিল। ঠাকুমা এখন হইতেই ছোটবোন টুলুকে উঠিতে বসিতে অহরহ বলিতেছেন: দেখলি তো তোর ছোটদির শিবপূজো ক'রার হাতে হাতে ফল। এবার বৈশাখ পড়লে তুমিও ছেড়না যেন।

সোনার হরিণ

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়.

রাত প্রায় একটা হবে। শীতকালের রাত। প্রকাণ্ড খাটে ইটালিয়ান রাগের কোমল ও উষ্ণ স্পর্শের মধ্যে রায় বাহাদুর করুণাশঙ্কর মিত্র ঘুমে প্রায় অচেতন হয়েছিলেন। ঘরের কোণে টেলিফোনটা ঝন্‌ঝন্ করে উঠলো, যা পড়লো করুণাশঙ্করের ঘুমের নিশ্ছিদ্র দুর্গে। প্রথমটা স্বপ্ন দেখছেন, কিন্তু সেটা চোখ মেলে চাইতেই জোলো। বেডসুইচটা টিপে ঘড়ির দিকে চাইলেন। একটা বাজতে পাঁচ মিনিট। নিতান্ত জরুরী কিছু না ঘটলে এ সময়ে কেউ কাউকে টেলিফোন করে না, বিশেষ বিরাশী বছরের বৃদ্ধ রায় বাহাদুর করুণাশঙ্কর মিত্রকে। করুণাশঙ্কর উঠে বসলেন। মখমলের স্লীপারটায় পা গলালেন, পা দুটো তবু ঠাণ্ডায় একটু কাঁপতে লাগলো। রাগটা গায়ে চড়িয়েই তিনি টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে ধরলেন।

—হ্যালো—

—বাগবাজার চৌধুরী বাড়ী থেকে বলছি।···আপনার এখুনি একবার আসা দরকার কর্ত্তা মশাই।···

—কেন···কি হয়েছে ?

—কাল সকাল থেকে গিন্নি-মার জ্বর হয়েছিল, এখন প্রায়···শ্বাস উঠবার উপক্রম···ডাক্তার প্রথম বুঝতে পারেন নি, এখন বলছেন চোখা নিউমোনিয়া·· গিন্নিমা আপনাকে দেখতে চাইছেন·· তাই···

'এখুনি যাচ্ছি···কিন্তু অরুণ কোথায়—তোমাদের বাড়ীর কর্ত্তা ?'

'তিনি এখনও ফেরেননি।'

'ছেলেরা—?'

'বড় খোকাবাবু বোম্বাইয়ে গেছেন বেড়াতে, ছোট খোকাবাবু কলেজের ছেলেদের সঙ্গে কড়কি গেছেন···'

'ডাক্তারকে অপেক্ষা করতে বলুন। দরকার হলে বড় ডাক্তার ডাকান। আমি পনের মিনিটের মধ্যে পৌঁছবো—'

রিসিভার নামিয়ে রেখে করুণাশঙ্কর এসে খাটের ওপর বসে পড়লেন। এক সঙ্গে এতগুলো কথা বলতে তাঁর কষ্ট হয়। তার ওপর দুঃসংবাদের উত্তেজনা। পা দুটোয় যেন বেশী ঠাণ্ডা লাগছে। কিন্তু বসে থাকবার সময় নেই; উঠে গিয়ে দরজা খুলতে হোলো। দরজার বাইরেই বারান্দায় তাঁর খাস চাকর হরিচরণের শোবার জায়গা। বারান্দায় মোটা ত্রিপলের পর্দা ফেলা, ঠাণ্ডা লাগবার ভয় নেই। করুণাশঙ্করের স্ত্রী মারা গেছেন বাইশ বছর আগে। তারপর থেকে একা শোওয়াটা তাঁর এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে নিতান্ত অসুখ-বিসুখ না হ'লে হরিচরণকে তিনি কিছুতে শুতে দেন না। আর বয়সের তুলনায় শরীরটাও তাঁর আশ্চর্য্য, অদ্ভুত। একটু ঠাণ্ডা লাগা ছাড়া আর কোন উপদ্রব নেই।

দরজা খুলে করুণাশঙ্কর হরিচরণকে ডাকলেন।

—রামদিনকে গাড়ী বা'র করতে বল্। বাগবাজার যাব। সময় নেই···ধরিচরণ নিচে গিয়ে রামদিনকে খবর দেবার পর গাড়ী বা'র করতে মিনিট পাঁচেকের বেশী সময় লাগলো না। রায় বাহাদুর প্রকাণ্ড ওভারকোটের ওপর কানঢাকা টুপী পরে নিচে নেমে এলেন। কুয়াশা-ঢাকা পথ চিরে গাড়ি ছুটলো বাগবাজারের দিকে।

শীতকালের রাত। পথ-ঘাট নির্জ্জন হয়ে গেছে। এত রাত্রে রাস্তায় এ-রূপ করপাশ্বর কতদিন দেখেননি। যখন দেখেছেন তখন কলকাতার রাস্তায় ট্রাম চলতো, টমটম চলতো, মোটর নয়। গভীর রাত্রে ঘোড়ার খুরের শব্দ বহু দূর পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হোতো···

করপাশ্বরের অদ্ভুত লাগছিল চারিদিক। শুধু চারিদিক নয়, নিজেকেও। বাগবাজারের চৌধুরী বাড়ীর গিন্নি—অরুণা, রায়বাহাদুরের মেয়ে। তাঁর কনিষ্ঠ সন্তান। তার আগে এসেছিল তিনটী,—তিনটিই ছেলে। তারা নাই আজ। একটি যোলর, একটি বাইশ আর একটি তিরিশ বছর বয়সে মারা গেছে। বাকী শুধু অরুণা, তাঁর শেষ সন্তান। তাঁর যৌবনদিনের সেই রোমাঞ্চিত দিনগুলির অবশিষ্ট স্মৃতি। সেই অরুণার অসুখ, খবর উঠেছে। আজ বিয়াল্লিশ বছর বয়সে রাত একটার পর তিনি চলেছেন তাকে দেখতে, বড়পার থেকে বাগবাজার। অলষ্টার, কান-ঢাকা টুপি, উলের মোজা—কিছুই বাদ দেননি। শুধু তাই নয়। ঘর থেকে বার হবার আগে দেয়াল-আলমারীতে রাখা যে বোতল থেকে খানিকটা তিনি গ্লাসে ঢেলে পান করে এসেছেন, তা একেবারে খাঁটি ফরাসী দেশে তৈরী।···আশ্চর্য্য নয়? আশ্চর্য্য নয়, এই দীর্ঘদিন জীবনের ঘাটে পরমায়ুর নৌকর ছেলে অকারণ বেঁচে থাকা?

গাড়ির চাকা জনবিরল পথ কেটে উর্দ্ধশ্বাসে এগিয়ে যাচ্ছিল। রায়বাহাদুরের মনে হচ্ছিল, স্বপ্ন দেখছেন। ছোট নাতি একবার তাঁকে সিনেমায় নিয়ে গিয়েছিল—সেই প্রথম আর শেষ, পর্দ্দার ওপর সেদিন যে সব ব্যাপার ঘটেছিল সেগুলো চোখে দেখলেও তিনি ভাল বুঝতে পারেন নি, এও যেন ঠিক তেমনি। শুধু এই পথ পার হওয়া নয়, বেঁচে থাকাটাও তাঁর কাছে এই মুহূর্ত্তে অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল।

বাগবাজারে পৌঁছে রায়বাহাদুর চৌধুরীবাড়ীর তেতলায় উঠলেন। অরুণার শোবার ঘরে—তার মাথার শিয়রে ডাক্তার থেকে নার্স, বাড়ীর বুড়ো ম্যানেজার, জন ছয়সাত ঝি-চাকর···মোটমাট জন দশেকের ভিড়। অরুণাকে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে।

রায়বাহাদুর ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার আর নার্স ছাড়া সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। যেন মৃত্যুপথযাত্রিনী অরুণার চেয়ে রায়বাহাদুর করপাশ্বরের চিত্তের উপস্থিতির দিকে নজর দেওয়াটা অনেক বেশী জরুরী। রায়বাহাদুর মেয়ের মাথার শিয়রে বসে তার একটা হাত সন্তর্পণে কোলে তুলে নিলেন।···ঠাণ্ডা হয়ে আসছে,···কোন অনুভূতি নেই সে হাতে। শুধু হাতে কেন, সব অনুভূতিই অরুণার হারিয়ে আসছে—খুব ধীরে ধীরে, একান্ত নিশ্চিন্তভাবে। কিছু করবার নেই, কিছুই করবার নেই। ডাক্তারকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার উৎসাহ পর্য্যন্ত পেলেন না রায়বাহাদুর। আশে পাশে যে লোকগুলো চুপ করে দাঁড়িয়েছিল তাদের দিকে চাইতেও ইচ্ছা হ'ল না। এই ভিড়ের মধ্যে যাদের থাকা উচিত ছিল তাদের একজনও নেই। কার মুখের দিকে চাইবেন করপাশ্বর?

অরুণার স্বামী অরুণ। বড়লোকের ছেলে, ব্যারিষ্টার। নাম মিলিয়ে বিয়ে দিয়েছিলেন রায়বাহাদুর। বয়স এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি। কিন্তু সে বাড়ী ফেরেনি। বাড়ী সে রাত্রে ফেরে না, রায়বাহাদুর জানেন। লন্ডাক প্লেস—না-কি একটা রাস্তায় তার স্বতন্ত্র সংসার। রাতগুলি সেই সংসারের কর্ত্রী, ইহুদী একটী মেয়ের—মানে অন্য এক নারীর। এমনি কাটছে আজ বাইশ বছর।

রায়বাহাদুর এ ইতিহাস জানেন। তবু তিনি ভাবছিলেন, শেষমুহূর্তে হয়ত একটী রাত অরুণ বাজে খরচের খাতে ফেলতে পারে। কিম্বা অরুণার একটা ছেলেও যদি···না, তারা দুজনেই কলকাতার বাইরে। কিন্তু রায়বাহাদুর মিছে ভাবছিলেন। কে এলো আর এলো না সেটুকু খোঁজবার অভ্যুত্তি অরুণার ছিল না।

অবশেষে ডাক্তার নিজেই কথা বললেন: আর মাত্র ঘন্টা খানেকের ব্যাপার। আমাদের কিছুই করবার উপায় নেই।

রায়বাহাদুর দুঃখিত হলেন কি না নিজেই বুঝতে পারলেন না। পাঁচ বছর আগে অরুণা শেষবার বাপের বাড়ী গিয়েছিল। মাত্র দিন কয়েকের জন্যে। তারই মধ্যে একদিন—রাত তখন তিনটে, রায়বাহাদুর ঘুম ভেঙে যেতে দেখলেন পাশের ঘরে আলো জ্বলছে। উঠে গিয়ে দেখেন অরুণা স্নান করে এসে মাথা মুছছে। আশ্চর্য হলেন রায়বাহাদুর।

অরুণা হেসে বলেছিল: এই সময় একবার স্নান করে নিলে ভোরের দিকে ঘুম আসে। নইলে মোটে ঘুমুতে পারি না বাবা। পরের দিন বড় একজন ডাক্তার এসে অরুণার জন্যে ঘুমের ওষুধ লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন রাত্রে অরুণা দুটোর পর ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার পরের দিনও তাই। কিন্তু তৃতীয় দিন একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো। রাত ভোর হয়ে গেল, বেলা দশটা বেজে গেল, কিন্তু অরুণার ঘুম ভাঙলো না। আবার ডাক্তার এলেন। অনেক চেষ্টায় অরুণার ঘুম ভাঙলো। যাবার সময় ডাক্তার রায়বাহাদুরকে বলে গেলেন: রাত্রে ওঁর কাছে কারও থাকা দরকার। নইলে ওষুধ আমার বদলে দিতে হবে। ওষুধ উনি একটু বেশী মাত্রায় খেয়েছিলেন। বোধ হয় ইচ্ছে করেই।

অরুণাকে অবশ্য রায়বাহাদুর কিছু বলেন নি, শুধু ওষুধটা বদলে দেওয়া হয়েছিল। সেটা ভাল হয়েছিল কি খারাপ হয়েছিল রায়বাহাদুর বুঝতে পারেননি। আইনে আত্মহত্যার চেষ্টা নাকি অন্যায়। আইনের মানে আছে হয়তো, যা নেই তার নাম বোধ হয় ন্যায়।

সেদিনের এই কথাটাই রায়বাহাদুরের আজ বার বার মনে পড়ছিল। সেদিন অরুণা চেয়েও যা পায়নি, আজ তাই ধীরে ধীরে, কিন্তু একান্ত নিশ্চিন্তভাবে তাকে ছেড়ে যেতে চাইছে। বুকের কাছে যার মুখ, সমস্ত শরীরে তাই ছড়িয়ে পড়ছে—অজানিত দাতার দয়ার মতো। রায়বাহাদুর দুঃখ করবেন?

মৃত্যুর একটা মানে আছে, একেবারে উলঙ্গ, প্রত্যক্ষ, নিষ্ঠুর সে অর্থ। কিন্তু রায়বাহাদুরের কাছে তার কোন দাবী নেই। একদিন ছিল, কিন্তু আজ নেই। বড় ছেলে যখন মারা যায় করুণাশঙ্কর তখন লামডিংএর ওদিকের জঙ্গলে—শিকারে গিয়েছিলেন। শিকারের সন্ধানে মাচানের ওপর বসে থাকতে থাকতে খবর পৌঁছেছিল। সেদিন মানে ছিল মৃত্যুর। মেজ মরলো মোটর এক্সিডেন্টে। কলকাতার শহরে রেসিংকার

তখন সবে আমদানী হয়েছে। শীতের রাতে, বোধকরি একটু অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় গাড়ি চালাতে গিয়ে রাজেন্দ্রনাথ আর ফিরে আসেনি। ফিরে এসেছিল তার থেঁতলানো মাংসপিণ্ড, রক্তাক্ত কুৎসিত। রাজেন্দ্রনাথ একা ছিল না, তার সঙ্গে লিপষ্টিক-মাখা-ঠোঁট একটী কিরিঙ্গি মেয়েকেও নাকি আহত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।

সেদিন মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জীবনের একটা নতুন অর্থ যেন রায়বাহাদুর খুঁজে পেয়েছিলেন। ছোট ছেলে মারা গেল কলেরায়। যে বাড়ীর নিচে থেকে ওপর পর্য্যন্ত ঝকঝকে শ্বেত পাথর দিয়ে বাঁধানো, চাকররা দিনে যার তিনেক যে বাড়ীর ঘরের মেঝে ফিনাইল দিয়ে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে, যে বাড়ীর চৌহদ্দির এক বিঘের মধ্যে আশেপাশে কোন বাড়ী নেই—সেই বাড়ীর ছেলে কলেরায় দুঘণ্টার মধ্যে মারা গেল। রাশি রাশি টাকা, অজস্র, অগণিত টাকা দিয়েও করুণাশঙ্কর সেদিন কিছু করতে পারেননি। বসে বসে শুধু ডাক্তারদের অনর্থক কার্যতৎপরতার সাক্ষ্য রয়েছিলেন।

তারপর থেকে মৃত্যুর কোন অর্থ নেই, কোন রোমাঞ্চ নেই, কোন বিস্ময় নেই রায় বাহাদুরের কাছে। নিজেকে তিনি প্রতিনিয়তে সেই অনিবার্য্য মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। কিন্তু সে তাঁর কাছে যায়নি ··বাট, সত্তর, আশী—বিরাশীতেও না। তার বদলে আসছে করুণার কাছে। তাঁর কনিষ্ঠ সন্তান, তাঁর যৌবন-ধর্ম্মের শেষ পরিচয় করুণার কাছে। করুণাও তাঁর মত অপেক্ষা করেছে—না, ঠিক অপেক্ষা নয়, বরং বলা চলে বাসনা করেছে এই মুহূর্ত্তটীকে ; প্রতিদিন নয়, প্রতি মুহূর্ত্তে এগিয়ে গেছে—যেন এই তীর্থের দিকে। রায় বাহাদুর অপেক্ষা করেছেন, কামনা করেননি। মৃত্যু-কামনার মত দুর্ব্বলতা তাঁর নেই। কেন নেই সেও একটা আশ্চর্য্য। যৌবনকে তিনি আকণ্ঠ ভোগ করেছেন, জীবনের দাঁড়িপাল্লায় সুখ আর দুঃখ দুটোকেই সমান ভাগে ওজন করে নিয়েছেন, তাই। করুণা কিন্তু কামনা করেছে, নববধূর উৎকণ্ঠিত প্রত্যাশা নিয়ে। রায় বাহাদুর শোক করবেন? ডাক্তারের হিসেবে খুব বেশী ভুল হয়নি। করুণা মারা গেল রাত তিনটের পর। ম্যানেজার চোখ বুজলেন, ডাক্তার নিঃশব্দে উঠে গেলেন, বি-চাকরের দল কেউ ফুঁপিয়ে কাঁদলো, কেউ কাঁদবার ভাণ করে বেরিয়ে গেল। রায় বাহাদুর কাঁদতে পারলেন না, চুপ করে বসে রইলেন।

মনে পড়ছিল করুণার বিয়ের কথা। এ ইতিহাসটা তাঁরই নিজের রচনা, সেই জন্যেই এত বেশী করে মনে পড়ছিল। রায়বাহাদুরের চৌধুরী পরিবারের হাঁক-ডাক তখন সারা কলকাতায়। করুণের ঠাকুর্দ্দার নামের আগে ছিল রাজা খেতাব, পরে ছিল কে, সি, আই-ই। বাপ মস্ত বড় একটা বিলিতি ব্যাঙ্কের বেনিয়ান। রাস্তা ওপর রায় বাহাদুর যখন শুনলেন ছেলের নাম করুণ, তখনই তিনি মন ঠিক করে ফেললেন। করুণার মার কিন্তু ইচ্ছে ছিল না। তিনি বলেছিলেন, অত বড় সংসারে করুণা নিজেকে মানাতে পারবে না। তা ছাড়া—

'তা ছাড়া কি?'

'মেয়ে তো তোমার সুন্দরী নয়, ওরা পছন্দ নাও করতে পারেন।' করুণাশঙ্কর বলেছিলেন, আমার মেয়ে—ওই একটী মেয়ে। সুন্দরী হওয়া বা না হওয়ার কিছু যায় আসে না। বিয়ে ওইখানেই হবে।

এবং হয়েছিলও তাই। কিন্তু কি করে হয়েছিল সে ইতিহাস রায়বাহাদুরের নিজের রচনা। মেয়ে দেখার পর লোক-মুখে যখন শোনা গেল যে পাত্র-পক্ষ খুব খুশী হয়নি, তার মাসখানেক পরে রায় বাহাদুর হঠাৎ একদিন

অরুণাকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ভাবী জামাই আর শ্বশুরের মধ্যে সে দিন আহার-পর্বের ফাঁকে ফাঁকে ঠিক কি কথা হয়েছিল তা অবশ্য জানা যায়নি, কিন্তু দিন কয়েক পরেই খবর এসেছিল, চৌধুরীরা রাজী আছেন।

তারপর শুভকাজ সম্পন্ন হতে খুব বেশী দেরী হয় নি। রাজকীয় সমারোহ সেই অনুষ্ঠানটিকে স্মরণীয় করে তুলেছিল। গোরা পল্টনের ব্যাণ্ডের বাজনা, হাজার দশেক টাকার আতসবাজী, হাজার হাজার কাঙালী ভোজন, বহুদান, পণ্ডিত-বিদায়—কিছুই বাদ যায় নি। সেদিন অসংখ্য লোকের উত্তেজনার মধ্যে রায় বাহাদুরের গৃহিনী ছাড়া কেউ বোধ হয় অরুণার মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখেনি। খুশী হয়েছিল, অরুণা নিশ্চয় খুশী হয়েছিল, এত বড় বংশের ছেলের সঙ্গে বিয়ে—খুশী না হয়ে তার উপায় ছিল না। তবু ভয় করছিল, ভীষণ ভয় করছিল। এত বড় বংশ, এত চাকচিক্য বলেই ভয় করছিল। বাপমায়ের চৌধুরী বাড়ীতে তখন বড় বড় সাহেব সুবোধের নিয়ে বছরে অন্ততঃ পঁচিশটা ডিনার পার্টির যেওয়াজ, চাকর খানসামা ছাড়া নিজেদের মধ্যে দেশী ভাষায় কথা বলাটাও প্রায় গর্হিত। এর মধ্যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবে কি করে সেই ভয়টাই অরুণার মনকে সেদিন তোলপাড় করেছিল।

এবং খাপ খাওয়াতে সে পারেনি। এসবের প্রতি তার বিরাগ ছিল বলে নয়, ভালো লাগতো, খুব ভালো লাগতো তার এসব, তবু সে যেন কোথায় হারিয়ে যেত। এত উল্লাস, এত কলরব তাকে বিহ্বল করে ফেলতো। পারলো না, কিছুতেই সে পারলো না। পারবার ক্ষমতাই ছিল না তার মধ্যে। অরুণাও চেষ্টা করেছিল প্রায় পাঁচ বছর ধরে, নানাভাবে চেষ্টা করেছিল—তবু কিছু হোলো না। এই পাঁচ বছরের মধ্যে দুটি সন্তান এলো, তার পরেই অরুণা একেবারে ঘুরিয়ে গেল অরুণের কাছে। নিতে গেল।

কথাটা যখন করুণাময়ের কানে পৌঁছলো তখন গৃহিনী মারা গেছেন। কিন্তু গৃহিনীর কথাগুলো তাঁর মনে ছিল। মনে ছিল বলেই যেন তাঁর স্নেহ চেপে গেল। অরুণকে তিনি আবার ডেকে পাঠালেন। শ্বশুর-জামাইয়ের সে দিনের আলাপে বিশ্বস্ততা ছিল যত খানি, নাটকীয়তা ছিল তার চেয়ে বেশী। রায় বাহাদুর বললেন, কি খাবে? কচ্ না কড়াসী!

শেষেরটাই ভালো। —একটু অবাক হয়ে থাকার পর অরুণ বলেছিল। অরুণের হয়ে জানালেন আর নিজের জন্যে ব্রাণ্ডির ফরমাস দিয়ে রায় বাহাদুর বলেছিলেন: আমাদের দুপক্ষেরই টাকার অভাব নেই। কাজেই চক্ষু-লজ্জার পর্দাটা না থাকা ভালো।

তারপর শ্যাম্পেনের পেয়ালা আর ব্রাণ্ডির গ্লাস সামনে রেখে শ্বশুর-জামাইয়ের যে আলাপ চলেছিল তা এই:

—অরুণাকে তুমি ভালবাসতে পারবে না জানতাম, কিন্তু সুখে থাকতে যেমন মত ভদ্রতা আর আত্মসম্মান বোধ তোমার কাছে আশা করেছিলাম। বছরে পঁচিশ হাজার টাকায় মাসোহারা তার দাম হিসেবে খুব কম নয়।

—অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু আত্মসম্মানের কথাটা ভালো লাগলো না। কারণ ওটার বিচার আমরা করি পরের আদর্শ দিয়ে। আমি তাতে রাজী নই। আমি individualist আত্মস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস করি।

—সে-স্বাতন্ত্র্য বোধ তোমার স্ত্রীর প্রতি তোমাকে সুবিচার করতে বলে না?

—বলে যতক্ষণ প্রতিদানে কিছু পাওয়া যায়, ততক্ষণ। বিশ্বাস করুন, চেষ্টা আমি কম করিনি। একদিন আপনার মালোহারার ভয় ছিল। আজ সে ভয় কেটে গেছে। বাবা যারা গেছেন, সমস্ত সম্পত্তির মালিক আমি নিজে। ওটা বন্ধ হলেও আজ কিছু যায় আসে না।

—অন্ততঃপক্ষে চক্ষুলজ্জাটা তোমার থাকা উচিত ছিল।

—আপনিই বলেছেন, আমাদের মধ্যে ওটা অনাবশ্যক। কাজেই আরও একটু স্পষ্ট করে বলবো। খারাপ শোনাবে, কিন্তু রাগ করবেন না। নীতিজ্ঞান জন্মায় নৈতিক আবহাওয়ায়। আমি সে আবহাওয়ায় সুযোগ পাই নি। আমার ঠাকুর্দার কথা আপনি জানেন, তিনি বেশীর ভাগ বিলেতে থাকতেন। বাবা অবশ্য কলকাতার বাইরে যাননি। কিন্তু তাঁর ইতিহাসও খুব ছোট নয়। জীবনকে উপভোগ করতে হবে, এইটেই বরাবর শিখে এসেছি। শিখে এসেছি, যে-দেহটাকে নিয়ে দুঃখ-দুর্ভোগের অন্ত নেই, তার-কাছ থেকে যতটুকু আনন্দ পাওয়া যায় সেটা পুরোমাত্রায় আদায় করে নিতে হবে। যতক্ষণ সে ক্ষমতা আছে ততক্ষণ সেটুকু আদায় করে নেওয়াই ভালো।

এরপর অবশ্য রায় বাহাদুর কিছু বলা দরকার মনে করেন নি, বলতেও পারেন নি। অরুণের সঙ্গে তাঁর দেখাও হয় নি। অরুণা অবশ্য মাসে মাসে দিন কয়েকের জন্যে তাঁর বাড়ীতে এসেছে—কিন্তু দিন কয়েকের জন্যেই তার বেশী নয়। আজ, অরুণার মৃত-দেহের শিয়রে বসে রায় বাহাদুর অরুণের অধুনাতম চেহারাটা কল্পনা করবার চেষ্টা করছিলেন। এখনও কি ঠিক তেমনি আছে সে?

নিজের মনের মধ্যে ডুবে রায় বাহাদুর চোখ চেয়ে দেখলেন, ভোর হয়ে আসছে। অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে। রায় বাহাদুর উঠে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিলেন। ঘরের মধ্যে যে অস্পষ্ট অন্ধকারটুকু রইলো তার মধ্যে অরুণার মুখ কি আশ্চর্য আর পরিশ্রান্ত বলে মনে হতে লাগলো। এতদিনে তার সব শ্রান্তির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। রায় বাহাদুর কাঁদবেন?

ঘণ্টাখানেক পরে সিঁড়িতে অরুণের গলা শোনা গেল।

—এখুনি একজন নিউ মার্কেটে চলে যাও। ফুল আনবে, যতো পারো। আর ভালো যা শুধু তাই।

অরুণ যখন ঘরে এসে ঢুকলো রায় বাহাদুর মুখ তুলে চাইতে পারলেন না। অরুণ এসে অরুণার খাটের পাশে দাঁড়ালো। চেয়ে চেয়ে কি দেখলো তা সেই জানে। ক্ষণে একটা দীর্ঘশ্বাসও পড়লো যেন। তারপরও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে। বাইরে থেকে কে যেন ডাকলো। তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

উপর থেকে অরুণার মৃতদেহ নিচে নামিয়ে ফুল দিয়ে সাজানো হোলো। অঢেল ফুল, শুধু যা অরুণ আনতে দিয়েছিল তাই নয়, নানা জায়গা থেকে ফুল এসেছিল—তার ঘটাশঙ্কর বাজপেয়ী থেকে আরম্ভ করে, রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী পর্যন্ত সবাই ফুল পাঠিয়েছিলেন। এঁদের পাঠানো ফুলের সঙ্গে কালো বর্ডার দেওয়া একটা করে কার্ডও ছিল অবশ্য—কারা পাঠিয়েছে তার বিজ্ঞপ্তি।

বুড়ো ম্যানেজার তাদের নাম গুলো খাতায় নোট করে রাখছিলেন আর ফুলগুলো দিয়ে অরুণাকে সাজানো হচ্ছিল। রায় বাহাদুর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। মনে পড়ছিল অরুণার বিয়ের রাত। সেদিন আর আজ —এই দুটি দিন ছাড়া সে সমারোহের মাঝখানে আসতে পারেনি। কিন্তু রায় বাহাদুরের মনে হচ্ছিল এ শোক-উচ্ছ্বাস অরুণার জন্যে নয়। অরুণা অনেক আগেই মরেছিল। আজ যে মারা গেলো সে রায় বাহাদুর করুণাশঙ্কর মিত্রের মেয়ে আর রাজা শিবশঙ্কর চৌধুরীর নাতি-বৌ। শোকের উচ্ছ্বাস তাই এত বেশী। রায় বাহাদুরের কিন্তু হাসি পাচ্ছিল, অল্পঅল্প হাসি পাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, পরস্পরের ওপর অত্যাচার করে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকাটা অন্যায়, কিন্তু অনাবশ্যক হয়তো নয়। এতে মানুষকে কত বিচিত্র ভাবে চেনবার আর জানবার সুযোগ হয়। নিজের ভুলটা উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে রায় বাহাদুরের মনে হচ্ছিল, তিনি ঘরে থেকে বাড়ীর বাইরে আসা-যাওয়া কমিয়ে দিয়েছেন, তারপর শহর—এই কলকাতা শহরটা কি বিষম বিস্তীর্ণ হয়েছে, এত বেশী বড় হয়েছে যে কোথায় তার সুরু আর শেষ সেটাও তাঁর পক্ষে হিসেব করা শক্ত। শহর বেড়েছে, বড় হয়েছে। কিন্তু মানুষগুলো বোধ হয় আগের চেয়ে অনেক ছোট হয়ে গেছে।

রায় বাহাদুর নীতিবাগীশ নন। তাঁর সময়ও লোকে জীবনকে উপভোগ করতো। কিন্তু সেদিনের দুর্নীতির মধ্যেও কোথায় যেন অনন্যসাধারণ বলিষ্ঠতা ছিল। আজকের মানুষ বেশী সভ্য হবার সঙ্গে সঙ্গে বেশী দুর্বল হয়ে পড়েছে।

শোক-যাত্রার পূর্বে বহুপরিচিত ব্যক্তি জড় হয়েছিলেন চৌধুরীদের বাড়ীর বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে। ফুল দিয়ে ঢাকা অরুণার মৃতদেহ নিয়ে একদল লোক গেল শ্মশানের দিকে, একদল গেল না। রায় বাহাদুর রইলেন শেষের দলে। শববাহকরা প্রাঙ্গণ পার হয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়বার পর করুণাশঙ্করের পুরাতন বন্ধু আর নবীন মিত্র জিজ্ঞাসা করলেন, এবার কি করবে ভাবছো? উইল করে টাকাগুলো নাতিদের নামে লিখে দিয়ে কাশী কিম্বা হরিদ্বারে যাও।

রায় বাহাদুর একটুকু হাসলেন, তারপর বললেন, নাতি দুটোকে একেবারে ফাঁকি দেওয়া ভাল দেখাবে না। কিছু দিতেই হবে। বাকীটা ভাবছি—কুকুর-বেড়ালদের জন্যে একটা হাসপাতাল করবার জন্যে দান করে যাব।

আর নবীন একটু বিব্রত হয়ে বললেন, তামাসা হচ্ছে? নাতিদের দেবার পর আর বিশেষ কিছু থাকবে না বলো?

রায় বাহাদুর বললেন, তা, তেমন কিছু নয় বিশেষ। ও দু শালাকে বললাম করে দিলেও লাখ চল্লিশ থেকে যাবে।

সিঙ্গাপুরের কাহিনী

শ্রীশিরুপমা দত্ত

[গত মহাযুদ্ধের শেষ বারুদের গন্ধ এখনও বাতাস থেকে মুছে যায় নি, এখনও মাটী থেকে রক্তের সব দাগ ধুয়ে যায় নি।

সৈনিক-মানুষ যুদ্ধ-ক্ষেত্র থেকে বাড়ী ফিরে এসেছে, ঐতিহাসিক-মানুষ এখন সেই শ্মশানে গিয়ে হিসেব সংগ্রহ করছে···

বিংশ-শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রের ইতিহাস রচনা হচ্ছে।

সাধারণ মানুষ আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে থাকতেই চেষ্টা করি, যুদ্ধ যদি নিজেই ঘাড়ের-ওপর এসে পড়ে সে আলাদা কথা। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের বাইরে প্রেক্ষাগৃহে বসে যুদ্ধের নাটক দেখতে আমাদের মনে একটা স্বাভাবিক কৌতূহল আছে। হয়ত সেইভাবে আমাদের সাংগোপন-যুদ্ধ-তৃষ্ণা আমরা মিটাই।

তাই সিঙ্গাপুরের পতন-কাহিনীর এই প্রত্যক্ষ বিবরণ, আশা হয়, গল্পভারতীর পাঠকবর্গের আনন্দ বর্দ্ধনই করবে। এই কাহিনীর লেখিকা বাংলারই এক প্রবাসী কন্যা। সিঙ্গাপুরের পতনের শেষ কয়েক দিনের সঙ্গে এই তরুণী সাক্ষাৎভাবে জড়িত ছিলেন এবং সেই যুদ্ধ-বিভীষিকার মধ্যে আহত-সেবার কার্য্যে চীন, মালয় এবং স্থানীয় নারীদের সঙ্গে সমানে সংযুক্ত থেকে বাঙালী আধুনিকাদের মর্য্যাদাই বৃদ্ধি করেছেন। তাই মনে হয়, বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশিত সিঙ্গাপুরের এই প্রত্যক্ষ বিবরণ, বর্ত্তমান বাংলা-ভাষায় যুদ্ধ-সাহিত্যের অভাব কথঞ্চিৎ পূরীকরণ করতে সাহায্য করবে।]

সিঙ্গাপুর···প্রাচ্যে বৃটীশ-সাম্রাজ্যের প্রবেশ-দ্বার···বহুদিনের বহু চেষ্টায় বহু সামরিক আয়োজনে দুর্ভেদ্য, দুরধিগম্য···বজ্র-প্রতিরোধী দৌর-নিবেধ···

এই ধারণা, ধারণা কেন বিশ্বাস, জগতের সঙ্গে সঙ্গে সিঙ্গাপুরবাসী আমাদের মনে ইউক্লিডের P. D-র মত গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। তাই যখন পীত-আতঙ্কের ঢেউ প্রশান্ত সাগরে আলোড়ন তুলে ভারত-মহাসাগরের তটে এসে আঘাত করছিল, আমরা সত্যি সত্যি অন্তরে হতখানি বিচলিত হবার কোন কারণ খুঁজে পাই নি।

কিন্তু ক্রমশ ক্রমশ অন্তরের সেই সাহস একটু করে শিথিল হয়ে আসতে লাগলো, বিজ্ঞলোকেরা বলাবলি করতে লাগলেন, অভ্রান্ত সত্য বলে নাকি জগতে কোন কিছু নেই।

কথাটার যাথার্থ্য উপলব্ধি করলাম এ একচল্লিশ সালের ডিসেম্বর মাসে।

আন্তর্জাতিক আবহাওয়ার কেন্দ্র থেকে এই আকস্মিক আক্রমণ সম্পর্কে কোন সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী না প্রকাশ হলেও সমস্ত জন-সাধারণ—গরীব নিরক্ষর শ্রমিক থেকে সুপণ্ডিত রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা পর্যন্ত ক্রমশঃ হতাশ হয়ে চেয়েছিল ঐ মহাসমুদ্রের দিকে ভাবী প্লাবনের আশঙ্কায়।

এইভাবে মাসের (ডিসেম্বর) প্রথম ছ'দিন অতিবাহিত হোল।

সপ্তম দিন—রবিবার ; স্কুল-কলেজ-অফিস বন্ধ ; সকালেই সেদিন নিজেকে কিছু মুক্ত ম'নে বোধ করছিলাম। সকালবেলা—বৈঠকখানায় বসে সামনের পাতে চক্ষু অনন্তার পানে চেয়ে আছি, সংবাদপত্র-বিক্রেতা ছেলেটার তখনো দেখা নেই। বাবার এক বন্ধু এসে হাজির হলেন এই খবর নিয়ে যে—তাপান থেকে মিঃ কুরুসু অতিরিক্ত দূত হিসেবে ছাওদাই পথে রওনা হ'য়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ; এবং পূর্ব এশিয়ার উভয় জাতির ন্যায্য দাবী সম্পর্কে সম্প্রতি যে আলোচনা চ'লছে সেটা সুচারুরূপে সম্পন্ন করাই তাঁর এই যাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য। অতঃপর এই সম্বন্ধে সকলের নিজস্ব গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যে কক্ষটী মুখর হ'য়ে উঠলো।

পত্রিকাখানি হাতে আসতেই দেখি তাতে মোটা অক্ষরে ছাপা,—প্রভাতের তরুণ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের আশাপ্রদ বাণী—সিঙ্গাপুর হলো ব্রিটেনের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের ভিত্তিপ্রস্তর—দুরতিক্রম্য দুর্গ।

আশঙ্কিত মনটা খানিক শান্ত হ'লো ! ভাবলাম - থাক্, আমরা তাহ'লে নিরাপদে আছি—এই দুর্ভেদ্য কেল্লা ছুঁতে শত্রু নিশ্চিত সাহস করবে না।

বিকেলে সমুদ্র-তীরে বেড়াতে গেলাম, সেখানেও দেখি সেই ভাবি বিপদের ছায়া বিরাজমান। অদূরে একটী প্রকাণ্ড রণতরী বহর, একটী এয়ার-ক্র্যাফ্‌ট-ক্যারিয়ার থেকে খানকতক প্লেন উঠছে আকাশে তোঁ তোঁ শব্দে।

...রাত্রি দুটো...সারা সহর নিঝুম নিথর। হঠাৎ বজ্রপাতের ন্যায় বিকট আওয়াজ হতেই আমাদের ঘুম গেল ভেঙে...দেখি ছেলেদের শোওয়ার ঘরখানা যেন ঝঞ্ঝা-সমুদ্রে জাহাজের মত দুলছে ; ভাবলাম বুঝি ভূমিকম্প কিন্তু পরক্ষণেই "এক-এক" গানের ক্রমাগত কর্ণভেদী হুঙ্কার শুনতেই সে ভ্রম অপসৃত হল। শুনলাম বাবা ওঘর থেকে মাকে বলছেন—জাপান এবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে। জানলায় গিয়ে দেখি, রাস্তার দুপাশে গ্যাসের আলোগুলি সন্ধ্যারাতের মতই উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। আকাশের পানে চাইতেই অবাক হ'লাম—অনেকগুলি সার্চ্চ-লাইটের জ্যোতি চারিধারের খণ্ড খণ্ড মেঘগুলোকে ছুঁড়ে মোমাঞ্চগুলো ধরবার চেষ্টা করছে।

কয়েক মিনিট বাদে একে একে কামানগুলো নিস্তব্ধ হ'লো। কানে এলো নীচের তলা থেকে, হিন্দুস্থানী দারোয়ানটার উৎকণ্ঠিত কণ্ঠস্বর—বাবুসাব, বাবুসাব, লড়াই সুরু হো গিয়া। আমার হাতে binocularটা দিয়ে বাবা বল্লেন—দেখো তো, ওদিকে যেন আগুন লেগেছে বোধ হচ্ছে।

দেখি সত্যিই সহরের একধার থেকে ধোঁওয়া কুণ্ডলীকৃত হ'য়ে আকাশে উঠছে আর সেদিকের আকাশের রঙটা ঈষৎ লাল।

ভীষণ আহতে বুকটা যেন কেঁপে উঠলো।

সকালে বেতারে স্থানীয় কেন্দ্রটী পাওয়া গেল না। গত রাতে অপ্রত্যাশিত আক্রমণের ফলে কোন-একটী যন্ত্র বিগড়ে যাওয়ায় সেদিন প্রচার-কার্য্য কয়েক ঘণ্টা বন্ধ ছিল। যাই হ'ক, বি. বি সি. থেকে জানা গেল—গতকাল রাত্রি বারোটায় মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে জাপানের আকস্মিক সংগ্রাম ঘোষণার খবর—তার এক ঘণ্টার মধ্যে পার্লহারবার-ম্যানিলা-ব্যাংকক ও সিঙ্গাপুরে ব্যাপকভাবে বিমান আক্রমণ এবং উত্তর মালয়ে কোটাবারু নামক অখ্যাত বন্দরটীতে জাপানী সেনাবাহিনীর অবতরণ।

মহাবিস্ময়ে মাথা তো গেল ঘুরে!—তাহ'লে সত্যিই কী এই সুন্দর উপদ্বীপটী এবার রুধিরাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবে!

রাস্তা দিয়ে দলে দলে লোক ছুটছে যেদিকে গত রাত্তে বোমা পড়েছে। সেখানে গিয়ে দেখা গেল—সহরের সরকারী দপ্তরগুলির নিকটে তিনখানি ত্রিতল বাড়ী* হয়েছে শত্রুর লক্ষ্যবস্তু। Direct hit হওয়াতে একখানি বাড়ী একেবারে ভস্মস্তূপে পরিণত হ'য়েছে—বাকী দুখানির চারিধারের দেওয়াল ছাড়া আর কিছুই নেই।

এতদিন পর্য্যন্ত চীন ও প্রতীচ্যের বোমায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরবাড়ীর ছবি দেখেছি পত্রিকা ও চলচ্চিত্রে, কিন্তু আজ প্রত্যক্ষ দেখলাম তার অনন্ত আসল রূপ। শোনা গেল একটী সারা সংসার (স্বামী-স্ত্রী, তিনটী ছেলেমেয়ে—দুজন কি) ঐ ভস্মস্তূপের মধ্যে এখনো চাপা পড়ে আছে। বহুত মেয়ে পুরুষ কুলি সেই প্রকাণ্ড স্তূপ খনন কাজে ব্যস্ত।

ভয়ে সর্ব্বশরীর যেন শিউরে ওঠে—কে জানে, যে কোন মুহূর্ত্তে আমাদেরও হয়তো ঐ দুর্ভাগ্য ঘটতে পারে।

গত বারোটী ঘণ্টার মধ্যে শহরে সমস্ত লোকের জীবনে দেখা দিল এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন। প্রত্যেক পাড়ায় এ. আর. পি. ও এম এ. এস কোয়ার্টার প্রতিষ্ঠিত হ'লো; ওয়ার্ডেনরা গৃহস্থ বাড়ী গিয়ে strong shelter তৈরী করার সদুপদেশ দিতে লাগলো; দৈনিক সংবাদ পত্রগুলিতে ঐ সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা—বিমান-আক্রমণ সুরু হলে কী প্রকারে আত্মরক্ষা করতে হয় এবং আহতের কীরূপ বন্দোবস্ত করতে হয় ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে দফা দফা আলোচনা বার হোল।

এই কারণে বাড়ীতেও আরম্ভ হলো অনেক কিছু বাড়তি কাজ—প্রথমে সব আনাদা দরজার কাঁচের সার্শিতে, কাঁচের আলমারী ও টেবিলের ওপর আটা দিয়ে বাগদা ঝ্যাকড়া লাগানো—দেয়ালের ছবি খুলে রাখা—ওপর তলা থেকে যত সব ভারী আসবাব নীচে নামানো আর লাইব্রেরীর দামী বইগুলো নিরাপদ জায়গায় রাখা ইত্যাদি।

দু'একদিনের মধ্যে সৌখীন আসবাবে সুসজ্জিত ঘরগুলির মধ্যে দেখা দিল একটা বিশ্রী এলোমেলো ভাব—সুইয়িং মেসিন ও আমার টেবলটী এল তাঁদার ঘরে রিফ্রিজারেটরের পাশে; খাবার ঘরটী ভর্ত্তি হোল খাট

---

* এদেশে সাধারণত লোকেরা ইটের তৈরী বাড়ীর উপরতলায় সিঁড়ি ও ঘরের মেঝে কাঠে নির্ম্মিত—হাল আমল চীনেরা।

ওয়ার্ডরোব ও ড্রেসিং টেবলে, আর ছোটখাটো সামান্য জিনিষগুলো একটু ঝাড়ামোছার পর রেখে দালানে রাখা হোল। নীচে থেকে চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল—আমরা যেন সদ্য অন্য বাসা থেকে উঠে এসেছি।

ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে স্থানীয় সব স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হয়ে এক মাসের ছুটী চলছিল। আমার ভাই দুটি (সবু ও মিনু) অনেক আগে থেকে মতলব করে রেখেছিল কী ভাবে কাটাবে এই সুদীর্ঘ ছুটীটা আর আগামী ক্রীষ্টমাসেতে বাবার কাছে কী কী জিনিষের আব্দার করবে তারও একটা লিষ্ট করেছিল। কিন্তু অকস্মাৎ যুদ্ধ বাধায় ওদের হ'লো ভারী মুস্কিল,—দূরের জনহীন দ্বীপে পিকনিকে যাওয়া বা ফুটবল টেনিস খেলা সব কিছুই বন্ধ হয়ে গেল—দিনরাত বাড়ীতেই বন্দী। অথচ চুপচাপ ব'সে থাকাটাও ওদের স্বভাব-বিরুদ্ধ; খালি আলমারী টেবিল চেয়ারগুলো ওদের বেশ খেলার বস্তু হয়ে দাঁড়ালো। আমাদের দরকারী জিনিষ নিরাপদ স্থানে রাখা দেখে ওরাও নিজের ব্যাট-বল-ষ্টাম্প, এলবাম ও স্কাইটিং কিপের এক্সেসরিজগুলি এনে ভালো জায়গায় রাখলো।

আমাদের বাড়ীর পিছনে ও সামনে ছিল উঁচু পাহাড়শ্রেণী (১০০০ ফিট) পাড়ার সব ভদ্রলোকেরা মিলে পাহাড়ের সব চেয়ে বড় গুহাটীতে একটী সুদৃঢ় শেল্টার তৈরী করতে মনস্থির করলেন। কাজও সুরু হ'ল দুদিনের মধ্যে এবং কাজে চাইনীজ কুলী নিযুক্ত করা গেল সন্ধ্যা সাতটা পর্য্যন্ত। সময়টা শেষ হ'তে তিন হপ্তা লাগে। সকলের সুবিধার জন্যে ভেতরে ইলেকট্রিক লাইট ও ফ্যান লাগানো হয়। ঐ সময় যতবার হাওয়াই আক্রমণ হয়, আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম নীচের সিঁড়ির তলায়।

এই সময় পাড়ার এ, এ, এস কেন্দ্রটীতে অনেকগুলি শুশ্রূষাকারিণীর দরকার হয়; প্রতিবাসীনীদের মধ্যে অনেকেই স্বেচ্ছায় সেবাব্রত গ্রহণ করলেন। আমার প্রচুর অবসর দেখে এক বন্ধু আমাকেও অনুরোধ করলেন ঐ দলে যোগ দিতে। আমার মোটেই আপত্তি ছিল না—বরং খুসীই হলাম দুর্দ্দিনে অসহায় আহতদের সেবায় লাগতে পারবো ভেবে। অনেক ক'রে বাবা-মার অনুমতি পেয়ে একদিন স্বেচ্ছাসেবিকার দল-ভুক্ত হ'লাম। আমাদের ক্যাম্পএর ভার গ্রহণ করেন দুজন বিচক্ষণ ডাক্তার (ডাঃ ব্রুক ও ডাঃ থম্পসন্) পেত্তাং বিকে হাওয়াই আক্রমণের ফলে শহরের বিশেষ ক্ষতি হয়নি—আমাদের কিছুই কাজ ছিল না—আমাদের গ্রুপের ডিউটি ছিল সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটে পর্য্যন্ত; প্রত্যহ ঐ সময়টা কাটতো কাই-এড-পুস্তিকা অধ্যয়নে কিংবা গল্প-গুজবে।

এদিকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে জাপানীরা কোটাবাক্ দখল করলে, এবং বন্যার জলের বেগে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো।* এদেশে যুদ্ধের সরঞ্জাম অনেক কিছু ছিল সত্য কিন্তু আধুনিক যুদ্ধ-কৌশলে যে শক্তিটার প্রভাব সব চেয়ে বেশী, সেই বিমানবহর (air force) নাকি একেবারেই ছিল না। মাত্র মাসখানেক পূর্ব্বে জার্মান বাহিনীর পথরোধ করতে এদেশ থেকে তিনের চারাংশ বিমানবহর পাঠানো হয় সুদূর উত্তর আফ্রিকায়। অথচ জাপানের তখন হাওয়াই শক্তি অপরিমেয়।

সন্তরক্ষ সারাবাক ও ইন্দোচীনের হাওয়াই আড্ডাগুলি থেকে জাপানী বোমারু এদেশের বিভিন্ন স্থান প্রত্যহ আক্রমণ করতে লাগলো।

---

* বাদরের যুদ্ধে জাপানীরা প্রতি দিন মুড়ি কিলোমিটার গতিতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হ'য়ে আসে।

৯ই তারিখে ঘটল এক অতি শোচনীয় ঘটনা—ব্রিটেনের সর্বশ্রেষ্ঠ রণতরী Prince of Wales (35000 ton) ও একটী ক্রুজার Repulse (32000 ton) প্রভৃতি জাপানী হাওয়াই আক্রমণের ফলে মালয়ের পূর্ব-উপকূলে অসময় হলো। ঐ দুটী জাহাজের এগারো-শো জন লোকের মধ্যে মাত্র একশো পঞ্চাশ জন রক্ষা পেয়েছিল। বাকী লোকের সঙ্গে ফ্লিট এডমিরাল টম ফিলিপসও মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কোটাবারু অধিকার করলেও আমাদের ধারণা ছিল যে, এদেশ যখন এত দৃঢ়ভাবে সংরক্ষিত, তখন জাপানীরা বেশী দূর এগোতে কখনই পারবে না—অবশেষে পিছু হটতেই হবে। কিন্তু ব্রিটেনের গর্ব প্রিন্স-অব-ওয়েলসের অসময় হওয়ার খবরটা কানে আসতেই সে-আশা চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে গেল;—হতাশ হয়ে ভাবতে লাগলাম—তবে কী আমরা এতদিন মিথ্যা প্রতারিত হ'য়ে এসেছি···শত্রুকে প্রতিরোধ করার জন্যে এদেশে এক হাজার হাওয়াই কেল্লা (Flying Fortress) রাখার চুক্তি কী ভাঁওতা ছিল? ···সম্প্রতি ক্রুক পপ্‌হামের এখানকার আত্মরক্ষা মূলক সাজসরঞ্জাম পরিবর্তন করে বিশেষ সম্ভোষ প্রকাশটা কী নিছক একটা রাজনীতিক চাল?

হপ্তা খানেকের মধ্যে জাপানীরা উত্তর মালয়ের অনেকগুলি রাজ্য দখল করে নিল। শঙ্কিত জনসাধারণকে উৎসাহিত করার অভিপ্রায়ে প্রধান সেনাপতির শিবির থেকে একদিন এই বিবৃতি প্রকাশ করা হোল—গত চারদিন যাবৎ প্রচণ্ড যুদ্ধের পর শত্রুসৈন্য···সরতেই বাধ্য করেছে। আমাদের বাহিনী অবশ্য অবশেষে পেরাক নদীর* এপারে এসে পৌঁছেছে এবং নদীর সেতু দুটি উড়ে ফেলা হ'য়েছে। এপারে তারা একটী সুদৃঢ় ঘাঁটী তৈরী করছে শত্রুকে পাল্টা আক্রমণ করার অভিপ্রায়ে।

দক্ষিণ মালয়ে শত্রু এগিয়ে আসার সঙ্গে সিঙ্গাপুরের উপর বিমানহানার মাত্রাও বাড়লো। প্রত্যহ তিন চার বার করে শত্রু বিমান আসার ফলে সাইরেনগুলি জানাতো। যুদ্ধের প্রথম স্তরে সহরের বাইরে সামরিক লক্ষ্য-বস্তুগুলি সাধারণতঃ তারা ধ্বংস করে যেতো এবং সে সব স্থানে যে সব শ্রমিকরা খাটতো তাদের মধ্যে অনেকেই হতাহত হোত। প্রাণের ভয়ে বহু শ্রমিক ঐ সব বিপদসঙ্কুল স্থানের কাজ ছেড়ে দেয়; কিন্তু প্রচুর কয়েকগুণ বেশী বেতনের প্রলোভন দেখাতে আবার তারা ফিরে আসে কাজে। অবশেষে টাকার লোভে পড়ে বেচারীদের অনেকেই হতাহত হ'তে লাগলো।

উনিশে ডিসেম্বরে মালয়ের অন্যতম বৃহৎ বন্দর পিন্যাং জাপানীরা দখল করে। চারদিন পূর্বে পিন্যাং-এর উপর তারা এত ভীষণ বোমাবর্ষণ করে যে সেদিন অনেক বেসামরিক নিহত হয়। আমাদের অনেক পুরোন বাঙালী বন্ধুও সেই রেডে মারা যান। জাপানীরা পিন্যাং সহরে পৌঁছাবার দুদিন আগেই ব্রিটিশ সৈন্য সেখান পরিত্যাগ করে দক্ষিণ দিকে সরে আসে। এবং আসার পূর্বে সেখানকার ইলেকট্রিক-পাওয়ার-ষ্টেশন, পানীয় জলের মেন পাইপ লাইন ও বন্দরের অনেক কিছু কল-কারখানা ও প্রিন্টিং প্রেসটী একেবারে নষ্ট করে দেয়।

হপ্তা দুই পরে ভারত থেকে কয়েক বাহিনী টাটকা সৈন্য এল এবং সেই সঙ্গে পর্যাপ্ত মাল-মশলাও এলো। নিম্ন-নিম প্রদীপে অকস্মাৎ একটু তৈল প্রদান করা হলো। স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশ হয়ে গেল যে ভারী

---

* উক্ত নদীটীর যে অংশে জাপানীরা অতিক্রম করে সে জায়গায় জল বারো মাস infested with crocodiles—তবে সৈন্যগুলো সাঁতার দিয়ে পার হয়।

তাগী মন্তব্য—আর আমরা শত্রুকে সামনে এগোতে দেবো না—এবার তার পরাজয় অনিবার্য। এই মন্তব্যটী প'ড়ে অনেক চাইনীস ভদ্রলোক গম্ভীর ভাবে বল্লেন—কথাটা নেহাৎ উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়; এর মধ্যে কিছু গভীর অর্থ নিহিত আছে। প্যাসিফিকের ওপারে সুদূর যুক্তরাষ্ট্রের অধিপতির সঙ্গে ব্রিটীশ প্রধান মন্ত্রীর যে আলোচনা উপস্থিত আবহা হয়েছে, তা নিশ্চয়ই এই দুর্গটীকে কেন্দ্র করে। নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করে তিনি আরো বল্লেন, একটী reliable source থেকে খবর পেইছি যে দু-একদিনের মধ্যে U. S. A. থেকে শ'চল্লো Flying Fortress এখানে এসে পৌছাবে। আশাপ্রদ খবরটী পেয়ে সোৎসাহে আকাশের পানে চাইনি যে তা নয়।

নবাগত বাহিনীগুলিকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে শহরের অনেক জায়গায় তাদের ছাউনি করা হোল। শত্রুর লক্ষ্য-সন্ধানী প্লেন যে দূর অন্তরীক্ষ থেকে তা দেখতে পেয়েছে সে-কথা কেউ জানতেও পারলো না। ফলে তার পরের দিন ডি-ফরমেশনে এক ঝাঁক জাপানী বোমারু এসে শহরের ওপরে চক্র দিতে লাগলো—অমনি আরম্ভ হোল প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ। সেদিন অনেক নিরীহ লোক হতাহত ও আশ্রয়হীন হল। এই দেখে জনসাধারণের মধ্যে হ'ল ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি! অনেকে মনস্থ করলো শহরের বাড়ী ছেড়ে দূরে পাহাড় জঙ্গলে-ঘেরা ক্ষুদ্র গ্রামে উঠে যেতে। সরকারও তাদের আবেদন গ্রহণ করলেন। দেখতে দেখতে অনেকে সপরিবারে চলে গেলেন পল্লীগ্রামে—শহরের বাড়ীতে তালা দিয়ে।

আমাদের পাড়াটি প্রায় খালি হয়ে গেল। পথে কোন পরিচিতের সাথে সাক্ষাৎ হলে, 'কেমন আছেন' এর পরিবর্তে 'কবে ও কোথায় উঠে যাচ্ছেন'-টাই এখন সাধারণ আলাপ হয়ে উঠলো।

আমাদের সেন্টারটী নির্দ্দিষ্ট সময়ে তৈরী হ'য়ে গেল। চারিদিকের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে তারা স্থির করলেন যে এই জায়গায় থাকাই বেশী নিরাপদ। ঐ সব পাহাড়ী পল্লীগুলিতে হাওয়াই হানার সম্ভাবনা কম থাকলেও ডাকাত দস্যুর ভয় প্রচুর।

কয়েকদিন বাদে সেই পল্লী অঞ্চলেই একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। কোন একটী পাহাড়ী পল্লীতে ভুলক্রমে জাপানী বোমারু একদিন কয়েকটী বোমা নিক্ষেপ করে। ওখানকার বাংলো বাড়ীগুলি সাধারণতঃ কাঠ ও আতাপ (বাংলার হোগলার মত) খড়ে তৈরী; সুতরাং আগুনে-বোমাতে তাদের ঘরের মত অনেকের বাড়ীঘর পুড়ে ছাই হোল। প্রাণের বিশেষ ক্ষতি না হলেও কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য জিনিস-পত্র অনেকেই হারিয়েছিল। ফলে আমাদের পাড়ার অনেকে আবার স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন।

ক্রমে খ্রীষ্টমাস এল। এদেশে খ্রীষ্টানরা সংখ্যা-লঘিষ্ঠ হলেও প্রতি বছর এই উৎসবে সকল ধর্ম্মের লোকেই যোগ দেয় ও প্রচুর আনন্দ উপভোগ করে। গত বছরের মত এই বিরাট আনন্দ-উৎসব এবার আর জনসাধারণকে আকৃষ্ট করলো না। বাগান পরিষ্কার করা···গাছ ছাঁটা···বাড়ী সাজানো···জানলা দরজায় রঙ-বেরঙের রেশমী পর্দ্দা লাগানো ও দোকানে গিয়ে নানারূপ উপহারের দ্রব্য ক্রয় করা ইত্যাদি কাজে কাউকেই বিশেষ ব্যস্ত দেখা গেল না। কোথায় গেলে এই বিধ্বংসী বোমার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়—এই যেন সকলের প্রধান চিন্তার বিষয়।

আমাদের বাড়ীর কাছেই ছিল চাইনীজদের মেথডিষ্ট চার্চ্চ।···সকাল থেকে সেদিন বহু লোক এল এই ভক্তদিনের ক্যাম্পে যোগ দিতে। সকালে বিমান হানা হয়নি। দুপুরে একদল তর্ষি শ্রোতৃবর্গের সামনে বিশপ যখন বাইবেলের ব্যাখ্যা করছিলেন—শোনা গেল হঠাৎ সাইরেনের আর্ত্তনাদ। উপাসনা-রত জনতার মধ্যে কিছু চাঞ্চল্য দেখা গেল না। একটু বাদে এলার্ম ঘন্টা বাজল। এ. আর. পি ওয়ার্ডেনরা লোহার টুপি পরে গ্যাস-মাস্কের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে পথে বার হোল। পথচারীদের থামিয়ে Take shelter please বলতে লাগলো। সকলেই সভয়ে আকাশের পানে চেয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছোটে পথের ধারে আধ-হওয়া সেল্টারে, নিকটবর্ত্তী কোন মাঠে, ট্রেঞ্চে বা রাস্তার দুপাশের পাঁচ ফুট গভীর ড্রেনে। গির্জ্জা থেকে কেউ বার হয়নি দেখে ওয়ার্ডেনরা সেখানে গিয়ে সকলকে সত্বর নীচের সেল্টারে আশ্রয় নিতে অনুরোধ করে। কিন্তু দুচারজন ছাড়া কেউই সে কথায় কর্ণপাত করলে না। ধর্ম্মগ্রন্থ খানি বুকে চেপে ধরে অনেকে বল্লে—এমায়গা এখন সেল্টারের চেয়ে ঢের বেশী নিরাপদ—তোমরা যাও। অগত্যা তারা ফিরে এল। গির্জ্জার করুণ কণ্ঠে প্রার্থনা গান সুরু হোল। এক-এক গানের আওয়াজ কয়েকবার শোনা গেল। সে-যাত্রা সহরের কোন অংশে অতি হয়নি।

এই সময় শত্রুর হাওয়াই-হানা ভীষণ ভাবে বাড়তে আরম্ভ করে। আমাদের সেল্টারটী তৈরী হ'লেও প্রবেশদ্বার ও সামনে মাটীর প্রাচীর তখনো হ'তে বাকী। তদ্ভিন্ন বিমান-আক্রমণ আরম্ভ হোলে কেউ আর বাড়ীতে থাকতো না—পাহাড়ের তলার কোপে গিয়ে আশ্রয় নিতো। পাহাড়ের পেছনেই ছিল একটা ছোট কুঁড়ে ঘর। রেডের সময় আমরা তার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিতাম। বাড়ীর দরজার তালা দিয়ে দারোয়ানটা পাহাড়ের পাশের খোলা মাঠে গিয়ে উপুড় হ'য়ে শুয়ে থাকতো। তার এক বন্ধু (ওয়াঙ্গেন) তাকে এই উপদেশ দেয়-যে, এভাবে মাটীতে শুয়ে পড়লে কোন রকম চোট লাগতে পারে না। তার এতে অখণ্ড বিশ্বাস। আমরা হুমায় বারণ করলেও সে প্রথমে গ্রাহ্য করত না। কিন্তু যেদিন এক-এক কামানের গোলার ভেতরের তিন পাউণ্ড ওজনের একটী লোহার টুক্রি এসে তার কাছে পড়লো সেইদিন থেকে সে ঐ খোলা মাঠে আসা বন্ধ করে!

দিনের বেলা বিমান-আক্রমণ আরম্ভ হ'লে আমাদের ভীষণ দুর্ভাবনা হোত, বাবার জন্যে। ওঁর অফিস তখন ছিল ঘাঁপের উত্তরাংশে, শহর থেকে আট মাইল দূরে। অফিসের বিল্ডিংটা ছিল একটা উঁচু পাহাড়ের ওপর এবং অনেক কিছু সামরিক দ্রব্য সেই ক্যাষ্টরীতে তৈরী হোতো। সুতরাং সেটী যে শত্রুর লক্ষবস্তু সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। জাপানী বোমারুগুলো সাধারণতঃ ঐ দিক থেকে বোমা ছাড়তে ছাড়তে শহরে এসে ঢুকতো।

পাহাড়ের মধ্যে সুড়ঙ্গ কেটে খুব মজবুত সেল্টার তৈরী করা হ'য়েছিল এবং ক্যাষ্টরী ছাদের ওপর গুলন spotter নিযুক্ত করা হয়। তবে অন্যান্য কারখানার ন্যায় ওদের ক্যাষ্টরীতেও একটী ভারী অদ্ভুত আদেশ জারী করা হয় যে, শত্রুর বিমান ক্যাষ্টরীর কাছাকাছি না আসা পর্য্যন্ত কেউ যেন সেল্টারে না প্রবেশ করে। এটা অবশ্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের নয়, শুধু শ্রমিকদের জন্যে। গরীবের শ্রমে গড়া ঐশ্বর্য্যে গর্ব্বিত প্রভুদের কাছে বেচারী শ্রমিকদের জীবন যে কত তুচ্ছ ও উপেক্ষার বস্তু এই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রায় রোজই বিমান-আক্রমণ হয়ে গেলে, বাবা টেলিফোনে তাঁর খবর দিতেন এবং জিজ্ঞাসা করতেন আমরা কীরূপ উপভোগ করলাম।

পয়লা জানুয়ারী নতুন বছরের প্রথম দিনটী অন্য দিন গুলির মতই মিলিয়ে গেল। শত্রু একে একে উত্তর সাগরের সাতটী রাজ্য দখল করলে। এবার অষ্টমটীর সীমান্ত অতিক্রম করেছে। এর রাজধানী লেয়াবচ্যাব্ এখান থেকে মাত্র একশো পঁচিশ মাইল—হাওয়াই জাহাজে মাত্র পনেরো মিনিট লাগে পৌঁছাতে। সুতরাং এখন শত্রুর হাওয়াই-হানা আরো বাড়লো—চার পাঁচ বার হানার কম কোন দিন যায়নি। কিন্তু মানুষের মধ্যে সব রকম অবস্থাকে সহজ ভাবে গ্রহণ করার একটী অতি রহস্যময় শক্তি নিহিত আছে। বিবিধ দুর্ভাবনায় জর্জ্জরিত থাকা সত্ত্বেও সকলের দিন এক রকম কেটে যায়। সাইরেনের আওয়াজ কানে আসা মাত্র লোকে আর তেমন আঁৎকে ওঠে না; বাজার-দোকান-হোটেল-সিনেমা সবই আগের মত খোলা এবং মনটারও অভাব নেই। বাজারে গিয়ে রেড আরম্ভ হ'লেও তরী-তরকারী না কিনে কেউ বাড়ী যেতেনা। একদিন রাত্রের রেডে একটী জনতা-ভর্ত্তি সিনেমা হাউসে বোমা পড়ে ও বহুলোক হতাহত হয়।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে (৬ই জানুয়ারী) স্কুল খুললো। প্রথমে অনেক দিদিমণী যেতে আরম্ভ করে। কিন্তু একদিন সকালে একটী হানীয় স্কুলে শত্রু বিমান বোমা নিক্ষেপ করে এবং খোলা মাঠে খেলায় রত ছেলেদের মেশিনগান্ করে—অনেক ছেলে হতাহত হয়। তারপর অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের আর স্কুলে পাঠাতে রাজী হন না। বাধ্য হ'য়ে স্কুলগুলি বন্ধ হ'য়ে যায়। সারা বছর পরিশ্রম করার ফল কোন ছেলে মেয়েই উপভোগ করতে পারলো না। এই আকস্মিক সংঘর্ষণ এনে দিল তাদের জীবনে এক অভাবনীয় বিরাট পরিবর্ত্তন ও ক্ষতি।

শত্রুর হাত থেকে এদেশকে বাঁচানো অসম্ভব মনে করে এইবার বহুত ভারতবাসী চাইনীস এবং প্রায় সব ইউরোপীয় মেয়েরা ছেলেপুলে সহ জাহাজ যোগে ভারত কিম্বা অষ্ট্রেলিয়া অভিমুখে পালাতে সুরু করলেন। যাঁরা অপেক্ষাকৃত ধনী তাঁরা গেলেন বিমান যোগে। * যে সব মেডামরা সওদাগরী অফিসে কাজ করতেন, তাঁরাও একে একে অফিসের ভার অন্য কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত করে স্ত্রীদের অনুসরণ করলেন। বিদায় নেওয়ার সময় কর্ম্মচারীদের দু তিন মাসের বেতন দিয়ে বল্লেন—আমরা যে মাসের প্রথমেই ফিরবো—তোমরা পাবড়ে যেওনা—ঠিক কাজ চালিয়ে যাও—শত্রু হারবেই।

গভর্ণমেণ্ট সার্ভিসে যাঁরা ছিলেন তাঁদের অবশ্য থাকতেই হোল। চাইনীদদের মধ্যে যাঁরা পালালেন তাঁদের মধ্যে দেশীয় তাপেরই বোমার চেয়ে জাপানীদের ভয় বেশী।

এক চাইনীস বন্ধু বিদায় নিতে এসে বল্লেন—আমার প্রাণ মোটেই যেতে চাচ্ছে না যাদের বড় ভালবাসে তাদের পিছে ফেলে—তা'ছাড়া আমাদের ঐ সাজানো বাড়ীটা ছেড়ে যেতে মনটায় ভারী লাগছে—কী সুন্দর আমাদের বাগানটা ভাই—কত কষ্ট করে অর্কেটি গাছগুলো তৈরী করা হয়েছে! সহানুভূতি সহ ন্যায়—বাস্তবিক বর্ত্তমান পৃথিবীতে বেঁচে থাকাই মহাপাপ; তবে মানুষের ভাগ্য বড় রহস্যময়। হয়তো মাস চারেকের মধ্যে ব্যাপারটা বদলাতে পারে। গতরাত্রে প্রধান সেনাপতির বেতার-বাণীতে জানলাম,—

---

* মালয় উপদ্বীপটী নয়টী করদরাজ্যে বিভক্ত; রাজাগুলির নাম:—পেরোর, পাহাং, নেগ্রিসেম্বিলান, পেরাক, সেলাঙ্গোর, পার্লিস, কেডা, এলাসু ও কেলানটান্।

মালয়ের প্রতি-ইঞ্চি জমির জন্যে এঁদের (ব্রিটীশ) সৈন্য রীতিমত লড়াই করবে। তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বন্ধু বল্লেন—ওসব মন-ভোলানো কথা। ফ্রান্স, নরওয়েতে কী হ'ল? এখানেও তার পুনরাবৃত্তি হবে। অবশেষে অসহায় জাপানীদের হাতে অত্যাচারিত হবে এদেশের নিরীহ লোকগুলো!—সেই জন্যেই তো আজ আমরা পালিয়ে যাচ্ছি।

বন্ধু বিদায় নিলেন; তাঁর কথাগুলো মনটাকে আলোড়িত করলে। এই সময় এখানকার অনেকগুলি বাঙালীও দেশে রওনা হলেন। চারিপাশের বিপর্য্যয় অবস্থা দেখে আমাদেরও দেশে যাওয়ার সব বন্দোবস্ত করা হোল। জানা গেল, জন পিছু একটি ছোট সুটকেস ছাড়া আর কোন লটবহর নেওয়া যাবে না। চারিদিন বাদে খবর এল—তিনখানি যাত্রীবাহী জাহাজ বঙ্গোপসাগরে শত্রুর হাওয়াই আক্রমণে জলমগ্ন হ'য়েছে, এক হাজার জন যাত্রীর মধ্যে মাত্র একের চারাংশকে রক্ষা করা গেছে। শুনে তো সব চক্ষুস্থির হলাম এবং বাংলার নিরাপদ তীরে ফিরে যাওয়ার ব্যাকুল-স্পৃহাও কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। মা বলেন—অকূল সমুদ্রে ছেলেপুলে নিয়ে ডুবে মরার চেয়ে, মাটির ওপরে এসব কষ্ট সহ্য করাই ভালো।

দশ তারিখে জানা গেল—এই বার সিঙ্গাপুর দ্বীপটীকে শত্রু সাবমেরিন ও যুদ্ধ-জাহাজে অবরুদ্ধ করে ফেলেছে। বাইরে থেকে কোন খাদ্যদ্রব্য বা যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম এখন জল দিয়ে আসা সম্পূর্ণ অসম্ভব। খাদ্যদ্রব্যের অবশ্য কোন অভাবই তখন ছিল না। ক'বছর আগে থেকে এই ভাবী অবরোধের আশঙ্কায় গভর্ণমেণ্ট চারবছরের উপযোগী খাদ্যের ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু এদেশে মজুত করে রেখেছিলেন। লড়াই সুরু হ'লে গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণকে উপদেশ দেন প্রচুর পরিমাণে খাদ্যের জিনিস ক্রয় করে নিরাপদ স্থানে রেখে দিতে।

সিঙ্গাপুরকে "প্রাচ্যের জিব্রাল্টার" বলা অসঙ্গত নয়। সমুদ্র দিয়ে এ দুর্গ বেষ্টন করা যথার্থই কল্পনাতীত ছিল। এর চারিপাশের জলের তলায় বিছানো ছিল মাইনের অদৃশ্য ফাঁদ এবং এর চতুষ্পার্শে যে-সব অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ ছড়িয়ে আছে তার মধ্যে উপযুক্ত দ্বীপগুলিতে বড় বড় কোষ্ট ব্যাটারী লাগানো ছিল। কামানগুলোর রেঞ্জ দশ মাইলের অধিক। উক্ত দ্বীপগুলির মধ্যে পুলোব্রানি, ব্লাকাং মাতি, সেট জন আইল্যাণ্ড, পুলো বুকোম ও পুলো উবিন—এই দ্বীপ গুলিতে ছিল সৈন্যের ঘাঁটী ও হাওয়াই আড্ডা। দক্ষিণ দিকের সমুদ্র দিয়ে সিঙ্গাপুর যে অপরাজেয় জাপান তা জানতো; তাই প্রথমে সে প্রবেশ করে উত্তর-দিকের উপকূল দিয়ে। এবং সিঙ্গাপুর আত্মসমর্পণ করার এক হপ্তা পরে জাপানী-যুদ্ধ-জাহাজ প্রথম এই দ্বীপের উপকূলে নোঙর করে।

জাপানীরা ক্রমশঃ এগিয়ে আসতে লাগলো। একদিন সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হোল এক নোটীশ—শত্রু খুব শীঘ্রই "পুলো ওনোং রিজার্ভয়ের" দখল করবে—জনসাধারণ যেন যথাসম্ভব কম জল খরচ করে ও যথেষ্ট পরিমাণে জল সঞ্চয় করে রাখে; যে কোন মুহূর্ত্তে জল বন্ধ হ'য়ে যেতে পারে।—এখানে ব'লে রাখা দরকার কী উপায়ে সিঙ্গাপুরের লোক পানীয় জল পায়। সিঙ্গাপুর দ্বীপের মধ্যে পানীয় জল (Fresh water) পাওয়া যায় না। এখান থেকে ত্রিশ মাইল দূরে মেনল্যাণ্ডে অবস্থিত "পুলো ওনোং" রিজার্ভয়ের থেকে পাম্প করে সিঙ্গাপুরে জল পাঠানো হয়। সিঙ্গাপুরের উত্তরপ্রান্তে যাকি-বিচি রিসার্ভয়ারে সেই জল

এসে জমে। পুলো গুলোর থেকে ব্যাক-বিচি পর্যন্ত দুটী পাইপ লাইন; একটী এসেছে মাটীর ওপর (surface pipe line) দিয়ে, অপরটী মাটীর তলা (underground pipe line) দিয়ে। মাটীর ওপরকার পাইপটী স্থানে স্থানে মোষের ঘাড়ে ঘেঁড়ে যাওয়ায় সেটী দিয়ে আর বেশী জল আসছিল না, সুতরাং সারের জলের প্রেসারও অর্দ্ধেকের বেশী কমে গেল। আমাদের বাড়ীতে কোন চৌবাচ্চা ছিল না, দুটো বেনজিনের ড্রামে জল ধরে রাখা হ'ল। রান্নাঘরে যতগুলো ঘড়া-ঘটী-বালতি ছিল সেগুলো সব ভরে রাখা হ'ল খাবার জল। বাইরে পথের ধারে যে একটা ট্যাপ ছিল তার সামনে ঠিক ভিখারীর মতো লোক জমে গেছে—সারাদিন ধরে লোকে অনবরত বালতি পুরে জল নিয়ে যাচ্ছে।

বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার পর থেকে ব্ল্যাক-আউট সম্পর্কে খুব কড়া আইন বার হ'ল—রাত্রে যেন কোন বাড়ী থেকে আলোর ক্ষীণ রশ্মিটুকুও না দেখা যায়।

এই ব্যাপারে মহা অসুবিধায় পড়লেন, রঙ্কন-প্রিয়া ভাটপাড়ার গৃহিণীরা। সন্ধ্যার সময় সাধারণতঃ সকলে রান্না সুরু করেন কিন্তু কালো ফেড়ে ঢাকা বাড়ির ক্ষীণ আলোয় তরকারীর বর্ণ নজরে আসাই শক্ত—অথচ চিরকালের অভ্যাসটা এক নিমেষে বদলাতেও মন চায় না। সুতরাং, সকলেই এখন বেলা থাকতে রান্না শেষ করে ফেলেন। ফেডের অনিশ্চয়তা হেতু সন্ধ্যার আগে আহারাদিও শেষ করা হয়। রাত্রি আটটার মধ্যে সারা শহরটী হয় শ্মশানের মত নীরব ও জনহীন।

এই সময়ে একটী বাড়ীর এক অবিস্মরণীয় ঘটনার কথা বলি—

সেদিন ভোরেই ভাদুমাসী মঙ্গলবার। সারাদিন ধরে ভীষণ বর্ষা—সন্ধ্যার পর তার মাত্রা যেন আরো বৃদ্ধি পায়; রাত্রি তখন ন'টা; ভাই-বোনেরা অকাতরে ঘুমিয়ে আছে; আমরা সকলে শুনছি বেতারে একটী বিচিত্রার অনুষ্ঠান। সকালে মাত্র একটী বার ফেড হয়—আমি ছিলাম তখন ক্যাম্পে—সারাদিন চুপ-চাপ গেছে। রাত্রে ভাবলাম এই ক্রমাগত বৃষ্টিতে নিশ্চয়ই শত্রুর প্লেন আসতে সাহস করবে না—যে চিকুর হানছে তাতে প্লেন আগুন ধরে যাবে। কিন্তু শত্রু-প্লেনগুলি সাহসে যে ঈগলের সমতুল্য তা জানতাম না। হঠাৎ সাইরেনের আর্ত্তনাদ···সকলেই তো অবাক···বিচিত্রার অনুষ্ঠান গেলা ঘুরে গেল।

পরে ওয়ার্ডেনদের বুটের মদমদ্ শব্দ·· কাছের জানালার ফাঁক দিয়ে একটু আলো বাইরে দেখা যাচ্ছে কী না তাই লক্ষ্য করার জন্যে ঘোরাঘুরি করছে। এক একটী গানের প্রচণ্ড আওয়াজে সারা বাড়ী কেঁপে ওঠে, দেওয়ালের ওপর থেকে ছোট ঘড়িটা মাটিতে পড়ে চুরমার হ'য়ে যায়, এইবার মাথার ওপর শত্রু-প্লেনের গোঁ গোঁ শব্দ ও এক-একটি গানের গর্জ্জন শোনা গেল। মা ভীষণ অস্থির হয়ে উঠলেন; বাবাকে বলেন—না বাবু আর কোন মতেই ঘরে থাকা উচিত নয়—যে রকম শব্দ হ'চ্ছে তাতে এবাড়ী ভেঙে পড়তে কতক্ষণ—এই ভেজলা বাড়ী চাপা পড়ে মরার চেয়ে বাইরে মরা ঢের ভাল—চলো সবাই শেল্টারে। বাবা ইতস্ততঃ ভাবে বলেন—কিন্তু শেল্টারে যাওয়া হবে কী করে! প্রথমতঃ ছেলেরা সব ঘুমিয়ে, তার ওপর বাইরে ঐ মুষলধারে বৃষ্টি। মা বলেন—তা হোক, ওদের কি আর চোকর দু'জনে মিলে খুব নিয়ে যেতে পারবে।

ঐ ভীষণ বৃষ্টিতে আমার ঘর থেকে বেরুতে ইচ্ছে করছিলো না। তবুও—যে রকম অন্ধকার, তাতে সেন্টারে যাওয়া হবে কী করে? উঁচু নীচু জায়গা, দেখতে না পেয়ে পড়ে মরতে হবে। মা বল্লেন—কেরোসিন টর্চ তো আছে, তাতেই দেখা যাবে।

বাবা দরজা খুলে আমাদের বল্লেন—এই অন্ধকারেই যেতে হবে—বিদ্যুতের টর্চ জ্বলবে না—এখন মার্শাল-ল জারী করা হয়েছে, বিমান-আক্রমণের সময় একটু আলো দেখা গেছে কী গুলি তাকে গুলি করা হবে। প্রথমে আমি খুব আপত্তি তুললাম—অবশেষে বহুনিয় ঠেলার ঘর ছেড়ে বেরুতে হলো। ঝি-চাকরগুলো ছেলেদের ঘাড়ে করে আগে গেল; আমি মাকে নিয়ে ওদের পিছনে চলাম—বাবা এলেন সকলের শেষে। এত গাঢ় অন্ধকার যে কিছু দেখা যায় না; সারা দেহ ভিজেছে অবিশ্রান্ত জলে—কয়েক পা এগুতেই দেখি পথের মাঝে একখানা লরি কে রেখে গেছে। মাথা ঠুকে গেল··· ভাবছি কোথা দিয়ে যাবো, এমন সময় চাইনীস কিটার কথা কানে এল—এখানে লরী আছে, সাবধান, এস একপাশ দিয়ে। মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে চলেছি পাশ দিয়ে, মা বল্লেন—ঐ দেখ আকাশে সার্চ-লাইট ফেলেছে—নিশ্চয়ই বন্দরগুলো ওখানে কোথাও লুকিয়ে আছে। আমার তখন মাথায় ঘা খেয়ে মানসিক অবস্থা বিকৃত। বল্লাম··· মরুক না কেন, চুলোয় যাক ওরা। লরীর সামনেটা পার হতেই আবার এক মুস্কিলে পড়লাম—সেখানে ছিল একটা বড় বালীর স্তূপ। পা দিতেই হাঁটু পর্য্যন্ত সেল ঢুকে তার মধ্যে—ভয়ে বাবা গো বলে চেঁচিয়ে উঠি; সেই সময় বাবাও এসে পৌঁচেছেন ঠিক আমাদের পেছনে; ওঁর সাহায্যে বালীর স্তূপ থেকে মুক্তি পেলাম কিন্তু পায়ের গোড়ায় দুটি সাপের ভেতরে ঢুকে রইলো।

সেন্টারের সামনে পৌঁছে দেখি দোর গোড়ায় সে কি ভীষণ ভিড়। দারোয়ানটা এসে জানালো—ভেতরে তিলার্দ্ধ জায়গা নেই, প্রায় দেড়শো লোক ঢুকেছে অথচ সেন্টারটী মাত্র সত্তর জনের উপযুক্ত। আমাদের প্রতিবেশী এক চাইনীস ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে আমাদের কাছে এলেন। মিসেস কিম বল্লেন—ওঁরাও ভেতরে জায়গা পাননি—বিশেষ বেশী লোক হওয়াতে আভ্যন্তরিন অবস্থা ঠিক সারডিন টিনের অনুরূপ।

বৃষ্টি তখনো মুষলধারে পড়ছে, আর তার সঙ্গে বাতাসও ঝড়ের মত বেগে বইছে। মাথার ওপর চেরী গাছের ডালগুলো হাওয়ার মুয়ে পড়ছে। মেঘের গর্জ্জনও তেমনি প্রচণ্ড। 'এক এক' কামান্ বা বোমা ফাটার সব কিছু বোঝা যায় না। নিঃসহায় নিরাশ্রয়ের মত গাছের তলায় আমরা দাঁড়িয়ে ভিজছি—যেন যে করে থাকতে বাধ্য হোক্

এদিকে মা সকলের গা পরীক্ষা করতে লাগলেন—জ্বর এসেছে কী না; ছাতা থাকায় ছোট ভাই বোনেরা ভিজতে পারেনি। আমার মাথায় হাত দিয়েই চমকে গেলেন—উঃ তুই কী ভীষণ ভিজে গেছিস—এখন অসুখ না হলে বাঁচি। শীতে আমার সারা দেহ কাঁপছিল; রাগও হচ্ছিল ভীষণ—ধ্যাম—তোমার জন্যেই তো এই সব হোল এই পচা কুচ্ছের চেয়ে বাড়ীতো ঢের ভালো ছিল।—মা বল্লেন—আমি কী আনি যে হেল্টারের ঐ দুর্যোগ হবে। বাবা সকলকে চুপ করতে বলেন, কেন না ডেকের সবল চোর ডাকাতের উপদ্রবও খুব বাড়ে। এবং আমরা এই নির্জন জায়গায় আছি জানতে পারলে তাদের বেশ সুযোগ হবে। এদেশের চাইনীস বা ব্যাপারে ডাকাতদের নৃশংসতার কথা অবিদিত ছিল না—তাই ঐ কথা শুনে ভয়ে সর্বশরীর কাঁটা দিয়ে উঠলো। চুপ করে রইলাম।

বৃষ্টি অনেকটা কমে এল—ঝড়টি যে এবার গোধূলির অন-ফ্লাবার শোনা যাবে. কিন্তু তার পরিবর্তে শোনা গেল মেঘের গোঁ গোঁ আওয়াজ। হঠাৎ ঘরের মেঝে যেন কেঁপে উঠলো—বোঝা গেল কাছাকাছির মধ্যে বোমা পড়েছে। অনেকক্ষণ নীরব। কাছেই কোন গাছে একটা কাঠঠোকরা পাখী মাঝে মাঝে সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে খট্ খট্ শব্দ করে। ঘড়িতে তিনটে বাজে—অদূরে শোনা যায় কাদের পায়ের বুটের আওয়াজ। মিঃ কিম চুপি চুপি বাবাকে বলেন—এরা হয়ত ডাকাত—এদিকেই আসছে। বাস্তবিকই দেখা যায় দোরের ফাঁক দিয়ে কাকপোংসাতে ছজন দস্যুর মত লোক আমাদের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে—অবোধ্য ভাষায় তারা কথা কয় আর মধ্যে মধ্যে টর্চের আলো ফেলে আকাশে। একটু বাদে আমার কতকগুলো লোকের ছুটোর আওয়াজ কানে এলো। তাই শুনে বোধ হয় এ লোক ছজন ত্রস্তভাবে সেখান থেকে পালালো ঘরের পেছন দিয়ে। পেছনের লোকগুলি বন্দুকধারী সেটা; ব্লু টর্চ লাইটে এদের দেখতে পায় ও পিছু তাড়া করে। নীচু গলায় বাবা বলেন—এরা ডাকাত নয়—বিদ্রোহ কলঙ্কিষ্ট। দেখি মা জোড়হাতে ভগবানের কাছে আমাদের নিরাপত্তা প্রার্থনা করছেন আর আমার পেছনে চাইনীস ঝিটাও স্মরণ করছে তার তোয়া-প্যা-কোংকে।

পাহাড়ের ওপর থেকে শোনা যায় মানুষের কাতর আর্তনাদ সেই সঙ্গে রাইফেলের শব্দ। মিঃ কিম বলেন—ওদের গুলি করেছে। আতঙ্কে সকলের প্রাণ মুখের আঁচী হয়ে যায়। তারপর চারিদিকে আবার নীরবতা ছেয়ে যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটে—অন-ফ্লাবারের নাম গন্ধ নেই।

খানিক বাদে মিলিটারী পুলিশ ছজন নীচুস্বরে কী বলতে বলতে ঘরের পাশ দিয়ে নীচের দেকে গেল, আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচি।

ভিজে কাপড়ে পাথরের মেঝের ব'সে ভীষণ ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছিল—ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিলাম। বেরবার সময় সঙ্গে ওরা যে-ছুটো কম্বল এনেছিল তা দিয়ে ঘুমন্ত ভাই বোনদের ঢেকে রাখা হ'য়েছিল। তারা তিনটীতে এক্সিমোদের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমে নিথর একটা কোণে; মুহূর্তেই এই বিভীষিকাময়ী ঘাত-সংঘাত ওদের কাছে কত তুচ্ছ কত উপেক্ষণীয় ব্যাপার।

অল্প দূরে টাউনহলের ঘড়িতে বাজলো ৫টা, চারিদিকে ঘুম ভেঙে নানাবিধ পাখীর সংমিশ্রিত কলরব; ভোরের ক্ষীণ গোলাপী আভায় উদ্ভাসিত আকাশের খানিকটা দেখা গেল দরজার ফাঁক দিয়ে। উৎকণ্ঠিতভাবে

আমরা প্রতীক্ষা করছি দারিদেনের অগ-ফীয়ার ধ্বনি—এমন সময় শোনা গেল কোথায় রাওয়ের (দরওয়ান) কণ্ঠ—বাবু সাব, কেয়ারী খোল দিইয়ে।

দোর খুলেই দেখি ওধারে সেন্টার থেকে পঙ্গপালের মত লোক বেরিয়ে যাচ্ছে। অনেকেরই চোখ আকাশের দিকে। তখনো রেড এখনো শেষ হয়নি—উত্তরদিকে অবস্থিত নৌঘাঁটীতে এখনো জাপানী প্লেন বোমা বর্ষণ করছে। গত রাত্রে শত্রু সহরের ভিতর কত ক্ষতি করেছে তা আকাশের চারিদিকে বাঘের হাঁচির মতো গোদাকার ধোঁয়ার স্তূপ থেকে অনুমিত হ'লো। দূর থেকে ভেসে আসে ফায়ার-ব্রিগেডের অনবরত ঠাং ঠাং ধ্বনি। সব কিছু জানার শুনিবার ঔৎসুক্য ও কৌতূহল আর আমায় সেখানে স্থির থাকতে দিলে না। জনতাকীর্ণ পথ অতি কষ্টে পার হয়ে সকলে বাড়ী ফিরে আসি।

সামনের পথে অনেকগুলি লোক জড় হয়েছে, যাব সেখানে গেলেন কী ব্যাপার তাই জানতে।

তাড়াতাড়ি ফিরে ভাল কাপড় বদলে ও প্রাতঃরাশ সেরে এম. এ. এস ক্যাম্পএ গেলাম। দেখি বারান্দার সামনে খান দুই এম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে। ঘরের ভেতর ঢুকতেই সমস্ত শরীর শিউরে উঠলো আতঙ্কে।

হলের ভেতর কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য। চারিধারে পাতা হয়েছে খান কুড়ি ক্যাম্প-বেড এবং প্রত্যেকটীর ওপরে শুয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে আহত শিশু ও বয়স্ক লোক। তাদের মর্মন্তুদ আর্তনাদ এবং রক্ত ও টিংচার আয়োডিনের মিশ্রিত বিকট গন্ধে কক্ষটী যেন ভীষণ নরকে পরিণত হয়েছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে নিষ্পলক নেত্রে সেই দিকে চেয়ে আছি, এই সময় মিস্ দিম্ এসে আমার একটা বাহু ধরে ভগ্নকণ্ঠে বলে উঠলো—Oh miss Dutt, You are so badly needed here now : Don't be disheartened dear ; be brave enough to face the reality. It is but the begining of this fateful cataclysm. যন্ত্র চালিতের মত তাকে অনুসরণ করি। একটি দশ বছরের আহত চাইনীস মেয়েকে শুশ্রূষা করার ভার আমায় দেওয়া হোল। মেয়েটির মুখে ও দুহাতে অনেক জায়গা সাংঘাতিক ভাবে কেটে গেছে কাঁচে। শুনলাম একটা বোমা তাদের বাড়ীর নিকটে explode করায় তার blast এ জানলার কাঁচের শার্সি ভেঙে চারিধারে সবেগে ছিটকে যায়—মেয়েটী সেই ঘরের টেবুলের তলায় ছিল তার মা ও ভায়ের সঙ্গে, এবং সেই ছিটকানো কাঁচে তারা সকলেই আহত হয়। কাছে আসতেই আমার উপর দুটী অশ্রুপূর্ণ চোখের সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মেয়েটী বলে—তুমি কী জানো আমার মা কোথায় আমার ভাই কোথায়—তারা বেঁচে আছে ?

এই আহতা নীড়-হারা মেয়েটী কার বা কোথা হ'তে এসেছে তখনো সব জানতাম না। তার ব্যথাতুর পাংশু মুখটীর পানে চেয়ে আমার প্রাণটা যেন অব্যক্ত বেদনায় হাহাকার করে। ডাঃ থমসন কাছেই একজন বৃদ্ধীর কত পরীক্ষা করছিলেন এবং নানারূপ মিষ্টি কথা বলছিলেন তাকে উৎসাহ দিতে ; পাছে উনি কিছু ভাবেন ব'লে তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছে তার একটী হাতে কেমিকিল লাগিয়ে দিতে দিতে বল্লাম—তুমি কেঁদোনা, তোমার মা ভায়ের সামান্য একটু চোট লেগেছে, এখুনি আসবে তোমায় দেখতে—আমায় ব'লেছে তোমার মা। কথা কয়টী শুনে মেয়েটী কিছু শান্ত হয় তবে দেহের ক্ষতের জ্বালায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। নানারূপ কথা ব'লে তাকে একটু অন্যমনস্ক করার ব্যর্থ চেষ্টা করি।

ঘণ্টা দুই পরে কয়েকখানি বড় এম্বুলেন্স এসে বারাণ্ডার সামনে থামে; এবং ট্রেনারের সঙ্গে অনেকগুলো লোক ষ্ট্রেচার নিয়ে ভেতরে আসে। এদিকে তাদের দেখে আহতদের মধ্যে অনেকে আতঙ্কে ভীষণ চিৎকার করে ওঠে। সকলকে অভয় দিয়ে ডাঃ ব্রুক বলেন—seriously wounded personদের শহরের বড় হসপিট্যালে পাঠাবার বন্দোবস্ত করা হ'য়েছে; এরা এসেছে তোমাদের নিতে—সেখানে গিয়ে সকলেই সেরে উঠবে। একে একে সকলকেই বার করে নিয়ে যায়—দুটী বেড ছাড়া সবগুলিই খালি; এইবার সেই মেয়েটীকে নিতে একটা ষ্ট্রেচার নিয়ে দুজন পাঞ্জাবী সাহেব এল; লি-সিয়ান (মেয়েটীর নাম) তাদের দাড়ি ও কালো পাগড়ী দেখে ভীষণ চিৎকার করে উঠে—ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতদুটী দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে বলে—ওগো আমি যাবো না ওদের কাছে—এখানে থাকবো, আর আমি কাঁদবো না—আমায় দয়া করো...। তার করুণ কণ্ঠের কাতর মিনতি মাখা কথায় সেখানে অনেকেরই চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হ'য়ে ওঠে। ডাঃ ব্রুক ছুটে এলেন সেদিকে; তিনি চাইনিজ ভাষায় অভিজ্ঞ সুতরাং ন্যাদে ভাষায় তাঁকে অনেক কিছু বোঝাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন—লি-সিয়ান সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না—নিঃসহায় পক্ষীশাবকটীর ন্যায় আমার বুকে প্রাণপণে-আঁটা মুখটী রেখে ফোঁপাতে থাকে। মহামুস্কিল। অথচ তাকে এখানে রাখাও অতিশয় বিপজ্জনক—যে কোন মুহূর্তে আবার বোমা সুরু হ'তে পারে। ডাঃ ব্রুকও ভাবতে থাকেন। কী উপায়ে তাকে হসপিট্যালে স্থানান্তরিত করা যায়। বোধ হয় কোন অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে একটা উপস্থিত-বুদ্ধি মাথায় এল—লি-সিয়ানকে চাইনীজে বুঝান—তুমি ওখানে না গেলে তোমার মা খুব ভাববেন কিন্তু—তিনিও সেই হসপিট্যালেই আছেন।

নিমেষে তার ক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখখানিতে অসীম পরিতৃপ্তির জ্যোতি ছড়িয়ে দিল—ছোট্ট গোলাপী ঠোঁট দুটীর ফাঁকে উদ্ভাসিত হোল একটু মর্মান্তিক হাসিচ্ছটা, বল্লে—সত্যি আমার মা সেখানে আছে? ঠিক বলছো তো? হ্যাঁ, আমি যাবো আমার মার কাছে চলো।—ষ্ট্রেচারের ওপর শুইয়ে দিলাম তাকে—ছোট্ট কোমল দেহটী কম্বলে ঢেকে দেওয়া হোল। এম্বুলেন্স ষ্ট্রেচার তুলে ধরতেই সে আবার একটা হাত তুলে ধরে তাতারে বল্লে—এই লোকগুলোকে আমার বড্ড ভয় করে, তুমি আমার সঙ্গে চল···মার কাছে পৌঁছে দিয়ে আবার ফিরে এস'খন। কী কথা বলে তার এই মর্মস্পর্শী অনুরোধ থেকে মুক্তি পাবো ভাবছি···পাশ থেকে একজন চাইনীজ ড্রেসার তাকে মিষ্টভাবে বল্লেন···কিছু ভয় নেই, আমি তোমার সঙ্গে যাবো। ওরা তাকে নিয়ে গেল। যাওয়ার সময় লি-সিয়ান কাতরভাবে একবার আমার পানে চাইল মাত্র।

বাকী লোক কয়টির আঘাত খুব সামান্য, ওষুধ ও ব্যাণ্ডেজ বেঁধে তারা নিজ গৃহে ফিরে যায়। বেলা তখন চারটে···ডিউটি শেষ হ'তে এখনো দুঘণ্টা বাকী। মানসিক ও দৈহিক ক্লান্তিতে সবাইকে অস্বাভাবিক ম্লান দেখাচ্ছিল। হঠাৎ বেরালে ডাঃ ব্রুক সবাইকে ছুটি দিলেন। আবার ডিউটি সুরু হবে কাল সকালে।

কাগজে ও লোকের মুখে জানা গেল কাল রাতে শহরের কী কী জায়গায় বোমা পড়েছে আর কী অসহায় নিরীহ প্রাণের ক্ষতি হ'য়েছে। এ পর্য্যন্ত এরূপ ভারী আক্রমণ শহরের ওপর আর হয়নি। যেতারে জানলাম—জাপানীরা অবশিষ্ট রাজ্য সোহ'র ষ্টেটের উত্তর দিকের নদীটী পার হওয়ার চেষ্টা করছে।

পরের দিন দুপুরে টিফিনের পর আমাদের Camp-এ মিটিং হয়; ডক্টর থম্পসন কাই এড সম্পর্কে বক্তৃতা দিচ্ছেন যখন সে-সময় বোমা পড়ার আওয়াজ হয়—হাঁরপরেই এক-এক-খানের প্রচণ্ড গর্জন। বোঝা গেল স্থানীয় Jeotterদের চোখে ধূলি দিয়ে কখন জাপানী বমার সহরের ভেতরে এসে ঢুকেছে। বক্তৃতা থেমে গেল। সকলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে মাটির তলার আশ্রয় কক্ষের পানে।

সায়রণা ছিল রেড আলার্ড হ'লেই যেন বাড়ী ফিরে আসি। বাড়ী ফিরে এসে সকলে মিলে শেল্টারে গেলাম। বাড়ী থেকে এক মাইলের মধ্যে তাঞ্জোং পাগার ডক-ইয়ার্ড। ছোট বড় অনেক জাহাজ সেখানে সর্বক্ষণ যাত্রী বা মালপত্র বোঝাই নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তবে সেদিন মাল-পত্র কিছু ছিল না, প্রাণের ভয়ে হাজার হাজার লোক জাহাজে উঠছিল নিরাপদ স্থানে পালাবে বলে। সমস্ত ফেরীগুলি একটা বিরাট মেলার রূপান্তরিত হ'য়েছিল। শহরের বোমাগুলি সহরের সীমায় প্রবেশ করতেই ডক-ইয়ার্ডের জীবন্ত দৃশ্যটা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সিঙ্গাং যখন করে জাপানীরা সিঙ্গাং দেওয়ার কেন্দ্রে প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করে। গত ক'দিন ধরে সিঙ্গাপুরের অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে ওরা প্রচার করছিল—তোমরা দেশ ছেড়ে কোথাও পালিও না—বেসামরিক লোকদের আমরা কখনই হত্যা করবো না···সামরিক লক্ষ্য বস্তু থেকে যত সম্ভব দূরে থাকবে··ইত্যাদি···। সুতরাং সেদিন ডকইয়ার্ডে উক্ত অনুরোধের অবহেলার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল লক্ষ্য করে তাদের ধৈর্যচ্যুতি হয়। অমনি সুরু হোল প্রচণ্ড বোমা-বৃষ্টি ও মেশিনগানের গোলার। শেল্টারের দেয়ে কাঁপছিল সেই ভয়ঙ্করী ব্লাস্টের ধাক্কায়। ভাবছিলাম আজ হয়তো আমাদের নিরাশ্রয় পুরুষদের হ'তে হবে। রেড আর্লি তিন ঘণ্টা চলে। শেল্টার থেকে বার হ'য়ে দেখি আমাদের বাড়ীখানা তখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে—ওপরের কয়েক জানলাগুলো ব্লাস্টের চোটে খুলে গেছে।

যাবার অফিসে কোন কাজ হলো না—পর পর রাত্রির আক্রমণে এই এলাকার অনেকগুলি লাইন কেটে যাওয়ায়। পরে শোনা গেল সেদিন জাহাজ ঘাটে মাছির মত মেয়েপুরুষ ছেলেপুলে হতাহত হয়েছে। নোঙর-করা জাহাজগুলির মধ্যেও খুব কমই রক্ষা পেয়েছে।

পরের দিন ক্যাম্পে গিয়ে শুনলাম গতকালের ভয়াবহ আক্রমণের ফলে একটা হসপিট্যালের একটা অংশ চুরমার হ'য়ে গেছে। মনটায় ভারী লাগলো—আহা বেচারী রোগীগুলি কী হতভাগা। তারপর জানলাম সেদিন দুপুরে যেসব আহতদের এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হ'য়েছিল তারাও নাকি ঐ হসপিট্যালের ঐ অংশে ছিল। তাদের শবগুলি এখন খুঁড়ে বার করা হ'চ্ছে।—তক্ষুণি মনের মধ্যে ভেসে ওঠে সেই নিঃসহায় অসহায়া লি-লিয়ানের অনিন্দ্য-সুন্দর মুখখানি, তার অশ্রুসজল চোখের সেই মর্মভেদী প্রাণ-স্পর্শী দৃষ্টি-ভঙ্গী—সেই মুমূর্ষু কণ্ঠের মিনতিভরা কথাগুলি···। এই অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদ বয়ে আনে অন্তরে একটা দারুণ নিষ্ঠুর আঘাত। এবং আজ দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ বছর গত হ'য়ে গেছে—লি-লিয়ান কতকাল মিলিয়ে গেছে এই মাটির বুকে—কিন্তু তার সেই ক্ষণিকের পরিচয় আমার মনে এঁকে গেছে একটা গভীর রেখা যা আজো মনে হ'লে কিসের অদৃশ্য আকর্ষণে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলি।

এই সময় একটা অস্বাভাবিক ঘটনা আমাদের সাংসারিক জীবনে একটু অশান্তির সৃষ্টি করে। বহুদিনের পুরোনো দারোয়ান জোধান রাওয়ের হঠাৎ বিকেকের চাতি স্কট। গত হপ্তা দুই ব্যাপি সারা শহরে বিভীষিকাময়ী মৃত্যুর তা তব নৃত্য এবং সর্বগ্রাসী বন্যার ন্যায় আগুনের উগ্র লেলিহান মূর্তি বোধ তার মস্তিষ্ক-বিকৃতির প্রধান হেতু। তারপর দুদিন আগে জাহাজ-ঘাটে তার এক প্রিয় বন্ধুর মৃত্যু ঘটে—তার কাছে নাকি জোধান গচ্ছিত রেখেছিল তার সমস্ত সঞ্চিত অর্থ। সুতরাং টাকার শোক ও বোমার ভয় দুই-ই তার জীবনে বয়ে আনে এক অস্তি নির্ভুর অঘটন। কাজের প্রতি আর কোন আঁট বা তৎপরতা নেই—সর্বদা ফিস্ ফিস্ করে কী যেন আর কাঁদে···মোটর বা ট্রামের বাঁশী শুনেই উর্ধশ্বাসে ছোটে সেল্টারে। তারী মুস্কিলে পড়া গেল। ঐ সময় ঝি-চাকর পাওয়াও ভারী সমস্যার কথা; রোজ চারডলার মাইনে ও খাবার দিলেও কাউকে পাওয়া যায় না। অবশেষে অনেক কষ্টে একজনকে (ঠাকুর সিং) পাওয়া গেল—শুধু রাতটুকু বাড়ী পাহারা দেওয়ার জন্যে; মাসিক বেতন চল্লিশ ডলার। বাড়ীর কাজকর্ম একটী মাত্র ঝি নিয়ে চালাতে হয়। অতো বোমাবৃষ্টি সত্ত্বেও তখনো অনেক জাহাজ ভারত অভিমুখে ছাড়ত। জোধান রাওকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোল। একদিন বিকেলে তার এক কাকার সঙ্গে জোধান রাও তার মুলুকের দিকে রওনা হোল, যদিও তখন অর্ধেকের বেশী জাহাজ গন্তব্যস্থানে পৌঁছানোর আশা খুব কম—জাপানী ইউ-বোট বা ছাওয়াই ঈগল মারপথেই তাদের টুটিকরো করে ফেলে এবং জলমগ্ন জাহাজ থেকে যারা বেঁচে যায়, তারা বোটের সাহায্যে rescue shipএ গিয়ে পৌঁছালেও পারে না—জাপানীরা তাদের বেদিনগান করে।

দিনে জানুয়ারী সন্ধ্যায় রেডিও মারফৎ বিভিন্ন দেশ থেকে খবর সংগ্রহ করছি এমন সময় তাগাদের কাঁটাটা গিয়ে পড়ে সিঙ্গাং ষ্টেশনের মিটারে—সঙ্গে সঙ্গে কানে ভেসে আসে আমাদের স্বাধেশ-সঙ্গীতের প্রথম লাইনটী·····সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্য শ্যামলাং মাতরম্·· ··বন্দেমাতরম্·· !·· চমকে উঠি····· এ কী ব্যাপার···রেডার-কোন্ডে আমাদের স্বাধেশ-মন্ত্র...কে গায়! সেদিন রাত্রে কল পেন্সিলে লেখা ডায়েরীর পাতা থেকে' খানিকটা অংশ নীচে উদ্ধৃত করে দিলাম—···দারুণ অশান্তি ও দুর্ভাবনায় উৎপীড়িত বিক্ষুব্ধ মন আজ হঠাৎ অসীম আনন্দ ও উৎসাহে ভরে উঠেছে; এই মাত্র শুনলাম সিঙ্গাং ষ্টেশন থেকে আমাদের স্বদেশ-সঙ্গীত···বন্দেমাতরম্ গানটী! কী সুদ্রুত সুর আর কী চিত্তজয়ী প্রেরণাময়ী তার প্রভাব। দেশ থেকে আসার পর এ গান শোনার সৌভাগ্য হয়নি···ও রেকর্ড এখানে পাওয়া যায় না, proscribed.. সিঙ্গাং থেকে আজ বলছিল, এই দক্ষিণ-পূর্ব-এসিয়া থেকে সাদা জাতির প্রভুত্ব কেঁটিয়ে ফেলেই ওরা ক্ষান্ত হবে না,···বর্ষা শেষের পর ওরা ভারতে ঢুকবে···১৮৫৭ সালের রক্তাক্ত দিনগুলি থেকে ওরা আমাদের জন্মভূমিকে করবে মুক্ত—স্বাধীন!···কথাগুলো শুনে আজ আমার শিরায় উপশিরায় বেজেছে কী অপূর্ব শিহরণ; এতকাল পরে আমাদের শুমদাবৃত রাত্রির শেষ হবে···জগতের সামনে এবার ভারতবাসী উন্নতশিরে দাঁড়িয়ে সগর্বে বলবে—আমরা স্বাধীন জাতির সন্তান।···আঃ সে কী গৌরবান্বিত মুহূর্ত।···

পঁচিশ তারিখের সকালে সাইরেনে এলার্ম ধ্বনি বাজে, কিন্তু প্রত্যহের মত কামানের গর্জন বা বোমার গম্ গম্ শব্দ কিছুই শোনা গেল না; শহরের আকাশে হঠাৎ দুখানি রূপালী রঙের ফাইটার প্লেন (জাপানী)

মুদ্রিত হয় এবং রাশীকৃত সবুজ ও লাল-রঙের pamphlet হরির লুটের মত সারা শহরে ছড়িয়ে আবার তারা মেঘের মধ্যে অন্তর্হিত হয়। বহুত লোকে ছোটে সেই চিঠি কুড়োতে···কিন্তু পুলিসের baton chargeএর ভয়ে কেউ আর তা পড়তে সাহস করে না—পুলিসের হাতে সেগুলো সমর্পণ করতে বাধ্য হয়। যাদের বাড়ীর মধ্যে বা ছাদে পড়েছিল তারাই এর মর্ম জানতে পারে। এক বন্ধু তার বাড়ীতে পড়ে-পাওয়া একটী pamphlet এনে দেখায়। তাতে তিনটী ভাষায় (ম্যালে-চাইনীস-ইংরাজী) লেখা ছিল এই কথাগুলি—গত-কাল রাত্রে নীপন সেনাপতি (জেঃ ইয়ামাশিতা) একটী চরমপত্র পাঠিয়েছেন ইংরেজ সেনাপতির (জেঃ ওয়েভেল) শিবিরে—কিন্তু তিনি সেটা অগ্রাহ্য করেছেন, জবাব দেননি ; সুতরাং এবার বাধ্য হয়ে এই দুর্ভেদ্য দুর্গকে দ্বিতীয় ডানকার্কে পরিণত করা হবে। অধিবাসীরা, খুব সাবধানে থাকবেন- আমরা আসছি তোমাদের মুক্তি দিতে।

কিকেলে খবর পাওয়া গেল ইংরেজের প্রধান সেনাপতি (জেঃ ওয়েভেল) পদত্যাগ করেছেন এবং সেই পদে নিযুক্ত হয়েছেন জেঃ পার্সিভাল। পরের দিন জানা গেল ভূতপূর্ব সেনাপতি গত রাত্রে বিমান যোগে অ্যাটেন্ডিয়ায় চলে গেছেন। ওয়েল অফ্‌ওয়েলস দ্বীপের অবশিষ্ট রাজ্যখণ্ড জোহর ষ্টেটের রাজধানী জোহোর বারু জাপানীরা দখল করলে ; এবং সেই থেকে পুলোতুনোং থেকে আমাদের পানীয় জলও আসা বন্ধ হয়। পূর্বে উল্লিখিত অ্যাকরিড্‌ ডিস্ট্রিক্টের চলটুকু এখন ৪০০,০০০ অধিবাসীর পুঁজি ; তার ওপর main landএ যতগুলি ব্রিটিশ ডিভিসন ছিল তারা এখন সকলেই পরাজিত হয়ে এখানে জড়ো হ'য়েছে।

সুতরাং এবার সুরু হোল জলের দুর্ভিক্ষ, যদিও চারিপাশে বিশাল-জলধি দ্বারা পরিবেষ্টিত। ভাগ্য-দেবতার কী নিষ্ঠুর পরিহাস ! যারা জল সঞ্চয় করে রেখেছিল তাদের স্নান-কাপড়-কাচা বন্ধ রেখে একরকম চলতে লাগলো—কিন্তু যারা তা করেনি তারাই পড়লো মহাসমস্যায়। এগার-বেজে থেমে গেলেই দুঃস্থ নরনারী একটী পাত্র হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ায় পুলের ধারে—কাসি সিকিত আয়ের না (একটু জল দাও গো)—বলে ; এরা জলের ভিখারী, খাবার সামগ্রী চায় না এরা, চায় শুধু একটু জল।

যদিও যুদ্ধের গোড়াতে সেনাপতি বেটার বক্তৃতা প্রসঙ্গে সম্পর্কে ব'লেছিলেন- we shall fight to the last man, কিন্তু আসলে এই বাণীর কোন বাস্তব প্রমাণ পরিলক্ষিত হল না। main landএ যেমনে জাপানীরা একটী বুলেটও খরচ না করে গ্রামের পর গ্রাম দখল করে এবং ব্রিটীশ সৈন্য শত্রু পৌঁছানোর অনেক আগে থেকে সে-সব জায়গা ছেড়ে দিয়ে পেছনে হটতে থাকে। তখানে মাত্র দুটী জায়গা ছাড়া আর কোথাও সামনাসামনি ভাবে শত্রুর সঙ্গে লড়াই হয়নি। জোহর থেকে যখন পরাজিত ব্রিটীশ-বাহিনীগুলি ভয়ঙ্কের মত Causeway (সিঙ্গাপুর ও মেনল্যাণ্ডের মধ্যবর্তি সেতু) অতিক্রম করে এখানে এসে শেষ আশ্রয় নিল তখন সম্পূর্ণ প্রকাশ পেল, প্রধান সেনাপতির উক্ত বাণীর অসারতা। কাগজে এইবার একটী নোটীশ বার হোল—The seige of Singapore has began. Be prepared for any eventuality. জনসাধারণ স্তম্ভিত হয়ে শোনে ; মনে পড়ে কয়েকদিন আগে শোনা কথাগুলি—এখানে

ডানকার্কের পুনরাভিনয় হবে—সেই ভয়ঙ্কর Carpet bombing! ভোরের দিকে ছবিটাসহ পালিয়ে আসার সময় মধ্যবর্তী সেতুটা ডাইনামাইটে ধ্বংস করা হয়—শত্রুর পথ রোধ করতে।

দ্বীপের উপকূলবর্তী জায়গাগুলি এবার military zoneএর অন্তর্ভুক্ত করা হোল; সাগর তীরে যাদের বাড়ী তাদের চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশ দেওয়া হোল শহরের interiorএ evacuate করতে। ভাগ্যক্রমে আমাদের বাড়ীটা উক্ত সীমানার বাইরে ছিল। বোমার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে অনেকে শহর ছেড়ে উপকূলবর্তী শহরতলীতে গিয়ে ডেরা বেঁধেছিল—এখন military decreeঅনুযায়ী হুকুমাতে আবার তাদের শহরে ফিরতে হোল। যারা ঐ সব জায়গার স্থায়ী বাসিন্দা তাদের আত্মীয় স্বজন গৃহে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। বোমার ঘায়ে অনেক বাড়ী ভূমিসাৎ হওয়াতে শহরে তখন খালি বাড়ী পাওয়াই মুস্কিল। অনেকে আত্মীয় স্বজন বাড়ীতে স্থান না পেয়ে অগত্যা কোন সরকারী বড় প্রকাণ্ড কংক্রীট বিল্ডিংয়ের তলায় আশ্রয় নেয়।

সকলেই আশঙ্কা করছিল যে এবার সমুদ্র থেকে শত্রুর মুহুর্মুহু heavy bombardment সুরু করবে; হিসেব করে দেখা গেল যদি whole-scale bombardment চলে তাহলে মাত্র একঘণ্টার মধ্যে সারা শহর মাটীতে মিশে যাবে!

১লা ফেব্রুয়ারী··· কয়োহাসে গর্ব্বিত জাপানের শক্তিশালী সেনাবাহিনী মালয়ের দক্ষিণ উপকূল প্রান্তে এসে দাঁড়ালো··· বেলার শেষে অস্তমিত সূর্য্যের অন্তিম রশ্মি ধূসরাভ আকাশের বুকে সৃষ্টি করেছে একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন; ব্রিটেনের বহু অর্থে নির্ম্মিত অতি-গৌরবের দুরতিক্রম্য দুর্গ প্রাচীর ফিরাটার সেই সিঙ্গাপুর আজ তাদের সম্মুখে··· মাত্র কয়েক মাইলের তফাৎ···। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মান প্যানজার বাহিনী যখন ফ্রান্সের দুর্ভেদ্য মাজিনো লাইন অতিক্রম করে তখন জার্মান সৈন্যদের প্রিয় শ্লোগান হয়েছিল To Paris. To Paris—; সেইরূপ একচল্লিশ সালের ডিসেম্বরে জাপান যখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আক্রমণ করে তখন জাপানী সৈন্যেরা এই Slogan গাইতে থাকে To Singapore, To Singapore প্রায় ৫৪ দিন প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর সেই দুর্জ্জয় বেরা আজ তাদের সম্মুখবর্তী···পাঁচলক্ষ নিরীহ মানুষ নিস্তব্ধ চিত্তে প্রতীক্ষা করে বিজয়ী শত্রুর চরম আক্রমণ···।

মোহর পতনের পর তিন দিন নীরবতার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়···বিষণ্ণ ঘনঘটার পূর্বে গহন বনভূমির যেন নিশ্চল ধর্ম্মঘটের অবস্থা···। আমরা ভাবি—আর বেশী দেরী নেই—যে কোন মুহূর্ত্তে মৃত্যুর কোলে ঘুমিয়ে পড়তে হবে।···নিরুপায়···।

বহির্জগতের সঙ্গে সকলপ্রকার সংযোগ এইবার বিচ্ছিন্ন হোল—একমাত্র রেডিও ছাড়া···অবিকল যেন বন্দী বিহঙ্গ···।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী আরম্ভ হয় এক ভীষণ হাওয়াই আক্রমণ···জাপানীরা শহরের চারধারে ছড়িয়ে দেয় কিছু আগুনে বোমা। শেল্টার থেকে বার হ'য়ে দেখি চারিদিক শুধু ধোঁয়াকীর্ণ···সকাল দশটায় বোধ হচ্ছিল যেন বেলার শেষ। আমাদের বাড়ীতে এসে ওঠেন বাবার জনৈক চাইনীজ বন্ধু সাথে তাঁর সারা

সংসারটী; আজ সকালের রেডে তাঁর বাড়ীটী ভস্মীভূত হ'য়ে গেছে; বাড়ীর সাথে তিনিষপত্রও সব পুড়ে গেছে—একেবারে সর্বস্বান্ত অবস্থা; প্রাণের ক্ষতি কিছু হয়নি—তবে দারুণ আতঙ্কে মেয়ে-ছেলেরা চিৎকার করছে—কী প্রতিকূল অবস্থা।

ঐ দিন সন্ধ্যার জাপানীরা ওপার থেকে Shelling আরম্ভ করলে সিঙ্গাপুরের ওপর। তার range পাঁচ ছ' মাইল। এতদিন শুধু বোমার হাত থেকে আত্মরক্ষার নানান কসি নানা বন্দোবস্ত করা হচ্ছিল; এখন আর একটী সম্পূর্ণ অন্য অস্ত্র দেখা দিল। জাপানী বমারগুলো বেশীর ভাগ সময়ে একটা কোন সামরিক লক্ষ্যবস্তুকে কেন্দ্র করে বোমা বর্ষণ করে; কিন্তু কামানের গোলা বা শেল্ তো ঠিক লক্ষ্য বস্তুরটীর ওপর ফেলা সম্ভবপর নয়। এর মুখ থেকে বাঁচার কী উপায়?

Shelling হতে casualty-র সংখ্যা অসম্ভব রকম বাড়তে থকে।

সকালে এক প্রতিবাসীর বাড়ীতে বুকফাটা আর্তনাদ শোনা গেল···গিয়ে দেখি বাড়ীর গিন্নী পুত্র কন্যা সহ কাতরভাবে অশ্রুবর্ষণ করছেন··· এইমাত্র খবর এসেছে সকালে আফিস যাওয়ার পথে বর্তা শেলে মারা গেছেন এবং তাঁর মাথাটা নাকি দেহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হোয়ে গেছে। একটু বাদে মৃতদেহ লরি ক'রে আনা হোল বাড়ীর সামনে·· সেদিন নিজে লোক এই প্রথম দেখি। ···পিতার মুণ্ডহীন রক্তাক্ত দেহ ঘিরে স্ত্রী ছেলেমেয়ের যে কী আকুল আর্তনাদ··।

আট তারিখের রাত্রে অন্ধকারে আত্মগোপন করে জাপানী-বাহিনী সিঙ্গাপুরের উত্তর উপকূলে অবতরণ করলে—ঠিক তার আধ মাইলের মধ্যে ছিল ব্রিটীশ কৌজের ঘাঁটী·· শত্রুর নির্বিঘ্ন-প্রবেশ তারা একটুও টের পেল না। সকাল বেলা আরম্ভ হোল কুরুক্ষেত্রের তুমুল সংগ্রাম।

পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে জাপানীরা এখানকার পাঁচটি এরোড্রামের ভিতর দুইটী দখল করলে···যেন স্যাণ্ড থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে জাপানী ইগল এসে সেখানে করলে ঘাঁটী; ওপার থেকে সেই বিশালকায় দৈত্যের মত কামানগুলোও এইবার এপারে বসানো হ'ল সহরের দিকে মুখ করে···।

এতদিন পরে সহরের কাজকর্ম যান-বাহন ইত্যাদি এইবার নিস্তব্ধ নিশ্চল হয়ে এল; এবং সহরের শেষ সংবাদ-পত্রখানি (Straits-Times) একশো এক বছর পর আজ প্রকাশিত হওয়া বন্ধ হ'ল। শেলিং-এর চোটে লোকে আর পথে নামতে সাহস করে না। সহরের সমস্ত সামরিক কলকারখানা অফিস ইত্যাদি এবার একে একে বন্ধ হলো। কোনও অফিসে বেতাদ প্রভুরা বিদায় কালে কর্মচারীদের পুরস্কার স্বরূপ দেন তিন মাসের বেতন আবার কোথাও কোথাও হতভাগ্যেরা একটী মাসিকিও পেলে না।

মিলিটারী হস্পিটাল গুলো আহত সৈন্যে ভরে যাওয়ায় সিভিল হস্পিট্যালগুলিও এবার দখল করা হয়। শেলিং ও এয়ার রেডে সিভিলিয়ান ক্যাসুয়্যালটিও বড় কম বাড়তে লাগলো না...অথচ হস্পিট্যালের সংখ্যা বহু··· এম, ও, এস প্রতিষ্ঠানগুলিই সেই দুর্ভাগাদের এখন একমাত্র সহায়···কিন্তু সেখানেও বিচক্ষণ surgeon and medical equipment এর নিতান্ত অভাব। আমাদের ক্যাম্পটার চল্লিশটী বেডই ভর্তি···প্রত্যেকেই সাংঘাতিকভাবে আহত...কারুর একটা হাতের আধখানা কাটা, কারুর একটা পা উড়ে গেছে, কারুর মাথা কাটা

আবার কারুর সাধ্য নেই অতিরিক্ত শিশুটীর লেগে। ···বারুদ অসহ্য যন্ত্রণায় কেউ করে উন্মাদের মত চিৎকার আবার কারুর জ্ঞানশূন্য অচৈতন্য অবস্থা। তাদের অমূল্য জীবনগুলি বাঁচাবার জন্যে চিকিৎসকদের কী অক্লান্ত চেষ্টা, নার্সদের কী নিঃস্বার্থ সেবা···। অনেকেই জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে অপারেশন টেবলের ওপরই···!

এই সময় আমাদের একমাত্র পরিচারিকাটী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে—danger never comes alone—প্রবাদটী প্রতি অক্ষরে সত্য। সে চলে যায় তার আপনার জনের কাছে···বাড়ীতে থাকে সাহায্য করতে দ্বিতীয় ব্যক্তি রইল না,···মহা সমস্যায় পড়া গেল; অবশেষে বাধ্য হ'য়ে এম, এ, এস কেন্দ্রে সেবাব্রত ত্যাগ করতে হোল।

উত্তর দিক থেকে জাপানীরা ক্রমশঃ শহরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো এবং কামানের গোলাও এসে পড়ছে শহরের উত্তর পর্যন্তে ···আমাদের দিকটা শহরের দক্ষিণ এলাকায় সুতরাং উপস্থিত shelling থেকে খানিকটা নিরাপদ; তবে বোমা ও মেসিন গানের ঠেলায় রীতিমত জর্জ্জরিত। দ্বীপের ওপর ঘাঁটী করাতে জাপানীরা প্রতি ঘণ্টাতে শহরের ওপর এসে অনর্থক সেসামরিক এলাকায় বোমা বা মেসিন গান ছুড়তে থাকে; সাইরেন ধ্বনির ওপর আর কারুর আস্থা নেই বোমা বা মেসিন গানের শব্দ হলে তবে সাইরেন বাজে, সুতরাং সবাইকে চব্বিশ ঘণ্টা এবার শেল্টারের মধ্যে বাসা বাঁধতে হলো···সঙ্গে রইলো সামান্য কিছু বিস্কুট-টিন-ফুড ও খার্মোফ্লাস্ক ভর্ত্তি কফি।

শেল্টারে বিবিধ জাতীয় লোকের অসহনীয় ভীড়; বেশী লোক ধরবে ব'লে বেঞ্চের ওপর স্লাব পেতে মাচার মত করা হয়; ছেলে-পুলে ও বুড়িদের তোলানো হয় মাচার তলায়—বাকী লোক থাকে তার ওপর।

গত কয়েক দিন থেকে ট্যাপে এক বিন্দু জল নেই···পূর্ব-সঞ্চিত জল ও সোডা লিমনেড দ্বারা কোন মতে তৃষ্ণা দূর করা হচ্ছে···দ্বানাদি একদম বন্ধ; আলো-বাতাস-বিহীন ক্ষুদ্র ওহা···অগণ্য মানুষের ভীড় ···ঘর্মাক্ত দেহের বিকট গন্ধ···কী অসহনীয় অবস্থা।

কিন্তু এই মরণোন্মুখ দুর্দ্দশাতেও লোক জীবনকে হাসির খোরাক যোগাতে কুণ্ঠিত হয় না,···কথা···হাসি··· গল্প অবাধে চলতে থাকে। শেল্টারের এক কোন থেকে একটী চাইনীজ তরুণ বলে ওঠে—কী বিশ্রী অব্যবস্থা; বুড়িদের মাচার তলা থেকে বার করে ওপরে বসতে দেওয়া হোক—কারণ ওদের দিন তো কেটে গেছে; তরুণ ভারতীয়রা গিয়ে বরং ঐ নিরাপদ জায়গাটী দখল করুক—এদের জীবনের মূল্য ঢের বেশী।

সকলেই হাসতে থাকে। তাগাক্রমে ওদের বৃদ্ধারা কেউ ইংরেজী জানতো না, না হলে হয় তো একটা বাক্-যুদ্ধ সুরু হোত।

জানা গেল ব্রিটীশ সেনাপতি নাকি সিঙ্গাপুর শহরটীকে রাশিয়ার "লেনিনগ্রাদের" মত open city ব'লে ঘোষণা করেছেন—কিন্তু জাপানীরা তা গ্রাহ্য করলে না · তারা চায় ব্রিটীশ ফৌজের বিনাসর্ত্তে আত্ম সমর্পণ!

দশ তারিখের সকালে একটিবার সাইরেনের করুণ কণ্ঠধ্বনি শোনা যায়···তারপর আর অল-ক্লীয়ার দেওয়া হয় নি—সেই রেড চলতে থাকে···জীবন্ত নরকের মধ্যে দিন কাটে··· ।

চোদ্দ তারিখ—পরাজিত ব্রিটীশ সৈন্যে শহরের দক্ষিণ প্রান্ত গেল ছেয়ে—পথের দুধার ভ'রে গেল ট্যাঙ্ক ও ট্রাকে ; খবর পেয়ে সেন্টার থেকে বেরিয়ে পড়লাম দেখতে। ট্রাক থেকে বেরিয়ে এল এক দঙ্গল রাইফেলধারী সাদা ও কালো সৈন্য···পথের ধারে প্রকাণ্ড মাঠেতে তারা ক্লান্তভাবে গিয়ে ব'সে পড়ে··। শুনলাম তারা উত্তর পল্লী থেকে এসেছে—সেখানে নাকি রাস্তার জাপানীদের সঙ্গে তুমুল লড়াই চলছে·· লাট বাহাদুর বেতারে জানিয়েছেন এখানে শেষ যুদ্ধ দেওয়া হবে। সুতরাং এইখানেই অভিনীত হবে ষ্ট্যালিনগ্রাডের দ্বিতীয় অভিনয়! আতঙ্কে সকলেরই চক্ষুস্থির! আর দূরে ফটাফট্ শব্দ শুনতেই সকলে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলাম সেন্টারে··· আকাশ থেকে জাপানীরা মেসিন গান ছুড়ছে। বাবা পিছিয়ে পড়েছিলেন—এক চুলের জন্য রক্ষা পেলেন—দাদা কুলিদের মত বুলেট ওঁর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ভয়ে সকলেই আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে·· কক্ষ ঝরঝায় হঠাৎ ঘন ঘন ধাক্কা···তারপর বুট-পরা পায়ের শব্দ। ···ভেতরে অনেকে ভয়ে কেঁদে ওঠে—জাপানীরা এসেছে বুঝি তাদের খুন করতে। ···বাবা হয়ে দোর খোলা হোল···ভেতরে এসে ঢোকে ক'জন সাদা সৈন্য—please give us shelter !·· সন্ধ্যার পর আবার নীরবতা ফিরে আসে, তবে কামানের গোলা মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে পড়ছে আরো দক্ষিণে।

পনেরো তারিখ—রবিবার। সকালে সেন্টার থেকে বার হ'তেই নজরে পড়ে রাস্তায় গাদা লোক চ'লছে হাতে বা মাথায় নানাবিধ জিনিষপত্র নিয়ে! এক বন্ধু বল্লেন—লুট আরম্ভ হয়েছে—বোমার ভয়ে বড় বড় দোকান ও লোকের বাড়ী থেকে নানারকম জিনিষ নিয়ে ওরা ছুটেছে···। আমাদের সেন্টার থেকে অনেকগুলি নিম্নশ্রেণীর চাইনীজ স্ত্রীপুরুষ বার হয়ে গেল—সেই লুটেরাদের দলে যোগ দিতে! ওদের দুঃসাহস ও মারাত্মক লোভ দেখে সকলেই অবাক হোলাম, এখন মার্শাল ল', মিলিটারী পুলিশ দেখতে পেলেই তাদের গুলি করবে··এবং মাথার উপর চলছে মৃত্যুর অবিশ্রান্ত তাণ্ডব নৃত্য···পথের ধারে মাঠে ঘাটে পড়ে আছে অগণিত মৃতদেহ—ওরা সে সব উপেক্ষা করে ছুটলো লুট করতে— ওদের কাছে অর্থই প্রধান—প্রাণের কোন মূল্য নেই !

গত কালের সৈন্যরা আজ মাঠে নেই। আজ থেকে Central Detective Station এর প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড বিচ্ছিন্নের জন্য তারা আশ্রয় নিয়েছে। তাদের কয়েকটা kit-bags পড়ে আছে ঘাসের ওপর।

সকলে গেল দেখে একটু সাহস পেয়ে আমরাও রাস্তার দিকে নেমে গেলাম সব কিছু প্রত্যক্ষ দেখতে: রাস্তায় চৌমাথায় খাটানো হয়েছে Camouflaged machineguns ··দক্ষিণ প্রান্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বালির বস্তা ও কাঁটা-তারে। কাঠের পোষ্টে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে—Battle Zone···।···অনেকগুলো শুর্খা ও অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্য সেই সব কাজে ব্যস্ত। খবর পাওয়া গেল—জাপানীরা সহরের উত্তরের অংশের অনেকখানি দখল করেছে এবং উপস্থিত লড়াই হচ্ছে ঘোড়-দৌড়ের মাঠে...আমাদের পাড়া থেকে মাত্র তিন মাইল! অনেক বন্ধু বল্লেন—ব্রিটীশদের নিশ্চয়ই মতিভ্রম হ'য়েছে··আর কতটা ওরা হটতে পারবে বলুন তো···আমেরিকা থেকে ফ্লাইং ফোর্টেস পাওয়ার আশাটা এখনো কী ওরা পরিত্যাগ করতে পারছে না···অনর্থক আমাদের প্রাণগুলো ধ্বংস হবে যা দেখছি···। তাঁর কথার মধ্যে দিয়ে আমাদের মনটাও যেন প্রতিধ্বনিত হোল।

বেলা আটটায় শোনা গেল প্লেনের গো গো শব্দ—সবাই ছিরে এলাম শেল্টারে এক রকম ছুটেই প্রায়,··· সৈন্যগুলো নিজ নিজ পোষ্টে দাঁড়িয়ে হাই আকাশের পানে চেয়ে—বেচারীরা !

বোমা ফাটার কর্ণভেদী আওয়াজ ও 'এক এক' গানের গর্জ্জন সুরু হোল—সারা শেলটার দুলতে থাকে··· বোঝা গেল ওরা ব্রিটীশ ফৌজের ঘাঁটী দেখতে পেয়েছে, তাই এসেছে সেটা মুছে দিতে··এবং আজ যে আমাদের জীবনের শেষ তারিখ...তাও বারংবার মনে পড়তে লাগলো।

একবার একটা বোমা এত কাছে ফাটলো যে শেলটারে যারা স্থানাভাবে দাঁড়িয়েছিল তারা ধাক্কা খেয়ে অন্য লোকের ঘাড়ে প'ড়ে যায়—আতঙ্কে ছেলেপুলেরা ভীষণ চিৎকার করে ওঠে···।

বেলা বারোটায় রেড পামে·· আবার সবাই বার হল। রাস্তার পানে চাইতেই ভয়ে চমকে উঠি—কতকগুলো মিলিটারী ট্রাক উল্টে গেছে—রাস্তার ওপর পড়ে আছে অনেকগুলো বেসামরিক লোকের রক্তাক্ত মৃতদেহ! আর তাদের চারিদিকে ছড়িয়ে আছে এক রাশ জিনিস—বোঝা গেল এরা সেই লুট করতে গিয়েছিল-- ফেরার পথে সৈন্যরা মেসিনগান করে ওদের মেরে ফেলেছে···! রাস্তার মোড়ে ভগ্ন সৈন্য বা কামান কিছুই দেখা গেল না···সেই জায়গাটা থেকে দশগজো হাত দূরে মাঠের ওপর বোমা পড়ে একটা গর্ত্ত হ'য়েছে— অনেকে risk নিয়ে গেল সেই দিকে · আমার সাহসে কুলালো না···নিষ্পন্দ চোখে চেয়ে রইলাম সামনের আকাশের পানে···চারিধারে কী প্রচণ্ড আগুন—পেট্রোল ট্যাঙ্ক···বাবার গুদাম লোকের বাড়ী শুকনো তালপাতার মত হু হু করে পুড়ছে—এই বিরাট ধ্বংসের মধ্যে কারার-এঞ্জিনগুলো কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেছে। অদূরে একটা দোতলা বাড়ী আজকের রেডে চূর্ণ হয়ে গেছে—তার ভগ্নস্তূপ থেকে বার হ'চ্ছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ; তার মধ্যে দুটী সংসার এগুতে ছিল তা জানতাম···হয়তো তারা এখন ঐ বিরাট স্তূপের তলায়··· কেউ কেউ এখনো হয়তো বেঁচে কাতরাচ্ছে, আবার কেউ হয়তো ঘুমিয়ে গেছে চিরকালের জন্য...।

আমাদের বাড়ীটা তখনো দাঁড়িয়ে···বোমার ঘায়ে ছাদের অনেক টাইল ছিটকে গেছে চারিধারে। ছেলেদের খাবার জল আর নেই—খবর এল—ওরা ভীষণ কান্না জুড়েছে জলের জন্যে—মহা মুস্কিল...মা ও বাবা গেলেন বাড়ী থেকে তাড়াতাড়ি জল আনতে—তাই বোনেদের নিয়ে আমিও তাঁদের অনুসরণ করলাম। বাড়ীর মধ্যে ঢুকে দেখি—কী অদ্ভুত ব্যাপার—ঘরের মেঝে অতি সিলিং থেকে খসে পড়া সিমেন্টের চাবড়া ও আলমারী ভাঙা কাঁচের টুকরোতে—দেয়ালগুলোও ফেটে গেছে এক এক জায়গায়··।···বাড়ীর পেছনের খিড়কী দরজা ভাঙা...রান্নাঘরের বারান্দার রাখা বাসনগুলো ও ছুটো বাক্স কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেছে— জলপূর্ণ ডোলটী একেবারে শূন্য ! বাবা বল্লেন—তারা কী হিংসুটী ছেলে, জলটুকু পর্য্যন্ত নিতে ছোলেনি...।

ছেলেরা জল খেয়ে শান্ত হ'ল,—তখন কোন প্লেনের শব্দ নেই—কিছুদূরে উত্তর পক্ষের কামানের কেবল গুম্ গুম্ আওয়াজ। রাত্রের জন্যে মা একটা ব্যাগে কিছু খাবার ও লেমনেড ভ'রে নিলেন···আমার মনে হোল—রাত্রে ওগুলো ব্যবহার করার সৌভাগ্য আর কী হবে—যে ভয়ঙ্কর ধ্বংসের বন্যা বইছে তার মুখে ভেসে যেতে আর কতটুকুই বা বাকী··· ।

যে কোন মুহূর্ত্তে আবার জাপানী প্লেন ছুটে আসতে পারে এদিকে বোমা ছড়াতে···তাড়াতাড়ি ভেতরের সব দরজা বন্ধ করে খাবারের ব্যাগ নিয়ে আমরা বাইরে এসে দাঁড়াই—বাবা সদর দরজায় তালা দিচ্ছেন—হঠাৎ চারিদিকে লোক ছুটতে আরম্ভ করে...ওধারের আকাশে মেঘের ভেতর থেকে তিনখানা প্লেন তড়িৎ বেগে আবার ছুটে আসে.. দারুণ আতঙ্কে প্রাণ শুকিয়ে যায়···পা কাঁপতে থাকে...শেল্টারে পৌঁছোতে সাধনের খোলা মাঠখানি এ সময়ে পার হওয়াও সম্পূর্ণ নির্ব্বুদ্ধিতা···হতভম্বের মত পাশে বালীর বস্তায় ঘেরা বারাণ্ডাতে গিয়ে সবাই দাঁড়ালাম·· খাবারের ব্যাগটা দরজার সামনেই পড়ে রইলো। সুরু হয় বোমাবৃষ্টি ও সেই সঙ্গে মেসিন গান্···ভাবলাম আর বুঝি রক্ষা নেই···এই বুঝি জীবনের শেষ মুহূর্ত···বোমা ফাটার ভয়ঙ্কর আওয়াজে ছোট ভাই ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে···মা তাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরেন··· হঠাৎ চারিধারে এক ঝলক আলোয় উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে···আবার একটা ভীষণ আওয়াজ... ...সামনে দিয়ে তড়িৎ বেগে একটা আগুনের টুকরো অন্যদিকে বেরিয়ে গেল ·····স্তব্ধ মাঝে সকলের দেহ আলা করে উঠলো·····ওপর থেকে সাততলা ফেটে একরাশ বালি আমাদের মাথার ওপর ছড়িয়ে পড়ল ····খানিক বাদে আবার সব নীরব·····আমরা এবার প্রাণ নিয়ে ছুটলাম শেল্টারের দিকে, মাঠের উপর একজন চাইনীস স্প্লিন্টার লেগে রক্তাক্ত দেহে জ্ঞানশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে; আতঙ্কে আমি তখন ঠক ঠক করে কাঁপছি··· শেল্টারে ঢুকে অবসন্ন দেহে বসে পড়লাম।

রাত্রি আটটা—চেতনা ফিরে এলে দেখি প্রত্যহের ন্যায় শেল্টারের একটি কোণে ব্ল্যাম্পটি জ্বলছে—সব লোকে নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করছে। বাবার জনৈক বন্ধু (তামিল) এসে চুপি চুপি জানালেন—এই মাত্র হেড-কোয়ার্টার থেকে খবর পাওয়া গেছে—আজ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় cease fire আদেশ ঘোষিত হ'য়েছে—বৃটিশ সেনাপতি (জেঃ পার্সিভ্যাল) প্রায় বত্রিশ হাজার সৈন্য সহ বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করেছেন।

অসীম আনন্দ ও স্বস্তিতে রোমাঞ্চিত হ'ল সারা দেহ···

মা করজোড়ে প্রণাম করেন দীনবন্ধু নারায়ণকে—জ্ঞাপন করেন তাঁর অন্তরের কৃতজ্ঞতা, বিধাতার ভাইবোন তিনটিকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বাবা বলেন—ভগবানের কী অপরিসীম করুণা···এই সর্ব্বনাশা যুদ্ধের মুখ থেকে অক্ষত অবস্থায় তোমাদের সকলকে নিয়ে যে মুক্তি পাবো তা আর ভাবিনি। প্রবল উত্তেজনায় তাঁর কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট হয়ে আসে···আমারো চোখ দুটো ঝাপসা হ'য়ে ওঠে অপ্রকাশ্য আনন্দ বিদ্যুতে। বাবার সঙ্গে আমরা শেল্টারের বাহিরে এলাম। উক্ত বন্ধুটি অদূরে central detective station এ কাজ করতেন, এবং সেই খানেই পরিবারসহ থাকতেন। ফিরে যাওয়ার সময় বলেন—হ্যাঁ, আর একটা কথা, এখানকার পুলিশ সাহেব আত্ম-সমর্পণের খবর পেয়ে আত্মহত্যা করেছেন এই কয়েক মিনিট হোল।

বাইরে এসে দেখি চারিদিকে অন্ধকার ও নীরব। গত বারো দিন যাবৎ কামানের হুঙ্কার এখন নিস্তব্ধ—উন্মুক্ত মাঠে দাঁড়ালে আর বোম মাথায় পড়ার ভয় নেই···মৃত্যুর বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্ন আজ অতীতের মধ্যে মিলিয়ে গেল··· জীবনের যেন একটা নূতন অভাবনীয় অধ্যায়ের রচনা হোল সুরু ··

দূর থেকে ভেসে আসে সাইরেনে অল-ক্লীয়ার ধ্বনি—যুদ্ধ-বিরতির সর্বপ্রথম সংকেত। অমনি শেল্টার থেকে দলে দলে লোক মহা কলোরবে বেরিয়ে আসে···প্রত্যেকের মুখে হাসির সে কী মধুরস্রোত। তারা যেন নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। পরিচিতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এক বৃদ্ধ প্যাট্রির আবেগ-ভরা কণ্ঠে বল্লেন,—The most gracious almighty has redeemed us at last!

সবাই নিজের ঘরে ফিরে যায় ···চোর-ডাকাতের চেয়ে জাপানী সৈন্যদের ভয়টাই সকলের বেশী·····। আমরাও ফিরে এলাম; সঙ্গে কতকগুলি বন্ধু এলেন শুধু রাত্রিটা কাটাতে।

স্বপ্নাবিষ্টের মত জানলার ধারে এসে দাঁড়াই। সুদীর্ঘ আটঘটি দিন পরে আজ ঝড় থামে। কিন্তু তার বীভৎস ছায়ার চারিধার প্রচ্ছন্ন। অসংখ্য নরনারীর বিকৃত হাহাকারে এখনো বাতাস কলুষিত।·····কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। সূচীভেদ্য ঘন অন্ধকারে মাটির অর্ধ-দগ্ধ শোণিতাক্ত রূপ নিমজ্জিত।·····শতাব্দীব্যাপী যার বিশাল সাম্রাজ্যের সূর্য্য কখনো অস্তমিত হয়নি···সেই পরাক্রমশালী ব্রিটীশ কেশরী সর্বপ্রথম প্রাণ ভীতির কাছে আজ পরাজিত·····

দশুর বছর ধরে নির্মিত দুর্জয় দুর্ভেদ্য দুর্গ মাত্র সাতদিনের ঝড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ··· বিজেতার কৃপাপ্রার্থী ·····

কোর্ট ক্যানিং কেল্লার সুউচ্চ শিখর থেকে একশো তেইশ বছর পরে ধরিত্রীতে-এক ব্রিটীশ বিমান ইউনিয়নজ্যাক!

তার স্থান দখল করে পরাজয়ের প্রতীক স্বরূপ শ্বেত-পতাকা·· ·· শুভসায়ী রাত্রে নিখিল বিশ্বে যে ঘোষণা করে রাত্রি-তাড়া-গড়ার চিরন্তন খেলা···সেদিন সেই শ্বেত-পতাকা যারা উড়িয়েছিল, তারাও কি কল্পনা করেছিল, দু'দিন পরে এ-ও আর উড়বে না এখানে?

কৌশিক মিলনের—মিলন সেতু

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

(৯)

সুনীতি যখন বাড়ী ফিরিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সারাদিনের পরিশ্রান্ত দেহ মন লইয়া একেবারে নিজের শয়ন গৃহে চলিয়া গিয়া চুপে চুপে চোক বুজিয়া কিছুক্ষণ অন্ততঃ বিছানায় শুইয়া পড়িয়া থাকার বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ভাগ্যের সে ইচ্ছা মোটেই ছিল না। সামনের বারান্দা দিয়া ভিতরের অনতি বৃহৎ বসিবার ঘরখানায় ঢুকিতেই যে দৃশ্য তার চোখে পড়িল, ইহার জন্য সে মনের মধ্যে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিলেও আজকের সন্ধ্যায় একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। শুধু মনেই নয়, শরীরেও সে আদৌ সুস্থ নাই। আঃ এটুকু বিশ্রাম, অন্ততঃ খানিকটা সময়ের জন্যও যদি সে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিতে পারিত! অতীতের স্মৃতি আজ তাকে একান্তরূপেই যে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে।

তার বাবা, এই বাড়ীর নিমি কর্ত্তা, চন্দ্রকুমার···ঘরটার দিকে মুখ করিয়াই খাড়া দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহারা তাঁর মোটের উপর একদিন বেশ ভালই ছিল, এখনও তার সবটা ধ্বংস হয় নাই, নাক চোখগুলায় তার স্পষ্ট চিহ্ন জাগিয়া আছে, মুখের কাটা তাহার মত হইয়া গেলেও গায়ের রংয়ে আজও সু-বর্ণের আভাষ পাওয়া যায়, মাথার চুলের মধ্যভাগে টাক পড়িতেছে, চোখের দৃষ্টি বিস্ফারিত ও রক্তাভ, ঠোঁটের পাশে মৃদু মৃদু ঘর্ম্মসিক্ত হাসি। মেয়েকে দেখিতে পাইয়াই তিনি একটা ছোবল মারিলেন, "কি, এতক্ষণে এলে! আজ আমার খেতে জোটেনি, সে খবরটা রাখো?"

সুনীতি অকারণেই ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, ঈষৎ কুণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, মাসী কি ভাল রাঁধেনি? পাঁড়েটাকে এত করে শেখাচ্ছি তবু—"

চন্দ্রকুমার জিহ্বা তালু সংযোগে একটা বিশেষরূপ ধ্বনি করিয়া বাধা দিলেন, "কোথায় তোমার পাঁড়ে? তাকে তো আমি গলাধাক্কা দিতে দিতে বাড়ী থেকে দূর করে দিয়েছি। রাঁধবে কে শুনি?"

সুনীতি একটুক্ষণ স্তব্ধ থাকিল, পরে সকলই আত্মগোপনের সহিত কহিল, "নতুন ঝিকে দিয়ে কিছু করিয়ে না হয় আনিয়ে খেলে না কেন? তুমি তো জানতে আমার ফিরতে একটু রাত হবে!"

চন্দ্রকুমার এই কথায় যেন আত্মমর্য্যাদায় দারুণ আঘাত পাইলেন, অকস্মাৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া সদর্পে ও সরোষে কহিয়া উঠিলেন, "তুমি কি মনে ভেবেছ পাঁড়েকে বিদায় দিয়ে আমি তোমার কি-মাসীকে বাড়ীতে থাকতে দিয়েছি? কেন? কেন দোষ? মেয়েমানুষ বলে? কিসের জন্যে? মেয়েমানুষ কি পুরুষ মানুষের চাইতে কোন কিছুতে কম? ওরা কি পুরুষের চেয়ে কম খায়, না কম পরে? খাটতে পারে কম? চুরি করেনা? মিথ্যের ঝুড়ি নয়? যত সব মন্দ কাজ সংসারের হয়, সবার মধ্যেই থাকে ওরা, ওরা ওরা"···

"বাবা!"

চন্দ্রকুমার একটা কটমট দিয়া আধ ফেরা হইয়া দাঁড়াইলেন, মুখে একটা তীব্র বিদ্রূপের কুটিল হাসি ফুটিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, তোমার গায়ে লাগলেই তো পারে, হেরেমাহুষ কি না! কিন্তু সত্যিকথা বলবো, হ্যাঁ বিশ্রীই বলবো তোমায় ভাল না লাগলেও বলবো, শুনলে?"

সুনীতি অতি মৃদু একটা নিশ্বাস ভিতরে ভিতরে চাপিয়া ফেলিয়া সংযতকণ্ঠে উত্তর করিল, "শুনেছি,..."

চন্দ্রকুমার নিজের খেয়ালেই বলিয়া চলিলেন, "হ্যাঁ শুনতেই হবে, হবেই শুনতে, না শুনলে আমি ছাড়বো কেন? কেন, কেন, কেন ছাড়বো শুনি? আমার বাড়ীতে আমি বাড়ীর কর্তা, চিরটাকাল ধ'রে শুনে আসছি, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম! আজকের দিনে কিসের জন্যে তার ব্যতিক্রম হবে শুনি? হঠাৎ কি পৃথিবীটা সূর্য্যের আকর্ষণ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে? রাত্রি দিন আর হচ্ছে না? তবে? তবে? আমারই বা কর্তৃত্ব নষ্ট হলে কিসের জন্যে না হতে যাব না! কিছুতেই না, কিছুতেই না, আমার যা খুসী হবে আমি কর্ব্বো,—কি চাকর বামুনদিদি বাসন-টাকুর যাকে ইচ্ছে হবে তাড়িয়ে দোব, রোখই নেই, কি করতে পার্ব্বে তুমি সুনীতি? পারো কিছু করতে?"

সুনীতি কি বলিবে, সে শুধু স্থির দাঁড়াইয়া রহিল, জানে তাকে এখনই রান্নাঘরের দিকে যাইতে হইবে, না গেলে রাত্রের আহার্য্য প্রস্তুত হইবে না। বাড়ীতে দ্বিতীয় প্রাণীটী পর্য্যন্ত নাই।

চন্দ্রকুমার কিন্তু মেয়ের নীরব ঔদাস্য পছন্দ করিলেন না, আরও খানিকটা উত্তেজিত হইয়া কথার উপর জোর দিয়া দিয়া পুনশ্চ তাহাকে প্রশ্ন করিলেন,—

"কি, চুপ করে রৈলে কেন? মনে করছো পার্ব্বে আমায় বাধা দিতে, না? কিন্তু এই আমি একটী কথায় বলে দিলুম, তোমাকে, সে তুমি, তুমি তো তুমি তোমার বাবা এলেও পার্ব্বে না, এ হ্যাঁ' কর্ব্বো সে শুধু আমি, আমিই কর্ব্বো। বুঝতে পেরেছ? হ্যাঁ কি না শিগ্‌গির বলো, শিগ্‌গির—"

এবার আর কথা না কহিলেই নয় দেখিয়া মৃদু নিক্কিপ্তস্বরে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে সুনীতি উত্তর করিল, "বুঝেছি বাবা, আমি এখন রান্নাঘরে যাচ্ছি,..."

সে পিছন ফিরিয়া চলিতে উদ্যত হইয়াই ফিরিতে বাধ্য হইল, চন্দ্রকুমার ডাক দিয়াছেন। সুনীতি ফিরিয়া দাঁড়াইলে মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিলেন, "হুঁ বুঝেছ! যদি বুঝতেই পারতে তা'হলে কি আমায় বলতে না যে, 'আমার বাবা তো তুমিই, তবে আমায় বলা হচ্ছে কেন যে তোমার বাবা এলেও পার্ব্বে না।' ব্যাঃ কি লেখাপড়া শিখলি এতদিনেরে? একটা 'হক' কথা বলতে ভরসা রাখিস্ না। আরে, চল্লি কোথায়? শোন, শোন, রান্না আর করতে তোকে হবে না. না হয় আজ নাই বা খেলুম! কি, নাঃ যা, যা, রাঁধগে যা, নাই বা রাঁধবি কেন? কেন শুনি? খেতে দিচ্ছিনে? পরতে দিচ্ছিনে? ওসব অম্‌নি হয়? একটা মেয়েছানা পোষা বড় চাট্টিখানি কথা কি না। রাঁধবি না তো কি করবি? মেয়েমাহুষে ছিল ভিটেয় ঘাস জন্মেছে বলে কি বাপকে কিং অর্জ্জ করে দিয়েছে না কি? যা, যা,..."

সুনীতি এ অপমানের ঘায়ে মূর্চ্ছা গেল না, বৎসরাবধি এ সমস্ত কথা সে ত অহোরাত্রই উঠিতে বসিতে ক্রমাগতই শুনিতেছে। এর চেয়ে আরও কত মর্ম্মকথাও তাকে শুনতে হইয়াছে, যে সব কথা অপর কেহ

মুখে উচ্চারণ করিতে সাহস করিলে, চন্দ্রকুমার হয়ত স্বহস্তে তাকে চাবুক পেটা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না, কিন্তু 'তেহি নো দিবসা গতাঃ,' চন্দ্রকুমার আজ তো আর সে চন্দ্রকুমার নাই।

(২)

কি নাই, ঠিকে ঝি হইলেও বাড়ীর মোটা কাজগুলি সেই চুকেলা করিয়া দিয়া যায়, বাসন মাজা কাপড় কাচা জল-এটিনা ঝাঁট-পাট সমস্তই. পাড়ে শুধুই রাঁধে না বাজার করে, খামখেয়ালী গৃহস্বামীর ফাই-ফরমাস সমস্তই খাটে, এক হাজা সাতবার করিয়া গরম করে, চালে একটী ধান একটী কাঁকর থাকিলে চলা থাকে না, রান্নার কাল হইলে বাটীশুদ্ধ সকলে তার পাছে গিয়া পড়ে, ঝাল নুন কম হইলে চারিদিকে ছড়াছড়ি হয়, তৎক্ষণাৎ নূতন তরকারি মাছ রাঁধিয়া দিতে হয়। অবশ্য সময় সময় নূতন রান্না করা হয় না, সুনীতির ও তার অংশের তিনিষগুলিকে কখন মশলা বাড়াইয়া কখন মশলা বুইয়া নূতন ধরণে দিয়া নবীন মূর্ত্তিতে সরবরাহ করা হয়। সুনীতি সুনলক্ষ্মী হেতুন গোনা দিয়া রাত যেটুকু না খাইলে নয়, খায়; পাড়ে দই মিষ্টি পয়সা পায়। এ রকম উপদ্রব বেশীদিন কে সহিবে? বামুন ঠাকুরকে দুজন দুমাসও কাটাইতে পারে নাই, তারপর কত জনই আসিল গেল, প্রাদেশিকতার কোনই বাছবিচার করা হয় নাই! পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব্বোত্তরাঞ্চলের সমস্ত জেলা উড়িষ্যা বিহারের দারভাঙ্গা ভাগলপুর পাটনা হইতে উত্তরপশ্চিমের গোরখপুর কেহই এ বাড়ীর রান্নাঘরে পদার্পণ করিতে বাকি রাখে নাই, যে একবার আসিয়াছে, সে আর তো আসে না এবং সাধ্য-পক্ষে অপরকেও বাধা দেয়। এক আধজন দুঃসাহসী মুখের উপর জবাব করিতে গিয়া মারও তো খাইয়াছে। লোক পাওয়া কঠিন!

সুনীতি ভোরে উঠিয়া বাসি-বাসন পোড়াকড়া লইয়া মাজিতে বসিল। রাঘবও সে রাত্রেই রান্নার পর ধুইয়া রাখিয়াছে। উনান ধরিতে দেরি হইবে, চায়ের কেৎলী ও সসপ্যান সে তেলতরা প্রাইমাস ষ্টোভের কাছে সাজাইয়া রাখিয়া বাসনগুলা তাড়াতাড়ি মাজিতেছিল। বাসনমাজা কাজটাতেই বড় বেশী কষ্ট হয়, বাবা যদি ঝিটাকেও অন্তত না তাড়াইতেন।

কিন্তু এসব ভাবিয়া লাভ কি? তার বাবা যদি "বাবাই" ই থাকিবেন, তবে এমন সব অস্বাভাবিক কাণ্ড করিবেনই বা কেন? একি তার পূর্ব্বাপর পরিচিত সেই স্নেহময় পিতা? মাত্র তিনটী বৎসর, তিন বৎসর তার মা মরিয়াছেন, আর এরই মধ্যে তাঁর এই অকল্পনীয় পরিবর্ত্তন। সুনীতির মানসনেত্রে ফুটিয়া উঠিল তার মায়ের মুখ, আপনার শক্তিতে সম্পূর্ণ ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যে অতি সহজ অথচ স্নিগ্ধ সহাস্য মুখে যেন পরম ঔদার্য্য মাখানো, কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তিই যে ছিলেন! বছর চল্লিশের কাছাকাছি বয়স হইয়াছিল, শরীর মনে কোথাও এতটুকু ক্লান্তি দেখা দেয় নাই, তেমনি তাঁর স্বামী-প্রেমের পরিপূর্ণ সরোবরেও না। ঠিক সেই তরুণ বয়সের মতই চন্দ্রকুমার স্ত্রীর আশেপাশে মুগ্ধ-মধুপের মতই প্রেমের গুঞ্জন গাহিয়া দুটী জীবনকে চিরশ্যামলতায় নবীন করিয়া রাখিয়াছিলেন। সংসার ছিল অভাবহীন জীবন ছিল পরিপূর্ণ। সেবাকুশল শুশ্রূষায় সমস্তই ছিল মধুময়। হাসে-লতে সুপ্রফুল্ল দিনগুলি ছিল ঠিক যেন অব্যাহত ছন্দে গাঁথা।

সহসা মেঘ না জমিতেই বাজ পড়িল। সুনীতির মা সুকুমারী অকস্মাৎ মারা গেলেন, সংসারে দারিদ্র্য আগুন, সে আগুন ধীরে ধীরে তাঁর সংসারকে পরিত্যক্ত পতি-পুত্রীকে ভস্মিভূত করিতেছে, ছাই হইয়া যাইতে বেশী আর বাকি নাই।

চন্দ্রকুমার পত্নীবিয়োগে মেয়েদের বিধবা হওয়ার চেয়েও বেশী শোকার্ত হইলেন, তাদেরই মত আমিষ আহার ত্যাগ করিলেন, চাকরী ছাড়িয়া অসময়ের শেনসনে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিলেন, গীতা-পাঠে—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে চিত্ত ঢালিয়া দিলেন, কিন্তু বেশীদিন এ ভাব রহিল না, এটা ক্রমান-বৈরাগ্যের মতই মাসকতক চলিয়াছিল এবং সুনীতির পক্ষে তখনও খুবই শান্তির ব্যাপার হয় নাই। ঘরে নাই আহার নাই সারারাত্রি কাতর দীর্ঘশ্বাস, চাপাক্রন্দনে অনাথাকে কাতর আহ্বান, মাতৃশোকাতুরা নিজের দুঃখেই যথেষ্ট কষ্ট পাইতেছে, বাপের এত কষ্ট সহ্য করা তার পক্ষে অসহনীয় মনে হইত। অথচ নিজের কষ্ট ভুলিয়া তাঁকেই সে একান্ত স্নেহে ও শ্রদ্ধায় নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিয়া থাকিত। বি এ পরীক্ষার পর এম্ এ পড়িবার যে কল্পনা ছিল, সে ইচ্ছা তাঁরই জন্য সে ত্যাগ করিল, অসহায় শোকাচ্ছন্ন বাপকে সে কার কাছে রাখিয়া দিয়া কলিকাতায় পড়িতে যাইবে!

সকল দেশেই প্রবাদ আছে, অতির গতি ভাল নয়; 'অতি দর্পে হতা লঙ্কা' ইত্যাদি, এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল! চন্দ্রকুমারের অতি শোক তাঁর অতিশয় পতনেরই কারণ হইয়া দাঁড়াইল। শুরু সপ্তাহত্যা ভিন্ন শাস্ত্রাধ্যয়ন অতি সাধারণ বুদ্ধিতে তার সত্যমূর্তিতে প্রকটিত হয় না, খোঁকের মাথায় পুঁথির পাতা উল্টাইয়া যাওয়াই চলে, চিত্তক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইয়া পল্লবিত ও পুষ্প প্রসবিনী ফলপ্রসূ হইতে পারেন।

কিছুদিন পরে নিদারুণ শাস্ত্র ছাড়িয়া চন্দ্রকুমার সাইকিক-সোসাইটীতে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। 'লেড্ বিটারের' 'অলিভার লজের' "ম্যাডাম্ ব্লাভট্স্কির"ও অন্যান্য কিছু কিছু পারলৌকিক বইপত্র একান্ত আগ্রহে পাঠ করিতে লাগিলেন, মনে হইল বুঝি এইবার একটা শান্তির সন্ধান পাইয়াছেন! ইহলোকের ও পরলোকের মাঝখানে যে একটা অতি শুভ্র এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম মিলন সেতু এই উভয় লোকের অধিবাসীদের একান্তরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, এইবার সেই তত্ত্বপুঞ্জের সন্ধান লাভ করিয়া তিনি সেই সেতু পার হইতে পারিয়াছেন। আর কি? এখন তাঁর প্রবাসিনী-প্রিয়া আর তাঁর অনধিগম্যা রহিবেন না, তাঁর অন্তরের নাস্তিক্যের শূন্যতা এইবার পূর্ণ হইয়া গেল!"

একদিন একান্ত আগ্রহভরে সুনীতিকে আনিয়া বলিলেন, "আজ একজন মিডিয়মের আসবার কথা আছে, তোমার মার খবর পাবো, তিনি নিশ্চয় আসবেন, তুমি যাবে?"

সুনীতি তার বাবার পুরাণো সোয়েটার রিপু করিতেছিল, হাত হইতে ফেলিয়া দিয়া সচকিতে দাঁড়াইয়া উঠিল, বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া আগ্রহব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, "যাবো বাবা, নিয়ে চলো।"

"বেশ, তৈরী হও,—" বলিয়া চন্দ্রকুমার স্ত্রীর জীবিতকালের মত কোঁচান মিহি ধুতী হাতে গিলা-করা আদ্দির পাঞ্জাবী পাতলা উড়ানী পরিয়া সাজিয়া আসিলেন, স্ত্রীর মৃত্যুর পর এ সব আলমারি হইতে বাহির করা হয় নাই। এতকালের পরিত্যক্ত সোয়েটের পাংশুলোড়া পাশে ফোঁস পড়াইয়া দিতে থাকিলেও তাদের

লোভ ত্যাগ করিতে পারিলেন না, আজ বহুদিনের অদর্শনের সমস্ত বিরহ বেদনা প্রশমিত করিয়া তপ্তনিদাঘের সমুদয় তাপদাহ জুড়াইয়া দিয়া নববর্ষার স্নিগ্ধ সলিল সম্পাতের মত সুকুমারী আসিবে, সে তো তাঁর এমন অপরিচ্ছন্ন বিমূর্ষণ বেশ সহ্য করিতে পারিবে না।

দ্বিতীয় স্বদেশী নয়, একজন বিদেশী পুরুষ। তিনি প্রথমতঃ আর একজনের বিদেহী আত্মীয়ের সঙ্গে মিলন সেতু বাঁধিয়া দিয়া তার পর চন্দ্রকুমারের প্রতি প্রশ্ন করিলেন ;—

"কা'কে চান ?"

আবেগ বিগলিত বিচলিতকণ্ঠে চন্দ্রকুমার উত্তর করিলেন, "আমার স্ত্রীকে, সুকুমারীকে—"

"আমি বলে দেখি, ছালো নিষ্টার মিথ ! আপনি কি এঁর স্ত্রীকে চেনে আনতে পার্বেন ?—"

প্রত্যুত্তরে ফুলস্কেপটিতে লিখিত হইল ;—"আমি তো তাঁকে চিনি না, তবে এইখানে একজন মেডি দাঁড়িয়ে আছেন এবং ঐ ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে হাসছেন ; হতে পারে তিনিই ওঁর স্ত্রী।"

"আপনি প্রশ্ন করুন ;—"

চন্দ্রকুমার দু'তিনবারের চেষ্টার পর গলা সাফ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"সুকু, এসেছ ?"—

উত্তর হইল, "অনেকক্ষণ। আমি তো তোমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকি।"

চন্দ্রকুমারের চোখ দুইটা তার চশমার পরকলার মধ্য দিয়া চকচকে হইয়া উঠিল, আনন্দ-স্মিতমুখে সে করিয়া উঠিল, "সত্যি থাকো ? সর্বক্ষণ ? তবে দেখা দাও না কেন ?"

উত্তর হইল, "কি রকম কথাই বলে ! দেখা দিই, আর তুমি ভূত দেখেছ বলে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করো, রোজা ডেকে আমায় সর্ষে-পড়া খাওয়াও !"

চন্দ্রকুমারের সেই উজ্জ্বল দৃষ্টি সলিলার্দ্র হইয়া গেল, সঙ্কোচে উচ্চারণ করিলেন, "আবার তুমি তাই ভাবো !"

"হয়েছে, রাগ করতে হবে না আর, অমন দশা করে থাকো কেন ?"

"কি দশা ?"

"বাঃ জানো না যেন ! নাপিতকে দোষাকে ভাতে মেরে দাড়ি বয়কট করে, কিম্ভূতকিমাকার হয়ে ওসব কি হচ্ছে ?"

চন্দ্রকুমার একটা প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাসে যেন সমস্ত মনটাকে একমুহূর্ত্তে হাল্কা করিয়া ফেলিলেন, তাঁর সমুদয় আত্মত্যাগ তাহা হইলে সার্থকতা লাভ করিয়াছে ! সকল কষ্ট সফল হইয়াছে ! বলিলেন, আগ্রহ মৃদুকণ্ঠে বলিলেন ; "তোমায় ছেড়ে কিছুই আমার ভাল লাগে না যে সুকু ! তুমি কেন আমায় ছেড়ে গেলে বলো ?"

অদৃশ্য সুকু উত্তর লিখিল, "আমি কি ইচ্ছা করে গেছি ? নিয়তি আমায় টেনে এনেছে, তাই বলে অত কুড়ে হলে কখন চলে !"

"কুড়ে !" সবিস্ময় অর্দ্ধস্ফুট আর্ত্তনাদ। "কুড়ে !"

"তা' না তো কি! চাকরী ছাড়লে কি আছে, পুরুষ মানুষ কাজকর্ম ছেড়ে ঘরে বসে থাকলে শরীর মন ভাল থাকে কখন? কি চেহারা করেছ আয়নিতে কি চেয়ে দেখ না?"

আবার মনটা প্রসাদ প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিল; "কি হবে শরীর নিয়ে, তোমার কাছে যত শীগ্‌গির যেতে পারি ততই তো ভাল।"

"আহা কি কথাই বল্লেন! আর আমার মেয়েটার! ওর কি বিয়ে দেবে না? পড়া তো ছাড়িয়েইছো!"

ঠিক সুকুমারীরই চরিত্রগত পরিচয়! ঈষৎ অভিমানে চন্দ্রকুমার উত্তর দিলেন, "পড়া আমি ওর ছাড়াইনি সুকু! ও নিজেই ছেড়েছে, আর বিয়ের কথা তো একটা দুটো হচ্ছে, ওই রাজী হয় না।"

"হ্যাঁ সে তোমারই সঙ্গে! তুমি যদি সহজভাবে থাকতে ওকে তোমার জন্যে অত ভাবতে কষ্ট পেতে হতো না! আচ্ছা আজ যাই, দেরী আর থাকতে পারছি না, কষ্ট হচ্ছে।"

সেই পত্নি-পত্নী সেই মান-অভিমান সেই কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্যের হিসাব নিকাশ! তবে আর বাকি কি? চায়ার কোথায়? শুধু যদি একবার চোখের দেখাটা দেখা যাইত!

চন্দ্রকুমার আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া যেখানে যত ছোট বড় বিডিয়াদের খবর সংগ্রহ করিতে পারিল, ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু সত্যই তো আর ব্যাপারটা অত সহজসাধ্য নয়! টেবিল ঠোকা, প্ল্যানচেট নামান, অনেক কিছুই হইল, তবুও এমন কিছুই মিলিল না যাহাতে অন্তর হইতে বিশ্বাস করিতে পারা যায় যে, সত্যই তার অপগতা প্রিয়-পত্নী বিদেহী সুকুমারীই তার সঙ্গে কথাবার্তা কহিতেছে! সে রহস্যালাপ, সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মিলিল না।

প্রায় বৎসরের পরে আবার সেই পূর্ব্বতন বিডিয়াম তাদের "সাইকিক্যাল-রিসার্চ সোসাইটীতে" দেখা দিলেন। চন্দ্রকুমার সুনীতিকে খবর না দিলেও সে তার বাবার সাড়াশব্দ পেয়ে ঘরে বসিয়া আদরে করিয়াছিল, সঙ্গ লইল।

সুকুমারী এবার অন্য সুরে কথা কহিল, বলিল; "কেন তুমি অমন করে আমায় দিনরাত টানাটানি করছো? নিজেও দুঃখ পাচ্ছো, আমাকেও দিচ্ছো, আমায় ভুলে যাবার চেষ্টা কেন করছো না!"

আহতের আর্ত্তস্বরে চন্দ্রকুমার ঈষৎ উচ্চ কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "তোমায় ভুলে যেতে বলছো? কেন, আমায় তুমি আর চাও না, তোমায় আমি স্মরণ করে দুঃখ দিচ্ছি! এমন নিষ্ঠুর হয়ে গেছ তুমি?"

উত্তর দিল সুকুমারীর বিদেহী আত্মা, না সূক্ষ্মদেহী সুকুমারীই তো আত্মা তো কথা কয় না।

"হ্যাঁ সবাই হয়, নিষ্ঠুর না হলে যদি পৃথিবীর দিকে শত দৃষ্টি হয়ে চেয়ে থাকতো,—উন্নতি কর না, কেমন করে? তুমি আমায় আর ডেকো না, ডাকলেও আর আমি আসবো না।"

"উঃ, এত নিষ্ঠুর তুমি কেমন করে হ'লে সুকুমারী? আমার প্রতি এতটুকুও টান আর তোমার নেই? অথচ আমি তোমার জন্য অহর্নিশি কেঁদে ফিরছি।"

অশ্রুসিক্ত হস্তের সবল অক্ষরে লিখিত হইল, "তা জানি, আর সেই জন্যেই আমি তোমায় ডাকে সাড়া দোব না স্থির করেছি। মৃতের পিছনে ছুটে বেড়ালে ইহপরলোকের কোনই উপকার নেই। তার চেয়ে মেয়ের ভাল বিয়ে দাও, ধর্ম্মের দিকে মতি দাও, ভবিষ্যতে মঙ্গল হবে।"

চন্দ্রকুমার সুগভীর অভিমানভরে কহিয়া উঠিলেন, "তুমিই যদি আমায় ভুলে যাও, তবে ইহপরলোকে ভাল মন্দ কি হলো না হলো, কি আমার তা'তে এলো গেল? চাই না আমার ভবিষ্যতের মঙ্গল।"

অতি দুঃখিত ধীরা ধীরা কলমে এই কথাগুলি লিখিত হইল —"নিয়তি অখণ্ডনীয় হ'লেও তার নিমিত্ত কারণ আমিই হলেম! কিন্তু কি করবো এ আমারও নিয়তি! এখনও শান্ত হবার চেষ্টা করো, ভগবান্ গ্রহণ করো, তা'তে রুচি না হয় এই মন্ত্র জপো।"

"এই মহামন্ত্র লিখিয়া দিন।" জপ করো, যাবৎ অমঙ্গল ঘটতে পারে, সাবধান করে দিচ্ছি এখনও আত্মস্থ হও। আমি চাইনে, আর ডেকো না। খুকি, তুই একটীও কথা বলতে পারলিনে মা? দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে বিস্তর, আশীর্ব্বাদ করছি তোমার শেষ ভাল হবে।"

চন্দ্রকুমার উচ্চ চিৎকারে ডাকিয়া উঠিলেন, "সুকুমারী! সুকুমারী! খুকু! খুকু!" তারপর আছড়াইয়া খাটিতে পড়িয়া চেতনা হারাইলেন, যখন সংজ্ঞা ফিরিল, মস্তিষ্ক সম্পূর্ণরূপেই বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

সেই ইহপরলোক হইতে গভীর বাধাহত চিত্তের নিগূঢ় সাবধানতায় যাঁর একটা নিদারুণ অমঙ্গলের নির্দ্দেশ দিয়াছিল, সে যে এমন মুখামুখি আগাইয়া আসিয়া আক্রমণ করে প্রস্তুত হইয়াছিল কে' তাহা জানিত! মাসের পর মাস অতিবাহিত হইয়া চলিয়া গেল, কোন ব্যতিক্রম ঘটিল না, চন্দ্রকুমার তাঁর চন্দ্রকিরণেরই মত পরম রমণীয় স্নিগ্ধ শীতলতা পরিহারপূর্ব্বক দিনের পর দিন ক্রমশই তপ্ত নিদাঘের উগ্রজ্বালা তাঁর চারিদিকে বিস্তারিত করিতে থাকিলেন, ফলে নিজের ত যা' হইল তা' হইল, ধরিয়া ধরিয়া মরিতে লাগিল কন্যা সুনীতি। জ্বালার তার পরিসীমা রহিল না। কলেজ সে ছাড়িয়াছে, এফ্ এ পরীক্ষা না হয় নাই দিল, বাপের জন্য এটুকু ত্যাগ স্বীকার করা সে কিছু তার পক্ষে খুব বেশী কথা নয়; কিন্তু এই যে দিনের পর দিন সমস্ত মানসীক ব্যাপারের উপর এতখানি শারীরিক কষ্ট, অনভ্যস্ত শরীর যে আর এই ক্লেশভার বহন করিতে স্বীকৃত হইতেছে না। মাথা ঘুরিয়া কতদিন রান্নাঘরেই পড়ে পড়ে হয়, কোনমতে সামলাইয়া লয়, বুক প্রায়ই ধড়ফড় করে, দেহ শীর্ণ, বর্ণ মলিন হইয়া যাইতেছে, তার আতঙ্ক বিস্ফারিত সুন্দর দুটী চোখের কোণে অর্দ্ধবৃত্তাকারে কালির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে, অথচ কতই বা তার বয়স! এই বয়সেই তো মেয়েরা খাইয়া পরিয়া পড়াশোনা করিয়া ভবিষ্যতের সুখময় দাম্পত্য জীবনের জন্য নিজেদের তৈরি করিয়া লয়। সুনীতির সকরুণ শান্ত মুখখানি দেখিলেই একটী আলোকশিখা নেবা প্রদীপের কথা স্বতঃই মনে পড়ে।

খিড়কির দরজাটার বাহিরের দিকের কড়াটা খুটখুট করিয়া ঈষৎ নড়িল, কে' যেন অতি মৃদু সঙ্কোচে সন্দেহ-জড়িতে সসঙ্কোচে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে। কে? সুনীতি ছাইবাধা হাত দুইয়া উঠিয়া গিয়া দরজা

খুলিয়া দিল। মায়ের বাড়িয়ে দাঁড়াইয়া নূতন বিভাড়িতা কি শিবানীর মা। সুনীতির কাছে আসিয়া গলার স্বর নামাইয়া কথা কহিল, বলিল;—"মাইনেটা দেবে দিদিমণি? মাস কাবার ত আর আটদিন হয়ে গেছে, বাড়ীউলি রক্ত তাগাদা করছে দিয়ে যেতে।"

সুনীতি যেন একটা পথ পাইল, বলিল, "তা দিচ্ছি, তুই চলে গেলি কেন ভাই, জানিস্‌তো বাবার কি অবস্থা, তোদের কি একটুও মায়া হয় না রে?"

তার কথাগুলা শেষদিকে গাঢ় হইয়া কণ্ঠের মধ্যে জড়াইয়া আসিল। শিবানীর মা কহিল, "সে ত সবই জানি দিদি, কি করবো, আমি নিজে ত চলে যাইনি, সেদিকালে ধাক্কা দিতে দিতে. বেরো মাগী, বেরো মাগী' বলতে বলতে সদর রাস্তায় বার করে দিয়ে কটক বন্ধ করে দিয়ে এলেন, আমি কি কর্ত্তো বল? সাতরাতটা তোমার কথাই ভেবেছি।"

সুনীতির আতঙ্কিত মন যেন সহিতে পারিতেছিল না, নিদারুণ শুমোটের পর এতটুকু হাওয়ার ছোঁয়াতেই তার দুচোখ বহিয়া একটানা জল ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল, সে বড় কাতরতার সহিত ঝিয়ের একটা হাত চাপিয়া ধরিল; "আমি বড্ড একলা শিবুর মা, তুমি আমায় ফেলে যাও, তুমি ফিরে এস ভাই, ফিরে এস।"

এ সব শ্রেণীর চিত্তের স্বার্থপরতা খুবই বেশী দেখা যায়, তথাপি মানুষ মাত্রেরই মধ্যে একটা দুর্ব্বলস্থান আছে, দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে সেখানে স্পর্শ লাগিলে তাকে এক মুহূর্ত্তে উদারতর করিয়া তুলিতেও বাধে না। সে আজ যে মাহিনার ছুতা করিয়া আসিয়াছিল, সেটা এই সুনীতির প্রতি অনুকম্পাতেই, নহিলে মাহিনা সে প্রয়োজন মত লইবে বলিয়া নিজেই সুনীতির কাছে জমা রাখিয়াছিল। তথাপি বিগলিতভাবে কহিল, "থাকলুম না হয়, ভিক্ষন্ বাবু যদি থাকতে না দেয়, দেখেছ তো' মানুষ জনের উপর বড় নারাজ, কেবলি বলে, রাক্ষসের মত খাচ্ছে, কোনদিন আমায় খাবে, বিদায় করো, বিদায় করো।"

"তুমি খিড়কি দিয়ে এসে কাজ করে বেরিয়ে যেও, বাবা দেখতে পাবেন না।"

ঝি রাজী হইল।

(৩)

পরের দিন সকালবেলায় চন্দ্রকুমার যখন নীচে নামিয়া আসিলেন, যেন সে মানুষ নয়। চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরে ঢুকিতেছিলেন, হঠাৎ সামনাসামনি দেখা হইয়া গেল সুনীতির সঙ্গে। সে তখন ব্যস্তভাবে গরম জলের কেৎলী খাড়ন দিয়া ধরিয়া ভিতর দিকের দরজাটা দিয়া ঘুরে ঢুকিতেছিল। চন্দ্রকুমার সুস্পষ্টরূপেই চমকাইয়া উঠিলেন, তাঁর ম্লান মুখ ম্লানতর হইয়া গেল, সঙ্কোচে দৃষ্টি নত করিয়া দরজার সামনেই দাঁড়াইয়া

ভারতের সুবিখ্যাত
নৃত্যনিপুণা ছায়াচিত্র
শিল্পী শ্রীমতী সাধনা বসু
বলেন—

ওটীন ক্রীম
অপরিহার্য্য

নাট্য ও ছায়াচিত্র
জগতের অপরাপর
সুপ্রসিদ্ধ অভিনেত্রীরাও
এই অভিমত সমর্থন
করেন।

OATINE CREAM is indispensable for my toilet. I have been using it for a long time, and find it delightful, and extremely necessary to preserve a perfect skin.

Sadhona Bose

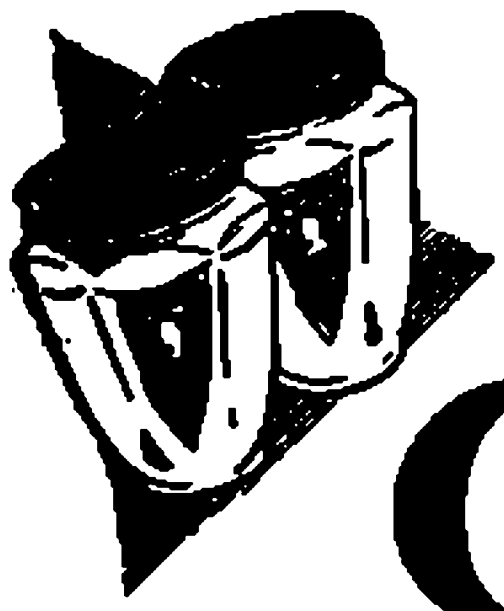

Oatine

SNOW for DAY • CREAM for NIGHT

হইলেন, অগ্রসর হইতে আর পা উঠিল না। সুনীতি অতটা লক্ষ্য করে নাই, আর করিলেই বা কি, এরকম ঘটনা তো এই বৎসর কাটিতে যায়, তাদের নৈমিত্তিক নয়, নিত্য ঘটনা। প্রথম প্রথম জ্ঞানশূন্য হইয়া লোক তাড়ানো এবং তারপর অনুতপ্ত হইয়া ক্ষেদের কাছে মার্জ্জনাভিক্ষা এমন কি, সেই বিভীষিকা যদি তখন সম্মুখে থাকে, তাদের কাছেও হাতে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে কিছুমাত্র বাধে না, আবার দিন-দোগিসেই অকস্মাৎ যায় যায় শব্দে পূর্ব্বকৃত ব্যাপারেরই পুনরভিনয়! উঃ নিদারুণ, নিদারুণ সে সব দৃশ্য, সহ্য করা সে যে কি কঠিন!

বাকী দিয়া চা ছাঁকিতে ছাঁকিতে সুনীতি ডাকিল, "এসো বাবা! তক্ষণ মাখন-মিছরিটা খেয়ে নাও।" সে অন্য হাত দিয়া ট্রাঁয়ের প্লেটে সাজানো মাখন-মিশ্রি খোসা ছাড়ানো বাদামও দিয়ে দুধের সঙ্গে বাটী তিনি এবং ক্রীম মাখানো টোষ্ট দুখানি বাপের চেয়ারের দিকে ঠেলিয়া দিল।

চন্দ্রকুমার কবিরাজী মতে এবং পূর্ব্বাভ্যাস মতে ঠাণ্ডা ও গরম প্রেসক্রিপ্‌সন এক সঙ্গেই ব্যবহার করিয়া থাকেন, আপত্তি করিয়া কোনই লাভ ছিল না। মেয়ের সরল কণ্ঠস্বরে ও মুখভাবে চোখ তুলিয়া দেখিয়া একটু যেন সঙ্কোচ কাটিল, অগ্রসর হইয়া আসিয়া আসন গ্রহণ করিতে করিতে মৃদু-কণ্ঠস্বরে কহিয়া উঠিলেন, "দেখিস মা হাত পোড়াস্‌নি যেন, ঢের সময় আছে, অত ব্যস্ত হ'তে হবে না।"

সুনীতির চাপা ঠোঁটের কোণের কাছে একটী বিন্দু হাসির রশ্মি অতি সন্তর্পণে ফোটে ফোটে হইয়াও সাহস করিয়া ফুটিতে পারিল না, সকোতুকে সেটুকুকে সে ভিতরে চালিয়া লইতেই মনে পড়িল, এই কথাই তার বাপ একপেয়ালা তৈরি চা তাঁর দিকে অগ্রসর করিয়া দিতে গেলেও কতবারই না বলিয়াছেন! "বাবা, কিছু খাচ্ছো না যে, খাও—"

চন্দ্রকুমারের যেন চটকা ভাঙ্গিয়া গেল, "অ্যাঁ, খাচ্ছি না! হ্যাঁ, হ্যাঁ, খাচ্ছি নাই তো, নাঃ খাবো না, তুই কি রকম রোগা হয়ে গেছিস্, আর আমি ভালমন্দ খেয়ে খেয়ে দিনকের দিন পেট্টা-সুর হচ্ছি! দেখছিস না, কত মোটা হয়েছি, তোর মা যদি এখন আমায় দেখে, চিনতে পারে? কক্ষণ পারে না।"

সুনীতি প্রমাদ গণিল, তাড়াতাড়ি করিয়া বলিল, নিশ্চয় পারেন, মা তোমার কত রকম তৈরী করে করে খাওয়াতেন, সে কি রোগা হ'বার জন্যে? তুমি না খেলে তাঁর কষ্ট হবে না?"

সর্ব্বনাশ! কেনই বা সে এমন কথাটা হঠাৎ বলিয়া ফেলিল! —উঃ কেন মরিতে বলিল!

ঝন্ ঝন্ শব্দে হাতের প্লেটখানা টান মারিয়া মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া চন্দ্রকুমার লাফাইয়া উঠিয়া দুহাত তুলিয়া চিৎকার আরম্ভ করিলেন:—

"কে বল্লে তোকে? কে বল্লে তোকে, তার কষ্ট হবে কে তোকে বলেছে? বল্ বল্ শিগ্‌গির বল্,—বল্— না হ'লে আজ তোকে আস্ত পুঁতে ফেলবো। মেয়ে বলে কিছু বলি না বলে! তার যদি আমার জন্যে এতটুকুও কষ্ট হতো, তা হলে সে বলতে পারতো, 'তাকলেও আর আসবো না!' মেকরহারাম-বেইমান কোথাকার! আর তুই তুইও তো তারই গর্ভের মেয়ে কই, বল্‌তে পারলি না তো, কি করে তুই জান্‌লি যে তার কষ্ট হয়! বল্ কে তোকে একথা বলেছে? বল, না হলে তোকে আজ কেটে ফেলে ভাসিয়ে দোবো।"

"আমি বলেছি ওঁকে,—"

সুনীতির হাত কাঁপিয়া চায়ের পেয়ালার খানিকটা চলকাইয়া টেবিলক্লথে পড়িয়া গেল, বাপকে দিবার জন্ত সে পেয়ালাটা হাতে লইয়াছিল, নামাইতে ভুলিয়া গিয়াছে।

"কি, কি বলে? তুমি বলেছ? তুমি, তুমি, তুমি কি জানো যে বলেছ? সুকুমারীর সঙ্গে তোমার কি দেখা হয়েছিল না কি যে তুমি তার মনের খবর ওকে দিতে গিয়েছ? আস্পর্দ্ধা তো কম নয় তোমার? বেরোও—বেরোও, গেট-আউট, গেট-আউট,—'চন্দ্রকুমার আগন্তুককে তাড়া করিয়া গেলেন।

যে আসিয়া ঐ কথা বলিয়াছিল, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ প্রমাণ মাপের বেশ একজন সুশ্রী যুবক সে, সাজসজ্জাও তার ভদ্রশ্রেণীর তারণ্যোচিতই, মুখের ভাবটী তারী স্নিগ্ধ ও আকর্ষণীয়। সে তার স্বভাব-মধুরকণ্ঠে ধীরস্বরে উত্তর করিল, "আমার চেনা একজন মিডিয়াম আছে, আমি তারই খুঁতে সকার সঙ্গেই কথা কইতে পারি কি না, আপনার কথা আমাদের কলেজে পড়তেন, ডিসেক্টিং ক্লাবে আলাপও একটু হয়েছিল, সেদিন হঠাৎ ট্রামে দেখা হ'তে, উনি আমায় জিজ্ঞাসা করেন, কোন মিডিয়ামকে চিনি কি না, তাই একজনকার খবর ওঁকে বলতে এসেছি। খুব ভাল মিডিয়াম, ধরে চাইবেন, তাকে তিনি ডেকে দেবেন। চেনা-শোনার অত-শত ধার ধারেন না। গ্ল্যাডষ্টোন বলুন, গ্ল্যাডষ্টোনকে পাবেন, টান যদি নেপোলিয়ানকে তাই তাই, সাজাহান বাদশাহকে পাওয়া যায় কি না অবশ্য আমি ঠিক বলতে পারিনে, সম্প্রতি পাকিস্থানে বাস করবার জন্তে যদি অবতার টবতার হয়ে থাকেন, সে খোঁজ জানেন, নৈলে নিশ্চয়ই আসবেন, নাদিরশা, তৈমুরের, হুমুডাকাতের অবতার হয়ে গেছে-ওঁদের কটীকে শুধু পাবেন না।"

চন্দ্রকুমার ধৈর্য্য ধরিয়া দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন, অসহিষ্ণু হইয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'কোকুড়ি রাখো, রাখো! কোথায় থাকে তোমার মিডিয়ম? নিয়ে চলো আমাকে সেইখানে, এক্ষুনি নিয়ে চল।'

সুনীতির মুখখানা মরামুখের মত সাদা হইয়া গিয়াছে, সে তার কম্পিত ওষ্ঠাধরে কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু বলা হইল না, হাতের ইঙ্গিতে উহাকে থামাইয়া দিয়া আগন্তুক সপ্রতিভ স্নিগ্ধ হাস্তে উত্তর দিল, "আপনাকে সেখানে কোন দুঃখে নিয়ে যাবো, তাঁকেই এখানে আজ রাত্রে আমি আনছি যে। এইখানে নিজ বাড়ীঘর, এইখানে এলেই না তাঁর মনটা তৃপ্ত হবে, তা ছাড়া দেখুন, আপনি অত স্থিরের মধ্যে ডাকতেন বলেই তো তিনি আসবেন না বলেছিলেন। নিজে এসে ওঁকে বলুন;—হিঁদুঘরের বউ মানুষ তো যতই হোক, সাহেব টাহেবের হাত ধরা কি আর পছন্দ করতে পারে! এ রকম কেস্ ওঁর কাছে বিস্তর এসেছে কি না, ওঁরই কাছে আমার শোনা। তাই বলছি দেখবেন, ঠিক তাই ঘটেছে। আচ্ছা, সুনীতি দেবি! দিন না ওঁর চা টা এগিয়ে, আর যদি থাকে তো আমাকেও এক, না হয় তো আধ পেয়ালাটাক, অবশ্য নিজের জন্তেও একটু রাখবেন, নানা সমস্তটা আমার ছেলে 'ধিচ্চেন কেন? আছে আরও? কই চালুন তো দেখি, আচ্ছা —তাহলে বিস্কুট ছুটো চন্দ্রবাবু না কি বলবো? জ্যেঠামশাই? হ্যাঁ, খেয়ে নিন, আর বেশ করে তেল মেখে স্নান আহার করে একটু নিদ্রা দেবেন, বৈকালে চা ইত্যাদি খেয়ে তৈরি থাকবেন, সন্ধ্যা হলেই ওঁকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে আসবো। আর আপনি সুনীতি দেবি, একটা কাজ করবেন, একটী নির্জ্জন দেখে ঘর পরিষ্কার

মুখে মুছে ধূপ জেলে, ফুল সাজিয়ে চন্দনের ছড়া দিয়ে একটী ছোট্ট চৌকিতে কাগজ পেনসিল রেখে যেন্নে। নিজে স্নান করে একটী ধৌতবস্ত্র পরিধান, কপালে দেবেন শ্বেতচন্দনের প্রলেপ, চাই কি আপনারই হাত দিয়ে লেখা যায় হ'তেও পারে, ওঁর সে রকম শক্তিও আছে। বেশ, সব ঠিক থাকলো, প্রণাম জ্যেঠামশাই! নমস্কার সুনীতি দেবি! চল্লেম!"

অদ্ভুত! ঝড়ের মত আসিয়া তেম্‌নি করিয়াই চলিয়া গেল, কিন্তু কি অসাধ্যসাধনই সে করিয়া গেল সে শুধু জানিল সুনীতি! স্তম্ভিত একটা বাধকে গেল নিরীহ ছেড়া বানাইয়া দিয়া! যে এ কাজটা করিল সে তার একান্তই অপরিচিত, অথচ এমন সব কথা যা' অন্যের পক্ষে জানা সম্ভব নয় কেমন করিয়াই বা বলিল।

দিন ভোর ভাবিয়া ভাবিয়াও সুনীতি এই অপূর্ব্ব রহস্যের কোন সুমীমাংসা করিতে পারে নাই যে সকল কথা এই অপরিচিত তরুণ তার মুখের উপর বলিয়া গেল তার মধ্যের প্রায় সমস্তটাই তো মিথ্যা। কলেজে সে এর সঙ্গে পড়ে নাই, কোন ডিবেটিং ক্লাবে যোগ সে দেয় নাই, দিবার অবসর তার কোথায় যে দিবে, ইহাকে কোনদিন সে চোখে দেখিয়াছে, এমনও তার স্মরণ হইল না। অথচ এমন সব কথা এ বলিয়া গেল, যেকথা বাহিরের কোন লোকেরই জানা সম্ভব নয়। তবে কি সত্যসত্যই এ যা বলিল সব সত্য? তার মা-ই মিভিনমের মুখ দিয়া সত্যসত্যই স্বামীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে সম্মত হইয়াছেন? তিনি তো সবই দেখিতে পাইতেছেন, তবে উহাকে দেখিতে পাইলে প্রতিবিধান না করিবেনই বা কেন? তার সমস্ত শরীর আনন্দে আশ্বাসে কৃতজ্ঞতায় রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, দুটী চোখ দিয়া অজস্র ব্যথাবিজড়িত আনন্দাশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, অভিমানে, আনন্দে সংমিশ্রিত গদগদকণ্ঠে অস্ফুটস্বরে সে ক্রমাগত উচ্চারণ করিতে লাগিল; "মা! মা! ওমা, মা! মাগো! মা আমার! আমার মা! আমার মা!

এতদিনকার সমুদয় দুঃখ অভিমান যেন নিঃশেষ হইয়া সেই অশ্রুজলের সঙ্গে তার মনের মধ্য হইতে ধৌত হইয়া যাইতে লাগিল। অপরাধের কুণ্ঠায় মরিয়া গিয়া মনে মনে ক্ষমা চাহিতে চাহিতে পুনঃপুন বলিতে লাগিল, "কত অন্যায় কথা তোমায় আমি বলেছি মা! স্বার্থপর বলে কত অনুযোগ যে করেছি, সে সব তুমি নির্দ্দোষ বলে আমায় ক্ষমা কর্ব্বে ত? আমি তো কর্ত্রী নই, মা নই কেমন করে তাদের মনের কথা বুঝতে পার্ব্বো? আমার বাবা এত দুঃখ পাচ্ছেন, শুধু তোমার বৎসরান্তে একটী দিনের দেখা দেওয়া—না তাও নয় একটু লিখে জানানো এইটুকুও তুমি কেন পার্ব্বে না বলে, এই ভেবে কত রাগ করেছি, কিন্তু তুমি তো থাকতে পারোনি, এই তো সুযোগ পেতেই আপনি এসেছ, একজন অপরিচিতের কাছে—"

"সুনীতি!"

বজ্রনির্ঘোষে আহ্বান আসিল। সচকিত সুনীতি উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল রুদ্র মূর্ত্তিতে চন্দ্রকুমার অদূরে মুখভঙ্গী করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

(৫)

সন্ধ্যার অল্প পরেই টাঙ্গি হইতে নামিয়া দুটী লোক ঘরে আসিয়া ঢুকিল, দ্বারের জন্ম খোলাই ছিল, পিতা-পুত্রী প্রতীক্ষামান হইয়া সংশয়াচ্ছন্ন-চিত্তে পুনঃ পুনঃ দেওয়ালে টাঙ্গানো ঘড়িটার কাঁটার দিকে চাহিতেছিলেন। বিদ্ব দেখিয়া ভয়ে সুনীতির বুক চিপচিপ করিতে আরম্ভ করিল, যদি তারা না আসে, তখন কি যে হইবে, সে কথা ভাবিতেও তার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে।

যারা দুজন ঘরে ঢুকিল, তাদের মধ্যের একজন সেই সকাল বেলার ছেলেটী, আর একজন? সুনীতি সবিস্ময়ে দেখিল, মাথায় জটা, মুখে ছাইমাখা ঈষৎ নবীন শুভ্র সংযুক্ত এক গেরুয়া-পরা সাধু।

সাধুদের তো বয়স বুঝা যায় না, মুখে তার উপর ভস্মমাখা ও মাথার উপর চূড়াকারে বাঁধা কপিশবর্ণের জটার ছায়ায় অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত। চন্দ্রকুমার ভক্তিভরে প্রণত হইতে যাইতেই সাধু ত্রস্তে বেশ খানিকটা পিছু হটিয়া গিয়া দুই কর বুক করিয়া, গম্ভীরস্বরে উচ্চারণ করিলেন, "নারায়ণ! নারায়ণ!"

ওঁর সাড়ি সম্ভ্রমে চন্দ্রকুমারকে প্রণামপূর্বক কহিল, "ওঁরা যে সর্ব্বভূতে নারায়ণের অধিষ্ঠান দেখেন কিনা, প্রণাম তো কাকে নেন্ না, জেঠামশাই! শুধু বলবেন, "নমো নারায়ণ।" চন্দ্রকুমার প্রীত হইয়া ঐকথাই উচ্চারণ করিলেন।

পূজার ঘরে আসিয়া চক্রে বসা হইলে, সাধুর হাত দিয়া লেখা হইলে; "কি ব্যাপার! এমন করে রাষ্ট্র-বিপ্লব করছো কেন? আমার সাধের পাতা সংসারটাকে একেবারে ছত্রছাড়া করে ছাড়বে?"

চন্দ্রকুমার ঈষৎ অপ্রস্তুত হইলেও বিশেষ অপ্রতিভ, একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া উত্তর দিলেন, "তুমি কেন আমায় ভুলে যেতে বসে ছিলে, আমি তোমার কাছে যাবার জন্ম পথ চেয়ে দিন গুণছিলুম, কেন আমায় সে স্বপ্ন ভেঙ্গে দিলে?"

"হুঁ, স্বপ্ন ভাঙ্গলে শিশুরাই তো হাত-পা ছুড়ে কেঁদে ওঠে; তুমিও যে তাদেরই মধ্যের একটী, সে কথা আমার মনে ছিল না! যাহোক খুব শোধটা নিলে। বোঝ এতো চুলোয় চবে গেছে, এই সাত আট মাস ধরে প্রত্যেক মানুষের মনের দোরে দোরে উঁকি পেকে পেকে ঘুরে বেড়িয়েছি একমাত্র চিন্তা কার দ্বারা মহারাজের দরবারে হাজির হই! অবশেষে এই মহাশ্মার এই মহাপুরুষের দর্শনলাভ করে তবেই এই দুর্লভ পায়ারার পায়ে ঘুরতে পেরেছি। এখন আজ্ঞা হোক কি করতে হবে!"

চন্দ্রকুমার আনন্দে ও অভিমানে অবরুদ্ধপ্রায় গদগদকণ্ঠে কোনমতে কহিলেন; "কেন তুমি আমায় ছেড়ে চলে গেলে সুকুমারি?"

চটপট উত্তর হইল, "আমি কি সখ করে মরেছি নাকি? আত্মহত্যা করলে বরং ওকথা বলতে পারতে, আমারই কি তোমাদের ছেড়ে আসবার ইচ্ছে ছিল! কর্ম্মফলে যা লেখা আছে কার সাধ্য তা রদ করে? কিন্তু এ'ও বলি তাই বলে এটাও আমার ভাল নয়! একদিন তো আবার মিলন হবেই, অনর্থক ওসব কাণ্ড করে এইটী করছো যে এর ফলে চকাচকির মত চিরকাল ধরে দুজনে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার দুদিকে থেকে যাব, মিলতে পারবোনা।"

চন্দ্রকুমার হা হা করিয়া ছেলে মানুষের মত কাঁদিয়া উঠিলেন। কোন দিকে নীরবে তাঁর আত্মহত্যা হইবার অবসর প্রদান করিয়া কাগজ লক্ষ হইয়া রহিল, তিনি কৌচার খুঁট তুলিয়া চোখ মুছিলেন, অমনি লেখা হইল, "ছিঃ কেঁদোনা, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে, আমি আর থাকতে পারছি না, যাও, ব্যগ্র ব্যাকুলতার সঙ্গে চন্দ্রকুমার আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন ; "সুকু, এই আমি শান্ত হচ্ছি, আমায় ছেড়ে যেও না।"

সুকুমারী লিখিলেন, "আমি আবার যাই কোন চুলোয় ; যাবার কি তুমি উপায় রেখেছ —যখন থেকে তোমায় ছুতে পেয়েছে, রাতদিন তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিনা নাকি সাতটা জনমজুরের খাটুনী খেটে না মরে সেদিকেও তো অনেকটা শক্তি দিতে হচ্ছে, দেখতে দেখতে কত কাহিল হয়ে গেছি। এই স্বামীজী তো দেখতে পাচ্ছেন, বলুন। স্বামীজী নীরবে ঈষৎ সম্মতিসূচক মাথা নুঁকাইলেন।

চন্দ্রকুমারের বহুক্ষণ বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। অবশেষে ক্ষীণস্বরে শুধু কহিলেন, "আমায় তুমি ক্ষমা করো." তারপর সহসা আরো গাঢ়কণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "আমি আবার মানুষ হবো, শুধু তুমি আমায় দেখা দিও, আমায় ত্যাগ করো না।"

"কি করে ?"

"এমনি করে ?" "তা কি করে হবে ? স্বামীজী তো আর আমার হুকুমের চাকর নন, তিনি তোমার জন্য অত ত্যাগ স্বীকার কর্ব্বেন কেন ? তাছাড়া তুমি নিজের মেয়ের জন্যে পর্য্যন্ত এতটুকু করোনি, খালি দুঃখ দিয়েছ !

সুনীতি এইসকল কাণ্ডকারখানা দেখিয়া অবাক্ অভিভূত হইয়া গিয়া হাঁটুর উপর চিবুক রাখিয়া অদৃষ্ট হস্তের লেখার মধ্যে আত্মহারা হইয়াছিল, এই কথায় ঈষৎ চকিত হইয়া উঠিল, যদি বাবা এই অনুযোগ শুনিয়া ফের ক্ষেপিয়া যান ! মনে মনে সে বিনতি করিয়া কহিতে লাগিল, না মা, আমার জন্যে বাবাকে কিছু বলোনা মা ! ওঁর যে মাথা খারাপ, আগে কত ভালবেসেছেন, দেখেছ ত' ? এই রকম কি ছিলেন ?

চন্দ্রকুমার চটিলেন না, এবং আরও শান্ত-স্বরে কহিলেন, "আজ থেকে আমি কারুকে কোন দুঃখ দেবোনা, তুমি যে আজ আমার সকল দুঃখ মিটিয়ে দিয়েছ সুকু ! বলো কি করলে আমি মাঝে মাঝে তোমায় পাবো ?"

"এর একটামাত্র উপায় দেখছি, আর কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না ; কিন্তু —

"বলো, বলো, আমি তাই কর্ব্বো, যা বলবে, তোমায় দিব্যি করে বলছি"—চন্দ্রকুমার আগ্রহে হাঁপাইতে লাগিলেন ; "দেখ হঠাৎ কিছু না ভেবেই কথা দেওয়া সঙ্গত নয় !"

"কি বল তো সুকু ! তুমি কি আমায় যা তা বলবে ?"

চন্দ্রকুমারের বহুদিন হাস্যভাব-বিরত ওষ্ঠাধরে গভীর নির্ভরপ্রেমের স্নিগ্ধ-হাস্য বিভাসিত হইয়া উঠিল।

"ডক্টর প্রফুল্লকান্তি গাঙ্গুলীর সঙ্গে সুনীতির বিয়ে দিলে তাঁর দীক্ষাগুরু হিসাবে স্বামীজী সপ্রকাশানন্দ তোমার আমার মধ্যে মাসে একদিন করে এমনি একটী মিলন সেতু রচনা করতে নীতির অনুরোধে হয়ত সম্মত হলেও হতে পারেন।"

সুনীতির বুকের মধ্যে ধড়াস্ করিয়া ধাক্কা দিয়া একটা যেন অবরুদ্ধ দ্বার খুলিয়া গেল। ডক্টর প্রফুল্ল গাঙ্গুলী পুনা ডেনটাল হস্পিটালের জার্ম্মানী পাশ ডাক্তার প্রফুল্ল গাঙ্গুলী তার সহপাঠিনী একবার অন্তরঙ্গ প্রিয়সখী যাহা

যাকে সে তার জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা জানাইতে কোনদিন দ্বিধা বোধ করেন নাই এবং যে তাদের পারিবারিক সমস্ত কথাগুলোই কিন্তু রিসার্চ সোসাইটির লিখিত পত্রাবলী সমুদয়ই খুটিয়া খুটিয়া শুধু জানাই নয়, স্বচক্ষে পড়িয়াও দেখিয়াছে, তাহারই সহোদর ভ্রাতা ডক্টার গাঙ্গুলী—তবে কি, তবে কি—

সাগ্রহে চন্দ্র কুমার প্রশ্ন করিলেন, তাঁকে কোথায় পাবো!" সুকুমারী সম্ভবতঃ যথেষ্ট উপহাসের হাসিই তাঁদের অলক্ষ্যে হাসিয়া থাকিবেন তবে সে হাসি দর্শন করার মত পুণ্যবল তো পিতা পুত্রীর ছিলনা তাই সেটা হয়ত একা স্বামীজীই উপভোগ করিলেন।

সুকুমারী লিখিলেন, "কেমন জব্দ নেই তো!" ডাক্তারকে দুহাতে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া গভীর আনন্দের শ্বাসগ্রহণ পূর্ব্বক চন্দ্রকুমারই ওকে কহিলেন একটুও না—একেবারে—এই-আমি পাকা কথা দিলুম।

সুনীতির দুইচক্ষে তখনও শত ধারা বহিতে ছিল সে তাহা মুছিতেও ভুলিয়া গেল, হঠাৎ আবার এ হইল কি! খুবই খোস মেজাজে আজ তো চন্দ্রকুমার পরিপাটি স্নান আহার করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন, ঘুম ভাঙ্গিয়া সহসা এমূর্ত্তি কেন?

কেন তাহা চন্দ্রকুমারই বলিলেন, চিৎকার শব্দে ধমক দিয়া উঠিলেন, "আজকের দিনে তোর চোখে জল কিসের জন্যে শুনি? মা আসছে ঘরে, নিজের মা সে তো, তোর সংসারকে তো আর জানছিনে, তবে আবাগের বেটী' তুই কাঁদিস কি জন্যে শুনি? কেন কলের জলের মতন চোকের জলে ট্যাক্স বসাসনি বলে? আমার যদি কর্পোরেসনের মেয়র করে আমি কর্ব্বো, হ্যাঁ, দেখি, নিশ্চয় করবো ওই আইনটা, বাছাধনদের কাঁদার সুখটা যার করছি দেখোনা!

এই কথা! সুনীতি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, মনে এক রকমে, আর মুখে আর এক রকমে হাসি আনিয়া উৎসাহ প্রকাশ করিয়া কহিয়া উঠিল, "আমি কাঁদিনি বাবা! মা আসবেন সংসারটা ঝুড়ি করছিলাম কি না, ধুলো না পোকা কি চোকে পড়েছিল, বলে অত জল পড়ছে। এখন তুমি চলো, চা করে আনি, আজ তোমার চা'র সঙ্গে একটু গরম হালুয়া করে দিই, আর নিমকী ভেজেও রেখেছি, পেট ভোরে খেয়ে নাও, হয়ত অনেক রাত হয়ে যাবে খেতে।"

খাবারের রেকাব টানিয়া লইয়াই চন্দ্রকুমার ঈষৎমুখবিকৃত করিলেন, "একি করেছ! হালুয়াতে কর্পূর দাওনি তো! জানোনা তুমি এতবড় দেড়ে মেয়ে তোমার মা কি পছন্দ করতেন!"

সহাস্যে সুনীতি উত্তর করিল, "খেয়ে দেখে বলো, না খেয়েই রাগ করছো কেন? কেমন? দিই নি!"

"দিয়েছিস, কিন্তু চিনের বাসায়—"

"চায়ের জিনে আর একটু ছাপো,—মৌরি ছোট এলাচ কিসমিস চিনের বাদাম সব দিয়েছি। ভাল হয়নি ?"

"হুঁঃ এ তোকে আর করতে হয় না, তোর মা এসে করে দিয়েছে ! যেয়ে দেখনা ; তোর বাবা উনি বাবার পর একটী দিনও এমনটী হয়েছিল ?—তবে হ্যাঁ, নিজের কোলে যদি ঝোল টানো সে অবশ্য আলাদা কথা !"

সুনীতি এই অবমাননা অনেক নিঃশেষে আজ আহত হইল না, যেন সে গভীর অন্ধকারের মধ্যে এতটুকু আলোর সন্ধান পাইল, সাগ্রহ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "ঠিক বলেছ বাবা ! এ মায়েরই হাতের কারণ ! আর শোন, একটা কথা বলি, তুমি হয়ত বিশ্বাস না-ও করতে পারো, যখন আমি হামুয়া করবার জন্যে ঠোঙ্গে বড়া চাপাচ্ছি না, অমনি একটা বিলাস তেলের গন্ধ পেলুম, তুমিতো জানো, মা ও ছাড়া কখন অন্য কোন তেলই খাবতেন না।"

চন্দ্রকুমার হাহা করিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন, "মনে আবার নেই, খুব আছে ! তোর মাটী কি কম দুষ্টু ছিল ! ওর যত সব পুরোণ ঢাকের ভিনিসে পছন্দ ! গোলাপ জল, কেওড়া আতর কর্পূর ভর্পূর খেতেন,—সেও মৃগনাভী আর কেশর কেওড়া ! দিদিভি একদিন নিজে তো তেল মাখতেননা আমি কখন মেখে এলে নাকে কাপড় গুঁজে বলতেন, এ মাঃ ঘরের মধ্যে সাতটা ছুচো চলে গেল কখন ! সোজা দুষ্টু !"

স্নেহের মন্তব্যটুকু হাসির পরিবর্ত্তে কান্নার মতই শুনাইল। আঃ ভগবান ! এত ভালবাসার বস্তুকে এমন করিয়া কেনই বা কাড়িয়া লও ! কষ্ট হয় না ? "অথচ ভাগ্যিমানের বউ মরে" বলিয়া একটা প্রবাদকথা এইদেশেই বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে !

সুনীতি চন্দ্র কুমারের ধুতী পাঞ্জাবী আনিয়া তাঁকে পরাইয়া দিল, গয়কন্যা যতদূর সম্ভব গোছগাছ করিয়া রাখিল, ফুল আর তার টবের গাছে কোটেনা, কতকগুলো রঙ্গের অভাবে মরিয়াই গিয়াছে। কিনে দিয়া মালা ও ফুল বাজার হইতে কিনিয়া আনাইল, ফুলদানী সাজাইল কিন্তু ফুলের তোড়ায় মোগাড় করিতে পারিল না, তখন মায়ের হাতের তৈরি করা পশমের ফুলগাছ চিত্রিত মাটীর ছোট্ট টব হইতে তুলিয়া তাহাই দিয়া টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিল।

প্রসন্নচিত্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চারিদিক দেখিতে দেখিতে সহসা চন্দ্র কুমার মেয়ের দিকে চোখ পড়তেই যেন চটকাভাঙ্গা হইয়া উঠিয়া পরুষকণ্ঠে চেচাইয়া উঠিলেন—

"এর মানে ? এর মানে ? ওর চোখে আমার খাটো করে দেওয়া এই তো ? এমন না হলে মেয়ে ! বেইমান ! বেইমান ! যার খাবে তারই কুচ্ছো করবে।"

ভয়ে সুনীতি শুখাইয়া উঠিল, এত পরিশ্রমে এতক্ষণে সে সারা দিনে যে সমস্ত আয়োজন করিয়া তুলিয়াছে, হয়ত বা এখনই এক বিরাট লঙ্কাকাণ্ডে সমুদয় উৎসব হইয়া যাইবে। শুষ্ক মুখে বিপন্ন ভাবে তাকাইয়া রহিল, মনের প্রশ্ন মুখে ফুটাইতে ভরসা করিল না। চন্দ্রকুমার একটু পরেই ঈষৎ সুর নরম করিয়া আপনিই বলিলেন ;

এরকম মূর্ত্তি কেন ? বলবে কখন করবো ? এইতো ? তোমার মা বলতেন, 'যে রাঁধে-সে কি চুল বাঁধে ?' শোননি কখনো ? ভূদেব বাবুর পারিবারিক প্রবন্ধ পড়েই দেখনা, কি বলেছেন বাংলার শিক্ষাগুরু ? বলেননি, 'একসঙ্গে যিনি বিবি ও বাঁদী হতে পারেন লক্ষ্মী চরিত্র তিনিই আরম্ভ করেছেন, যাও ভাল করে চুল বেঁধে, ভাল কাপড় পরে এসোগে।' শিগ্‌গীর যাও, খুব শিগ্‌গির ফিরে এসো কিন্তু।

সুনীতির এতক্ষণে মনে পড়িল, সত্য সত্যই সে নিজের কথা সম্পূর্ণ রূপেই ভুলিয়া গিয়াছিল সারাদিন ধরিয়া ঘর দোরের কুলকাড়া হইতে রাঁধাবাড়া পর্য্যন্ত করিয়া যে মূর্ত্তি তার এখন হইয়াছে, এই বেশভূষার সঙ্গে ঐ টাকা মাখা ও খুলকালি মাখা হাত মুখ সে কোন লোকের সাক্ষাতে বাহির করার মত নয়। চট্ করিয়া তার মনে পড়িয়া গেল, সকাল বেলার সেই শুভ-সন্দেশবাহী সুশ্রী চেহারার যুবকটীকে। তার সাক্ষাতে সকালে যা' হইয়াছে সেই যথেষ্ট, এ মূর্ত্তি লইয়া আর সে বাহির হইতে চাহেনা। জীবনের বিষম-ঘূর্ণীপাকে পাক খাইতে খাইতে যদিও তার জীবনের মধ্যে একমাত্র রক্ত-বিদ্যুত ভরা মেঘাচ্ছন্ন বর্ষা ঋতু ভিন্ন অন্য কাহারও প্রবেশ পথ ছিলনা, কিন্তু কালের ধর্ম্ম তো বাধা মানেনা, পথ না পাইলেও সে যে পথপ্রান্তে প্রতীক্ষিত হইয়া থাকে ! সজ্জায় সেই তরুণকে তরুণী হইয়া অন্ততঃ সে নির্লিপ্ততার দ্বারা অবমাননা করিতে পারেনা।

যখন সে সাজ সজ্জা করিয়া ঘরে ঢুকিল, চন্দ্রকুমার একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া সপ্রশংস বিস্ময়ে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে দেখিতে মৃদু মৃদু হাসিয়া এইটুকু বলিলেন ;

"তোমার চেহারা যতটা খারাপ হয়ে গেছে মনে করি, ততটা হয়নি। অবশ্য সুকুমারী ঠিকই ধরে ফেলবে।"

একটি জাপানী গল্প

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—পণ্ডিচারী

(১)

সুন্দরী নিপ্পন—ইংরেজী ভাষার মারফতে যাকে আমরা পদ্মময় জাপান ব'লে জানি।

সুন্দরী নিপ্পন—চেরী ক্রেসথেমিকা ফুজিয়ামার দেশ।

সুন্দরী নিপ্পন—যার সমুদ্র-তীরে, চেরীফুলে, ক্রেসথেমিকার পুঞ্জে, ফুজিয়ামার তুষারাবৃত কিরীটে সৌন্দর্যলক্ষ্মী তাঁর সমস্ত গরিমা ঢেলে দিয়ে ব'সে আছেন। সেই দেশের কাহিনী।

বহুকাল আগের কথা। তখনো নিপ্পনের বুক ফুঁড়ে কলের চিমনি সবেগে মাথা তুলে দাঁড়ায় নি, তার প্রতপ্ত ওষ্ঠর থেকে ধূম উদ্গীরণ ক'রে ক'রে সুনীল আকাশ আর নির্মল বাতাস বিষাক্ত ক'রে তোলে নি, যান্ত্রিক ঔদ্ধত্যে মানুষকে বলে নি—"মানুষ! তুমি আমাকে আবিষ্কার করেছ বটে কিন্তু আজ আমি তোমার প্রভু তুমি আমার দাস।"

বহুকাল আগের কথা। তখনো সৌন্দর্যের লীলা-নিকেতন নিপ্পনের শিক্ষিত সম্প্রদায় বিদেশীর অনুকরণে আপনাদের সুদৃশ্য নয়নানন্দ কিমোনো পরিহার ক'রে কাপড়ে তৈরি দুই হাতীর পাদে আপনাদের নিম্নাঙ্গ আবৃত করতে শুরু করে নি। সেই সেকালের কথা—যখন প্রতীচীর সংস্পর্শ সৌন্দর্য-প্রাণ নিপ্পনের প্রসন্ন আত্মাকে নিদারুণভাবে জখম করে নি—প্রতীচীর দারুণ রুক্ষতা তাকে হিংস্র পাশবিক ক'রে তোলে নি।

এ সেই সেদিনের কাহিনী।

শীতকাল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছে। তৃণলতা শুষ্ক সব ম'রে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গিয়েছে। প্রতি বৃক্ষ থেকে শেষ পত্রটী পর্যন্ত ঝ'রে গিয়েছে। সেই সব বৃক্ষ তাদের শাখা প্রশাখা কঙ্কালের হাতের মতো শীত-নিষ্ঠুর অরুণ আকাশের দিকে তুলে রেখে স্থির শুষ্ক দাঁড়িয়ে আছে—বুঝি স্বপ্ন দেখছে বসন্তশ্রীর। বুঝি ভাবছে তারা, কবে আবার বসন্ত-লক্ষ্মী তাঁর আশীর্বাণী নিয়ে উদিত হবেন তাদের অন্তরে অন্তরে, শিরায় শিরায়, শাখা প্রশাখা উপশাখায়; কবে আবার তাঁর অদম্য জীবনী-শক্তি তাদের ডালপালা ছেয়ে নেবে—তাদের সর্বাঙ্গ ঘিরে উল্লসিত হ'য়ে উঠবে প্রাণ-প্রাচুর্যে উচ্ছলিত একটা হরিৎ সঙ্গীত—আর সেই সঙ্গীতের সুরে সুরে তালে তালে ছন্দে ছন্দে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কিশলয় বেরিয়ে আসবে, মহা সমারোহে সূর্য-কিরণে চিক্ চিক্ চিক্ চিক্ করতে থাকবে, আর দক্ষিণ-সমুদ্র থেকে আগত স্নিগ্ধ মধুর বাতাসে দোল্ খেতে খেতে যেন বলবে—

"বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম
বারে বারে।

ভেবেছিলেম ফিরব না রে।
এই ত আবার নবীন বেশে
এলেম তোমার হৃদয়-দ্বারে"—

নিঃস্ব বৃক্ষরাজি বুঝি আজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখছে অনাগত প্রাচুর্যের !

শীত আরও বেড়ে গেল। বরফ পড়তে শুরু করল। পেঁজা তুলোর মতো বরফ আকাশে উড়তে লাগল, বাতাসে ভাসতে লাগল, পাতাহীন গাছের ডালপালাকে মণ্ডিত ক'রে তাদের এক অদ্ভুত আকৃতি দান করল—সেই পেঁজা তুলো শুকনো মাটিতে পড়ে ঘর বাড়ি ঘাট বাট প্রান্তর প্রান্তর এক অপরূপ ধবলিমায় মুড়ে দিল—যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল এক শুভ্রতার সুষমা—যেন এক অপার্থিব শুভ্রতা কলুষ-পূর্ণ পৃথিবীকে এক পরম শুচিতায় আবৃত ক'রে দিয়েছে স্বপ্নের মতো।

দাস্তে মাসায়ুনো তাঁর প্রাসাদ-দুর্গের এক গবাক্ষ খুলে বাইরে তাকিয়ে দেখলেন—আচম্বিতে যেন তাঁর অজ্ঞাতসারেই তাঁর কণ্ঠ ধ্বনিত হ'য়ে উঠল—বাঃ !

কারণ এই তুষার-রাজ্যেরও একটা সৌন্দর্য আছে যা প্রথম বসন্তের হরিৎ-শ্রীর সৌন্দর্যের চাইতে কম চমৎকারিত্বে ভরা নয়। বসন্তের সৌন্দর্য, প্রাণের প্রাচুর্যের সৌন্দর্য—সৃষ্টির অঙ্কুরে আছে যে লীলা-বিলাস, সেই লীলা-বিলাসের অন্তরে আছে যে গোপন-চাঞ্চল্য সেই চাঞ্চল্য মুক্তি পায়, বসন্তের স্পর্শে সারার ক'রে ওঠে রূপে রসে বর্ণে গন্ধে—তাই সে সৌন্দর্য। আর শীতের এই তুষার-রাজ্যের সৌন্দর্য, পরম নিষ্ক্রিয়তার মাঝে আছে যে এক পরম শান্তি এ তারি সৌন্দর্য—পরম বিস্মৃতির মাঝে আছে যে এক পরম নিশ্চিন্ততা এ তারি সৌন্দর্য ! পুরু পুঞ্জ তুষারিকার বিকশিত হাস্যে যেমন আছে এক মনোহারিত্ব, তুষার-কিরীটি ঘুমিয়ে-পড়া গাম্ভীর্যে তার মৌন সমাধিতেও আছে তেমনি এক চমৎকারিত্ব !

তুষার-রাজ্যের এই অপূর্ব সৌন্দর্য আরও ভালো ক'রে উপভোগ করবার জন্যে মাসায়ুনো তাঁর প্রাসাদ-দুর্গ থেকে বের হলেন, সঙ্গে তাঁর কয়েকজন অনুচর আর তাঁর পাদুকা-বাহক হেইশিরো—মাকাবে হেইশিরো।

মাসায়ুনো তাঁর প্রাসাদ-দুর্গ থেকে কিছু দূরে একটি নাতি-উচ্চ টিলার উপর একটি বিশ্রাম-মণ্ডপ তৈরি করিয়েছিলেন। টিলার উপরকার সেই মণ্ডপ থেকে চারিদিকে বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে। সেই মণ্ডপ থেকে শীতের রাজ্যের বৈরাগ্য-কঠোর শুভ্র সুষমা উপভোগ করবার জন্যে তিনি সেইখানে এসে উপস্থিত হলেন। তারপর অনুচরদের নিয়ে মণ্ডপের মধ্যে প্রবেশ করলেন। বাইরে দ্বারদেশে রইলো কেবল তাঁর পাদুকা-বাহক হেইশিরো।

দাস্তে মাসায়ুনো মণ্ডপের এক বাতায়নে দাঁড়িয়ে। তাঁর দৃষ্টির আগে এক অপূর্ব শুভ্র সুষমার রাজ্য। কোনোখানে ছেদ নেই, কোনোখানে একটু মলিনতা নেই, লেশমাত্র ছন্দ-পতনও কোথাও ধরা যায় না। পৃথিবী আজ স্তব্ধ শান্ত মৌন। একটি পাখির একখানি কণ্ঠও কোথাও ধ্বনিত হচ্ছে না, একটি ভ্রমরের ক্ষীণতম গুঞ্জনও কোথা থেকে উঠছে না। একটি তৃণের এতটুকু শ্যামলিমা, একটি প্রজাপতির এতটুকু বর্ণ-সুষমা কোথাও দৃষ্ট হচ্ছে না। সমস্ত বিশ্বের যেন আজ প্রশান্ত বিরাট এক ধ্যান-সমাধি। এই

বিরাট ধ্যান-সমাধির সম্মুখে দাঁড়িয়ে মাসাম্নের অন্তরে অন্তরে কেবলই ধ্বনিত হ'তে লাগল—আঃ কী সুন্দর! কী সুন্দর! তাঁর মনে হ'তে লাগল, তুমি ভগবান শাক্যমুনির সমাধিও এমনি সুন্দর—শুভ্র-শুচি শুব্ধ-গম্ভীর ও চরম প্রশান্তির নিলয়!

বাইরে দ্বারের সম্মুখে হেইশিরো তার প্রভুর গেটা (জাপানী খড়ম) জোড়া সযত্নে সাজিয়ে রেখেছিল যেন তিনি বেরিয়েই তা পায়ে দিতে পারেন। গেটা জোড়ার উপর কেবলি তুষার কণা এসে পড়ছিল আর হেইশিরো তাই ক্রমাগত তার আস্তিন দিয়ে মুছে মুছে পরিষ্কার ক'রে রাখছিল। হেইশিরো ছিল যেমন কর্তব্য-পরায়ণ তেমনি ছিল তার প্রভু দাতে মাসাম্নের প্রতি ভালোবাসা। সে জানত, তার প্রভু তো প্রচণ্ডতম শীতেও কস্মিনকালে টাবি (জাপানী মোজা) পরেন না। মাসাম্নের মতে মোজা পরা নাকি নিতান্তই একটা মেয়েলী ব্যাপার। সুতরাং এমন ব্যাপার ক'রে তিনি তাঁর পৌরুষের অবমাননা করতে চিরকালই নারাজ। তিনি যদি আজকাল এই দিনে তাঁর মোজাহীন অনাবৃত পায়ে হিম-হয়ে-থাকা গেটা পরেন তবে তাঁর মর্যিটির হয়তো কিছু বিচ্যুতি ঘটে। সুতরাং শুকনো ও গরম রাখবার জন্যে হেইশিরো গেটা জোড়া তুলে নিয়ে আপনার পোষাকের ভিতরে পেটের কাছে রেখে দিয়ে তার প্রভুর বেরিয়ে আসার প্রতীক্ষা করতে লাগল।

"প্রভু আসছেন—প্রভু আসছেন—প্রভু মহামানব দাতে মাসাম্নে আসছেন"

দু' একটি মুহূর্তের পরেই মণ্ডপ থেকে বেরিয়ে ঘোষণা করল। হেইশিরো তৎক্ষণাৎ গেটাজোড়া তার পোষাকের ভিতর পেটের কাছ থেকে বের ক'রে ঠিক দরজার বাইরে এমনভাবে সাজিয়ে রাখল যেন মাসাম্নে বেরিয়ে এসেই বিনা বাক্যব্যয়ে বিনা অসুবিধায় পায়ে দিতে পারেন। পর মুহূর্তে মণ্ডপ থেকে বেরিয়ে এলেন আভিজাত্যে গরিত যৌবনে উন্নত মহামানবর দাতে মাসাম্নে। এবং বেরিয়ে এসেই গেটায় পা চালিয়ে দিলেন।

গেটায় পা দিতেই মাসাম্নে অনুভব করলেন তার উষ্ণতা। আশ্চর্য! এমন শীতে গেটা জোড়া এমন উষ্ণ থাকল কি ক'রে? ও বুঝেছি—এর উত্তর পেতেও মাসাম্নের কিছুমাত্র দেরী হল না—ব্যাটা হেইশিরো নিশ্চয়ই এতক্ষণ গেটা জোড়ার উপর আরাম ক'রে ব'সে ছিল। মাসাম্নে যেই বুঝতে পেরেছিলেন যেমন মেজাজী তেমনি রাগী তেমনি হঠকারী। যেমনি তাঁর মনে হ'ল যে হেইশিরো তাঁর গেটার উপর বসেছিল তেমনি যেন তাঁর মাথায় খুন চ'ড়ে গেল। কী আস্পর্দা এই ছোট লোকগুলোর—তাঁর পায়ে দেবার মাল্লবর গেটার উপর বসা! কী হোল আজকাল এই ছোট লোকগুলোর! মহামানবর দাইশিরো* তৎক্ষণাৎ শিরে হেইশিরোর টুঁটি চেপে ধ'রে বিড়াল যেমন ইঁদুরকে কাঁকানি দেয় তেমনি কাঁকানি দিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বললেন—"ব্যাটা উঠুক। আমার পায়ে দেবার গেটার উপরে তুই বসিস্, এত বড় তোর আস্পর্দা!" বলতে বলতে তাঁর ক্রোধ যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেল, তিনি এক পাটি গেটা তুলে নিয়ে তাই দিয়ে হেইশিরোর কপালে এক প্রচণ্ড ঘা বসিয়ে দিলেন, এবং ফুলিশ-কঠোর কণ্ঠে যেন আগুন ছুটিয়ে বললেন—"এই তোর শিক্ষা!"

---

* দাইশিরো—আপনের সমতুল্য।

আচম্বিত আক্রমণে বেচারা হেইশিরো পূর্বেই হতভম্ব হ'য়ে গিয়েছিল, তারপর কপালে গেটার অতর্কিত প্রচণ্ড আঘাতে তার মাথার ভিতরটা ঝিম্ ঝিম্ ক'রে উঠল, তার চোখের সামনে রাত্রির আঁধার নেমে এলো, মাথা ঘুরে সে প্রায় অচৈতন্য হ'য়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল—গেটার প্রচণ্ড আঘাতে তার কপাল কেটে রক্ত ঝরছিল।

ব্যাপারটা প্রায় এক মুহূর্ত সময়ের মধ্যে সংঘটিত হ'য়ে গেল; হেইশিরোকে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখে হাতে মাসামুনে আর দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় করলেন না। প্রাসাদ-দুর্গ থেকে আর এক জোড়া গেটা আনবারও তাঁর সয় সইল না। ঘোড়া পায়েই তিনি হন্ হন্ ক'রে তাঁর প্রাসাদ-দুর্গে চ'লে গেলেন। অনুচরবর্গও তাঁর অনুগমন করল। একটা লোক যে সেখানে ধুলার স্তূপের উপর প'ড়ে রইল, সে লোকটা বেঁচে রইল না মরল তা দেখবার প্রয়োজনমাত্রও কেউ বোধ করল না।

হেইশিরো একেবারেই মূর্ছিত হ'য়ে পড়েছিল। মাসামুনে ও তাঁর অনুচরবর্গ চ'লে যাবার কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে তার জ্ঞান ফিরে এলো। ধীরে ধীরে সে উঠে বসল এবং চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। চারিদিকে কেবল এক ধূধূ প্রান্তর। একটি জন প্রাণী কোথাও নেই। অদূরে তার প্রভু লর্ড হাতে মাসামুনের প্রাসাদ-দুর্গ একাকী আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে যেন এক দাম্ভিকতার প্রতিমূর্তি। ধীরে ধীরে হেইশিরোর সমস্ত কথা মনে এলো। সমস্ত মন তার এক দুর্নিবার গ্লানিতে পূর্ণ হয়ে গেল। কী দারুণ অবিচার, নিদারুণ অত্যাচার! কী নির্দয় নিষ্ঠুর এই অভিজাতশ্রেণীর লোকগুলো—কী হঠকারী! এদের অন্তরে দয়া মায়া করুণা ব'লে কোনো বস্তু নেই, বিচার বিবেচনার কোনো ধৈর্য নেই। হেইশিরোর সমস্ত অন্তরটা বিষিয়ে উঠল, তার সায়ু শরীরের শিরা উপশিরাগুলো টন্ টন্ করতে লাগল। তাঁর অন্তরে যেখানে ছিল ভক্তি শ্রদ্ধা ভালোবাসা সেখানে ধীরে ধীরে জেগে উঠল এক দারুণ আক্রোশ, এক দুর্নিবার প্রতিহিংসার অদম্য কামনা। এরই স্পর্শে তার অন্তরের এতকালের সঞ্চয়-রক্ষিত যত কিছু সুকুমার বৃত্তি সব ঝ'রে গিয়ে একেবারে শুষ্ক পরিণত হ'য়ে গেল। রইল শুধু একটা রুক্ষ নীরস উষর মরুভূমি; দিকে দিকে একটা হা হা আর্তনাদ। তার সমস্ত অন্তরাত্মা আচ্ছন্ন ক'রে রইল এক প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি। তার মন প্রাণ চিত্ত এক হ'য়ে তারস্বরে যেন বলতে লাগল—নাঃ, এর প্রতিশোধ নিতে হবে। যেমন ক'রে হোক্, যতদিনে হোক্ এর প্রতিশোধ সে নেবেই। ধীরে ধীরে হেইশিরো অতি কষ্টে উঠে দাঁড়াল। কাছেই তারই ললাটের রক্তে কলঙ্কিত গেটার পাটিটা প'ড়ে ছিল। সেইটে সে কুড়িয়ে নিয়ে তার পোষাকের ভিতরে পেটের কাছে সযত্নে রেখে দিল। কিন্তু এবার আর পূর্বের মতো ভক্তি ভালোবাসার দ্বারা, প্রভুর কল্যাণ-কামনার দ্বারা চালিত হ'য়ে নয়। এই গেটার পাটিটা থাকবে তার কাছে তার প্রতিহিংসা গ্রহণের স্মারকরূপে। তারপর সে ধীরে ধীরে টিলা থেকে অন্য দিক দিয়ে নেমে চিরকালের তরে হাতে মাসামুনের প্রাসাদ-দুর্গ ও তাঁর খড়্গ-বরদারীর দায়িত্ব ছেড়ে চ'লে গেল।

সেইদিন থেকে হাকাবে হেইশিরোর জীবনের একমাত্র ব্রত হ'ল প্রতিহিংসা গ্রহণ—হাতে মাসামুনের অবিচার তাঁর হঠকারিতার প্রতিশোধ নেওয়া। হেইশিরোর জীবনে আর যা কিছু তা সবই অবান্তর, অকিঞ্চিৎকর, অর্থহীন।

(২)

মাকাবে হেইশিরোর একমাত্র চিন্তা কি ক'রে, যাতে মাসাবুনের অমানুষিক ব্যবহারের প্রতিশোধ দিতে পারে—কি ক'রে সে তার ব্রত উদ্‌যাপন করতে পারে। কিন্তু হাঃ হাঃ হাঃ—এ একটা মস্ত বড় হাসির কথা—মস্ত বড়। এ যেন আরব্যুল্লাটা বলছে, সে চীন-দরজ্ঞ তবে নেবে—যেন একটা শিশির কণা বলছে, সে গোবি মরুভূমিতে উফান রচনা করবে। মাসাবুনে নিগ্রনের প্রবল পরাক্রান্ত দাইমিয়োদেরই, সামন্তদেরই একজন। আর সে—হেইশিরো—একজন দাসমাত্র—নফর—বড়ম-বরদার। কোথায় আকাশের তারা আর কোথায় পৃথিবীর ধূলিকণা। কেমন ক'রে সে—হেইশিরো—নফর হেইশিরো—বড়ম-বরদার হেইশিরো—মস্ত উচ্চে হাত তুলবে? কি কৌশলে কোন্ চাতুর্যের বলে সে পৌঁছবে সেখানে, যেখানে গর্বে গরীয়ান্ ঔদ্ধত্যে উদ্ধত দাইমিয়োরা বাস করে? কি কৌশলে সে পৌঁছবে সেখানে? অথচ তাকে পৌঁছতেই হবে সেখানে—যেমন ক'রে হোক্ পৌঁছতেই হবে? কিন্তু কি ক'রে? কি ক'রে? একবার মনে হ'ল সে যে মাসাবুনেকে খুন ক'রবে—সোজা গিয়ে তার বুকে ছোরা বসিয়ে দেবে—তার পর তার মৃত্যু-বিকৃত মুখের দিকে তাকিয়ে বলবে—বলবে সে তার বজ্রকণ্ঠে, বিদ্রূপ-কণ্ঠে, বিজয়ীর কণ্ঠে—"চিন্‌তে পারিস্ আমাকে মাসাবুনে—চিন্‌তে পারিস্? আমি সেই হেইশিরো—মাকাবে হেইশিরো—যাকে তুই একদিন মেরেছিলি বড়ম দিয়ে বিনা অপরাধে, বিনা বিচার বিবেচনায়—আজ এই তার প্রতিশোধ।" উঃ সে কি সুখ—কী সুখ! ভাবতেই হেইশিরোর সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে—তার হাত নিশপিশ করতে থাকে, বুকের রক্ত উদ্বাম হ'য়ে ওঠে। কিন্তু তারপর তার মনে প'ড়ে যায় যে মাসাবুনে সব সময় শরীর-রক্ষী নিয়ে চলা ফেরা করে, তা ছাড়া বলিষ্ঠ তার শরীর। হেইশিরোর চাইতে মাসাবুনে বয়েসে যেমন বলিষ্ঠ দৈহিক শক্তিতে আবার তেমনি পরিষ্ঠ। সুতরাং সোজাসুজি তাকে খুন করতে গেলে বেশি সম্ভাবনা হেইশিরোর নিজেরই হত হবার। তখন কোথায় রইবে তার প্রতিশোধ আর কোথায় রইবে সে? না, খুন নয়—অন্য কোন উপায় বের করতে হবে। কিন্তু কি সে উপায়? কোন্ সে পথ?

সারা নিপ্পনে ছুটি মাত্র ব্যক্তি আছেন, যাঁরা দাইমিয়োদের সায়েস্তা করবার ক্ষমতা রাখেন। এক হচ্ছেন সম্রাট স্বয়ং আর হচ্ছেন শোগুন*। এই দুয়ের মহামান্য আসনের কাছ পর্যন্ত সে যদি কোনো রকমে পৌঁছতে পারে তবে তার প্রতিশোধ নেবার পথও প্রশস্ত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু ঐ মহামান্য আসনের সান্নিধ্যে কেমন ক'রে সে পৌঁছবে—সে, সামান্য একটা পাহুকা-বাহক ভৃত্য? তবে একেবারে যে অসম্ভব তাও নয়। এই মুহূর্তে তা অসম্ভব হ'তে পারে, কিন্তু সব কালের তরে অসম্ভব নয়। আচ্ছা—ধরা যাক্—যদি সে সৈন্যদলে প্রবেশ করে? এ-যুগ যেমন যুদ্ধবিগ্রহের কাল, তাতে সৈনিকরূপে শৌর্য বীর্য দেখিয়ে সে উচ্চ থেকে উচ্চতর পদ পেতে পারে এবং একদিন সে হয়তো—দশ পনর কুড়ি পঁচিশ বছরে—একেবারে শোগুন ও সম্রাটের আসনের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। তখন কলে কৌশলে পাকে প্রকারে গোপন চক্রান্তে সে মাসাবুনেকে জালে জড়াতে পারে—সম্রাটের বিবৃদ্ধিতে ফেলতে পারে। কিন্তু সৈনিক হ'তে হ'লে, সৈনিক হ'য়ে ক্রমশঃ

* শোগুন—প্রধান সেনাপতি। সম্রাটের নীচেই এঁর আসন। মধ্যযুগে কয়েক পুরুষ ধরে ইনিই এক রকম বিদেশের শাসন-কর্তা ছিলেন।

উন্নতির পথে অগ্রসর হ'তে হ'লে চাই নিখুঁত স্বাস্থ্য বলিষ্ঠ দেহ সুদৃঢ় মাংসপেশী। কিন্তু কোথায় সে-সব হেইশিরোর? সৈনিক-জীবনে নিশ্চিহ্নরূপে দু'দিনেই তার শরীর ভেঙে পড়বে। না, ও-পথ তার নয়, এ-পথে তার ইষ্ট মিলবে না। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হেইশিরো ও-চিন্তা ত্যাগ করুন।

কিন্তু হঠাৎ হেইশিরোর মনে পড়ল আর একটা পথের কথা। এ-পথে উচ্চ নীচ সকল কুলের নির্বিশেষে যে-কেউ উন্নতি ক'রে ক'রে অবশেষে শোগুন এবং শোগুনকেও পেরিয়ে সম্রাটের সিংহাসনের কাছাকাছি পৌঁছুতে পারে। এ-পথে সুদৃঢ় দেহের তেমন প্রয়োজন নেই, যেমন আছে সুদৃঢ় মনের—এ-পথে বলিষ্ঠ মাংসপেশীর প্রশ্ন নেই প্রশ্ন আছে বলিষ্ঠ সঙ্কল্পের। আর মনের দৃঢ়তা সঙ্কল্পের দৃঢ়তা তাঁর আছে অপরিমিত অপরিমেয়। এই পথ হচ্ছে ধর্মের পথ। সে যদি পুরোহিত হয় তবে সে কোনো একদিন ধার্মিকতার জ্ঞানের গভীরতায় জীবনের পবিত্রতায় এমন কি সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। আর একবার যদি সে সম্রাটের সান্নিধ্যে তার আসনখানি পাততে কৃতকার্য হয় তবে সে উদ্যত দাঁতে মাসামুনেকে দেখে নিতে পারে বা দেখিতে দিতে পারে। হাঁ—এই-ই ঠিক। সে পুরোহিত হবে—তারপর তার ভাগ্য।

এই ঠিক করেই কিছুমাত্র কালবিলম্ব না ক'রে হেইশিরো কিয়োতো রওনা হ'য়ে গেল এবং সেখানে পৌঁছে হিগাশিয়ামার উৎসোজি মঠে শিক্ষানবিসরূপে প্রবেশ করল—যাকাবে হেইশিরো নাম পরিত্যাগ ক'রে জোকেন নাম নিয়ে।

কিন্তু পুরোহিত হবার জন্যে শিক্ষানবিসের কাজ খুব সহজ ব্যাপার নয়। পুরোহিত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতি দিন প্রতি ঘণ্টা শিক্ষানবিসকে নানা আচার বিচার ব্যবহার তপশ্চর্যা কৃচ্ছ্রতা ইত্যাদির ভিতর দিয়ে জীবন নিয়মিত ক'রে চলতে হয়। এতটুকু এদিক ওদিক হবার নিয়ম নেই, একটু পা ছড়িয়ে বসবার উপায় নেই, একবার গায়ের আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলবার অবসর নেই। একটা ইস্পাত-নির্মিত ফ্রেমের মধ্যে যেন জীবনকে ঘ'সে পিষে চটকে প্রবেশ করিয়ে দিতে হয়—তাতে হাড়গোড়গুলো ভাঙল, মাংসপেশীগুলো থেঁতলে গেল না অব্যাহত রইল তার হিসেব রাখবার কথা নেই। এ সবের উপর আছে আবার গুরুস্থানীয় পুরোহিতদের দেখা। তাঁদের হীনতম ভৃত্যের কার্যেও শিক্ষানবিসের ত্রুটি হওয়া এক মহা অপরাধজনক ব্যাপার। এই জীবনের মধ্যে হেইশিরো প্রায় হিমসিম্ খেয়ে যাবার মতো হ'ল। এক এক সময় হতাশার অবসাদে যেন তার সমস্ত শরীর মন ভেঙে পড়তে চায়। তখন কেবলি মনে হ'তে থাকে তার পূর্ব জীবনের কথা—তার পাদুকা-বাহকের জীবন। কী নির্বিরোধী নির্বিবাদী শান্তির জীবন। ক্লেশ নেই, পরিশ্রম নেই, দুশ্চিন্তা দুর্ভোগ নেই। না—সে বুঝি আর পারে না, বুঝি তার তপশ্চর্যা সব ভেঙে যায়। গভীর অবসাদে তার মাথা নুয়ে পড়ে, কপাল তার করতলে ন্যস্ত হয় নিদারুণ হতাশায়। হঠাৎ তার হাতে লাগে তার কপালের ক্ষতচিহ্নে। আর এক মুহূর্তে সব বদলে যায়। কোথায় অন্তর্হিত হ'য়ে যায় হতাশা নিরাশা অবসাদ! মাসামুনে—মাসামুনে— দাঁতে মাসামুনে—উদ্যত পর্বত হাইমিয়ো—অত্যাচারী হঠকারী অবিচারকারী হাইমিয়ো! এক সুপ্ত শার্দূল জেগে ওঠে হেইশিরোর মধ্যে—এক সুপ্ত শার্দূল! না—না—না, সুখ নয়, শান্তি নয়, নিরাপত্তা নয়—জীবনের একমাত্র লক্ষ্য প্রতিহিংসা, উদ্যত পর্বত মাসামুনেকে ভূতলে লুটিয়ে দিতে হবে, তাকে মথিত দলিত পিষ্ট ক'রে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে হবে। হাঁ, সেই একমাত্র লক্ষ্য তার

জীবনের, তার জীবনধারণ কেবলমাত্র তারই উপলক্ষ্যে—তার জীবনে আর কোনো সুখ নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, একমাত্র সুখ আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিশোধ গ্রহণ। চতুর্গুণ উৎসাহে হেইশিরো আবার লেগে যায় তার শিক্ষানবিসের নানা কর্তব্যে ও তপস্যায়।

ক্রমে ক্রমে হেইশিরো যা ভোবেন তার আগ্রহ ও অধ্যবসায়ে, তিতিক্ষা ও তপশ্চর্যায় মঠের শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। তাঁরা অতি যত্নসহকারে হেইশিরোকে সর্ববিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সে জ্ঞানার্জনে প্রভূত উন্নতি করল। তখন হেইশিরোর মনে হ'ল এই ক্ষুদ্র মঠেই তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না। একটা সুবৃহৎ শিক্ষাকেন্দ্রে থেকে শিক্ষালাভ ও জ্ঞানার্জন না করতে পারলে তার শিক্ষাও সম্পূর্ণ হবে না, তার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হবে না। তখনকার দিনে সারা নিপ্পনে সবার চাইতে বড় ও সবার চাইতে বিখ্যাত আধ্যাত্ম শিক্ষাকেন্দ্র ছিল হিয়েই পর্বতের উপর স্থাপিত এন্‌রিয়াকুজি মঠ। এই মঠেই সে শিক্ষার্থীরূপে স্থান পাবার জন্য আবেদন করল। আশ্রয়ের সঙ্গে তার আবেদন মঞ্জুর হ'ল। হেইশিরো বা ভোবেন উংগোজি মঠ থেকে বিদায় নিয়ে এনরিয়াকুজি মঠে প্রবেশ করল।

এই মঠে একাদিক্রমে বিশ বৎসর তার কাটল ধর্মশিক্ষায় ও আধ্যাত্ম সাধনায়, কঠোর ব্রত নিয়ম পালনে, নির্মম তপশ্চর্যায়। এই সময়ের মধ্যে ধীরে ধীরে তার নাম তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল দেশের নানা দিকে। তার বিদ্যাবত্তা, তার ধার্মিকতা, তার তপশ্চর্যার কথা ঘরে ঘরে নর নারীর মুখে মুখে ফিরতে লাগল। কিন্তু কোথায় সোগুন, কোথায় সম্রাট? কোথায় তাঁদের সান্নিধ্য সিংহাসন? এখনো তো তার নাম তার যশ সম্রাটের সিংহাসনের কাছ পর্যন্ত পৌঁছোয়নি, সম্রাটের তো দৃষ্টি তার প্রতি আকৃষ্ট হয় নি। না, এখনো পথ বাকি। তাকে আরো বিখ্যাত হ'তে হবে, আরো যশ অর্জন করতে হবে—তাকে বিশ্ব বিখ্যাত হ'য়ে উঠতে হবে। তবেই সম্রাটের দৃষ্টি তার উপর পতিত হবে। আর তার আজীবনের ব্রত উদ্‌যাপনেরও সম্ভাবনা দাঁড়াবে। তাই হেইশিরো ঠিক করলে যে সে তার শিক্ষা সমাপ্তির জন্য চীনে যাবে। কেননা তখনকার দিনে পূর্ব প্রাচ্যে চীনদেশ ছিল শিক্ষায় শিল্পে সভ্যতায় একেবারে শীর্ষস্থানে। এইখানে সে শাক্যমুনির পরম ধর্মের সকল জ্ঞান অর্জন করতে পারবে, সকল রহস্য অবগত হ'তে পারবে। তারপর চাই কি একদিন তার নামটা সম্রাটেরও কানে গিয়ে পৌঁছবে।

অবশেষে একদিন যখন সুযোগ মিলল তখন এক জাহাজে চড়ে হেইশিরো চীনদেশে গিয়ে পৌঁছল।

আরও দশ বছর কাটল চীনে হেইশিরোর। এই দশ বছর সে চীনের যত বিখ্যাত মঠ ও মন্দির সব পরিভ্রমণ করে শাক্যমুনির ধর্ম সম্পর্কে যেখানে যা কিছু শুনবার বুঝবার দেখবার সব আয়ত্ত করল। বৌদ্ধধর্মের যা কিছু তত্ত্ব যে কোনো তথ্য কিছুই আর হেইশিরোর অজানা রইল না। এই বিদেশেও কিছু দিনের মধ্যেই ভোবেনের নাম লোক-সমাজে বিস্তৃত হ'য়ে পড়ল এবং ক্রমে ক্রমে তা চীন-সম্রাটের কানে গিয়ে পৌঁছল। চীন-সম্রাট এই বিদেশীর জ্ঞানের গভীরতা, জীবনের পবিত্রতা, আধ্যাত্ম সাধনার একাগ্রতার কথা শুনে তাকে দেখবার জন্যে কৌতূহলী হ'য়ে উঠলেন। সম্রাট-সকাশে উপস্থিত হবার জন্যে মন্ত্রীর কাছ থেকে হেইশিরোর কাছে আদেশ-পত্র গেল। ভোবেন বা হেইশিরো সম্রাটের সান্নিধ্যে নীত হ'ল। সাক্ষাতে চীন-সম্রাট হেইশিরোর গভীর জ্ঞানের, শুচিস্নিগ্ধ ধার্মিকতার ও পরম পবিত্রতার পরিচয় পেয়ে অতীব প্রীত হলেন এবং তাকে ইস্‌পান-কাশো-দাইজেন্‌জী এই

আধ্যাত্ম গৌরব-জ্ঞাপক উপাধিতে ভূষিত ক'রে সম্মানিত করলেন। মহাচীনের ধর্মজগতের সকল জ্ঞান গৌরব ও সম্মান অর্জন ক'রে দশ বৎসর পরে হেইশিরো আপন স্বদেশে ফিরে এলো। যে হেইশিরো কেবল মাত্র এক ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তিরূপে চীনে যাত্রা করেছিল সেই হেইশিরো দশ বৎসর পরে আপন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করল নিপ্পনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মাপদেষ্টার আসন নিয়ে। সারা নিপ্পনে তার নাম ছড়িয়ে পড়ল। বলা বাহুল্য সম্রাটের কানেও তার নাম পৌঁছুতে বাকি রইল না।

(৩)

কিয়োতোর যে উংগোজি মঠে হেইশিরো প্রথম শিক্ষানবিসরূপে প্রবেশ করেছিল মহাচীন থেকে দেশে ফিরে ইসান্-কাশো-দাইশেন্‌জি সেই মঠেই আপনার আস্তানা গাড়লেন। উংগোজি মঠে আপনার উপযুক্ত আসনে স্থির হ'য়ে ব'সেই তিনি সব প্রথমেই খাতে মাসাগুনের খোঁজ নিলেন। কিন্তু হায় রে দুর্ভাগ্য! খোঁজ নিয়ে বড় দুঃখের সঙ্গেই তিনি আবিষ্কার করলেন যে মাসাগুনেও আর সেই মাসাগুনে নেই—সংসারে যাতে মাসাগুনেও প্রভূত উন্নতি করেছেন। এখন তিনি আর সেই ত্রিশ বছর আগেকার তাঁর ওসাকি তালুকটুকুর মাত্র মালিক নন। আজ সেন্‌চাইয়ের প্রাসাদ-দুর্গের অধিকারী তিনি এবং সেই সঙ্গে বিস্তৃত ভূসম্পত্তির মালিক। উচ্চ রাজকার্যেই যে তিনি নিযুক্ত তাই নয়, সম্রাটের দরবারেও তাঁর প্রভূত মান প্রতিপত্তি। আজ সাত্সুমোর সমগ্র উত্তরপূর্বাঞ্চলের সামন্তদের সর্দার তিনি—তাই এমন কি প্রবলপ্রতাপান্বিত শোগুনেরও তাঁকে কতকটা সমীহ ক'রে চলতে হয়। এই সব খবর পেয়ে প্রতিহিংসার পথে বিপুল বাধার কথা মনে ক'রে দাইশেন্‌জি কতকটা প্রমাদ গণলেন—কিন্তু একেবারে হতাশ হলেন না। তিনি ধৈর্যের সঙ্গে ভবিষ্যৎ কোনো সুযোগের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে হঠকারিতার দ্বারা চালিত হ'য়ে ভুলপথে একটুকু পা বাড়ালে তাঁর আজীবনের প্রচেষ্টা সব ব্যর্থ হ'য়ে যাবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁকে অগ্রসর হ'তে হবে বিড়ালের মতো নিঃশব্দে, শৃগালের মতো চাতুর্যে। তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে বকের মতো ধৈর্যে, শকুনির মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

কিন্তু দাইশেনজিকে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হল না।

এই সময়ে একবার সম্রাট অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন—কি এক কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধিতে তিনি আক্রান্ত হলেন। কিন্তু কি সে ব্যাধি কেউ বুঝতে পারে না। নিপ্পনের যেখানে যত সুবিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন ক্রমে ক্রমে তাঁরা সবাই রাজপ্রাসাদে এসে সমবেত হলেন। কিন্তু ব্যাধির নিদানই কেউ ধরতে পারলেন না, চিকিৎসা তো দূরের কথা। এমন ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা যা কিছু নিরাপদ গোছের ঔষধ প্রয়োগ করলেন, তাতে কোনো ফলই পাওয়া গেল না। সম্রাট ধীরে ধীরে শুকিয়ে উঠতে লাগলেন—যেন তিনি দিন দিন তিল তিল ক'রে অনিবার্যভাবে মৃত্যুর দিকেই এগিয়ে চলেছেন—ধীরে ধীরে মৃত্যুর কালো যবনিকাখানি তাঁর জীবন-নাট্যের উপর নেমে আসতে লাগল।

চিকিৎসার দ্বারা যখন কিছুতেই কিছু হল না তখন সবার নিশ্চিত ধারণা জন্মিল যে, এটা কোনো ব্যাধি নয়। আসলে সম্রাটের দেহ কোনো অপদেবতা আশ্রয় করেছে। সুতরাং চিকিৎসকের চিকিৎসার দ্বারা কিছু হবে না। এই অপদেবতার হাত থেকে মুক্তি পেতে হ'লে চাই জপতপ শান্তি-স্বস্ত্যয়ন। কোনো ধর্মাত্মা আধ্যাত্মশক্তিতে বলীয়ান ধর্মগুরুর শক্তিতেই সম্রাটের জীবন রক্ষা পেতে পারে—আর কিছুতে নয়। শরীরের রক্তপ্রবাহ যেখানে

রোগের বীজাণু দ্বারা জর্জরিত হ'য়ে উঠেছে সেখানে বটিকা পাচন সূচিকাভরণ ইত্যাদি কার্যকরী। কিন্তু যেখানে সূক্ষ্ম প্রাণশক্তি আঁধার-রাজ্যের সূক্ষ্ম শক্তিধারা আচ্ছন্ন সেখানে বটিকা পাচন ইত্যাদি ব্যর্থই হ'য়ে যায়। সুতরাং আধ্যাত্ম শক্তিতে শক্তিমান এক ব্যক্তিকেই এসে সম্রাটের জীবন-রক্ষার ভার নিতে হবে। কে আছেন এমন ধর্মাত্মা এমন তপশ্চর্যাপরায়ণ, এমন অধ্যাত্ম শক্তিতে বলীয়ান মহাজন যিনি এই ভার গ্রহণ করতে পারেন? কে আছেন এমন ধর্মগুরু যিনি তাঁর দিব্যশক্তিতে সকল অপশক্তিকে দূরীভূত করতে পারেন? অন্ধকারের স্থানে আলোক, অশুভের স্থানে শুভ, মৃত্যুর স্থানে জীবন আকর্ষণ ক'রে আনতে পারেন? কে আছেন তেমন?

সভার কণ্ঠ থেকে এক বাক্যে এক জনের নাম উচ্চারিত হ'ল—"ইস্‌সান-কাশো-দাইজেন্‌জি।"

সুতরাং তৎক্ষণাৎ তাঁকে রাজপ্রাসাদে আহ্বান করা হ'ল এবং সম্রাটের জীবন-রক্ষার ভার তাঁর উপর ন্যস্ত করা হ'ল।

দাইজেন্‌জি সম্রাটের রোগ-শয্যার পাশে স্থান গ্রহণ করলেন। এবং সাত দিন সাত রাত সেখান থেকে আর কোথাও নড়লেন না। সাত দিন সাত রাত তিনি উপবাস ক'রে একাগ্রচিত্তে তাঁর মন প্রাণ সত্তা এক ক'রে প্রার্থনা করতে লাগলেন—তাঁর প্রাণের সমস্ত আকুতি দিয়ে আত্মার সমস্ত ব্যাকুলতা দিয়ে জানাতে লাগলেন তাঁর প্রার্থনা এক ঊর্দ্ধ ঐশী শক্তির কাছে। হে বিশ্বের মহাপ্রাণ! দাও দাও তোমার একটু স্পর্শ এই রোগজীর্ণ দেহে, এই মৃত্যুপথ-যাত্রী মানবকে, এই অকালে ঝরবার মুখে প্রসূনটিকে—যে মহাপ্রাণের এতটুকু স্পর্শে জেগে ওঠে বুকে বহ্নিতে কিশলয়পুঞ্জ, হীনতম তৃণগুল্মে পুষ্প-সম্ভার, যার স্পর্শে তেজী-বীথিকায় জেগে ওঠে তেজীপুঞ্জের অপূর্ব নয়নানন্দ বর্ণসমারোহ, চন্দ্রমল্লিকার কুঞ্জে চন্দ্রমল্লিকার মহা উৎসব, জেগে ওঠে উষর মরুভূমিতে মরুদ্যান, নদীবক্ষে বীচিভঙ্গ, জেগে ওঠে পক্ষীকণ্ঠে কাকলি শিশুকণ্ঠে মা ডাক প্রিয়ের কণ্ঠে প্রিয়া-স্বর—সেই মহাপ্রাণের একটুকু সঞ্জীবনী স্পর্শ দাও দাও এই রোগজীর্ণ কলেবরে এই মৃত্যু-ত্রিয়মান যাত্রীকে—হে মহাপ্রাণ, প্রাণ দাও প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে জাগ্রত মহাপ্রাণ! সাত দিন সাত রাত, যেন এক যুগ। যেন মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের, অন্ধকারের সঙ্গে আলোকের এক নীরব সংগ্রাম। অবশেষে ধীরে ধীরে অন্ধকারের পরাভব ঘটল, জীবন তার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িয়ে দিল, মহাপ্রাণের সূক্ষ্মতম সঞ্জীবনী স্পর্শ সম্রাটের রোগ-পাণ্ডুর দেহে সজীবতা ফিরিয়ে আনতে লাগল। তাঁর চোখ খুলল, মুখমণ্ডলে রক্তের আভা দেখা দিল, কণ্ঠে কথা ফুটল—ক্রমে ক্রমে তিনি সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হ'য়ে উঠলেন। জয় জয় জয় হে জাগ্রত মহাপ্রাণ!

সারা নিপ্পন জুড়ে ইস্‌সান-কাশো-দাইজেন্‌জির জয় জয়কার পড়ে গেল। মহারাজ সোগুন স্বয়ং এসে ধর্মাত্মা দাইজেন্‌জিকে অভিনন্দন জানালেন। সম্রাট তাঁকে এক নূতন উপাধি উংগো-জেন্‌জি দ্বারা ভূষিত করলেন। বলাবাহুল্য এর পর উংগো-জেন্‌জি সম্রাটের শ্রেষ্ঠতম মিত্রপাত্র হ'য়ে উঠলেন।

উংগো-জেন্‌জি তাঁর উংগোজি মঠে ফিরে গেলেন। তাঁর মনে হ'তে লাগল যে এইবার তাঁর ব্রত উদ্‌যাপনের তাঁর প্রতিশোধ গ্রহণের কাল সমাগত। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন এখন কি কৌশলে যাতে বাসাখুনেকে সম্রাটের রোষ-বহ্নিতে ফেলতে পারা যায়। সম্রাটের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্রে বাসাখুনে লিপ্ত এমন একটা ব্যাপার সম্রাটকে বিশ্বাস করাতে পারলেই কাজ শেষ। এইটেই আবিষ্কার করার মাত্র এখন অপেক্ষা।

কেবল মাত্র এই একটি বিষয় উংগো-জেন্‌জির মন অধিকার ক'রে বসল। তাঁর ধ্যানে জ্ঞানে, শয়নে স্বপনে, কর্মে বিশ্রামে, আহারে বিহারে কেবল ঐ চিন্তা—কি ক'রে মাসামুনেকে ফাঁদে ফেলা যায়। এমনি ক'রেই উংগো জেন্‌জির দিন কাটে।

সেদিন গভীর নিশীথে উংগো-জেন্‌জি আপনার বিশ্রাম-কক্ষে ব'সেছিলেন। চোখে তাঁর ঘুম নেই, হৃদয়ে তাঁর শান্তি নেই—তাঁর এক চিন্তা এক ধ্যান—কি ক'রে, কি ক'রে হাতে মাসামুনেকে পাশবদ্ধ করা যায়। কিন্তু কোনোই কূল কিনারা এতদিন করতে পারেন নি। ভাবতে ভাবতে তাঁর চোখ দুটি যেন ঘুমিতে আচ্ছন্ন হ'য়ে এলো। তাঁর মাথাটা তাঁর বুকের উপর নমিত হ'য়ে গেল। তারপর—তারপর যেন এক অপূর্ব ব্যাপার ঘটল। একি স্বপ্ন না সত্য? কে জানে! উংগো জেন্‌জি যেন দেখলেন, সহসা সমস্ত কক্ষটি জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে, আর সেই জ্যোতিঃ উজ্জ্বলতর ক'রে ধীর পাদক্ষেপে তাঁর সম্মুখে প্রশান্ত বদনে, সৌম্য হাস্যে, দিক যেন এক বিপুল করুণা-ধারায় প্লাবিত ক'রে এসে দাঁড়িয়েছেন শাক্যমুনি। উংগো- জেন্‌জির সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল। বহুদূরাগত বংশীর সুমধুর সুরলহরী যেন তাঁর হৃৎকন্দরে ধ্বনিত হ'তে লাগল। এক অপূর্ব সুরস্তিতে যেন তাঁর জীবনটা পরিপূর্ণ হ'য়ে গেল। শাক্যদেব তাঁর দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত ক'রে যেন তাঁর মাথার উপর রাখলেন। সে কি এক মুহূর্ত সে কি এক যুগ! পরক্ষণে উংগো-জেন্‌জির তন্দ্রা ভেঙে গেল। তিনি মাথা তুলে চোখ মেলে দেখলেন। কেউ কোথাও নেই, কক্ষ তেমনি অন্ধকার পূর্ণ। কেবল তাঁর অন্তরটা যেন তখনো কাঁপছে।

উংগো-জেন্‌জি ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। বাইরে বেরিয়ে দেখলেন, দিক দেশ যেন সারা বিশ্ব চরাচর এক সান্দ্র নিবিড় জ্যোৎস্নার বন্যায় পরিপ্লাবিত। সে কী জ্যোৎস্না! রজত-শুভ্র—গলিত রৌপ্যের প্লাবন—তার মধ্যে হংস-বলাকা মিলিয়ে যায়, ধরা যায় না! সম্মুখে বিস্তৃত উদ্যানে অজস্র চন্দ্রমল্লিকা ফুটে আছে এক গভীর রহস্য-নিকেতনের হাসির ও সৌন্দর্যের বাহন হ'য়ে, জ্যোৎস্না-আকুল নিশীথে প্রস্ফুটিত হাস্নোহানার সুরভি দিক দেশ আমোদিত করেছে যেন কোন্ এক অনশ্বর সাধকতায়। উংগো-জেন্‌জির সারা অন্তর যেন একটা অপূর্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল। তাঁর জীবনের চার পাশ থেকে যেন কতকালের একটা পুরু গাঢ় কৃষ্ণ যবনিকা খসে পড়ল। কোথা থেকে যেন একটা বিরাট পাষাণ ভার নেমে গেল। তিনি সেই মুহূর্তে দেখতে পেলেন জীবনটাকে স্পষ্টভাবে স্বচ্ছভাবে গভীরভাবে—সেই অপূর্ব অনির্বাচ্যক্ষণে তিনি বুঝতে পারলেন জীবনের প্রতি ঘটনা, বাইরের ব্যাখ্যায় নয়, তাঁর ভিতরকার সত্য অর্থে, গভীরতর তাৎপর্যে, গভীরতম মর্মভোতনায়। অতি নিবিষ্ট-মনা কে একজন যেন নিজেকে আবিষ্কার করল। মুহূর্তে তাঁর সমগ্র জীবন পূর্ণ হ'য়ে গেল সুখে সৌখ্যে শান্তিতে। কোথাও যেন আর লেশতমও অপ্রেম রইল না।

পরদিন উংগো-জেন্‌জি তাঁর প্রধানতম শিষ্যকে পাঠালেন যাতে মাসামুনেকে সাদরে সসম্মানে আমন্ত্রণ ক'রে আনতে উংগোজি মঠে তাঁর আবাস স্থানে।

(৪)

যথা সময়ে যাতে মাসামুনে উংগোজি মঠে এলেন। সাদরে অভ্যর্থনা ক'রে ধর্মগুরু উংগো-জেন্‌জি তাঁকে আপনার বিশ্রাম-কক্ষে নিয়ে গেলেন। বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ ক'রে মাসামুনে চমৎকৃত হ'য়ে দেখলেন কক্ষের

এক পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র বেদী, আর সেই বেদীর উপরে এক পাটি গেটা অতি সযত্নে রাখা হয়েছে। সেই কাষ্ঠ পাদুকা পুষ্পে ও পুষ্পমাল্যে শোভিত। সম্মুখে তার সারি সারি ধূপকাঠি জ্বলছে এবং তারি সুরভিতে সমস্ত গৃহ আমোদিত। ফুলের সৌরভ ও ধূপ ধূপের সুরভি মিশে সমস্ত কক্ষটাতে যেন একটা রহস্যের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে যেন দেবতার প্রসন্নতার উদ্ভাস।

দাস্তে মাসামুনে উপস্থিত হ'লে উৎগো-জেন্‌জি কক্ষতলে দুই করতল স্থাপন ক'রে মেঝেতে ললাট স্পর্শ ক'রে কয়েকবার অভিবাদন করলেন তারপর মাথা তুলে বললেন—"মহামান্যবর দাইমিয়ো দাতে মাসামুনে! উৎগোজি যথে স্বাগতম্।"

দাস্তে মাসামুনে প্রত্যভিবাদন জানিয়ে বললেন—"মহামান্য ধর্মগুরু উৎগো-জেন্‌জি! একটা বিষয়ে আমার পরম কৌতূহল জেগেছে। আপনি গেটার মতো একটা তুচ্ছ বস্তুকে এমন ক'রে বেদীর উপরে রেখেছেনই বা কেন আর পুষ্প পত্র দিয়ে ধূপ ধুনা জ্বালিয়ে তার এমন অর্চনাই বা করছেন কেন?

উৎগো-জেন্‌জি উত্তর করলেন—"সেই কথাই বলবার জন্য আমি আজ আপনাকে আমন্ত্রণ করেছি।"

ধর্মগুরুর কথা শুনে মাসামুনের মনের বিস্ময় চতুর্গুণ বেড়ে গেল—বললেন "সেই কথাই বলবার জন্যে আমাকে আমন্ত্রণ করেছেন? আমার বিস্ময় এতে চতুর্গুণ বেড়ে গেল। কিন্তু আমাকে কেন?"

ধর্মগুরু বললেন—"শুনুন তবে। ত্রিশ বছর পূর্বের কথা। আপনি তখন তেইশ চব্বিশ বৎসরের যুবক মাত্র এক প্রচণ্ড শীতের দিন। সমস্ত বরফে আবৃত হ'য়ে গিয়ে এক শুভ্র সুষমা চতুর্দিকে শোভা বিস্তার করেছে। সেদিন এই শুভ্র সৌন্দর্য ভালো ক'রে উপভোগ করবার জন্য একজন দাইমিয়ো তাঁর প্রাসাদ-দুর্গের অনতিদূরে একটি টিলার উপরে যে একটি বিশ্রাম-ভবন তিনি নির্মাণ করেছিলেন? সেইখানে কয়েকটি অনুচর নিয়ে উপস্থিত হন। দাইমিয়ো তাঁর অনুচরদের নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেন, বাইরে থাকে তাঁর পাদুকা-বাহক ভৃত্য। এই ভৃত্যের তার প্রভুর প্রতি ছিল যেমন ভক্তি তেমনি ভালোবাসা। পাছে হিমে ঠাণ্ডা গেটা পায়ে দিয়ে তার প্রভুর কষ্ট হয় সেই জন্যে সে গেটা জোড়া তার পরিচ্ছদের ভিতরে তার পেটের কাছে রেখে দেয়। তার প্রভুর বেরিয়ে আসবার পূর্বক্ষণে সে পাদুকা জোড়া দ্বারের কাছে সাজিয়ে রাখে। তার প্রভু বেরিয়ে এসে গেটা-পায়ে দিয়ে তার উষ্ণতা অনুভব করেন এবং তৎক্ষণাৎ মনে করেন যে নফরটা নিশ্চয়ই এতক্ষণ এই গেটা পেতে বসেছিল। তৎক্ষণাৎ ক্রোধে উন্মত্ত হ'য়ে তিনি একপাটি গেটা দিয়ে সেই হতভাগ্য ভৃত্যের কপালে এক প্রচণ্ড আঘাত বসিয়ে দেন। সেই আচম্বিত আঘাতে বেচারা মূর্ছিত হ'য়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।"

এই কাহিনী শুনে ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার স্মৃতি যেন সহসা মাসামুনের মনে সমুজ্জ্বল হ'য়ে উঠল—তিনি ব'লে উঠলেন—"আমিই সেই দাইমিয়ো। কিন্তু আপনি এই ঘটনা জানলেন কি ক'রে?"

ধর্মগুরু উত্তর করিলেন—"আমিই সেই হতভাগ্য পাদুকা-বাহক ভৃত্য মাকাবে হেইশিরো।"

যেন টাইফুনের একটা ঘমকা, ভূমিকম্পের একটা ঝুঁটকুনি মাসামুনের মনের উপর দিয়ে চলে গেল—বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে প্রচণ্ড এক বিস্ময় কণ্ঠে নিয়ে তিনি ব'লে উঠলেন—"তুমি—আপনি—আপনিই সেই ভৃত্য।"

"হাঁ—আমিই সেই ভৃত্য।"

"কি আশ্চর্য! আমি কিছুমাত্র চিনতে পারি নি"

উগো-কেনৃজি বললেন—"কি ক'রে চিনবেন। তখন আমি ছিলাম তেত্রিশ বছরের যুবক আর এখন জরাগ্রস্ত শিথিল ত্বক শুভ্র কেশ তেষট্টি বৎসরের বৃদ্ধ। তা ছাড়া আমি ছিলাম আপনার হীনতম নফর। কোনোদিন ভালো ক'রে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন কি না সন্দেহ।"

মাসামুনে এক প্রবল প্রয়াসে আপনাকে শান্ত ও প্রকৃতিস্থ করলেন—তারপর প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন—"আমার কৌতূহলের উদ্দাম চাঞ্চল্য মার্জনা করুন। কিন্তু তারপর?"

উগো-কেনৃজি বলতে লাগলেন—"তারপর মাসামুনে হেইশিরোকে অমনি মূর্ছাবস্থায় ফেলে রেখে আপনার অনুচরদের নিয়ে তাঁর প্রাসাদ-দুর্গে চ'লে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে হতভাগা হেইশিরোর জ্ঞান ফিরে এলো। জ্ঞান ফেরবার পর যখন তার সমস্ত ঘটনা মনে পড়ল তখন তার অন্তরে যেন এক সুপ্ত শার্দূল জেগে উঠল। কী অত্যাচার! কী অবিচার! ভক্তি ভালোবাসার কী প্রতিদান। তার মনে এর প্রতিশোধ গ্রহণের এক দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। সেই অবস্থায় নিয়ে সে চিরদিনের তরে ও প্রভুকে ছেড়ে চলে গেল।"

মাসামুনে বললেন—"হাঁ হাঁ, মনে পড়েছে, এর পর হেইশিরোকে আর আমি খুঁজে পাই নি। হিরোয়িমা আমার পাদুকা-বাহকের কাজ পায়। কিন্তু তারপর?"

বৃদ্ধগুরু বলতে লাগলেন—"কিন্তু প্রতিশোধ নেবার জন্যেই প্রতিশোধ নেওয়া যায় না। বিশেষ ক'রে সে একজন সামান্য নফর আর মাসামুনে একজন দাইমিয়ো। হেইশিরো কেবল চিন্তা করতে লাগল কোন পন্থায় তার কামনা সফল হ'তে পারে। তার মনে হ'ল সে যদি পুরোহিত হ'য়ে বহু খ্যাতি অর্জন করতে পারে এবং কোনোদিন সম্রাটের কৃপালাভ করতে সমর্থ হয় তবে তার পক্ষে এই প্রতিশোধ নেবার পথ খুলে যেতে পারে। এই মনে ক'রে সে প্রথমে এই উগোজি মঠে এবং পরে এরিয়ানজুজি মঠে বিশ বছর ধ'রে শিক্ষা দীক্ষা ও তপশ্চর্যায় কাটালো। তারপর চীনদেশে গিয়ে আরো দশ বছর সে সেখানকার নানা মঠ মন্দিরে ঘুরে ঘুরে বৌদ্ধধর্মের সকল গুহ্য তথ্য ও রহস্য আয়ত্ত করল। তারপর একদিন চীন সম্রাটের কাছ থেকে প্রভূত সম্মান অর্জন ক'রে আপন স্বদেশে ফিরল।"

মাসামুনে বললেন—"হাঁ, ইস্পান-কালো-বাইয়েনৃজির স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কথা আমার বেশ মনে আছে—সবারই মনে আছে।"

"স্বদেশে ফিরে হেইশিরো বা ইস্পান-কালো-বাইয়েনৃজি উগোজি মঠে প্রধান ধর্মগুরুরূপে স্থান পেলেন। তার নাম সারা নিপ্পনে ছড়িয়ে গেল। কিছুকাল পরে সম্রাট এক দারুণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন। যখন চিকিৎসকরা কিছুই করতে পারলেন না তখন শান্তি-স্বস্ত্যয়নের জন্য আমার ডাক পড়ল। রোগ-শয্যার পাশে সাতদিন সাতরাত্র ধ'রে প্রার্থনার পর সম্রাট মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এলেন। তারপর ধীরে ধীরে তিনি সম্পূর্ণ নিরাময় হ'য়ে উঠলেন। আমি তাঁর সর্ব প্রধান প্রিয়পাত্র হ'য়ে উঠলাম। সেই দিন থেকে দিবসে নিশীথে শয়নে স্বপনে কর্মে অবসরে আমার এক ধ্যান এক জ্ঞান একচিন্তা, কি ক'রে আপনাকে সম্রাটের বিষ-দৃষ্টিতে ফেলতে পারি। কাল গভীর নিশীথে এই চিন্তাই করছিলাম। চোখে ঘুম নেই, জাগে শান্তি নেই। কালো বাদুড়ের মতো চিন্তারাশি উড়ে যায় এদিক সেদিক এলোমেলো—জীবনের চতুর্দিকে যেন একটা ভারী মসীকৃষ্ণ যবনিকা ফেলে দিয়েছে কে।

ভাবতে ভাবতে আমার চোখ বন্ধ হয়ে এলো। তারপর এক অপূর্ব স্বপ্ন! দেখলেন যেন চতুর্দিক জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল আর সেই জ্যোতিঃ উজ্জ্বলতর হ'য়ে শাকামুনি এসে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হ'লেন এবং তাঁর দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত ক'রে আমার মাথার উপরে রাখলেন। মুহূর্তে যেন আমার জীবনের চতুর্দিক থেকে কৃষ্ণ যবনিকা খ'সে পড়ল—আমার সমস্ত অন্তর আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল—আর সেই আলোকে স্পষ্টভাবে স্বচ্ছভাবে আমি দেখতে পেলেম আমার জীবন, আমার জীবনের ঘটনাবলীর আসল অর্থ প্রকৃত তাৎপর্য। সেই মুহূর্তে দিব্য-দৃষ্টিতে পরিষ্কার দেখতে পেলেম যে আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মিত্র হচ্ছেন আপনি।"

মাসামুনে চম্‌কে উঠলেন—বিস্ময়াকুল কণ্ঠে ব'লে উঠলেন—"আমি!"

"হাঁ, আপনি। ভেবে দেখুন, আপনি যদি সেই ত্রিশ বছর পূর্বে ক্রোধের বশে আমাকে গেটা দিয়ে আঘাত না করতেন তবে আজ আমি কোথায় থাকতাম। মাকাবে হেটশিরো তবে আজও সেই পাদুকা-বাহক ভৃত্যই থেকে যেত। তবে কোথায় রইত তার আজকার এই খ্যাতি প্রতিপত্তি যশ মান দেশ বিদেশে নাম। কোথায় রইত তার শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান আধ্যাত্মজীবন। একমাত্র আপনার কার্যের ফলেই এ সব হেইবিতোর ভাগ্যে ঘটেছে। আর তাই সেদিনকার সেই আমার কুড়িয়ে-বেওয়া আপনার গেটার পাটি আমার পক্ষে পূজা—আর তাই তার স্থান হয়েছে বেদীর উপর—পুষ্প পত্র মাল্যে ধূপ ধুনায় অর্চিত।"

বলতে বলতে উংগো-জেন্‌জি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর দুই বাহু প্রসারিত ক'রে বললেন—"হাতে মাসামুনে আপনি প্রথম পরাক্রান্ত যাইমিয়ো। কিন্তু আমিও আজ নিক্কনের প্রধান ধর্মগুরু আপনার অযোগ্য নই। আমি আপনার বন্ধুত্ব লাভের কামনা করি। যে-জ্যোতির আবির্ভাব ঘটেছে তা চিরস্থায়ী হোক—আবার যেন আঁধার একে গ্রাস করতে না পারে—ডুবিয়ে দিতে না পারে।"

হাতে মাসামুনে কাহিনী শুনতে শুনতে এক বিপুল বিস্ময়ের মাঝে ডুবে গিয়েছিলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর বাহু বিস্তার করে উংগো-জেন্‌জির প্রসারিত বাহু গ্রহণ করলেন—এবং পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। বৃদ্ধ উংগো-জেন্‌জির চোখ দিয়ে দরবিগলিত ধারে অশ্রু ঝরতে লাগল—আনন্দের অশ্রু। যেন আজ তাঁর জীবনের সত্যিকার ব্রত উদ্‌যাপন হ'ল। গর্বোদ্ধত মাটসিংহা দাতে মাসামুনের চক্ষুও শুষ্ক রইল না।

দু'জনের ঠিক মাথার উপরে যেন খানিকটা আলোকোজ্জ্বল কুয়াসা—তারি মধ্যে একখানি জ্যোতির্ময় প্রসারিত হস্ত, যেন ধীরে ধীরে অপসারিত হ'য়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেল!

মজুনা

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

পল্লীর পরিবারে মজুনা ছিল যেন আ-গাছা। বনে একটি বনুল ফুল। সে এত রূপ কোথায় পাইল কে জানে! একদিন তাহার দেহে মনে আনন্দের তড়িৎ খেলিয়া গেল। যৌবনের দখিনা বাতাসে তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল। বারোবাঁকীর খাল ধারে তাহার বাড়ী। ভাই নাই, বোন নাই, বাপমায়ের আদরের দুলালি, কুটীর আলো করিয়া কুটিয়া রহিল।

বারোবাঁকীর খালে অনেক নৌকা আসে। মজুনা স্নান করিতে গিয়া দেখে খালের জলে চলচ্ছলৎ করিয়া নৌকাগুলি মৃদু মৃদু দোল খাইতেছে।

একদিন নিশীথ রাতে মজুনা ঘুমের ঘোরে শুনিল বাঁশীর গান। সে স্বপ্নে শিহরিয়া উঠিল, এমন সুন্দর বাঁশী কে বাজায়? গাঙের কূল হইতে বাঁশী বড় উদাস সুরে বাজিতেছে। এমন বাঁশীর গান ত সে আর কখনও শোনে নাই!

উদাস সুরে বাজে বাঁশী ভাটাল দরিয়ার বইয়া।
উদাস করে ঘুমের মানুষ পরাণ কান্দি লইয়া।

পরদিন মজুনা আবার সে বাঁশী শুনিল এবং কলসী লইয়া ঘাটের কূলে স্নান করিতে গেল। দেখিল, একখানি নৌকার ছইয়ের (ছাদের) উপর বসিয়া একজন বিদেশী বাঁশী বাজাইতেছে আপনার মনে। বাঁশী যেন তাহার প্রাণের কথা বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতেছে। মজুনার প্রাণে তাহার সুরের প্রাণস্পর্শ দিয়া লাগিল। সে কেবলই ভাবিতে লাগিল, একি বাঁশী! এমন করিয়া পাগল-করা বাঁশী কেন বাজে? সে সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল,

বাঁশীর সুরেতে কন্যার দুরু দুরু বুক।
চাঁদের দুয়ত জিনি বাঁশিয়ার মুখ॥

কি সুন্দর! যেমন রূপ তেমনি গুণ। কে ধৈর্য ধারণ করিতে পারে? মজুনা আস্তে আস্তে কলসী ভাসাইয়া দিল। তাহার সরীর বাঁশীর উদাস-করা সুরে অবশ হইতে লাগিল। সে জলের স্রোতে ভাসিয়া গেল।

আউলা বাউলা চুল জলেতে ভাসিল।
চাঁদের সমান মুখ মেঘেতে ঢাকিল॥

মজুনার সব আলুথালু হইয়া গেল। পায়ে কাপড় জড়াইয়া গেল। তখন সে ডুবিতে লাগিল। নৌকার মাঝি মাল্লারা সব 'ডুবিল' 'ডুবিল' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। কন্যার পিতা গুমাইন ছুটিয়া আসিয়া আছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু কেহই খালের জলে ডুবিয়া মজুনাকে তুলিতে সাহস করিল না। খালে কুমীর থাকিত। সেই ভয়ে কেহ জলে নামিতে পারিল না।

বারোমারিয়ার খাল খণ্ড অতিশয়।

পতি বছর এই খালে এক এক মানুষ লয়॥

নৌকার ছাতে বসিয়া যে এতক্ষণ অন্যমনে বাঁশী বাজাইতেছিল, সে দেখিল যে, একটি তরুণী ডুবিয়া যাইতেছে, অথচ তাহাকে উদ্ধার করিবার কোনও চেষ্টাই হইতেছে না। তখন সে জলে নামিয়া পড়িল এবং সাঁতার কাটিয়া ঝাঁকের মাথায় গিয়া খোঁপা ধরিতে লাগিল। সে যাহা অনুমান করিয়াছিল, তাহাই ঠিক ঝাঁকের মাথায় জলের তলে

কালা বরণ চুলের মতন কি যে দেখা যায়।

যুবক ডুব দিয়া মহুনাকে তুলিল। কেহ বলে প্রাণ নাই, কেহ বলে আছে। কিন্তু যুবক সে সব কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে মাথার উপর তুলিয়া ঘুরিতে লাগিল। তরুণী অনেক জল খাইয়াছিল, সে সব বাহির হইয়া গেল এবং সকলে ধরাধরি করিয়া তাহাকে বাড়ীতে লইয়া গিয়া শোয়াইয়া দিল।

(২)

মহুনার পিতা গুরাধন সেই ছেলেটির পরিচয় জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল যে তাহার কন্যার জীবন রক্ষা করিয়াছে।

ঘাটের কূলে গিয়া তাহার দেখা পাইল এবং বলিয়া কহিয়া তাহাকে বাড়ীতে ধরিয়া আনিল।

গুরাধন বলে বাপ শুন মোর কথা।

মহুনার খালে তোমার বানাই দিব জোতা॥

আমার কন্যার জন্যে তোমার পায়ের জুতা বনাইয়া দিলেও তোমার ঋণ পরিশোধ করা যায় না। তুমি তাহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে, শুধু তাহাই নয়, এখনও সে তোমারই কথা বলিতেছে। বিকারের ঝোঁকে তোমায় খোঁজই করিতেছে।

গুরাধন ঐ ঘাটের ঘাটোয়ালী করে। সে প্রায় সকল মাঝিমাল্লাকে চিনিত। বলিল, তোমায় ত আমি এতদিন দেখি নাই। তোমার নাম কি? তোমার বাপ মাই বা কোথায়? কোন গাঁয়ে তোমার বাড়ী?

ছেলেটি বলিল, আমার নাম ছায়াদ। বাপ মা কেউ নেই। ছেলেবেলা থেকেই আমি মাতৃপিতৃহীন। কোথায় আমার গাঁ, মনে নেই। লক্ষ্যহীন হয়ে নিরাশ্রয় হয়ে ঘুরতে ঘুরতে শেষে ভাটিয়াল গ্রামে এসে হাজিসেখের বাড়ীতে আশ্রয় পেলাম। শেষের বানের কারবার আছে—আমি সেই কাজে এসেছি।" মহুনার মা এই সকল শুনিয়া তাহাকে অত্যন্ত যত্ন আদর করিল এবং কন্যা যেখানে জ্বরঘোরে অচেতন, সেখানে লইয়া গেল। ছায়াদ একখানি পাখা হাতে লইয়া তাহার শিয়রে গিয়া বসিল।

মহুনা মাঝে মাঝে 'বাশিয়া' 'বাশিয়া' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিতে লাগিল। ছায়াদের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে মহুনার 'সোনার অঙ্গে' হাত বুলাইতে লাগিল।

মহুনা একবার চাহিয়াই চক্ষু বুজিল। এ কি স্বপ্ন? সত্যই কি সে আসিয়াছে?

ফিরিয়া চাহিল কন্যা মুখে নাই তার বাণী।
বুকে ছিল ব্যথা তার চোখে ছিল পানি॥

মহুনা ক্রমে সুস্থির হইল। তাহার অসুখ যত দিন ছিল, ছায়াদ প্রতি দিন তাহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিয়াছে, কত মিষ্ট কথা বলিয়াছে, কত সান্ত্বনা দিয়াছে। ছায়াদের নৌকায় ফিরিতে কোনও কোনও দিন অধিক রাত্রি হইয়া যাইত।

মহুনার রাত্রিটুকু কাটিত ছায়াদের স্বপ্নে। ভোর হইলেই তাহার চক্ষু কাহার সন্ধান করিত। অশান্ত-ভাবে সময় কাটাইয়া যখন মহুনা ছায়াদকে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিত তখন যেন আগুনে জল পড়িত।

মহুনার মা বলিল, 'হাসা ছেলে। জামাই করলে হয় না?'

তার বাবা বলিল 'বাড়ী ঘর নেই যে।'

"না-ই থাক, আমার ত পুত নেই, সে আমার ঘরে আমার ছেলের মতো হয়ে থাকবে।"

তাঁহারা উভয়ে ছায়াদকে 'দুলা' করিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু ছায়াদ বলিল, সে গরীব, সে পরের চাকর, পরের অন্নদাস। যাহার চালচুলা নাই, তাহার আবার বিবাহ সে করিবেনা।

(৩)

মহুনা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। ছায়াদের প্রতি তাহার ভালোবাসা হৃদয়ের দুকূল ছাপাইয়া উঠিল। সে আর আপনাকে সামলাইতে পারিতেছিল না। একদিন দুপুরের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, এমন সময়ে ছায়াদ আসিয়া বলিল, মহুনা ঠাণ্ডা জল খাওয়াতে পারো?

মহুনা ঠাণ্ডা জল দিল। কিন্তু পিপাসার জল পাইয়াও যেন তাহার তৃপ্তি গেল না। ছায়াদ থামিয়া থামিয়া বলিল,

'মহুনা, কাল আমার নৌকা খুলে দেবো। আমায় মনে থাকবে ত?

মহুনার মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। সে অশ্রুভরা চোখে বলিল, তুমি কেন যাবে বন্ধু?

'চাকরি করি যে? ধান কেনা হয়ে গেছে, আর ত থাকা চলে না।

'চাকরি না-ই বা করলে! আমার বাবার বিঘে চার পাঁচ জমি আছে—'

'তাতে ত আর চলবে না! আমি এমন সোনার প্রতিমা নিয়ে গিয়ে খাওয়াবো কি'?—

তুমি বাঁশী বাজিয়ো, আমি শুনবো। তোমার বাঁশী শুনে জলে ডুবেছিলাম, ও-বাঁশী শুনলে খিদে তেষ্টা থাকে না। আমার জন্যে ভেবো না—'

মহুনা গান সাঙ্গিয়া গোপীযন্ত্রটি তাহার মুখে তুলিয়া দিল। বলিল 'জীবনে মরণে তুমিই আমার প্রাণের বন্ধু—যদি নিতান্ত যাবে যাও, আবার

দেখাইও সোনা মুখ দেখাইও হাসি।
আবার আসিয়া ঘাটে বাজাইও বাঁশী॥

ছায়াদ বলিল, আমি প্রথমে যদি বাড়ি আবার আসিব। কিন্তু এসে দেখবো, যে কোন মুহূর্তে তোমার শাদি হয়ে গেছে—'

না, বধু। সে হবার নয়। আমার মা বাপ জানে যে আমার বিয়ে হয়ে গেছে। 'তুমি আমার বুকে আছ, তুমি আমার প্রাণে। বাঘোবাঁকীর জল থেকে যখন তুমি আমায় বুকে করে' তুলেছিলে, তখন কি আমার বিয়ে হয় নি!

ছায়াদ উত্তর করিল, তুমি ঠিকই বলছ। কিন্তু ছেলে বেলা আমার মা বাপ মারা গেলে আমি যখন অনাথ হয়ে ঘুরে' বেড়িয়েছিলাম, তখন যিনি আমায় আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁর কাছে না জিজ্ঞেস করে' কেমন করে' বিয়ের কথায় রাজি হই?

"কিন্তু তিনি যদি তোমায় মানা করেন—"

"না গো না! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো—আমি তোমাকে বিবাহ করলো—ধর্ম সাক্ষী করে' বলে যাচ্ছি।

তবুও মহুনা অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া তাহাকে বলিয়া দিল:

যে দিন দেখেছি তোমায় ঐ নদীর কূলে।
তোমার পা যে বাঁধা আছি আমার মাথার চুলে॥

পরদিন নৌকা ছাড়িয়া দিল। বহু দূর দৃষ্টি যায়, নদীর কূলে দাঁড়াইয়া মহুনা তাকিয়া রহিল। তারপর অশ্রুজলে মুখ বুক ভাসাইয়া সে গৃহে ফিরিল।

(৪)

ভাটিয়াল গ্রামের হাজি শেখ ধানের বেপারী। তাহারই প্রতিপালিত ছায়াদ। কিন্তু হাজি শেখ বড় কৃপণ: কেবল মুনাফা করিতেই ব্যস্ত। ধানের ব্যবসায় লাভ হয় খুব, কিন্তু শেখের তাহাতেও তৃপ্তি নাই। বাড়ীতে সে একখানি ছিন্ন বস্ত্র পরিয়াই থাকে। এক সন্ধ্যা অন্ন খায় ত পরের সন্ধ্যা কিছুই খায় না। লোকে তাহাকে বলিত টাকার কুমীর। কিন্তু হইলে কি হয়? খরচ করিবার বেলা তাহার হাত সরিত না।

ছায়াদ ধান লইয়া ফিরিল। সে এতদিন শেখের বাড়ীতে কাজ করিয়াছে, নিশ্চয়ই তাহার কিছু পাওনা হইয়াছে। যদি বিবাহ করিতেই হয়, কিছু টাকাকড়ি লাগিবে ত? ছায়াদ হাজি শেখের নিকটে গিয়া তাহার প্রাপ্য মাসোহারা চাহিল। শেখ হঠাৎ এই টাকার প্রসঙ্গে চকল হইয়া উঠিল। বলিল,

'তোমাকে আবার বেতন দিতে হবে নাকি? কত চাই বল—'

'যা দিবে তাই নিব। এখন তোমার বিবেচনা।'

হাজি শেখ দশটি টাকা ছায়াদের হাতে দিল এবং কয়েকবৎসরের প্রাণপাত পরিশ্রমের সামান্য পুরস্কার পাছে তুচ্ছ করে এই ভয় বলিল:

'তোমায় এত দিন ভাত কাপড় দিয়ে পালন করলাম, আমার কাছে মাসোহারা চাইতে লজ্জা হ'ল না—'

ছায়াদ নির্বাক্ হইয়া শুনিল। পরে টাকা কয়েকটি ফিরাইয়া দিয়া উঠিয়া গেল।

সে ভাবিল 'সত্যই ত। আমি এই ব্যক্তির অন্নে মানুষ। এর নিকট থেকে টাকা কেন নিব? বরং অন্যত্র আমার ভাগ্য পরীক্ষা করে' দেখি।

ভাগ্যান্বেষণের জন্য ছায়াদ বাহির হইয়া পড়িল এবং পায়ে হাঁটিয়া চট্টগ্রাম সহরে আসিয়া চাকরীর চেষ্টা করিতে লাগিল। হাতে পয়সামাত্র নাই, পেটে অন্ন নাই, ছায়াদ কোনও স্থানে চাকরী জোগাড় করিতে পারিল না।

এই সময়ে বাদশাহী মোগলের সঙ্গে আরাকানের মগদের যুদ্ধ বাধিয়াছিল। এই মগদের উপদ্রবে বাংলার পূর্বাঞ্চল একদিন বিধ্বস্ত হইয়াছিল। নবাব শায়েস্তা খাঁ এই সময়ে চট্টগ্রাম অধিকার করেন এবং তাঁহার পুত্র এক নৌ-বহর লইয়া মগদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। ঠিক এই সময়ে ছায়াদ চাটিগাঁয় উপনীত হইল।

চট্টগ্রামের মাঝিরা অতিশয় দক্ষ বলিয়া খ্যাতি আছে। মগরাও এ বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী রহিত। সুতরাং নাবিকের কাজ হইল উপযুক্ত দাঁড়িমাল্লা ও সৈন্য বহর সংগ্রহ করা।

বাদশাহের লোকেরা ভাগ্যান্বেষী যুবক ছায়াদকে বাঁধিয়া লইয়া গেল। সাতদিন ধরিয়া তাহাকে বেগার খাটাইল এবং কঠোর পরীক্ষার পর তাহাকে নৌবিভাগে ভর্তি করিয়া লইল।

৫

কর্ণফুলীর অদূরে 'কুতুবের চর' নামে একটি দ্বীপ আছে। খবর আসিল যে সেই চরে অগণিত মগ নৌকা ছিপ প্রভৃতি লইয়া লুকাইয়া আছে। নৌসেনাপতি স্থির করিলেন যে, আগে গিয়া তাহাদের আক্রমণ করিতে না পারিলে জয়ের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু কুতুবের চর কোথায় এবং কোনপথে গেলে শীঘ্র সেখানে পৌঁছানো যায়, তাহা কেহ বলিতে পারে না। এই সময়ে ছায়াদকে প্রশ্ন করা হলে সে বলিল,

হুজুর এই পথ ধরে।
শতবার পাড়ি আমি দিয়াছি সাইগরে॥

ছায়াদের পরামর্শে সেই রাত্রে বাদশাহী নৌবহর যাত্রা করিল। সকালে কর্ণফুলীর মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিল সাগরের বুকে ঢেউ উঠিয়াছে।

প্রথমে অগ্রসর হইল 'পঙ্খী-উড়া' নামে তরী। শত কামান তাহাতে সজ্জিত এবং একশত দাঁড়ে নৌকা নক্ষত্রবেগে চলে। তারপরে 'হংসমালা' নামে তরণী। তাহাতে বারুদ এবং গোলা বোঝাই। তারপর চলিল 'জয় জোয়ার' তাহাতে হাজার সৈন্য। পরে পরে অসংখ্য বানামনৌকা। এইভাবে মোগল নৌবাহিনী আক্রমণে অগ্রসর হইল। ছায়াদ একখানি 'পরেওা' নৌকায় পথ দেখাইয়া চলিল।

ঘুরে ঘুরে বাজে বাজে দামামা নাকাড়া।
বড় জয় পাইলো তথায় মুন্সীর হাবড়া॥

সাগরে জোয়ার আসিল, তখন পাহাড় প্রমাণ ঢেউ উঠিতে লাগিল। সেই সময়ে দুইপক্ষে লড়াইয়ের কাড়া-নাকাড়া বাজিয়া উঠিল। মগেরা বহু 'হলদ' নৌকা লইয়া অগ্রসর হইল। 'হলদে' বহু কামান সজ্জিত ছিল। পশ্চাতে অসংখ্য 'জলেরা' এই সব তরণী অভিজ্ঞতগামী। মগদের লোকে বলিত 'সাগরের পোকা।' নৌচালনে তাহারা অসীম পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। ছোট ছোট 'ফুচা' নৌকা লইয়া তাহারা এরূপ ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হইত

যে, চক্ষের নিমেষে তাহারা দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া যাইত। মগরা এই নৌ-বহর লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিল 'শঙ্খের মুখের চরে।'

সার ভাটার পাতের পানি জলছ্ জলছ্ করে।
মগর বহর আইলো তখন শঙ্খর মুখর চরে॥

শঙ্খনদীর মুখে দুই পক্ষে কামান দাগিতে লাগিল। কামানের শ্রবণ ভীষণ গর্জন, রণবাদ্যের তুমুল ধ্বনি, মুসলমান ও হিন্দুসৈন্যগণের জয়ধ্বনি সহ মগদের অযোধ্য চীৎকার মিশিয়া এই সামুদ্রিক যুদ্ধকে বিকট করিয়া তুলিল।

এমন সময়ে বিষম ঝড়তুফান শুরু হইল। সে কি ঝড়! সমুদ্রের ঢেউ যেন আকাশে উঠিতে লাগিল। ঝড়ের কড়কড় নিনাদে শ্রবণ বধির হইল। মুসলমানেরা 'আজান' হুঙ্কারিয়া এবং মগেরা 'ফরা' 'ফরা' শব্দ করিয়া বিপদ্মুক্তির জন্য কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিল। 'ফরা' মগদের দেবতা। মগদের মধ্যে যাহারা বৌদ্ধ ছিল, তাহারা 'প্রভু নিরঞ্জনের' দরবারে প্রার্থনা জানাইতে ত্রুটি করিল না। কত কত তরণী জলমগ্ন হইল, তাহার সংখ্যা কে করিবে? অগণিত লোক যাহারা যুদ্ধে প্রাণ পাইয়াছিল, তাহারা অনেকে ঝড়ে পড়িয়া প্রাণ হারাইল। ছাগাদের সরেঙা নৌকাও ডুবিয়া গেল।

হেথু লাঠিয়াল যৈন আসি গেল লাঠি।
মগে না পাইল আগুন মুছলমানে বাটি॥

এক প্রহর রাত্রির সময়ে তুফান থামিয়া গেল। আকাশ নির্মল হইল এবং চাঁদ উঠিয়া সেই সলিলময় মহা শ্মশানের উপর বিদ্রূপের হাসি হাসিলেন।

মোগলদেরই জয় হইল। এই যুদ্ধকে মগধাওনি বলে, এই মগধাওনির পরে আর মগদের তেমন শক্তি রহিল না।

(৬)

ইতিমধ্যে বারোবাকীর খালের কূলে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মগ এবং পর্তুগীজ জলদস্যু এই সকল গ্রাম ও বন্দরে ঢুকিয়া লোকের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিত এবং প্রাণেও মারিত। পর্তুগীজ জলদস্যুদের বলিত হার্মাদ। মগদেরও ঐ নামে অভিহিত করিত।

মজুনার গৃহও ইহাদের করাল কবলে পড়িল। তাহারা সমস্ত লুটপাট করিল ও ঘরদ্বার জ্বালাইয়া দিল। মজুনার পিতা ও মাতা প্রাণ হারাইল। মজুনা তখন তাহার মাতুলালয়ে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইল।

বৃদ্ধ মামা ও মামী তাহাকে খুব যত্নই করিলেন কিন্তু তাহার এক নূতন বিপদ জুটিল। মজুনার এক মামাতো ভাই ছিল তাহার নাম বদরত। বদরতের উগ্র স্বভাব; সে মজুনাকে দেখিয়া অত্যন্ত লোভার্ত হইয়া পড়িল।

মজুনা যত তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায়, ততই বদরত তাহার কাছে ঘেঁষিয়া আসিতে চায়। সে মজুনাকে দেখিলেই শিস্ দেয়, গান জুড়িয়া দেয় এবং একা পাইলেই নানা প্রস্তাব করিয়া বসে।

একদিন মজুনা শুইয়া আছে। বদরত তাহার বিছানায় গিয়া বসিল এবং তাহার গায়ে হাত দিতে চেষ্টা করিল। তখন মজুনা কাঁদিয়া কাটিয়া তাহার মামীকে বলিয়া দিল। তাবিল মামী নিশ্চয়ই বদরতকে শাসন করিয়া দিবেন। কিন্তু দেখিল মামীর মনোভাব অন্যরূপ।

মামী বলিল, তা মন্দই বা কি বাছা? তুমি দুদিন বাদে এই ঘরের বধূ হইবা। ভাল-ই ত।

মঞ্জুলা হাতজোড় করিয়া বলিল, 'এই বিষয় মাপ চাই মামী। আমার বিয়ে হয়ে গেছে। একবার বিয়ে হইলে, তালাক না দেওয়া পর্যন্ত আমার ত আর বিয়ে করবার জো নেই—'

"ও-সব কথা রাখো বাপু। তোমার ওরা যৌবন—যেমনীরে হার্যাদের ভয়, এখন তুমি শাদি না করলে তোমার খোয়ারের অন্ত থাকিবে না—"

মঞ্জুলা দেখিল, মামী তাহাকে রক্ষা করা দূরে থাক্, তাহাকে বাঘের মুখে ফেলিয়া দিতেও কুণ্ঠিত নহেন। তখন সে মন দৃঢ় করিল। ছায়াদের কথা স্মরণ করিয়া তাহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল। সে ভাবিল, মাও যদি আজ বাঁচিয়া থাকিত, তাহা হইলে এমন করিয়া কেহ তাহার এমন লাঞ্ছনা করিতে পারিত না। মঞ্জুলা তাহার দুরদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া বড়ই কাঁদিল। কিন্তু উপায় কিছুই ঠিক করিতে পারিল না।

একদিন বিপদ চরমে উঠিল। ইহারই জন্য সে আশঙ্কা করিতেছিল। মঞ্জুলা রাতই ঘরে একাকী রাতই করিতেছিল এই সুযোগে বদরত আসিয়া তাহার যৌবনদান চাহিল।

কাপানেতে নল ফোটে শ্রবণার লাগি।
সোনা তৈন রে আমি তোমার সোনার যৌবন মাগি।

মঞ্জুলা অনেক অনুনয় বিনয় করিল, পায়ে ডুবিয়া মরিবারও ভয় দেখাইল, কিন্তু বদরত আজ পাগল হইয়া উঠিয়াছে। সে রূপসীকে মঞ্জুলার ধর্মনাশ করিবার জন্য তাহার দুইখানি হাত ধরিয়া ফেলিল।

তখন মঞ্জুলা কাকুতি মিনতি করিয়া বলিল, শোনো ভাই শোনো, নিতান্ত যখন তুমি মানা শুনবে না, তখন আর কি করি? তবে তুমি একটু সবুর কর,—পলকের মধ্যে আমি আসছি। তখন তোমার যা ইচ্ছা করিও।"

মঞ্জুলা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বাহিরে গেল এবং সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া মামা মামীর ঘর ছাড়িল। সে ছুটিতে ছুটিতে গিয়া এক ঘন বেতঝাড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। তাহার সর্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। কিন্তু সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। কোনও রূপে তাহাকে পলাইতে হইবে, এই দুষমন বদরতের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইবে একমাত্র চিন্তা তাহার মনে।

রাত্রি যখন গভীর হইল, তখন সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া বারোধাকীর খালের দিকে ছুটিতে লাগিল। পক্ষী পিঞ্জর ছাড়িয়া উড়িল।

ছোট ছোট পাহাড়ের সারি, তাহার মাঝে মাঝে ঘন জঙ্গল। সেই জঙ্গলের পথে মঞ্জুলা পথ চলিতে লাগিল। মানুষের গন্ধ পাইয়া হরিণ ছুটিয়া পলাইল। দূরে বাঘ ভালুকের ডাকে রাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকার ভীষণ হইয়া উঠিল।

ছায়াদ জলে ডুবিয়াও মরিল না। নৌকার ছই (ছাত) ধরিয়া ধরিয়া সে বারোধাকীর খালে আসিয়া লাগিল। কিন্তু কোথায় সে বন্দর! কোথায় বা সেই মাঝি-মাল্লার মেলা! ছায়াদ সারাদিন জলে পড়িয়া রহিল। কেহ আসিল না, কোনও পরিচিত মুখ তাহাকে সম্ভাষণ জানাইল না। তখন সে নিকটের কোপ হইতে একটি নলীর পাতা ছিঁড়িয়া লজ্জা রক্ষা করিয়া গ্রামের মধ্যে অগ্রসর হইল।

মহুনার বাড়ী যেখানে ছিল, সেখানে এখন ঘর দরজার চিহ্নমাত্র নাই। শুধু সেই আমড়াতলা আছে যেখানে মহুনা বসিয়া চরকায় সুতা কাটিত। তাহার কত কথা মনে পড়িল। তার সে বাঁশী আর নাই, সে আপন-ভোলা মহুনাই বা কোথায়!

ছায়াদের সমস্ত অঙ্গ অবশ। তাহার উপরে আজ কয়েকদিন অন্ন নাই। কিন্তু তাহার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা তাহার নাই। সে ভাবিতে লাগিল চাঁদ সুরুজ সাক্ষী করিয়া যাহাকে শাদি করিয়া গোলাম, সেই সোনার কন্যা যখন নাই, তখন আর জীবন রাখিয়া কি লাভ?

ছায়াদ আমড়ার তলায় শুইয়া পড়িল।

মহুনা তাহার মাতুলালয় হইতে পলায়ন করিয়া রাত্রিশেষে পথ দেখিতে পাইল। হিজল গাছের তলে এক বৃদ্ধ ধুনি জ্বালিয়া বসিয়াছিল। সে মহুনাকে দেখিয়া হাত কাইয়া উঠিল।

মহুনা বলিল, ওগো, আমায় একটু আশ্রয় দেও। আমি বড় অনাথা। তুমি আমার ধর্মের বাপ। আমি তোমার কন্যা। তুমি আমায় দূর ক'রে দিও না'

বৃদ্ধ কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া ভাল করিয়া মহুনার দিকে চাহিয়া দেখিল।

মহুনা বলিল, তোমার যদি কন্যা থাকে, আমি তাকে বহিন বলে ডাকবো। যদি না থাকে, তাকে প্রাণ খুলে মা ডাক ডাকবো।'

এই বৃদ্ধ আর কেহ নয়, সেই ভাটিয়াল গ্রামের হাজি শেখ। বৃদ্ধ পৃথকের জন্য একজন সমর্থ লোক পাইয়া খুসীই হইল। সে বলিল, 'তা হলে চলো আমার বাড়ীতে রাত থাকিতে থাকতে এসো আমরা যাত্রা করি।'

মহুনা বলিল, হাঁ, সেই ভালো। কিন্তু একটিবার আমার বাপের ভিটা দেখে আসবো। এই অনুমতি চাই। বারোবাকীর খালের কূলে আমার বাপের ভিটা ছিল। জন্মের শোধ একবার দেখে এখনই আসবো।

বৃদ্ধ সম্মত হইল। পূবের আকাশ সবে লাল হইয়া আসিয়াছে। পক্ষী-পাখালি সুমধুর স্বরে ডাকিয়া উঠিয়াছে। মহুনা চারিদিক্ চাহিয়া দেখিল, কোথাও কেহ নাই।

কিন্তু আমড়া গাছের নীচে কে একজন শুইয়া নয়? একটু অগ্রসর হইয়া গিয়া দেখিল, তাহারই আরাধনা-ধন ভূমে গড়াগড়ি যাইতেছে।

পায়ের শব্দ পাইয়া ছায়াদও চোখ মেলিয়া উঠিয়া বসিল। উভয়ে উভয়কে অপ্রত্যাশিত ভাবে পাইয়া ভাবিল স্বপ্ন নয়ত? চারি চক্ষে অশ্রুধারা ছুটিল।

হাজি শেখের সহিত ছায়াদেরও কিছুপূর্বে পথে দেখা হইয়াছিল এবং তাহারই নিকট হইতে একখানি ছিন্ন গামছা চাহিয়া লইয়া সে লজ্জা নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কাজেই এই সুখের সময়ে হাজিশেখের কথাই তাহার মনে হইল এবং উভয়ে তাহার সঙ্গে হিজল গাছের তলায় মিলিত হইয়া ভাটিয়াল গ্রামে গমন করিল।*

---

* চট্টগ্রামের দক্ষিণে কক্সবাজার মহকুমার অন্তর্গত বহুদ্দিকিয়ার খাল ও হাজিশেখের বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যায়।

অপরাজিতেষু

শ্রীদিলীপকুমার রায়

[১৯৪৫ এর "শীতের অর্ঘ" সংখ্যায় গল্পভারতীতে শকুন্তলা ও উদয়ের কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। তার মর্ম এই ক্রোরপতি পঞ্জাবী-কাশ্মীরী ব্যবসায়ীর আদরিণী কন্যা দরিদ্র "বাঁশিওয়ালা" উদয়ের জন্য স্বামীকে ছেড়ে দারিদ্র্য বরণ করে। রাওলপিণ্ডিতে বিপন্ন উদয় ও শকুন্তলাকে নিয়ে অসিত ওর বন্ধু শঙ্করের অতিথি হয়। সেখানে উদয়ের পা কাটতে হয়। তারপর শকুন্তলা ও পঙ্গু উদয়কে অসিত কয়েক মাসের জন্য ছুমেলে তার গুরুদেবের আশ্রমে রাখে। ছুমেল কাশ্মীর রাজ্যে ঝিলমের ধারে—রাওলপিণ্ডি থেকে শ্রীনগর যেতে হ'লে মাঝপথে ছুমেল পড়ে। শ্রীনগর থেকে একশো মাইল। সোহনলাল অসিতের গুরুভাই—"শাদাকালো" নাটকে তার অমিতার ও যাদু-গোপালের কথা আছে। ডাক্তার—জাপান-প্রত্যাগত, অসিতের প্রিয়বন্ধু। শকুন্তলা আশৈশব কলিকাতায় মানুষ বাংলা বলে বাঙালিরই মতন।]

কলিকাতা—২০ আগস্ট

ভাই অসিতা,

অকারণ তুমি আমাকে বকেছ। ও ভাটিয়ালি গানটা আমার অনেক আগে গেওয়া—তখন আমি তোমার কাছে গান শেখা সুরুই করিনি কাজেই ভালো গান মন্দ গানের মধ্যে তফাৎটুকু ধরতে পর্যন্ত পারতাম না। তার পরে আরো আছে—শোনো।

ওরা আমার কথা না শুনেই ওটি বার করেছে—আমি পই পই ক'রে মানা করা সত্ত্বেও। কেন—সে কথা তুমি হাড়ে হাড়ে জানো—ও-টংএর বাজে গানেরই চাহিদা বাজারে বেশি ব'লে। তুমি ওদের কাছে নিশ্চয় উল্টোটাই শুনেছ যে আমিই চাই আমার রেকর্ডের বেশি বিক্রি। কিন্তু ওদের কথা তাই ব'লে বিশ্বাস করতে পারলে এমন টপ ক'রে? না অসিতা, আমি কের বলবই বলব যে তুমি বড় সরল। মনে আছে তুমি একদিন বলেছিলে—যেদিন সুভাষ বাবুকে তুমি প্রথম আমাদের বাড়িতে আনো—যে কবিদের এক মহাদোষ তারা কান-পাতলা। শুনে সুভাষ বাবু হেসে বলেছিলেন; "অসিত যখন জগৎ সম্বন্ধে বলে এই এই তখন নিজেকে মনে করে জগৎ-ছাড়া।" তাই বোধ হয় তুমি ভুলে বসে আছ যে তুমিও কবি। রাগ করোনা ভাই, কিন্তু কী করে তুমি ভাবতে পারলে এমনতর কথা যে তোমার কুনো ছায়ারাণী হঠাৎ পপুলার হবার জন্যে মরীয়া হয়ে উঠেছে! পপুলারই যদি হ'তে চাইব তবে সভা সমিতিতে গান করতে আমার কেন এত অসাধ বলতে পারো? তা'ছাড়া কেউ আমার গানের বেশি প্রশংসা করলে কি ছাই আমি বিশ্বাস করি? আমি যে স্বভাবে কী অবিশ্বাসী চাক্ষুষ করোনি কি বারবারই? তবু আমি খাতাবাতি বদলে গেলাম—যাঁ ক'রে? তোমার কাছেই শুনেছি যে যোগেও

না কি সবচেয়ে কঠিন এই স্বভাবের বদল। অথচ যেই তুমি চললে তোমার ছায়া পথুলার হবার জন্যে উঠে প'ড়ে লেগেছে

অমনি বললে "তাইতো!
ছায়া আমার সে ছায়া আর নাই তো!"

এর পরে কবে তনব কে তোমাকে বলল ফিস ফিস করে: ঐ দেখ, ছায়া তোমাকে ঠেস দিয়ে কথা কইল, বলল "সরল!"—কাজ নেই তাই গোড়া থেকেই তার পথ মেরে রাখি, শোন—কেন বলছিলাম তোমাকে "সরল"।

অনেকদিন বাদে হঠাৎ পরশুদিন প্রফেসর শিবেন্দ্রনাথ সাহেব এসেছিলেন আমাদের বাড়ি। একগাল হাসি: তুমি নাকি তাঁর কাছে চিঠি লিখে ক্ষমা চেয়েছ। কী যে খুসি ভদ্রলোক! বললেন:—"আশ্রমের ঐ মরুভূমিতে যে অসিত আছে তার শুধু একটা কারণ: মরুভূমিতেই ওয়েসিসের বিকাশ।" আরো সে কত কথিতা! বললেন: "আশ্রমে সবাই যে গম্ভীর বিশ্লেষণ—নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত অষ্টপ্রহর—ego-র পরে কি একটা মস্ত বিশ্লেষণ ছুড়ে আমাদের চমকে দিয়ে বললেন যে অহং জয় করতে চেয়ে আশ্রমবাসটাই ভুল, কেননা আশ্রমীরা "আমি"কে ভুলতে গিয়ে সমস্তক্ষণ তাকেই করে প্রদক্ষিণ। "আমি আমি" ক'রে এমন অস্থির আর কেউ নয়।

একথায় অনেকেই সায় দিলেন,—কেউ কেউ আবার হাততালি দিতে। আমারো যে দিতে ইচ্ছে হয় নি এমন নয়—কিন্তু পাছে কেউ তোমাকে লিখে পাঠায় যে আমি তোমার পিছনে হাততালি দিই তাই চেপে গেলাম। একথায়ও রাগ কোরো না ভাই লক্ষ্মীটি। কিন্তু তোমার মতন একটা মনিষ্যি আশ্রমে গিয়ে ধরিত্রি করছে ও নাক টিপে বসে আছে চক্ষু মুদে, এ কি সত্যি ভাবা যায়। প্রফেসরও বলছিলেন এই কথাই: যে আশ্রমে বাস তোমার স্বধর্ম নয় যেখানে কেউ কারুর নয়, সবাই স্ব স্ব প্রধান। তবে তুমি যে তাদের সঙ্গে এতদিনও টিকতে পারলে তাইতেই প্রমাণ হচ্ছে যে তুমি ক্ষমাশীল—কিন্তু আর না ভাই, হয়ত এসব কথা তোমার কাছে রিপোর্ট করাটা ঠিক হ'ল না—কিন্তু তোমার এত সোজাসুজি প্রশংসা। কারণ তুমি চাও আটটাক প্রশংসা সুভাষ বাবুও একদিন বলেনি কি তোমারি সামনে হেসে? কিন্তু চাইলে হবে কি বলো? আমি তো জানোই আর্টের ধারই ধারি না—মুখ্যু মেয়ে যে! তোমাকে এ ধরণের সোজাসুজি প্রশংসা করবো না ভাবিও তো কতবারই কিন্তু কেউ তোমার মন খুলে সুখ্যাতি করলে তোমায় না জানিয়েই বা পারি কই? স্বভাব যায় না মলে জানোই তো।

ঐ দেখ গল্পের কথাটাই বলা হয় নি: শিবেন বাবু বলছিলেন তুমি তাঁর কাছে না কি অপরাধ করেছিলে, কিন্তু সেদিন চিঠি লিখে অকুণ্ঠে ক্ষমা চেয়েছ। "অকুণ্ঠে" কথাটি তিনি বেশ রসিয়েই বললেন এবং অত্যন্ত অকুণ্ঠে। এবার গল্পটা শোনো হ'ল বলি: অসিদা কেন মানুষটা কুণ্ঠা হবার মতন অপরাধ করল যে-যোগাযোগের ফেরে প'ড়ে সে-ব্যাপারটা কি একটু বলুনই না খুলে—প্রায় বিছের ভগায় এসেছিল উনি তারিকি লোক হওয়া সত্ত্বেও। রগ ঘেঁসে বেঁচে গেলেন শুধু এই জন্যে যে তারপরেই তিনি সত্যি খুব মন খুলেই প্রশংসা করলেন। বললেন: "তৃণাদপি সুনীচেন" কথাটা মুখে আওড়ায় অনেকেই কিন্তু তুমি জীবনে ওর সাধনা চাও। বললেন: হবে না? কত বড় বংশের ছেলে! বড় যে সেই না পারে ছোট হ'তে—ইত্যাদি। কিন্তু কেন রাগ ক'রে চিঠি লেখা বন্ধ ক'রে সাজা দিও না ভাই, তোমার দুটি পায়ে পড়ি। ভেবেছিলাম প্রফেসর সাহেবকে একবার বলি: তোমার সম্বন্ধে ক্ষমাশীল সরল বড় বংশের ছেলে সব কিছু বলা যায়, যায় না শুধু একটি কথা বলা: তুমি

কখন কী ক'রে বলো। এখান তাই ও রেকর্ডটা যদি বলো তো তোড়ে কেলতে বলি—যা খরচ লাগে আমি দেব আমার গ্রামোফোনের টাকা থেকে। তুমি যা বলবে সেই অনুসারেই সব ব্যবস্থা করবে। কেবল তুমি মুখ ভার ক'রে—তোমারই ভাষায়—ডুবিও না বেচারি আমাদের।

ইতি—তোমার স্নেহের—ছায়া।

যোগাশ্রম

ডুমেল—কাশ্মীর—২৮ আগষ্ট।

স্নেহের ছায়ারাণী!

তোমার চিঠি পেলাম কাল। কিছু মনে কোরোনা দিদি! আমাকে আর একজন ঠিক অমনি ভারিক্কি মানুষই লিখেছিলেন যে ঐ রাগে ভাটিয়ালিটা নাকি বেশী বিকোবে বলেই ছাপা হ'ল। শুধু লেখা নয়—রেকর্ডটি তিনি আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ওর লেবেলে লিখে—"অসিত কুমারের ছাত্রী শ্রীমতী ছায়া দেবী"—পত্রপাঠ গ্রামোফোন আটিষ্ট। কাজেই রাগ দিয়ে রাখা যুক্তি ভাই লক্ষীটি! কিন্তু তুমি স্বভাবে অবিশ্বাসী? ছায়া! গুরুদেবের মুখে শুনেছি যে আমাদের স্বভাবটি যে কী সেটা বুঝতে আমরা এত বেশী বেশ পাই হ'লেই অসংকুচে "পঙ্কজুচের ফাঁদে ভ্রম পড়ে কাঁদে—"। তোমার গান শুনে অতি অবিশ্বাসীর মনেও ভগবানের প্রতি ভক্তি এসেছে এ-ও কি আমি চাক্ষুষ করি নি! তাই তো আমাকে এত বাজে ভাবতে—thou too brutus! মন দাপাদাপি হ'য়ে ওঠে—এ হেন কণ্ঠের সঙ্গে এ হেন প্রতিভার সোনায় সোহাগা যখন হ'লই—যা ঘটে ঘটুক, কালে ভদ্রে—তখন এ-সুযোগ হারানো নয়। কী চাও গানের বদলে গান ক'রে? ওর চেয়ে তো হাজারো লোক আছে! অন্তত তুমি ও দলে ভিড়ি তোমো না। গানে তোমার মতন সহায় আমি কখনো পাই নি এর আগে—ভবিষ্যতেও আর কোন দিন পাবো কিনা সন্দেহ। কারণ এতখানি প্রতিভার সঙ্গে এতখানি নিষ্ঠা ও তপস্যা যাদের তারা ভগবানের গান গাইবে কোন্ দুঃখে—তোম তা না না না না, ক'রে? কিন্তু মুখ ভার? তোমার উপরে মুখ ভার করলে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে সব আগে কার বলে, একটিবার ভেবে দেখেছ কি? যাদের মুখ পূর্বদিকে তারা অন্তত সূর্যোদয় কাকে বলে জানে। কিন্তু যাদের চোখ পশ্চিমাকাশের শুকতারাটির দিকেই নিত্য?—

প্রফেসার সাহেবের কথা শুনে হাসি পেল বৈ কি। মানুষটি সত্যি সরলপ্রাণ। কিন্তু—না থাক। জানো ছায়া, সাহেবপুরাণের একটা শ্লোকে আছে: বন্ধু পাওয়া সহজ রাখা শক্ত। আমাদের আত্মাভিমানেই আনে হারাবার ব্যথা। আমি সেই জন্যেই ওঁর কাছে "অকুণ্ঠে" ক্ষমা চেয়েছিলাম—তিনি আমায় স্নেহ করেন ব'লে। সংসারে সব জায়গায় নত হ'তে বাধে ছায়া—বাধে না কেবল স্নেহের কাছে। তাই ওঁর আত্মপ্রসাদ আমি মেনে নিলাম, উনি যে স্নেহশীল। কেবল—ব'লেই ফেলি (চুপি চুপি কিন্তু) উনি মেয়েদের সঙ্গে মেশি মেশেন না ব'লেই হয়ত একটি কথা আজ পর্যন্ত শোনেন নি। যে একহাতে তালি বাজে না।

কিন্তু কর্ম করলে তার ফল হাতে হাতে। তাই ধমকাতেই হ'ল তোমাকে স্নেহ। খবর্দার। আমাকে সরল বলতেও পারবে না, না ক্ষমাশীল। আর "তৃণাদপি সুনীচেন"? হেসে আর বাঁচি না যে! দুঃখ এই যে চিঠিতে অট্টহাসির অঙ্গভঙ্গিটুকু এঁকে পাঠানো গেলেও যায় না তার বাদ্যযন্ত্রের কোনো

হর্ষমা করা। কিন্তু সে বাই হোক্ তুমিও হয়ত কম রাগ ঘেঁসে যেতে যাও নি, কেনো। কারণ উনি কিছুকাল থেকে, আশ্রমের বিপক্ষে যে-সব শব্দভেদী বাণ নিয়ে এখানে ওখানে তীরন্দাজি করে আসছেন তার খবর যথাকালে আমার কানে পৌঁছে বৈ কি। এরূপ ক্ষেত্রে মানুষ গায়ের জ্বালা মেটাবার তারই ওপর দিয়ে যাকে পায় হাতের কাছে। কেবল হ'ল কী জানো? আশ্রম মকভূমি এখানকার সাহেব সব ego-centric (ঐ কথাটাই নিশ্চয় প্রফেসর সাহেবের মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল—যেহেতু ওর চেয়ে কম ওজনের ইংরিজি বিশেষণ তিনি কদাচ ব্যবহার করেন) এসব শুনতে শুনতে যেমনি আবার ক্রোধের ব্রহ্মতেজ ঘাউ ঘাউ ক'রে জ্বলে উঠল অমনি ঐ "তৃণাদপি সুনীচেন" কথাটি শুনেই সে মুহূর্তে আমারি ধনকা হাসির জলে জব্দ ক'রে নিজে দিয়ে হ'ল ছাইয়ের সন্ন্যাসন। কারণ ওটি একটি অতি নিদারুণ ব্রোক ছায়ারাণী! একটি যোগাতার সঙ্গে আর একটি—তার সঙ্গে ফের আর একটি। অতএব কান টানলে যখন মাথা আসেই তখন সাহেবি সভ্যিকে আমাকে হ'তেই হবে শুধু দীন নয়, সেই সঙ্গে যুগপৎ সহিষ্ণু তথা মানদাতা। ও শ্লোকটি হ'ল:

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানীনা মানদেন কীর্তনীয়: সদা হরি:।
তৃণের চেয়েও আপনারে জানি নিচু বলি যে-সুজন,
তরুর চেয়েও সহিষ্ণু—তাকে ছায়া দেয় সুবর্ণায়,
মানহীনে দেয় মান সহজেই—শ্রীহরির কীর্তন
তারি মুখে শুধু সাজে, "বৈষ্ণব" শুধু তারে বলা যায়।

আমার বৈষ্ণব হংসে জন্ম—শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ অদ্বৈত গোস্বামী ছিলেন আমার একজন পূর্বপুরুষ—কাজেই রুখে উঠে যদি বলো আমার কুলের কথা, তাহলে চি চি করেই বলতে হবে—থাক্ ও কথা।

কেবল মনে রেখো কুলের কথার আর একজন করেছিল গর্জন। সে কর্ণ। তাকে যখন পাণ্ডবরা বলল, ও সূতপুত্র ওর সঙ্গে লড়বে কে। তখন সে যা বলেছিল ভাবতে আজো আমার বুকের রক্ত গরম হয়ে ওঠে;

"দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং হি পৌরুষম্।"
কুলগৌরব দৈব-অধীন গৌরব কোথা তায়?
পুরুষ-যে, চায় আপন সাধনে গৌরব বহুবায়।

হয়ত বলবে এরই নাম দর্প। মানি। কিন্তু বলব গৌরবের দর্পের চেয়ে ঢের ভালো। কেন? এই জন্যে যে, আমরা সবাই মোটের উপরে অজ্ঞানের রসাতলেই বাস করি বটে কিন্তু তবু সেখানেও থেকে থেকে জ্ঞানের ঝিলিক খেলে যায়—পাতালেও আকাশ এক এক সময়ে উঁকি মেরে ভূমিকম্পের প্রণামে। তাই মনে হয় যে "আমি" বলতে আমরা—যে সচরাচর আমাদের ইচ্ছাশক্তি—উইল—বুঝি সেখানে অন্তত হয় নি আমাদের ঠিকে ভুল। অন্তার্থ: প্রতিভা আমাদের প্রাণ কাড়ে বটে—কিন্তু তপস্যাই টানে মন।

কেননা তপস্যা ক'রে যা পাই তাকে শুধু বলা চলে আমার নিজের যোগ্যতায়। প্রতিভা হ'ল আকাশ থেকে পড়া দৈবকল, manna—আধার ক'রে রাখানো সোনা নয়। হয়ত তুমি সুভাষের মতকে ফের দাঁড় করাবে আমার বিপক্ষে—কারণ সে তোমাদের ওখানে সেদিন বলেছিল অধ্যবসায়ের ডিংে নইলে প্রতিভার ইমারত হ'য়ে দাঁড়ায় শুধু তাদের ঘর। মানি। কিন্তু তবু প্রতিভার প্রাণকোষে এমন কিছু থাকেই থাকে যা অমেয় অধ্যবসায়েও হাতানো যায় না। অন্যভাবায়, অধ্যবসায় বড় জোর প্রতিভার সহচর সারথি হ'তে পারে কিন্তু উৎস নয়, জনক নয়। ও হ'ল সত্যিই "যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে।" বড় প্রতিভা ও তার আনুষঙ্গিক অধ্যবসায় এ দুয়ের মুড়িগাড়ি আমার নিজের তো কেবলই মনে হয় সহজাত কবচকুণ্ডলের কথা। কিন্তু মনে রেখো এখানে প্রতিভাই হ'ল কুণ্ডল—মধিয়ে দেয়, ঝলিয়ে তোলে, ভাসিয়ে নিয়ে যায় তার রূপের টানে। কবচ তাকে শুধু আগলায়।

অন্যদিকে তপস্যার টঙ্কার কেমন জানো? পারব না—এত বড় কথা? পেয়ে তবে ছাড়ব। বিশ্বামিত্রের রূপে উঠে ব্রাহ্মণ হওয়া। বলির তপ ক'রে শক্তি অর্জন ক'রে দেবতাদেরও পুলিশোলাও চালান দেওয়া। নিরালা শাস্ত্রচর্চায় একলব্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নৈপুণ্য অর্জন করা। ঐ কর্ণের পাশাপাশি অর্জুনের কথাই ভাবো না; একজন ছিল নরনারায়ণের অংশাবতার—প্রতিভায়, কুলের শীলের ভাগ্যের বরপুত্র—কৃষ্ণ যার সারথি। অন্যদিকে কর্ণ! আহা! বেচারি! ভাগ্য তার পরে, বিরূপ জন্মাবধি। মা থেকেও কোলছাড়া। বাপ থেকেও এমনই অবস্থা—যে তাঁর নাম করলেও মার মাথা হেঁট! বালের-তলে-ভেসে-আসা ছেলে যাকে বলে অক্ষরে অক্ষরে। অথচ ভেবে দেখ—এ-হেন অনাথ দুর্ভাগা শুধু নিজের আকর্ণ তপস্যার শক্তিতে এমন ঔরবাজ হ'য়ে উঠল যে অর্জুন যে অর্জুন সেও মারা পড়ত যদি না ঘটোৎকচের কিস্তি দিয়ে সামলাতেন ঐ গোয়ালার ছেলে। কিন্তু তার পরেও ভেবে দেখ কর্ণের দুর্দম প্রভাব! সে যতক্ষণ ছিল কৌরবদের দাবী ছিল—আশা নির্মূল হয় নি। কেন? না কর্ণের ছিল সেই ইচ্ছাশক্তির তেজ যা ভীরুর বুকেও জাগাতে পারে আত্মপ্রত্যয়। এইটিই পারে না বংশগৌরব। তাই প্রফেসরের সঙ্গে যদি কের দেখা হয় তো বোলো যে অর্জুনকে ছাত্তে মারেন মারুন কিন্তু তাতে মারবেন না—বড় বংশের ছেলে ব'লে লজ্জা দিয়ে। আর শুধু বংশের কথা তুলে লজ্জা দেওয়াই তো নয় ছায়াবাজি!—এরো পরে আছে যে! কী সেটা?—ঐ যদা যৈ আমি বাঁশের চেয়ে নিচু হ'য়ে চলতে চাই। প্রফেসরকে চুপিচুপি শুধিয়ো তাঁকে আমি কী ভাবে আঘাত করেছিলাম। একথা ভুলতাম না যদি তুমি সাহেবি নজিরের জোরে না বলতে অমন হাসির কথা যে বাঁশের চেয়ে নিচু হ'য়ে চলতে জানে এক তোমার অসিদা। আমি কি রকম অহঙ্কারী ওরবে? পিতৃগৌরবকে তোমরা বড় বলো তো?—কিন্তু বাপের নাম ভাঙিয়ে খাওয়াকে যারা মনে করেন ভাগ্যবানের আভিধাত্য তাঁদের সৌভাগ্য সম্বন্ধে আমি বলি চলুরানব! ও-বিড়ম্বনা শিরসি না নিখ। অর্জুনের চেয়ে যে আমি কর্ণকে বেশি ভালোবাসি সে অকারণ নয়। সাশ্রুনেত্রে ধূলিধূসরিত রক্তাক্ত ভক্তকে দেখে আমার হাতে পায়ে খিল ধরে—কিন্তু রক্ত গরম হ'য়ে ওঠে যখন শুনি গুরুদেবের তেজোময় স্পর্ধা:

সন্তাং কিন্তো কিং কপিশোঃ প্রয়াসৈর্
বাহৌ বসিতে হ্যপবর্হিণঃ কিম্।

গুহা তহাঃ কিমজিতোঽবাতি লোপনজান্
কস্মাদুত্তি কস্মতো বনদুর্গবাজান্।
তুমি বনে আছে শস্যার তরে কেন বা অন্বেষণ!
নাহ বনে হিংসাপী—উপাধানে বলো কোন্ প্রয়োজন?
গৃহ কেন চাই? গুহা কি মন্দ? যেন না কি আশ্রয়
তরুকোটরে ধরি? পর্ণী রচনার তবে কেন গাহি জয়?

আমাকে ভুল বুঝো না কিন্তু! আমি যে স্বভাবে শুকদেব নই একথা তুমি প্রফেসর সাহেবের কাছেই হয়ত শুনে থাকবে। তুমি নিজেও আশ্রমে এসে দেখে গেছ কত গম্ভীরাননে আমার মতিগতি দেখে আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা ছেড়ে দিয়ে দিনরাত মাথা নাড়ছেন। আমার বলবার উদ্দেশ্য; শুকদেবের স্পর্ধা ও বীর্যের ছবিটা অন্তত "আমি চোখে দেখতে পাই কিন্তু ঘাসের চেয়ে নিচু হ'য়ে থাকার কথায় মনে হয়; কী এ বস্তু—পেতে শোণ না গায়ে দেয়? ইতি তোমার অহঙ্কারী—অসিতা

কলিকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর

তথাস্তু ভাই অহঙ্কারীণা,

বরক শিরোধার্য। কেবল এই কথাটি মনোধার্য করি কী ক'রে বলো দেখি যে তুমি ক্ষমা করলে এ-দৃশ্য স্বচক্ষে দেখলেও বলতে পার না তুমি ক্ষমাশীল! তবে তুমি সহিষ্ণু এমন কথা তো তোমাকে বলি নি। তোমার শ্লোকে কী বলে তা নিয়ে তো কথা নয় আমি কি বলেছি "সেই হয় প্রভ"—তোমারই শ্রীমুখের শেক্সপীয়রীয় ভাষায়। যাঁরা আদা জল খেয়ে তোমাকে অপদস্থ করতে লেগেছিলেন তাঁদের তুমি তোমার আসরে পাশে বসিয়ে গান শুনিয়ে পরে সন্দেশ খাওয়াও নি? ঐ প্রফেসর সাহেবের কথাই নেও না। উনি তোমার প্রশংসা করতে এসেও আশ্রমের নামে যেসব কথা বললেন সে সব যে তোমাকে বাজবে এ কি উনি জানতেন না মনে করো? কিন্তু উনি এটুকু জানতেন যে এসব কথা তোমার কানের মধ্যে ফেলেও মরমে পশবে না। এহেন মানুষকেই বাংলা অভিধানে বলে ক্ষমাশীল আর ঠিক সেই জন্যেই প্রফেসর তোমাকে বলেছিলেন ক্ষমাশীল—হয়ত একটু না ভেবেচিন্তেই। কারণ হয়ত তাঁর কথাটা বলবার সময়ে মাথায়ই আসে নি যে নিজে থেকে ক্ষমা চেয়ে তাঁকেই ক্ষমা করার দুরভিসন্ধি তোমার থাকতে পারে। কিন্তু সে যাই হোক আমার মনে হয় একটা জায়গায় প্রফেসর সাহেবের প্রতি একটু যেন অবিচার যতনই হ'য়ে যাচ্ছে। বড় বংশের ছেলেরাই পারে ক্ষমা করতে ও চাইতে একথা বলবার সময়ে তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, যে-সে পারে না একাজ। হয়ত বড় বংশের ছেলে ব'লে তিনি তোমাকে লজ্জা দিতে চান নি।

কেবল একটা আপত্তি কেবলি আমার মনে উঠছে—কিছু মনে কোরো না ভাই। আমার এ-ই হয়েছে আর এক মহাদুর্দিব যে, তোমাকে মুখের উপর কিছু বলতেও বাধে অথচ হাজার চেষ্টা ক'রেও মুখ সামলে কথা বলতে পারি কই!

তাই 'আপত্তি' না ব'লে বলা যাক্ 'প্রশ্ন'। প্রশ্নটা এই যে বড় বংশে জন্মানোর মধ্যে সত্যিকার গৌরব কিছু না থাকতে পারে। কিন্তু বড় বড় বংশে প্রায়ই কয়েকটা বড় বড় আদর্শ—দিলদরিয়া চালের চাল থাকে না কি?—হয়েছে দাঁড়াও। গত বছর তোমায় কাছে শিখেছি তোমার একটি প্রিয় হিন্দুস্থানি গান;

দেখ্ বড়োঁকী রীত ন জায়ে!
পিয় জায়ে পর যীত ন জায়ে!

এর বাংলা অনুবাদটাও সেদিন শুনিয়ে দিয়েছিলাম প্রফেসর সাহেবকে:

বড়তের রীতি লায়ারো না যেন, দেখো!
সব যায় যাক্—প্রেমেরে বাঁচায়ে রেখো!

হ্যাঁ। আরো মনে পড়েছে—কী মজা! কেমন হর্ষ! একদিন তুমিই আমাদের বাড়িতে বলেছিলে গীতা না কিসে আছে যে ভগবানকে শুধু চাওয়াও এমন পুণ্য যে সে বাঁচায় দুর্গতি থেকে—এমন কি যদি কারুর পা হঠাৎ কখনো ভাঙলেও সে পড়ে না—ঐ পুণ্য বলেই মরণের পরে জন্মায় বড় ঘরে। এ তত্ত্বকথা রেখে শুধু খোলা চোখে সংসারটাকে দেখলেও কি মনে হয় না—যে কথা প্রফেসরও সেদিন বলছিলেন—যে যেসব দিলদরিয়াদের কাছ থেকে মানুষ অনেক কিছু পায় তারা নিতে পারে বড় ঘরের ছেলে ব'লেই। কি জানি কেন অসিদা, ভগবান আছেন শুনলে আমার মনে বড় জোর ধটকা লাগে—যদিও গান করবার সময়ে কেমন যেন আবেশ আসে যার দরুণ তোমরা আমাকে বলো ভক্তিমতী যা আমি একেবারেই নই—ভগবান বলতে আমার মনে প্রশ্ন ওঠে—তোমারই ভাষায় কী এ-বস্তু—পেতে শোয় না গায়ে যের? কিন্তু ঐ দেখ থেই হারিয়ে যায় আর কি। বলছিলাম কি, ভগবান এ দিন-দুনিয়ার মঙ্গল করছেন শুনলে বড় জোর হাসি পায়। কিন্তু মানুষ সবই সমান, বড় বংশ একটা জলে-টানা আয়না এ শুনলে হাপুস নয়নে কাঁদতে ইচ্ছে করে। সুভাষ বাবুকে কি চোখে দেখি নি কখনো? ঐ রূপ কি বড় বংশের ছাড়া আর কোথাও সেলা সম্ভব অসিদা? আর একজনের নাম করতে পারতাম কিন্তু সে অহঙ্কারী ভাই তার নাম্ব গরম করব না। কিন্তু সত্যি কি তুমি বলতে চাও যে সুভাষ বাবুর মতন দিলদরিয়া মানুষ তিথিরির ঘরে জন্মাতে পারত—ঐ চমৎকার দীপ্ত রূপ? না—কের ধম্‌কালে সইব না—"রূপ দুদিনের" ব'লে। কারণ কথাটা মিথ্যে নয় বটে কিন্তু তাই ব'লে সত্যিও নয়। কারণ আয়ু দিয়ে সব সময়ে সব কিছুর মহিমা মাপা যায় না। যদি বেন্ত তাহ'লে তুমি তোমার বুকের বিগ্রহের জন্যে ভালো ভালো ফুলের ডালি সাজাতে না, মুড়িয়ে বালা জোগাতে। ইতি

তোমার
সহজে-না-হারি ছায়ারাণী

যোগাশ্রম,
দুমেল—কাশ্মীর, ১০ সেপ্টেম্বর

স্নেহের ছায়ারাণী!

এবার তুমি একহাত নিয়েছ আমাকে—মানছি। তবে শাস্ত্রে-পুরাণে একে বলে "অন্-ক্লোর"। কারণ সুভাষকে প্রথম আমিই তোমাদের হরিশ মুখুয্যে রোডের বাড়িতে নিয়ে যাই। শুধু তাই নয় ওর বংশগত রূপ-গুণের কথাও আমিই তোমাকে প্রথম বলি সেই বায়াকপুরে—মনে আছে? সেখানে অমলা নন্দী নেচেছিল যখন তুমি আমি মিলে গাইলাম অজয় ভট্টাচার্যের লেখা সুভাষ স্তব:

"ত্রিংশ কোটির অমর নিধি! জয় হোক তব জয়!" আর, পরে আমিই বলি ঠাট্টা ক'রে যে, স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি এ হতে পারে কিন্তু পুরুষরত্নং পেতে হ'লে চাই কুলের খনি। তাতে-মনে আছে তোমার কে একজন সাম্যবাদী রুখে উঠে তর্ক তুলেছিলেন যে তাহ'লে স্বনাম পুরুষো ধন্য বলে কেন? উত্তরে আমি বলেছিলাম—নিতান্ত বন্ধুগর্বেই কিন্তু, যে—ধন্য পুরুষ জন্মাতে পারে হীন কুল থেকে কিন্তু মহাপুরুষরা প্রায়ই কৌলীন্যের বনেদি অন্তঃপুরে জন্ম নিতেই ভালবেসে এসেছেন। এমন কি ভাগবতে স্বয়ং নারায়ণ ঠাকুর ব'লে বসলেন সনক সনাতন সনন্দ সনৎকুমারকে যে ব্রাহ্মণরা তাঁর গুণ গান করেন ব'লেই লোকে তাঁকে পুজো দিয়ে আসছে আবহমানকাল।

কিন্তু সুভাষের নাম ক'রে তুমি আমাকে বেশ একটু বেকায়দায় ফেলে সহজে-না-ছাড়ি গেতাব নিলেও আমার গেতাব হ'ল মরিয়া-না-মরি—জেনে রেখো। দ্বিজেন্দ্রলালের গান বলে: "রাগলে আমার জ্ঞান থাকে না।" আমার প্রাণ বলে: "কেউ টুকলে আমার মান যাবে না।" অতএব আজ আমি প্রমাণ করবই কেন আমি না ক্ষমাশীল, না "তৃণাদপি সুনীচেন।" বংশের কথা এখন মানে মানে ধামাচাপা দিতে হ'ল। (উঃ তুমি কিন্তু সহজ মেয়ে নও: আমারি মুখের কথা কেড়ে।—ধার শিল যার নোড়া তারি ভাঙো দাঁতের গোড়া!!)

এবার কিন্তু ঠাট্টা নয় ছায়ারাণী। আমি চাই তুমি আমাকে একটু বুঝবার চেষ্টা করো। তাই আমি তোমাকে প্রথমেই বিশ্বাস করতে অনুরোধ করছি যে বড় বংশে জন্মানোর ভাগ্যে আমার মনের মধ্যে একটা সত্যিকার গ্লানি হয়। কিন্তু তার কারণ শুধুই অহঙ্কার নয়—বরং তার উল্টো: আমি সব মানুষের মধ্যেই ভগবানকে দেখতে চাই আরো এই জন্যে যে বেশীর ভাগ না হোক অনেক মানুষকেই দেখতে না দেখতে আমার মন থেকে ব'লে, ওঠে: এদের মধ্যে যিনি বিরাজ করেন তাঁর নাম ভগবান, না শয়তান? আর মনে হয় বিশেষ ক'রেই রাজনীতিতে, যে কথা আমি সুভাষকে প্রায়ই বলতাম। কিন্তু এ বাইরের কচকচি থাক। সদর থেকে অন্দর মহলে আসচি সময় হ'ল।

সত্যি ছায়ারাণী, বিশ্বাস কোরো গুরুর প্রসাদে অন্তত এক আধটা সোনা-কথা প্রায় জানার কোঠায় এসেছে: যেমন—বংশ বিদ্যা ধন জন পৌরুষ প্রতিভা এসব একটা সীমান্ত পর্যন্ত আমাদের সাথের সাথী হতে পারে

তারপর কেবল একটি মাত্র সঙ্গী টিঁকে থাকে যুধিষ্ঠিরের সাথী কুকুরের মত—তার নাম শরণাগতি—কারণ সে ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না : "I can deliver the goods" : এ শরণাগতি নরম নরম শুনতে বটে—বলে : "তুলো যেন শুনতে তুলো ধুনতে পরেছান"?—কিন্তু বৃথা চেষ্টা ভাই! শরণাগতি চাইতে হ'লেও নিজের সঙ্গে যে সে কী কুরুক্ষেত্রের লড়াই সে ব'লে বোঝাবার চেষ্টা বিড়ম্বনা। কেবল এইটুকু বলি যে জীবনে বতন ক'রে যদি কিছু জেনে থাকি এই বারবৎসরে সেটি এই যে অহংস্ফীতিমানের শেষ কুটোটি পর্যন্ত চোখের জলে ভাসিয়ে শরণাগতির কূল না চাইলে আর সবই হয়ত মিলতে পারে—দেহসুখ, সিদ্ধাই, যশ, মান, প্রতিপত্তি বহু শিষ্যের সেবা—কন্তু কী—কেবল মিলবে না সেই মনের মানুষকে যার সম্বন্ধে বলেছে বাউল চোখের জলে :

দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা
ধরি ধরি মনে করি ধরতে গিয়ে মিলল না!

কেবল এক শরণাগতি হ'লেই ধরা যায় সেই অধরাকে। কিন্তু এ যে পেয়েছে সে পাঁচক, পারেনি কেবল তোমার খাঁড়ার চেয়ে তুরতিমানী অধিক, আর কোনকালেও পারবে কি না সন্দেহ।

হয়ত তুমি হাসবে একথা শুনে। হয়ত সাহেব প্রফেসরের দল আরো একটু নিষ্করুণ হবেন, বলবেন একমুখ সিগারেট ধোঁয়া ছেড়ে : "তবে কেন এ-সুখে-থাকতে-ভূতে-কিলোনো ওঁড় চাপ?" ঐখানেই আর মুখে রা থাকে না ছায়াবাণী!—বিশেষ ক'রে তাঁদের সামনে যাঁরা একটিবারও দেখে নি সেই কাঁচা সোনার রঙে রঙিন কোহিনূরটিকে। কেন যে সব থেকেও মনে হয় কিছুই নেই, আর সব হারিয়ে ছত্রখানে হ'য়েও মনে হয়—এ তের ভালো; যে-আমিকে এত তাগাদেও তার হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে প্রাণ কান্নাকাটি করে অহং অহংকে বিদায় দেবার কথা এলে মন বলে 'সবুর সবুর' সবার উপর কেন যে আকাশের চাঁদকে পেতে চাই ভাঙা ঘরের পিদিমে জলতে—এ কি বোঝানো যায় বৈজ্ঞানিক বিচারকদের? প্রফেসর সাহেব একবার আমাকে একটি পত্রে লিখেছিলেন যে সাধনার খবর তিনি রাখেন এবং আইকনোক্লাস্টির ঝুড়ির জলে ধুলে পেয়েছেন সাধক জীবনের হকিকথাগুলি। উত্তরে আমি তাঁকে জানিয়েছিলাম এই ব'লে যে "সাহেব! সাধনা সম্বন্ধে আমাদের শুনে-শেখা ও প'ড়ে-জানা ধারণার সঙ্গে ক'রে দেখা ও হাত-লাগা উপলব্ধিগুলির ঠিক ততখানি মিল যতটা মিল ছবিতে-আঁকা শিখা ও কাপড়ে-লাগা আগুনের মধ্যে। ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে যখন যেটে যখন তীর কিছু হদিশ মিললেও মিলতে পারে কিন্তু সাধনার ক্ষেত্রে নাম শুনে বাণীর কোনো হদিশই মেলে না। একজন ভক্ত বলেছিলেন :

মীমাংসারজসা মলীমসমৃশাং তার্কৈর্ধীরীশ্বরে
সুখাস্বাদং পরিবেশয়ন্ত্যপি রসং তর্কী ন বর্কী স্পৃশেৎ

অর্থাৎ তর্ক মীমাংসার রজের ধুলোয় যাদের চোখ অন্ধ তাদের বিদ্যাবুদ্ধি মস্ত হ'লেও পায় না ভগবৎরসের স্বাদ, যেমন হাতার মস্ত হ'লেও হাতা পায় না সে-রসের স্বাদ বা সে পাঁচজনকে পরিবেশন করে। প্রফেসর সাহেব আমার উপর অপ্রসন্ন হ'য়েছিলেন কি সাধে?

কিন্তু তবু আমি বলব সে তাঁকে কথাটা বলেছিলাম আমি মনের দুঃখেই—রাগের জ্বালায় নয়। তবে হয়ত একটু হাসিও পেয়ে থাকবে যখন তিনি অম্লান বদনে পুঁথি-পড়া বুলি আওড়ে যান যে আশ্রমে ঠিক সাধনা হয় না—যেহেতু আশ্রমবাসীরা নিজেদের আমিকে প্রদক্ষিণ ক'রেই চায় আমিহীন হ'তে। উনি কোনো আশ্রমে এসে যদি অন্তত বছর পাঁচেকও যোগে বসতেন তাহ'লে বুঝতেন কেন সাধক সাধিকাদের প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ হয় এই "আমি" নিয়ে। আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল—বলতেন পরমহংসদেব। কারণ এ "আমি" সে কী অতিকায় জঞ্জাল জানতেন তিনি। তাই তো এত নাকের জলে চোখের জলে। সাধনার উদ্যোগপর্বে মনের ঘরে ঝাঁট দিতে গিয়ে সব আগে কিসের ধুলো সাফ করতে হয় জানো? এই "আমি"-র; আর সে কী ধুলো ছায়ারাণী, তোমার প্রফেসর কী জানবেন? "আমি আমি" তারা করে কি সাধে তাই? "আমি-র" ধুলোয় যখন মন বদ্ধ হ'য়ে আসে তখন কি মন যায় আর কিছুর দিকে? আর "বিরস বদন"? তাঁর সঙ্গে যদি দেখা হয় তো বোলো কবীরের একটি দোহা:

হস হস কাহু না পাইয়া, জিন পায়া তিন রোয়।
হাসী খেলে পিউ মিলে তো কৌন দুহাগিনি হোয়?
মিলেনা কাহে হাসির মেলায় কান্নায় দিলে বঁধু।
সাধ ক'রে হ'ত অভাগিনী সে কে মুখে দেখা দিলে বঁধু?

সংসারে হাসি মুখ সাধ আহ্লাদের কথা উঠছে এখানে এই জন্যে যে, সংসারের সব আমোদ প্রমোদ যার কাছে বিষ হ'য়ে গেছে তারো হাজারো পিছুটান থাকেই যতক্ষণ পর্যন্ত। হাসির মেলায় কান্নাকে মেলে না ব'লেই সে কান্নার এলাকায় আসে বটে—কিন্তু কেঁদে ভাসিয়ে দিতে নয়, কান্নার খেয়া বেয়ে বিরহের অকূল পাথার পেরুতে। তবু হয় কি, সাধক সব কিছু ছেড়েও রেখে: ঐ কমনি পিছুটান তাকে ছাড়ে নি—যার নাম সংস্কার। এই সংস্কার না কাটালে কান্নাকে মেলে না—শুধু চুল ছাড়লেই হবে না, চুলের পানে ফিরে ফিরে চাওয়া—casting longing lingering looks behind—এও ছাড়তে হবে নির্মূল হ'য়ে। ছুটকো গল্প, টুকরো চাউনি, শিশুর হাসি, বন্ধুর প্রীতি সব ছাড়তে হবে নির্মম হ'য়েই—কেন না এসবই সংস্কারের মধ্যে পড়ে এসবই নানা ছলছুতোয় হয় আমাদের অহঙ্কারকে না হয় মমকারকে উস্কে দেয়, জীইয়ে রাখে। তাই না তাকে এত জোর ক'রে রুদ্ধ হ'তে হয়—নির্মম হ'য়ে হয় মুখ ফেরাতে! সাধনার নামে আমরা পুষি শুধু অহঙ্কারকেই বটে। ছায়ারাণী! এপথে অহংকারকে যে দুষকলা দিয়ে পোষে তার উপর রাগ করা ভুল, তাকে নিয়ে এমন কি হাসাও নিষ্ঠুরতা, কেন না তার দুঃখে কাঁদবে শুধু মানুষ নয়—কাঁদবে ঐ শেয়াল কুকুরগুলোও। দেখ, সংসারে যারা থাকে তাদের দুঃখ শোক আছে জানি, কিন্তু আমোদ আহ্লাদও আছে। অসুখ আছে কিন্তু সহায় সম্বলও যে নেই এমন কথা কেউ বলে না। পড়লে তাদের অন্তত আহা বলার এক আধটা লোকও থাকে। লাগলে গায়ে হাত বুলিয়ে দেবার যতন দরদী দু একটিও অন্তত মেলে। কিন্তু এপথের পথিকদের দুঃখ কী কজন খবর রাখে সময়ে সময়ে আমি ভাবি। তোমাকে এসব কথা বলি নি তুমি মনে দুঃখ পাবে ব'লে। কিন্তু এ একটুও বাড়ানোর কথা নয় ছায়ারাণী,

যে ধরণীর ধরণের প্রত্যাশা পর্যন্ত সাধকের ছাড়তে হবেই হবে। পারি না বলার পথ নেই কেন না, না পারলেই নয়। আর সে কখন জানো? যখন এর চেয়ে বড় কিছু পাবের সে পেয়েছে তখন নয়—এমন কি যখন পাবার কোনো টেঁকসই ভরসা পেয়েছে তখনো নয়: ছাড়তে হয় এমন সময়ে যখন সম্বল শুধু এই অপময়—"হয়ত পাব যদি হয় তাঁর করুণা"। মনে রেখো যাঁকে দেখি নি চিনি নি—তাঁরই করুণাটি নিয়ে তাড়া ঘরে বাতি জ্বেলে রাখতে হবে। আর নিভে গেলে পাড়াপড়শির কাছ থেকে আগুনের প্রত্যাশাটুকুও নিষিদ্ধ।

এখানে বলছি অবশ্য আমি আদর্শের কথা। কারণ এতটা পারতে পারতেই বহুকাল কেটে যায়। আর এই সময়টায় যে কী দুরন্তপনা! অবিশ্যি একলা আমি বলছি নে যে এ পথের পথিকদের সময়গুলোই চলতে হয় খালি হাতে। সময়ে সময়ে হাতে দু এক পয়সা আসে বৈকি—একটু আধটু টুকরো মাণিক, চকিত উপলব্ধির। কিন্তু সে কতক্ষণ? বিদ্যুতের ঝলকানিতে পথ দেখতে পাই যতক্ষণ। তারপরে যে তিমিরে সেই তিমিরে—নাঃ আরো তিমিরে। প্রাণ করে পালাই পালাই—অথচ "পালাবি কোনখানে তুই?" যে-সব কাফ্রি বাইরে থেকে ব'সে চিৎকার করতে চেয়ে বলেন যে সাধকরা বড় আত্মমুখী তাঁরা ধরণী হ'তে মুছতে চেষ্টা করতেন—কেন বলেছিলেন কবীর যে এ আলোর দুনিয়ায় মুখ আঁধার করে মানুষ বড় দুঃখেই। বৈলে কি ছায়ারাণী, আমি এখন তোমার গান শুনতে ছুটে না গিয়ে এমন চুপটি ক'রে অজ্ঞাতবাস করি মুখটি ক'রে তার? তোমার গানের তোমার হাসির তোমার সঙ্গে রুখে উঠে তর্ক করার চেয়ে কি আমার কাছে আশ্রমে ব'সে মতুলে হ'য়ে ওঠা বেশি আনন্দের? আমি যা-ই হই, উন্মাদ নই।

তবেই ভেবে দেখ দিদি যে মনটা আমাদের কী ভাবে ঘা খায়—যখন আমরা দেখি যে দুর্গার বোকামুখির পরেও অহংকে কিছুকেই বাগ মানাতে পারছি না। শুধু খা-খাওয়াতে হ'লেও না হয় সামলানো যেত। কিন্তু তার পরে যে "কী যাতনা বিষে"—জানে শুধু সে যাকে, "দংশে নাগিনীবিষে।" সাধারণ জীবনে বাইরের মানুষ ভাঁড়োপোকার আত্মরূপান্তরের সাধনার খবর তো রাখে না, রাখবার কথাও নয়। তাদের মাথাব্যথা কেবল প্রজাপতি নিয়ে। কিন্তু কত চোখের জল ফেলে যে ভাঁয়োকে তার পোকার খোল ছেড়ে পাখিদের কোঠায় উঠতে হয় সে জানে কেবল ঐ বোবা পোকা। তাই তোমাকে কী ক'রে বোঝাব অহংটা নিয়ে ঘর করবার দুঃখ। যায় না বোঝানো তবু বোঝাতে সাধ যায়—এও সেই একই অহং কিনা! বলব তবু। কী হয় তবে? বেই সে দেখে যে এত শতর পরেও নিজের অহংকে নিয়ে কেউ একটুও তেতে উঠলনা সেই হয় কি? না, যা কিছু অল্প স্বল্প সে পুঁজি করেছিল মুঠোর-মধ্যে-বন্দী জনের হ'তেই যায় হু হু ক'রে বেরিয়ে। আর ঠিক এই সময়ে—অর্থাৎ সব জমা খরচ হ'য়ে যাবার মুখে তখন—সকলকে ধতই ধরবে আঁকড়ে দেখবে সে ততই হ'য়ে উঠছে নিঃশেষমুখী, ক্ষণিক ভরতি হচ্ছে অলীকের ফাঁকে। তখন সে যে কী খেদ—আকুদি-বিকুলি ছায়ারাণী, বলবই বা কাকে, ব'লে ফলই বা কী বলো? শুধু এই কথাটি তুমি মেনে নাও—যদিও কাফ্রি সাহেবরা মানতে রাজি হবেন কি না সন্দেহ—যে পায়ের নিচে শক্ত রাখবার মতন একটু ঠাঁই পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না—সত্যি মনে হয় সব মাটিই বুঝি ফোরাবালি। এমনি একটি টলমলে অবস্থায় আমি একটি গান বেঁধেছিলাম সম্প্রতি:

কোথায় আমি দাঁড়িয়ে আছি, পায়ের নিচে কোথায় কাঁকি,
শুধাই যদি তোমায় কেঁদে দেখিয়ে শ্যামল দেবে না কি ?

কী ভাবছ ? স্বখাত সলিলে ! বটেই তো। কিন্তু বিষের গ্রাস নিয়ে লাভে মূলে তুলেও তার ফলে যখন ধনুষ্টংকার হয় তখন তাকে "যেমন কর্ম তেমনি ফল" ব'লে কে সান্ত্বনা দেবে কাকে ছায়াবাণী ? তাই বলছি সে অহংকারকে নিয়ে ঘর করা আর যার পক্ষেই সম্ভব হোক না কেন তার পক্ষে সম্ভব নয় যে বিভূতি চায় না—চায় বিধাতাকে। তাই বাদু বলেছেন :

জঁহা রাম ওঁহ মৈ নহীঁ, মৈ জঁহা নহি রাম
বাদু মহলা বারিক হৈ যৈ দু নাহীঁ ঠাম
অর্থাৎ
যেথা রাম সেথা আমি নাই, যেথা আমি সেথা নাই রাম,
বাদু বলে ঘর ছোট তার, সেথা দুজনার কোথা ঠাই ?

এতশতর মানে এখন তুমি বুঝবে না এ আমি জানি। তবে কি জানো ? তোমার কাছে যখন লিখতে বসি কেমন যেন কোঁক আসাকে পেয়ে বসে—তাই যে-সব কথা লেখার কোনো মানেই হয় না সড় সড় ক'রে এসে যায় কলমের মুখে।

না ছায়াবাণী। কথাটা তুমি পুরোপুরি সত্যি হ'ল না। আমার মন তারি অসুখ এইই হ'ল সত্যি। তাই সে চায় তুমি যে-ক'রে হোক তার ব্যথা বোঝো। নৈলে কি তোমাকে লিখতে পারতাম তখনো—তোমারই ভাষায় "উচ্ছ্বাসপানা" কথা !

কিন্তু যখন এত বড় একটা কাঁড়ুনি গেয়েই ফেলেছি তখন ব'লেই ফেলি সেদিন যা ঘটল—অঘটন ঘটনপটীয়সীর লীলায়—যদি বোঝো এই দুরাশায়। মনে রেখো কিন্তু যে এই যে প্রত্যাশা এও আমাদের সাধনার অন্তরায়—তাই তোমাকে দয়াদী জেনে যে একটু ছুৎ ক'রে নিচ্ছি, অর্থাৎ মনের দুঃখ মনেই রাখছি সে এর জন্যেও ভুগতে হবেই—যথাকালে। তবু বলবই আজ—মনের ভার হাল্কা হবার একটুখানি নগদ বিদায় তো পাব। যথাদাম। প্রায়শ্চিত্ত ? সে তো পরে।

• • • •

সোহনলালকে কি তোমার মনে আছে ? তুমি যেবার যখন এখানে ছিলে সে তোমাকে আমার কুটিরের সামনে যে কাঠচাঁপা গাছটি আছে তা থেকে ফুল তুলে দিত—সেই ? কেন জানি না তুমি আমার কাছে যখনই গান শিখতে তার চোখে বাঁকা হাসি ফুটতে দেখি নি : কিন্তু অন্য যে-কোনো মেয়ে আমার ছায়া মাড়াতে না মাড়াতে সোহনলাল তার মাথা কাটায় ! লোকটি মানুষ মন্দ নয় কিন্তু তার মনে একটি

নিশ্চিৎ আছেসেহেতু—যে, তার চরিত্র সীতার-ভাষার মতন "অ্যবস্ সাস্পিশন"। একটু আগেই বলছিলাম না যে সাধনা শুনতে বা করতে অনেক সময়েই ঠিক তার উল্টো? সোহনলালের এই সচ্চরিত্রতার দৃষ্টান্তই নেও না। সাধারণত আমরা শুনে এসেছি তো যে শান্ত দান্ত জিতেন্দ্রিয় এরাই পায় ভগবানকে সব চেয়ে সহজে। কিন্তু সাধনার আখড়ায় এসে স্পষ্ট দেখতে পায় অনেক কিছু যা একেবারেই ভাবে নি। যেমন ধরো জিতেন্দ্রিয়তা। আমাদের মন অমন প্রতিষ্ঠাটিকে পেতে না পেতে কী কাজে লাগায়। একটা ছবি মনে আসছে। কৃত্তিবাসের বর্ণনা মনে করো; অমন নিজের লাজকে কুণ্ডলী ক'রে বসেছে তার সিংহাসনে। সোহনলাল ঠিক তেমনি প্রতি মুহূর্তে উঁচু হ'য়ে বসে নিজের সচ্চরিত্রতার নিষ্পাপ মকে আর বক্তৃতা ঝাড়ে যে নারীকে দেখতে না দেখতে যদি মন বন্ধুপের মতন সচ্চরিত্রতার অন্ধকারে ডুব দিতে না দেখে তবে আলো পাওয়ার আশা দুরাশা। মানুষ ভুল ভ্রান্তি ক'রে চোখের জলের আচমাতেও যে কলপাড়ের ছহসার দেখা পেতে পারে একথা সোহনলালের কাছে বলবার মতন মুখের পাটা এ আশ্রমে কারুর নেই। কারণ শুধু যে ও চরিত্র চোরাল, কুত্তিবীর, তাই নয় শিরোমণি শিরোমণি ব'লে যখন ও নাক টিপে সিংহাসনে তখন তাকে আরো ভয়ার মতন সাংঘাতিক জীবন্ত। না না আমি সত্যি ভয়াই ছাবাবাণ্ডী—বিশ্বাস কোরো। কারণ ওর সঙ্গে তর্ক করতে গেলে ওর নীতি না নিলেই চলে না; যে, "হাত থাকতে মুখোমুখি কেন?" এসব ক্ষেত্রেও ছাবাবাণ্ডি, একটা উল্টো ব্যাপার ঘটে। যাদের বুদ্ধি বেশি জ্ঞান বেশি, তাদেরই হয় বেশি দুরবস্থা—যদিও উল্টোটাই শুনে এসেছি এতদিন সত্য ব'লে যে বুদ্ধিমন্ত বলং তস্য এবং knowledge is power: বাইরের জগতের সম্বন্ধে একথা অনেকটা খাটে কেন না সেখানে প্রতিযোগিতা নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু ভগবানকে পাওয়াটা তো ঠিক কুস্তিদের কুস্তিদের দৌড়ঝাঁপ নয়—এখানে যে হারে সে-ই জেতে। কিন্তু সোহনলালকে একথা বোঝাবার কোনো উপায়ই নেই এবং তার প্রধান কারণ ও সচ্চরিত্র।

কথাটা অবান্তর নয়—কারণ ঠিক এই জন্যেই ও আমার প্রতি প্রসন্ন নয়: আমি যে অসচ্চরিত্রদেরও আস্কারা দিই—যাদের লোকজন আমল দেয় না। লোক মানে কিন্তু এখানে মানব নয়, শুধু মানবীকেই ও মনে করে লোকের মত লোক—কেন না গোলের মতন গোল পাকায় তো তারাই: যথা শকুন্তলা।

সেই শকুন্তলা, সেই কাশ্মীরী মেয়ে—মনে আছে তো?—যাকে উদয়ের সঙ্গে ক'রে রাওলপিণ্ডি থেকে নিয়ে আসি? তোমাকে সে-চিঠিতে লেখা হয় নি—সম্প্রতি কাদকে পড়লাম ওর ক্রোরপতি বাপ মারা গেছেন পারোরে। বেচারি। এক পয়সাও পায় নি। অথচ উদয়ের জন্যে ঘর না ছাড়লে বাপের উইলে ওর যে একটা বেশ বড় রকমের আধপা থাকত একথা আশা করি তুমি আছরী মেয়ে সহজেই বুঝবে। কিন্তু কথায় কথায় কথা বেড়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা বলি এবার।

শকুন্তলা এসে প্রথম দিকে দু একবার আমার কুটীরে আমার ভজন গানের সঙ্গে নাচত। ওইতেই সোহনলাল গেল ক্ষেপে। অন্তত ওর ধরণী তক্ষকুল ওই ব'লে ঝেড়ে আরো ক্ষেপে। এখানে এক একটি সাধকের এক একটি ছোট ছোট দল আছে। অনেক আবর্তই পাকিয়ে উঠত না যদি এই সব দল দলপতিকে ক্রমাগত উস্কে না দিত। তাই সোহনলাল প্রথমটায় শকুন্তলাকে খারাপ চোখে না দেখলেও

ওর ভক্তরা ওকে স্মরণ করিয়ে দিতে কার্পণ্য করেনি যে মেয়েটি মোহিনী। তবু মানুষের মন বিচিত্র। ও শকুন্তলাকে দেখে কেমন যেন হকচকিয়ে গেল। প্রায় ভুলে যাবার দাখিল যে ও পরপুরুষের জন্য পাতিব্রত্য লঙ্ঘন করেছে। আমি যখন রাওলপিণ্ডিতে শকুন্তলাকে নিয়ে বিব্রত তখন থেকে থেকে খবর পেতাম যে, সোহনলাল বিব্রত থাকত আমাকে নিয়ে—পাছে আমার আসন্ন চরিত্র একেবারে অন্ধকার হ'য়ে ওঠে। শুনতাম যে গুরুদেবের কাছেও নাকি ও প্রায়ই নানা সুরে কাঁদুনি গাইত—পরোপকারের অছিলায় অসিত তাঁর সুনাম ভাঙিয়ে রোমান্স করছে ব'লে।

কাজেই যখন শকুন্তলা ও উদয়কে আমি আশ্রমে ঠাঁই দিই তখন ও বেশ তাল ঠুকেই এসেছিল মনে মনে: আচ্ছা দেখলো! আর যদিই বেশি ওর ভক্তের দল ওকে ক'রে তুলেছিল আরো চালা: হাঁ তা বটেই তো তা বটেই তো! এমন মেয়েকে আশ্রমে আনা?—গুরুদেবের পবিত্র আশ্রমে? কিন্তু কিছু বলতেও পারে না—গুরুদেব নিজে ওর কুটীরটিতে মাটি পাঠিয়ে দিয়েছেন দু দুটি।

কিন্তু যেখানে কণ্ঠস্বর বাইরে ফোটে না সেখানে যে-স্বর বোবার তার কাছিক নাম ওরফে, ঘরোয়া নাম গুরুবোনো। এই শেষজাতীয় ধ্বনি আশ্রমের আকাশে বাতাসে ঘুরে বেড়াতে লাগল—এরা আশ্রমে আসে কেন? সোহনলালের মত নিয়ে যদি গুরুদেব আশ্রম করতেন তাহ'লে কিন্তু একটা মস্ত সুবিধে হ'ত যে আশ্রমে শকুন্তলা—অসিত-দাদুগোপাল—বর্গীয় কলকাতের ঠাঁই হ'ত না—রেখা যেত শুধু এক ঝাঁক নিরঙ্কুশ মডার্ণ গুরুদের ওরফে সোহনলাল—তোমার ভাষায়—"নাক টিপে ব'সে"। তাদের মধ্যেও হয়ত ঝগড়া হ'ত কে কেমন ভাবে নাক টেপে—এ বলত ওরটা ভালো, ও বলত তার। সে বিতণ্ডায়ও একটু আধটু রঙ্গ হয়ত থাকত—জানি না—কিন্তু এটা জানি যে একটা জিনিস থাকত না:—অবৈর্য। বড়ই ওকে দোষ দেই ছায়াবাণী ওর ভক্তের কথাটা হেসে উড়িয়ে দিতে তো পারি না—তাই ওর ওপর রাগ ক'রেও রাগ রাখতে পারি কই—দুরু:ভাগী হ'বে? এসব তাই তোমার কাছে আর করব না—তোমার অসিদার সম্বন্ধে তোমার ধারণা ভালো—মক্কেল খোয়াতে কে চায় বলো?

আসল কথাটা মনে টাঙিয়ে রেখে দিও। প্রথমদিকে সোহনলাল হঠাৎ ওদের প্রতি খুব দরদী হ'য়ে উঠল। বিশেষ ধনিকন্যা শকুন্তলার দুঃখ অবস্থার কথা শুনে কেমন যেন ও ভুলেই গেল কী কারণে ওর এ অবস্থা। বন্ধুবান্ধবদের কাছে এ-ব্যাপারে দোষ দিত ও উদয়কেই—শকুন্তলাকে যতটা পারে চলতে বাঁচিয়ে। সচরাচর ওর মেজাজের ছন্দ ছিল ঠিক উল্টো—প্রতি চিটিফ্রাবে ও দোষীদেরই করত বেশি আখিক—যেহেতু বলত ও ডেকে গৃহের পবিত্রতা বজায় রাখার প্রধান দায়িত্ব তাদেরই: এসব নিয়ে তোমাকে বেশি বলব না কারণ তুমি এখনো ছেলেমানুষ। তাই এ পর্বটুকু সংক্ষেপেই বলব।

শকুন্তলার প্রতি ওর এ হঠাৎ-সদয়তার আমি আকৃষ্ট হই নি। কারণ নারীর রূপ যে কী তুচ্ছ বাবার সোহনলাল না জানলেও আমি জানি—কত কী ধনিয়ে নেবার বা বলাতে চাই নি, করিয়ে নেব বা করতে

পারব ভাবি নি। শুধু মনই যে হয় এমন বলছি নে। ভালোও যথেষ্ট হয়! কত অসাধ্য যে সুসাধ্য হ'য়ে ওঠে রূপের ডাকে—কিন্তু থাক এসব বাজে কথা।

ও শকুন্তলাকে এ-ওভা নানা জিনিসপত্র কিনে দেওয়া সুরু করল—"বহিন বহিন" ক'রে সে কী মোহন হাসি ওর বিষণ্ণ মুখে। তারপর উদয় যে উদয় তার জন্যেও টাকা খরচ সুরু হ'ল: শ্রীনগর থেকে আনা টাটকা আপেল পেয়ারা কমলা এমন কি ট্রবেরিও আনাত—ট্যাক্সি ক'রে।

হঠাৎ একদিন ছুটে এসেছে দুপুরবেলা। রাগে ওর সর্বাঙ্গ কাঁপছে: শকুন্তলাকে আমি বোনের আসন দিয়েছি—অথচ লোকে বলে কি না—"তাকতে পারেন? আমাকে!!"

আমি আর পারলাম না বলবার—ক্লিষ্ট কেটে: ছোট মুখের বড় কথায় কান দিতে আছে সোহনলাল!—বিশেষ তোমার মতন ভারিক্কি মানুষের যে স্বপ্নেও কখনো পাতান বোনকে বোনের ছাড়া অন্য কোনো আসনে বসায় নি!"

এখানে ওর কথা একটু বলতেই হ'ল।

সোহনলালের চরিত্রের একটা বড় মজার দিক আছে। ওর আত্মবিশ্বাস এত বেশি যে মনে মনে ও যদি নিজের সম্বন্ধে নানা কথা তখন ও প্রায় স্বতঃসিদ্ধের মতনই ধ'রে নেয় যে অপরের কাছে সেসব কথা স্বতঃসিদ্ধ। হয়ত তুমি জানো না "মানিয়া" কাকে বলে। ধরো, একজন খাসা লোক: সে অন্য সব বিষয়ে হয়ত খাসা সুদ্ধ কেবল নিজেকে মনে করে রাজার জামাই। যখন সে হেসে দুন লকড়ির কথা কয় সবার মতনই বলে হাট বাজারের কথা আর সবারই মতন—সব ঠিক ঠিক। কিন্তু সেই স্বপ্নের-মরিচের কথা ওঠে সব যায় উল্টে সে ধ'রে নেয় সবাই জানে—তার নাম রাজবাড়ি। সোহনলালও তাই অন্য সব বিষয়ে সজাগ হ'লেও চরিত্রের কথা উঠতে না উঠতে ধ'রে নেবেই নেবে যে সে যে হৈমন্ত স্বামী ছাড়া আর কিছু হ'তে পারে এমন কথা কারুর মনে আসাও অসম্ভব।

এই কারণেই ও আমার কাছে ছুটে এসেছিল—না ভেবে যে আমি ওর নিজের সম্বন্ধে নিজের সার্টিফিকেটকে মেনে না নিতেও পারি। এরকমের লোক যে শুধু আশ্রমেই আছে তাই নয় তবে আশ্রমের ছোট ছকের মধ্যে এরকম চকচকে খুঁটি বেশি চোখে ঠেকে ব'লে সাধক সাধিকাদের মধ্যে এধরণের টাইপ বড় বেশি অনন্যসাধারণ হ'য়ে ওঠে।

ও আমার ঠাট্টা শুনে প্রথমটা একটু আশ্চর্য হ'য়ে তাকালো আমার পানে। ওকে অনেকে—বিশেষ বাঙ্গলোপাড়—প্রায়ই ঠাট্টা ক'রে বলত যে ও বোঝে সবই কেবল একটু দেরিতে। এ-ইঙ্গিতের তাৎপর্যও ও প্রথমে ধরতে পারে নি, ওর এক তীক্ষ্ণধী পারিষদই ওকে জানিয়ে যেত। সেই থেকে ও ঠাট্টা তামাসার আসরে বেশি ধরা দেওয়া দিত না।

কিন্তু আমার ঠাট্টাটার মর্ম বুঝতে ওর বেশি দেরি হয় নি। যা-খাওয়ার এই একটা সুবিধা এই যে তার ফলে আমাদের চেতনা একটু না একটু সজাগ হ'য়ে ওঠেই। ও যখন বুঝল আমার ইঙ্গিতটা তখন ওর কর্মা মুখে লালের ছোপ লাগল। তারপর দেখি ঠোঁট কাঁপছে। ও বলল: "তার মানে?"

মানে বোঝাতে গেলে কী ক'ঠ বলা যায় না, কারণ ওর প্রতি ক্রমাগত প্রশ্রয় হবার চেষ্টা করার ফলেই ভিতরে আমার মনটা ওর পরে আরো যেন বিরূপ হ'য়ে উঠ'ছিল। কিন্তু রাখেন কৃষ্ণ মারে কে? ঠিক এই সময়েই শকুন্তলা উচ্ছল হ'য়ে "দাদা" ব'লে ছুটে ঘরে ঢুকল। মোহনলাল ওকে দেখেই ঘর থেকে ঝড়ের মতন বেরিয়ে গেল।

"কী হয়েছে দাদা?"

"সে তোমার শ্রোতব্য নয় দিদি।"

ওর মুখে ঘনঘটা ছেয়ে এল। আমি হেসে ওকে পাশে বসিয়ে বললাম: "একটিমাত্র ধমক কথায়ই মুখে মেঘ ছেয়ে এল।"

ও মুখ নিচু ক'রে রইল খানিক। পরে বলল; "কথা একটিমাত্র হ'লে আসত না দাদা। কিন্তু এক যখন পাঁচগুণ হ'য়ে তোপে বড়, তখন বেকে ঠেকালে একটু মুস্কিল হয় বৈ কি।"

আমি বুঝলাম মোহনলাল যেটুকু আমাকে জানিয়েছে সেটা পাদপ্রদীপের সামনে আওড়ানোর কথা।

নেপথ্যে আরো কিছু আছে।

এই হ'ল ভূমিকা। এরই পর থেকে মোহনলালের নানা শব্দভেদী তীরন্দাজির গুজব কানে আসতে লাগল যে শকুন্তলা আমার কুটীরে বেশ জমিয়ে নাচ গান করে—সাক্ষাৎ আশ্রমে রূপসীর নৃত্যসাধনা—ইত্যাদি।

বলেছি কথাটার মধ্যে এইটুকু সত্যি ছিল যে শকুন্তলা তখন পর্যন্ত মাত্র দু'এক দিন নেচেছিল আমার "কৃষ্ণের মতীর মাক" গানটার সঙ্গে। কিন্তু গুজবের বেলায় যে আজব তুমি ছেলেমানুষ হ'লেও জানো চ'ড়ে হাড়ে। এহেন গুজবের দশাননে রটল যে শকুন্তলার সঙ্গে না কি বাদুগোপালও এক একদিন নাচে। কল্পকের কল্পনার ঘুঁৎ থাকলেও বাহাদুরি অকাট্য।

ঐ বিপুলকায় বাদুগোপাল হ'ল কি না শকুন্তলার ডান্সিং পার্টনার! শুনে শকুন্তলার চোখে সেই রাগের আগুনে হাসির রাঙ্গতা ভুলব না। খানিকক্ষণ পরে আমার পানে চেয়ে থেকে কিন্তু কেমন গম্ভীর হয়ে উঠল, বলল: "কিন্তু এ ধরণের কথা হেসে ওড়ানোর নয় দাদা—কেঁদে ভাসাবার। কারণ এটা তো আশ্রম।"

ওকে বোঝাতে একটু বেগ পেতে হয়েছিল সেদিন। কিন্তু শুধু ওকে কেন অনেক আশ্রমবাসীকেও দেখি সহজে এই সাদা কথাটি বোঝানো যায় না যে মর্ত্যলোকের কোনো সন্ন্যাই রাতারাতি স্বর্গীয় তপোবন হ'য়ে উঠতে পারে না। আমরা কুটিলতার যে-জটিল উত্তরাধিকার নিয়ে আশ্রমে আসি তাদের জট ছাড়ানো চারটি-খানি কথা নয়। শুধু তাই নয় আশ্রমে সংসারের নানা সংস্কার সময়ে সময়ে আরো উগ্র হ'য়েই দেখা দেয় এখানে ওদের প্রবেশ নিষেধ বলে। যেসব প্রবৃত্তিদের উপবাসী রাখি তারা একটু ফাঁক পেতে না পেতে ঝুঁকে হানা। প্রফেসর সাহেবকে অবিশ্যি একথা বোঝানো যাবে না তবে এটুকু বোধ হয় তুমি বুঝতে পারবে। কারণ আশ্রমে তুমি এসেছ।

ও একটু চুপ ক'রে রইল-মুখ নিচু ক'রে। পরে বলল: "তুমি তো জানো না দাদা তোমার এই বোনটিকে—কী অহঙ্কারী সে!"

হাসি এল ছায়ারাণীর। যেন ও-ই জানে ওর নয় দাদাটিকে। সান্ত্বনা দিয়ে বললাম: "শিল্পী মানেই একটু বেশি অহঙ্কারী হ'য়ে থাকে দিদি। এর উপায় কী বলো?"

"উপায়—অহঙ্কারের খোরাক না-জোগানো। আমার সবচেয়ে গুমর—আমি নাচি ভালো।"

"গুমরটা ছেড়ে নাচটাকে ধরলে কেমন হয়?"

ও ম্লান মুখে মাথা নাড়ল: "সে কী হয় দাদা?"

আমি হেসে ওর একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলাম: "তবে হয় যেটা তার কথাই বলো না শুনি একটু।"

"বোনা। মাথা হেঁট ক'রে।"

হো হো ক'রে হেসে ফেললাম: "তার পরেই মাথা ঝাঁকিয়ে বলবে: 'দেখ আমি অমিতা সুলতার চেয়ে কত ভালো ছুঁচে সুতো পরাই।'"

"কী যে বলো দাদা।" ও হেসে উড়িয়ে দিল। বোধ হয় হাসির পরে কী হানা দেয় সে সম্বন্ধে রামসলার ভবিষ্যদ্বাণীটি ওর অজানা ছিল।

দশ বার দিন পরে। হঠাৎ ওর আবির্ভাব আমার ছাদে। রাত তখন দশটা হবে।

এত রাতে ও ইদানীং বড় একটা একা আমার কাছে আসত না। বাইরে যারা নিভীক দেখে তাদেরো আশ্রমে এসে একটু সমঝে চলতেই হয়—শুকেও হয়েছিল, বিশেষ ক'রে সম্প্রতি। কারণ সোহনলালের সমধর্মী দল যে শনৈঃ শনৈঃ পুরু হ'তে উঠছিল এ গুজব কানাঘুঁষোয় পৌঁছাচ্ছিল আমাদের সবাইকারই কানে। আমি ঠিক প্রমাদ না গণলেও এধরণের আন্দোলনকে ঠিক পুলক-জাগানো জাতীয় কিছু তো আর মনে করতে পারিনি। কারণ একটি কথা অন্তত বলতে পারি—হেমি ও-ও হয়ত সেই একজাতেরি অহঙ্কার সেই ছুঁচে সুতো পরানোর। যে স্বভাবে আমি ঝগড়াটে নই। সবাইকে সমান চোখে দেখি বললে নিশ্চয় সেটা হবে লোক-হাসানো কথা। কিন্তু সবাইয়ের মধ্যেই কিছু কিছু গুণ আমার চোখে পড়ে এললে হয়ত অত্যুক্তি নাও হতে পারে। তাই সোহনলালকে আমি তাতে ঠেলা করতে পারতাম না—সে এখানে ওখানে আমার বিরুদ্ধে নানা টিপ্পনি কাটা সত্ত্বেও। কারণ গুরুদেবের প্রতি তার ভক্তি তো অস্বীকার করা চলেনা। তার নানা কাজের মধ্যে একটা ছিল ভোরবেলা উঠে গাছে চ'ড়ে ঝাঁকনি দিয়ে ফুল-তোলা—কাঠচাঁপা।

একবার পড়েও যায় একটা ডাল ভেঙে। আমি হ'লে এ পতনপর্বের পরে হয়ত গাছের ছায়া পর্যন্ত মাড়াতাম না। কিন্তু সোহনলাল দুদিন পরেই কের দেখি আমার কুটীরের সামনে গাছে মড়বড় করে বেড়াচ্ছে ভালে ভালে। মানুষটা অশিক্ষিত গেঁয়োযোগী বলে রসটুকু কিন্তু নিটোল ওর আছে মানতেই হবে। এই কথার পরে জোর দিয়েই আমি মনকে তুলিয়ে পাঠিয়ে ঠাণ্ডা করতাম, বলতাম যে ভগবান ভাবগ্রাহী—বাইরের প্রকৃতি কারই বা নিখুঁৎ। তাছাড়া স্নেহো না হ'লেও এবং একবার দারুণ প'ড়ে যাওয়া সত্ত্বেও কের রোজ রোজ গাছে চড়া—বাপরে! দৈহিক দুঃখ আমাকে বেশি পেতে হয় নি বলেই সবচেয়ে ডরাই হাত পা ভাঙাদ, রক্তারক্তি তে। সোহনলাল কিন্তু রক্তকে চাটনির মতন চেখে চেখে উচ্চারণ করে, বলে খুন"—শুধু তাই নয় খুনোখুনি কবিতা

পর্ব্ব লেগে ! একটু মন:কষ্টেই ওর মুখ একেবারে অন্ধকার। কিন্তু দৈহিক যন্ত্রণার সময়েও ওর মুখে আলো সহজে নেভে না। It takes all sorts to make a world—বলে না ?

যে জন্যে কথাটা পাড়লাম। আমি চেষ্টা করছিলাম মন থেকে ওর প্রতি যে-বিরূপ ভাবটা আমায় ঘিরে উঠছে,তাকে একেবারে অর্ধচন্দ্র দিতে না পারি অন্ততঃ একটু উপুরী রেখে হাল্কা করতে। তাই ওর দোষ ত্রুটির কথা না ভেবে প্রাণপণে চেষ্টা করতাম নজরে আনতে গুণগুলিকে।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার ছায়ারাণী ! সাধনা করতে আসার পরে বহুদিন কেবলই দেখতে পাওয়া যায় আমাদের ছোট দিকটা। তখন ভুলে যেতে হয় সত্যি যে আমাদের মধ্যে শুধু অসুরই নেই আমাদের পাকে ফেলতে, দেবতাও আছেন টেনে তুলতে। নরওয়ামের সেই গল্পে আছে না ?—স্ত্রীর গুরুদেব-চর্বিত আক চিবোনো খেয়ে স্বামী ভেবেছিলেন "ব্রহ্ম বলু সর্ব্বত্র" হ'লেও ঐ চিবোনো আকেও থাকেন কী সুখে ? তেমনিই আমার মনে হ'তে লাগল যে ভগবান যেখানেই থাকুন না কেন গোঁড়ায়গোবিন্দের মধ্যে থাকেন কী ব'লে ?

যেই ভাবি অমনি কেষ্ট মন কালো হ'য়ে যায়। বুঝতে পারি—কেন। সব মানুষের মধ্যে দেবতা আছেন এটা সর্ব্বত্রই প্রায় কথার কথায় দাঁড়িয়ে গেছে। কেবল সাধনায় একে চাক্ষুষ করা যায়। কেবল করতে হ'লে চাই প্রধান শ্রদ্ধা প্রীতি বন্ধুদের পাশের। বেরসিকী হ'য়ে দেখলে বেরোয়ে ঘুরে মরতে হয়। আর, যে-চোখে দেখতে পায় না অপরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন দেবতাকে সে নিজের মধ্যের দেবতাকেও বসে হারিয়ে। কেষ্ট বলি, বুঝি সবই। অথচ তবু অসুস্থ হই নানা ক্ষোভ, অভিমান, প্রত্যাশার ঘূর্ণীতে প'ড়ে। যে-দৃষ্টি ভঙ্গিতে নরদেবের মধ্যেও দেবতা দেখা যায় তাকে দিব্য দৃষ্টি ব'লে ব্যক্ত করি। আমিও করলাম।

অমনি—সঙ্গে সঙ্গে—মনের মধ্যে সব আলো গেল নিভে—দেখতে দেখতে। এ যে কী শাস্তি তোমাকে কেমন ক'রে বোঝাব ছায়ারাণী ! প্রত্যক্ষ দেখছি—"একে একে নিভিছে দেউটি" জানবার উপায়ও জানি, অর্থাৎ আত্মগ্লানিকে অনুতাপকে মেনে নেওয়া—অথচ পারছি না মানতে। আমাদের যা যা ধারণা সবই যে সত্যি নয়—থিওরিতে কে না জানে ? কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যখন এখানে ওখানে সেখানে কেউ বেরিয়ে যেতে বলেন—মন টনটন ক'রে ওঠে। তার পরেই অভিমান : কী ? ভুল সবই আমার ? আর ওর বেলা ? কিন্তু এইখানেই হ'ল সাধনার শান্তি। সমাজের ব্যবস্থা আলোদা। সাধনার বিধান—নিজেকে ছোটাই না দেওয়া—অপরে কী করে না করে সে তার বিচার্য—আমি কেবল আমার নিজেরই বিচারক আর কারু না। বলা সেখানে কে কাকে কার সঙ্গে সেখানে সবাই একলা !

ভাবতে ভাবতে ছাদে চুপ ক'রে শুয়ে দেখছি ওপরে বাঁকা চাঁদের সঙ্গে মেঘের সেই লুকোচুরি খেলা—কবে এ খেলার সুরু, কবে শেষ কেউ জানি না। জানি শুধু এইটুকু যে এ-খেলা পুরোনো হ'য়েও নতুন হবার শক্তি ধরে। ঐ—ওদিকে পাতলা মেঘের ঘোমটা টেনে একটি দুটি তিনটি লাজুক তারা মুখ ঢাকছে, কেউ ঘোমটা খুলে নয়না হানে বুঝি চাঁদের পানে—কিন্তু চাঁদের হাসি দেখে লজ্জা পেয়ে কেউ টেনে দেয় ঘোমটা—ঠিক যেমন চাওয়াচাওয়ির সময়ে করে না ফুটফুটি নাচওয়ালির ?

হঠাৎ দেখি মনের মধ্যে আলো না হোক একটা বিষয় অস্বস্তি গেছে বিছিয়ে। বিষয় না ব'লে বরঞ্চ উদাস বলাই ভালো। কারণ তার বাধী সুরটা যে বৈরাগ্যের : গুনগুনিয়ে উঠল :

তখনো যখন ছেড়ে আসে
অকূলে ভাসিতে যেন পারি :
"সে আমারে বাসে ভালোবাসে
যদি আমি তার অভিসারী।"

ঘুচিয়ে গেল ব্যথা। কিম্বা বেদনার বাষ্পের মধ্যেই লুকিয়েছিল শুধু সান্ত্বনা নয় শান্তি? এইখানেই না সৌন্দর্যের মহিমা! চোখে দেখছি নীলাকাশের আলো-ছায়া নিয়ে খেলা, কানে শুনছি ঝিলির নিজেকে বাছাই ক'রে সুরের তালের ছকে ছুলে ছুলে তালে তালে চলা। বেড়াচি সোহনলাল! নাকই টিপল চিরটাকাল—না খুলল কান, না মেলল চোখ। কেন এমন দুর্ভাগার উপর রাগ করি ওকে দয়া না ক'রে? যে মেয়েদের দেহের মধ্যে শুধু দেহ দেখেই নাচ দেখতে ভুলে যায় তার উপরে কি রাগ করতে আছে। কী? নাচে বিপদ আছে? হায় রে হায় বিপদ নেই কোথায়। এই প্রাণটা নিয়ে কি কম প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। শুধু বিপদ কাটাতে কে চায় অকালমৃত্যু? মেয়েদের বাদ দিলে দাঁড়াব কোথায় ছাই? সত্যই বলি বড় গলা ক'রে কোনো পুরুষই আজ পর্যন্ত এই সমস্যার চাবিকাঠি খুঁজে পায় নি যে দেহতত্ত্বি নিখুঁৎ হ'লে জন্মানো যায় কোন্ ভূঁইফোড় উপায়ে? এর যতদিন না একটা কিনারা হচ্ছে ততদিন যোগীদের একটি প্রধান "না"-তে কিছুতে জিজ্ঞাসু মন পুরোপুরি প্রসন্ন হ'য়ে বলতে পারবে না "হাঁ"। অবিশ্যি গোঁড়া মনের কথা আলাদা—তারা নিজেকে মনে করে বৈষ্ণবাণী; কিন্তু গোঁড়ামির গোঁড়াই মুস্কিলখানা দেখা দিলেও মুস্কিল এই যে তার আপৎশান্তি কুরুক্ষেত্রের শেষে শ্মশানঘাটে। সোহনলাল এক কথায় মেনে নিল নারীর দেহ নরকের দ্বার কিন্তু তাই ব'লে যারা একথা মেনে নিতে পারে না তাদের পক্ষে সোহনলালের খোঁড়া শান্তিকে চাইতে পর্যন্ত হাবে—পাওয়া তো দূরের কথা।

এই সব সাতপাঁচ ভাবছি ছাদের উপর চিৎ হ'য়ে শুয়ে এমন সময় চমকে উঠলাম পায়ে একটি নরম হাতের স্পর্শে।

"কে? শকুন্তলা! কী ব্যাপার?" উঠে বসলাম। ও কী একটা কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল। ওকে কাছে টেনে নিতেই দেখি ওর চোখ ছোলা। আদর ক'রে বললাম : "কী হয়েছে দিদি?"

ও মুখাতে মুখ লুকিয়ে আমার কোলে লুটিয়ে পড়ল। তারপর—সে কী কান্না মেয়ের! তুমি সময়ে সময়ে যেমন কাঁদতে আমার কোলে উপুড় হ'য়ে তার চেয়ে একটুও কম কাঁদুনি নয় সে। সর্ব অঙ্গে চোখের জলের মোত রেখার হিয়োলে নিয়েছে নব জন্ম।

সহরে এত অধীর হবার মেয়ে তো ও নয়। কী ব্যাপার?

মনের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। বললাম ওর মাথায় হাত রেখে : "সোহনলাল বুঝি?"

ও ছুঁ-র তড়িতে মাথা নাড়ল। আমার মগজে বিদ্যুৎ ঝলক দ'য়ে উঠল মুহূর্তে। কিন্তু সাম্‌লে জোর ক'রে মুখে হাসি টেনে ওর মুখ তুলে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললাম: "ওটার কথায় কিছু মনে করতে আছে? যা বলে বলুক না।" শকুন্তলা তখন উঠে বসেছে।

"কাছে এসো।"

ও আমার পায়ে একটি হাত রেখে আর এক হাতে আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে লাগল। আমার কৌতূহল হ'ল: "কী বলেছে শুনি? কার কাছে? আমার সম্বন্ধেই তো?

ও মুখ নিচু ক'রে বলল: "না দাদা। এবার বলাবলি নয়। তাহ'লে এতটা লাগত না অমন।"

তারপরে একটু ক'রে বলে ফের ফেঁদে পড়ে। বড় ঘরের মেয়ে তো। এত অপমান!

অথচ ব্যাপারটা বাইরে থেকে দেখতে খুবই সামান্য। কিন্তু আঘাতের প্রবলতার অনুপাতে তো ব্যথা থাকে না ছায়ারাণী, বোধশক্তির অনুপাতেই টনটনানি।

হয়েছিল কি, শকুন্তলাদের কুটীরের সামনেও একটা কাঠচাঁপা গাছ ছিল। মোহনদাস সেটাতেও চ'ড়ে ফুল তুলত রোজ সকালে গুরুদেবের জন্যে। গুরুদেব এই ফুল দিয়ে প্রণতাদের আশীর্বাদ করতেন। কাজেই তাঁরও ফুলের দরকার। না হ'লে যে চলত না তা নয়—অন্য ফুলও ছিল। কিন্তু এ ফুলটি তিনি বেশি ভালোবাসতেন।

কয়েকদিন আগেও মোহনদাস ফুল তুলেছে ওদের ওখানে—সঙ্গে সঙ্গে শকুন্তলাও কয়েকটা মাটিতে ঝরা ফুল কুড়িয়ে নিয়েছে—ও আপত্তি করে নি, কিন্তু সেদিন ফুল তুলতে গেছেই গাছের উপর থেকে হাঁক দিয়ে বলেছে ফুলে হাত না দিতে—গুরুদেবের ফুল।

শকুন্তলা চোখ মুছে বলল: "যদি একটুও ভদ্রভাবার কথা বলত দাদা, তাহ'লে এত লাগত না। হঠাৎ কেন জানি না—আবার ওর চোখে জল ভ'রে আসে, কোনোমতে সাম্‌লে বলে: "কেবল কেবলই আজ মনে পড়ছে আমাদের তিনমহলা বাড়ির কথা। তার শুধু পিছনের বাগানটায় আশ্রমের সব কটা বাগান ধরে। অথচ···"ওর স্বর কেঁপে ওঠে ফের···" অথচ দাদা আজ আমি নিঃস্ব ব'লেই না এই অপমানটা ও আমাকে করতে সাহস করল। আর কী অমন? না, দুটো তুচ্ছ ফুল—তাও মাটিতে ঝরা ফুল—গাছ থেকে তোলা হ'লেও যা"—

কথাটা ওর শেষ হ'ল না—আমার কোলে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগল!

আমার মাথার রক্ত গরম হ'য়ে উঠল। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করলাম ইষ্ট নাম জপ ক'রে রাগ থামাতে। একটু সুস্থির হয়েছি এমন সময় হঠাৎ ও মুখ তুলে বলল ঈষৎ হেসে: "দাদা, ও বলল গুরুদেবের ফুল কাজেই হাত দিতে মানা—কিন্তু দুদিন আগে যখন আমাকে আপেল খাওয়াতে তখন কি ফলটা ছিল অ-গুরুদেবের? তখন তো ও নিজে হাতে আমাকে গোছা ক'রে ফুল দিয়েছে। কিন্তু এখানে দেখি যার যখন যা করবার দরকার করে হয় গুরুদেবের কথায় নয় নামের বুড়ি ছুঁয়ে।

কথাটা কানে খুব শ্রুতিমধুর মনে হয়নি ছায়ারাণীর। কারণ যতই বলি আশ্রমের সাধকরা আমার গুরুভাই তারা অন্যায় কিছু করলে তাই আমি তার সঠিক তো বটেই। তবু—এ আর এক বস্তু ছায়ারাণী—আশ্রমের সাধকের নিন্দা আমি নানা সময়েই করেছি কিন্তু অপরের মুখে সে নিন্দা শুনলে মন রুখে ওঠে। এ কেন হয় আমি টের পেয়েছি বারে নিজে জোর ক'রে মিলতে চেষ্টা করি সে উঠে আসতে চায় বটে কিন্তু তবু মনে হয় এ গেলা-না-গেলা আমার নিজের ইচ্ছাধীন। কিন্তু বাইরে থেকে যদি কেউ কিছু গেলাতে চায় তো সে সত্য হোক মন রুখে উঠে বলে মিথ্যার পাচন।

তাই ওর উপর মন একটু বিরূপ হ'ল। কিন্তু তার পরেই সব ভুলে গেলাম—সাধন উৎসব যখন অকুন্তলা বলল: "আমি বললাম: এ বাড়িতে যখন বাবা আমাকে ডেকেছেন তখন তোমার কথা আমি—শুনব কেন?" তাতে ও বলল 'ডেকেছে গুরুদেব কৃপাময় ব'লে। আর তিনি তাদের এখানে চেনেন ব'লে যারা নাই দিলে ওঠে মাথায়।'

মুহূর্তে আমার সর্বাঙ্গ থেকে রক্ত যেন মাথায় চ'ড়ে গেল। তোরা আমাকে মারু বলো—এ আর একটা ভুল ধারণা। আমি বিপ্লবী হাত—স্বভাবেও বটে, উত্তরাধিকার সূত্রেও বটে। তবে বাগ মাথার বেশী কুসংস্কার পাইনে বলেই আমাকে অনেকে অবাস্তব ব'লে ভুল করেন। হয়েছে কি জানো আমি বরাবর স্বাধীন ভাবেই থেকেছি ব'লে কারুর মুখে চড়া গলায় কড়া কথা আমাকে বড় একটা শুনতে হয় নি। এ ফল যে ভালো হয়েছে এমন ইঙ্গিত মোটেই করছি না। সংসারের কক্ষ দিকটার সঙ্গে একটু পাকাপোক্ত পরিচয় না থাকলে মনটায় নানা আগেয় বস্তু অপকোই থেকে যায়—বলত আমাকে সুভাষ প্রায়ই ঠাট্টা ক'রে।

সুভাষের কথাটা যে ভুল ছিল এমনও নয়—তবে বিধাতা কাকে যে কোন্ পথ দিয়ে কোথায় নিয়ে যান কেউ কি আগে থেকে জানতে পারে ছায়ারাণী, না পারলেও জানের মূলধন কিছু সত্যি বাড়ে? সুভাষকে মিলতে হ'তই রাতদিন বেদরদীদের সঙ্গে—এ কে না জানে! এজন্যে তাকে দুঃখ পেতে হয়েছিলও কম না। আমাকে চালিয়েছিলেন তিনি—সে আর এক বিচিত্র পথে। নানা জানা মুখের চেনা পথের দরজা দিয়েছিলেন তিনি যেন গোড়া থেকেই বন্ধ ক'রে কিন্তু অনেক অচিন রাজ্যের শুধু যে তিনি সন্ধান এনে দিয়েছিলেন তাই নয় বাছাই করার পথও রেখেছিলেন খোলা। যাদের চাইনা তাদের গান শোনাতে আমি বাধ্য নই, যারা আমার চক্ষুশূল তাদের মুখ দেখবার কোনো নৈতিক কর্তব্যই আমার নেই। যেখানে চাই যাই—ঠকি ও ঘুসিটা হয়ত বেশি কিন্তু বকি ঝকিও যে কম নয় সেও কি একটা কম বাঁচোয়া? শেষে ঘরের ছেলে ফিরি ঘরে: সেখানে দিদিমার আশীর্বচনের মধু আদর সেবা অঢেল: আহা! আমার হাতে কালি মুখে কালি—বাছা আমার ঠকে এলি!

আশ্রমেই প্রথম আমাকে এ শিক্ষা স্বীকার করতে হ'ল যে যাদের সেবা আমার ভাল লাগেনা তাদেরও আমাকে খানিকটা সইতেই হবে। গুরুদেব আমাকে সাধ্যমত বাঁচিয়ে চলেন—অপার তাঁর করুণা। কিন্তু তাঁকে ঘর করতে হয় ভিড় নিয়ে, আমি ভিড় ভালবাসি না। কি না বেদরদীদের। যেহেতু দরদীদের মতো তো ভিড় নয়—সে যে মজলিশ।

এখানে ওখানে তাই খা খেতে হয় বৈকি। বেশি নয় তবু একটু আধটু তো হয়ই—গুরুদেবের রক্তচক্ষু সত্ত্বেও। শোধও কখনো কখনো তুলি না কি আর?—যদিও চড়া কথায় নয়—আমার রীতি হ'ল কড়া লোকদের একেবারে বর্জন করা—বেশ গম্ভীরভাবে নজরের মধ্যে না আনা। আমাকে অনেক সময়েই করতে হয়েছে খানিকটা নিষ্ঠুর হ'য়েই বলব। কারণ যাদের সঙ্গে মেলেছে তাদের অনেকেই চেয়েছে কের সন্ধি করতে। সব সময়েই যে আমি মুখ ফিরিয়েছি তা নয়। তবে অনেক সময়েই এমন হয়েছে যে তাদের বোবা মিনতিকে আমি ভাষা দেবার সময়ই দিই নি। তবে যাদের মুখে খই ফোটে তাদের সঙ্গে মোটের উপর আমার ব'নে যায়। যেমন ধরো এই সোহনলালেরই সঙ্গে। এধরণের মনকষাকষি ওর সঙ্গে অনেকবারই হয়েছে কিন্তু ওর খোলা হাসি, বাধ্যতা ও হৈ হৈ কাণ্ডে মন একটু নরম হ'য়ে আসে কের। "বলে বলুক না আমার নামে—আমিই কি ওকে রেয়াৎ করে চলি—" বলি নিজের মনকে। তোমরা বোধ হয় এইটে দেখেই বলো আমি ক্ষমাহীন। আর সেই জন্যেই তোমাদের ভুল হয়। কারণ ক্ষমা আমি ইচ্ছে ক'রে করি না। হয় কি রাগ আমি পুষে রাখতে পারি না কিছুতে।

সোহনলালই একটা গানে গাইত উর্দু গজল

ভলো দিল্ দৈঠ—জানে দো
কে অদনা হো হি ভাতা হয়।

কিন্তু সেদিন শকুন্তলার কথা শুনতে না শুনতে মাথার মধ্যে উঠল ঝাঁ ঝাঁ ক'রে। সঙ্গে সঙ্গে যেন নতুন ক'রে অনুভব করলাম যে নিজেকে চরিতে পাঠিয়ে শান্ত শিষ্ট ক'রে রাখার নাম সমতা নয়। সমতা হ'ল ভিতরের একটা সহজ প্রতিক্রিয়া: স্বভাবে সেই রকম হওয়া যেখানে আঘাত লাগলেও ফিরিয়ে দেওয়া অসম্ভব—'রিবাউণ্ড' করা থেকে নিজেকে ঠেকানো নয় যে-কাঠিন্যের দরুন কিছু পড়লে 'রিবাউণ্ড' করে তার পথ যেন রাখা—ভিতরের কঠিনতাকে নরম ক'রে। তৃণাদপি সুনীচেন হ'তে হ'লে সেই কোমলতার চাবিকাঠিটি আগে হারিয়ে রাখতে হয়। কিন্তু হারাবে কে? মন? দূর্। মন করে জানে অমূল্য কোন্ হাটে বিকোয়! জানে এক হৃদয়। কিন্তু—বললে হয়ত তুমি চোখ কপালে তুলে বলবে সে কি! তবু বলবই যে, যে-ভাবে আমরা এযুগে জীবন যাপন করি তার সঙ্গে হৃদয়ের পা ফেলার ছন্দ মেলে না। তাই হয়ত মানুষ মানুষকে এত ভুল বোঝে।

হৃদয় বলতে কিন্তু আমি এখানে উচ্ছ্বাস বুঝছি না। বুঝছি—জীবনকে দেখার একটা ভঙ্গি। কেমন জান? একই ঘটনাকে বিচারকের দৃষ্টি থেকে দেখলে যে-ভাবে দেখি ধরণীর চোখে দেখলে অনেক সময় উল্টো দেখি তো? অনেকটা সেই রকম। তৃণের চেয়েও নিচু হ'তে সত্য যে পেরেছে—মানতেই হবে সে খানিকটা হয়েছে ধরণী আর ধরণী হতে পারে মানুষ তখনই যখন মনের নির্মম দম্ভ ছেড়ে সে এসে বসে হৃদয়ের নরম ভূমিশয্যায়। রাগ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি টের পেলাম যে আমার মনের মধ্যে সেই কোমলতা আসে নি যার উদয় বিনা না হওয়া যায় ক্ষমাশীল, না সহিষ্ণু।

একথা বলছি আরো এই জন্যে যে রাগ করার জন্যে সে সময়টায় আমার মনে একটুও গ্লানি অনুভব করিনি। বরং নিজেকে সমর্থনই এই ব'লে যে এমন সুন্দর মেয়েকে যে অপমান করে সে—কিন্তু এখানে থমকে গেলাম। মন খুলে brute বলতেই বা পারি কই? সে গুরুদেবের জন্যেই তো ফুল নিচ্ছে। বাগান আমাদের নয়—তাঁর। আশ্রমে আমাদের বাড়ি কিছু আমাদের সম্পত্তি নয়। গুরুদেব টানে আমরা প্রত্যেকেই

নিজেকে নিঃস্ব ব'লে শুধু মানতে নয় চিনতে শিখি। যা কিছু ভোগ করি যেন ভগবানের দান ভেবে মেনে নিই—নিজের প্রাপ্য ভেবে দাবি না করি, আমরা সন্ন্যাসী নই বটে,—যেহেতু গুরুদেব কৃষ্ণ সাধনের দীক্ষা দিতে নারাজ—কিন্তু তাই ব'লে আমরা সংসারীও তো নই। তবে? ফুল যদি ওকে সোহাগদান না দেয় তাতে কার কী বলবার আছে?

কিন্তু মাথার যখন রক্তাক্ত ঢেউ খেলে যায় তখন নিজের মনের ঠিক ছবিটি কী দেখবার জন্যে শান্তির আয়নাটিই হ'য়ে যায় আপসা। ফলে আমি খানিকটা অন্ধের মতই রুখে উঠলাম। বললাম: শকুন্তলাকে "তুমি কাল আমার এখানে এসো সকালেই। আমার বাগানেও তো কাঠচাঁপা আছে দেব।"

অন্য সময়ে হ'লে হয়ত ও বলত ওকে কী কপর্দকশূন্য ভিক্ষুক পেয়েছ? কারণ বড় ঘরের মেয়ে তো:—উদরের জন্যে ঘর ছাড়লে কী হয় আভিজাত্য গৃহহারা মেজাজ তো ওর নয়। কিন্তু এবার বিশেষ করেই ওকে পেয়ে বসেছিল এই দুর্বার ক্ষোভ যে দুটো ফুল কৃষ্ণকে পাব না ঠাকুর সাজাতে! আরো এই জন্যে যে এ-ফুল দিয়ে ও সাজাত শ্রীকৃষ্ণের একটি সাদা পাথরের বিগ্রহ। এসব কথা ও পরে বলেছিল খুলে তাই এসব এত খুঁটিয়ে লিখতে পারলাম, নৈলে তোমরা তোমাদের অভিধানে যোগী তাহলেও সে তো জানে সত্যি যোগী হবার তার কত দেরি। কের রুখে উঠছ তো "ফুল করছ অভিধা বলতে কেন?" খবরদার।

ব্যাপারটার শেষ পর্যন্ত শুনলেই মালুম হবে ফুল কার শ্রীমতী শুকতারা ছায়াবাণীর, না অসিতকুমার অভিমানীর।

ওকে নিমরাজি দেখে খুসি হ'য়ে বললাম; "তাহ'লে কাল সকালে তুমি আমার গাছের তলায় ফুল নেবে—কেমন!" ও চুপ্‌কে ফুল তুলল। পরে মুখ নিচু ক'রে একটু ভাবল তার পরে কের আমার চোখে চোখ রেখে বলল: দেখ—কেবল—

"কী?"

"যদি ধরো পাঁচজনের কানে উঠে?"

"সে তো উঠবেই।"

"ওমা!"

আমি হেসে ফেললাম: "তুমি যেদিনকার কোনো আশ্রমে থাকো নি বোধহয়, না?"

"কেন দাদা?"

"থাকলে জানতে যে আশ্রমে সর্বশক্তিমান্ হওয়া কঠিন হ'লেও সর্বজ্ঞ হওয়া অতি সোজা—প্রায় সবারই পক্ষে। কাজেই তুমি ঘোরে খিল দিয়েও যদি একদিন মোচার ঘন্ট খাও দেখবে পর দিন সবাই বলাবলি করছে: কী সর্বনাশ! মোচার ঘন্ট—আর গুরুদেবের অনুমতি না নিয়ে!

ও মন খুলে হাসতেও পারল না। বলল: "তাহ'লে গুরুদেবের কানেও তো উঠবে?"

"অর্জুনের লক্ষ্যভেদের চেয়েও অব্যর্থ।"

ওর ঠোঁট কেঁপে উঠল: "তাহ'লে কাজ নেই ভাই। আমাদের নিয়ে তো একি মধ্যে একটা সোরগোল—না দাদা কাজ কী বাধা ডেকে—যখন চুপো ওল না খেলে চলে। আমি বিনয়ের ওপার থেকে দুচ্চারো ফুল তুলে আনব। কাঠচাঁপা নাই বা হ'ল। ওপারে কী সুন্দর দুচারো ফুল ফুটেছে—জানো? আর অঢেল।"

মনে মনে হাসলাম অথচ প্রশংসা না ক'রেও পারলাম না—কী অপূর্ব অভিনয়! বললাম ওর পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে—না হেসে: "বেশ। কেবল ঠিক ক'রে বলো এখন—এ-ই তোমার মনের কথা তো! এখনো সময় আছে কিন্তু ওকে টাট করবার।"

ওর চোখে জল উপচে পড়ল। কিন্তু এবার ও সামলে নিল: ব্লাউসের হাতায় চোখ মুছে আমার পানে খানিক তাকিয়ে রইল। পরে বলল: মিথ্যে বলব না দাদা। পাঞ্জাবি রক্ত আমার গায়ে। নিতান্ত মেয়ে মানুষ ব'লে ওর গায়ে হাত তুলতে সাহস করি নি—"বলতে বলতে ওর মুখে কে যেন এক মুঠো আবীর ছড়িয়ে দিল। ও বলল: "কিন্তু না, হাতে ওরদের ওই দিক নেবেন—তখন তোমার অপমান হবে। আমি নিজের অপমান সইতে পারি দাদা কিন্তু তুমি আমাদের জন্যে যা করেছ তার প্রতিদানে তোমার হাতে অপমান হয় তা সইব কী ক'রে?" ব'লেই মেয়ে দুহাতে মুখ ঢাকল।

এখানে ওর অভিনয় ছিল না—কারণ আমাকে ও ভালোবেসেছিল। আমি ওকে কাছে টেনে বললাম আদর ক'রে; কথা হইল তাহ'লে কাল সকালে তুমি এখানে আসবে। আমি চুপ তখু তে তোমাকে দেব তা নয় তোমাকে দিয়েই তোলাব—আর ওর চোখের সামনে।"

"কিন্তু যদি গুরুদেব ওরই পক্ষ নেন?

"তাহ'লেই বা মন্দ কী?—প্রমাণ হ'য়ে যাবে খুঁটির জোর বেশি কার।" বলতে বলতে বিপদের অভিমান এসে গেল নিজের পরাভব কল্পনা ক'রে। ট্রাজিডি কি শুধু বেপে মুখ ছারাবারি। এঁকেও মুখ। বললাম: "আমি এখানে এসেছি ভগবানকে পেতে—দাসখৎ লিখে চাকরি করতে নয়। যদি গুরুদেব বলেন যে সব কিছু নির্বিচারে মেনে না নিলে তাঁর চোখে আমার স্থান নেই তাহ'লেও এ বিশ্বাস আমার উঠে যাবে না যে আমাকে দিয়ে যিনি চাওয়াচ্ছেন অভিনয় সে-অভিনয় এমন কোনো ঠাঁই আমার ক'রে নেবেনই যেখানে তাঁকে ডাকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে। না কুন্তলা, তুমি আপত্তি কোরো না—একটা হেস্তনেস্ত আমিও চাই। চাবার চাষাড়ি বরাবর সহ্য করতে হবে নিজে চাষা হ'তে পারিনে ব'লে—এ অসহ্য।"

ও হেসে ফেলল: "কথাটা তারি মজার লাগল!" বলতে বলতে ওর মুখে জ'লে উঠল উৎসাহের আলো। মানবজীবনের আর একটা মজা এই যে "শাস্তরসাস্পদ" ব'লেই ছামরি লোভটা এখানে মানুষকে সহজেই পেয়ে বসে। যেখানে খোরাক কম সেখানে খাঁই হয় বেশি—কে না জানে? আশ্রমে তুচ্ছ-রা যে তাদের পুচ্ছ এত বেশি নাড়ে তার এও একটা কারণ। বাঁচার অনুভব তিমিত হ'য়ে এলে আমরা বিপদকে মনে ক'রে বসি সম্পদের আরম্ভাই।

ও আমার কাঁধে মাথা রেখে চুপ ক'রে ব'সে রইল খানিকক্ষণ। অঙ্গে আমার শিহরণ জেগে উঠল। উঃ! আমি কী মহাবীর! কী মহৎ! এক অসহায়া অবলার হ'য়ে কী লড়াইই না লড়তে যাচ্ছি জোর বেঁধে! মনে কেবল একটা অবুঝ সংশয় থেকে থেকে উঁকি দিচ্ছিল: "লড়ছি কি সত্যি এইজন্যেই যে অবলাটি অসহায়া? যদি ধরো ওর ছয় হ'ত আমাদের গণাধরের পিসির মতন কালো, দাঁত দুটো গজদন্ত, চোখ দুটো হ'ত ভাঁটা আর নাকটা ধারালো খাঁড়া তাহ'লেও কি "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে

তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে' এই মহা ভুল ক'রে হ'তে চাইতাম রাতারাতি হৃদয়ের ভন্ ভুইক্ সোট? কিন্তু চিন্তাকে আমল দিলাম না—ওর চুলে হাত বুলোতে বুলোতে মন আমার স্নেহে নম্র হ'য়ে এল সেই আবেগটুকুর স্বাদ বেশ চেখে চেখে উপভোগ করতে লাগলাম। কবিদের এই এক মহা বিপদ আছে ছোরাবাণী,—তারা রোগী হ'তে চাইলেও বাধা পায় পদে পদে এই জন্যে যে তারা বড় বেশি ভালোবাসে নিজের আবেগ উচ্ছ্বাসগুলিকে নানা পরিবেশের মধ্যে ধূপ ধুনো দিয়ে পুজো করতে। মুখে বলে বটে যে এ চায় তারা দেবতাকে উৎসর্গ ক'রে শুধু প্রসাদ পেতে, কিন্তু তাদের কবিত্বের নানা নৈবেদ্য চুরি করে প্রায়ই তাদের আত্মপ্রসাদের পুরুতে। একথার মানে তুমি হয়ত ঠিক বুঝবে না—শুধু তুমি কেন, তোমার চেয়ে প্রবীণা যারা তাঁরাও বুঝতেন কি না সন্দেহ। তাই আজ শুধু এইটুকু ব'লেই ক্ষান্ত হব যে রোগীদের শান্ত সমতা সবারই পক্ষে দুরূহ তবু একথা সত্য হ'লেও বলা হয়ত চলে যে কবি শিল্পী প্রকৃতির মানুষের পক্ষে পদে পদে আবেগ উচ্ছ্বাসের আনন্দময় দুঃখের সোত সামলানো একটু বেশিরকম কঠিন। এর একটা কারণ—রোগীদের আত্মদমন হ'ল সাধনা। কিন্তু কবিদের পক্ষে এ-তপস্যা ঠিক সাধনার কোঠায় পড়ে না: পড়ে নিছক কৃচ্ছ্রসাধনেরই কোঠায়। কিন্তু এ জানে শুধু সেই কবি যে রোগ হ'তে চায় সত্যিই অথচ কিছুতেই নিজেকে পুরোপুরি বোঝাতে পারে না যে সব ভাবনার তরাডুবি হ'লেই মিলবে ডুবসাঁতারে পরম বন্দর।

তাই আমার সময়ে সময়ে এখনো সন্দেহ উঁকি মারে ছোরাবাণী যে আমাদের মতন প্রকৃতির মানুষ যারা তারা কি স্বধর্মের পথে চলতে পারে রোগমুক্তি হ'বে? উত্তরে "না" বলা সহজ, কিন্তু তাতেও কোনো পরিষ্কার সমাধান মেলে না। কারণ আমরা সবাই চাই শান্তি হারাতে। কবিত্বের তাকে পুলক আছে, দুঃখ আছে, জ্বালা আছে—কিন্তু নেই ঘানি, নেই শান্তি। তারাটা অবশ্যই নয় কারণ শকুন্তলা পড়ে আমারই মনে তাই ওকে একটু বেশি বেজেছিল সব আবেগ উচ্ছ্বাসের মাথা কাটিয়ে কিল খেয়ে কিল চুরি ক'রে চুপ ক'রে যাওয়া। সঙ্গে সঙ্গে ওর ছোরাচও লাগল আমাকে। ও যদি হ'ত শ্রীমতী বিমলি বাগ্‌নি তাহ'লে শ্রীযুৎ অসিতকুমারও হয়ত অন্যায় ক্রুদ্ধ মহাশ্বেতার ছদ্মে কথার জলন্ত উৎসাহে চাক দিয়ে বসতেন না লোহনলালের মতন জোয়ানকে মুহ্যং মেহি। সেদিন সমসেট ম'মের একটি চমৎকার গল্প পড়লাম। তাতে এক শিল্পী বলছেন আর পাঁচজনের দিকে তাকিয়ে: "We are the only people who count. We give the world siginificance you are only the raw material."

ঠিক কি সোহনলাল বর্ণীয় জনতার প্রতি আমার মনের ভাব!—তাই আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে। ব'লে ফেলেছে লোকটা নিজে মস্ত শিল্পী তো! কিন্তু এম্‌নি ক'রেই কি হাটে হাড়ি ভাঙবে তাই ব'লে? শিল্পীরা হাড়ির খবর রাখা ভালো হ'তে পারে কিন্তু তাদেরো যে ক'রে খেতে হবে এটা তোলা কি ঠিক?

শকুন্তলা চ'লে গেলে তাকলাম গুরুদেবকে আগে ফিরে ব'লে রাখি। কিন্তু ফের সেই অভিমানে বাধল্। ছুটো ফুল তুলব এ আবার বলব কী? তাছাড়া সোহনলাল এ নিয়ে গোল পাকাবে জানতাম। ঐ ফের সেই ছোঁয়ার লোভ। কিন্তু হয়ত নিছক ছোঁয়া ছাড়াও কিছু আছে ব্যাপারটার মধ্যে। Raw material নিয়ে আমরা করব কী ছাই যদি তা দিয়ে গড়তে হয় শুধু সার সার নিরীহ গড্ডালিকা প্রবাহের

মুক্তি? মাঝে মাঝে একটু আধটু তাল না ঠুকলে চলে? আশ্রমে থাকোনি তো ছাওয়াপাখী! মিটিয়ে যাবার ভয়ে তটস্থ হ'য়ে থাকার কী দুঃখ তাই জানাব না। শুধু দুঃখ নয় সে—পাছে সেকালে সেবাতেৎ হ'য়ে যাই ভগবানের নাম করতে করতে—কিন্তু থাক এত কথা তোমার কাছে বলার মানেই হয় না—কারণ এ তুমি কিছুতেই বুঝতে পারবে না। শুধু তুমি কেন কোন আশ্রমে যারা বহুদিন বাস করেনি তারাও বুঝবে কি না সন্দেহ, কী দারুণ অবস্থি এ! আমি তত্ত্ব পাইনে ব'লে অহঙ্কার করি প্রায়ই—তাই হয়ত ভগবান এ সদাতত্ত্বের উত্তপ্ত ঘন্ত্র করেছেন আমার নিত্য বাড়ি ফাঁকি পাতে অবশ্য, পাছে আমি তাঁকে মেরুদণ্ডহীন ভাঁবেগার হ'য়ে পড়ি। না—ঠিক করলাম। গুরুদেবকে জানাতে গেলাম কী দুঃখে? আমার কুটীরের মধ্যে চাঁপাগাছ তার ফুলে আমার অধিকার নেই? এ অসহ্য। এ নিয়ে যদি বেশি গোল বাধে যুথিকা এখানে আমার ঠাঁই নেই—এ রকম সদাসচকিত হ'য়ে থাকার চেয়ে হেস্তনেস্ত একটা হ'য়ে যাক না, মন্দ কি? ভগবান কি শুধু এখানেই আছেন? এখানে ঠাঁই না পাই অন্যত্র যাব, ক্ষতি কি? ভগবানকে পাওয়াই মুখ্য—কী পথে, তাঁকে পাব সেটা তো গৌণই বটে।

এই সময়ে কোঁকের মাথায় ফের ভুলে গেলাম গুরুদেবের করুণার কথা। ভুলে গেলাম—কখনো তিনি আমার মনে এতটুকু আঘাত দেননি—কারুর মনেই যেন না। ভুলে গেলাম আমার সহ দুরন্তপনায় তাঁর অত্যন্ত ক্ষমার দৃষ্টান্ত। ভুলে গেলাম তাঁর একটি কথা যখন একবার আমি তাঁকে বলেছিলাম কোনো অপরাধ ক'রে যে, এ ধরণের উদ্ধত অপরাধ যে করে তার কোনো আশা নেই আশ্রমের দোরে ফিরে আসার। কাজেই আমাকে বিদায় দিন আমি যেখানে চোক চ'লে যাই। তাতে তিনি শুধু বলেছিলেন: "যেতে চাও যাও। কিন্তু যখনি ফিরে আসতে চাও এসো। আর মনে রেখো আমি শুধু চাই তুমি ভগবানকে পাও—আমার যোগের পথেই তাঁকে পাও বা অন্য যোগে তাতে কী যায় আসে? তাছাড়া তুমি যে-অপরাধই করো না কেন অপরাধের জন্যে আমার এখানে কারুর ঠাঁই হবে না এ হ'তে পারে না।"

"খুটির জোর" কথাটা এবার মনে হলো ছায়াপাখী। দেবতা আমাদের অমৃতত্বও দিলেও আমরা তাকে অমৃতের জন্যে না চেয়ে চাই তাঁড়টার জন্যে। তিলুরের অসুরেরা তাইতো ক্ষেপে উঠে বলে: এরা আবার দেবতা কোন্‌খানে? আমি যদি না জানতাম যে এ আসর বৈধে আমার পরাজয় অসম্ভব তাহ'লে হয়ত সোহনলালও রুখে উঠত না: আমার মধ্যে দেবতা দেখিয়ে না দেলে ওর মধ্যেকার অসুর এগিয়ে আসত না। তাহ'লে হার্মনি হ'ত কিন্তু ড্রামা? ড্রামার স্বাদ যারা সত্যি পেয়েছে তারা তার ওঠাপড়ায় বিমর্ষিত হ'লেই কি মনে প্রাণে বলতে পারে: "সকলি গরল ভেল?" যাক্।

পরদিন শকুন্তলা ভোরবেলাই এসে আমার এখানে চা খেল। তখনই সে ফুল নিয়ে যেতে পারত কিন্তু তাহ'লে সংঘর্ষ ঠাঁই পায় কোথায়? তবু সংঘর্ষের মধ্যে একটা বিষাদ অশান্তিই তো আছে। তাই ও একবার বলল আধলা আদলা ক'রে: "থাক দাদা।"

"কেন?"

"ভয় করছে একটু একটু।"

ওঃ! শুনেই আমার ঘুমিয়েপড়া বীরত্ব খাড়া হ'য়ে উঠল, বললাম হেসে নাটুকে ভঙ্গিতে

"কে সে যত তুমি মোরে যে দেখায় ভয়?"

শকুন্তলা হেসে ফেলল: "তুমি বড় ছেলেমানুষ দাদা! ভয় কি আমার বওকে?"

"অবে?"

"তোমার ভাষার যে-খুঁটিতে সে বাঁধা তাকে।"

উত্তর দেবার আগেই সোহনলালের অভ্যুদয়। সেদিন ওর সঙ্গে সেই যে একটু মনান্তর হয়েছিল তার পর থেকে আমরা পরস্পরকে একটু এড়িয়ে এড়িয়েই চলছিলাম। আশ্রমের এ আর এক মহামুস্কিল। জনারণ্যের জগতে ভিড় হলেও যেমনি ইচ্ছে এড়াবার পথ আছে। আশ্রমে নৈব নৈব চ। যাদের মুখ দেখতেও খারাপ লাগে তাদের সঙ্গে আলাপ না হয় তবু লেন দেন নেই কিন্তু অনেকেরই তো ঘর করতে হয়—অভিমান জয় করার এ একটি মহাপথ। কুসুমাবৃত পথ এ নয়—কাঁটাও এপথে এক আধটা নয়—কিন্তু তবু এপথে চলতে যে নারাজ নয় তাতে হাতে কলমে সে কিছু পায়ই।

কাজেই সোহনলালকে দেখে ইচ্ছেমত করতে পারলাম। এ কম কথা নয়। কারুর ও পাড়া না দিয়ে মুখ ফিরোলো। তবু মনকে বললাম: "মন শান্ত শান্ত শান্ত—"মনোরোধিহতে লোকো"—অর্থাৎ সবকাজই নিরুদ্বেগে করতে হবে হে মন আমার!

কিন্তু কোথায় গীতা গাওয়া আর কোথায় সুন্দরী বলনায় পৃষ্ঠপোষক হওয়া? সব কাজ নিরুদ্বেগে করা যায় না। খাওয়া যায় নিরুদ্বেগে, বেড়ানো যায় নিরুদ্বেগে কিন্তু কে কবে কারুর পানে চুমুক দেনিয়ে দিয়েছে নিরুদ্বেগে? ও হয় না। সব কাজই ভগবানকে অর্পণ করা চলে না। আর তাদেরই নাম অপকর্ম। কর্মই সাধনার অর্ঘ, অপকর্ম নয়। ভাল ঠোকাকে কোন্ কর্মের দলে ফেলা যায় বলতেই পারছ।

এবার শেষ অধ্যায়ের পালা।

সোহনলাল পাছে উঠছে না উঠতে আমি বেশ নিরুদ্বেগ উদাত্তস্বরেই বললাম: "শকুন্তলা! তোমার ফুল নিলে না?"

ও চকিতে আমার দিকে কটাক্ষ করল? সমর্থে ই'ক মিথ্যে বলেন নি। সব আর্টই পুরুষ মেয়েদের চেয়ে বড় কেবল এই একটিতে ছাড়া। এখানে ওরা আমাদের সঙ্গে পাঁজা রেখে খেলে আমাদের বাজি মাৎ করতে পারে। এ-পুরুষের কথা ব'লে উড়িয়ে দিও না। কারণ এ হ'ল মানুষের চিরন্তন অস্তিত্বের কথা। একথার মানে নয় যে পুরুষ অভিনয় করে না। অভিনেতা আমরা সবাই—শেক্সপীয়র অকারণ জগৎকে রঙ্গমঞ্চ ব'লে একশাল হাসেননি। যেখানে প্রত্যেকেই চায় অপরের চোখে বড় হ'তে অথচ বড় হবার সত্যি কোনো যোগ্যতা যেখানে নেই সেখানে বড় হবার ভঙ্গি না ক'রে উপায় কী বলো? বিশেষ ক'রে আমাদের মতন কবি শিল্পীদের চলনে বলনে সাজসজ্জা ব'লে দাঁড়ায় তো জলভাতেরই মতন—মন যদি বা আপত্তি করে, করে অতি মৃদুস্বরেই। কিন্তু সব কথা মেনেও তবু বলতেই হয় যে মেয়েদের এ-সাজসজ্জায় কেমন যেন একটা

স্বভাবসিদ্ধ অনিশ্চিতপটুতা আছে। এখানে ladies are "born great," gents at best "attain greatness" আর কি—ঐ শেক্সপীয়রেই যোক্ষম ইঙ্গিত।

শকুন্তলা আমার দিকে তাকিয়েই ধরল cue একবারে তৎক্ষণাৎ-বলা রিহার্সালে। বলল: "কপালখানা! ভুলো কি একা তুমি দাদা! এখানে এলাম ফুল নিতে, অথচ ভুলে ব'সে আছি।" ব'লে অতি সহজ ভঙ্গিতে সরলা প্রস্থানোদ্যতা চললেন, যেতে যেতে গাছতলায় ফুল কুড়ুতে। মুখে তখন ওর সেই প্রত্যুৎপন্নমতি আলো যে কোনোদিন জানে নি ছায়া ব'লে কিছু আছে। ছবিটা একবার কল্পনা করো ছায়াভীরু, নিজে ফুলচয়ননিরতা পূজারিণী আশ্রম-বালিকা যার একমাত্র উদ্দেশ্য সুন্দর ফুল তোলা দেবতার জন্যে! উপরে গাছের ঘন পাতার মধ্যে আঁকশি হাতে সকরুণ বীর সোহনলাল—আহা যেন মেয়ের কোলে বিজলি বাতি! আর অদূরে দণ্ডায়মান পূজারিণীর রক্ষক শ্রীমৎ অসিৎকুমার যোগপন্থী—যে দেখছে পূজারিণীর বুকের খাঁচলের ওঠাপড়া—কী হয় কী হয়! এ হেন নাটকীয় পরিবেশ সংসারেই বা কটা হয় বলো দেখি—যোগাভ্রষ্ট তো যোগাভ্রষ্ট!

সোহনলাল প্রথমে একটু আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকাল। তারপর শকুন্তলার দিকে। অতঃপর আঁকশি নামিয়ে একেবারে চুপ—খানিকক্ষণের জন্যে। তারপর ফের ফুল তুলতে লাগল। শকুন্তলা তখন একটি একটি ক'রে ফুল কুড়িয়ে তার খাঁচলে তুলছে। আমি বললাম চেঁচিয়ে: "ঐ ঐটে নাও—ঐটে বেশ বড়।" সেটি সোহনলালেরই আঁকশি দিয়ে তুমিসাৎ-করা সবে-পড়া ফুল।

ইচ্ছে ক'রেই ব'লেছিলাম বৈ কি। চাইছিলাম তো একটা এস্পার ওস্পার।

সোহনলাল আর পারল না, বলল হেঁকে: "ও ফুলে হাত দিও না।"

আমি বললাম: "কেন?"

সোহনলাল: "ও ফুল আমি পেড়েছি।"

আমি (হেসে): মনে পড়ছে শকুন্তলা! প্রথম গোয়ালিনী কী বলেছিল? কার গরু?—না যে দুধ খায় তার?

সোহনলাল (আমার দিকে চেয়ে): মানে?

আমি: মানে ফুল কার তা বলা শক্ত বটে, তবে যে আঁকশি দিয়ে পাড়ে তার যে নয়—এটুকু বলতে হ'লে প্রফেট হ'তে হয় না।

সোহনলাল: জানি, কিন্তু এ ফুল যাঁর জন্যে তুলছি তিনি কে তুমি যেন ভালো ক'রেই জানো।

এখানে আমাকেও একটু বেকায়দায় ফেলল বৈ কি। দুষ্টু বুদ্ধির হাতে হাতে শাস্তি যেন দণ্ডবৎ। কিন্তু বেঁচে গেলাম তার পরেই ওর ভুল চালে: ও বলল শকুন্তলাকে: "তাছাড়া তুমি বাইরের লোক—আশ্রমের কিছু ছুঁও না।"

আমি সুযোগ পেয়ে যেন লাফিয়ে উঠলাম: "এ-ও কি বলছ তুমি গুরুদেবের মুখপাত্র হ'য়ে?"

সোহনলাল: তুমি কি বলতে চাও ও বাইরের লোক নয়?

আমি : আমি বলতে চাই শুধু এই যথা যে যাকে আমি বোন ব'লে নিজে ডেকে এনেছি তাকে ঠেস দিয়ে যদি একটি কথাও তুমি ফের বলো তো (সংযম ক'রে) দেখতে পাবে।

সোহনলাল (একটু থতমত খেয়ে) : বেশ অসিত তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া নেই। কিন্তু তুমি আলো যাকেতাকে আমি গুরুদেবের ফুল ছুঁতে দিতে পারি না।

আমি (শকুন্তলাকে) : ঐখানে একটা চমৎকার ফুল নিও।

শকুন্তলা কিন্তু একটু বিপন্ন বোধ করছে তখন। আমি টপ্ ক'রে দিয়ে বললাম : এই নেও ফুলে হাত দিচ্ছে এবার কোনো বাইরের লোক নয়।

সোহনলাল। (গাছ থেকে তাকিয়ে প'ড়ে) তুমি কি বলতে চাও আশ্রম তোমার! আর ঐ মেয়েটি—

আমি। সোহনলাল! আশ্রম কার সে নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করতে আমি রাজি নই। আমি কেবল এই বলতে চাই যে বাড়ি আমার আর নাম সম্বন্ধে তুমি চাষার ভাষায় কথা কইছ সে ভদ্রমহিলা এবং আমার বোন।

সোহনলাল। (এগিয়ে এসে) বোন! জানা আছে। এ আশ্রমে স্থান নেই নাস্তিকদের।

আমি। না থাকলে আমারও স্থান নেই। শকুন্তলা! ঐ ঐখানে আরও দুটো ফুল আছে।

সোহনলাল। (চেঁচিয়ে) কী! তবে আমি—

হঠাৎ আমার সেই সুপ্তসূত্র জানা ডাক্তার বন্ধুর উদয়। ভাগ্যবানের বোঝা বন ভগবান।

ডাক্তার। (আমার দিকে তাকিয়ে) ওকি ব্যাপার অসিত বাবু? চেঁচামেচিতে কি ভদ্রদের টিকতে দেবে না নাকি ঐ বুনোটা!

সোহনলাল। মুখ সামলে—

ডাক্তার। Shut up! (আমার দিকে তাকিয়ে) কী হয়েছে অসিত বাবু? (বলেই শকুন্তলার পানে চেয়ে) হুঁ। ওঁকে অপমান করেছে? (শকুন্তলার তখন চোখে আগুনজ্বলা জল—ঠোঁট কাঁপছে রাগে)

ডাক্তার কিলেও কেরত। শকুন্তলার রূপও একটা সহজ ব্যাপার নয়। সে একটু ওর দিকে তাকিয়েই সোহনলালের সামনে এগিয়ে এসে কুটীরের গেট দেখিয়ে বলল : এই! নিকালো!

সোহনলাল। মুহ সামালকে—ব'লেই চক্ষের নিমেষে পড়ল ওর ওপর ঝাঁপিয়ে। কিন্তু চোখের ডাক্তার তারও আগে কী রকম বেঁকে কী যে করল বুঝতে পারলাম না—কেবল বোঝা গেল তার পরিণাম। সে চোখে

না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। ছোট্ট বন্দুক থেকে যেমন লম্বা তীর শাঁ ক'রে বেরিয়ে যায় ঠিক তেমনই ওর মুখনিসৃত লম্বা মানুষটা বেঁটে ডাক্তারের হাত থেকে যেন ছিটকে ঘুরে ধমাস ক'রে পড়ল সাহেবদার দুহাত ঘুরে—একেবারে চিৎ। শকুন্তলা রাগ ভুলে খিল খিল করে হেসে উঠল—বাস্তবিক হাস্যরসিক কঠোরাদপি হ'লেও মৃদুনি কুসুমাদপি তথা তৎকৃতিতে পড়েছি কিন্তু রণাঙ্গণে রৌদ্ররসের পাষাণ বুক ফুড়ে এমন হাস্যরসের ফোয়ারা ফিনকি দিয়ে উঠতে পারে কেউ কখনো দেখেছেন কিনা খবর পাই নি। যাই হোক শকুন্তলার হাসিতে আমি যেন খুসি হয়েই যোগ দিলাম। ডাক্তারের বিজয়দীপ্ত মুখে বেশ চিত্তসংকার আত্মপ্রসাদের জ্যোতি উঠল ফুটে। শকুন্তলার দিকে চেয়ে বলল: 'কের যদি মোষটা কোনো গোল করে তো আমাকে শুধু একটু খবর দেবেন।" ব'লে নমস্কার ক'রেই প্রস্থান।

সোহনলাল একটু বাদে উঠে মুখ নীচু ক'রে খুড়োতে খুড়োতে চ'লে গেল।

তারপর—কর্মফল। হে কং আত্মগ্লানি! শকুন্তলাকে কেন এ শুকথা দিতে গেলাম আমি! ছি ছি। অবিশ্যি আমি ওর গায়ে হাত তুলিনি কিন্তু হাসলাম তো। সোহনলালকে আমি প্রায়ই চাষা বলে থাকি কিন্তু এখানে ওতে আমাতে কী তফাৎ রইল? হেসে উঠলাম ওর তুমিসম্বন্ধে! আচ্ছা আমিকে চরম একটু বেশি প্রশ্রয় দিচ্ছি—বলবে তুমি—যেহেতু মানুষ হঠাৎ পড়লে না হেসে কেউ পারে না। না হাসাতে তত আপত্তি নেই কিন্তু তার পরে ওকে নিয়ে যত ক'রে তুলে আনতে তো পারতাম। যতই বলি না কেন ও যে আমার গুরুভাই আর শকুন্তলা আমার গুরুবোন নয় এ তো সত্যি। তাই বাইরের লোকের মান রাখতে ঘরের লোকের মানহানি হ'ল না কি! তুমি হয়ত উত্তরে বলবে: এখানে ঘরের লোক বাইরের লোক প্রশ্নটাই অবান্তর। বললে একটু ভুল করবে। কারণ যতই বলি না কেন ছাবাবাদী, খ্রীষ্টদেব বলেছিলেন একটি দামি কথায় এক কথা: যে, a house divided against itself can not stand—এ উক্তিটি বিশেষ ক'রেই খাটে আশ্রম সম্পর্কে। সাথে একজনও সত্যি ভগবানকে চায় কি না সন্দেহ। গুরুদেব যাদের ঠাঁই দিয়েছেন তাদের যে দোষই থাক না কেন ভগবানকে তারা পেয়েছে কোথাও না কোথাও। এ যে চায়, তাঁর কাছে তার শত খুন মাপ। কারণ বিদ্যা প্রতিভা জাতি কুলশীলমান রূপ শক্তি এসবই তাঁর কাছে অবান্তর। তিনি বলেন ভগবানকে সত্যিকার চায় কিনা এইটেই তিনি দেখেন সব আগে। যতই বলি না কেন, এ না মেনে তো উপায় নেই যে শকুন্তলা ভগবানকে তেমন ক'রে চায় নি যেমন ক'রে ও চেয়েছে, হয়ো উষ্ণকে। অন্যদিকে সোহনলাল অস্ত্র ভাষা পরনিন্দায় অতিমুখর অসহিষ্ণু সবই মানি তবু এই নীরস আশ্রমে যে এত ঝগড়াঝাঁটি করেও এতদিন টিঁকে রয়েছে এর মধ্যে একটা আশ্চর্য আত্মদমন আছে মানতেই হবে। এ হেন লোককে আমি কিনা মার খাওয়ালাম! অথচ আশ্চর্য খানিক আগেও ওর ভণের দিকটার কথা মনেও হয় নি। মানুষ কত সহজে অন্ধ হয়! ভাবতেই মনে হ'ল: বেচারি—ও-ও তো আমার ভালো দিকটার সম্বন্ধে ঠিক এমনিই অন্ধ হয়েছে শুধু আমার উপর রাগ করার দরুণ। কিন্তু একাধে নিজেকে অন্ধ ভাবতে এত আত্মগ্লানি এল—তবু মানি না, লজ্জা—যে সইতে পারলাম না, ধরলাম ওকালতি: এ বাড়াবাড়ি হচ্ছে, ওকে আমি মার খাওয়ালাম কেমন করে? এ তো ওর নিজেরই কর্মফল! ইত্যাদি।

প্রথমে এর ফলে যে একটুও সান্ত্বনা পাই নি তা নয় কিন্তু গুরুদেবের সংস্পর্শে আসার এই একটা ফল আমি প্রত্যক্ষ করেছি ছায়ারাণী যে আত্মপ্রসাদের দিনে তাঁর দৃষ্টান্ত আমাদের বড় একটা কাজে না এলেও অনুতাপের দিনে তাঁর সংযম ও ঔদার্য ভুলতে পারি না। বলেছি এই একটা দম্ভ ছুবিয়ে যে আত্মবঞ্চনা যে-সাধক সত্যি চায় না সে একটু একটু ক'রে পারই পায় সেই আলো যার প্রসাদে সে দেখতে পায় কোন্ অচিহ্নিত পথ বেয়ে হানা দিয়েছে কুযুক্তির দলবল। শুনেছি এ হয় নাকি গুরুদেবের যোগবলে। এ-যোগবল কী বস্তু আমি জানি না। শোনা কথায় পরে শ্রদ্ধা রাখতে বহু চেষ্টা করেছি কিন্তু যখন দেখি সে-কথা কোনো-মতেই জানার কোঠায় আসতে নারাজ তখন কিছুতে পারি না বজায় রাখতে। তাই যোগবলের অনুভূতির সত্যাসত্য যেটুকু জানি তাইই এলাকায় থাকা ভালো। এই চৌহদ্দির মধ্যে অনেকবারই উপলব্ধি করেছি যে চাইলে পরমের মুহূর্তেই আসে এমনি কোন আলো যার ইসারায় চলা কঠিন হ'লেও অসম্ভব নয়। তাই কুযুক্তি হানা দিতেই আমি দেখতে পেলাম এই আলোতে কে যেন সব বলাচ্ছে আমাকে দিয়ে। মার আমি খাওয়াই নি? আমার সাধ না থাকলে কি বাইরের একজন এসে আমার বাড়িতে আর একজনের গায়ে হাত তুলতে সাহস করে?

মানুষ: পশুপাখি ও এতটা শুরুও আমি সত্যিই চাই নি—কিন্তু এটুকু ধীশক্তিও কি আমার থাকা উচিত ছিল না যে গুরুদেবের প্রাণসাধনার প্রতিষ্ঠিত যে-পীঠস্থানে সেখানে এধরণের বেয়াদবির স্থান নেই? কুযুক্তি কের মহিমা হ'য়ে উঠল: তাই ব'লে সে কী ইচ্ছে করবে? হাসি এল: এরি নাম বুঝি শাক দিয়ে মাছ ঢাকা! কে না জানে সাধকদের কারুর এক্তিয়ার নেই পরকে সাজা দেওয়ার—আমাদের দণ্ড পরের শাসন সংশোধন নয়—নিজের শুদ্ধিসাধন আত্মদমন—পদে পদে।

সারারাত পারলাম না ঘুমতে। শেষরাতে স্বপ্ন দেখলাম অন্ধকার শ্মশানে ঘুরে বেড়াচ্ছি আলোর তৃষ্ণায়। সে যে কী কষ্ট ব'লে বোঝাতে পারব না তোমাকে। সংসারে দুঃখ কষ্ট আছে নিশ্চয়ই কিন্তু সব ছেড়ে একটা কিছুর উপরে সেখানে ভর নেই। কাজেই একটা অবলম্বন গেলে আর একটাকে ধরা যায়, সেটা গেলে আর একটা—সংসারী আশার ছলাকলা অশেষ। কিন্তু যোগের গতি একমুখী—সংসারের যতরকম বিচিত্র আশা ভরসা আছে সবের মায়া কাটিয়ে একটি বিন্দুতেই তাকে মন রাখতে হবে—কেবল সেখানেই নিশ্চয় উদ্দেশ মেলে ব'লে। কাজেই এহেন ঐকান্তিক অভিযানে যখন মনে হয় যার ভরসায় সব ছাড়া সে মুখ ফিরিয়েছে তখন সে যে কী যন্ত্রণা—কিন্তু না এসব তোমাকে বলা আমার উচিত নয়—কারণ তুমিও দুঃখ কম পাও নি। কিন্তু তবু বলব ছায়ারাণী যে তোমার আশার তরীতে একটু আধটু জল ঢুকলেও বানচাল হয় নি সে। আমার হয়েছে এমন কথা বলছি না। কিন্তু যোগের পথে এমন কালো তুফান প্রায়ই আসে যখন মনে হয় তরাডুবি থেকে বাঁচা অসম্ভব। কিন্তু সে-দুঃখের কথা ব'লে বোঝানো যায় না। তবুও বলি। কেন? কথা বলতে হয় ব'লে; আর কোনো কারণ আমি খুঁজে পাই নি—অন্তত আজ পর্যন্ত। যাক এবার উপসংহারটুকু বলি।

ঘুম ভাঙতেই আলো জ্বালিয়ে চিঠি লিখলাম মোহনলালকে—"অকুণ্ঠে" ক্ষমা চেয়ে। এবার হাসি পাচ্ছে কিন্তু। প্রফেসর সাহেবরা যদি জানতেন কত কর্মভোগের ফলে কুণ্ঠোর্মির অকুণ্ঠ হবার পথে কুণ্ঠা কাটে! থাক্।

মোহনলালের কাছে নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাথরের মতন ভারি মনটা হ'য়ে গেল পালকের মতন হাল্কা।

ধর্ম যখন যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন দুনিয়ায় সবচেয়ে আশ্চর্য হ'তে হয় কিসে, তখন তিনি বলেছিলেন :

প্রতিদিন দেখি—বসুধায় চলে একে একে সবে মরণের পথে, তবু
জনে জনে ভাবে সে চির-অমর— আশ্চর্য কী আছে এর চেয়ে প্রভু?

আমি হ'লে কিন্তু বলতাম :

প্রতিদিন দেখি—হ'লে নত হয় সহজে বিনয় করতলগত, তবু
করি' বারি ভর করি পরাজয়—আশ্চর্য কী আছে এর চেয়ে প্রভু?

• •

চিঠি লেখা শেষ ক'রে সবে নাম সই করেছি এমন সময়ে শকুন্তলার আবির্ভাব। হাতে তার কাশ্মীরী ফুলের সাজি, পায়ে—পাখার ছন্দ, মুখে প্রভাতী আলো। একটু পরেই মোহনলালের অনুবাদ। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গাছতলায় এসে দাঁড়িয়ে ম্লান মুখে উঠল গাছে—কণ্ঠে। আমি প্রথমে চমকে উঠেছিলাম। এত গঞ্জনার পরদিনেই ও রোজকার মতন আসতে পারবে এ আমি ভাবতেই পারি নি। শ্রদ্ধা একটু হ'ল বৈকি? আমি যা পারি তা ও পারে না এই কথাই এতদিন ভেবে এসেছি। ভেবে দেখিনি ও যা পারে তা আমি পারি কিনা। অনুতাপ প্রবল হ'য়ে উঠল। ভাবলাম—এর পরে আর কাজ কী চিঠিতে? মুখে বলাই তো ভালো: কিন্তু সেখানে এল কুণ্ঠা। মনে মনে বললাম,—নাঃ, চিঠিটা ওর হাতে দেওয়াই ভালো সব দিক দিয়ে। সেখানে আবার এল দ্বিধা। শকুন্তলা যে একেবারে সামনে। যদি ভাবে—গুরুদেব আমাকে কিছু বলেছেন? কাজ কি! ও চ'লে গেলেই দেওয়া যাবে—তাড়া কিসের?

ফুল নিয়ে হাসিমুখে হেলেদুলে চ'লে গেলেন বিজয়িনী। হঠাৎ ডাক্তারের উদয়—

"কি ব্যাপার হে? সুপ্রভাত।"

"সুপ্রভাত!" বলল ডাক্তার গাছের দিকে চেয়ে চাপা সুরে। কের এসেছে চাষাটা?

আমি (মৃদু-সুরে) হাঁ—

ডাক্তার: Unthinkable, জানো—ওটা গুরুদেবের কাছে গিয়ে লাগিয়েছিল।

আমি (সকৌতূহলে): বটে? তারপর?

ডাক্তার : তারপর আর কি ? গুরুদেব নিশ্চয় ওকে বকে দিয়েছেন ! তোমাদের তো কিছু বলেন নি ?

আমি : না।

ডাক্তার : হিপ্—হিপ্—

আমি : চুপ্ চুপ্—ও শুনতে পাবে।

ডাক্তার : পেলেই বা !

আমি : না ভাই, কলহ-কাঁটির ঝের টেনে লাভ কী।

ডাক্তার : ওর উপরে রাগই করিনা কেন ও অপদস্থ হ'লে তাতে তো খুশিই আশ্রমেরই দুর্নাম।

ডাক্তার (একটু চুপ ক'রে থেকে) : সেকথা সত্যি। কিন্তু এক কাপ চা দাদা !

আমি : (হেসে) কাল তুমি যে নুরিদাসার রূপ ধরন দিলে দাদা, তাতে তোমার শ্রীমুখকমলে শক্তি থাকলে সুধার সরবৎ পাঠাই—

ডাক্তার : Please don't—it is our duty to teach people their places.

• • • • •

চ'লে গেল ডাক্তার, চা খেয়ে ছড়ি ঘুরতে ঘুরতে। কিন্তু তার পর থেকে—ও না ! কখন যে আমার মনের সুর গেছে বদলে ! বলি মিলেকে—কথা চাওয়াটা বাড়াবাড়ি ঠেকা—তাছাড়া সত্যিই তো ওর শিক্ষা পাওয়ার দরকার ছিল। মন একটু খুঁৎ খুঁৎ করে তবু ! ধনঞ্জয়ই এবার তাকে : "বোঝো না কেন ? ধরো যদি ক্ষমা চাইলে ফের ওঠে মাথা গরম হ'য়ে—হবে না শিক্ষাটা ব্যর্থ ? শুধু তাই নয়, তাতেও তো খুইয়ে আশ্রমেরই ক্ষতি।

যুক্তি অনবদ্য। কেবল একটা বেয়াড়া প্রশ্ন শুধু থেকে থেকে পাখারা দেওয়া মনের খড়খড়ি খুলে উঁকি দিয়ে যায় মুচকে হেসে প্রশ্নটা এই : চাবাটা প্রকৃতপক্ষে জানলে এসব যুক্তি মনে ঠাঁই পেত কি না ?

ইতি

তোমার অসি দা

আমার ছাত্র

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষের প্রতি মানুষের এই যে হিংসা, এই যে উদগ্র বর্বরতা আচরিত হচ্ছে সভ্যতার নামে, শতাব্দীর শিক্ষা সংযম এক মুহূর্তে যাতে করে ঝড়ের মত উড়ে গেল, উদগ্র লোভ, হিংসা ও লালসার এই যে নগ্ন মূর্তি দেখা গেল চোখে,—তাতে ঘমে গেলে চলবে না। মানুষ আছে এখনও, মানবতা আছে, মনুষ্য সমাজ থেকে লজ্জায় মুখ ঢেকে বিদায় নেবার সময় ভগবান এদেরই দিকে ফিরে ক্ষীণ আশ্বাসের বাণী শুনতে পান, শুনতে পেয়ে থম্‌কে দাঁড়ান।

আমাদের গণেশদাদার কথা বলবার যোগ্য বলে এতদিন ভাবিনি, কিন্তু আজ দেখছি গণেশদাদার ছবি আমার মনের পটে মস্ত বড় হয়ে ফুটে উঠেছে। এর আর একটা কারণ যে গণেশদাদা আমার ছাত্র।

গণেশদাদার নাম গণশা মুচি। আমাদের গ্রামের মুচিপাড়ার ছোট্ট খড়ের চারচালা ঘরে দুটি গরু ও চার পাঁচটি বাছুর এবং স্ত্রী পুত্র নিয়ে, উঠানে লাউমাচা পুঁইমাচা বানিয়ে, পুকুরে নেটে শাক তুলে, মেটে আলু ও কুলো ওল তুলে ছাটে বিক্রী করে সংসার চালাতো।

যখন পাঠশালায় পড়ি, তখন হরিশ ভট্টাচার্যমশায়ের বাড়ি গণেশ মুচি কুয়াশের কাজ করে। আমরা গণেশদাদা বলে ডাকতাম, অন্যলোকে বলতো গণশা মুচি। মিশ্‌কালো, দোহারা গড়ন, মুখে একপ্রকার শান্ত, দীনভাব, লাজুক নম্র চোখ দুটি, সর্বদাই যেন অপ্রতিভ, যেন কি একটা মহা অপরাধ করে ফেলেছে সে।

হরিশ ভট্টাচার্যমশায় কড়া প্রকৃতির গ্রাম্য গাঁতিদার। গণেশদাদাকে ডেকে বলছেন—এই গণশা—বাবুদাদলার জমিতে দোয়ার দেওয়া হয়েছে?

গণেশ অমনি হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে বলতো—আজ্ঞে না, বাবাঠাকুর। কাল তো মোটে লাঙল দেলাম—

—হারামজাদা এতদিন ঘুমুচ্ছিলে নাকে তেল দিয়ে? কবে বলিচি চষ্‌তে ও দুঁই?

—জমিত্তি লাঙল না লাগলি কি ক-অ-স্থবো বাবাঠাকুর। আজ সাঁজবাতির মধ্যি দোয়ার দিয়ে দেবাপি—

—না দিলে ছুতিয়ে তোমার আজ হাড় খুলে নোব বলে থাকে দেন।

গণেশদাদা আমরা যেখানে খেলা করচি সেখানে এসে হেসে বলতো—বাবাঠাকুর চটে গিয়েচেন।

আমি বলচাম—ও গণেশদাদা, ইংরিজি জানো?

—ইন্‌জিরি? ক'নে থেকে জানবো? মুই কি লেখাপড়া জানি!

—শিখবে?

—শিখিয়ে দাও দাদাঠাকুর তো শিখি—

—দেখো ওতার মানে ওপর।

—কি ?

—ওভার মানে ওপর, উড্ মানে কাঠ, কাউ মানে গরু—

গণেশদাদা মুখস্থ করতে লাগলো। ইউ পি পাঠশালার কুঞ্জ মাষ্টারের শেখানো যত বিদ্যা আমার মাথায় ভিড় করে তাদের উগ্রতায় আমাকে ব্যতিব্যস্ত করছিল, তা সবগুলো গণেশদাদার ঘাড়ে না চাপাতে পারলে যেন আমার নিস্তার নেই। সেই থেকে গণেশদাদার ইংরিজি শিক্ষার ভার আমি স্বহস্তে গ্রহণ করলাম। গোটা ওয়ার্ডবুকখানা গণেশদাদাকে কণ্ঠস্থ করবার যে কি দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা আমার। মুখে মুখে শেখানো ছাড়া অতিরিক্ত অন্য উপায়ে ছিল না, গণেশদাদার তাগাতেই বলি, 'মা সরস্বতীর বরের জন্যটা কখনো মাড়াইনি সে।'

গণেশদাদা কিন্তু শিখলো অনেক কথা। প্রতিস্পর্ধার প্রাচীন উপায়ে প্রায় তিনশখানেক ইংরিজি শব্দের ঐশ্বর্য্যে সে ঐশ্বর্য্যবান হয়ে উঠলো। আমিও শিষ্যগর্বে গর্ব্বিত হয়ে উঠলাম যথোচিত।

আমার সে-গর্ব্ব মাঝে মাঝে বড় অশোভনভাবে আত্মপ্রকাশ করতো, গণেশদাদার লাজুকতা ও অপ্রতিভ ভাবকে আরও বাড়িয়ে। যেমন একটা উদাহরণ দিই। হরিশ ভাঠোমশায়ের বাড়ি তাঁর বড় ছেলে ফুটুদা'কে বিয়ের শুভে কন্যাপক্ষ দেখতে এসেছে—দুতিনটি ভদ্রলোক, শ্যামনগরের কাছে কোথায় বাড়ি। আমরা ছেলেরা বলাবলি করলাম শ্যামনগর অর্থাৎ সহরের দিকে যতই বাড়ী হোক বাছাধনদের, আমাদের অজপাড়াগাঁ বলে যে নাক সিঁটকোবেন তা হোতে দিচ্ছি নে—দেখিয়ে দেবো এ গ্রামের একজন মুচি কুষাণও ইংরিজি কেমন জানে। সেই ভদ্রলোকের দল যখন হরিশ ভাঠোমশায়ের চণ্ডীমণ্ডপে বসে আছে, তখন আমি গণেশদাদাকে ডেকে বল্লাম—এই দেখুন, এদের মাইস্যার কেমন ইংরিজি জানে—

তাদের মধ্যে একজন কৌতূহলের সুরে বল্লে—তাই নাকি। দেখি—দেখি—

আমি অমনি বলি—গণেশদাদা, ওভার মানে কি ?

গণেশ হাত ওপরে তুলে বল্লে—ওপোর।

—ওয়াটার ?

—জল।

—স্কাই ?

—আকাশ।

ইত্যাদি।

এক ডজন শব্দের ক্ষীণ পুঁজি শেষ হোতেই আমি থেমে গেলাম। গণেশদাদার দিকে সহরের চালবাজ লোকদের সপ্রশংস দৃষ্টি পড়ুক—এই আমার ইচ্ছা। আমার উদ্দেশ্য সফল হোল; সহরে বাবুরা ওর দিকে চেয়ে চেয়ে বল্লে—বাঃ, বাঃ, এ লোকটি তো বেশ। কি নাম তোমার ? বেশ। এদিকে এসো—

ওরা চার আনা বকশিস করলে তখুনি। অর্থকরী বিদ্যা বটে ইংরিজি।...

সেই থেকে গণেশদাদার কি উৎসাহ ইংরিজি শেখবার। সাতদিনের মধ্যে আর এক ডজন শব্দ কণ্ঠস্থ করে ফেললে।

আর একদিনের কথা মনে পড়ে। শীতকাল। বাড়িতে রুটি হচ্ছে, দুধ আর গুড় দিয়ে খাবো বলে মনে খুব ফুর্তি। এমন সময় পীতাম্বর রায় জ্যাঠামশায়ের বাড়ি হৈ চৈ শুনে সেদিকে গেলাম। গিয়ে দেখি তাঁর চণ্ডীমণ্ডপের সামনে লোকে লোকারণ্য। পীতাম্বর রায়, হরিশ জ্যাঠামশায়, নবীন চক্রবর্তী প্রভৃতি বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরা চণ্ডীমণ্ডপে বসে। পীতাম্বর রায় খুব চীৎকার করছেন ও হাতপা নাড়ছেন। উঠানের মাঝখানে গণেশদাদা মুখ চুণ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ব্যাপার শুনে বুঝলাম পীতাম্বর রায়ের একটি গরু আজ দুদিন হারিয়ে গিয়েছিল আজ সেটা গণেশদাদার বাড়ির পিছনে মুচিপাড়ার বড় আমবাগান (যার নাম এ গ্রামে গলায় পড়ের বাগান) দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল এবং তার লেজ কে দা দিয়ে অনেকখানি কেটে দিয়েছে, বলকল করে রক্ত পড়ছে লেজ দিয়ে। এই অপরাধের সন্দেহ গিয়ে পড়েছে গণেশদাদার ওপর, কারণ প্রথমতঃ মুচিরা গরুর চামড়া বিক্রি করে, দ্বিতীয়তঃ, গরু গণেশদাদার বাড়ির পিছনে বাঁধা ছিল, তৃতীয়তঃ গণেশদাদা গরীব। সুতরাং গণেশদাদাই মাত্রে গরুটি কেটে চামড়া খুলে নেওয়ার উদ্দেশ্যে সেটাকে লুকিয়ে রেখেছিল তার বাড়ির পিছনের আমবাগানে। রায়ের কোপও সেই মেরেছে।

পীতাম্বর রায়ের ও হরিশ জ্যাঠামশায়ের যুক্তির মধ্যে যে ফাঁক ছিল, তা কারো চোখে পড়লো না। গণেশদাদার বক্তব্য প্রথমতঃ সুযুক্ত নয়, দ্বিতীয়তঃ তার বুদ্ধিশুদ্ধি (যার অস্তিত্বও তার কোনোদিনই নেই) লোপ পেয়েছিল, সুতরাং আত্মপক্ষ সমর্থনে সে পটুত্বের বিশেষ পরিচয় দিল না।

উঃ সে কি মারটাই মারলেন পীতাম্বর জ্যাঠামশাই ওকে, পা থেকে চটি জুতো খুলে! কত কাল কেটে গিয়েছে দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর কিন্তু আজও আমি চোখের সামনে গণেশদাদার বহুলা ও লজ্জাকাতর মুখ দেখতে পাই। মার বটে একখানা। শুধু শোনা যায় পীতাম্বর রায়ের তর্জন গর্জন এবং চটাং চটাং চটি জুতোর শব্দ গণেশদাদার পিঠে। পিঠ ফেটে রক্ত পড়তে লাগলো দরদর করে। তখনও পীতাম্বর জ্যাঠার থামবার চেহারা ছিল না, নীলু বাঁড়ুয্যের ছেলে মণিদাদা, জোয়ান ছোকরা, দৌড়ে গিয়ে পীতাম্বরের হাত ধরে টেনে এনে নিরস্ত করলে।

আহা, গণেশদাদা বসে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগলো। আমি জানতাম গণেশদাদা নির্দোষী। আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো গণেশদাদার কান্না দেখে। ইচ্ছে হোল পীতাম্বর জ্যাঠার কাণ ধরে কেউ এখুনি মুরগা করে দেয় তো আমার মনের রাগ মেটে।

এ সব বাল্যকালের কথা।

সারা বাল্যকাল ধরে দেখেছি গণেশদাদা লোকের ফাইফরমাজ খাটতে খাটতে দিনান্তে একখানা রাঙা আশটালের ভাত কায়ক্লেশে জোগাড় করছে। তাতেই তার কি খুশি।

—ও গণেশদাদা, আজ কি খেলে?

আমি হয়তো প্রশ্ন করি।

তখন গণেশদাদা আস্তে আস্তে হবে যেন কল্পনায় খাদ্যগুলো সে আবার পরম তৃপ্তির সঙ্গে আস্বাদ করছে।

—খ্যালাম? তা খ্যালাম মন্দ নয়। তোমার বড় বউদিদি রেঁধেছো অনেকগুলি। খ্যালাম ধরো (আঙুলের পর্ব্বে হিসেব রেখে) ভাত, শুক্তোর (গ্রাহের নাম) বাঙা ডাঁটা দিয়ে, কুমড়ো দিয়ে, পেঁজ দিয়ে কিঞ্চের ঝাল (তরকারি হিসেবে অদ্ভুত শুধু নয়, বিকট), বাঙন দিয়ে পেঁজ দিয়ে, কাঁচালংকা আর তেঁতুল। তা বেশ খ্যালাম—কি বলো?

—বেশ খেয়েচ, আবার কি খাবে?

কোনোদিন জিজ্ঞাসিত না হয়েও একগাল হেসে বলতো—দাদাঠাকুর, আজ খুব খ্যালাম—

—কি ও গণেশদাদা?

—কি বল দিনি?

গণেশদাদা সকৌতুকে আমার দিকে তাকায়।

—তা কি জানি? তুমি বলো।

—আজ তোমার বউদিদি রন্ধন করেন। উত্তের (উচ্ছে) শাক আর মরাকলা দিয়ে একটা তরকারি আর পান্তা ভাত।

খাবারটা লোভনীয় বলে মনে না হোলেও মৌখিক তারিফ না করে উপায় নেই গণেশদাদার কাছে।

খাওয়ার তো এই দশা—পরণে ময়লা ছেঁড়া কাপড় কিংবা গামছা ছাড়া আমি তো গণেশদাদার ছবি মনেই করতে পারিনে। অথচ ব্রাহ্মণপাড়ার অর্দ্ধেক কাজে গণেশকে না ডোলে চলেই না। বেশির ভাগই বাগ্গার।

—ওরে গণশা, আজ উঠোনের কাঠগুলো ঘরে তুলে দিয়ে আসিস তো?

—গণশা, গাছের নারকোলগুলো পেড়ে দিতে হবে ওবেলা।

—গরুটো পচ্চে গিয়েচে গে, তুই দুপুরবেলা একবার এসে গরুটো আজ এনে দিবি—বুঝ্‌লি।

—গণশা, আমার গাছের দুকাঁদি কাঁচকলা হাট থেকে বিক্রী করে দিতে হবে বাবা—

শুধু মিষ্টিকথা—ব্যস্! ঐ পর্য্যন্ত। কখনো গণেশদাদা মুখ ফুটে একটা পয়সা মজুরি এ সব কাইফরমাজ খাটার জন্যে চাইতো না। বরং বলতো—ব্রেহ্মণ দেবতা, ওনাদের পা ধোয়া জল খেলি স্বগ্‌গো। ওনাদের একটু সেবা করবো তার আবার পয়সা!

কিন্তু শুধু ব্রাহ্মণের নয়, আমি যে-কোনো জাতির সেবা করতে দেখেছি ওকে অম্লানবদনে। ব্রেহ্মণপাড়ার অর্দ্ধেক বুড়ি বিধবার মাথে তার সঞ্চিত তেঁতুলকাঠের গুঁড়ি কুড়ুল দিয়ে চালা করে দিতে দেখেছি। কত ক্রিয়াহীন মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণপাড়ার চণ্ডীমণ্ডপগুলি যখন অলস যুবক ও প্রৌঢ়দের পাশা দাবা ক্রীড়ার বিবিধ ধ্বনিতে অথবা দিবানিদ্রাতিভূত ব্যক্তিদের নাসিকাগর্জ্জনে মুখরিত, তখন গণেশদাদা কারো তেঁতুলগাছে তেঁতুল পেড়ে দিচ্ছে, না হয় কারো কলাইয়ের গাছ-বোঝাই গাড়ী চালিয়ে খামারে আনছে। গায়ে ওর সারাদেহ ভিজে, মাথার চুল ধূলিধূসর, পেটে পেট লেগেছে কারণ—এখনও খাওয়া হয়নি।

কখনো দেখিনি গণেশদাদা কারও সঙ্গে ঝগড়া করছে কিংবা চড়াগুরে কথা বলছে।

আমার বাল্যকাল কেটে গেল। কলেজে পড়ে দুটো পাশ করে গ্রামে ফিরে যেতে পথেই গণেশদাদার সঙ্গে দেখা কেলতলার মাঠে। গণেশদাদা গরু চরাচ্ছে মাঠের মধ্যে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে। পাশ দিয়েই আমার পথ। গণেশদাদাকে ডেকে বলাম—ও গণেশদা, চিনতে পারো?

—তা চিনতে পারবো না, ঠাকোমণি দাঠাকুর। কোলে পিঠি করে মানুষ করলাম আর চিনতি পারবো না। কত বচ্ছর দেখিনি। কোথায় ছিলে এ্যাদ্দিন আমাদের ভুলে?

—আমার বাড়ি। তুমি তো বুড়ো হয়ে গিয়েচ দেখচি। মাথার চুল পেকেচে হ্যাঁ গণেশদাদা?

—ওমা, তোমাদের কোলে করে মানুষ করলাম, তোমরাই কত বড় হয়ে গেলে—মুই আর বুড়ো হবো না? বয়েস কি কম হোল?

—ভাল আছ হ্যাঁ গণেশদা?

—হ্যাঁ ভালো। তোমরা সব ভালো?

গণেশদাদাকে এই বয়সে গরু চরাতে রেখে আশ্চর্য্য হোলাম। কারণ পল্লীগ্রামে গোরু চরানো হোল বিষয়কর্ম্মের প্রথম সোপান। সাধারণতঃ বালকেরা এ কাজ করে থাকে—তারপর ক্রমোন্নতির ধাপে ধাপে উঠতে সুরু করে। মোটামুটি দেটা এই রকম :—

১। গরু চরানো (১৭ বছর বয়েস পর্য্যন্ত)

২। জন খাটা (১৬।১৭ থেকে ত্রিশ বছর বয়েস পর্য্যন্ত)

৩। অপরের কৃষাণগিরি করা (২৫ ৩০ থেকে চল্লিশ পর্য্যন্ত)

৪। নিজের জমিতে চাষ আবাদ করা (এ সৌভাগ্য সকলের ঘটে না)

৫। বাড়িতে ধানের গোলা বাঁধা (যেমন অনেকেই ব্যবসা করে কিন্তু ধনী হতে পারে না, তেমনি চাষ অনেকেই করে কিন্তু গোলা বাঁধতে পারে না। এ সৌভাগ্য ক্বচিৎ ঘটে চাষীর ভাগ্যে)

৬। কিন্তু এ লিখচি কেন, এ ভাগ্য সকলের হয় না—ব্যবসাদার মাত্রেই কি টাটা-বিড়লা হয়? তবুও এটার উল্লেখ করতেই হবে—প্রত্যেক চাষীর স্বপ্ন, প্রত্যেক রাখালের অগস-মধ্যাহ্নের স্বপ্ন, প্রত্যেক দিন

মজুরের বর্ষা-দিনে এক হাঁটু জল-কাদায় ধান রোপন করতে করতে ক্লান্তি, অপনোদনের পথ—এটি উল্লেখ না করলে চলবে না। সেটি হোল নিজে মহাজন হয়ে নিজের সোনা থেকে অপরকে ধান কর্জ্জ দেওয়া।

এই উচ্চতম স্তর প্রাপ্তি বহুপুণ্যের ফলে ঘটে।

যাক্. কিন্তু গণেশদাদা এই বয়েসে বিদ্যারম্ভের প্রথম সোপানটিতে কেন, এ প্রশ্ন আমার মনে না উঠে পারলো না। পাড়াগাঁয়ে এই বয়সেও যারা গরু চরায়, বুঝতে হবে তারা ভাগ্যদেবী যারা নিতান্তই অবহেলিত, তারা নিতান্তই অভাজন। এ প্রশ্ন গণেশদাদাকে করলাম না, যদি ও মনে কষ্ট পায়। আমার কিন্তু মনে বড় কষ্ট হোল পকেশ গণেশদাদাকে পাঁচন হাতে তালপাতার ছাতি মাথায় গরু চরাতে দেখে।

গণেশ দাদা বলে—বোসো বোসো দাদা ঠাকুর। তামুক খাবা?

—ও শিখিনি।

—এতটুকু দেখিচি তোমাকে। কত বড়টা হয়ে গিয়েচ। হ্যাঁগে, দিগেন্ করো দিনি সেই ইন্‌জিরি? মনে আছে কিনা দেখি।

ওঃ, অনেক দিনের কথা—উচ্চ প্রাইমারি পাঠশালার সেই দিনগুলি কতকাল আগে অতীতে মিলিয়ে গিয়েচে। আজ পনেরো বছর আগের ব্যাপার সেই গণেশ দাদাকে ইংরিজি শেখানো। কি কি শিখিয়েছিলাম তাই কি ছাই আমার মনে আছে?

গণেশ দাদা কিন্তু হাসি-হাসি মুখে রিডারটুকুতে চেয়ে আছে আমার দিকে।

বল্লাম—তুমি বলতে আরম্ভ করো?

—ওতার মানে ওপর—

—কেন কেন তারপর?

—তুমি জিনোও দাদা,—আমি যদি—

—জল?

—ওয়াটার।

—আকাশ?

—বাই।

—হুঁ?

—ফিক।

গণেশ দাদার মুখে বিদ্রূপের পরিষ্কার হাসি। তুমি তো ঠকাতে পারলে না দাদা ঠাকুর এতদিন পরেও, ভাবটা এই রকম। আমি ভাবচি, এ-ইংরিজি শিখে তালপাতার ছাতি মাথায় গোচারণ-রত গণেশ দাদার কি উপকার হবে?

গণেশ দাদা বল্লে—বলো-বলো—

—পিপড়ে?

—পিপড়ে? ওডা তো শিখাও নি দাদা ঠাকুর। ও তুমি শিখাও নি। ও শিখিইলে, তা মুই এ্যাকটা ভুলিনি। তা ওডা মোরে শিখিয়ে দ্যাও পিপড়ের ইন্‌জিরি কি?

—এ্যান্ট।

—এ্যান্ট? এ্যান্ট-এ্যান্ট-এ্যান্ট-এ্যান্ট—

জিউলি গাছটার তলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য গ্রাজুয়েট আমি আমার পঞ্চকেশ গোচারণ-রত ছাত্রকে ইংরাজি ভাষার পাঠ দিতে দিতে বড্ড দেরি করে ফেলি, বেলা বার দেখে গণেশই বল্লে—তুমি এসো দাদাঠাকুর। মুই গরু কডায়ে জল দেখিয়ে আনি পোড়ার খালে—আর অনেক কথা শেখলনি—এ সব দেশ মুলুকের দেশ, ন্যাখাপড়ার কথা কেউ বলে না—মোর মত ইন্‌জিরি ক'জনে জানে, ওই তো সব রাখাল ছোঁড়ারা গরু চরাচ্ছে, কই ডেকে শুধোও না জলের ইন্‌জিরি ধাকের ইন্‌জিরি—সব মুলুকু দাদাঠাকুর—সব মুলুকু—

—পোড়ার খালে মাছ পড়চে আজকাল গণেশ দাদা?

—ওই হচ্ছে দুচারটো বান, ধরুই, ডেংচোকো—চলো না একদিন বস্তি যাই—

. . —যাবো। দু একদিন পরে।

—বে ক'ডা দিন গাঁয়ে থাকবা, মোরে লেখাবা কিন্তু—

—নিশ্চয়ই। এবার তোদেরকে চারজন ইংরিজি কথা না শিখিয়ে আর—

—তোমাদের বাপ মায়ের, আশিব্বাদে আ মুই শিখিচি, তাতেই মোর সামনে কেউ দাঁড়াতি পারে? ওই তো হিবু বয়াতির ছেলে ওস্মান গরু চরাচ্চে—ডেকে শুধোও না—

গণেশ দাদা দূরে গোচারণ-রত একটি তেরো-চোদ্দ বছরের বালকের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে।

• • • • •

গ্রামে এসে গণেশ দাদার কথা লোককে জিগ্যেস করলাম। ওর অবস্থা এত খারাপ হোল কেন? কাল শুনলাম ওর দুই ছেলেই মারা গিয়েছে। বুড়ো হয়েছে বলে লোকের বাড়িতে কৃষাণের কাজে কেউ রাখতে

চায় না। অম্বিকার বেনার বাবে সামান্য একটু জিটেসংসের জমি ছিল, তাও বিক্রি হয়ে গিয়েছে। নিজের লাঙল নেই বলে ভাগে চাষ করবার উপায় নেই—যার লাঙল নেই, তাকে বর্গা দেবে কে জমি? সুতরাং এ-অঞ্চলে বাধ্য হয়েই ওকে গরু চরাতে হচ্ছে।

গণেশ দাদার বাড়ি গেলাম একদিন। ও ঘরে বসে কি চাঁচছে—ঝুড়ি বুনবে। ঝুড়ি তৈরি করে হাটে বেচলে পয়সা হয় কিন্তু ও ঝুড়ি বুনছে পরের ব্যাপার। এ আমি জানি। এর একটা মস্ত কারণ ওকে পরের বাঁশ ঝাড় থেকে কঞ্চি কেটে আনতে হয়—অপরে তার দাম স্বরূপ নেয় একটা ঝুড়ি, না তো একটা গাছ-ঘেরা কঞ্চির ঠোঙা। গণেশ দাদার ঘরে কঞ্চির বাঁশের বেড়া, চালে খড় নেই—একটা চালকুমড়ো লতা উঠিয়ে দিয়েছে চালে, চালকুমড়োর ফুল আর ফল যথেষ্ট হয়েছে, লতাগুলো চাল ছাড়িয়ে এদিক ওদিক ঝুলে পড়ে বাতাসে দুলছে, একটা বাড়ি ছাগল ঘরের ছেঁচতলায় কাঁটাল পাতা পরম তৃপ্তিতে চিবুচ্ছে, ওর বৌ মুখকর্ম করছে—বেশ লাগলো আমার। ঘরে পেতল কাঁসারে সংস্পর্শ নেই মাটির কলসী, মাটির হাঁড়ি সরা, মাটির ডাবর, মাটির ভাঁড়ে জল রাখা আছে। ভাত খাব কলার পাতায় নয়তো চাষ্টোর বিলের পদ্ম পাতায়। আমাকে বলে—চালকুমড়ো একটা নিয়ে যাও দাদাঠাকুর।

—ও আমি কি করবো।

—নিয়ে যাও, বেশ সুক্তুনি করো তোমরা। মোরা সুক্তুনি রাঁধতে জানিনে। বামুন-বাড়িতে কত সুক্তুনি খেইচি আগে আগে! পস্তায় লাগে—

—কেন বউদিদি সুক্তুনি করতে জানে না?

—অত তেল মসলা ক'নে পাবো মোরা? দাদাঠাকুরের যাদন কথা। ও সব তরকারি কি মোরা খেতি জানি না পারি।

ওদের ঘরের দাওয়ায় একজন খুনখুনে বুড়ি ছেঁড়া কাঁথা গায়ে শুয়ে আছে অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছিলাম। গণেশ দাদাকে জিগ্যেস করাতে ও বলে—আরে ও সেই রতনের মা, ওরে চেনো না? রতন ঘর ছেড়ে পালিয়েচে এক বাগদি মাগীকে নিয়ে। ওর মা খায় কনে? কেউ দেখে না। দুদিন না খেয়ে ঘরের মধ্যে পড়েছিল। তাই ওরে এনে রেখে দেলাম মোর এখানে। চকির ওপর না খেয়ে মরবে পাড়া পিরতিবাসী—চকি কি ফাঁকা যায়? তাই ওরে এনে রেখে দেলাম। যদি মোদের জোটে, তোমারও একবেলা জোটবে। তাও নড়তে পারে না, জ্বর, হুর্দি, কাশি। একটু হুলেপাতি ওষুদ এনে দিয়েলাম বগানন্দপুরের ডাক্তার বাবুর কাছ থেকে। দু আনা দাম নিয়েচে—তা যদি মোদো উপগার হোলো দাদাঠাকুর—তুমি জানো হুলেপাতি?

—না আমি জানি নে। আচ্ছা আমি দেখবো এখন ওবেলা ওষুধের ব্যবস্থা।

—কি দেবো তোমারে দাদাঠাকুর তাই ভাবচি—

—কিছু দিতে হবে না। তুমি কথা বলো আমি শুনি—

কিন্তু কথা কইতে গণেশ দাদা জানে না। তার সংকীর্ণ জীবন ধারার ক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা সে সঞ্চয় করেছে আজ পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর ধরে, সে যতই সামান্য হোক, বলতে জানলে তাই নিয়েই চমৎকার কথার জাল রচনা করা যেতো যা আকাশকে বাতাসকে মাতিয়ে দিতে পারতো, শুকনো ডালে ফুল ফোটাতে পারতো—পঞ্চটার বিলের পদ্ম ফুলের পদ্মগন্ধ যেন আমার নাকে উড়িয়ে নিয়ে আসতে পারতো। গণেশ দাদা সে সব পারে না। তবুও ওর সঙ্গ আমার এত ভালো লাগে। কথার দরকার হয় না, ওর নিরলংকরণ ও অনাড়ম্বর সান্নিধ্যেই আমার মনে একটি মৌন সিম্ফনির আবেদন বহন করে আনে। সেবার চলে আসার পাঁচ ছ' বছর হবে গণেশ দাদার সঙ্গে আবার দেখা।

গণেশ দাদার মাথার চুল পেকে একেবারে শনের নুড়ি হয়ে গিয়েছে, পিঠের দিকটা থেকে একটু কুঁজো হয়ে গিয়েছে—সামান্য।

সন্ধ্যেবেলা। পূজোর ছুটিতে সেবার নদীতে একটু বন্যার আভাস দেখা গিয়েছে। কাশফুল ফুটে আলো করেছে নদীর দুইপাড়। নদীর ধারের মাঠে গণেশ গরু চরাচ্ছে, পুঁজতে পুঁজতে বার করলাম। ওর মাথার চুল আর ওর চারিপাশের কাশফুল একই রকম দেখতে। বৃদ্ধ গণেশ দাদা সেই পাঁচ সাত বছর আগের মত তাল পাতার ছাতি তার মাথায় দিয়ে লাঠি হাতে গরু চরাচ্ছে। কৌচড় থেকে বের করে কি খাচ্ছিল, আমায় দেখে লজ্জিত মুখে বলে—সৈরভির মা দুটো চাল ভাজা দেলে, বলে, গরম গরম একখোলা নামিয়ে খেলাম, তুমি দুটো নিয়ে যাও—তাই নিয়ে এ্যালাম। বেশ লাগে—তা এলে কবে দাদাঠাকুর! আর তাখো বড্ড বুড়ো হয়ে পড়িচি, তুমি আসচো কিন্তু মুই বুঝতে পারলাম না। বলি, কেডা আসে বাবু পানা? চকি যেমন আর ঠাওর হয় না—

—চালভাজা খাচ্ছ, দাঁত আছে?

—তা আছে তোমার বাপমায়ের আশিব্বাদে। বলি ও কথা থাক, বিয়ে-থাওয়া করেচ?

—না। বিয়ের আর বয়েস নেই।

কি কথা বলো দাদাঠাকুর? তোমারে কোলে করে মানুষ করলাম, কালকের কাঁচা ছেলে, বয়েস হইয়ে গেল তোমার? ও কথা বোলো নী। মা লক্ষিকে যেথে মুই চক্ষু বুঁজোবো। বিয়ে করো—কি করচো আজকাল?

—চাকরী করচি।

—বেশ বেশ। মোদের শুনেও সুখ। তা বোসো। এই গাছটার ছিয়াতে বোসো—হ্যাঁরে, তোমরা টুপি পরো? বেনার ডাঁটার খাসা টুপি বুনি দিতি পারি। সরকার সাহেবের টুপি। নেবা?

—না আমি সাহেবের টুপি পরি নে।

—বোসো। জিরোও বড্ড দূর।

কি সুন্দর নীল আকাশ কাশফুলে ভরা বিস্তীর্ণ মাঠের ওপরে হুমড়ি খেয়ে আছে। সাধারণ রকমের নীল

নয়, সে এক অদ্ভুত মধুরকণ্ঠি হংসের নীড়। ওপার থেকে হু হু হাওয়া বইছে, গণেশ দাদার মাথার সাদা চুল বাতাসে কাশফুলের মত উড়ছে। আমার কাছে ছবিটি বেশ লাগে।

গণেশ দাদা এইবার চালতাতলা খাওয়া শেষ করে নদীর পাড় বেয়ে জলে নেমে দুহাতে আঁজলা করে জল খেয়ে নিয়ে সরস তৃপ্তির সঙ্গে 'আ' বলে একটি দীর্ঘস্বর উচ্চারণ করলে। আমার কাছে এসে বসে তামুক খাবা?

—খাই দে।

—দাঁড়াও সাজি। মোর দা-কাটা খয়সান তামাক বড্ড ভদর। কিছু নেই, শুধু তামাক আর গুড়। বাজারের তামুক চুণ মেশায়। বসি ছাদে দাদাঠাকুর, একটু গুলোও দিকি?

কি?

—সেই ইন্‌জিরি। মুই বুঝন্ত বলবো? ওতার মানে ওপর; ওয়াটার মানে জল, বার্ড্ মানে পাখী, মাছির ইন্‌জিরি স্যাণ্ড, মাছের ইন্‌জিরি ফ্লাই—

—উঁহু—

—কি মাছের ইন্‌জিরি ফ্লাই নয়?

—না।

—তবে কি এ্যাণ্ট?

—না, এ্যাণ্ট মানি পিঁপড়া। মাছের ইংরিজি ফিশ্, মাছির ইংরিজি ফ্লাই।

—হ্যাঁ ঠিক ঠিক। বসি ছাদে বয়েস হয়েছে আজকাল অনেক, সব কথা বক্কয়ে মনে পড়ে না, বেয়াদপ হয়ে যাই। আর তুমি না এলি তো চর্চ্চা হয় না, সব মুরুখু—কার সঙ্গে ইন্‌জিরি বলবো বলো দিকি?

আর এক ডজন ইংরাজি শব্দ বলে বসে আমার জ্ঞানপিপাসু শুভ্রকেশ ছাত্রকে শিক্ষা দিলাম সেই কাশফুল-কোটা চরে বসে শরতের অপরাহ্ণে। আগের শেখা শব্দগুলোও একবার সে ঝালিয়ে নিলে মহাউৎসাহে। তারপর সেই বিরাট বিদ্যার বোঝা বহন করে সেই বছরের মাঘ মাসে নিমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে গণেশদাদা পরলোক যাত্রা করলে। পরবৎসর পুনরায় দেশে ফিরে আর ওকে দেখতে পাইনি।

কি বৈষয়িক উন্নতির দিক থেকে, কি ইংরিজি শিক্ষার দিক থেকে গণেশদাদা সারাজীবন প্রথম সোপানের দিকেই রয়ে গেল বটে কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওর মধ্যে এমন কিছু ছিল, যার সাহায্যে ও সব সোপান অতিক্রম করে, আমাদের অনেককে অতিক্রম করে, অনেক উচুতে গিয়ে পৌঁছেছিল। তাই আজকার দিনে বার বার তার কথা আমার মনে পড়ে।

অনুবাদ

কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত বাংলা-সাহিত্যে অনুবাদের বিশেষ কোন কদর ছিল না।

সৌভাগ্যবশতঃ আজ আমরা উপলব্ধি করছি, অনুবাদ হলো যে-কোন সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ। সাহিত্যের প্রসার অনুবাদের উপরই নির্ভর করে। অনুবাদের মধ্য দিয়েই এক জাতি আর-এক জাতির, এক সভ্যতা আর-এক সভ্যতার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সুযোগ পায়। এবং এই অনুবাদ-শক্তির বদৌলতই ইংরেজী সাহিত্য আজ এত বিপুল ও বিশাল হতে পেরেছে।

এই প্রসঙ্গে, অনুবাদ-সাহিত্যের রীতি-নীতির কথা ওঠে। এ-পর্য্যন্ত বাংলাসাহিত্যে যেভাবে অনুবাদ-কার্য্য চলে এসেছে, তার মধ্যে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। অনুবাদ-কার্য্য অতি দুরূহ সাহিত্যিক-কর্ত্তব্য এবং অনুবাদকের দায়িত্ব যে কতখানি, তা উপলব্ধি করবার সময় এখন এসেছে। প্রথমতঃ, অনুবাদের অনুবাদ সাহিত্য-নীতি বিরুদ্ধ। বাংলা-সাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত অধিকাংশ যা অনূদিত হয়েছে, তা ইংরেজী অনুবাদের মধ্য দিয়ে। এইভাবে অনুবাদ-সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে না। মূল ভাষা থেকে অনুবাদ না করলে, অনুবাদের কোন বৈশিষ্ট্য থাকে না। সেইজন্যে অনুবাদকের পক্ষে বহু ভাষাজ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয়।

এ ছাড়া, অনুবাদ-সাহিত্যের অন্য যে-সব রীতি-নীতি আছে, তার আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। সেগুলি যথাযথ পালন না করার দরুণই বাংলা ভাষায় অনুবাদ-কার্য্য বহু হলেও, অনুবাদ-সাহিত্য গড়ে ওঠে নি।

গল্প-ভারতীর এই অনুবাদ-বিভাগ যে স্বতন্ত্র বিভাগরূপে এখানে দেওয়া হলো, তার কারণ, গল্পভারতী বাংলা দেশের সাহিত্যিকগণের সহায়তায় এই অনুবাদ-সাহিত্যকে প্রকৃত রূপ দেবার চেষ্টা করছে। এই বিভাগের প্রত্যেক গল্পটী মূল ভাষা থেকে অনূদিত হয়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় আজ যে নব-অভ্যুত্থান ঘটছে, বাংলা-সাহিত্যের অন্তঃপুরে তাদের আত্মীয় করে নিয়ে আসা, গল্পভারতীর একটী মুখ্য উদ্দেশ্য। এই ব্যাপারে আমরা প্রত্যেক সাহিত্য-সেবীর সহযোগিতা কামনা করছি।

—সম্পাদক

পোপের গাধা

(মূল ফরাসী ভাষা হইতে)

লেখক—আঁাল ফোঁস দোদে

অনুবাদ—ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী

প্রভাঁসের লোকেরা যে সব সুন্দর সুন্দর প্রবাদবাক্য দিয়ে তাদের কথার রং চড়ায় তারমধ্যে এর চাইতে বেশী সুন্দর ও অদ্ভুত আর দ্বিতীয়টি নেই। আমার দিনের পনেরো ভাগের মধ্যে কোন প্রতিহিংসা-পরায়ণ লোকের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সকলেই বলে—"বাবা! ঐ লোকটা! সাবধান! ও পোপের গাধা, সাত বছর ধরে লাথি তুলে রাখে।"

অনেকদিন ধরে আমি খুঁজেছি এই প্রবাদ কোত্থেকে এসেছে, পোপের গাধাই বা কি, সাত বছর ধরে লাথি তুলে রাখাই বা কী। কিন্তু কেউই এবিষয়ে কোন খবর দিতে পারেনি; এমন কি আমার শানাই-বাজিয়ে ফ্রাঁসে মামাই প্রভাঁসের সমস্ত ইতিহাস যার নখাগ্রে, সেও না। আমারই মত ফ্রাঁসের ধারণা যে ওর মধ্যে আভিঞোঁর কোন পুরাণো ঘটনার কথা লুকিয়ে রয়েছে, কিন্তু ঐ প্রবাদ ছাড়া কোন দিন অন্য ভাবে সেও কোন ঘটনার উল্লেখ শোনে নি···

বুড়ো বাজনদার একদিন আমাকে হাসতে হাসতে বললো—তুমি এর খবর কেবলমাত্র চিপালের লাইব্রেরিতেই পাবে।

কথাটা আমার মনে লাগলো, চিপালের লাইব্রেরী আমার মরজাগোড়ায়। সুতরাং আটদিন ধরে আমি সেখানে খোঁজখবরে লেগে গেলাম।

লাইব্রেরিটি চমৎকার, নিখুঁতভাবে সাজিয়ে গোছা, কবিদের জন্য দিন রাত খোলা থাকে আর বেঁটেখাটো লাইব্রেরীয়নরা সারাক্ষণ গুণ গুণ করে ঘোরে আর বই বের করে। যে-কটা দিন আমি এই লাইব্রেরিতে কাটিয়েছিলাম তা ছিল আমার কাছে খুব আনন্দদায়ক। চেয়ারে সোজা হয়ে বসে সপ্তাহব্যাপী গবেষণার পর আমি অবশেষে যা খুঁজছিলাম তার সন্ধান পেলাম। পোপের সেই গাধা আর সাত বছর ধরে তার লাথি ফিরিয়ে রাখবার ইতিবৃত্ত মিললো। গল্পটা একটু সোজা হলেও বেশ চিত্তাকর্ষক। গল্প যেমনটি পুঁথিতে পড়েছি তেমনি ভাবেই বলব।

পুঁথিখানি বহুকালের রং ধরা, শুকনো ন্যাতেণ্ডারের মিষ্টি গন্ধে ভরা আর তার সুতোর বিণ্ডর ছবি বুলানো।

পোপের সময়কার আভিঞোঁ শহর যে না দেখেছে সে কিছুই দেখেনি। শহরটা ছিল আনন্দময় প্রাণ ও স্ফূর্তিতে ভরা। শহরে হত উৎসবের পর উৎসব—এ সবে এই শহরের আর কোন জুড়ী ছিল না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, শোভাযাত্রা, তীর্থযাত্রা, ফুল বিছানো রাস্তা, রাস্তার দুধারে উঁচু পতাকা, রোদ ঝলমলে

কার্ডিনালদের মত আগত বহর, হাওয়ায় পতাকার পত্ পত্ শব্দ, পতাকাশোভিত গ্যালারী, পার্কে পোপের সৈন্যদের দামিন গান, পরিব্রাজক সন্ন্যাসীদের লাঠির ঠক্‌ঠকানি, তারপর পোপের প্রাসাদের চারিদিকে উপর থেকে নীচু পর্য্যন্ত সমস্ত বাড়ী গুলিতে মৌচাকের মৌমাছির শব্দের মত গুণ-গুণ আওয়াজ; এ আওয়াজ হচ্ছে—লেদ্, সোনালী জরি বুনবার তাঁতের টানা-পড়েনের, পাথরের বাসন ঘোষাই করবার হাতুড়ীর, যন্ত্রপাতী তৈরির লাইবোনিয়ম বাঁধবার আর ভাঙী মেজেদের গানের। ওদিকে ঘন্টার শব্দ আর পুলের সব সময়েই ছুচারটে ঢোলকের বাজনা। তার কারণ, আমাদের অকলে লোকেরা খোসমেজাজে থাকলে নাচটাকে অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করে। সেকালে শহরের রাস্তাগুলি 'কারা'-ডোম' নাচের পক্ষে বড্ড সঙ্ক হলে, রোদের মুক্ত হাওয়ায় আভিঞ্জোর পুলের উপর শানাই ও ঢোলকগুলি জমা করা হত। আর দিনরাত সেখানে চলত নাচ। কি সুখের কালই না ছিল! কি সুখের শহরই না ছিল! ভলোগার তখন আর কারো ঘাড়ে পড়ত না; সরকারী খেলখানাকে তখন করা হয়েছিল লোকের মেজাজ ঠাণ্ডা করবার জন্য বাছা-বাছা মদের ডিপো। লোকের অভাব ছিল না দেশে যুদ্ধবিগ্রহ ছিল না···এমনি করেই আভিঞ্জোর পোপেরা প্রজাপালন করতেন। আর সেই জন্যই তারা তাঁদের অভাবে এতটা দুঃখবোধ করেছিল।

পোপদের মধ্যে একজন ছিলেন সকলের সেরা—এক সদাশয় বৃদ্ধ—নাম বোনিফাস।···তাঁর মৃত্যুতে আভিঞ্জোর লোকেরা কতই না চোখের জল ফেলেছিল! তিনি ছিলেন যেন রাজা—যেমন সদানন্দ তেমনই সুন্দর। কাউকে দেখলে তাঁর গাধার উপর থেকে এমন দিল-খোলা হাসি-ই হাসতেন! আর সে গরীব গাছ-কুড়ুনীই হোক বা রাজার খাসমহলের শহুরে কর্মচারীই হোক, তাঁর কাছ দিয়ে গেলে এমন মিষ্টি স্বরেই না তার আশীর্বাদ করতেন! তিনি ছিলেন যেন এক সত্যিকার ইতালীয় পোপ, সে ইতালী হচ্ছে প্রভাসের—হাসি ছিল বেশ মার্জ্জিত হাসি। টুপিটা ছিল অনাড়ম্বর মাঝোয়ারা গাছের ছোট্ট একটি ডগা আঁটা; অবশ্যকার ইতালীয় তাতে কোন স্থান ছিল না। একমাত্র ইতালী যা তিনি চোখে দেখেছিলেন তা ছিল তাঁর দ্রাক্ষা—একটা ছোট দ্রাক্ষা যা তিনি লাগিয়েছিলেন নিজের হাতে—আভিঞ্জো থেকে তিন লিগ দূরে 'শাতো-নফে'র মাউঁল গাছের বাগানে।

রবিবারে সন্ধ্যা-উপাসনার পর এই মহানুভব পোপ লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে বেরুতেন। সেই সময়ে তিনি গাধাটার উপরটায় গিয়ে রোদ্দুরে বসতেন; গাধাটা তাঁর পাশে, আর কার্ডিনালরা তাঁর চার পাশে বসতেন কাঠের গুঁড়ির ধারে লম্বা হয়ে। তিনি তখন বের করতেন তাঁর পোচকা থেকে একটি টাটকা মদের বোতল—লাল রঙের খাশা মদ যার সেই থেকে নাম দেওয়া হয়েছিল "শাতো-নফ্ দে' পোপ" (=পোপদের শাতো নফ্) আর তিনি দ্রাক্ষা-কুঞ্জের উপর মেহার্দ্র দৃষ্টি-রেখে একটি ছোট্ট পেয়ালায় তা ঢালতেন আর একটু একটু করে গলাধঃকরণ করতেন। তারপর বোতলটা যখন শূন্য হত, দিন পড়ে আসত, তখন তিনি স্ফূর্ত্তি নিয়ে সাঙ্গোপাঙ্গসহ ফিরতেন শহরে। আভিঞ্জোর পুলের উপর ঢোলকের বাজনা আর কারাভোল নাচের মধ্য দিয়ে যাবার সময় তাঁর গাধাটা সুরের তালে-তালে পা ফেলতো আর তিনি নিজেও টুপিটা নাচিয়ে, নাচের তাল রাখতে রাখতে এগুতেন। কার্ডিনালরা তাতে লজ্জা পেতেন, কিন্তু লোকেরা বলতো "কি মহানুভব রাজা! কি সুন্দর স্বভাব পোপের!"

'শাতো নফে'র ভ্রাক্ষানুক্ত ছাড়া পোপ পৃথিবীতে সব চাইতে ভালবাসতেন তাঁর গাধাটিকে। তিনি ওই জন্তুটাকে নিয়েই থাকতেন সর্বক্ষণ। রোজ রাত্রি শুতে যাবার আগে, তিনি নিজে দেখতেন আস্তাবল ঠিক বন্ধ করা হয়েছে কিনা, গাধার গায়দায় সব খাবার দেওয়া হয়েছে কিনা। আর খাবার টেবিল থেকে ওঠবার সময় তিনি প্রত্যহ নিজে সামনে তৈরি করিয়ে নিতেন এক গামলা মদ। কার্ডিনালদের কটাক্ষ সত্ত্বেও তিনি নিজে হাতে তা খাওয়াতেন গাধাটিকে।

…আর একথাও স্বীকার করতে হবে যে জন্তুটার জন্য অতটা কষ্ট করা সাজত। গাধাটা ছিল বেশ সুন্দর, কালো রঙের উপর লাল ডোরা, বেশ শক্ত তার পা, চক্‌চকে লোম, কোমরটা তরাট আর বেশ চওড়া। সে চলতো তার লাল সবুজ পরা ছোট্ট মাথাটা গর্বভরে উঁচু করে। তার স্বভাবটা ছিল বেশ মিষ্টি, চোখ দুটো ছিল ভালমানুষের, আর লম্বা কান দুটো সব সময়েই নাচত। তার চেহারাটা ছিল মোটের ওপর একটা মূর্তিমান ছোট্ট ছেলের মত। আভিঞ্জোঁ শহরের সকলেই তাকে বেশ সমীহ করত। শহরের রাস্তা দিয়ে যখন সে যেত তখন সব রকমেই তাকে সম্মান দেখানো হত। তার কারণ, সকলেই জানতো পোপের চোখে পড়বার এই ছিল প্রকৃষ্ট উপায়। পোপের গাধা তার বোকা চেহারা সত্ত্বেও কত লোকেরই না কপাল ফিরিয়েছে—প্রমাণ ভিত্তে জেমেন আর তার বড় বড় এডভেঞ্চার।

এ ভিত্তে জেমেন বুধাতঃ ছিল একটি নির্লজ্জ বকাটে; তার বাবা স্বর্গকার, ওই জেমেন তাকে শেষ পর্যন্ত বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হন, কারণ সে কোন কাজই করতে চাইত না, আর তাঁর কাজের লোকগুলিকে বিপথে চালিত করত। ছ'মাস ধরে সে আভিঞ্জোঁর গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ান বেশীর ভাগ সময় পোপ-প্রাসাদের কাছাকাছি। হতভাগাটার অনেকদিন ধরেই পোপের গাধার উপর চোখ ছিল আর তার পেছনে ছিল বেশ একটা বড় রকমের ফন্দী।…একদিন পোপ একা পাচিলের ধারে বেড়াচ্ছিলেন, সঙ্গে ছিল গাধাটি। অমনি ভিত্তে এগিয়ে গিয়ে জোড়হাত করে গদ্‌গদস্বরে বলল—হে দেবতা, হে পিতা, আপনার গাধাটি কি সুন্দর! ওকে একটু চাল করে দেখতে দিন।…হে পোপ, সুন্দর গাধা আপনার।…আর্দাশ সম্রাটেরও এমনটি নেই।

তারপর সে তার গায়ে হাত বুলতে লাগলো, আর তাকে মিষ্টি করে বলতে লাগলো—যেন সে একটি সুন্দরীর সঙ্গে কথা বলছিল—

এদিকে এসো, আমার মাণিক, আমার ধন,…

ভালমানুষ পোপ, মুগ্ধ হয়ে নিজের মনে বলতে লাগলেন—

কি সুন্দর ছোট্ট ছেলেটি…আমার গাধার সঙ্গে কি মিষ্টি ব্যবহারই করছে!

পরের দিন কি ঘটল জানেন কি? ভিত্তে জেমেনের গায় চড়লো তার পুরাণো লাল রঙের কোটের বদলে ফিকে রঙের লেস্ লাগানো কোট, তারগেট রঙের সিল্কের হুড, আর বগলেস্ জাঁটা জুতো। সে ঢুকলো পোপের কোয়ারের স্কুলে যেখানে তার পূর্বে রাজরাজড়াদের ছেলে ও কার্ডিনালদের ভাগ্নে ছাড়া কেউ ঢুকতে পারতো না।…একেই বলে কুচক্র।…কিন্তু ভিত্তে ওখানেই থামলো না।

পোপের চাকরীতে একবার ভর্তি হবার পর সেই খেলাই সে চালালো যাতে একবার এতটা ফল

সেবেছে। সকলের সঙ্গে সে করতে লাগলো উদ্ধত ব্যবহার, আর যত ঘৃণা ও ভদ্রতা করত গাধাটির সঙ্গে। সব সময়েই তাকে দেখা যেত প্রাসাদের চত্বরে হয় এক বুঠো ওট্‌স্ নিয়ে, না হয় এক ঝাঁটি ঘাস নিয়ে পোপের বারান্দার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ঘোড়াটা আর যেন বলছে—"এ, এটা কার জন্য? এই ভাবে চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত পোপ বার্ত্তিকোর জন্য যখন আর মিতে দেখা শোনা করতে পারবেন না, তখন তাঁকেই ভার দিলেন আভাবসের। আর গাধার জন্য প্রাত্যহিক ফরাসী মদের গামলাটা নিয়ে যাবার। এটা কার্ডিনালের ভাল লাগলো না।

গাধাটিরও এটা ভাল লাগলো না।…ঠিক মদ আসবার সময় প্রত্যহ পাঁচ ছ'জন কোরাসের ছাত্র তাদের ঘড়, আর লেস্ চাপিয়ে চটপট্ গোবারে ঢুকে পড়তে লাগলো। তারপর এক মুহূর্ত্তের মধ্যে কারাসেন ও মস্‌লার পরম গন্ধে আস্তাবল ভরে উঠতো আর হিংসে ভেদেন্ অতি সাবধানে ফরাসী মদের গামলাটা নিয়ে হাজির হোতো। তখন সুরু হোতো বেচারী গাধাটার অকথ্য যন্ত্রণা।

এই যে সুগন্ধী মদ যা সে এত ভালবাসতো, যাতে তার দেহটা গরম থাকত আর সজীব হত, সে মদ আনা হত তারই জন্য, তারই খাবার ঘরে, কিন্তু সে পেত শুধু তার গন্ধটা। কি নিষ্ঠুরতা! মদের গন্ধে তার নাক ভর্ত্তি হয়ে উঠেছে, ব্যস্, চোখের দেখাও হয়ে গেল! গোলাপী রঙের সব মিষ্টি মদটা গিয়ে ঢুকলো ওই হতভাগাদের পেটে।…আর ওরা! ওর মদটাই চুরি করে খাস্ত দিত না; কোরাসের ছোকরাগুলো মদটা বেশ করে খেয়ে নিয়ে, কেউ বা ওর কান ধরে টানত, কেউ বা লেজ নাড়া দিত। কিংবা ওর ঘাড়ে চড়ত; বেদুগে তার হুডটা ওর মাথায় চাপাবার চেষ্টা করত। কিন্তু এই বকাটেরা একবার স্বপ্নেও ভাবতে পারতো না যে, ওই ছোকরা জন্তুটা কোমরের এক ধাক্কা মেরে, না হয় এক চাট দিয়ে তাদের হতভাগা বা আরও দূরে পাঠিয়ে দিতে পারত।…কিন্তু সে তা কিছুই করল না। আসলে সে পোপের গাধা তো, তার পিঠে চড়ে পোপ কত লোককে না আশীর্বাদ করেছেন, কত অপরাধের বিধান দিয়েছেন।… ছেলেগুলো তাকে নিয়ে যা খুশী তাই করতো, কিন্তু সে চটতো না। শুধু রাগ হত তার ভিতো ভেদেনের উপর।…যখন সে বুঝত যে ও তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, তখনই তার পা সুড়সুড় করত। আর তার যথেষ্ট কারণও ছিল। ঐ ছুঁচো ভিতো ওর সঙ্গে কত চালাকি-ই খেলত! মদ খাবার পর ওর সঙ্গে এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার-ই করত!…

একদিন কি ভিতো ওকে পোপ-প্রাসাদের ঘণ্টা-ঘরের উপরটায় চড়ায় নি? ওই পাহাড়টির উপরে!…এটা কিন্তু গল্প নয়। প্রভাঁসের দু'লক্ষ লোক তা দেখেছে। হতভাগা পশুটা কি রকম ভয় পেয়েছিল ভেবে দেখুন। এক ঘণ্টা ধরে তাকে অন্ধকার ঘুরানো-সিঁড়ীতে ঘুরতে হয়েছে। অসংখ্য বার তাকে হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে হয়েছে, তারপর সে গিয়ে দাঁড়ায় দিনের আলোয় ভরা এক চাতালে, আর তার হাজার ফুট নীচে সে দেখল অদ্ভুত চেহারার আজিজো শহর। বাজারের ব্যারাকগুলি বাদামের মত ছোট, পোপের সৈন্যেরা তাদের খুপরীর সামনে দেখাচ্ছিল যেন ছোট লাল পিপড়ের সারি, আর খুব নীচে রূপালী রঙের একটা সুতোর মত পুল, যার উপর চলছিল নাচের ঢেউ…! বেচারা গাধা! সে ভয়ে আঁৎকে উঠলো। আর সে এমন ডাকই ডেকে উঠলো যে, পোপ-প্রাসাদের সব সার্সিগুলো কাঁপতে লাগলো।

পোপ ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন—চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে ওখানে? ওকে কি করছে?

ভিত্তে ভেদেন তখন পোপ-প্রাসাদের চত্বরে নেমে এসেছে। কাঁদবার মত মুখভঙ্গী করে আর নিজের চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে সে বললে—

—বাবা ওখানে কি দেখছেন না? ওখানে আপনার গাধা। ভগবান! আমাদের কি হবে! আপনার গাধা গিয়ে ঘণ্টাঘরে চড়েছে।

—একা?

—হাঁ বাবা একেবারে একা।···একবার উপরের দিকে চেয়ে দেখুন।···দেখছেন না ওর কাণের ডগা দুটো ঘন ঘন নড়ছে? যেন দুটো হিংস্রটের পাখী।

—পোপ চোখ দুটো উপরের দিকে করে বললেন—হায় হায়! ও কি পাগল হয়ে গেল? ওরে পড়ে মরবে? যা বেচারাকে শিগ্‌গির নামিয়ে আন্।

বেচারা! ও ত ভাবছিল নামতে পারলে বাঁচে।···কিন্তু কেমন করে নামবে? সিঁড়িটার কথা ভাবা যায় না। ও দিয়ে ওঠা একরকম চলে। কিন্তু নামতে গেলে একশো বার ঠ্যাং ভাঙবার সম্ভাবনা। হতভাগা গাধাটা ভয়ে আড়ষ্ট। তার মাথাটা ঘুরছিল। বড় বড় চোখ করে সে চাতালের উপর এদিক-ওদিক আর তিত্তে ভেদেনের মুণ্ডপাত করছিল।···

—ভাকাস্তটা! একবার যদি নামতে পারি···কাল সকালে খুরের এমন নাথিই খাবে?

নাথি মারবার কথাটা মনে পড়ে তার বেশ একটু সাহস বাড়ল; তা না হলে আর ও পাড়াতে পারছিল না। ···তারপর ওকে উপর থেকে নামানো হবে, তার জন্য করতে হবে বেশ কায়দা। ওকে নামাতে হবে ট্রেচারে করে ঘড়ি ঝুলিয়ে। কি লজ্জাই না পোপের গাধার—তাকে চল অবশেষে উপর থেকে ঝুলতে আর শূন্যে পা ছুঁড়তে। সমস্ত আভিন্যো শহর দেখল তা তাকিয়ে।

হতভাগা পশুটা সারারাত ঘুমুতে পারল না। তার মনে হতে লাগলো যেন তখনো সে বিশ্রী চাতালটার উপর ঘুরছে, আর শহরের লোকজন হাসছে। তার মনে পড়ল, ঐ পাজী তিত্তে ভেদেনের কথা আর বেশ একটা মোয়ালো লাথি যা সে পরদিন সকালে লাগাবে ওর ঘাড়ে। পাপেরিগুস্ থেকে দেখা যাবে সে লাথির ধুঁয়ো।··· আর ওই রাত্রে যখন আস্তাবলে ওর ঢোকাবার ব্যবস্থা চলছিল তখন তিত্তে ভেদেন কি করছিল জানেন? সে তখন পোপের অলিবোটে গান করতে করতে চলেছে নেপেল্‌সের রাজসভার দিকে—সঙ্গে তার জমিদারের ছেলেরা যাদের বছর বছর রাণীর কাছে পাঠানো হয় আদবকায়দা আর রাজনীতি শিখোবার জন্য। তিত্তে জমিদারের ছেলে নয়। কিন্তু পোপ গাধাটাকে বন্ধ করবার জন্য আর ওই দিন গাধাটাকে নামাবার সময় খাটা-খাটুনীর জন্য তার এই সম্মান দিয়েছিলেন।

পরদিন গাধাটার হল আপশোষ। সরোষে গলার ঘণ্টাগুলো ঝাঁকুনি দিতে দিতে সে ভাবলে—চোরটা বোধহয় কিছু সন্দেহ করেছিল। আচ্ছা, থাকো এখন। ফিরে এলে ওই লাথিই তুমি পাবে। এখন ওটা তোমার জন্যই তোলা থাকল।

আর সত্যিই ও তা করল।

ভিত্তের যাবার পর পোপের গাধা আবার তার জীবনে শান্তি ফিরে পেল···তার আগেকার চেহারাও ফিরে এল। আস্তাবলে আর কিকেও আসে না, বেলুপেও আসে না। সেই সোনালী দিনগুলো, যখন পোপ তাকে নিজে হাতে মদ তৈরী করে দিতেন তাও সে ফিরে পেল। তা ছাড়া সে ফিরে পেল, তার দিবানিদ্রা, লম্বা দিবানিদ্রার সুযোগ, আভিন্যোর পুলের উপর দিয়ে যেতে যেতে নাচের তালে পা ফেলা। কিন্তু তার ওই এডভেঞ্চারের পর থেকে ওর যেন মনে হত শহরের লোকেরা আর তেমন সম্ভ্রম দেখায় না। ও যখন রাস্তা দিয়ে যেত তখন যেন চলত নানা রকমের কানাঘুষা—বুড়োরা একটু ঘাড় বাঁকাত আর ছেলেরা ওর গলার ঘণ্টার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাত আর হাসত। পোপও তাঁর বন্ধুকে আর অতটা বিশ্বাস করতেন না। রবিবার দিন তাঁর ব্রাঙ্কাযুজ থেকে ফিরবার পথে ওর পিঠের ওপর বসে একটু ঝিমোবার কালে তাঁর সবসময়ই মনে পড়ত—"বেটা যদি ওই ঘণ্টাঘরের চাতালে তুলে নিয়ে যুদ্ধ জাহাজ!" গাধা এ সব বুঝত। যথেষ্ট মনোকষ্ট পেত আর যে কষ্ট হাসতে চেপে। কিন্তু যখন কেউ ওর সামনে ভিত্তে ভেদেনের নাম উচ্চারণ করত, ওর লম্বা কান দুটো কেঁপে উঠত এবং ও একটু মুচকি হেসে পায়ের নোংরা নালগুলো পথের বাঁকানো চাতালে ঘসে ঘসে সাফ করত।·····

এই ভাবে সাত বছর কাটলো। সাত বছরের শেষে ভিত্তে ভেদেন নেপল্‌সের কারাগার হতে ফিরল। ওর ওখানে যতদিন থাকবার কথা তা শেষ হয় নি। কিন্তু ও খবর পেল যে পোপের পেটোরা মুভার্দিয়ে হঠাৎ আভিন্যোতে মারা গেছে। ওই চাকরিটি বেশ সুবিধের মনে করে ও তাড়াতাড়ি চলে এল ওটা জোগাড় করবার জন্য।

শহরটা ভেদেনটা যখন পোপ-প্রাসাদের সদরে ঢুকলো পোপ ওকে হঠাৎ চিনতে পারলেন না। ও বেশ আগেকার চেয়ে লম্বা চওড়া হয়েছে। পোপও বুড়ো হয়েছেন—চশমাছাড়া ভাল করে দেখতে পান না।

ভিত্তে ঘাবড়ালো না।

—সে কি বাবা আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না?···আমি ভিত্তে ভেদেন···।

—ভেদেন?

—হাঁ, আপনি আমাকে জানেন···সেই যে আপনার গাধার কাছে রোজ মদ নিয়ে যেতাম।

—হাঁ হাঁ···মনে পড়েছে···সেই সুন্দর ছেলেটা, ভিত্তে ভেদেন!···তা এখন তুই কি চাস্?

—বিশেষ কিছু নয় বাবা···এই চাইতে এসেছিলাম···গাধাটা আছে ত বাবা আপনার? ও ভাল আছে ত? ···তা বেশ···আপনার কাছে চাইতে এসেছিলাম আপনার মুভার্দিয়ের কাজটা। সে ও কাজে ছিল সে মারা গেছে কিনা।

—তুই ও কাজ পেতে চাস···এঁ্যা, তুই ত ছেলেমানুষ! তোর বয়স কত?

—তিন বছর দু'মাস বাবা। আপনার গাধার চাইতে ঠিক পাঁচ বছরের বড়।···কি সুন্দর গাধাটা, ও যেন দেবতার দান।···ওকে কত ভালবাসতাম তা যদি আপনি জানতেন! ইতালিতে ওর জন্য আমার কিছুই ভালবাসত না।···ওকে একবার দেখবার অনুমতি দেবেন না?

পোপ বেশ একটু বিচলিত হলেন, বললেন—হাঁ বাছা, তুই ওকে বেশরি ঘটকি। তুই ওকে অত ভালবাসিস, তা তোকে আর ওর থেকে দূরে থাকতে হবে না।…আজ থেকেই তুই আমার 'মুক্তার্দিয়ে' হয়ে সঙ্গে সঙ্গে থাকবি।…কার্ডিনালরা চেঁচামেচি করবে। তা করুক, ও আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।…তা কাল প্রার্থনা শেষে বেরুবার সময় আমাদের সঙ্গে দেখা করিস। গির্জার লোকেদের সামনে তোর পদক ও পোষাক দেব…আর তারপর গাধাটি দেখাবার জন্ত নিয়ে যাব। সেদে আমাদের দু'জনের সঙ্গে ত্রাক্কাকুজে যাবি।…এ্যাঁ—তাহলে এখন যা।…

হিত্তে ভেদেন ঘর থেকে বেশ খুশীমনে বেরুল। পরদিনের অনুষ্ঠানের জন্ত যে সে কি ব্যাকুলভাবে সময় কাটালো, তা না বললেও চলবে। কিন্তু পোপ-প্রাসাদে আর একজন হয়েছিল ওর চাইতে বেশী খুশী, তার সময় কাটছিল বেশী ব্যাকুলতায়। সে হচ্ছে ওই পোপের গাধাটা। ভেদেন ফিরে আসা থেকে পরদিন প্রার্থনার সময় পর্যন্ত ও অনবরত ওট্ খাচ্ছিল আর পেছনের পা দুটো দেয়ালে ছুঁড়ছিল। গাধাটাও অনুষ্ঠানের জন্ত তৈরি হচ্ছিল…

পরদিন প্রার্থনার পর হিত্তে ভেদেন এসে দাঁড়াল পোপ-প্রাসাদের প্রাঙ্গনে। গোনর-গোবড়া পুরোহিতরা সকলেই সেখানে ছিলেন। লাল-রঙের আলখাল্লা পরা, কার্ডিনালরা, কালো-ভেলভেট-পরা 'শয়তানের উকিল', কনসেস্টর এবট,……কেউই বাদ পড়েনি। এমন অনুষ্ঠান আর হয় না! ঘন্টাধ্বনি, পটকা, সূর্যের আলো, গান …আর ঐ আভিঙ্গোর পুলের উপর চোদকের বাজনা আর নাচ।

যখন ভেদেন এই সভায় এসে ঢুকলো তখন তার চেহারা ও চালচলন দেখে সকলেই প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলো। প্রভাসের সত্যিকার একখানা খাসা চেহারা। কেবল চুলের রঙটা সোনালী, লম্বা চুলগুলো একটু কোঁকড়ান; আর পাখীর পালকের মত ছোট, শ্মশ্রুরেখা দেখলেই মনে হয় ওর বাবার দোকানের সোনার গুঁড়ো লেগে রয়েছে। এমন কাণাঘুষাও চললো যে নেপল্‌সের রাণী ওর ওই সোনালী রঙের দাড়িটা কখনো কখনো আঙুল দিয়ে নেড়ে দিতেন। ভেদেন বগাধরও এমন চটকদার হাবভাব ও উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি ছাড়ছিলেন যেন তিনি ছিলেন সত্যিই রাণীর একজন প্রিয়পাত্র।… আর সে দিন স্বদেশের সম্মানের জন্ত গ্রে নেপল্‌সের পোষাক ছেড়ে প্রভাঁসের চলতি ঘুলকাটা জ্যাকেট পরেছিল আর ওর টুপির ওপর লাগিয়েছিল কামার্গের সারসের একটা বড় পালক।

প্রাঙ্গনে ঢুকেই 'মুক্তার্দিয়ে' বেশ একটু হেসে নমস্কার করল আর তারপর সেই সিঁড়ীর দিকে এগিয়ে চলল যেখানে পোপ ওকে পদক দেবার জন্ত অপেক্ষা করছিলেন। তার সঙ্গে ছিল বক্স গাছের চামচ আর কাঞ্চন রঙের পোষাক। গাধাটা দাঁড়িয়েছিল ঠিক সিঁড়ীর নীচে, লাগাম লাগানো, ত্রাক্কাকুজে রওনা হবে বলে।…হিত্তে ভেদেন ওর কাছ দিয়ে যাবার সময় একটু হেসে থাম্‌লো, ওর পিঠে আদর করে দু-চার থাপড় দেবার জন্তে। চোখের কোণ দিয়ে সে দেখছিল পোপকে ওর আদর জানানোটা ওঁর চোখে পড়ে কিনা। জায়গাটাও ছিল খুবই…গাধাটা বুক ফোলা করল—

—নে, ধর, চোর কোথাকার। সাত বছর ধরে তোর জন্তে তুলে রেখেছি।

সে ছুঁড়লো ভয়ঙ্কর নাধি। এমনই ভয়ঙ্কর যে, পাঁচেরিওস্ত থেকেও দেখা গেল তার ধুঁলো—সাদা রঙের ধুলোর ঘূর্ণী আর তার মধ্যে দোল খাচ্ছে সারসের পালকটা। শুধু ওইটাই অবশিষ্ট ছিল হতভাগ্য হিত্তে ভেদেনের।

সাধার নাধি সাধারণতঃ অতটা ভয়ঙ্কর হয় না। কিন্তু ওটা ছিল পোপের গাধা কিনা আর তারপর বুঝুন সাত সাতটা বছর ধরে নাধিটা জমিয়ে রাখা হয়েছিল।

বাদলা দিনের শেষে

(চীন ভাষা হইতে)

লেখক—সিয়াও ছিয়েন
অনুবাদ—শ্রীঅমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

[সিয়াও ছিয়েন চীনের বিখ্যাত সংবাদপত্র তাকুংপাও-এর সাহিত্যবিভাগীয় সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত তিনি লণ্ডনে "স্কুল অফ অরিয়েণ্টাল এ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ"-এ অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন। তারপর কেনব্রিজ কিংস কলেজে ইংরাজি সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করেন। এখন তিনি বৃটেনে তাকুংপাও-এর স্বাধীন সংবাদদাতা। বহু ছোট গল্প তার উপন্যাস তিনি চীনাতে রচনা করেছেন। তাঁর ইংরাজিতে রচিত এচিং অফএ টরমেনটেড এজ (এ্যেলেপ আনউইন) 'টাইনা বাট নট ক্যাথে' (পাইলট লেস) প্রভৃতি কয়েকটি বই এখনও বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। তাছাড়া ইনি একজন ছবি আঁকিয়ে। এদিক থেকেও চীনেতে এঁর নাম আছে।]

হঠাৎ বৃষ্টিতে ভেজার মধ্যে বেশ একটা মজা আছে। ভিজতে সত্যি খারাপ লাগে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে দাঁড়ায় একটা মানুষকে মড়াই-এর মত, মুটো সব কিছু স্থির শান্ত বাদলা আকাশ, এই দুয়ের মধ্যে রেশারেশি। মাথার উপর ছাই-রঙা ছেয়াটোপখানা রেখে কুক কৌচকাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে কুণ্ডুলে নৌবহরের মত কালো মেঘ জড়ো হতে থাকে। থাকের পর থাকে ঐ কালো রঙ জমতে থাকে—যেন পৃথিবীর উপর উল্টে পড়লো বলে। সে ভোরা চোরের মত রাস্তার উপর দিয়ে ছুটতে থাকে আর পিছনে পুরাকালের যুদ্ধ-নাকারার মতন বাজ ডাকতে থাকে। ছুটতে ছুটতে পিছনে তাকায়, দেখে কালো মেঘের কোনটা হয়েছে তালোয়ার, কোনটা হয়েছে তালগাছ, কোনটা হয়েছে অজানা দৈত্য—চকচকে দাঁত বের করে রয়েছে। হঠাৎ হিমশীতল বৃষ্টির ফোঁটা মাথায়, ঘাড়ে, কাঁধে পড়তে থাকে, হাত উঁচু করে ছুঁতে দেখে হাতের পেছনে ফোঁটাগুলো জমা হয়।

রাস্তের অস্পষ্ট শব্দ এবার স্পষ্ট হয়ে চারিদিকে ফেটে পড়ে। কালো সিল্কের ওপর জরীর কাজের মত চমকে বিদ্যুৎ উঠে। লোকটি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। পথশ্রান্ত পা জোড়া কিন্তু কলের গাড়ীর মত ঠেলে নিয়ে চলে। আর জলের ফোঁটা টপটপ্ করে পড়তে থাকে কুঁজো পিঠের উপরে; ফোঁটাগুলো এখন পুঁতির মালার মতো গাঁথা। ভিজে কাপড় আর ঠাণ্ডা পা'দুটোর জন্য ভাবনা হয়। জলে-ভেজা ঝাপসা চোখ মেলে ও চারিদিকে একবার দেখে: রাস্তার ধারে হয়ত বা একটা মন্দির কিংবা জনশূন্য সরাই মিলতে পারে। আশ্রয়টা যাই হোক না ভদ্রতার সংশিক্ষা ভুলে ও সোজা ঢুকে পড়ে। নিংড়োতে নিংড়োতে নিজের মনেই বলে,

'ইস্! কি বৃষ্টি'—তারপর হয়ত দরজার উপরে একটা চেনা কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে পেতে বসে। হাতগুটিয়ে বৃষ্টির সৌন্দর্য্যের তারিফ করতে থাকে।

আসলে বৃষ্টিটা অনেক সময় শাপে বর হয়েছে। গরীব পড়ুয়াদেরদল যখন সরকারী পরীক্ষার জন্য যেতো তখন অনেকেই তো বৃষ্টির মধ্যে পড়ে রাস্তার ধারে, ভেঙে-পড়া মন্দিরে আশ্রয় নিয়ে পরীক্ষের সাক্ষাৎ পেয়েছে! অনেকে বাঁশ ঝাড়ের পাশে কোন বিরাট পরিবারের অতিথিশালায় আশ্রয় নিয়েছে। বাড়ীর মেয়ে ঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছে বিপর্য্যস্ত এই পড়ুয়াকে। তারপর প্রথম দর্শনেই প্রেম। চাঁদের আলোয় রডোডেন্ড্রন ঝোপের ধারে তাদের দুজনের আলাপ হয়েছে, পণ করেছে, হয় বিবাহ নয় মৃত্যু। লাজুক মেয়ে পড়ুয়ার হাতে জেডের একটা আংটি ফেলেই পালিয়েছে; সাজানো কিন্তু ফাঁকা ঘরের একটাই হচ্ছে এক টুকরো আশার আলো—আর যে-মানুষ খ্যাতির সন্ধানে বেরিয়েছে তার পথের পাশেও···

আমিও একবার বৃষ্টির মধ্যে পড়েছিলুম, কিন্তু রূপকথার ঘুমের দেটা বহুপরে। তাই আমার ভাগ্যে বিশেষ কিছু জোটেনি। তাছাড়া আমার বয়েস তখন বোধ করি বারোও পূর্ণ হয়নি, মাথায় একমুঁটি চুলও উঠেছে কিনা সন্দেহ। সেই সময় গ্রামের দক্ষিণ দিকে একটু বাইরে একটা স্কুলে আমি রোজ পড়তে যেতুম, সেখানে দিনের মধ্যে আট ঘণ্টা চীৎকার করে কনফুসিয়াসের উপদেশবাণী আউড়ে যেতে হত মন থেকে (তা না হলে করে পিটুনী)।

তারপর বিকেল চারটের সময় চূণকাম-করা দেওয়ালের উপর কনফুসিয়াসের পাথর-কোঁদা লেখার দিকে তিনবার নমস্কার ঠুকে ছুটে বাইরে চলে আসতাম।

আমাদের বাড়ী থেকে স্কুলটা খুব দূরে ছিল না। বাড়ি ছাড়িয়ে কাশ-ফুলে-ভর্ত্তি একটা শুকনো জলা পার হলেই স্কুল। এরই ধারে আমাদের বাড়ী, সামনে সীমনে পাহাড় দিয়ে ঘেরা পাঁচটা খেতখামার। নিজেকে তখন ভবঘুরে ভাবতে ভারী ভালো লাগতো। তাই স্কুলের বাঁধাধরা নিয়ম-কানুন থেকে সোজা আমার বাড়ীর নিয়মে ফিরে যেয়া পড়া মোটেই পছন্দ করতেম না। তাই যতক্ষণ পারা যায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম, তবু মাঝে মাঝে লম্বা টেবিলের উপর কাচের বোয়েমপ্তা আমার সোনালী মাছদের কথা প্রায়ই মনে হতো।

একদিন আমার থেকে বয়সে বড় একটি ছেলের সঙ্গে গ্রামের দু-তিন মাইল বাইরে একটা নদীতে কাঁকড়া ধরতে গেলুম। কিন্তু কাঁকড়ারদল আমাদের চেয়ে অনেক বেশী চালাক। কাঁকড়া যে রাত্রে গর্ত্তন ছেড়ে ধরতে হয় আর সকালে কাঁকড়ারা যে ঘুমোয়—এসব ঠিক করে জানবার আগেই আমাদের পাজামা নদীর জলে ভিজে গেছে। দুজনে নদীর ধারে বসে ছুতো শুকোচ্ছি এমন সময় আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া কালো মেঘ জমা হতে শুরু হলো। পূবদিগন্তের জোর হাওয়ার ধাক্কায় গমের শীষ একসঙ্গে উঠতে আর নামতে লাগলো; দূরে পাহাড়িয়েরা গোরুহানে সোনাঝুরির সারে রূপালি পাতাগুলি চিকচিক করতে লাগলো। আশে-পাশে জংলী অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে রওনা দিলুম, কড়ের সঙ্গে পাল্লাদিয়ে, পায়ের তলায় ভিজে ছুতো প্যাচ্‌প্যাচ করতে লাগলো। 'পাতলা পাড়ীর' আগেই

শিশিরগুলির মত বৃষ্টির ছোটো ছোটো দানা, ঘন আর আমাদের খোলা মাথার উপর আক্রমণ সুরু করলো। তারপর একটা ডালের ক্ষেতের পাশে ছোট্ট ঘাঁওাবর দেখে সেইদিকে ছুট লাগালুম।

ভিতরে তিন কিট লম্বা লক্ষ নলে তামাক খাচ্ছে একজন চাষা, ঘোঁয়াটে চোখ, গোটা মুখটা কোঁচকানো দাগকাটা। বেশ আরামে বাইরের বৃষ্টির দিকে চেয়ে আছে। আমাদের দেখে মুখের ভাঁজগুলো আরও একটু গভীর হলো, নলটা আবার মুখে পুরলো। বাইরের প্রচণ্ড বৃষ্টি-ধারার মতনই বুজন ক্ষুধে মানুষের উপস্থিতি তার কাছে সমান অর্থহীন। লালচে চোখে সে উদ্বেগশূন্য তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে।

যেমন করেই হোক তার মনটা আমাদের দিকে ফেরানো দরকার। তাই ভয়ে ভয়ে বললুম, 'এখানে আশ্রয় নিলে তোমার কোন আপত্তি নেই তো খুড়ো?' মুখ থেকে নলটা বার করে যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদের কথায় ও সায় দিলে।

দরজার কাছে জায়গা করে নিয়ে বসা গেল। খড় আর গোবরের গন্ধে জায়গাটা একেবারে ভরপুর। বৃষ্টির জোর ক্রমেই বেড়ে চলে, খোড়ো চাল থেকে গড়িয়ে-পড়া জলের পরদা ক্রমেই ঘন হতে থাকে। দরজার ভিতর দিয়ে দেখি বনগাছ সব প্রায় মাটিতে শুয়ে পড়েছে। আমাদের যেন মনে হয় পৃথিবীতে বৃষ্টির জলের বাঁধ ভেঙেছে আর তার সাথে সাথে জলের ফুলে ফুঁড়ি ধরছে আর ফুল ফুটছে। বন্ধু তখন তার ধলে সাফাতে ব্যস্ত আর আমি ভিজে জুতো জোড়া খুলে বসে আছি, ভাবছি আজ রাতের শান্তিটা কি ধরণেরই হবে।

হঠাৎ ইঞ্চিপানেক গভীর জলে মানুষের পায়ে ভারী ছপছপানি শোনা যায়, পরক্ষণেই দেখি ঘরের কোনে ধরেছে একটা ছাড় বের করা সরু হাত। অল্পবয়সী একটি মেয়ে ছাতের চোয়ানো জলের নীচে দাঁড়িয়ে আছে, মাথার চুল ভিজে চটের বড়ির মতন হয়ে গেছে। আমি ওর পেয়ে হাত থেকে জুতোজোড়া ফেলে দিয়েছি। একজন বেরে মানুষ এই বৃষ্টির মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে! তার পরিধানের পাতুটোর কথা আমার এখনও মনে আছে, দেখে মনে হয়েছিল দুটো কাদামাখা কদাকার ইঁটের টুকরো। ওর নীল পাজামাদুটো ভিজে একেবারে বেতনে হয়ে গেছে, গায়ের জামা কাপড় শরীরের সঙ্গে এত লেগে আছে যে ভিতরের শিরশিরে চামড়া অবধি দেখতে পাচ্ছি। হাসিমাখা বুদ্ধিহীন মুখ, এ মুখে শীত বর্ষা বা লজ্জার বিন্দুমাত্র দেশ নেই। বৃষ্টির ভিতর দিয়েও ওর চোখের উজ্জ্বলতায় পাগলামী ধরা পড়ে।

ও যে ভিতরে আসতে চায় সেটা বোঝাই যাচ্ছে। ঘুরে দাঁড়াতেই কাদায় কাদায় ছাপ দেখে বুঝতে পারি ও ক'বার হোঁচট খেয়েছে। তাড়াতাড়ি পাশে সরে গিয়ে ওর ঢোকবার রাস্তা করে দি। সঙ্গী আর আমি দুজনেই নতুন লোক দেখে খুশী হই, চাষীটা কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে তামাকের নল নেড়ে ওকে চীৎকার করে তাড়িয়ে দেয়, "ভাগ, ছুঁড়ি এখান থেকে! এখানে হবে টবে না।

মেয়েটি অমলিন হাসতেই থাকে, আমার দিকে একটু সরে আসে। আমি তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে ওকে ধরতে যাই, আমার মা-মাসীদের যেমন করি।

চাষাটি চীৎকার করে উঠে, "খামো! ও একজন পাগল!" মুখ থেকে গরম নলটা নামিয়ে হাতে রাখে।

মেয়েটি ওর দিকে তাকায়, মুখটা ছাঁ হয়ে যায়। তারপর আস্তে আস্তে বৃষ্টির ছাটে মাথা নীচু করে

চাষাটার নীচ থেকে চলে যায়। রেগে চাষাটির দিকে তাকাই, তারপর তাকে বোঝাতে চেষ্টা করি মেয়েটিকে ভিতরে আশ্রয় দেবার জন্য। কিন্তু তার মুখে ভয়, লালচে চোখ সরু আর শক্ত করে ও মেয়েটির দিকে চেয়ে থাকে।

বেয়ানে একটা হাতে ভর দিয়ে মেয়েটি আমাদের দিকে তাকিয়ে দাঁত খিঁচোয়। তারপর গমের ক্ষেতের ভিতর ঢুকে পড়ে। আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় একটা অদ্ভুত, অর্থহীন, বোকা হাসি হেসে যায়। খানিক পরে কয়েকটা ঝোপের ওপর হোঁচট খেতে ও গোখের আড়ালে চলে যায়।

আমি ত প্রায় কাঁদো কাঁদো। এরকম নিষ্ঠুরভাবে ওকে বের করে দেবার কি দরকার ছিল? এমনকি নদীটিও চটে উঠে বিড় বিড় করছে। চাষাটি বুঝতে পারে ওর ওপর আমরা চটেছি। জুতোর গায়ে তামাকের দলটা ঠুকে নিয়ে বলতে থাকে, "আচ্ছা ঝামেলায়! এই ঘরে একটা পাগলী মেয়েকে ঢোকাবো! এমনিতেই যথেষ্ট ভুগেছি, আর নয়!"

ব্যাপারটা জানতে কৌতূহল হয়, মেয়েটি কে ওকে জিজ্ঞেস করি। আমাদের কৌতূহল দেখে ও বেশ খুসি হয়ে ওঠে। আবার দলটায় তামাক ভরতে সুরু করে, পাতাগুলো আস্তে আস্তে হাতের চেটোয় পাকাতে থাকে, যেন বোঝাতে চায় আমরা যতটা নিষ্ঠুর তাকে ঠাউরেছি ততটা নিষ্ঠুর সে নয়। ওর আঙুলের মসৃণতা আমাদের ব্যস্ত করে তোলে, কিন্তু চাষাকে তাড়া দিয়ে লাভ নেই! শেষকালে দলে আগুন ধরলো, নাকের ভিতর দিয়ে লম্বা ধোঁয়া বেরিয়ে এলো; যেন এখন ও অনেকটা আশ্বস্ত। কানের পিছন দিকটা চুলকে ও সুরু করে।

"পাগলী মেয়ে, মানে কেউ আর ওকে চায়না, বুঝেছো?"

"কিন্তু ও কেন পাগলী হতে যাবে?"

"আরে বোকা ছেলে, ও নিজে কি আর পাগল হতে চায়! একটা বড় রকমের ধাক্কা খেয়েছিল কি না।"

"তাতা!" বন্ধুর দিকে তাকাই তারপর সম্প্রতি জোগাং গ্রামে কি ঘটেছে' মনে পড়ে। "ওর স্বামীকে হারিয়েছিলো বুঝি?"

"না, ও ওর স্বামীকে হারিয়েছে। ওর স্বামী হচ্ছে তু মের মেজো ছেলে। একেবারে কচি বয়সে দুজনের বিয়ে ঠিক হয়। বিয়ে হয় গত বছরের আগের বছর। তারপর মেজো ছেলে গেল পিকিঙে লেখাপড়া করতে। নতুন জায়গা, নতুন ধরণধারণ। তারপর ফিরে এলেই বৌ-এর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। বৌ বেচারী আর কিই বা করতে পারে! তারপর সহর থেকে এলো নতুন বয়সের বৌ। ভাইনী বড়ই চালাক! ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল, ছোট উঁচু কাপড়! দুজনে মিলে পুরোনো বৌকে দিলে তাড়িয়ে। কিন্তু সে যাবেই বা কোথায়? বাপ মা তো অনেক আগেই স্বর্গে গেছে, আছে কেবল এক ঝাপটে ভাই যেন পচা নরম আমটি। অগত্যা স্বামীর ঘরেই রইল দাসীর মত। নতুন বৌ-এর সারাক্ষণ সব বিষয়ে খুঁতখুঁতানি; যেদিন গালাগাল হয়না সেদিন ওর ভাগ্যে জোটে প্রহার। শেষে বেচারী পাগল হয়ে গেল সারাদিন গান করে "দিনরাত আমি থাকি চালাঘরে..."

এ সব কথা তখন বিশেষ কিছুই বুঝিনি, তবে আমাদের খুশে মন এটা বুঝেছিল যে ও নিজের দোষে পাগল হয়নি। তাই বার বার আমরা বলতুম,"তাই বলে তুমি কেন ওকে তাড়িয়ে দেবে?" চাষা ওয়াক্ থুঃ করে বালিকটা থুথু ফেলে যেন এই বিশ্বাসহীন বৃষ্টিকে গালাগাল করলে। "তোমরা দেখেছো ওকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি। যদি তোমাদের সাক্ষী মানি তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই আমার হয়ে বলবে। ওকে তাড়িয়ে দেওয়ার আমার আর কি দোষ বল? কতকটা মানুষ আছে যারা অন্তর সাদিল……! রাত্রে এই পাগলীকে বাইরে মাঠে একটা শিশু গাছের সঙ্গে ওরা চেন দিয়ে বেঁধে রেখেছিলো। তারপর মাঝরাতে নারীমাংসের গন্ধে শয়তানের আগমন। তোমাদের বাচ্চাদের সে-সব কথা বলে আর কি হবে? এ নিয়ে তোমরা আবার রটিয়ে বেড়িও না, বুঝেছো?"

কিন্তু এই সব আজেবাজে কথার মধ্যে আমরা আমাদের কথার উত্তর খুঁজে পাইনি। বৃষ্টি আস্তে আস্তে ধরে আসছে আর আমার সঙ্গী তভো তাড়া দিচ্ছে বাবার জন্যে। আমি কিন্তু ব্যাপারটা তখনও ঠিক বুঝতে পারিনি, "কিন্তু তুমি কেন ওকে তাড়িয়ে দিলে?"

"আরে, ম্যাজিস্ট্রেট লায়া গ্রাম লোকটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। একবার ধরা পড়লে দারোগা তার পিছনে লাগবে। আমি কখনও ওকে এখানে আশ্রয় দি! কেউ কি বিশ্বাস করবে বৃষ্টির জন্য ও এখানে আশ্রয় নিয়েছিলো? সবাইকার কি তোমাদের মত বুদ্ধি খাটে না?"

ঝড় প্রায় থেমে গেছে, পাতার চাল বেয়ে জল পড়ছে আস্তে আস্তে। আকাশের রঙ্ টা হয়েছে ধোঁয়াটে ছাই; লম্বা গাছের শীষ যেন হাপাচ্ছে, ওদের গা বেয়ে বৃষ্টির ফোঁটা এখনও ঝরছে। পাগলীর গল্প শুনতে আমার ভারী ভাল লাগছিল কিন্তু সন্ধ্যে বাড়ী ফিরবেই, মায়ের বকুনিটা যদি সন্ধ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় সেই ভয়ে। আমার আবার ভিজে জুতোর কথা মনে পড়ে যায়।

"তোমরা বাড়ী ফিরে যাও। দেরি করলে দিন ছোট হয়। ভালো ছেলে হবে, বুঝেছো? বড় হয়ে 'নতুন বরণ' দেখে তোমাদের মাথা যেন না ঘোরে।" তামাকের নলটা আবার টুকে নিয়ে ও ফুঁ দেয়, অদ্ভুত একটা শিসের শব্দ হয়। তারপর সোজা হয়ে বসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আমার আবার মনে হয় কথা! হয়ত তোমরা দুজনেই বিয়ে করবে নৌকার মত বড় পা-ওয়ালা মেয়েদের। দিনকাল বদলাচ্ছে যে, দিনকাল বদলাচ্ছে……"

চালা ছেড়ে যখন বের হলুম তখন বৃষ্টিটা ধরেছে কিন্তু অন্ধকার হয়ে আসছে। রাস্তাটায় এতো জল আর কাদা যে আমাদের ছুতো হাতে করেই নিয়ে যেতে হলো; চুপ্‌চাপ্ হাঁটছি আর মাঝে মাঝে পিছনে চেয়ে দেখছি।

বেশ কিছুদিন পরে আবার সেই গ্রামের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। পায়ের কাছে শূয়োর আর মুরগী খেলা করে বেড়াচ্ছে, হঠাৎ একটা হাসি, এতো রংদার আর ধারধারে যে মুরগীগুলো অবধি ছুটে পালিয়ে গেল। শব্দটার দিকে হেঁটে যাচ্ছি, কিন্তু মোড় ঘোরবার আগেই কানে আসে সেই সুর, এই কাঁদছে, এই গাইছে।

"কর্তা ঘুমোল পুবের ঘরে,
পশ্চিম ঘরে নতুন বৌ,
আর আমার জন্যে চানাঘর……"

ঈদগার উপহার

(মূল হিন্দী হইতে)

লেখক—প্রেমচন্দ্র
অনুবাদ—শ্রীমহেশচন্দ্র পাল

উৎসব বর্ষে বর্ষে আসে, তবু পুরানো হয় না। স্মরণাতীত অতীত হইতে এক-একটি পর্ব্বকে কেন্দ্র করিয়া সেই যে আবেগের উচ্ছল প্রবাহ বহিতেছে, আজও তাহার উচ্ছ্বাস মন্দীভূত হইল না। ঈদে, আগমনীতে তেমনি করিয়া আনন্দের বান ডাকে ; মহরমে, বিজয়া-দশমীতে তেমনি আকুল অশ্রু পাষাণের উথলিয়া উঠে।

কালের ভ্রূভঙ্গীকে এড়াইয়া পাশ-পার্শ্বিন সব যে এখনও চিরনূতন রহিয়াছে, তাহার কারণ মানব-হৃদয়ের প্রেম। এক পুরুষ যায়, অন্য পুরুষ আসে কিন্তু পুরুষানুক্রমে মনুষ্য-হৃদয়োত্থ ভাবের একই বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া অবিচ্ছিন্ন ধারায় ছুটিয়া চলে বলিয়া তাহার সজীবতা ম্লান হইতে পায় না।

যে-ভাবনার অবিচ্ছিন্নতা উপাসনাকে জীয়াইয়া রাখে, তাহারই অভাবে অনভ্যস্ত অন্য সম্প্রদায়ের নিকট এক কৃত্রিম অনাবশ্যক ধার্ম্মিকতা বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে। যুগান্ত-পুষ্ট অনুরূপ মনোভাব ত অনভ্যাসের নাই। মহরমের শোকযাত্রায় যুবকেরা হাসেন হোসেনের নূতন-রচিত স্মরণে অধীর হইয়া নিজেদের অঙ্গকে তীক্ষ্ণধার অস্ত্রে হানিতে থাকে। স্বেচ্ছাকৃত ক্ষতমুখ হইতে যখন রক্তের ধারায় শোণিত-প্রবাহ বেহ প্লাবিত করে, তখন পথচারী অন্যধর্মী দর্শক যে একেবারে বিচলিত না হয়, তাহা নহে ; তবু তাহার মনে শোকার্ত্তের অনুভূতির গভীরতা সম্বন্ধে সংশয় ঘোচে না। কিন্তু এই পর্দ্দে অবরোধ-বাসিনী অন্তঃপুরিকারা লোকলোচনের অন্তরালে বেতাবে আত্মহারা হইয়া অশ্রুনদী বহাইতে থাকেন, তাহা দেখিলে অবিশ্বাস আর মাথা তুলিতে পারে না।

মহরম শোকের স্মারক ; ঈদ শান্ত আনন্দের। আনন্দের উৎসব বলিয়াই ইহার আবেদন যেমন ব্যাপক তেমনি গভীর। ধনী-দরিদ্র-আবালবৃদ্ধবনিতা সর্ব্বশ্রেণী সমভাবে উচ্ছ্বাসোদ্বেল হইয়া উঠে। আলোড়নের পরিমাণ বিবেচনা করিলে হিন্দু-পর্ব্বসমূহের মধ্যে একমাত্র দুর্গাপূজার সঙ্গে ঈদের তুলনা হয়। সময়টাও পাশাপাশি। একমাস কাল কোন-কিছুকে উদ্দেশ করিয়া কৃচ্ছ্রসাধন করিলে মন ত আপনা হইতেই সমাপ্তি দিনের প্রতীক্ষায় ভাব-গদগদ হইয়া উঠিবে। সত্য বটে, রোজা কেউ কেউ রাখে না ; ইহাকে সম্পূর্ণ উপবাস বলাও ভুল ; কারণ অন্ধঘরে হইলেও দুইবার আহার ত বাদ যাইতেছে না। তবু রমজান মাসে দৈনন্দিন জীবনধারার আমূল পরিবর্ত্তন হয়। ইহার উপর, সাধুভক্তের প্রভাব আছে, ধ্যান-ধারণা, অতিথি-কাঙাল সেবা প্রভৃতি সূক্ষ্ম আনন্দের সঙ্গে ভূরি-ভোজন নব-বস্ত্র-পরিধান প্রভৃতি সাধারণের অনুভূতিগম্য আনন্দের বিধান আছে। সাজিয়া-গুজিয়া দল বাঁধিয়া ঈদগাহ যাওয়া ও আছেই। তাছাড়া দুর্গাপূজা বা বড়দিনের মত, সারা বৎসর

বিচ্ছিন্ন আত্মীয়-বন্ধু-পরিজনের সঙ্গে মিলন-আলিঙ্গনের এই পরম শুভ-অবসর। এবম্বিধ সম্মেলন ভদ্রচেতন নানা কারণের একত্র সমাবেশের ফলে ঈদ সমগ্র সমাজের মধ্যে এক অতি প্রবল ভাবোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে। ছোটদের ও আহ্লাদের আর সীমা থাকে না।

সব সমাজেই দেখা যায়, উৎসবের মাতামাতি শিক্ষিত লোকের মনে কমিতেছে। সারাটা বৎসর যাহারা খাটিয়া কাটায়, তাহারা আর উৎসবে মাতিবে কি! প্রতিদিনই তাহাদের উৎসব,—বিশেষতঃ পান ভোজনের। কিন্তু নিরক্ষর নিঃসম্বল গ্রাম্য লোকের কাছে ঈদ সমস্ত বৎসর ধরিয়া দিন গণিয়া গণিয়া প্রতীক্ষা করিবার মত মহামূল্য শুভদিন। রোজ রোজ ইহারা ভালমন্দ ত খাইতে পায় না, ছিন্ন মলিন বস্ত্র তালিযুক্ত বস্ত্রই ইহাদের আচ্ছাদন। শুধু ঈদের অপেক্ষায় তাহারা থাকে, তিল তিল করিয়া ক্ষুদ কুঁড়া বা চোক সঞ্চয় করে। সেদিন একটু ভাল খাইতে হইবে, খাওয়াইতে হইবে; নূতন কাপড় পরিতে হইবে, প্রিয়জনকে দিতে হইবে। যাহারা হত-দরিদ্র, তাহারাও পুরাতন কাপড়-জামা নিপুণভাবে রিপু করিয়া ধোপাকে দিয়া ধোয়াইয়া লয়, পারিলে রং করায়; চাহিয়া-চিন্তিয়া আর কিছু না হোক, একটুখানি পায়েসের উপকরণ ত জোগাড় করেই।

রমজানের পুরা ত্রিশ রোজা শেষ হইয়াছে,—আজ ঈদ। পত্রিকার ১৩।১৪ দুই দিনেরই উল্লেখ ছিল, কিন্তু বার তারিখের সন্ধ্যায় শত নর-নারীর আগ্রহ-ব্যাকুল দৃষ্টিতে দূর দিগন্তে ক্ষীণতম শশিকলার অস্তিত্বও ধরা পড়ে নাই। পরদিন অবশ্য খুব ভাল করিয়াই দেখা গেল। উত্তর-পশ্চিম ভারতে "ঈদের চাঁদ" প্রবাদে পরিণত হইয়াছে—বড় দুষ্প্রাপ্য, বহু আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব বুঝাইতেই লোকে বলে 'যেন ঈদের চাঁদ।' নির্দিষ্ট দিনে অস্তগামী রবির শেষ রশ্মিচ্ছটা ম্লান হইতে না হইতেই মসজিদের উচ্চতম মীনার হইতে বৃদ্ধোক্তদের অপলক নেত্র আকাশের দূর প্রান্ত সন্ধান করিতে থাকে; চন্দ্ররেখা দৃষ্টি-গোচর হইবামাত্র সঙ্কেত হয়,—সঙ্গে সঙ্গে তোপের বজ্রধ্বনি দিগ্বিদিক কাঁপাইয়া আগামী প্রভাতের উৎসব বার্তা ঘোষণা করে।

বোমা-বিস্ফোরণের দ্বারা সংবাদ ঘোষণা অবশ্য সহরেই হয়। গ্রামে বোমাও নাই, উঁচু মীনার-ওয়ালা মসজিদেরও অভাব। কিন্তু তীক্ষ্ণতর চক্ষু আছে। প্রতীক্ষমান ব্যগ্র দৃষ্টিতে চন্দ্রোদয় ঠিক সময়েই ধরা পড়ে। তৎক্ষণাৎ চারিভিতে বালক-বালিকাদের উত্তেজিত কলগুঞ্জন শোনা যায়। বয়স অনুসারে সামান্য জোরা বিনিময় আরম্ভ হয়। কে আগে চাঁদ দেখিয়া আব্বাজানকে সংবাদ দিল, (আব্বাজান পাশেই দাঁড়াইয়া; নিজের নাবালক পুত্রকন্যা হইতে কিঞ্চিৎ উঁচু বিদ্যায় তাহারই আগে দেখিবার কথা,—আগ্রহ উত্তেজনাও যে কম তাহা নয়!) সেই নিয়া তুমুল বিতর্ক কোলাহল চলিতে থাকে।

ভাদ্রমাস; যে সব স্থানে বৃষ্টিপাত আদৌ কম, সেখানেও এই সময় আকাশে মেঘের মেলা। তবুও যে চাঁদ দেখা যায় নাই, হয়ত মেঘাবগুণ্ঠনই তাহার কারণ। কাল বিকালে হঠাৎ আকাশ, অন্ততঃ পশ্চিম দিকটা, ঘটঘটে পরিষ্কার হইয়া গেল, কালবৈশাখী সন্ধ্যার গলিত স্বর্ণে স্নান করিয়া বিশ্বচরাচর ঝলমল করিয়া উঠিল। আবহাওয়া-বিশেষজ্ঞ বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা চোখের উপর হাতখানি একচালার মত রোপণ করিয়া কণ্ঠ অপসৃয়মান দৃষ্টির সমস্ত শক্তি পশ্চিম গগনে সংহত করিয়া মাথা নাড়িলেন: লক্ষণ ত ভাল নয়! হাসিতে

হাসিতে যে সূর্য্য বিষাদ নিল কাঁদিতে কাঁদিতে কাল সে ফিরিবে। বৃষ্টি হইলেই বিপদ হইয়াছে আর কি! ছাতা-টাতা অনেকেরই নাই, থাকিলেও এক একখানি আছে, বাচ্চাকাচ্চা সমেত এক-এক পাল লোককে তাহারই আশ্রয়ে তিন ক্রোশ দূরের ঈদগায় পারাপার করা অসম্ভব। ভিজা কাকের মত ঈদগায় পৌঁছিয়া কি সুখ!

কিন্তু বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ভবিষ্যদ্বাণীও যে ব্যর্থ হয়, এবারকার ঈদ তাহা প্রমাণ করিয়া ছাড়িল। যে সূর্য্য হাসিতে হাসিতে গিয়াছিল, হাসিমুখেই সে ঈদের প্রভাতে পুনরায় দর্শন দিল। রাত-ভোর এক ফোঁটা বৃষ্টি হয় নাই। এক রাত্রির মধ্যেই যেন ভাদ্রের ঘোর-ঘোর ভাব পুরাপুরি কাটিয়া গিয়াছে, অকালে শরৎরাজ শরতের পূর্ণোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। পত্র-পুষ্প তৃণ-গুল্মের সে কি বাহার! সিক্ত পত্রে সোনার আলো এক রকম খেলে; আবার, যে পাতা দীর্ঘদিন বৃষ্টিতে ভিজিয়া প্রাণরসে ভরপুর হইয়া সদ্য গা মুছিয়াছে, তাহাতে প্রভাত-কিরণ আর এক রকম করিয়া চকমক করে! মানুষের সঙ্গে প্রকৃতিরও আজ উৎসব……

হামিদ এই সবে সাতে পা দিয়াছে। সংসারে আপন বলিতে তাহার আছে এক পঞ্চাশী বছরের বুড়ী ঠাকুমা আমিনা। উভয়ে উভয়ের অবলম্বন। এই ভাঁড়াটুকু না থাকিলে বুড়ী তোদার ছেলের শোক কিছুতেই সামলাইয়া উঠিতে পারিত না। আর পিতৃ-মাতৃহীন অনাথের এই আশ্রয়টুকু থাকিলে কি যে হইত, অনুমান করা শক্ত নয়। তবে হামিদ ইহার-বিশেষ কিছু বুঝিতে পারে নাই। মায়ের বদলে ঠাকুমাকে আম্মাজান বলে। আগে মায়ের কোলে শুইত, এখন ঠাকুমার কোলে শোয়। আমিনা আপী কলেরায় যখন মারা যায়, হামিদ তখন তিন বছরেরটি। এরপর হইতেই মা কি রকম যেন হইয়া গেল। শরীর শুকাইতে শুকাইতে অস্থিচর্মসার, মুখ ফ্যাকাসে, কাটিলে রক্তের বদলে বুঝি জল বাহির হইবে। চোখের দৃষ্টি নিভিতে নিভিতে একদিন আর জ্বলিল না। এক বছরও পুরে নাই, অভাগিনী স্বামীর অনুগমন করিয়াছে! মা যে আর নাই, হামিদ তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। আম্মাজান অবশ্য বিদেশে রোজগারের জন্য গিয়াছে। অগণতি খেলনা মিঠাই লইয়া ফিরিবে।

সুতরাং বুড়ীই একমাত্র আশ্রয়। আশ্রয়টুকু যে খুব দৃঢ়, তাহা বলা যায় না। বুড়ী বয়সে জীর্ণ, ততোধিক দারিদ্র্যে জীর্ণ! সেই জীর্ণতার ছাপ হামিদের উপর পড়িয়াছে! দুর্বল শরীর, জোলো চেহারা মাথায়ও তেমন বাড়ে নাই। তবে দুঃখ-দারিদ্র্য তাহার ভঙ্গুর সিকলিকে দেহকে কিছুটা শক্ত করিয়াছে;—মনে হয়, সহজে ভাঙিবে না। কথায়-বার্তায় একটু অকালপক্ক; শিশুসুলভ কমনীয়তা নাই। সেও দুঃখ-দুর্ভোগের কল্যাণেই।

বেলা বাড়িয়া চলিল। ঈদগায় যাওয়া উপলক্ষে গ্রামে যে পরিমাণ দৌড়াদৌড়ি সুরু হইল, তাহা একপ্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনেরই মত দেখিতে। অতি বৃদ্ধ ছাড়া কেহ আশপাশ পাঁচ মিনিট বসিয়া থাকিতে পারিতেছে না। সে কিছুটা উৎসব-উৎসাহিত প্রাণচাঞ্চল্যবশে, বেশীর ভাগ অভাবের তাড়নায়। যত্নে ধোয়াইয়া, ইস্ত্রি করিয়া কেহ আচকানটি রাখিয়াছিল, পায়ে দিতে গিয়া দেখে একটাও বোতাম নাই। আন আন, সুচ সুতা বোতাম আন। কোথায় সুচ, কোথায় সুতা। তাড়াতাড়ির সময় হাতের

কাছের জিনিষও চোখ এড়াইয়া যায়। শেষে সুতা-সুতা মিলিল ত বোতামের হদিস পাওয়া গেল না। সুতরাং পাশের বাড়ীর মহম্মদ মিঞার বিবির নিকট ছুটিতে হইল। কেহ ভাড়িয়া মুড়িয়া ছুতা জোড়া ঘরের কোণে রাখিয়াছিল। বৃষ্টি যদিও নাই, তবু তিন্না দেওয়ালের আওতায় তাহাতে রাত্রির মধ্যেই ছাতা ধরিয়া গেছে। তেল দিয়া চকচকে করিয়া লইতে হইবে—সুতরাং সৈন্যাধিপতির দরবার যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই; কারণ ঘরের গৃহিণী বাসনগুলা মাজাইবার জন্য যে-তেলটুকু সঞ্চয় করিয়াছে, রীতিমত যুদ্ধ না করিলে তাহার এক ফোঁটাও বাহির করা সম্ভব হইবে না। এই সব ত আকস্মিক বিপদ—তাহারও পরিমাণ ও সংখ্যার এত আকস্মিক যে নাম দেওয়া যায় না। এই সব ঝামেলা ছাড়া আছে আর প্রাতঃকৃত্য,—গো-সেবা আদি। গরুগুলিকে গোয়াল হইতে বাহির করিয়া পাছে বাঁধিয়া ঘোরাইয়া মুছাইয়া দিনকার মত খড়-বিচালী দান দেওয়া চাই। ঈদগা হইতে ফিরিতে বেলা কি একটার কম হইবে! তিন ক্রোশ পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া-আসা কত লোকের সঙ্গে কোলাকুলি, মেলায় জিনিষপত্র কেনা কাটা—একটা ত বাজিবেই।

সকলের চেয়ে বেশী প্রবল ছোটদের দল। অধিকাংশই অবশ্য রোজা রাখে নাই। কেহ দুপুর, কেহ একদিন, কেহ কষ্টে-সৃষ্টে এক বেলা পর্য্যন্ত। কিন্তু ঈদগায় যাইবার উত্তেজনা কাহারও কম নহে। তাহাদের কাছে ঈদগার অর্থ—মেলা,—খেলনা, পুতুল, মিঠাই। রোজা ত বয়স্কদের জন্য, নমাজও তাই; মেলাটা ছোটদের। সর্ব্ববিধ চিন্তার ভারমুক্ত, স্বচ্ছন্দবিহারী মানবশিশুর দল নাচিয়া কুঁদিয়া বেড়াইতেছে, চরকীর মত বড়দের পায়ে-পায়ে ঘুরিতেছে। চাচা ফুফা আব্বার দল কেন ঈদগা যাইতে দেরী করিতেছে, তাহা তাহাদের বুদ্ধির অগম্য। গৃহস্থের চিন্তা ত তাহাদের নাই। সেমই তৈরী করিবার জন্য দুধ গুড় ঘরে থাকুক না থাকুক' তাহারা বুঝিবে না। তাহাদের ত খাইতে পাইলেই হইল। আব্বাজান হন্তদন্ত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে যে কেন চৌধুরী কাদের আলীর ঘরে দৌড়াইতেছেন, চৌধুরী একটু কঠিন হইলেই ঈদ যে মহরমে পরিণত হইবে, সে সব কথা বালক-বুদ্ধিতে প্রবেশ করে না।

সকলেরই জেবে কিছু কিছু পয়সা। কাহারও কাহারও সঞ্চয় একেবারে ষোল পয়সার অসম্ভব সীমায় গিয়া ঠেকিয়াছে—গুণিতে গুণিতে খুই পাওয়া যায় না। গুণিতে অধিকাংশই শিখে নাই। পাঁচ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া তারপর সাত, তারপর বার। বারর পর আবার বাজে নয়ে—নয়, দশ। তারপর সোজা ষোল। কেবল এই যে কুবেরের রত্ন-ভাণ্ডার তাহা দিয়া সারা মেলাটাই ঘরে তুলিয়া আনা যায়।

হামিদের আছে মাত্র তিনটি পয়সা। গুণিতে না শিখিলেও এ যে নেহাৎ কম, তাহা সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় বুঝিতে পারিয়াছে। ছোটদের ত কোন ঘাঁট নাই। তাই একদিকে তাহা যেমন নির্ব্বিকার পরম-হংসের সঙ্গে তুলনীয়, অন্য দিকে দয়ামায়াহীন কসাইয়ের। হামিদ বুঝাইবার চেষ্টায় ছিল, এখন পয়সা কম হইলে কি হইবে, আব্বাজান আম্মা মিঞার দরবার হইতে বুড়ি বুড়ি পুতুল খেলনা মিঠাই লইয়া ফিরিল বলিয়া। ছুটি দিন সবুর কর না। কিন্তু পকেটে যাহাদের পাঁচ সাত বারো নয় দশ ষোল পয়সা, তাহাদের সবুর সহিবে কেন? আম্মা মিঞার নাম তাহারা শুনিয়াছে, হামিদের বাবার ওখানে যাইবার কথায়ও অবিশ্বাস নাই, কিন্তু আজ ত আর ফিরিতেছে না। সুতরাং আজ তাহারাই বাজীমাৎ করিবে।

হামিদের সঙ্গে সহজে কথায় কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু আজ বেচারী আর গলায় তেমন জোর পাইতেছে না। শুধু কি মোল পয়সাই নাই? পায়ে জুতাও যে নাই। মাথায় তালি দেওয়া পুরানো টুপি—কিনারায় তেল ময়লায় পলস্তারা এমন সাঁটিয়া বসিয়াছে যে কোরান রিপ চাড়িলে যদি উঠে। ম্লান মুখে হামিদ ভিতরে গেল কিন্তু দাদীর শীর্ণ গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে দেখিয়া আর কিছু বলিতে পারিল না। আজকাল মাঝে মাঝে এ রকমটা চোখে পড়ে বটে। আমিনা প্রাণপণে হামিদকে দুঃখের আঘাত হইতে আড়াল করিয়া রাখিবার চেষ্টা করে; যে শোকাগ্নি নিজের অন্তরটাকে অহরহ পোড়াইয়া খাক করিতেছে, তাহার লেলিহান শিখা ও সবলে চাপিয়া রাখে। কিন্তু দারিদ্র্যের আঁচ কিছুটা কমাইতে পারিলেও, প্রাণের দাহকারের টুঁটি সব সময় চাপিয়া ধরা যায় না। পর্দ্দে উৎসবে ধৈর্য্যের বাঁধ কখন কখন ভাঙিয়া যায়।

হামিদকে দেখিয়া বুড়ী চোখ মুছিল। হামিদ আজকাল মাঝে মাঝে এইভাবে চকিতে নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এমন কি বুদ্ধিও যেন তাহার! মুখে বলিল: তুমি কিছু ভেবো না আম্মা। কিচ্ছু ভেবো না। আমি সকলের আগে ঈদগায় না পৌঁছি ত কি বলেছি

আমিনা ভাবিতেছিল: আজ যে ঘরে কিছু নাই সে কথা, আর চোখের জল ফেলিতেছিল। সেই শুধু কিছুই নাই। দুধ ত নাই-ই। আজ লোকে কত পীর ফকির ভিখারীকে খাওয়ায়; এমন দিনেও এই তুচ্ছ জিনিষের জন্য তাহাকে অন্যের কাছে হাত পাতিতে হইবে। আব্বি বাঁচিয়া থাকিলে ঈদ কি এই ভাবে কাটাইতে আসিত?—এমন হামিদের ঈদগায় যাওয়া সম্বন্ধেও সচেতন হইল। বালকেরা সকলেই নিজ নিজ বাপের হাত ধরিয়া ঈদগায় যাইবে। হামিদের ত ত্রিভুবনে এক আমিনাই সম্বল। প্রাণ ধরিয়া এই দুধের বাছাকে কি একেলা এই ভীড়ের মধ্যে যাইতে দেওয়া যায়? যদি হারাইয়া যায়? তিন ক্রোশ হাঁটিবে কি করিয়া? পায়ে ফোস্কা পড়িবে না? জুতাও ত নাই। এক, নিজে যদি যায়, কিছুদূর পরে পরে কাঁদে লইয়া যাইতে পারে; কিন্তু খুব শুদ্ধ যোগাড় করিয়া ঘরে একটু সেমই রাঁধিবে কে? পয়সা থাকিলে ঈদগা হইতে ফিরিবামাত্রই সব জিনিষ নিমিষে একত্র করা যায়। মাগিতে গেলে এত তাড়াহুড়া কাজ চলে না। মাস খানেক আগে যখন বিবির কাপড় সেলাই করিয়া আট আনা পাইয়াছিল। ঈদের জন্য তাহা এতদিন কত সতর্পণে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে,—আধুলী ত না, যেন সে নিজের ইমান। কিন্তু কালই গোয়ালিনী আসিয়া বাকী পয়সার জন্য এমন তাগাদা সুরু করিল। হামিদের জন্য বুড়ী রোজ দু'পয়সার দুধ নেয়, পনর দিনের দাম একসঙ্গে দেয়। গোয়ালিনীরও ত ঈদের খরচ আছে; পয়সা না লইয়া সে নড়িবে না। অনেক কাকুতি মিনতিতে সেদিনকার দশ পয়সা বাকী রাখিয়া পাঁচ আনা লইয়া গিয়াছে। আট আনার মধ্যে তিন আনা বাঁচিল। আমিনা প্রথমে মনে করিয়াছিল ইহা হইতে এক আনা হামিদকে খেলার জন্য দিবে। তাহাতে হামিদ একুনে সাত পয়সার মালিক হইবে। কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া বৃদ্ধা এক আনা ফকিরকে দান করাই স্থির করিল। সাধু-ফকিরের খেওয়ায় হামিদের কল্যাণ হইবে। বাকী রহিল দু' আনা। ইহাতে দুধ সেমই শুদ্ধ সব ত হয় না। সুতরাং দুধ মাগিয়া আনিতে হইবে। পাওয়া গেলে যাইতেও পারে: গ্রামে অনেকেই গরু রাখে।.....

মোপানী নাপতিনী মেথরাণী সকলেই আসিবে পার্ব্বণী আদায় করিতে। ঘরে যে কিছু নাই তাহা তাহারা বোঝে না। আর কিছু না হোক; এক পেয়ালা সেমই ত চাইই।.....

আবার চমক ভাঙে। বুড়া মানুষের মাথার ঠিক নাই। হামিদকে ঈদগায় যাইতে মানা করিবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু আনমনে একথা সে কথা ভাবিতে ভাবিতে কোথা হইতে কোথায় পৌছাইয়া গিয়াছে! এদিকে হামিদও চলিয়া গিয়াছে। কার সঙ্গে গেল কে জানে।

বুড়ী উঠিল। পাশের বাড়ীর করিমুদ্দির ছেলেদের সঙ্গে গিয়াছে। বাপ মা মরা ছেলেটার উপর সকলেরই মায়া আছে। করিমুদ্দির বিবি আশ্বাস দিল: কোন ভাবনা নেই চাচী। সব এক সঙ্গে ফিরিবে।.....

গ্রাম খালি করিয়া লোকজন চলিয়াছে। সকলের আগে ছেলেরা। হামিদও আছে। তাহারা কেহ হাঁটিয়া যায় না কিছুদূর দৌড়াইয়া গিয়া গাছের তলায় জিরায়, আবার দৌড়। দেখিতে দেখিতে সহর আসিয়া পড়িল। ছোট সহর। ঈদগা একবারে অপর প্রান্তে। বাজারের রাস্তা ধরিয়া সহর পার হইতে হয়।

মাঠ ছাড়িয়া যাইতে না যাইতেই রাস্তার দুধারে ধনীদের বড় বড় বাগানের সারি; প্রত্যেকটি দেয়াল দিয়া ঘেরা। আম লিচুর গাছগুলি অনেকদিন আগেও ফলভারে নুইয়া পড়িতেছিল; এখন মরশুম শেষ; কেমন যেন শ্রীহীন দেখাইতেছে। ছেলেরা কেহ কেহ খাপোখাই গাছে ঢিল ছুঁড়িতেছে। পাখী বা ফল যদিও নাই, তবু পূরবীয়া মালী "কৌন হ্যায় রে" বলিয়া ডিউটি বাজাইতে ছাড়ে না। ছেলেরা হাসিয়া উঠে।

বড় বড় ইমারত দেখা দিতে লাগিল: আদালত, কলেজ, ক্লাব। ইস্, এতবড় কলেজের বাড়ী, কত ছেলে পড়ে কে জানে। মামুদের মামুও পড়ে। মামুদ দেখিয়াছে, পড়ুয়ারা সব বড় বড় জোয়ান মরদ, কাহারও কাহারও গোঁফ দাড়ি আছে। এত বড় হইয়াও এরা কি যে পড়ে। কতদিন পড়িবে, পড়িয়া শেষে কি করিবে, এই নিয়া তর্ক বাধিয়া গেল। হামিদদের মক্তবে দু'তিন জন বড় বড় ছেলে আছে; রোজ মার খায়; লুকাইয়া বিড়ি শুদ্ধ গুড়ি টানে; লেখাপড়ার ধার ধারে না। এই কলেজেও তেমনি সব নিকর্মার দলের আড্ডা সন্দেহ নাই। বড় হইয়া গেলে নাকি আবার পড়া যায়! ক্লাব ঘরে জাদু হয়। মরা মানুষের মাথার খুলি নাচে, আরও কত রকম তামাসা হয়। তবে ভিতরে যাওয়া নিষেধ। আর, বিকালে এখানে সাহেবরা খেলে। গোরা ওয়ালাদের স্কুল কলেজে পড়িতে যাওয়া যেমনই হোক, খেলাটা সত্যই অবাক করিবার মত। হুটোপাটি ও ছোটদেরই এক চেটিয়া। কিন্তু সহরে মেথি সবই বিপরীত। আর শুধু কি তাই? মেমরাও খেলে যে! মামুদের নিকট শুনিয়া সকলের তাক লাগিয়া গেল। মাসী, চাচী, দাদী, আম্মারা লাফাইতেছে ঝাঁপাইতেছে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে কল্পনা করিয়া ছেলেদের তারী হাসি পাইল। হামিদ বলিল: আমার আম্মা ত ভাল করে চলতেই পারে না, দৌড়বে কি।

ইব্রাহিম সায় দিল: ঐ যে কি বলে বেট, আমার আম্মা ত ধরতেই পারবে না। ছুঁতে হলেই হয়েছে আর কি! হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে। মামুদ কোন কিছুতেই কাহারও কম যাইতে পারে না। মেমদের খেলিবার কথা সেই ত বলিয়াছিল। তাহার দাদু সহরে পড়ে, তাহার আম্মা হামিদ ইব্রাহিমের আম্মা হইতে কম কিসে। বলিল: আমার আম্মীজানের ত হাত কাঁপতে লাগবে। সত্যি, এমনি এমনি করে কাঁপবে। মোহসিন সাধারণতঃ প্রতিবাদ করিয়া থাকে। সে বলিল: কি যে বলিস মামুদ। মণ-মণ আটা

শিখতে পারে, বেট ধরতে হাত কাঁপবে! এই টুকু ত বেট। দু ঘড়া পানি নিয়ে আসে রোজ। তোদের মোষটারই ত পাঁচ ঘড়া না হলে তেষ্টা মেটে না। মেয়গুলো ত যেমন পুতুলের মত সাদা, তেমনি চুনকো। এক ঘড়া জল তুলতে গেলে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে না? আল্লা কসম।

গৌরবের দিকটা মানুষের চোখ এড়াইয়া গিয়াছিল। তবু একবার কথাটা বলিয়াছে, নিজের কোট ছাড়াটি কিছু নয়। ক্ষীণস্বরে বলিল: কিন্তু আব্বা দৌড় ঝাপ করতে ত পারে না।

মোহসিন: খামোখা দৌড়বেই বা কেন? তবে দরকার পড়লে কমও যাবে না। আমাদের গাইটা সেদিন দড়ি ছিঁড়ে চৌধুরীদের ক্ষেতে গিয়ে পড়েছিল। তাকে ধরতে গিয়ে আব্বা এমন জোরে ছুটলে যে আমি নাগাল পেলাম না সত্যি বলছি। আল্লা কসম।

ততক্ষণে হাসুইকরদের দু' একখানা দোকান খোলা গিয়াছে। আজ দোকান খুব সাজাইয়াছে। এত মিঠাই খায় কে? এক-এক দোকানে মিঠায়ের পাহাড়। রাতে না কি জিন আসিয়া সব কিনিয়া লয়। আব্বা বলেন মাঝ রাতে একটি লোক এক-এক করিয়া সকল দোকানে হাজিরা দেয়; সব মিঠাই কিনিয়া চাদির টাকা গুণিয়া দেয়। তামার টাকা নয়, আমাদের টাকার মত রূপোর টাকা।

হাফিজের বিশ্বাস হইল না—আমাদের টাকার মত টাকা জিন পায় কোথায়?

মোহসিন দর্পভরে মত নাক উঁচাইয়া জবাব দিল: জিনের আবার টাকার কমতি! তুই যেন কি হাফিজ। কেন, সে মাল খাওনার ইচ্ছামত চলে যেতে পারে না? লোহার দরজা ওদের আটকাতে পারে নাকি? টাকা ত টাকা, হীরা মোতি পর্যন্ত ওদের কাছে থাকে। যার উপর খুশী হল, এক মুঠি দিয়ে গেল। এখন এখানে আছে, দুমিনিটে কলকাত্তা। হাওয়ার আগে ছোটে। আল্লা কসম।

হাফিজ চোখ বড় করিয়া জিজ্ঞাসা করিল: জিন খুব বড়-বড় হয়, না?

মোহসিন: এক একটি আসমান বরাবর। মাটিতে দাঁড়ালে মাথা আসমানে ঠেকে। আর ইচ্ছা হল ত এতটুকু বদনার মধ্যে ঘুড়ুৎ করে সেঁধিয়ে গেল।

হাফিজ—লোকে ওদের কি করে বশ করে ভাই? একটা অভ্যর পাই ত জিনকে খুশ করে তাঁরে রাখি।

সর্বজ্ঞা মোহসিনও এবার কিছুটা বস্তি স্বীকার করিল—সে জানিনে ভাই। কিন্তু এটি ঠিক, চৌধুরী সাহেবের হাতে অনেক জিন আছে। কারও কোন জিনিষ চুরি যায় ত চৌধুরী সাহেব তক্ষুণি বলে দিতে পারে, কোথায় আছে। গুনিসনি, সেদিন ফুলেরাতির বাছুর হারিয়ে গেল। তিনদিন নিখোঁজ। হয়রাণ হয়ে ফুলেরাতি চৌধুরীর কাছে গিয়েছে কি, চৌধুরী অমনি বলে দিলে: খোয়াড়ে খোঁজ করগে যা। আর সত্যিসত্যি সেখানেই পেলে। জিন এসে ওকে সব বলে দিয়ে যায়—কি না। আল্লা কসম।

চৌধুরীকে সকলে কেন যে এত মানে তাহার হদিস তাহা হইলে এতদিনে পাওয়া গেল।.....

পথ ফুরাইতেছে। এই ত পুলিশের আস্তানা। কানিসটিকিল এখানেই লোককে কয়েদ করিয়া রাখে। গয়টন কার কো। আহা, রাতরাত তাপিয়া বেচারারা পাহারা দেয়। না হলে চুরি ঠেকাইবে কিসে?

ততক্ষণে মোহসিন একটু দম লইয়াছে। আবার সন্তেত প্রতিবাদ করিল: শোন কথা। কানিসটিকিল

পাহারা দেয়, না হাতী! আসল চোর ত ওরাই। শহরের যত সব চোর ডাকাতের সঙ্গে যড় আছে। এক মহল্লায় চোরকে বলে চুরি কর, আর অন্য মহল্লায় গিয়ে চেঁচায়: 'জাগতে রহো'। আমার এক মামু থানায় কনিসটিকিনের কাজ করে। কুড়ি টাকা ত মোটে মাইনে; কিন্তু কী-মাসে পঞ্চাশ টাকা করে পাঠায়। একবার আমি জিজ্ঞেস করলাম: মামু এত টাকা পাও কোথায়? মামু হেসে জবাব দিলে—বেটা, দুনিয়ায় ঘিদমতে টাকার অভাব। মনেই আবার মনে: আমরা ইচ্ছে করলে একদিনে লাখ টাকা কামাতে পারি। শুধু চাকরী চলে যাবার ডরেই করিনে। আল্লা কসম।

হামিদ জিজ্ঞাসা করিল: এরা চুরি করায়, তো কেউ ধরিয়ে দেয় না?

মোহসিন তাচ্ছিল্যের ভানে বলিল: আরে পাগলা, ধরবে কে? ধরবার মালিক যে আমার ওরাই। তবে হাঁ, আল্লা ওদের সাজাও দেন খুব। সেবার মামুর ঘর দোর পুড়ে একবারে খুঁটের ছাই। জল খাবার বাটি সেদিন একটিও বাঁচে নি। কদিন গাছের নিচে থাকতে হয়েছিল। তারপর কোত্থেকে একশো টাকা ধার করে আবার সংসার পাতে। খুদাকী কসম।

হামিদের চিন্তাধারা একশোর ধাক্কায় অঙ্কের খাতে বাহিয়া গিয়াছিল। সে অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞাসা করিল: একশো—ত পঞ্চাশ থেকে বেশী;—তাই না?

ইব্রাহিম মোহসিনের একচেটিয়া সর্বজ্ঞতায় চটিতেছিল। এবার আল্লাকসমওয়ালা কিছু বলিবার আগেই চুক চুক শব্দে কৃপা প্রকাশ করিয়া ইব্রাহিম বলিল—'কোথায় একশো, কোথায় পঞ্চাশ—পঞ্চাশে ওরে মোটে এক গুণি; একশো তিন গুণিতে ভুলোর না।'—সংখ্যা-বিজ্ঞানে তেমন দখল না থাকায় মোহসিন প্রতিবাদ করিল না, বিশেষতঃ ইব্রাহিমের পড়াশোনায় নাম আছে।

হামিদ তিন গুণির উপযুক্ত পরিমাণে হাঁ করিয়া একশোর মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিল।

মহসা শিছন হইতে ডাক পড়িল। বড়বাজারের মধ্য দিয়া না যাওয়াই স্থির হইয়াছে। গলিপথে গেলে শুধু যে শীঘ্র পৌঁছাইবে তাহা নহে, ছেলেরা দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনর্থক দেরী করিবার সুযোগ পাইবে না! আর ঈদের দিনে কাহাকেও বকাবকা, ধমকানো—কিছু নয়। কিংকর্তব্যে চোখ ভরিয়া যেমুক না, কেহ মানা করিবে না।

এলো গলি, দুধারে ঘন বসতি। বর্ষাকালে লতাপাতা যে পরিমাণে সতেজ চিক্কণ হয়, পাকা বাড়ীগুলি তেমনি, কাটলে ছাতায় সেওলায় যহা বিশ্রী হইয়া উঠে। সর্বাঙ্গে যেন দাদ, তেমনি ভ্যাপ্‌সা গন্ধ। তবু বড় বাড়ী হইলে. সামনে পাশে ফুল বাগান থাকিলে একরকম মানাইয়া যায়। সববাড়ীগুলি যেমন ছোট, তেমনি ঘিঞ্জী; গলিও নোংরা। গা ঘিন্‌ঘিন্ করে। বালকেরা উৎসাহিত হইয়া উঠিবার মত তেমন কিছু পাইতেছে না, এক নূতন নূতন বদমায়েসী। কাতারে কাতারে লোক চলিয়াছে, সকলের পুরোভাগে ক্ষুব্ধে মানবকবাহিনী। বিনা ভূমিকায় পরস্পর আলাপ পরিচয় করিতে বাধে না। সমবয়োচিত কুশল প্রশ্ন—যেমন, কত পয়সা আছে, কি কিনিবে ইত্যাদি সারিতে না সারিতেই কেহ বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িল। ঈদগা সামনেই! এখন গাড়ী ঘোড়ার ভীড় খুব। চিত্তবিচিত্র বেশভূষা; সকলেই যথা-শক্তি সুগন্ধ ছড়াইতেছেন,—দামী আতর হইতে বাসের বড় পর্যন্ত।

হামিদের দল এবার আর স্বয়ং-সম্পূর্ণ নহে। গাড়ী-ঘোড়ার পাদস্পর্শ হইতে বাঁচাইবার জন্য মামা চাচা আব্বাজানের বাচ্চাকাচ্চার হাত ধরিয়াছে। করিমুদ্দি নিজের ছেলেকে এক হাতে হামিদকে এক হাতে ধরিল। দুই পাশে অগুণতি দোকানের সারি। তবে রাস্তায় এত বেশী লোক যে একেবারে কিনারায় গিয়া না দাঁড়াইলে খুদেদের কিছু দেখিবার উপায় নাই। যে দিকেই তাকাও, দৃষ্টি রোধ করিয়া পাগড়ীসমেত ছ'ছ ফিট লম্বা জোয়ানের দল। রাস্তায় দাঁড়ানো চলে না; পুলিস 'চলতে রহো' 'চলতে রহো' হাঁকিতেছে।

ভীড়ের মধ্যে ঠাহর হয় নাই, সকলে একেবারে ঈদগায় মাঠ পার হইয়া আসিয়াছে। এখন আর রশিটাক। এই ত নমাজের জায়গা। মাথার উপর তেঁতুল গাছের ছায়া; নীচে শান বাঁধানো মেঝে। মেঝের উপরে ভাঙ্গিয় পাতা। যতদূর দৃষ্টি চলে, শুধু নমাজীর সারি—ভাঙ্গিয়ের বাহিরে বাঁধানো মেঝের শেষ সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। শেষে যাহারা পৌঁছিল, তাহারা পিছনেই স্থান পাইবে—ইহাতে ধনী দরিদ্র ইতর-ভদ্রের ভেদ নাই। নমাজ আরম্ভ হইল। দশ লক্ষ লোক একত্র এক সঙ্গে উঠিতেছে, হাঁটু গাড়িয়া বসিতেছে আভূমি প্রণত হইতেছে,—যেন লক্ষ দীপ একসঙ্গে জ্বলিয়া উঠিতেছে, নিভিতেছে, আবার জ্বলিতেছে। এইমাত্র যেখানে রণক্ষেত্রের তুমুল কোলাহল হইতেছিল, সেখানে শ্বাসপ্রশ্বাসও যেন পড়িতেছে না এমন নিস্তব্ধতা। বহুলোকের ভাবনা একমুখী, অন্তঃসঞ্চালন এক ভাবস্রোতক হইলে হইলেই ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়। সর্ব্ব দেশে সর্ব্বকালে সমবেত উপাসনার এই-ই হয়ত আসল রহস্য।.....

নমাজ শেষ হইয়াছে। এখন কোলাকুলির পালা। তারপরই মিঠাই ও খেলনার দোকানের দিকে সকলে ধাওয়া করিল। গ্রামের ছেলেবুড়া সকলের সমান উৎসাহ।

ঐ ত নাগর-দোলা। এক পয়সা ফেল, দশ চক্কর ঘুরাইয়া দিবে। নামিবার পর কিছুক্ষণ চক্ষে আর কিছু ঠাহর হয় না, মাথাটা তখনও ঝন্‌ঝন্ করিয়া ঘুরিতেছে।

নাগর-দোলার রকমফের আছে। কোনটার বসিবার স্থান বাক্সের মধ্যে; কোথাও হাতী ঘোড়ার পিঠে। মোহসিন প্রভৃতিরা চলিতে চলিতে সামনে প্রথমে বাক্সওয়ালা দোলনা দেখিতে পাইয়াছিল। সেখানে এক্‌প্রস্থ হইয়া গিয়াছে। ঘোড়া দেখিয়া আবার সখ চাপিল। হামিদ কোনটাতেই চড়িল না, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মুরুব্বী দার্শনিকের মত দোলার কথাই বোধকরি চিন্তা করিতেছিল। হয়ত অভিমানও হইয়াছে। কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসাও করে না; যেন সে দল হইতে আলাদা।

নাগর-দোলার এলাকা ছাড়াইয়া এবার খেলনা-রাজ্য। কত রকম যে আছে।—পুলিসের সিপাহী, রাজা, উকীল, ভিস্তী, ধোপানি, সাধু। ছেলেরা বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করিতে লাগিল। উকীলবাবু কিছু বলিতেছেন মনে হয়। ইব্রাহিম একটু ঝুঁকিয়া উকীলের বক্তৃতা শুনিবার চেষ্টা করিল।

মামুদ কিনিল সিপাহী—বাকী পালামা ও কোট পরা; মাথায় লাল পাগড়ী, কাঁধে বন্দুক, মনে হয় এখনই হাজতে লইয়া যাইবে। মোহসিনের ভিস্তী পছন্দ হইল—কোমর কিছু ঝুকানো, মশকের মুখ বুকের কাছে দুই হাতে ধরিয়া আছে; পরিষ্কার বোঝা যায় জল ছড়াইতেছে। ঝুরে কিনিল উকীল। ইব্রাহিমই কিনিত কিন্তু কিছুক্ষণ কান পাতিয়াও যখন বক্তৃতা শুনিতে পাইল না, তখন হতাশ হইয়া সরিয়া গেল। ঝুরে সে বিষয়ে চিন্তিত নহে। তার মামলাবাজ চাচা রোজ সকালে উঠিয়াই যে বাক্যালাপ করে তাহার মধ্যে ঘন

ঘন উকীলের উল্লেখ থাকে। সুতরাং উকীল তাহার চাই-ই। কেমন বিরাম মেখিতে, পরণে কাল রংয়ের চোগা, নীচে সাদা আচকান, আচকানের সামনেই ঘেব হইতে সোনার চেইন ঝুলিতেছে, এক হাতে বিরাট বই একখানা।

এসব খেলনারই দাম দু'পয়সা করিয়া। হামিদ এক পয়সা দিয়া খোদায় চড়ে নাই, দু'পয়সার খেলনাও কিনিল না। সম্বল ত মোটে তিনটি পয়সা! খরচ করিতে শুরু করিলেই ফুরাইবে। আর খেলনা কিনিয়া লাভই বা কি! হাত হইতে মসকাইল ও চুরমার। জল লাগিল ও রং সব সব সাফ! দুবার হাত ফেলাফেলি হইতে না হইতেই রং চটিয়া যাইতেছে।

সিপাহী, ভিস্তী, উকীলের গুণপণার তুলনা হইতেছিল। মোহসিন চোখ ঘুরাইয়া, মাথা দোলাইয়া বলিল: আমার ভিস্তী রোজ জল দিয়া যাবে, সকালসন্ধ্যে—দুবেলা।

মাহমুদ: আমার সেপাই ঘর চৌকি দেবে। চোর এসেছে কি অমনি বন্দুকের গুলি ছুটল: গুড়ুম ...গুড়ুম.....

নুরে: আমার উকীল চাচাজীর সব লোকসমা লড়বে। রোজ জিতে আসবে, কখনও হারবে না।

সখী: আর আমার ধোপানী তিন বেলা কাপড় কাচবে।

তিনবেলা এই জন্য যে মোহসিনের ভিস্তী দুবার জল দিবে। তাহার উপর টেক্কা না দিলে ত কিসের ভিস্তী!

হামিদ খেলনার কলঙ্কমুক্ত: প্রতিপন্ন করিল—মাটিরই ত তৈয়ী; মাটীতে পড়িলেই বোঝা যাবে কে কত জল, পাহারা বা বক্তৃতা দেয়।.....

কিন্তু চোখ দুটি এই অকাট্য দার্শনিকতায় কিছুমাত্র সায় দিল না। খেলনা পাইবার ইচ্ছা এমনই তীব্র হইয়া ফুটিয়াছে যে, চোখে জল আসিল বলিয়া। একবার যদি চাহে করিতেও দিত! সিপাহীর উপরই লোভটা বেশী। কিন্তু বালকের এত ঘরামারায় মন হইলে পরপৃষ্ঠসে হয় কি করিয়া! সকলে নিজ নিজ সম্পত্তি জাঁকড়িয়া রহিল।

এরপর মিঠাই। কেউ তিলের বেউড়ী কিনিয়াই কচর কচর শব্দে চিবাইতে লাগিল; কেউ গোলাপজাম কিনিয়া অতি সন্তর্পণে জিভে ছোঁয়াইতে ও তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া রসের পরিমাণ পরীক্ষা করিতে লাগিল। দুজন সোহন হালুয়া কিনিল; আর হামিদ শুধু একবার এর একবার ওর মুখের পানে দেখিতে লাগিল। বার বার জিবে হাত যাইতেছে। কিন্তু বারবার হাত দিলে হইবে কি! সেই সনাতন তিন পয়সাই আছে। একটা কিন্তু কিনিলেই ফুরাইল।

মোহসিন বলিল—হামিদ, এই নে এই রেউড়ী নিয়ে যা। বেশ মিষ্টি খেতে।

কে কি পরিমাণ দাতা, হামিদের তাহা অজ্ঞাত নহে। নিতাই পরিচয় পায়। তবু আশা তাকিল হয়ত ঠাট্টা নয়, দিতে পারে। চোখে সংশয়, কিন্তু হাত ঠিক পাতিল। মোহসিন নিতান্তার মতই হামিদের হাত পর্যন্ত ছোঁয়াইয়া তাড়াতাড়ি রেউড়ী মুখে পুরিল। তারপর তারি হাসাহাসি। হামিদ আঘাত সামলাইয়া পরক্ষণেই শক্ত হইয়া দাঁড়াইল। আবার মজা দেখিবার জন্য মোহসিন বলিল: এবার ঠিক দেব হামিদ, হাত পাত।

হামিদ—রেখে দে তোর মেঠাই। ছেলেছিস আমার পয়সা নেই?

সম্মী—আছে ত মোটে তিন পয়সা। এই সাত রাজার ধন দিয়ে কি কিনবেন হজুর?

মাহমুদ—আমি তোকে গোলাপজাম দিচ্ছি। মোহসিন কারী বদমায়েস। এই নে।

হামিদ একবার ঠকিয়াছে, আর তাহাকে পা দিল না। অবজ্ঞা দেখাইয়া বলিল—মিঠাই আবার খায় নাকি। বইয়ে কত খারাপ লিখেছে।

মোহসিন—সব বুজি। মুখে বলছে বটে কি, মনে মনে ভাবছিস তুঁকতে পেলেও হয়। তা, তুই নিজের পয়সা কেন বার করছিস নে? খরচ করবি না ত পয়সা আনলি কেন?

পয়সা যে কেন খরচ করিতেছে না, তাহা হামিদের নিকটও খুব স্পষ্ট নহে। সকলে তাহাকে ঝাঁপ দিয়া নৌকায় চড়িয়াছে, উকীল সেপাই ভিস্তী কিনিয়াছে, দেখাইয়া দেখাইয়া খাইতেছে; তাই বোধহয় তাহার উল্টা রোখ চাপিয়া গিয়াছে। তিন পয়সায় কি কিনিবে এই সব ছোঁড়াদের মুখে চুণের মত হয়, তাহাই হয়ত ভাবিতেছে। অন্ততঃ সবজান্তা মোহসিন এই অনুমানই করিল। বলিল: আমি জানি, কেন এখনও পয়সা বের করছে না। আমাদের পয়সা সব শেষ হয়ে গেলে তখন ও কিছু কিনবে, আর ও মেলিতে দেখিয়ে খাবে। আল্লাকসম।

সুতরাং সকলে সাবধান হইল। তাড়াতাড়ি শেষ করিলে শেষে হায় হইবে। কিন্তু শিশুর নিকট মুখ রক্ষার চেয়ে মুখে কিছু পোরার লোভ ঢের বেশী জোর রাখে। দেখিতে দেখিতে সকলের শেষ টুক্‌টুক্ নবডঙ্কা। শুধু মাহমুদের নিকট তখনও সরবত খাইবার জন্য এক পয়সা আছে। ইতিমধ্যে মিঠাইয়ের দোকান শেষ হইয়া লোহা লক্কড়ের এলাকা সুরু হইয়াছে।

তখনও হামিদ কিছুই কিনে নাই। হাতা বেড়ী তাওয়ার দোকানের সামনে আসিয়া হঠাৎ কি মনে পড়িল। মোহসিনেরা আগাইয়া চলিয়াছিল, হামিদ তৎক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতেছে—এই চিমটার কত দাম?—আর ভাবিতেছে, আম্মার চিমটা নাই, তাওয়া হইতে রুটি নামাইতে, আগুনে সেঁকিতে কখন কখন হাত পুড়িয়া যায়। একটী চিমটা হইলে বেশ হয়। আম্মা তারী খুশী হইবে। কিন্তু তিন পয়সায় হইবে কি?

—এই ছোট চিমটার কত দাম লালাজী?

পুরানো লোহার খুচরা কারবারী। জিনিষপত্র যেমন নড়বড়ে, মানুষটিও তেমনি। মুখ বিকৃত করিয়া পাশের খাতুন ও পাতা চুলকাইতেছিল। প্রশ্ন শুনিয়া চোখ তুলিল। সঙ্গে কেহ নাই দেখিয়া মনে করিল খামোখা দরদস্তুর করিতেছে, কিনিবার মতলব নাই। কিন্তু এইটুকু ছেলে বেশ আদব-কায়দা জানে ত! তাহাকে কেহ লালাই বলে না, এ একেবারে লালাজী বলিয়াছে। প্রসন্ন চিত্তে জবাব দিল: বেটা, এর দাম ছ পয়সা।

হামিদের মুখ ম্লান হইল। দুপুরের রোদে মুখখানা বড় করুণ দেখাইতেছে। ময়লা টুপির কিনারা বাহিয়া কাণের পাশ দিয়া ঘাম ঝরিতেছিল। দোকানী আর এক ঝলক দেখিয়া বলিল—আচ্ছা বেটা, পাঁচ পয়সায় দিয়ে যেও।

হামিদ বলিল—তিন পয়সা আছে; যদি দাও, দাও।

—না, না, সে কি করে হবে।

দোকানীর ব্যবসায়ী-বুদ্ধি লজ্জা পাইয়াছে।

এদিকে মোহসিন মামুদেরা ডাক পাড়িতেছে : হামিদ বাড়ি ও আয়, আমরা আর দাড়াতে পারিনে। এই সরবতের দোকানে একটু বসছি, তারপর চলে যাব।

হামিদ—এই যাই—বলিয়া দোকানের সামনে কিছুক্ষণ দাড়াইয়া রহিল। দোকানী কেরু পায়ের হাজিয়া-মাওয়া আঙুলে মন দিয়াছিল। একটু পরে আবার মাথা তুলিয়া দেখে, হামিদ যায় নাই, চিমটার দিকে চাহিয়া আছে। দোকানী তাহাকে দেখিতেছে বুঝিয়া হামিদ চলিয়া যাইতে পা বাড়াইল। এক পা যাইতেই শুনিল—আচ্ছা নিয়ে যা। তিন পয়সাই দিস। একটাতে না হয় লাভ নাই হল। শেষ কথাটি নিজেকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা।

হামিদ চিমটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে তিন সাথে সঙ্গীদের নিকট হাজির। মামুদ, ইব্রাহিম, সম্মী একসঙ্গে কোলাহল সুরু করিল—দেখি, দেখি, কি কিনলি দেখি। আরে এযে চিমটা। আচ্ছা পাগল যে তুই! খেলনা নয় যে খেলবি; মিঠাই নয় যে খাবি। চিমটা দিয়ে করবি কি তুনি? বাবুর্চির কাজ শিখবি নাকি?

মোহসিন ফোড়ন দিল—চিমটা দিয়ে চিমটি কাটবে আর কি।

হামিদ ব্যঙ্গ বিদ্রূপের জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল। চিমটাখানি বন্দুকের মত কাঁধে তুলিয়া সদর্পে দাঁড়াইল। তারপর ঝনঝন শব্দে চিমটা মাটিতে আছড়াইয়া মোহসিনকে বলিল :—আছড়াতে পারিস নিজের ভিস্তীকে এমনি করে? চকনাচুর হয়ে যাবে না? দেনা, একবার ঠুকে দেখি কেমন ধরদ তোর ভিস্তী।

চিমটা ও বাকা মিলিয়া যে পরিমাণ শব্দ সৃষ্টি করিল, তাহাতে অমন যে তুখোড় মোহসিন, তাহারও তৎক্ষণাৎ কথা যোগাইল না।

মামুদ বলিল : তা বলে, তোমার চিমটা ত আর খেলনা নয়।

হামিদ : খেলনা না কেন তুনি? ইচ্ছে করি ত কত্তালের মত বাজাতে পারি। কাঁধে তুলে নিলুম, বন্দুক হয়ে গেল—ফায়ার হো। হাতে করলুম, ফকীরের চিমটে হয়ে গেল। এই চিমটের এক চোটে তোদের সব খেলনা ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যাবে। উকীল ভিস্তী সিপাই সব মিলে ঠেলেও আমার চিমটাকে একচুল নড়াতে পারে? আয় না, দেখি—বলিয়া আবার চিমটা কাঁধে করিল।

সম্মীর চিমটা-মাহাত্ম্য সকলের আগে হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল। দু'আনার কেনা ভুগডুগী আগাইয়া দিয়া বলিল —বদল করবি ভাই আমার সঙ্গে? দু' আনার কিনেছি।

হামিদ উপেক্ষার হাসি হাসিয়া বলিল : বেচে যে তোর ভুগডুগী। আমার চিমটা ইচ্ছা করলে তোর ভুগডুগীর পেট এফুণি ফেড়ে ফেলতে পারে। এক পাতলা চামড়ার ইস্তা মামলা, দুদ লাগল আর গেল। আর আমার বাহাদুর চিমটা? ঝড়ে তুফানে, জলে আগুনে একটু উনিশ-বিশ হবে না।

আর চিমটার প্রভাব কেহ অস্বীকার করিতে পারিল না। কিন্তু সকলেরই পুঁজি শেষ। তাছাড়া এখন খেলা ছাড়াইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে। ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব নয়। পয়সাই বা কোথায়। এখন আবার পয়সার জন্য বায়না ধরিলে চড়-চাপড় খাওয়াই সার হইবে।

সকলের প্রতিনিধিস্বরূপ মোহসিন অনুতাপের ভঙ্গীতে বলিল—আল্লা কসম।

হামিদের উৎসাহ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল।

—এখন যদি বাঘ আসে, তবে তিন্তীর মশক ফুটো হয়ে যাবে, সেপাই বন্দুক ফেলে পালাবে, উকীল বাবু হেঁস হয়ে ভুঁয়ে লুটিয়ে পড়বে। আর আমার চিমটা? বাঘের ঘাড়ে চড়ে তার চোখ উপড়ে ফেলবে।

মোহসিন শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল—জল আনতে ত পারবে না?

হামিদ চিমটাকে উর্দ্ধমুখী করিয়া কহিল—ও জল আনতে যাবে কোন দুঃখে? তিন্তীকে এমনি মশক দেবে যে বাছাধন দিন-ভোর জল বইবে।

মোহসিন সম্পূর্ণ পরাজিত হইল। সমস্তের এমন দুর্দ্দশা, তাও আবার দুইবছরের ছোট হামিদের হাতে। কি আপশোষ!

ততক্ষণে মাহুদ সাহস করিয়া আবার কোমর বাঁধিয়াছে। হাসিতে হাসিতে বলিল—যদি কখনো পুলিশ ধরা পড়ে, তখন ত উকীলের দরকার হবে?

হামিদের কাছে এর কিছুতেই জবাব তৈয়ী ছিল না। তাড়াতাড়ি বিদ্যার বড় বলিল—একে ধরতে আসবে কে?

দুরে মোরের সঙ্গে জবাব দিল, কেন, এই বন্দুকওয়ালা সেপাই?

হামিদ মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল—বন্দুকওয়ালা সেপাই! আহা না, একুনি এক বাঘ [illegible] থাক, দেখি কে হারে কে জেতে?

মোহসিন এতক্ষণে কতকটা সামলাইয়াছে। এক নূতন তর্ক উপস্থিত করিল—তোমার চিমটার মুখ রোজ আগুনে পুড়বে ত? তখন?

সম্মী চিমটার বলে ভিড়িয়াছিল। বলিল: বাহাদুর যে সেইতো আগুনে [illegible] তোমার উকীল সেপাই ত ভয়ে ঘরের কোণে লুকুবে মেয়েদের মত।

মাহুদ মোহসিনের হইয়া যোগদান করিল—উকীল ত চেয়ার-টেবিলে বসবে, তোমার চিমটা রয়েই ঘরে মাটিতে পড়ে থাকবে।

এবার সম্মী পর্যন্ত মোহিত হইয়া গেল। নাম কথার এক কথা বটে। চিমটা মাটিতে লুটাইবে বটে। সম্মী হামিদের পার্শ্বত্যাগ করিল।

হামিদ এবার আগের মত সহায়হীন। কিন্তু ঘাবড়াইল না মুখের মত জবাব না জুটিলেও বলিল: আমার চিমটা রান্নাঘরে থাকবে কেন? তোমাদের উকীলকে চিমটি কেটে মাটিতে ফেলে দেবে আর ও চেয়ারে নিজে বসবে।

যদিও যথোচিত আস্ফালন সহকারে হামিদ উকীলকে ভূপাতিত করিবার ভয় দেখাইল তবু এবার তেমন প্রভাব পড়িল না। সম্মী পর্য্যন্ত ঘাড় নাড়িল। না, চিমটাকে চেয়ারে বসিতে কেহ দেখে নাই।

হামিদ প্রাহ্য না করিয়া পূর্ব্বানুবৃত্তি স্বরূপ বলিল—আর, সব আইনকানুন উকীলের পেট কুঁড়ে বার করে নিয়ে আসবে।

বলিয়াই মাটির ভিতরে চিমটার মুখ বীরবিক্রমে ঢুকিয়া দিয়া আইনের সমাধি-ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিল।

উদয় বিদীর্ণ করিবার কথাটায় ঠিক অস্বীকার করা যায় না। বিপক্ষ দল পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল: না আর পারা গেল না সন্ধী আবার হামিদের দিকে আসিয়া দাঁড়াইল।

তখন সন্ধির সর্ত আলোচনার পালা। খেলনার কি ওজন! চিমটা অক্ষয় হইয়া থাকিবে, খেলনা ভাঙিতে দেওয়া হইবে না। সুতরাং হাত খালি হইবার আগেই সন্ধি করিয়া ফেলা বুদ্ধিমানের কর্ম।

মোহসিন বলিল—তোর চিমটাটা একটু দেনা ভাই, দেখি কেমন। এই নে আমার ভিস্তী ভাল করে দেখ।

মাযুদ, নূরে, সন্ধীও তৎক্ষণাৎ নিজেদের খেলনা পেশ করিল।

হামিদ সদয় ভাবে স্বীকার করিলে পর চিমটা হাতে হাতে ফিরিতে লাগিল।

কিন্তু হামিদের ভাবান্তর হইয়াছে। মুহূর্তে খেলনা হাতে পাইয়াই তাহার মন হইতে চিমটার গৌরব অন্তর্হিত হইয়াছে। সে কাঁদ কাঁদ মুখে বলিল: তোদের আমি খেপাচ্ছিলাম ভাই। কোথায় তোদের খেলনা, কোথায় আমার চিমটা। মুখ দেখে মনে হয় এই বুঝি কথা কইবে। আমার চিমটায় একটু রক্তও যে নেই?

কিন্তু উল্টা সমঝলি রাম! চিমটার গৌরব মোহসিনদের মনে এমন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে যে চোখের জল ও জল, কুকান আসিলেও তাহার মূল্য বিধিত হইবে না। হামিদ এতক্ষণ যে কথা বলে নাই,—উহারা হাসাহাসি করিবে বলিয়াই বলে নাই—তাহা তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উচ্চারণ করিল।—তোর আম্মা চিমটা পেয়ে খুব খুশী হবে, হামিদ, আর কত রোটী খেবে। চিমটা কত দিন কত কাজ দেবে: আমাদের কপালে সত্যি রোজার বদলে মার লেখা আছে।

হামিদ চোখ মুছিল। চিমটা আম্মার কাছে আসিবে স্মরণ করিয়া খেলনার শোক ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

রাত্তার মাযুদের ক্ষুধা পাইলে তাহার বাপ তাহাকে কলা খাইতে দিলেন। সে তাহার অর্ধেক হামিদকে দিল। চিমটা কেনা সত্যই ব্যর্থ হয় নাই।.....

সাড়ে বারোটায় সাত খাঁ আর-একবার দরগরম হইয়া উঠিল। ঈদগার মেলা হইতে সকলে ফিরিয়াছে।

মোহসিনের ছোট বোন দৌড়িয়া আসিয়া মোহসিনের হাত হইতে ভিস্তী মিঞাকে ছিনাইয়া লইয়া উল্লাস ভরে যেই তিড়িং নাচ দিয়াছে অমনি ভিস্তী হাত হইতে ফসকাইয়া ভিন টুকরা। ভাই-বোনের এই লইয়া কিছুক্ষণ মারামারি, তদনন্তর তাহাদের গর্ভধারিণীর রণ-স্থলে প্রবেশ। তিনি নির্বিচারে উভয়কে উত্তমমধ্যম দিলেন। কান্নাকাটি অনেকক্ষণ চলিল।

নূরে মিঞার উকীলের জন্য মর্যাদানুরূপ ব্যবস্থা হইল। উকীল মানুষ, মাটিতে বসিতে ত পারেন না! কাঁচা দেয়ালে দুটি খুঁটি ভূমির সহিত সমান্তরাল করিয়া পুতিয়া তাহাতে তক্তা পাতা হইল! তার উপর কাগজের কার্পেট বিছাইয়া উকীলকে দেয়ালে হেলান দিয়া রাখা হইল। নূরে পাখা করিতে লাগিল। আদালতে বিজলীর পাখা থাকে। আইনের উত্তাপ মাথায় চড়িয়া গেলেই হইয়াছে আর কি!

পাখা করিতে করিতে উকীল সাহেবের গায়ে ঠেকিয়া যাওয়াতে প্রথমত ঘুরে পাখা মারিতে ঠেকাইতে গিয়াছে, কিন্তু তাহার উকিল সাহেব আগেই স্বয়ং মর্ত্তে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। হাত পা মাথা ভাঙিয়া গেল অবশ্য। মহা-সমারোহে উকীলের অন্ত্যেষ্টি হইল।

রহিল মামুদের সিপাই। বাড়ী পৌঁছামাত্রই পা পাহারা দিবার ভার তাহাকে সোপর্দ্দ করা হইল। পুলিশের সিপাই ত যে-সে লোক নয়, হাঁটিয়া পাহারা দিতে পারে না, পালকী চাহিয়া চাই। এক বুড়ির তলার লাল রঙের ছেঁড়া ছাতা বিছাইয়া সিপাহি সাহেবকে আরামে বসান হইল। দুরে বুড়ি মাথায় লইয়া নিজেদের বাড়ীর সামনে এদিক হইতে ওদিকে পাওচারি করিতে লাগিল। ছোট দুই ভাই সঙ্গে সঙ্গে ছোনেবালে জাগতে রহো" হুকারিয়া চলিল। ঘোড় ঘুরিবার সময় দুরে দেখিতে পায় নাই, ছোট ভাই একটি একেবারে পায়ে পায়ে আসিতেছে। ঘুরিতেই দুইজন সামনা সামনি হইয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল। কান্না শুনিয়া মা ছুটিয়া আসিলেন, দুই ভাইকে টানিয়া তুলিলেন। ততক্ষণে সিপাহি সাহেব খেলনা-লীলা সাঙ্গ করিয়াছেন।...

হামিদ ভয়ে ভয়ে বাড়ী ঢুকিতেছে—না জানি আম্মা কি বলিবেন। সে তো কাজের জিনিষই আনিয়াছে কিন্তু আম্মার যদি পছন্দ না হয়!

ডাকিল, আম্মা!

—এই যে, বাই মালিক। আচা, রোদ্দুরে মুখখানা জ্বলে গেছে। কিছু খাসনি নাকি? হাতে ও কি রে!

—চিমটা, আম্মা। আমি.....

—আ হতভাগা, যত সব ছিষ্টিছাড়া কাণ্ড তোমার। চিমটা দিয়ে কি করবি কি? এই তোর আক্কেল হচ্ছে? এ কি রকম খেলনা হল?

—আম্মা, আমি তোমার জন্ত এনেছি। রুটি সেঁকতে তোমার হাত যে জলে যায়—বলিয়া হামিদ কাঁদিয়া ফেলিল।

বুড়ী ত হতবাক। এ-কথা তাহার মনেই উঠে নাই। এতটুকু দুধের শিশু সে যে এই বয়সে এতদূর স্নেহ-মমতার প্রতিদান দিতে শিখিবে তাহা কে জানিত। বিস্ময়ের ঘোর কাটিতেই যা দেরী,—তারপর আঁচলায় দুই চোখ ছাপাইয়া জল ঝরিতে লাগিল।—আহা বাছারে, আজ ঈদের দিনে তোকে খামোকা বকলুম। বুড়ী আম্মার জন্ত তোর এত দরদ!—আঁচলা হামিদকে কোলে লইয়া তাহার মাথা বুকে চাপিয়া ধরিল।.....

চিমটারই জয় সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

পট্টনায়ক, একটা পয়সা

(মূল উড়িয়া ভাষা হইতে)

লেখক—শ্রীগোদাবরীশ মহাপাত্র
অনুবাদ—অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

আস্কো বাস ষ্ট্যাণ্ডে বাস থামার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ শোনা গেল—

পট্টনায়ক। একটা পয়সা!

অনবরত কড় কড়, দম্ দম্, ভঁ ভঁ শব্দ শুনে কানে তালা লেগে গিয়েছিল, মন উঠেছিল বিষিয়ে। রাজপথের ধুলোর মধ্যে বসে থাকার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ ঘোর পরিবর্তন। সেই কর্কশ, রুক্ষ শব্দের জায়গায় করুণ কণ্ঠের এক ক্ষীণ স্বর শোনা গেল—

'পট্টনায়কে, পইসাটিএ!

পট্টনায়ক, একটা পয়সা!

লোকে বাস থেকে নামলো। বাসে উঠে বসলো। লোকে পয়সা গুণলো, টিকিট কিনলো। কিন্তু সেই করুণ কোমল স্বরটির কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটলো না। বরং তাতে একটু চোখের জল মিশিয়ে আরও বিকল ভাবে কোথা থেকে হৃদয়ের মধ্যে প্রতিধ্বনি উঠলো—

পট্টনায়কে, পইসাটিএ!

পট্টনায়ক, একটা পয়সা!

সকলে মুখ ফিরিয়ে দেখে নিলো, সকলে মুখ ফিরিয়ে নিলো; কিন্তু স্বরটি বার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আশেপাশে দু একজন গরু পরিমিত বয়স্কাকে করুণার্দ্র করেছিল, সে সকলের মুখে ঘুরে ঘুরে চেয়ে অসহায় ভাবে বলে উঠলো—

পট্টনায়ক, একটা পয়সা!

কোথায় পট্টনায়ক, কোথায় পয়সা! একথার উত্তর কেউ দিলে না। শুধু একখানা ছেঁড়া নেকড়া কোমরে জড়িয়ে, সংসারকে নিজের বুকের হাড়গুলি গুণে দেখিয়ে দিয়ে সে লোকটি অসহায় ভাবে বলতে আরম্ভ করলো—

পট্টনায়ক, একটা পয়সা!

তার পা মাটিতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো না। তার চোখ ভাল করে খুলছিলো না। সে নিজে সংসারে আছে কিনা বোধ হয় তা জানবার শক্তি তার ছিলো না। তথাপি প্রাণে কি ক্ষীণ আশা নিয়ে শুকনো ঠোঁট থেকে ক্ষীণ স্বর উঠছিলো—

পট্টনায়ক, একটা পয়সা!

সে রথের কাছে চাইলো, মিত্রের কাছে চাইলো। রথ ও মিত্র মুখ ঘুরিয়ে নিলো। দাসকে ডাকলো—'পট্টনায়ক', দাস উঠলো চটে। প্রধান মাথায় পাগড়ি চড়িয়ে বসেছিলো। সে ধরতো 'প্রধান' বলে ডাকলে একটা পয়সা দিতেও পারতো। পট্টনায়ক ডাকে সে খেলো বিপদে। পাশ ফিরেছিলো সামনের সীটে। সে রেগে উঠলো। তথাপি সেই ত্রিশ জন যাত্রীর কাছে সে লোকটি তিনশ বার পট্টনায়ক শব্দ উচ্চারণ করে 'একটা পয়সা একটা পয়সা' ভিক্ষে চাইলো। কেউ বললো—ভারি এটা অত্যাচার, কেউ বললো—লোকটা পাগল, কেউ বা বললো গালাগোর, আকিংখোর, গুলিখোর। সব সে শুনলো; তবু প্রতিবাদ করলো না। লোকে তিরস্কার করলো; তবু চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল পড়লো না। গালাগাল শুনলো; এক পা পিছু হটলো না।

প্রায় তার হাত ছুঁয়ে আমি একটা আনি বাড়িয়ে দিয়ে বললাম—ওরে এই, পট্টনায়ক কে?

সে আনিটা হাতে নিয়ে, চোখের কাছে ধরে, একটু নিরীক্ষণ করে বললো, হাঁ একটা পয়সা। দিয়েছ, ভাল করেছ। নিয়েছিলে তো, দেখ কে?

আমি অবাক হয়ে রইলাম। খানিক চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম—নিয়েছিলাম কবে?

সে যুবকটা একটু উঁচু করে হস্তান্তরেই বললো—কবে? পাঁচ বৎসর আগেকার কথা ভুলে গেছো? সেই যে বালিগঞ্জ গাঁয়ের পাকা ঘরটা। সে বাড়িতে কি রঘু দুবুদ্ধি আর আছে? সে এনেছিল তোমার কাছ থেকে মোটে পঞ্চাশটা টাকা।

এই পর্যন্ত বলে ভিক্ষারীটী একটু যেন ক্লান্ত হয়ে পড়লো। বোধ হয়, তার দম ফুরিয়ে গেলো। তার মাথায় দেখা গেল বিন্দু বিন্দু ঘাম। একটু চোখ বুজে থেকে আবার বললো—

হাঁ, পঞ্চাশ টাকা। তারপরে……পাঁচ বৎসর পরে……পা—ঞ্চ—শো—টা—কা।

এই বলে সে বোকার মত মুখের পানে চেয়ে থাকলো।

বাস ছাড়বার শব্দ হলো—ভঁ…ভঁ…ভঁ; ফট্…ফট্…ফট্…

সত্যি যেন বাসটা ভোরে আটকিয়ে আমি তার কথা শুনবার আশায় গদির উপর উঠে বললাম। সে বললো—হাঁ. হাঁ, পাঁচশো টাকা। বাগান বাড়ি, ঘর দুয়োর, সব…পথে পথে ঘুরে ভিখ মাগছি। তোমাকে খুঁজছিলাম…

বাস ধীরে ধীরে চললো। আমি মুখ বার করে কিছু চাইলাম। বাস চললো—ফট্…ফট্…ফট্। আমার কানে এলো—পট্টনায়ক, পট্টনায়ক, পট্টনায়ক।

এই ঘটনার ঠিক দেড় বৎসর পরে অনেকবার সেই পথে গেলাম; কিন্তু ওরকম পট্টনায়ক ডাক আর শুনতে পেলাম না। কত কান পেতে থাকলাম, কত কার জন্য ফুল করে অপেক্ষা করলাম। একটা পয়সা কত ভিখারির ঝুলিতে দিলাম, দিয়ে কতবার সন্দেহে তার নাম জিজ্ঞাসা করলাম; কিন্তু দেড় বছর আগেকার ব্যাকুল প্রাণের সেই পট্টনায়ক ডাকটি আর শুনতে পেলাম না। দেড় বৎসর পরে আসকা বাস ষ্টেশনের আর একজন ভিখারির সঙ্গে একদিন দেখা হলো। দেড় বৎসর আগে একজন চাইছিলো পয়সা, দেড় বৎসর পরে এ দিতে চাইছে পয়সা। ভিখারি, সে আবার দিতে চায় পয়সা! তার হাত থেকে নেবে কে? কেউ নেয় না, সবাই শুধু দুঃখ করে বলে—'আহা, তাগো এমন করে! বংশ খেলে যে সাত জন্ম খেতে পারে,

তার আজ এই দশা। পট্টনায়ক পাগল হয়ে গেছে। পাগল না-হয়ে উপায় কি? কত লোকের টুঁটি চেপে ধরেছিলো, তাদের ভূত এখন এর টুঁটি ধরে পাগল করে দিয়েছে।' কেউ বা বলে—দেখ নি, সুবুদ্ধি তো এরই জন্য পাগল হয়ে গেলো, আর বাড়ি ফিরলো না। একে খুঁজে খুঁজে সে সারা সংসার ঘুরে বেড়াচ্ছে, আজ আবার এ তাকে খুঁজে খুঁজে পাগল হয়ে ঘুরছে।

পট্টনায়কের নাম শুনে আমার মন সাড়া দিয়ে উঠলো। আমি তার হাতের দিকে হাত এগিয়ে দিলাম। জরাজীর্ণ তিখারিটি আমার হাতে তাড়াতাড়ি পয়সাটি ফেলে দিয়ে হাতটা ধরে ফেললো। তারপরে পাগলের মত হেসে হেসে বললো—দেখা হলো, দেখা হলো। কিন্তু নিই নি, সব রেখে দিয়েছি, সুবুদ্ধি, যাচ্ছ কোথায়?

কন্ডাক্টর বাঁশি ছাড়লো, খেয়াল নেই। কন্ডাক্টর আমার হাত তার হাত থেকে আলগা হয়ে গেলো, হুঁস নেই। আমার গন্তব্য স্থল সে-জায়গা থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে। বাস থেকে নেমে চারদিকে চাইলাম। দেখলাম, আমারই বুকের ভিতর বেড়ংবৎসর পূর্বের সুবুদ্ধি ও একষট্টা পূর্বের পট্টনায়ক পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পেরেছে। দেখলাম, একজন হতাশপ্রাণে চলে যাচ্ছে, আর একজন অন্যতালে তাকে টেনে ধরেছে। দুই ব্যথাতুর প্রাণ সমান তালে আমার ভিতরে নৃত্য আরম্ভ করেছে। তার পরে চোখে পড়লো, পাহাড়, পর্বত, জনস্রোত, হাট-বাজার! কিন্তু সুবুদ্ধি আর পট্টনায়ক কোথায়?

ধনধান্যপূর্ণ বসুন্ধরার একজন ধনী আর একজন দরিদ্রের নিষ্ঠুর খেলা, একজন মহাজন ও একজন খাতকের নির্মম লীলার ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা। সেই অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের ভস্মস্তূপ কোথায় ধূলো হয়ে গেছে; তবুও সেই করুণ-ধ্বনি থেকে থেকে আমার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—পট্টনায়ক, একটি পয়সা!

———

মণিপুরকথা

(মৈতাই ভাষা থেকে)

অনুবাদ—শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

[আসামের পূর্ব্ব প্রান্তে চতুষ্পার্শে পাহাড়েরা যে বিরাট উপত্যকাভূমিতে মণিপুরীদের বাস তা নয়নানন্দকর, শ্যামসুন্দর। মণিপুরের প্রাকৃতিক আবেষ্টন সেখানকার অধিবাসীদের অন্তরে যে সৌন্দর্য্য-বোধের সঞ্চার করেছে, তারই রূপময় প্রকাশ তাদের অপূর্ব্ব মনোহর নির্ম্মল নৃত্যকলা। বিশ্বের সংস্কৃতির ভাণ্ডারে তা এই আদিম জাতির অনব অবদান। এই নৃত্যকলার ভিতর দিয়েই বিংশ-শতাব্দীতে মণিপুরের সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতিগত মিলনের সূত্রপাত, আর সে-মিলনের অগ্রদূত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় জাতীয় বাহিনী পরাধীন ভারতের শৃঙ্খল মুক্তিকল্পে যে মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছিল তার পরিপীঠ হওয়ার ফলে মণিপুরের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হ'ল ঘনিষ্ঠতর। এই ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য এবং সেখানকার মানুষদের সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহলও হয়ে উঠল ক্রমবর্দ্ধমান।

নৃতত্ত্ববিদেরা বলেন, মণিপুরীরা মাঙ্গোলীয় মহাজাতির তোটব্রহ্ম (Tibeto Burmon) শাখার কুকি চিন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কুকি প্রভৃতি অন্যান্য আদিম জাতির সঙ্গে মণিপুরীদের আকৃতি-প্রকৃতি, আচার-ব্যবহার এবং রীতিনীতিগত এত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় যে, এঁদের একই গোষ্ঠীর অধীন বলে মনে করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তদুপরি মণিপুরীদের সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, স্মরণাতীতকাল থেকে এঁরা এক উন্নত সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। শুধু নৃত্যকলা নয়, বিভিন্ন শিল্পকলার অনুশীলনে এঁদের নৈপুণ্য বিস্ময়কর। আসামের সমস্ত আদিম জাতির মধ্যে একমাত্র এঁদেরই নিজস্ব বর্ণমালা আছে। এঁদের মধ্যে যে-ভাষা প্রচলিত, তার নাম মৈতাই ভাষা। মৈতাই ভাষায় লেখা অনেক পুরাণো পুঁথি আজও দেখতে পাওয়া যায়।

বাংলার বৈষ্ণবধর্ম্ম একদা অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা অতিক্রম করে মণিপুরে গিয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। গোটা মণিপুরী জাতটাই বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। এঁদের নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম্মের সংমিশ্রণে বর্ত্তমান মণিপুরে আধ্যাত্মিকতার বনিয়াদের উপর এক অভিনব সাংস্কৃতিক সৌধ গড়ে উঠছে।

মণিপুরে কতকগুলো সুন্দর সুন্দর কাহিনী প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে 'খাম্বা ও থইবির' কাহিনী আমি 'বিচিত্র মণিপুর' নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছি। এই প্রণয়-গাথাটি পৃথিবীর যে-কোনো দেশের শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যের সমপর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হতে পারে। মণিপুরের চারণদলকে আমি বাদ্যযন্ত্র সংযোগে এই কাহিনীটি গেয়ে গেয়ে, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি, যাত্রার আসরে শুনেছি এর অভিনয়। 'মণিপুরী জাতির সাহিত্যিক-প্রতিভা আর তাদের সৃজনী-শক্তির অন্যতম পরিচায়ক হলো 'ঘুমিত কাপা' নামক কাহিনীটি। এই কাহিনীটি মৈতাই ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে। কে যে এর রচয়িতা তা জানা যায় না, কিন্তু যুগ যুগ ধরে এ কাহিনী মণিপুরীদের রস-পিপাসার পরিতৃপ্তি সাধন করে আসছে।]

সূর্য্য হলো পৃথিবীর জনক। সকল দেবতার গর্ভধারিণী, সূর্য্য-জননী সৃষ্টির একেবারে আদিকালে একই দিনে পাঁচ-পাঁচটি ছেলের জন্মদান করেছিলেন। প্রথম ছেলেটি তাঁর শুকোতে শুকোতে একেবারে পাকাটির মত সরু হয়ে উঠল, তারপর মরে গিয়ে প্রবেশ করলে পাতালে। তাঁর দ্বিতীয় ছেলেটির সমস্ত শরীরের মাংস একদিন পচে গলে পড়তে লাগল। তৃতীয় ছেলেটি ছিল খুব চটপটে আর উদ্ধত প্রকৃতির। একদিন অসতর্ক-ভাবে নদীর পাড় দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ সে পড়ে গেল একটা মাছ-ধরা ফাঁদে, জেলেরা আচ্ছা করে পিটুনি দিতে দিতে তাকে মেরেই ফেললে। মরবার পর তার দাঁতগুলো হ'ল মুনো ভাদোয়ারের দাঁতের মত, তার পাঁজরের হাড়গুলো খুলে নিয়ে দেবতারা ধনের কাজ চালাতে লাগলেন, আর তার মাথার কেশরাশি পরিণত হল পুষ্পগুচ্ছে। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তিন ভাই তো অকালে গেলেন, এখন বাকি রইলেন শুধু সূর্য্য আর তাঁর অগ্রজ নাজেনবা। তাঁরা দু'জনে পালাক্রমে উদিত এবং অস্তমিত হতে লাগলেন। এখন খোয়াই নথজেনবার ছিল এক নফর, নাম তার হাওচাংলা। লোকটা ছিল কুঁড়ের-বাদশা, কাজে-কর্ম্মে তার আদৌ মন বসত না। এদিকে দুটো সূর্য্য পালাক্রমে আকাশে উঠছে আর অস্ত যাচ্ছে। এতে করে দু'জনেই তারা বিশ্রাম নেবার ফুরসত পাচ্ছে, এটা কিন্তু তার বরদাস্ত হ'ল না। "আমি গোলাম"—সে মনে মনে বললে—"তাই মনিবের হুকুম মেনে আমায় চলতে হয়। রোজ দু'দুবার করে আমায় জঙ্গলের ভেতর থেকে কাঠ কুড়িয়ে আনতে হয়, মাথায় করে বয়ে নিয়ে আসতে হয় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধানের আঁটি। কিন্তু বিনিময়ে যা পাই তাতে মজুরি পোষায় না। ছেলেপুলেদের প্রতিপালন করবার ক্ষমতা আমার নেই। বৌটা উপবাস থেকে মরছে, তারপানে তাকাবার অবসর পর্য্যন্ত আমার নেই। আর ওদিকে সূর্য্যি মামারা আছেন বেশ আরামে। কাজের মধ্যে তো সারাদিনে সমস্ত আকাশ জুড়ে টো-টো করে বেড়ানো, তাও আবার প্রচুর অবসর। এর একটা বিহিত করতেই হবে।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে মনে মনে একটা ফন্দী আঁটল। তারপর বৌকে ডেকে বললে—"চাংখাম্ব লক্ষ্মীটি, চটপট তোমার বাপের বাড়ী থেকে একটা বাঁশ নিয়ে এসো তো।" তার কথামত বৌ তো গেল বাপের বাড়ীতে। বাপ কিন্তু

বাঁশ কিতে রাজী হ'ল না। বিফলমনোরথ হয়ে বৌ বাড়ীতে ফিরে এল। স্বামীর বাপার শুনে হাওড়াংলা তখন শ্বশুরের কন্যাকে বললে—"এখুনি তোমার পুড়োকে গিয়ে বল যে, আমার একান্ত অনুরোধ, যেমন করেই হোক তিনি যেন পুড়াল রাজার বাঁশ-বাড় থেকে মজবুত দেখে আমায় একটা বাঁশ যোগাড় করে দেন।"

এই বলে বৌকে সে পুড়াল রাজার দেশে তার পুড়োর কাছে পাঠিয়ে দিলে। রাজার অনুমতি নিয়ে হাওড়াংলার শ্বশুরের পাহাড়ের ওপরকার বাঁশবন থেকে খুব শক্ত আর লম্বা দেখে একটা বাঁশ কেটে আনলে। সেইটে নিয়ে বৌ ফিরে এল বাড়ীতে। বাঁশটি পেয়ে হাওড়াংলার ভারি আনন্দ। পুরো পাঁচদিন অবিশ্রাম মেটেপুটে তাই দিয়ে সে তৈরী করলে একটা ধনুক আর অনেকগুলো তীর, তারপর সেগুলোতে তেল মাখিয়ে রোদে শুকোতে দিলে। তীরগুলো যখন শুকনো খটখটে হয়ে উঠল তখন সেগুলোর আগায়, লেপন করলে তীব্র বিষ। তারপর সেগুলোকে তূণে পুরে রেখে নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করতে লাগল। তার বৌ হাউনে হাংখাপ তো তার কাণ্ডকারখানা দেখে হতভম্ব। সংসারের কাজ-কর্ম্ম সব বাদ দিয়ে একি খেয়াল নিয়ে মেতে আছে তার স্বামী!

খানিকক্ষণ পরে হাওড়াংলা বৌকে সম্বোধন করে ডেকে বললে—"চাং খাতু, চট করে পুকুর থেকে মাথায় করে এক ঘড়া জল নিয়ে এসো তো!"

অবেলায় জলকে যাবার হুকুম শুনে বৌ একেবারে অবাক হয়ে গেল। কিন্তু যা রাগী লোক হাওড়াংলা, তার কথা না মেনে তো উপায় নেই! কাজেই রান্নাবান্নার কাজ-কর্ম্ম সব ফেলে রেখে সে চলে গেল পুকুর-ঘাটে। জলের ঘড়া মাথায় নিয়ে সবে সে উঠানে এসে পা দিয়েছে, এমন সময় হাওড়াংলা তীর-ধনুক হাতে তার সামনে এসে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে বললে—"স্থির হয়ে দাঁড়াও, সাবধান আর এক পা-ও এগিয়ো না।"

ভয়ে বৌয়ের বুক দুরু দুরু করে কাঁপতে লাগল, শেষ পর্য্যন্ত তার স্বামীর মাথাটা কি খারাপ হয়ে গেল নাকি। যাই হোক্, সে তো নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইল। এদিকে হাওড়াংলা করলে কি, প্রায় ত্রিশ চল্লিশ হাত ব্যবধানে সরে গিয়ে বৌয়ের মাথার ওপরকার ঘড়াটা তাক করে ছুঁড়লে একটা তীর, জলপাত্রটা ফেটে গেল চৌচির হয়ে, আর বৌয়ের সুন্দর মুখখানা সিক্ত করে সারা গা বেয়ে জলধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল, বৌটি তখন খিলখিল করে হেসে কুটিপাটি।

আর একদিন বৌয়ের বাঁ-কান লক্ষ্য করে সে একটা তীর নিক্ষেপ করলে, সেটি অতি মৃদুভাবে গিয়ে স্পর্শ করলে তার কানের দুল। এর কিছুদিন পরে সে দেখতে পেলে ধানের স্তূপের ওপর বসে আছে ছোট্ট একটা চড়ুই পাখী। দেখেই সেটাকে মারবার জন্যে তার হাত নিশপিশ করতে লাগল। চট করে তীর ছুঁড়ে সেটাকে সে সাবাড় করে ফেলল।

এমনি করে নিজের লক্ষ্য-ভেদের অব্যর্থতা দেখে তার মনে জন্মাল প্রবল আত্মবিশ্বাস, বড় বড় জানোয়ার শিকারের ফিকির তার মাথায় এল। একদিন অনেকক্ষণ বাইরে টো-টো করে বেড়িয়ে বাড়ীতে ফিরে প্রথমেই বৌকে তাড়া দিয়ে বললে—"চাং খাতু, চটপট আমার ভাত বেড়ে দাও। ইয়া

প্রকাণ্ড একটা ধাড়ী শূয়োর এসে ঢুকেছে ধান ক্ষেতে আর তারই সঙ্গে সঙ্গে এসেছে একটা মস্তান সাপ। আমি যাচ্ছি এগুলোর ওপর তীরের ধার পরখ করতে। এ দুটোর রক্ষা-রক্ষা করে তবে অন্য কথা।"

খাওয়া-দাওয়া সেরে তূণ ধনুক নিয়ে সে রওনা হল বীরদর্পে। যথাস্থানে পৌঁছে ধানক্ষেতের একধারে গা ঢাকা দিয়ে শুয়ে সে সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল। (যেখানে সে আত্মগোপন করেছিল, আজো সে জায়গা খংইয়াদা মামুংসি নামে পরিচিত।)

ক্রমে দিন অবসান হয়ে এল। লাইজিং গ্রামের দূর দিগন্তলীন শুভ্রশ্রেণীর পেছন দিক দিয়ে মহাসূর্য্য অস্তমিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গেই সূর্য্যাগ্রজ নংজেনবা স্বকীয় রশ্মিচ্ছটায় সমগ্র দিকচক্রবাল উদ্ভাসিত করে সুরু করলেন আকাশ পরিক্রমণ। তাঁর অশ্বযোজিত রথচক্রের ঘর্ঘর ধ্বনিতে হাওডাংলা উৎকর্ণ হয়ে রইল, বরাহ-শিকারের কথা সে ভুলে গেল, তাহলে সূর্য্যকে যদি সে শরবিদ্ধ করে নিহত করতে পারে, তাহ'লে "সূর্য্য-শিকারী" নামে সে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

নংজেনবার রথ যখন প্রায় মধ্য-আকাশে এসেছে, হাওডাংলা তখন লক্ষ্য স্থির করে, ধনুকের জ্যা আকর্ষণপূর্ব্বক প্রাণপণ শক্তিতে তীর ছুঁড়লে, কিন্তু তার নিক্ষিপ্ত তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে রথযোজিত অশ্বখুরে প্রচণ্ড আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গেই অশ্বটি বিরাট মাহিংজনপদের নিকট ঘুটকে পড়ে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হ'ল। নিমেষ মধ্যে নংজেনবাও যে কোথায় উধাও হয়ে গেলেন, তাঁর আর পাত্তাই পাওয়া গেল না।

হাওডাংলার হাতে অগ্রজের এ দুর্দ্দশা দেখে মহাসূর্য্যের (তাওহইবেংবা) আর আকাশে বেরুতে সাহসে কুলোল না। আতঙ্কে তিনি সুদূর গ্রাম-প্রান্তের ভূগর্ভে এক প্রকাণ্ড গুহায় বাস পাখাবী আর মা সেনামাহীর কাছে গিয়ে আত্মগোপন করলেন। এমনিভাবে যুগপৎ যুগল-সূর্য্যের অন্তর্ধানে সমগ্র মৈতাই-ভূমি দিবারাত্র সকল সময়েই গভীর অন্ধকারে আবৃত হয়ে রইল। দিনদেবের অদর্শনে ব্যাকুল সমগ্র জনপদের নর-নারী ক্ষেত্রভূমিতে সমবেত হয়ে আকাশের পানে তাকিয়ে মিলিতকণ্ঠে দেবতাদের কৃপাভিক্ষা করতে লাগল। ধরিত্রী মাতার বুকফাটা আর্ত্ত ক্রন্দনধ্বনি যেন উত্থিত হতে লাগল অনন্ত আকাশের অভিমুখে। কিন্তু তাতে কোন ফল হ'ল না। দুর্ভাবনাদের দুর্দ্দশা দিন দিন বাড়তে লাগল। শস্যাগার পরিপূর্ণ, দিগন্তপ্রসারিত স্বর্ণশীর্ষ শস্যক্ষেত্রসমূহ আজ্ঞের হয়ে গেল, আগাছায় জঙ্গলে। মেয়েদের অবসর সময়টুকু কাটত ধান ক্ষেতে বীজবপনাদি ক্ষেত্রকর্ম্ম করে। এখন সে কাজ তাদের ফুরিয়ে গেছে, আর তারা ক্ষেতে যায় না। তরুণীদের গানে, গল্পে, গানে মুখরিত গ্রামপ্রান্তস্থ শস্যক্ষেত্রসমূহে এখন বিরাজ করতে লাগল এক ভয়াবহ নৈঃশব্দ্য।

নপেক, চিংখাই, ওয়াংপুরেল, খানাচাওবা, খাংজিং, সাগপুরেল, লইয়ারাকপা, কাওবাম, কাওক্রেল, মারাজিং এই দল অবতার প্রচুর সন্ধেষণা করেও সূর্য্যদেব কোথাও লুকিয়ে আছেন, তার কোনো হদিস পেলেন না।

গাঁয়ের পথে হঠাৎ একদিন ছুটি মেয়ের দেখা, দিনের বেলায়ই মশাল জ্বালিয়ে তারা পথ চলেছে, চলেছে তারা পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ রক্ষা ক্ষেত্রভূমির পানে। গল্পগাছা করতে করতে একত্রে তারা এগুতে লাগল। সহসা একটি মেয়ে তার সঙ্গিনীকে সম্বোধন করে বললে—"ভাই, তাকিয়ে দেখো, দূরে ঐ গত-

গ্রামের পাশে মাটির নীচে থেকে আগুনের আভা বের হয়ে বেরুচ্ছে। কি সুন্দর দৃশ্য! এ কিসের আগুন বলতে পারো?"

দ্বিতীয়া স্ত্রীলোকটি জবাব দিলে—"তুমি তাহ'লে দেখছি কিছুই জানো না। সূর্য্য যে ওখানে তার বাপ পাখাংবা আর মা সেনামাহীর নিকট লুকিয়ে আছেন।"

"ও! এটা তাহলে সূর্য্যের আলো, তাই অমন করে চোখ ঝলসিয়ে দিচ্ছে।" প্রশ্নকারিণী তখন একথা বলে মুহূর্তনয়নে সেদিক পানে তাকিয়ে রইল।

এদিকে সূর্য্যান্বেষণতৎপর দশাবতার তাদের কথাবার্ত্তা শুনতে পেলেন। নিজেদের নিকেতনে ফিরে এসে তাঁরা খোংনাককে ডেকে পাঠালেন। খোংনাক হচ্ছেন একজন গুণী স্ত্রীলোক। স্বপ্নে তিনি ভবিষ্যৎ ঘটনা জানতে পারেন, স্বপ্নগুলো তাঁর আশ্চর্য্যভাবে ফলে যায়। দেবতারা তাঁকে বললেন,—"খোংনাক লাইরেমা, আপনার উপর এক মৃতের আত্মার ভর হয়েছে। এর তাৎপর্য্য হচ্ছে এই যে, আপনাকেই সূর্য্যদেবকে আবাহন করতে হবে। আপনার স্তুতি-গানে নিশ্চয়ই তিনি প্রসন্ন হবেন।" এই কথাগুলো বলে তাঁরা তাঁকে অগ্রে সূর্য্যোদ্ভব নংজেনবার নিকটে প্রেরণ করলেন।

খোংনাক তাঁকে যথাবিধি আবাহন করে বলতে লাগলেন—"হে দেব দিনকর, আপনার এবং আপনার ভ্রাতা মহাসূর্য্যের অন্তর্দ্ধানে সমগ্র মৈতাই-ভূমি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমাদের ওপর প্রসন্ন হয়ে আবার আপনাদের আতপ্ত রশ্মিমালা বিকীরণপূর্ব্বক শীতজর্জ্জর জনপদসমূহকে সঞ্জীবিত করে তুলুন। হে দেবতাযুগল, আপনারা আবির্ভূত হোন্, আবির্ভূত হোন।"

তাঁর আকুল প্রার্থনা শুনে নংজেনবা বলতে লাগলেন—"খোংনাক লাইরেমা, শোনো তবে আমাদের কাহিনী। আমার যিনি গর্ভধারিণী তিনি হচ্ছেন, সারা পৃথিবীর যাবতীয় দেবতা-মানুষ সবাকার জননী। কোটি কোটি যুগ আগে তাঁর গর্ভে একই সঙ্গে জন্ম নিয়েছিলাম আমরা পাঁচ ভাই। একই সঙ্গে আমরা 'মানুষ' হতে লাগলাম। একদিন হঠাৎ আমাদের সকলের বড় ভাই ঘরে গিয়ে পাতালে ঢুকল। দ্বিতীয় ভাইটির যে কি দুর্দ্দশা হ'ল তা অবর্ণনীয়। তৃতীয় ভাই মাছধরা জালে পড়ে গিয়ে নাকানি-চোবানি খেয়ে জলে ডুবে মরা গেল, তাদেরের মধ্যে বেঁচে আছে একমাত্র তাজহুইরেংবা, কিন্তু খোয়াই নংজেনবা শিবার নদরের ভয়ে সে বহুদূরে গিয়ে মাটির নীচে লুকিয়ে রয়েছে।" এই কথাগুলো বলেই সূর্য্যাগ্রজ নংজেনবা হঠাৎ একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহার গভীরতম তলদেশে অদৃশ্য হলেন। গুহামুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খোংনাক তারস্বরে তাঁকে আহ্বান করতে লাগলেন। কিন্তু সে ডাক তাঁর কানে পৌঁছুলো না।

ব্যর্থমনোরথ হয়ে খোংনাক তখন দেবযান অতিক্রম করে সুরলোকে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দেবতাদের সম্বোধন করে তিনি বললেন, 'হে দশাবতার, আমার উদ্যম বিফল হয়েছে। নংজেনবা আকাশে পুনরুদিত হতে কিছুতেই রাজী হলেন না।' দেবতারা তখন দেবরাজ-কন্যা পানথইবির নিকট গিয়ে হাজির হয়ে তাঁর স্তব-গান সুরু করে দিলেন, তাঁরা সমস্বরে বলতে লাগলেন—"রাজকুমারি! মৈতাইভূমির অধিদেবতার স্নেহের পুতলি, নয়নের মণি আপনি; আপনার ইচ্ছায় জীবকুল জন্মগ্রহণ করছে, আপনিই আবার খেয়ালমত তাদের যম-মন্দিরে প্রেরণ করছেন। আপনি দেবতাদের মাতৃস্থানীয়া, মর্ত্যবাসীরাও আপনারই সন্তান। অপার্থিব-শ্রান্তিতে

উদ্ভাসিত আপনারই সুন্দর আনন, আপনার চোখের অমৃতির স্পর্শমাত্রে শ্বেতপদ্ম সহস্রদল মেলে বিকশিত হয়ে ওঠে। সমস্ত মর্ত্যলোকে গিয়ে বিষণ্ণা সূর্যদেবকে আপনি স্বর্গধামে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন।"

দেবতাদের বক্তব্য শেষ হলে দেবরাজ-কন্যা তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করতে সম্মত হলেন, বললেন—"হে দেবতাগণ, দীপ্তিমান সূর্যদেবকে ফিরিয়ে আনবার ভার যদি দয়া করে আপনারা আমার উপর অর্পণ করলেন, তাহ'লে শুনুন আপনাদের করণীয় কি কি। অবিলম্বে আপনারা দেবতা-মানবের আনাগোনার সুবিধার জন্যে স্বর্গ থেকে মর্ত্য পর্যন্ত এক সুদৃশ্য সেতু নির্মাণের আয়োজন আরম্ভ করে দিন। পাঁচশো উঁচু একটি মাচান তৈরী করুন. প্রতি নগরে জনপদে ঘোষণা করে দিন, দেশের সমস্ত নারীসমাজ যেন আমার সঙ্গে সূর্য্যায়াজনে যোগদান করে। বেতের চুবড়িগুলোতে বৃক্ষপত্র সযত্নে বিছিয়ে তাতে রাশীকৃত ধবধবে শাদা তাত আর প্রচুর ঘি, মধুর কলসীগুলো মধু দিয়ে একেবারে ভরতি করে ফেলুন। পাতার মোড়া আধার কুচি, আর কতকগুলো কড়ি উঁচুটা কালো কাপড়ে বেঁধে মধুর ভাণ্ডগুলোতে ডুবিয়ে রাখুন।"

তাঁর নির্দেশমত দেবতারা মধুর কলসী এবং অন্যান্য জিনিষ তড়িঘড়ি জোগাড় করে দিলেন। পানইহিবি হুকুমে একটা শাদা মুরগীও আনীত হল। এই সমস্ত দ্রব্যসম্ভার নিয়ে তিনি রওনা হলেন জনশূন্যপ্রসারিত মর্ত্যভূমির অভিমুখে। মহাপূর্বা তাওহুইয়েংয়ার পিতামাতার ভূগর্ভস্থ আবাস স্থলের নিকটে পৌঁছে, তিনি মধুরকণ্ঠে শুরু করলেন সূর্য্য-বন্দনা-গান—"হে তপনদেব, আপনি অন্তর্হিত হওয়ায় সমগ্র মৈতাইভূমি আজিও অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়ে আছে। আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন্। আপনার পুনরাবির্ভাবে অন্ধকার অপসৃত হোক, এখান থেকে ইন্দন পর্যন্ত সমগ্র জনপদ আপনার উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক, শীতার্ত নরনারী আপনার উষ্ণ কিরণধারায় অবগাহন করে লাভ করুক নবজীবন।" তাঁর আকুল প্রার্থনায় পরিতুষ্ট হয়ে সূর্যদেব পুনরুদ্ভাসিত হতে সম্মত হলেন। শাদা মুরগী যখন মাটির ওপর পদক্ষেপ করলে, সূর্য্যও তখন ভূগর্ভ থেকে বেরিয়ে এলেন আর তড়িঘেগে মাচানের একেবারে শীর্ষদেশে গিয়ে সমাসীন হলেন।

ঘন্যাকতায় তখন ভালো করে তাকিয়ে দেখেন, সূর্য্যের সে দীপ্তি আর নেই, তার রশ্মিমালা ঔজ্জ্বল্যহীন। "বিগতশ্রী সূর্যদেবকে আবার আমরা পুনঃপ্রতিষ্ঠান করব, আকাশের সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে তাঁর একাধিপত্য।" তারা বললেন। তাঁদের আদেশে পাখাংকার পুরোহিত সূর্য্যের দক্ষিণ পার্শ্বে আসন গ্রহণ করলেন। আর মইরাঙের অধিষ্ঠাতা দেবতা খাংজিঙের মন্দিরের পুরোহিত উপবেশন করলেন তাঁর বাম পার্শ্বে। সূর্য্যের অভিষেক-ক্রিয়ার জন্য মইরাঙের নদী থেকে আনীত হ'ল তীর্থবারি, একটি ভিন্ন এক রকমের শীতল তুষারস্রোত, আর নংমৈচিং পাহাড়ের শীর্ষদেশ থেকে নির্ঝরিণীর নির্মল সলিল। দেবতার পুরোহিতগণ সেই পবিত্র বারিধারা ছিটিয়ে দিলেন সূর্য্যের আননে। সেই মন্ত্রপূত তীর্থসলিলের অভিসিঞ্চনে সূর্য্যদেব আবার হয়ে উঠলেন প্রীমান, জ্যোতির্ময়। তাঁর প্রদীপ্তোজ্জ্বল দুই চক্ষু হতে বিচ্ছুরিত হতে লাগল তীব্র আলো। পানইহিবি তখন মুরগীটিকে তাঁর সামনে এনে মন্ত্র আবৃত্তি করে তাঁর প্রণয়তা বিধান করলেন।

তারপর নংমাইচিং পর্ব্বতবাসী উক্ত পর্ব্বতের দণ্ড পাখার রক্ষক, সূর্য্য-পূরক পুরোহিত লাংমাই থইবি সুরু করলেন, সূর্য্যোপাসনা। মুক্ত-করে তিনি বলতে লাগলেন—"হে পূষণ! তোমার আগমনে অন্ধ পাহাড় আবার চক্ষুষ্মান হয়ে উঠছে, তুমিই তো এ পাহাড়ের নয়নস্বরূপ। নংমাইচিংয়ের অধিবাসীদের প্রতি

অপরিসীম তোমার অনুকম্পা। তোমার উজ্জ্বল নয়নের প্রথম দৃষ্টিপাতে বিশ্বভুবন আলোকিত, পুলকিত হয়ে উঠেছে। বিশ্বচক্ষু তুমি এসেছ, তোমার উত্তোজ্জ্বল রশ্মিমালা অরণ্যে, পর্বতের শীর্ষে, নদীগর্ভে গিরি-গাত্রস্থ গ্রামসমূহে সর্বত্র বিকীর্ণ হচ্ছে। গিরিপাদমূলস্থ বিস্তীর্ণ জনপদের অধিবাসীরাও সূর্যোপাসনায় রত হল, পুরোহিতমণ্ডলীর কণ্ঠোত্থিত স্তুতি বন্দনাগানে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠে। জনপদ-বধূরা নদী পেরিয়ে আবার রওনা হল কৃষিক্ষেত্রের অভিমুখে। টাংখুল নাগারা দা হাতে করে চলল পথে অরণ্যে, নদনারী বহুকাল পরে আবার নদী-নির্ঝরিণী দীর্ঘিকার নির্মল নীরে দেখতে পেলে নিজ নিজ প্রতিবিম্ব। এদিকে গাংমাইকইবির প্রার্থনার আর বিরাম নেই, তিনি অবিশ্রান্ত আবৃত্তি করে চলেছেন—"দিনমণি, তোমার ছোঁয়াতে আমাদের পল্লী পথপ্রান্তর গাছপালা, বাঁশঝাড় সবকিছু ঝলমল্ করে উঠছে, তুমি সুন্দর, তুমি মহান্। হে দেব, তুমি জন্মেছিলে শ্বেত-পাথরের উপরে, তাইতো অমন শুভ্র তোমার অঙ্গ। তোমার অঙ্গের আভায় অন্ধকার অরণ্য আলোকিত হয়ে উঠে, তনের ওপর ঝিকিমিকি করে তোমার আলো, সু-উচ্চ বাঁশগাছের একেবারে শীর্ষদেশে ছেলে যাও তুমি অজস্র কিরণধারা, শুভ্র দ্বিপ্রহরে মইরাঙের নদীবক্ষে স্নান করতে গিয়ে আমরা অনুভব করি তোমার ঈষৎ-উষ্ণ কিরণ-করাঙ্গুলি-স্পর্শ।" দেখতে দেখতে সারা দেশ ছুড়ে প্রার্থনার ধুম পড়ে গেল। দক্ষিণে খুমান-পুরোহিত রত হলেন সূর্য-বন্দনায়। তাঁর পিতৃপিতামহ সবাই ছিলেন গুণী, তিনি নিজেও ছিলেন ওস্তাদ গায়ক তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল দলিত-মধুর এবং তাঁর সঙ্গীত ছিল সুর-প্রধান। বাস্তবিকই তাঁর কণ্ঠসঙ্গীত ছিল সারস-কূজনের মত সরস, তানমানলয় সহকারে একেবারে নিখুঁতভাবে তিনি গান করতে পারতেন। তিনি গাইতে লাগলেন—"সূর্যদেব, এতদিন পরে তুমি এসেছ। চেয়ে দেখ, তোমার আগমনে গাছপালা বাঁশঝাড়, তৃণরাজি সব কিছুই সতেজ ও সতেজ হয়ে উঠেছে, আমাদের অন্তর হয়েছে পুলকিত। এমনিভাবে তোমার প্রখরোজ্জ্বল কিরণধারায় খুমানভূমি যেন নিত্য পরিস্নাত হয়।" সকলের সঙ্গীত সমাধান হল এবার সর্বাকার সেরা ওস্তাদ মণিপুরের রাজপুরোহিতের পালা। মণিপুরী সঙ্গীতে সুদক্ষ তিনি। কণ্ঠস্বর তাঁর প্রবহমান নদী-স্রোতের মত দাবলীল, বেগবান। গুণী পুরোহিত নিত্য মধুর কণ্ঠে তাঁর শোকাপ্লুতিত জনক জননীর নামগান করেন, যখনি কারো মৃত্যু হয় তখনই তাঁর নামটিকে তাঁর শোক-গাথার মধ্যে জুড়ে দেন, তাঁরই কৃপায়ে কতী-পুরুষেরা ইতিহাসে অমর হয়ে বেঁচে থাকে, তাঁরই কৃপায় রাজন প্রভৃতি বিহঙ্গকুল মৃত্যুর পরে স্থান লাভ করে অক্ষয় স্বর্গলোকে। প্রতি মানুষের আত্মার সঙ্গে তাঁর সতীর্থ পরিচয়, কারুরই নাম তাঁর নেই অজানা। প্রতিনিয়ত কত লোক জন্মাচ্ছে, আবার মৃত্যুর চির অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আর সবাই দুদিন বাদে তাদের নাম ভুলে যায়, কিন্তু মৃত্যুর পর মানুষ যখন পচতে পারবে না, তখনো তাঁর পূর্বেকার নামরূপের কথা গুণী-পুরোহিতের স্মরণ থাকে। তাঁর মধুর কণ্ঠের আবাহনী সঙ্গীতে যাবতীয় মৃত ব্যক্তিরই নাম উচ্চারিত হয়, দিনের পর দিন অসংখ্য দেবতা আর মৃতের আত্মার নামাঙ্কিত তাঁর অমৃত নামাবলির আয়তন বেড়েই চলে। মরণের পরে যে সমস্ত দুষ্কৃতকারীর অদৃষ্টে দানবদের সঙ্গে অনন্ত নরক-বাস ঘটে কিন্তু যারা বারবার যোনি প্রাপ্ত হয় সেই পাপাত্মাদের নাম পর্যন্ত জানী ও গুণী পুরোহিত ভোলেন না।

মন্দির-প্রাঙ্গণ মুখরিত করে আচার্যের সুললিত বন্দনা-গান অনন্ত অম্বরের অভিমুখে উত্থিত হল। তিনি গেয়ে চললেন—"হে দেব দিবাকর, তুমি অজর, অমর, সত্যশিবসুন্দর, তুমিই এ বিশ্বের জীবন-স্বরূপ। অসংখ্য তোমার নাম, সাধ্য কি যে তোমার যাবতীয় নাম আমি কীর্তন করি। সকল সৌভাগ্যের আকর তুমি মাটির সৌরভে তোমারি রশ্মিধারার স্পর্শ। হে দীপ্তিমান, বিবস্বান্! এই গতিশীল বিশ্বের উৎপত্তির হেতু তুমি, তুমিই অমৃতত্বের উৎস।"

খুনে

(আমেরিকান সাহিত্য থেকে)

লেখক—আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে
অনুবাদক—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

হেনরীর সরাইখানার দরজা খুলে দুজন লোক এসে ঢুকলো। তারা কাউন্টারের কাছেই বসে পড়লো।

—কি চাই? হেনরী জিজ্ঞাসা করে।

তাদের মধ্যে একজন উত্তর দেয়, তাতো জানি না···অ্যাল, তুই কি খাবি তাই?

অ্যাল বলে, তাতো জানি না ··সত্যিই তো, কি খাবো?

বাইরে তখন অন্ধকার হয়ে আসছিল। জানালার ভেতর দিয়ে রাস্তার আলো জ্বলে উঠলো দেখা যাচ্ছে। কাউন্টারে যে-দুজন লোক এসে বসেছিল, তারা মেন্যুটা তুলে নিয়ে পড়তে থাকে। কাউন্টারের ওপার থেকে নিক অ্যাডাম তাদের দুজনকে লক্ষ্য করে। যখন তারা এসে ঢুকলো, তখন নিক হেনরীর সঙ্গে কথা বলছিল।

প্রথম লোকটা মেন্যু দেখে বললে, আমার জন্যে আপেল সস্ আর আলুর সঙ্গে রোষ্ট পর্কের টেণ্ডারলয়েন।

—এখন তৈরী নেই!

—তাহলে মরতে মেন্যুতে লিখে রেখেছ কেন?

হেনরী বুঝিয়ে বলে, ওটা ডিনারের জন্যে। ছ'টার সময় পাবেন।

বলেই কাউন্টারের পেছনে দেয়ালে ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখে।

—এখন পাঁচটা!

দ্বিতীয় লোকটা বলে ওঠে, কিন্তু ঘড়িতে তো পাঁচটা বেজে বিশ মিনিট হয়েছে।

—ঘড়িটা কুড়ি মিনিট ফাষ্ট!

—চুলোয় যাক তোমার ঘড়ি। বিরক্ত হয়ে প্রথম লোকটা বলে ওঠে, কি আছে তোমার?

হেনরী বলে, যে-কোন স্যাণ্ডউইচ চান, দিতে পারি। হ্যাম আর ডিম, বেকন আর ডিম, লিবার আর বেকন, কিন্তু ফ্রিড!

—থাকগে! এই যে লেখা রয়েছে, ক্রিম সস্ আর আলুর সঙ্গে আস্ত কড়াই শুদ্ধ মুরগীর ক্রোকেট—তাই-ই দাও!

—ওটা ডিনারের জন্যে!

—বা রে! যা চাইবো তাই-ই ডিনারের জন্যে? বলি, এই মজা করবার জন্যেই বুঝি এটা লিখে রেখেছ?

—যদি চান দিতে পারি, হ্যাম্ অ্যাণ্ড ডিম্, বেকন অ্যাণ্ড ডিম, লিভার অ্যাণ্ড—

—বেশ, হ্যাম অ্যাণ্ড ডিমই সই! বলে ওঠে যে লোকটার নাম অ্যাল। তার মাথায় একটা ভাবি হ্যাট···বুকের কাছে বোতাম-আঁটা কালো ওভারকোট। মুখটা খুব ছোট আর শাদা। ঠোঁট দুটো চাপা। গলায় সিল্কের মাফ্লার, হাতে দস্তানা।

—আমাকে তাহলে দাও বেকন অ্যাণ্ড ডিম, দ্বিতীয় জন বলে। পড়নে সে অ্যালের মতনই। দুজনের মুখ কিন্তু আলাদা ধরণের। তবে পোষাক দেখলে মনে হয় তারা দুটীতে যেন যমজ। দুজনেই পরেছে টাইট ওভার-কোট, বুকের কাছে বোতাম আঁটা। দুজনেই কাউণ্টারে কনুই-এর ভর দিয়ে, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বসেছে।

—বলি ড্রিঙ্ করবার কিছু আছে? অ্যাল জিজ্ঞাসা করে।

—সিল্ভার বিয়ার, বেডো, ছিল্লাড্-এল্—হেনরী উত্তরে জানায়।

—আমি বলছি ড্রিঙ্ করবার কিছু আছে?

—যা আছে বলেছি!

দ্বিতীয় জন বলে ওঠে,—শহরটা বেজায় গরম, নাম কি হে কাসগাটার?

—সামিট্।

—শুনেছিস কখনো? অ্যাল তার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করে।

—না! বন্ধু উত্তর দেয়।

—বলি এখানে রাত্তিরে কি করো তোমরা? অ্যাল জিজ্ঞাসা করে।

—ডিনার খাই! বন্ধুটীই উত্তর দেয়, এখানে এসে সবাই মিলে সেটতরে ডিনার খাই!

—ঠিক বলেছেন! হেনরী সায় দেয়।

—তা হলে তুমি বলছো সেইটেই ঠিক? অ্যাল হেনরীকে জিজ্ঞাসা করে।

—নিশ্চয়ই!

—তুমি তাই বড় লক্ষ্মী ছেলে, না?

—নিশ্চয়ই!

—না, তুমি তা নও! দ্বিতীয় জন বলে ওঠে, তাই না, অ্যাল?

—ও বোবা! অ্যাল বলে। তারপর নিজের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে, শোনো, তোমার নাম?

—অ্যাডাম্স্!

—বাঃ তুমিও লক্ষ্মী ছেলে, অ্যাল বলে ওঠে, লক্ষ্মী নয় ম্যাক্স্?

—এ শহরে সবাই লক্ষ্মী ছেলে, ম্যাক্স বলে।

ইতিমধ্যে হেনরী কাউণ্টারের ওপর দুটী ডিস এনে হাজির করে, একটাতে হ্যাম অ্যাণ্ড ডিম, আর একটাতে বেকন অ্যাণ্ড ডিম। সঙ্গে সঙ্গে দুটো ছোট ডিসে আলু ভাজা। রান্নাঘরে যাবার ছোট দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আসে।

—কোন্‌টে আপনার? অ্যালকে জিজ্ঞাসা করে।

—মনে নেই?

—হ্যাম আর ডিম!

—এই তো খুশী ছেলে, ম্যাক্স্ বলে ওঠে।

সামনে ঝুঁকে হ্যাম আর ডিমের ডিশটা নেয়। ধন্যবাদ দিয়েই দুজনে খেতে আরম্ভ করে। হেনরী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে।

হঠাৎ ম্যাক্স বলে ওঠে, দেখছো কি?

—কিছু না!

—যদো যা···প্যাট প্যাট করে আমার দিকে চেয়ে আছে···আবার বলছে, না!

অ্যাল বলে ওঠে, ঠাট্টা করছে, বুঝছিস না কেন ম্যাক্স?

হেনরী হেসে ওঠে।

ম্যাক্স ছেড়ে ওঠে, হাসতে হবে না···একদম না—ব্যস্!

—ঠিক আছে। বলে চুপ করে থাকে হেনরী।

ম্যাক্স অ্যালের দিকে ফিরে বলে, তাহলে ও জানছে যে সব ঠিক আছে···কি বলিস্ অ্যাল?

—দেখছিস না, মস্ত বড় একজন ভাবুক, অ্যাল উত্তর দেয়।

তারা দুজনে খেতে আরম্ভ করে।

—কাউন্টারের ওধারে যে লম্বা ছেলেটি দাঁড়িয়ে তার নামটা কি? অ্যাল ম্যাক্সকে জিজ্ঞাসা করে।

নিককে ডেকে ম্যাক্স বলে ওঠে, ওহে লম্বা ছেলে, তুমি তোমার বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে কাউন্টারের ভেতরে ঢুকে পড় তো!

—তার মানে? নিক জিজ্ঞাসা করে।

—মানে কিছু নেই!

এবারে অ্যাল বলে ওঠে, লম্বা ছেলের মত যা বলছি তা কর দেখি!

নিক্ কাউন্টার থেকে সরে ভেতরে চলে যায়।

হেনরী জিজ্ঞাসা করে ওঠে, কি ব্যাপার?

অ্যাল্ জবাব দেয়, ব্যাপার যাই হোক, তোমার মাথা ঘামাবার কিছু নেই। রান্নাঘরের ভেতরে কে আছে আর?

—একজন নিগার!

—কে সে নিগার?

—যে রান্না করে।

—ওকে বাইরে আসতে বল!

—তার মানে?

—অতি সোজা। ওকে বাইরে আসতে বল!

হেনরী ভেড়ে ওঠে, তোমরা কোথায় এসেছ তা জান?

এবার ম্যাক্স উত্তর দেয়, কোথায় এসেছি, তা আর জানি না! আমাদের দেখে কি খুব বোকা বলে মনে হচ্ছে তাই?

অ্যাড্ অ্যাক্সকে ধমক দিয়ে ওঠে, বোকার মতনই তো কথা বলছিস! বাজারের সঙ্গে তর্ক করে লাভ কি?

তারপর হেনরীর দিকে ফিরে হুকুম করে, শোন, নিগারটাকে বাইরে এখানে আসতে বলো!

—ওকে কি করতে চাও তোমরা?

—কিছুই না। বলি, আমার লক্ষ্মী ছেলে, একটু মাথাটা খাটাও দেখি বাবা! একটা নিগারকে নিয়ে আমরা কি করতে পারি বল?

হেনরী ঘাড় নেড়ে, স্যাম্! বাইরে এসো!

রান্নাঘরের ছোট্ট দরজাটা খুলে স্যাম্ বেরিয়ে আসে। জিজ্ঞাসা করে, কি ব্যাপার?

অ্যাড্ আর ম্যাক্স তাকে একবার ভাল করে দেখে নেয়।

—চমৎকার! ঠিক ঐখানেই দাঁড়িয়ে থাক, নড়ো না তো বাবা। অ্যাড্ বলে ওঠে।

রাঁধুনীর এ্যাপ্রন জড়ানো অবস্থায় স্যাম্ সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। কাউন্টারে যারা ব'সে, তাদের দুজনের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে।

অ্যাড্ টুলের ওপর থেকে নেমে পড়ে।

বলে, এই নিগারটাকে আর আমার ঐ লক্ষ্মী ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি। নিগার, পিছু হটে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকে পড়তো বাবা! তুমিও ওর সঙ্গে যাও, শুনছো লক্ষ্মী ছেলে?

নিক আর স্যাম রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে। অ্যাড্ তাদের পেছনে পেছনে।

রান্নাঘরে ঢুকে অ্যাড্ দরজা বন্ধ করে দেয়।

ম্যাক্স্ যার নাম, সে কাউন্টারে হেনরীর সামনাসামনি গিয়ে বসে। হেনরীর দিকে না চেয়ে কাউন্টারের পেছনের দেয়ালে বড় আয়নাটার দিকে চেয়ে থাকে। আগে এটা সেলুন ছিল, আয়নাটা তারি স্মৃতি।

আয়নার দিকে চেয়েই ম্যাক্স্ বলে, কিগা লক্ষ্মী ছেলে, মুখ ফুটে কিছু কথা বলো বাবা!

—এ সব কি ব্যাপার হচ্ছে?

ম্যাক্স্ চেঁচিয়ে অ্যাড্কে শুধোয়, হেই অ্যাড্, আমার লক্ষ্মী ছেলে জানতে চাইছে, এ সব কি ব্যাপার হচ্ছে?

রান্নাঘর থেকে অ্যাড্ জবাব দেয়, কি হচ্ছে, তুই বলে দেনা কেন?

ম্যাক্স্ জিজ্ঞাসা করে, কি হচ্ছে বলে তোমার ধারণা?

হেনরী জবাব দেয়, জানি না।

—জানতে বলছি না। কি মনে হচ্ছে তাই বলো! ম্যাক্স কিন্তু কথা বলবার সময় একবারও আয়না থেকে চোখ তুলে নেয় না।

—আমি বলতে চাই না!

—হেই অ্যাল্, লক্ষ্মী ছেলে বলছে যে, যা হচ্ছে তা সে বলতে চায় না!

বাথরুম থেকে অ্যাল্ বলে ওঠে, আমি সবই শুনতে পাচ্ছি!

বাথরুমের দরজার গায়ে ডিস্ রেওয়া-নেওয়া করবার জন্যে যে ফাঁকটা ছিল, সেটাতে টিনের একটা ঢাকনি দেওয়া ছিল। অ্যাল্ একটা খালি বোতল দিয়ে ঢাকনিটা তুলে রেখেছিল। সেখান দিয়ে বাইরের সব দেখা যাচ্ছিল।

বাথরুম থেকেই হেনরীকে ডেকে অ্যাল্ বলে, লক্ষ্মী বাপ্ আমার, শোন! আর একটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াও তো···ম্যাক্স, তুই আর একটু বাঁদিক ঘেঁসে···হাঁ···

যেন সে ফটোগ্রাফার, ফটো নেবার জন্য গোছগাছ করছে।

ম্যাক্স বলে, বলি ও লক্ষ্মী ছেলে, কথা কও! বলতো তারা, কি হবে এখানে?

হেনরী চুপ করে থাকে।

ম্যাক্স বলে, তাহলে শোন, আমিই বলছি। একজন সুইডকে আমরা খুন করবো। ওল্ এণ্ডারসন্ বলে একজন মালদার সুইড আছে, চেনো?

—হাঁ!

—রোজ রাত্তিরে সে এখানে খেতে আসে, না?

—কোন কোন দিন আসে।

—ঠিক ছ'টার সময় আসে, তাই না?

—হাঁ, যদি আসে!

—তা আমরা জানি। এখন অন্য কিছু কও দেখি! বাথরোপে যাও?

—হঠাৎ কখন!

—উঁহু! মাঝে মাঝে যাওয়া ভাল হে! তোমার মত লক্ষ্মী ছেলের মাঝে মাঝে বাথরোপে যাওয়া ভাল, বুঝেছ?

—ওল্ এণ্ডারসন্‌কে কেন তোমরা খুন করতে যাচ্ছো? কি করেছেন তিনি তোমাদের?

—আমাদের কিছু করবার কোন সুযোগই তার ঘটেনি। সে আমাদের দেখে নি পর্যন্ত!

বাথরুম থেকে অ্যাল্ বলে, আজ এই প্রথমবার দেখবে···এবং এইটেই শেষবার···

হেনরী জিজ্ঞাসা করে, তবে, কিসের জন্যে তাঁকে খুন করবে?

—একজন বন্ধুর জন্যে, এক বন্ধুর খাতিরে, বুঝেছ লক্ষ্মী ছেলে?

বাথরুম থেকে অ্যাল্ ধমকে ওঠে, চুপ কর! বড় বাজে বকিস্ তুই!

—বারে, লক্ষ্মী ছেলেকে খুশী রাখতে হবে তো! কি বল তারা?

অ্যাল্ বলে, তা হলে এতো রাজে বকবি? আমার লক্ষ্মী ছেলেটি আর কালো নিগারটী কেমন আপনা থেকেই খুশী হয়ে আছে! দুই সখীর মত দুজনকে একসঙ্গে বেঁধে রেখে দিয়েছি কেমন!

হেনরী ঘড়ির দিকে চায়।

অ্যাক্স লক্ষ্য করে। বলে, যদি কোন খদ্দের আসে, বলবে যে রাঁধুনী হঠাৎ চলে গিয়েছে···নেই··· তাতেও যদি কেউ থেকে যায়, বলবে, তাহলে আমাকেই গিয়েই রাঁধতে হবে। বুঝতে পারছো, লক্ষ্মী ছেলে?

হেনরী জবাব দেয়, বেশ, তাই হবে! কিন্তু তারপর আমাদের কি করবে?

অ্যাক্স বলে, সে হলো তার পরের কথা। এখন কি বলতে পারা যায়?

হেনরী আবার ঘড়ির দিকে চায়। ছ'টা বেজে পনেরো মিনিট। রাস্তা থেকে দরজা খুলে গেল। একজন খদ্দের এসে ঢুকলো।

—হালো হেনরী! খাবার আছে?

—অ্যাল্ বেরিয়ে গেছে···ফিরতে বোধ হয় আধঘণ্টা লাগবে।

—তাহলে অন্যত্র দেখি! লোকটা বেরিয়ে যায়।

হেনরী আবার ঘড়ির দিকে চায়। ছ'টা বেজে দুড়ি মিনিট হয়ে গেল।

অ্যাক্স্ বলে, এই তো লক্ষ্মী ছেলের মত কাজ! আসল ভদ্দরলোক।

রান্নাঘর থেকে অ্যাল্ বলে ওঠে, ভদ্দরলোক না হলে আর উপায় কি? বেশ জানে, বোড়ল পাইলেই, পেছন থেকে মাথাটা উড়িয়ে দেবো!

অ্যাক্স বাধা দিয়ে বলে ওঠে, না, না···তা কেন? আমার লক্ষ্মী ছেলে সত্যিই ভাল ছেলে। খুব ভাল ছেলে। আমার খুব ভাল লাগছে।

ঘড়িতে ছ'টা পঁচিশ হলো।

হেনরী বলে উঠলো, তিনি আর আসছেন না!

এমন সময় আর দুজন খদ্দের বাইরে থেকে এলো। তারা বসে খাবে না। কিছু স্যাণ্ডউইচ কিনে নিয়ে যাবে। বাধ্য হয়েই হেনরী রান্নাঘরে ঢোকে। দেখে, দরজার ঠেসান দিয়ে অ্যাল্ একটা টুলের ওপর বসে আছে, হাঁটুর ওপর করাত-দিয়ে-কাটা শট্-গান্···নিক্ আর স্যাম্ পিঠোপিঠি বসে আছে এক কোণে··· তাদের দুজনের মুখে দুটো তোয়ালে গোজা। নীরবে স্যাণ্ডউইচ তৈরী করে হেনরী অরেঞ্জপেপারে মুড়ে খদ্দেরের হাতে দিয়ে দেয়। দাম চুকিয়ে তারা চলে যায়।

অ্যাক্স বলে ওঠে, আমার লক্ষ্মী ছেলে সব কাজ করতে পারে। রাঁধতেও পারে। বিয়ে করলে পাকা গিন্নী হবে, না?

হেনরী বলে, তা হয়ত হবে! কিন্তু ওল্ এওারসন্ আর আসছেন না!

—আর দশ মিনিট সময় ভদ্দরলোককে দেখা যাক্, কি বল? অ্যাক্স জিজ্ঞাসা করে।

একবার ঘড়ির দিকে আর একবার আপনার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। কাঁটা সাতটার ঘর পেরিয়ে গেল। সাতটা বেজে পাঁচ মিনিট।

ম্যাক্স উঠে দাঁড়ায়, চলে আয় অ্যাল্। ভদ্রলোক আসছে না···চল যাই!

রান্নাঘর থেকে অ্যাল্ বলে, ভদ্রলোককে আর পাঁচমিনিট সময় দে!

পাঁচমিনিট পরে আর একজন খদ্দের এসে ঢুকলো। হেনরী জানালো, রাঁধুনীর অসুখ করেছে।

লোকটা রেগে উঠলো, আর একটা রাঁধুনি রাখতে পারো নি? এই করে বুঝি সরাইখানা চালাবে? হুঃ!

লোকটা বেরিয়ে যায়।

—চলে আয় অ্যাল্! ম্যাক্স ডাকে।

—লম্বা ছেলেটা আর এই নিগারটার কি হবে?

—ওরা ঠিক আছে!

—ঠিক বলছিস তো?

হেনরী বলে ওঠে, নিশ্চয়ই! বেঁচে আছি, এই যথেষ্ট!

অ্যাল্ রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে। টাইট ওভারকোটের ভেতর থেকে কোমরের কাছ বরাবর শট্-গানটা একটু উঁচু হয়ে থাকে। হাত দিয়ে কোটটা টেনে ঠিক করে নেয়।

হেনরীর কাছে এসে বলে,

—আজ তাহলে আসি, লক্ষ্মী ভাইটী আমার! তোমার ভাগ্যটা কিন্তু খুব ভাল!

ম্যাক্স সায় দেয়, ঘাইহ্নি, তোমার রেস খেলা উচিত!

সোজা হুজনে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে যায়। জানলা দিয়ে হেনরী উঁকি মেরে দেখে, গ্যাসের আলোয় রাস্তা দিয়ে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়ে নিক আর নিগারের মিলন-রজ্জু খুলে দেয়।

জাম বলে ওঠে, খুব হয়েছে, আর নয়, আমি আর এখানে কাজ করছি না!

নিক উঠে দাঁড়ায়। এর আগে আর কখনো মুখে তোয়ালে গুঁজে বসে থাকার সৌভাগ্য তার হয় নি।

গা থেকে ছেড়ে ফেলে দেবার মতন করে সে দেহ-ভঙ্গী করে।

—এসব কি?

হেনরী জানায়, ওল্ এওারসনকে খুন করতে এসেছিল।

—ওল্ এওারসন?

—হাঁ।

জাম্ বলে ওঠে, আমার এসব ভাল লাগে না···আলো না!

নিককে ডেকে হেনরী বলে, আমার মনে হয়, তুমি একবার এওারসনের কাছে যাও।

—ঠিক বলেছ!

জাম্ বাধা দিয়ে বলে ওঠে, না, না, এ সবের মধ্যে থেকো না···আমি বলছি—এর ত্রিসীমানার মধ্যে থেকো না!

সে কথার উত্তর না দিয়ে নিক হেনরীকে জিজ্ঞাসা করে,—আমি যাব! তিনি কোথায় থাকেন জানো?

আম্ খুড়ো দাঁড়ায়। বলে, বেঁটে বদমায়েসরা যা বলে তাই করে কিন্তু!

নিকের প্রশ্নের উত্তরে হেনরী জানায়, হার্লের বোর্ডিং-হাউসে থাকেন।

—আমি চললুম সেখানে!

নিক বেরিয়ে পড়ে। হার্লের বোর্ডিং বাড়ীর ভেতরে ঢুকতেই একটা বুড়ীর সঙ্গে দেখা হয়। জিজ্ঞাসা করে, ওল্ড এণ্ডারসন এখানে থাকেন?

—তাঁর সঙ্গে কি দেখা করতে চাও?

—হাঁ, যদি তিনি থাকেন!

বুড়ী পথ বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠে। নিক পেছনে পেছনে সিঁড়ি ছাড়িয়ে বারান্দা দিয়ে একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

বুড়ী দরজায় টোকা মারে।

ভেতর থেকে শব্দ আসে, কে?

বুড়ী জবাব দেয়, আপনার সঙ্গে কে একজন দেখা করতে এসেছে!

নিক জানায়, আমি নিক অ্যাডামস্!

—ভেতরে এসো!

দরজা ঠেলে নিক ঘরে ঢোকে। এণ্ডারসন পোষাক পরেই বিছানায় শুয়েছিল। যৌবনে বক্সিং প্রতিযোগিতায় হেবি-ওয়েটদলে লড়েছে। তাই দেহটা বিছানায় কুলোচ্ছিল না।

—কি ব্যাপার? জিজ্ঞাসা করে।

নিক বলে, আমি হেনরীর হোটেল থেকে আসছি। সেখানে দুটো লোক এসে আমাকে আর রাধুনিকে একসঙ্গে বেঁধে রেখেছিল। তারা বলে, আপনাকে খুন করবে।

কথাটা তার নিজের কাণেই কেমন যেন বেখাপ্পা শোনালো। এণ্ডারসন কিছুই বললো না।

নিক বলে চলে, আমাদের দুজনকে রান্নাঘরে ঢুকিয়ে বেঁধে রাখে। যখনি হোটেলে ঢোকে যাবেন, তখুনি খুন করবে।

শুধু এণ্ডারসন নীরবে দেয়ালের দিকে চেয়ে থাকে।

—হেনরীই আমাকে পাঠিয়ে দিল, আপনাকে খবর দেবার জন্যে।

এণ্ডারসন শুধু বলে, এ সম্বন্ধে আমি আর কি করতে পারি!

—তাদের কি রকম দেখতে, আমি বলতে পারি!

—আমি জানতে চাই না। তেমনি দেয়ালের দিকে চেয়ে বলে, অবশ্য খবরটা দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ।

নিক বিস্ময়ে অভ্যাগত সেই বিরাট বপুটীর দিকে চেয়ে থাকে।

—পুলিশকে গিয়ে কি খবর দেবো?

—না। তাতে কোন ফল হবে না।

—তাহলে আমি কি এ সম্বন্ধে কিছুই সাহায্য করতে পারি না?

—না। সাহায্য করবার কিছু নেই।

—এমনো তো হতে পারে, এটা শুধু একটা ধাপ্পা?

—না, ধাপ্পা নয়!

এণ্ডারসন পড়াতে পড়াতে দেয়ালে গিয়ে ঠেকে।

বলে—শুধু একটা কথা···বাইরে বেরুবো কি না, কিছুতেই ঠিক করতে পারছি না। সারাদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাই ভাবছি।

—শহর ছেড়ে চলে যেতে পারেন না?

তেমনি দেয়ালের দিকে চেয়ে থাকে এণ্ডারসন।

বলে, এখন করবার আর কিছু নেই!

নিক জিজ্ঞাসা করে, কোন রকমে মিটমাট করে নিতে পারেন না?

তেমনি স্থির কণ্ঠে বলে, না, আমারই ভুল হয়ে গিয়েছে। এখন আর করবার কিছু নেই। কিছুক্ষণ পরেই মন ঠিক করে ফেলবো, বেরুবো।

—তাহলে আমি ফিরে যাই! নিক বলে।

—তথাস্তু!

নিকের দিকে সে চেয়েও দেখে না। দেয়ালের দিকে তেমনি চেয়ে থেকে সে বলে ওঠে, এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ!

নিক বেরিয়ে আসে। দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসবার সময়, পেছন ফিরে দেখে, এণ্ডারসন তেমনি বিছানায় শুয়ে দেয়ালের দিকে চেয়ে আছে।

সিঁড়ির নীচে বুড়ী বলে, এমনি পোষাক পরে সারাদিন বিছানায় শুয়ে আছে। বোধ হয় শরীরটা ভাল নেই। আমি তবুও একবার গিয়ে বলেছিলাম, মিঃ এণ্ডারসন, এমন সুন্দর দিন, বাইরে গিয়ে বরঞ্চ একটু বেড়িয়ে আসুন না কেন? কিন্তু তাও ভাল লাগলো না ওর!

নিক বলে, বাইরে বেরুতেই উনি চান না!

বুড়ী দুঃখ করে, শরীরঃ তাহলে খুবই খারাপ। বড় ভাল লোক। বক্সিং লড়তেন।

—জানি!

—দেখলে কিন্তু মনে হয় না। শুধু মুখটা লক্ষ্য করে দেখলে বোঝা যায়। তবে বড় ঠাণ্ডা লোক!

বুড়ীকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিক রাস্তায় নেমে পড়ে।

হোটেলে ফিরে এসে দেখে, হেনরী কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে।

—দেখা হলো?

—হাঁ! ঘরেতেই আছেন·····বাইরে বেরুতে পারছেন না!

নিকের গলার আওয়াজ পেয়ে শ্যাম রান্নাঘর থেকে ছুটে আসে।

নিককে দেখেই ক্লোবার দরজা বন্ধ করে দেয়, বলে, ও সব কথা আমি শুনবো না পর্যন্ত!

নিক হেনরীকে জানায়, আমি বলেছি সব কিন্তু মেরেছি তিনি সবই জানেন।

—কি করবেন, কিছু বললেন?

—না!

—ওরা নিশ্চয়ই খুন করে ফেলবে!

—আমারও তাই বিশ্বাস!

—বোধ হয় শিকাগো শহরে কোন একটা গোলমাল বাঁধিয়েই তিনি এখানে এসেছেন!

—আমারও তাই মনে হয়।

—কি ঝঞ্ঝাট!

—সত্যি ঝঞ্ঝাটই বটে!

তারপর আর কোন কথা হয় না। হেনরী একটা বাড়ন নিয়ে নীরবে কাউন্টারটা মোছে।

নিক বলে ওঠে, আমি ভাবছি, এমন কি করেছে লোকটা?

—হয়ত ঠকিয়েছে। তারই শাস্তি দিতে হবে।

—আমি কিন্তু এ শহরে আর থাকতে পারবো না, নিক বলে ওঠে!

—যদি ছেড়ে দেতে পার, ভালই, হেনরী জানায়।

—এখনই ভাবছি, লোকটা ঘরে বিছানায় শুয়ে অপেক্ষা করে আছে···অপেক্ষা করে আছে, কখন আসবে মৃত্যু···জানে, যে মৃত্যু আসবেই—আমার কেমন যেন দম আটকে আসছে!

হেনরী বাড়নটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে, ভাববার দরকারই বা কি?

পুরস্কার

উপন্যাস

"সম্বুদ্ধ"

প্রভাতদা বলিলেন, সায়েন্টিফিক রিসার্চ কেউ করছে শুনলেই আমার ভয় করে।

কবিরাজ নলিনী সেনের ভিস্‌পেন্‌সারি। কবিরাজের ভাই সত্য সেন রিসার্চ পড়িতে বিলাতে গিয়াছিলেন, তিনি ডক্টরেট্ লইয়া দেশে ফিরিয়াছেন। প্রধানতঃ তাঁহার অভিনন্দন উপলক্ষ্য করিয়াই সকলে আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন।

কিন্তু প্রভাতদা গোল বাধাইলেন। ঠিক যখন অনেকে একসঙ্গে সম্বর্ধনাবাক্য উচ্চারণ করিয়া একটি ছোটখাট কলরবের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মিতভাষী সত্য সেন কেবল সলজ্জ হাসি দিয়াই সেই কলরবের উত্তর দিবার চেষ্টা করিতেছেন, প্রভাতদা অকস্মাৎ মুখশ্রী অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া বলিয়া বসিলেন, যাক, যখন তাদের সব শেষ হয়ে গেছে তখন আর কথা নেই, কিন্তু আগে জানলে আমি হয়তো বারণই করতাম। সায়েন্টিফিক রিসার্চ কেউ করছে শুনলেই আমার ভয় করে।

অকস্মাৎ বেসুরা উক্তির আঘাতে সমস্ত কলরব থামিয়া গেল। লোকের সাধ্যমতো আনন্দ প্রকাশ করিতে আসিয়া এমন অনুচিত কথা কেহ কারণ থাকিলেও বলে না। কবিরাজ মহাশয় সদাশিব মানুষ, তিনি পর্য্যন্ত ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন।

গোপেনবাবু কহিলেন, তোমার ভয়ের হেতু?

প্রভাতদা কহিলেন, হেতু আছে বলেই বলছি। বড্ড ডেঞ্জারাস জিনিস কিনা।

কবিরাজের ভাগিনেয় অমল কহিল, কিন্তু আপনি নিজেও তো নাকি রিসার্চ করতেন।

প্রভাতদা কহিলেন, আরে ভাই সে সব হিষ্টরিকাল রিসার্চ, তার কথা আলাদা। সায়েন্টিফিক রিসার্চ মানেই হচ্ছে আগুন নিয়ে খেলা। ওর কোথায় যে কিভাবে বিপদ লুকিয়ে থাকে, আগে থেকে কিছুটি জানবার যো নেই।

অমল কহিল, কিন্তু সায়েন্টিফিক রিসার্চ মানেই তো আর ডেথ-রে তৈরীর কারখানা নয়।

প্রভাতদা কহিলেন, ডেথ-রে ছাড়া কি আর বিপদের জিনিস নেই পৃথিবীতে? তুমি এক নাম শুনেছ ডেথ-রে! তুমি ছেলেমানুষ কিই বা জানবে—সায়েন্টিষ্টকেই শুধোও না, তাদের রিসার্চে বিপদ থাকে কিনা পায়ে পায়ে।

সত্য সেন ঈষৎ হাসিলেন। কহিলেন, থাকা অসম্ভব নয়, কিন্তু আমার সাধ্যমতো ছিল এগ্রিকাল্চারাল বায়োলজি। তার মধ্যে প্রাণ বিপন্ন হবার কোন আশঙ্কা নেই।

প্রভাতদা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, ঐ রকম ভাবছ তাই। আমিও এক কালে ভাবতাম। একটু থামিয়া আবার কহিলেন, তারপর এমন জিনিসই চোখ মেলে দেখতে হ'ল, মন থেকে তাকে মুছে ফেলবার আর যো রইল না।

প্রভাতদার কথাবার্তা সর্বদা কৌতুক ও রসের প্রাবল্যে ঝলমল করিতে থাকে ; তাঁহাকে এমন গম্ভীর ও করুণ স্বরে কথা বলিতে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। গোপেনবাবু সহজে কাবু হইবার লোক নন, কহিলেন, থাক, হয়েছে। এইবার আরেকখানা আজগুবি গল্প সুরু হবে তো ?

প্রভাতদা চটিলেন না। ব্যথিতদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর শান্তস্বরে কহিলেন, গল্প বলতে আজ আমি তো আসিনি। আর বললেও বিশ্বাস যদি না হয়; তুমি শুনো না সে গল্প।

গোপেনবাবু চুপ করিয়া গেলেন। মনে মনে সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু বিষাদের যে আবরণ প্রভাতদার মুখে-চোখে নিবিড় হইয়া নামিয়া আসিয়াছে তাহাকে আঘাত করিয়া ছিন্ন করিবার সাহস কাহারও হইল না। অমল এবং ফণী পর্যন্ত গম্ভীর হইয়া চাহিয়া রহিল ; ফণী চিরকাল কোমল-প্রকৃতি—কে জানে কোথায় তাহার মনে একটা নিদারুণ কত আকস্মিক আঘাতে বেদনার্ত হইয়া উঠিয়াছে, কল্পনা করিতে গিয়া তাহার নিজেরই দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

এই মৌনের বাঁধ ভাঙিল ধনিরের কোলাহলে। একসঙ্গে অনেকগুলি মোটর-সহী রাস্তা ও দুই পাশের বাড়িগুলাকে কাঁপাইয়া দিয়া চলিয়া গেল, তাহাদের ইঞ্জিন ও চর্বের শব্দে ঘরের নিশ্চিন্ত নীরবতা ভাঙিয়া খান-খান হইয়া গেল। কবিরাজ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রাস্তার দিকে তাকাইলেন : কহিলেন, আর এই এক উৎপাত !

কবিরাজের প্রথম জীবন কাটিয়াছে পূর্ববঙ্গে, নিভৃত পল্লীগ্রামের ছায়াশীতল আশ্রমে। কোলাহলমুখর মহানগরীর বিশ্রামহীন ক্রেদাক্তগুলিকে তিনি এখনও ঠিক অভ্যাস করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

নিতাইবাবু কৌতূহলে সারা হইতেছিলেন, মোহভঙ্গের এই সুযোগটুকু তিনি ছাড়িয়া দিতে পারিলেন না। কহিলেন, আজ হ'ল কি আপনার, প্রভাতদা ?

কবিরাজ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, থাক থাক। বলতে হয়তো ওর কষ্ট হবে।

প্রভাতদার মুখে একটি করুণ হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। কহিলেন, না, কষ্ট আর কি হবে।

ফণী আর থাকিতে পারিল না, বলিয়া ফেলিল, তাহ'লে বলুন না প্রভাতদা, কি হয়েছিল আপনার ?

অমলও কহিল, বলুন প্রভাতদা।

—বলব ? বলিয়া প্রভাতদা আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর নিজেকে যেন একটা ঝাঁকুনি দিয়া জাগাইয়া তুলিয়া কহিলেন, বেশ, বলছি। আর না ব'লে উপায়ও নেই। আমার নিজের ব্যাপার এটা নয়, তবুও এটাকে প্রকাশ ক'রে বলবার ভার আছে আমার ওপরেই। তার কারণ পৃথিবীতে ওই ঘটনা জানত মাত্র তিনজন মানুষ, তার মধ্যে একা আমিই আজ পর্যন্ত বেঁচে আছি।

সকলে সবিস্ময়ে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন—প্রভাতদার এমন কি কাহিনী থাকিতে পারে ? গোপেনবাবু তাঁহার শৈশবের বন্ধু, তিনি একবার কি বলিতে উদ্যত হইয়া আবার থামিয়া গেলেন। প্রভাতদার সেটুকু চক্ষু এড়াইল না, কহিলেন, কি হল গোপেন ? ভাবছ, তুমি জানলে না এমন কি কাণ্ড আমার ঘটে থাকতে পারে, এই তো ? কিন্তু সত্যিই এর খবর তুমি জানতে না। জানাবার আমার উপায় ছিল না।

নিতাইবাবু কহিলেন, কই বলুন প্রভাতদা !

অল্পক্ষণ আগে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, জলে ও আলোকে রাস্তার ধারে মেহগনি গাছের নূতন পাতা ঝকমক করিতেছিল! প্রভাতদা জানালা দিয়া এক মুহূর্ত সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন, বলি।

আমি এক্ষুনি বলেছি, এই ঘটনাটি মাত্র তিনজন লোক জানত, তার একজন আমি। একজন অনেকদিন আগেই মারা গেছেন; বাকি একজন মারা যাবার খবর আজ সকালবেলা পেয়েছি। আমার ওপর একদিকে যেমন ভার ছিল এই ঘটনা প্রকাশ করবার, অন্যদিকে তেমনই নিষেধও ছিল, যে তিনি বেঁচে থাকতে কাউকে না বলি! কাল এমন সময় এ গল্প বলার আমার অধিকার ছিল না; আজ এটা বলাই আমার কর্তব্য।

আজকের কাগজে খবর বেরিয়েছে, শিলিগুড়িতে মিসেস নিয়োগী ব'লে এক ভদ্রমহিলা কাল মারা গিয়েছেন। আজকের দিনে মিসেস নিয়োগীকে চিনবার লোক বেশি নেই, কিন্তু একটা সময় ছিল যখন শুধু কলকাতা শহর নয়, ভারতবর্ষের বাইরেও লেখাপড়ার চর্চা নিয়ে যারা দিন কাটাতেন তাঁদের অনেকেই একডাকে মিসেস নিয়োগীকে চিনতেন।

মিসেস নিয়োগী হচ্ছেন ডক্টর প্রফেসর নিয়োগীর স্ত্রী। ডক্টর নিয়োগী ছিলেন প্রেসেল কলেজের তখনকার দিনের ডাকসাইটে প্রফেসর, ইতিহাসের বাইরে অবধি তাঁর নাম ছিল। দত্তা, তোমরা তাঁকে দেখনি, কিন্তু তাঁর নাম নিশ্চয়ই শুনে থাকবে।

দত্তা কহিলেন, শুনেছি। তিনি তো মারাও গেছেন প্রায় বিশ বছর হ'ল।

প্রভাতদা কহিলেন, সতেরো বছর। নাইনটিন-টুয়েন্টিতে তিনি মারা যান।

গোপেনবাবু কহিলেন, আরে, সেই-যে ভদ্রলোক, তোমাদের কি রকম আত্মীয় হতেন? মাণিকতলার দিকে কোথায় বাড়ি, তোমার সঙ্গে আমিও তো গেছি ক'বার!

প্রভাতদা কহিলেন, মাণিকতলা নয়, পড়পায়।

গোপেনবাবু কহিলেন, তা হবে। কতদিন আগের কথা, ঠিক মনে নেই। কিন্তু মরবার আগে তিনি না পাগল হয়ে গিয়েছিলেন ব'লে শুনেছিলাম?

প্রভাতদা কহিলেন, হ্যাঁ, লোকে তাই জানে বটে। কিন্তু তাঁর পাগল হওয়ার সত্য ইতিহাসটা কেউ জানে না। সেই গল্পই আজ আমি বলব।

ডক্টর নিয়োগী ছিলেন অ্যাপ্রায়েড কিজিক্সের প্রফেসর। ইউনিভার্সিটিতে বরাবর ফার্স্ট হয়ে পাশ করেন, ক'রে বিলেত যান। সেখানেও কোন পরীক্ষাতে কোনদিন সেকেণ্ড হননি। শুনেছি সেখানে নাকি তাঁরা তাঁকে মোটা মাইনের চাকরি দিয়ে রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু দেশ ছেড়ে বাইরে পড়ে থাকতে তিনি রাজী হলেন না, চলে এলেন। দেশের ওপর টান ছিল তাঁর অসাধারণ।

আমার বাবা আর ডক্টর নিয়োগী স্কুলে একসঙ্গে পড়তেন, সেই থেকে দু' পরিবারে আত্মীয়। আমি তাঁকে কাকাবাবু ব'লে ডাকতাম। মিসেস নিয়োগীকে বলতাম কাকীমা। পড়াশোনার ব্যাপারে আমার গার্জেন বলতে গুরুজন বলে ছিলেন তাঁরা দুজনেই—বাবা ও-ভারটা তাঁদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। গড়পারে তাঁদের বাড়ী ছিল, বাড়ী না ব'লে তাকে কারখানা বললেই হয়! তিনতলার প্রায়

গোটাটা জুড়ে ডক্টর নিয়োগি তাঁর ল্যাবরেটরী বসিয়েছিলেন, দিনে-রাতে যতটুকু ফুরসৎ মিলত তিনি সেই ল্যাবরেটরীতেই প'ড়ে থাকতেন! কত রকম কি যে এক্সপেরিমেন্ট করতেন ব'সে তার ঠিক নেই। আমারও দিনের বেশিই ভাগ কাটত সেইখানে। ল্যাবরেটরীতে ঢুকতে অবশ্য পেতাম না, এক কাকীমা ছাড়া আর কারও সেখানে যাবার হুকুম ছিল না। যতক্ষণ বসে বসে দূর থেকে চেয়ে সেই সব কাণ্ডকারখানা দেখতাম—বুঝতামনা তার কিছুই, তবু দেখতে দেখতে মনে নেশা ধ'রে যেত। মনে মনে স্থির সংকল্প ক'রে রেখেছিলাম বড় হ'লে সায়েন্স পড়ব, আমিও ল্যাবরেটরী করব। কাকাবাবু কাকীমাও প্রাণপণে উৎসাহ দিতেন। কাকাবাবু বলতেন, সায়েন্স পড়, তোকে আমি পৃথিবীর সেরা সায়েন্টিষ্ট বানিয়ে দেব। ছেলেপুলে হবার, স্নেহমমতা সবটাই ঢেলে দিতেন আমার ওপরে। ম্যাট্রিক পাশ ক'রে বেরিয়ে সায়েন্স সাবজেক্ট নিয়ে পড়তে লাগলাম। সত্যি কথা বলতে, আমার তখনকার মাষ্টার ছিলেন কাকীমা। সায়েন্স পড়া আমার শেষ পর্যন্ত হয়নি, কিন্তু যেটুকু বা শিখেছিলাম সব তাঁর দয়াতেই!

এই একটি মানুষ দেখেছি, আমার কাকীমা। অমন একটি মেয়ে আর দেখলাম না জীবনে! ছোট-খাট মানুষটি, গায়ের রঙ সুন্দর ফেকাসে, মুখে হাসি লেগেই রয়েছে। এমন কিছু রূপসী হয়তো নন, কিন্তু সেই হাসিটুকুর জন্যে তাঁকে অদ্ভুত সুন্দর দেখাত। আর চোখ দুটির কথা কি বলব—টানা-টানা বড় দুটি চোখে বুদ্ধি আর মমতা যেন ঝরে পড়ছে। না জানতেন এমন কিছু নেই—ঘরকন্নার খুঁটিনাটিও যেমন নিজের হাতে করতেন, ল্যাবরেটরীর কাজেও ছিলেন তেমনই পটু। স্কুলে কলেজে পড়েননি কোনদিন—তখনকার দিনে মেয়েদের কলেজে পড়ার রেওয়াজ ছিল না। কাকাবাবু নিজেই তাঁকে সমস্ত শিখিয়েছিলেন। কাকাবাবুই বলতেন তাঁর মত এক্সপার্ট ল্যাবরেটরী-অ্যাসিষ্ট্যান্ট তিনি আর কোথাও পাননি। জানিনে এর খানিকটা হয়তো অত্যুক্তি, কাকীমা নিজে অন্ততঃ তাই বলতেন। কিন্তু কাকাবাবু সেকথা কিছুতেই মানতেন না। ওপরের বিশেষ কিছু যে আজও বুঝি তা নয়, সত্যি ক'রে দক্ষতা তাঁর কতটুকু ছিল বা না ছিল তা খুঁটিয়ে বলতে পারব না। কিন্তু একটি কথা জোর ক'রেই বলতে পারি, কাজে অমন নিষ্ঠা আমি আর কখনও দেখিনি।

কাকাবাবু ছিলেন চিরকেলে খেয়ালী মানুষ। এক্সপেরিমেন্টের নামে তাঁর নাওয়া-খাওয়ার হুঁস থাকত না। তাঁর সমস্ত কিছু সামলাতেন কাকীমা। কতদিন তাঁকে দেখেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা চোখে লেন্স লাগিয়ে ঠায় বসে কি সব রে না ওয়েস্ত করছেন, বা পাতার পর পাতা ধ'রে হিসেব টুকছেন, অঙ্ক কষছেন, আবার তারই ফাঁকে ফাঁকে সমস্তক্ষণ খাবারটি ক'রে দিতে, তাড়া দিয়ে কাকাবাবুকে কলেজে পাঠাতেও তাঁর ভুল হচ্ছে না। কাকাবাবু বলতেন, এইটেই আমার দুঃখু যে, আমার নাম সবাই জানল, কিন্তু যার দৌলতে আমার সমস্ত কাজ সম্ভব হচ্ছে তাকে কেউ চিনলে না। ওদেশে জন্মালে একটা কুরী-টুরী হ'য়ে যেতো গো।

কাকীমা বলতেন, কাজ নেই বাবু কুরী হ'য়ে, কানা বাঙালী আছি, আমার কানাই ভাল।

আমি বলতাম, সত্যি কাকীমা, আপনার নামটাও লোকের অন্ততঃ জানা উচিত।

কাকীমা বলতেন, রেখে দে বাপু। আমি মেয়েমানুষ নাম নিয়ে করব কি। তোর কাকাবাবুর নাম হোক, তাইতেই আমার হবে।

এমন নির্বাক আত্মবিলোপ করতে মানুষকে আর দেখিনি। এখনও ভাবি, সত্যকার সহধর্মিণী বলতে যাঁরা বোঝেন এমনিধারা মেয়েই বুঝতেন, একদিকে বাঙালী মেয়ের মন আর একদিকে জার্মান-লু মেয়ের ব্রেন, এর এমন সমন্বয় দেখতে পাওয়া ভাগ্যের কথা।

থাক, এখন যার কথা বলছিলাম। আমাদের বাড়ী তখন বাগবাজারে। তবু বেশির ভাগ সময় আমার কাটে পড়শীদেরই। কিছুটা বা পড়াশোনা করি, কিছুটা বা খেলাধুলো হৈ-হৈ করে কাটাই! কাকাবাবু কাকীমাও ফাঁক পেলেই খেলায় এসে যোগ দেন—বিশেষ করে ব্যাডমিন্টনটা খুবই ভাল খেলতেন কাকীমা। ছেলেপুলে নেই, গোটাকতক ভাগনে-ভাগনী-ভাইপোকে কাকাবাবু বাড়ীতে রেখে পুষতেন। কাকীমা বলতেন, যথেষ্ট পরিমাণ হৈ-চৈ না থাকলে সে-বাড়ীতে টিকে থাকা যায় না বাপু। হৈ-চৈয়ের কোন কমতি অবশ্য ছিল না, সেদিক দিয়ে আমাদের উৎসাহে ত্রুটি হত না।

এমনি করে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন যাচ্ছিল। কিন্তু চিরদিন গেল না। মানুষ সৃষ্টি ক'রে সুখে আছে, এটা বোধহয় বিধাতাপুরুষের তেমন সহ্য হয় না, সুখের সংসারে ভাঙন ধরিয়ে তাঁর খেলা! এদের সংসারেও তিনি কাট ধরিয়ে দিলেন। এবং দিলেন অদ্ভুতভাবে। একটা অতি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কি ক'রে যে তার সূত্রপাত হ'য়ে গেল—আমি আজও যেন ভেবে পাইনে।

সেটা নাইন্টিন ফিফটিন। গরমের দিন, সন্ধ্যার পরে দোতলার বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে আমরা গল্প করছি—আমি কাকাবাবু আর কাকীমা। বারান্দার ওধারে বসে কাকাবাবুর ভাগ্নে তোপসে আরব্য-উপন্যাসের গল্প পড়ছে।

তোপসে তখন ছেলেমানুষ আট-ন' বছরের জোর। ঐ বয়সেই কিন্তু ছেলেটা ভয়ানক বই পড়ত—ভাল হোক, মন্দ হোক বই পেলেই সে মুখ গুঁজে বসে যেত। আর একটা অদ্ভুত স্বভাব ছিল তার, পড়তে পড়তে কোথাও ভাল বা নতুন কথা কিছু পেলে তৎক্ষণাৎ চেঁচিয়ে সেটা সবাইকে শুনিয়ে দিত নইলে তার স্বস্তি ছিল না।

সেদিনও সে তাই করলে। পড়তে পড়তে হঠাৎ এক সময় 'ধ্যেৎ' বলে লাফিয়ে উঠল।

কাকীমা বললেন, কি হ'ল রে?

তোপসে বললে, দেখ না মামী। ব'লে বই হাতে করে কাকীমার কাছে চলে এল। বললে, রাজ্যের যত মিছে কথা লিখে বই বানিয়েছে।

কাকীমা বললেন, গল্প তো গল্প। তার আবার সত্যি-মিথ্যে কি?

তোপসে বললে, তাই ব'লে যার কোন মানে হয় না এমন কথা লিখবে? রাজকন্যা যাদুকরে লড়াই হচ্ছে, তা এ হয়ে যাচ্ছে পাখী তো ও হয়ে যাচ্ছে বেড়াল, আবার ইনি হচ্ছেন ডালিম আর উনি হচ্ছেন মুক্তো—যত সব নন্‌সেন্স!

কাকাবাবু চুপ করে শুনছিলেন। এবার তিনি কথা কইলেন। বললেন, নন্‌সেন্স কে বললে

তোকে? তোষল বললে, বন্‌সেন্স নয় তো কি! এ কখনও সত্যি হয়, না হ'তে পারে? গল্পের তো আর মা বাপ নেই, কাকে হাতে করলেই যত রাজ্যের বাজিল লিখে যাবার বাইট জন্মে যায় লেখকদের। হাম্‌বাগ যত।

কাকাবাবু এদিকে তাকাচ্ছিলেন, উঠে বসলেন। হঠাৎ একটা মস্ত ধমক দিয়ে বললেন, যাজে বকিস নি। পৃথিবীতে সবাই হাম্‌বাগ আর তুইই বুদ্ধিমান? তুই যা জানিস্‌নে বা যার মানে বুঝিস নে তাই কেউ বললেই সে হাম্‌বাগ হ'য়ে গেল, কাজিল কোথাকার?

কাকাবাবু সাধারণতঃ কাউকে কড়া কথা বলতেন না। তাঁর মুখে হঠাৎ এমন ধমক খেয়ে তোষল তড়কে গেল। চিঁচিঁ ক'রে বললে, কিন্তু এ কি ক'রে সত্যি হয়?

কাকাবাবু বললেন, হয় কি না হয়, তার তুই কতটুকু জানিস? তারপর গলা নামিয়ে বললেন, শুধু এই গল্পের কথা ব'লেই আমি বলছি নে। এমন অনেক কিছু ব্যাপার পৃথিবীতে আছে বা হ'তে পারে যা হয়তো হঠাৎ শুনলে সম্ভব ব'লে মনে হয় না। কুড়ি বছর আগে এরোপ্লেন বা সাবমেরিনের কথা মানুষ কল্পনা করতে পারত না। জুল্‌স্ ভার্ণে ডুবোজাহাজের কথা লিখেছিলেন ব'লে লোকে তাঁকে পাগল বলেছিল। গ্যালিলিওকে পুরেছিল জেলে। জানিস তাঁদের কথা?

তোষলের মুখ তখন এতটুকু হ'য়ে গেছে। বললে, জানি।

কাকাবাবু বললেন, সেইজন্যেই যখন নতুন কিছুর নাম শুনবি, তাকে হেসে উড়িয়ে না দিয়ে বরং ভেবে দেখবি তার মানে কি। কিছু জানলি না শুনলি না অথচ ফিজের মত হেসে তাকে নন্‌সেন্স বলে দিলি—এতে তোর বিদ্যে প্রমাণ হয় না, প্রমাণ হয় ছ্যাবলামো। লোক তাকে শ্রদ্ধা করে না, সবজান্তা বলে আড়ালে হাসি করে। বুঝেছিস?

তোষল বললে হ্যাঁ।

কাকাবাবু বললেন, যা, এখন পড়গে যা।

কাকীমা বললেন, পড়া থাক, আগে খেয়ে নিয়ে চল।

তোষলকে নিয়ে কাকীমা নীচে নেবে গেলেন। আমি বললাম, কিন্তু এ আপনার অন্যায় কাকাবাবু। ঐটুকুন ছেলে, অতবড় ধমকটা না দিলেই পারতেন।

কাকাবাবু বললেন, ঐটুকুন ছেলে তো কি হয়েছে? ঐটুকুন ব'লেই তো আরও বেশি ধমক পাবে। এই সময় থেকেই যদি সব হয়ে ওঠে, ভবিষ্যতে বাঁচবে কি ক'রে?

আমি বললাম, থাক গে। কিন্তু তাই যদি বলেন, ও যেকথা বলেছে আমি নিজেও তো তাই-ই বলব।

কাকাবাবু মুখ তুলে আমার দিকে চাইলেন। বললেন, কেন?

আমি বললাম, ওর কথাটাই সত্যি বলে। ও গল্পের কথা অসম্ভব ব'লে।

কাকাবাবুর চোখ হঠাৎ জ্বলে উঠল। বললেন, কে বলেছে তোমাকে, অসম্ভব?

আমার স্মরণশক্তি খুব ভাল এমন অহঙ্কার আমার নেই। কিন্তু সেদিনকার কথাগুলোর প্রতিটি অক্ষর

আমার মনে গেঁথে রয়েছে। পরে এতদিন এতবার করে সেগুলো আমি মনে মনে আউড়েছি যে এ জীবনে আর তাকে ভুলে যাবার আশা নেই। কি যে ঘটেছিল সেদিন আমার হ'ল কে জানে—বিধাতাপুরুষ নিজেই হয়তো আমাকে তর্ক করার বুদ্ধি দিয়েছিলেন। সেই একদিনের তর্কের ফল কতদূর গড়াবে যদি তখন জানতাম, প্রাণ গেলেও আমি সে তর্ক করতে যেতাম না। কিন্তু এখন আর তার জন্যে অনুতাপ করেও লাভ নেই, অনুতাপ করতে গেলে সেটা তামাসার মত শোনাবে। কি বলছিলাম?

অমল কহিল, ডক্টর বিরোধী বলিলেন, কে বলেছে অসম্ভব?

প্রভাতদা কহিলেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, বলবে আবার কে! মানুষ থেকে মুরগী, মুরগী থেকে ডালিম হওয়া সম্ভব নয় ব'লেই অসম্ভব।

কাকাবাবু একটুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, কাঠ থেকে চিনি হওয়াও তো একসময়ে অসম্ভব ব'লে জানত লোকে। ডিমের কুসুম থেকে পাখী হয় কি করে, বলতে পার?

আমি বললাম, সে হয়, কুসুমের মধ্যে এলিমেন্টের সামঞ্জস্য হয়েছে ব'লে। হাঁসের ডিম থেকে মুরগীর ছানা বেরোয় না। কিন্তু আপনি কি বলতে চান মন্থরের জোরে সত্যিই মানুষ থেকে জন্তু প্রাণী, প্রাণী থেকে ফল হওয়া সম্ভব?

কাকাবাবু বললেন, না। আমি শুধু বলতে চাই, সত্যি ক'রে কোনটা হওয়া সম্ভব কি সম্ভব নয় তার চূড়ান্ত রিসার্চ এবং এক্সপেরিমেন্ট যতক্ষণ না হ'য়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ তার সম্বন্ধে চট্ করে মতামত দিয়ে না ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

আমি বললাম, কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট পরের কথা। মানুষের কমনসেন্স ব'লে তো একটা জিনিস আছে, তার ফাঁক গ'লে বেরোলে তবেই এক্সপেরিমেন্টের কথা আসবে। এই রাজকন্যা আর যাদুকরের যে গল্প তোমরা বলছিলে, তার কথাই ধরুন। হেপ্নোটিজ্ম দিয়ে হয়তো মানুষকে এরকমের খেলা দেখিয়ে দেওয়া যায়, হিপ্নোটাইস করেও যায়। কিন্তু সত্যি সত্যি তারা এমন সব নতুন নতুন রূপ নিচ্ছে, পাখী হয়ে আকাশে উড়ছে, মাছ হ'য়ে জলে ডুবছে, হাওয়া হ'য়ে অদৃশ্য হ'য়ে যাচ্ছে—এইসবকে আপনি বিশ্বাস করতে বলেন?

কাকাবাবু বললেন, বিশ্বাস করতে বলি না, জেনে অবিশ্বাস করতে বারণ করি। একটা কথাই ভেবে দেখ না। এই-যে রূপ বদলাবার কথা বললে এরকমের গল্প তো শুধু আরেবিয়ান নাইট্সেই নেই। পৃথিবীর অনেক প্রাচীন-দেশের অনেক বইতেই এমন গল্প পড়া যায়। আমাদের হিন্দু মিথলজিতে এর ছড়াছড়ি দেখতে পাবে। দেবতারা পাখী হ'য়ে যাচ্ছেন, বা বিশেষ কোন মানুষের রূপ ধরছেন, ঋষির শাপে মানুষ জানোয়ার হয়ে যাচ্ছে, মায়াবী রাক্ষস ইচ্ছেমত রূপ নিচ্ছে বা অদৃশ্য হ'য়ে যাচ্ছে—আমাদের দেশের পুরাণে শাস্ত্রে রূপকথায় এমন কাহিনীর অন্ত নেই। ঠিক এমনিধারা গল্প চীনে আছে, গ্রীক পুরাণে আছে, রোমান পুঁথিতে আছে, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় আছে। তুমি কি বলবে, পৃথিবীর সমস্ত দেশের লোকেরাই ষড়যন্ত্র করে এই এক ধরণের মিথ্যেকথা বলিয়ে রেখে গেছে?

আমি বললাম, তা নাও হ'তে পারে। হয়তো বানিয়েছে অন্য কারণে—যে ক্ষমতা মানুষের নিজের নেই, কল্পনার বিরোধে সেই ক্ষমতার অধিকারী ক'রে এঁকে তারা তৃপ্তি পেয়েছে।

কাকাবাবু বললেন, হ'তে পারে, কিন্তু তাই হ'লে এত সমস্ত দেশের গল্পে এমন আশ্চর্য মিল থাকত না। একটা কথা মনে রেখো, এই দেশগুলো সবগুলো কাছাকাছি নয়, এদের মধ্যে যাতায়াতের রাস্তাও তখন বেশি ছিল না। এক দেশের গল্প শুনে অন্য দেশের লোকেরা নিজেদের বইয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছে, এ ব্যাখ্যা এখানে চলবে না। অবিশ্বাস্য বা অদ্ভুত কথাকে নির্দ্বিধায়ে স্বীকার করে নিতে অনিচ্ছা তখনকার লোকেরও ছিল। তার চেয়ে বরং, প্রত্যেকেই তারা এই ধরণের একটা কথার সঙ্গে কাজে হোক কল্পনায় হোক পরিচিত ছিল, এই কথা বিশ্বাস করাই সহজ।

আমি বললাম, বেশ, তাই যদি হয়। বিভিন্ন দেশের লোকেরা এই রকম অদ্ভুত কল্পনা করেছে, এমন কথা মনে করলেই বা দোষ কি ?

কাকাবাবু বললেন, দোষ হবে। মানুষের কল্পনা তার বাস্তব জীবনকে খুব বেশিদূর ছাড়িয়ে যেতে পারে না। ভূতের কেউ ছাগলের, কেউ বাঘের—চেহারাটা বানিয়ে নেয় সেই দেশের পরিচিত জীবকে থেকে। অথচ এই একটা জায়গায় সমস্ত দেশের কল্পনা আশ্চর্যরকম মিলে যাচ্ছে।

আমি বললাম, তাতে কি প্রমাণ হ'ল ?

কাকাবাবু বললেন, প্রমাণ হ'ল যে কল্পনাটা নেহাৎ আজগুবি নাও হ'তে পারে। হয়তো একই ধরণের ঘটনা এরা দেখেছে, দেখে তাই নিয়ে গল্প বানিয়েছে। যে ঘটনা তারা দেখেছিল, পরে কোন কারণে প্রাচীন জগতের আরও নানা বিষয়ের মত সেটাও লোপ পেয়েছে ; আমরা তার ধারণা করতে পারি না বলেই মনে করি গল্পগুলো আজগুবি।

আমি বললাম, আচ্ছা বেশ। তাহ'লে আপনিই বলুন না, কি ক'রে তারা এমন রূপ বর্ণনা ?

কাকাবাবু হঠাৎ থমকে গেলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, আমি তো কোনদিন ভেবে দেখিনি। কিন্তু —কি যেন বলতে গিয়ে তিনি থেমে গেলেন।

ভোম্বল এসে খবর দিল, মামা, খেতে যাও, মামী ডাকছেন।

কাকাবাবু বললেন, যাচ্ছি। আমাকে বললেন, খেতে যাবি চল।

দু'জনে ছাত থেকে নেমে এলাম, পাশাপাশি ব'সে গেলাম, কিন্তু সে রাতে আর কথাবার্তা প্রায় কিছুই হল না। কাকাবাবু সারাক্ষণ যেন গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে রইলেন। কাকীমা পর্যন্ত কথায় ক'রে ডেকে সাড়া পেলেন না।

খেয়ে উঠে আমি বাড়ি চ'লে এলাম। কি যে সর্বনাশের সূত্রপাত ক'রে রেখে এলাম, টেরও পেলাম না কিছু। একগ্লাস জল খাও গে যে।

খোট্টা ভৃত্য দ্বারের বাহির হইতে উঁকি মারিতেছিল। কবিরাজ তাহাকে ইঙ্গিত করিলেন। কবি কহিল, আমি দিচ্ছি, তোমার কর্ম নয়।

কবি কাচের গ্লাস বাহির করিয়া নিজের হাতে ভাল করিয়া ধুইল, তারপর জল ভরিয়া প্রভাতদার হাতে দিল।

প্রভাতদা একনিশ্বাসে গ্লাস খানি করিয়া সেটা ফণির হাতে ফিরাইয়া দিলেন। ফণী আর এক গ্লাস জল ভরিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিল, তারপর আবার বসিয়া কহিল, তারপর বলুন।

প্রভাতদা কহিলেন, বলছি। এর পরের দিন কাকাবাবুর বাড়ি যাওয়া হ'ল না। তার পরের দিন গেলাম। কাকাবাবু মাইক্রোস্কোপে কি দেখছিলেন বারান্দায় ব'সে। যেতেই বললেন, তোকে ডেকে পাঠাচ্ছিলাম। বোস্, দরকার আছে।

আমি বললাম, কি বলুন।

কাকাবাবু বললেন, বলছি, এটা শেষ ক'রে নিই আগে। ব'লে কাগজ পেন্সিল নিয়ে কি কতগুলো টুকতে লাগলেন স্লাইড্ দেখে দেখে। আমি চুপ ক'রে ব'সে রইলাম। কাজ করতে করতে তিনি হঠাৎ বললেন, তুই তাল সংস্কৃত জানিস, নয়?

আমি বললাম, হঠাৎ?

তিনি বললেন, আছে দরকার। ওটা শিখেছিলাম এক কালে, অনভ্যাসে ভুলে গেছি। আমাকে একটু পড়িয়ে দিতে পারবি?

তখন তো আর জানিনে--বললাম, পারব না কেন।

তিনি বললেন, তবে তাই কথা রইল, কাল থেকে পড়া শুরু হবে। কি কি বই লাগবে তার লিষ্টি দিয়ে যাস।

চার পাঁচমাস ধরে তিনি সংস্কৃত পড়লেন। অদ্ভুত নিষ্ঠা। স্কুলের মত ক'রে স্লেট পেন্সিলে হাতের লেখা লিখে ট্রান্সলেশন ক'রে টাস্ক লিখে তিনি পড়তে লাগলেন, তাতে তাঁর সঙ্কোচ নেই ভ্রান্তি নেই। অমন ক'রে লেগে থাকতে জানলে বড় হয়ে যেতাম।

আর পারতেনও পড়তে। পাঁচ মাসে সংস্কৃত শিখতে মানুষে পারে আমার ধারণা ছিল না। অথচ তিনি বেশ অনায়াসেই বড় বড় বই পড়তে পারছেন দেখলাম। শেষে বললাম, আর পড়াবার কিছু আমার নেই।

এই পাঁচ মাসের মধ্যে সেদিনকার তর্কের কথা আর ওঠে নি। আমি ভেবেছিলাম ভুলেই গেছেন। তোলেন নি, সেটা টের পেতে দেরি হ'ল না।

গোপেন তোমার মনে থাকতে পারে, এই সময়টাতে আমি মামার বাড়ী বেড়াতে যাই। সেখানে গিয়ে পড়লাম ম্যালেরিয়ায়, ম্যালেরিয়া থেকে রেমিটেণ্ট। কলকাতায় ফিরলাম প্রায় ছ'মাস পরে। তখনও আমার শরীর দুর্বল। এসেছি শুনে কাকাবাবু ডেকে পাঠালেন। গাড়ি ক'রে গেলাম তাঁর বাড়িতে। দেখেই বললেন, তুই কাহিল হয়েছিস, তবে আর শুনবি কি ক'রে?

আমি বললাম, কি শুনব?

তিনি বললেন, অনেক কথা। একটা নতুন থিওরির সন্ধান পেয়েছি মনে হচ্ছে।

তাঁর সমস্ত নতুন থিওরিরই প্রথম শ্রোতা ছিলাম আমরা দু'জন—আমি আর কাকীমা। নিজের চিন্তা-গুলোকে মনের মধ্যে গুছিয়ে নেবার জন্যেই বোধহয় তিনি আমাদের ব'লে যেতেন।

৫

আমি বললাম, বেশ তো, বলুন শুনব। দেহ কাহিল হয়েছে বলে মন তো আর রোগা হয় নি।

কাকাবাবু বললেন, আচ্ছা, একটু বোসো তাহ'লে। ব'লে উঠে লাইব্রেরি-ঘরে চলে গেলেন।

আমি বললাম, কিসের থিওরি, কাকীমা?

কাকীমা বললেন, জানিনে। বলেন কি আমাকে!

আমি বললাম, একটুও না?

কাকীমা বললেন, না। জিজ্ঞেস করেছিলাম, তা বললেন তুমি না এলে বলবেন না। এর সূত্র নাকি তুমিই ওঁকে দিয়েছিলে, তাই তা শুনবার প্রথম অধিকারও তোমারই। আমাকে বলতেও পারছেন না, অথচ ভেতরে ভীষণ উত্তেজিত হ'য়ে রয়েছেন।

আমি অবাক হ'য়ে বললাম, আমি আবার কিসের সূত্র দিলাম ওঁকে?

বলতে বলতেই কাকাবাবু ফিরে এলেন। তাঁর হাতে একগাদা বই। বইগুলো ধপাস ক'রে টেবিলে ফেলে ইজি-চেয়ার টেনে বসলেন, বললেন, সূত্রটা তুমি ঠিক একা দাওনি, দিয়েছিলে তুমি আর তোমার দু'জনে মিলে। এবার শোন।

অনেকদিন আগে এই বারান্দায় ব'সেই আমাদের কথা হয়েছিল, আরেবিয়ান নাইট্‌সের গল্প নিয়ে। মানুষ কোন কৌশলে অন্য মানুষের বা জীবের রূপ নিচ্ছে, এটা সম্ভব কিনা, এই ছিল আমাদের প্রশ্ন। এই প্রশ্নের জবাব আমি খুঁজে বার করেছি। আমি বলব এটা খুবই সম্ভব।

প্রভাত তোমার মনে থাকতে পারে, আমি সেদিন তোমাকে বলেছিলাম, কাঠ থেকে চিনি বা ডিম থেকে পাখী হয় কি ক'রে? তুমি তার কি জবাব দিয়েছিলে, মনে আছে কিছু?

আমি বললাম, আছে। বলেছিলাম, দু'টোর মধ্যে এক্সিমেণ্টের সাদৃশ্য থাকে ব'লে।

কাকাবাবু বললেন, ঠিক তাই। মানুষ অন্য মানুষের বা অন্য জীবের রূপও নিতে পারে এই একই প্রিন্সিপ্‌লে।

আমি বললাম, সে কি!

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ। আমি বুঝিয়ে বলছি।

কাকাবাবুর একটি অভ্যাস ছিল—ব্যাখ্যা ক'রে কিছু বোঝাতে হ'লে তিনি প্রায় বক্তৃতার ঢঙে বলতেন। যেন ক্লাসের ছেলেদের বোঝাচ্ছেন। ওটা বোধহয় হয়েছিল কলেজে পড়ানোর ফলে, কথা বলতে গেলেই তাঁর লেকচারের সুর এসে পড়ত।

তখনও ঠিক তেমনি ক'রেই তিনি কথা বলতে শুরু করলেন—ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে, চোখ দুটি আধ-বোজা ক'রে, দুটি হাত বুকের ওপর জড়ো ক'রে রেখে। প্রথমটা বুঝতেই পারি নি কোন্ বিষয় নিয়ে তিনি কথা কইবেন। তারপর খানিকটা শুনে আমরা অবাক হ'য়ে গেলাম—এও কি সম্ভব! অথচ এখনই তাঁর বলায় ভুল, শুনতে শুনতে কোথাও মনে হ'ল না অসম্ভব। মনে মনে বেশ বুঝছি এমন কখনও আসলে হ'তে পারে না, অথচ তাঁর কথা অবিশ্বাস বা অস্বীকার করার মত যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না—এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। তাঁর সবগুলো

কথাই আমার মনে আছে. কিন্তু তার সমস্ত খুঁটিনাটি ব'লে লাভ নেই, আপনাদের সে শুনতে ভাল লাগবে না। সোজা কথাটা তাঁর যা ছিল সেটুকু হচ্ছে এই।

ধনী কহিল. উঁহুঁ, ও চবে না প্রভাতদা, ফাঁকি দিলে চলবে না। আমরা সবটা শুনব।

প্রভাতদা কহিলেন, আরে, সে করমুলা আর থিওরির কচকচি, কি করতে শুনে। তার চাইতে আসল কথাটুকু জেনে নিলেই তো হ'ল।

অমল কহিল, মোটেই না। সবটা শুনব।

নিতাইবাবু কহিলেন, নিশ্চয়ই।

প্রভাতদা কহিলেন, ভ্যালা আপদ। সে শুনে বুঝবে কিছু?

সত্য সেন কহিলেন, নাই-বা বুঝল। আপনি ব'লে যান না, আপত্তিটা কিসের?

প্রভাতদা আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, আপত্তি কিছুই নেই। ভেবেছ আমি মিথ্যে গল্প বানিয়ে বলছি, থিওরি বলতে গেলেই ধরা প'ড়ে যাব, এই তো? বেশ, বলছি সবটাই। সত্য সেনের দিকে চাহিয়া কহিলেন, ডক্টর মিথোর্গার কথাটা প্রধানত ছিল অ্যাটমিক থিওরি নিয়ে। অ্যাটম এবং মাস্-এর মধ্যে—

নিতাইবাবু ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, উঁহু উঁহু, বাংলা ক'রে।

প্রভাতদা থামিয়া গেলেন। তারপর কহিলেন, আচ্ছা, বাংলা ক'রেই বলছি।

জড়পদার্থ সম্বন্ধে ডিমিক্রিসের প্রথম কথা হচ্ছে, প্রত্যেকটা পদার্থই কতগুলো অণু-পরমাণুর সমষ্টি। যে-কোন জিনিসকে ভেঙে খণ্ড খণ্ড খণ্ড খণ্ড করতে করতে যদি যাই, শেষ পর্যন্ত গিয়ে ঠেকব তার সবচেয়ে ছোট কণাতে, তাকে আর ভাঙা সম্ভব নয়। এই সবচে ছোট কণার নামই হচ্ছে পরমাণু। পরমাণুকে আর দু'ভাগ করা যায় না, করতে গেলে তার নেচারই বদ্‌লে যাবে। সেভাবে তাকে ভাঙা অবশ্য যায়, তখন পরমাণু ভেঙে গিয়ে পাওয়া যাবে দু'টো ইলেকট্রিক এনার্জি—এদের বলে ইলেকট্রন আর প্রোটন।

আর একটি কথা, ম্যাটার বা মাস্ বলতে যাকে বোঝায় সেটা এক পরমাণুর সমষ্টি, কিন্তু খালি পরমাণু ছাড়াও তার মধ্যে কথা আছে। পরমাণুরা যত ঘন হ'য়ে ঠেশাঠেশি ক'রে থাকবে মাস্ ততই কঠিন বা কম্প্যাক্ট হবে। কিন্তু পরমাণুরা কখনও একেবারে গায়ে গায়ে মিশে থাকে না, তাদের মধ্যে মধ্যে অস্তিত্বের ফাঁক থেকে যায়। একে বলে ইন্টার-মলিকুলার স্পেস্—

অমল কহিল, জানি। এর মধ্যে আমরা বুঝব না এমন কি আছে?

প্রভাতদা কহিলেন, জানলে তো ভালই। কিন্তু তাহ'লে নিশ্চয়ই এটুকুও জান, প্রত্যেক জিনিসের পরমাণু আলাদা। পরমাণু পর্য্যন্ত যতক্ষণ না পৌঁছচ্ছে, ততই তাও জিনিসের নেচার একই থেকে যাচ্ছে। লোহার পরমাণু সোনার পরমাণু আদের পরমাণু নারকোলের পরমাণু, এদের মধ্যে লোহা সোনা আম নারকোলের বিশেষত্বই পাওয়া যাবে। কিন্তু পরমাণুকেও আবার ভেঙে যদি ইলেকট্রন, প্রোটনে নিয়ে যাই, তখন সবই একই এনার্জি। এটুকু বুঝলে?

অমল কহিল, এও জানি। তারপর?

প্রভাতদা কহিলেন, তারপর, এই থিওরি দিয়ে ডক্টর নিয়োগী তাঁর কথা আরম্ভ করলেন সেদিন। ব'লে বললেন, এইবার ভেবে দেখ, স্রেফ কিভিকাল প্রসেসেই একজন মানুষ আর একজনের চেহারা নিতে পারে কিনা।

আমি বললাম, ভেবে কি ক'রে?

তিনি বললেন, সোজা উপায়। তোমার এবং আমার দেহে পরমাণু রয়েছে একই রকমের—মানুষের দেহের পরমাণু। আমার দেহে সেগুলো একটা বিশেষ রকমে সাজানো রয়েছে, তোমার দেহে সাজানো আছে একটু অন্য রকমে। এইজন্যেই দু'জনের চেহারায় তফাৎ দেখা যাচ্ছে—তুমি হয়তো মাথায় একটু চাওা, আমার হয়তো নাকটা একটু বেশি উঁচু তোমার চাইতে, বা কানটা একটু ছোট। এখন যদি এমন যদি কোন প্রসেস থাকে যার দ্বারা এই পরমাণুদের ইচ্ছে মত বেড়ে বেড়ে নতুন ক'রে সাজানো যায়, তাহলে আমার চেহারা থেকে তোমার চেহারা বানানো, বা তোমার চেহারা থেকে আমার চেহারায় চ'লে আসা মোটেই শক্ত হবে না।

নিতাইবাবু কহিলেন, শুনতে মন্দ নয় বটে। কিন্তু মন বদলাবে কি ক'রে শুনি? মনে তো পরমাণু নেই।

প্রভাতদা কহিলেন, মন বদলাবার কথাও তো কেউ বলছে না। ইন্দ্র যখন গৌতম মুনি সেজেছিলেন তখন মনে যে-ইন্দ্র সেই ইন্দ্রই থেকে গিয়েছিলেন। নইলে পুরোপুরি গৌতম যদি হ'য়ে যেতেন, অহল্যার পাপ হত না। একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন, এখানে কথাই হচ্ছে মন চেতনা বুদ্ধি যেমন তেমনিটিই থাকবে, শুধু বদলে যাবে শুধু বাইরের চেহারাটা। রাজকন্যা ভালিম হন নি, ভালিমের রূপ ধরেছিলেন মাত্র।

গোপেনবাবু কহিলেন, আচ্ছা আচ্ছা! তারপর বল।

প্রভাতদা কহিলেন, মন বদলাবার কথা কি আমিই তুলিনি? আমিও জিজ্ঞেস করেছিলাম সেদিন কাকাবাবু তখন যে উত্তর দিয়েছিলেন সেইটেই বললাম আপনাদের। যাক, তারপর বলি। আমি বললাম, আপনি তো বললেন, এক মানুষ থেকে অন্য মানুষের চেহারা ধরবার কথা। কিন্তু মানুষ থেকে জানোয়ার বা গাছ-পাথর? এদের তো পরমাণু এক নয়!

কাকাবাবু বললেন, এক নয়, এবং তাই বলেই এটা বেশি শক্ত প্রসেস। এখানে কেবল দেহের পরমাণুকে নেড়েচেড়ে সাজালে হবে না, সেই পরমাণুকেই ভেঙে বদলে নিতে হবে।

আমি বললাম, কি করে?

কাকাবাবু বললেন, বুঝে নাও। দু'টো বস্তুর পরমাণু এক নয়; কিন্তু সেই পরমাণুকে আবার ভেঙে যদি এনার্জিতে নিয়ে ফেলতে পার, তখন সবই এক, কারণ এনার্জির রকমফের নেই। অতএব পরমাণুকে ভেঙে এনার্জি কর, আবার তাই থেকে ইচ্ছেমত নতুন রকমের পরমাণু তৈরি করে নাও, তা'হলেই হ'ল।

কাকীমা এতক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে শুনছিলেন। শোনবার সময় তিনি প্রায়ই কথা বলতেন না, এক মনে খালি কথা যেন গিলে যেতেন। তিনি হঠাৎ বললেন, আমি একটি কথা জিজ্ঞেস করব?

কাকাবাবু বললেন, কর।

কাকীমা বললেন, আচ্ছা, তুমি যা বললে তাই যদি সত্যি হয়—পৃথিবীতে এক ধাতু থেকে অন্য ধাতু করা, পারা তামা বা রূপো থেকে সোনা করা নিয়ে অ্যালকেমিস্টরা চিরকাল চেষ্টা ক'রে এসেছে শুনতে পাই। তারা কেন তা'হলে এতদিন চেষ্টা করে নি?

কাকাবাবু হেসে বললেন, কিন্তেস করবার দরকার ছিল না কিছু, কথাটা আমিই তোমাদের বলতে যাচ্ছিলাম। অন্যধাতু থেকে সোনা তৈরী একেবারে যদি তা নয়; অতি প্রাচীন জগতের সাম্রাজিস্টরা এর প্রসেস জানতেন ঝণে শোনা যায়। সে-প্রসেস তাঁরা অন্যকে জানাতে চান নি, নিজেদের পেটেন্ট বলে লুকিয়ে রাখতেন। তাই তাঁরা মরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সে বিদ্যেও লোপ পেয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, পাছে অন্য বৈজ্ঞানিকরা বা তাঁদেরই চেলারা তাঁদের প্রসেস চুরি করে নেয়, এই ভয়ে তাঁরা সত্যকার প্রসেসটাকে গোপন রেখে কতগুলো হিজিবিজি ভুলভাল বাইরে রেখিয়ে রেখেছিলেন। লোকে তাই দেখত তাই বিশ্বাস করত; তার ফলে পরে যারা তাঁদের নকল করতে চেয়েছে তারা আগাগোড়াই ভুল পথে চলেছে। তারা ভেবেছে অ্যালকেমিস্টরা তামাকে লোহাকে সোনা করতেন অন্য কিছু মিশিয়ে-টিশিয়ে—সোজা কথায় কোন কেমিক্যাল কি অ্যাক্শন ঘটিয়ে। অথচ আসলে ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। 'অ্যালকেমিস্ট্' নামটাই একটা প্রকাণ্ড ভাঁওতাবাজি—আসলে এদের নাম হওয়া উচিত ছিল 'অপ্টিকিমিস্ট'। লোহা সোনা হ'ত কেমিকেল কারণে নয়, কিজিক্যাল-ডিফ্রাক্শনের ভেতর দিয়ে।

কাকীমা বললেন, পরশমণির মানে কি তা'হলে?

কাকাবাবু একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, যদি যদি একটা প্রকাণ্ড রকমের স্পেকিং গ্লাস যাকে ছুঁলে আলোর কিরণ ছোটে?

কাকীমা বললেন, ধ্যেৎ। তখন কি তারা ইলেক্ট্রিসিটির ব্যবহার জানত নাকি!

কাকাবাবু বললেন, তখনকার হয়তো ছিল না। বজ্রের বিদ্যুৎ ধ'রে নিয়ে তারা কাজ চালাত যদি মনে করি, তবে পরশমণির মানে হবে এমন কোন একটা কড়কটার যার দ্বারা সেই বজ্রকে কাজে লাগানো যায়; মানুষের জীবনে তার সুযোগ আসত কচিৎ এক আধবার; সেইজন্যেই পরশমণিকে বলা হ'ত দুর্লভ বস্তু, জীবনে একবারের বেশি তার দেখা মেলে না।

কথাগুলো আপনাদের কাছে আশ্চর্য লাগছে। কিন্তু এর চেয়ে ঢের বেশী আশ্চর্য হয়েছিলাম সেদিন আমরা দু'জনে—আমি আর কাকীমা। তার কারণ আপনারা আজ এটাকে শুনেছেন গল্প হিসাবে, শুনে বিশ্বাস আপনাদের হোক না হোক আমাদের তার আসে না। আর আমরা সেদিন শুনেছিলাম সত্যমূর্তের মত, despite ourselves প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাস করতে করতে। আমরা জানতাম যিনি বলেছেন তিনি কখনোও সাম্রাজের কথা নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করেন না—সাম্রাজ তাঁর কাছে ছিল ধর্মের চেয়েও সেক্রেড্ বস্তু।

আমি বললাম, বেশ: কিন্তু অদৃশ্য হ'ত মানুষ কি ক'রে?

কাকাবাবু বললেন, সে তো সোজা কথা। ট্রান্সপেরেন্সি মানে হচ্ছে absence of obstruction to light। যেটার মধ্য দিয়ে খুব সহজে খুশী চলবে সেইটিই তত সহজে অদৃশ্য মনে হবে।

আমি বললাম, হুঁ। কিন্তু কাচের পরমাণু ট্রান্সপেরেন্ট্ হ'তে পারে, মানুষের পরমাণু তো নয়।

কাকাবাবু বললেন, পরমাণু ট্রান্সপেরেন্ট হ'তে যাবে কেন। মাছ-ধরা জাল দেখেছ?

আমি বললাম, দেখেছি।

কাকাবাবু বললেন, তার বিশেষত্ব কি, লক্ষ্য করেছ কোনদিন?

কাকীমা বললেন, জালের আবার বিশেষত্ব কি, জালের বিশেষত্ব তাতে মাছ ধরা পড়ে।

কাকাবাবু বললেন, আজ্ঞে না, সীরিয়াস্ হ'য়ে শুনুন একটু দয়া ক'রে। মাছ-ধরা জালের বিশেষত্ব হচ্ছে, তাতে যত থাকে সুতো, ততই থাকে ফুটো। জালটাকে যদি গুটিয়ে পুঁটুলি ক'রে রেখে দাও, সেটা একটা সলিড্ ম্যাস্, তার মধ্য দিয়ে দৃষ্টি চলে না। সেই জালকেই আবার টানটান ক'রে মেলে ধর,—তার ভেতর দিয়ে চমৎকার দেখতে পাবে। কেন এমন হয়?

কাকীমা বললেন, সে না জানে কে। জড়ো ক'রে রাখলে সুতোগুলো গায়ে-গায়ে হ'য়ে থাকে; ছড়িয়ে দিলে ফুটোগুলো বড় হ'য়ে যায়, তার ফাঁক দিয়ে সব দেখা যায়।

কাকাবাবু বললেন, তা'হলে এই ফুটোগুলোকে যদি আমি জালের ইন্টার স্যুতো স্পেস্ বলি, তোমার আপত্তি নেইতো?

কাকীমা বললেন, না।

কাকাবাবু বললেন ভাল কথা। এবার মনে কর, দেহটাও জালের মত, তার মধ্যে অসংখ্য ইন্টার-মলিকুলার স্পেসের ফুটো রয়েছে। যদি কোন উপায়ে এই স্পেসকে বাড়িয়ে দেওয়া যায় পরমাণুগুলো পরস্পরের থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাবে, এবং সেই ফাঁক দিয়ে ক্রমেই বেশি আলো চলাচল করতে পারবে। তার মানেই বস্তুটা ক্রমেই স্বচ্ছ, এবং তার পরে অদৃশ্য হ'য়ে যাবে। আবার ইন্টার-মলিকুলার স্পেস কমিয়ে আন, তার ডেন্সিটি কমতে থাকবে, অদৃশ্যও সে আর থাকবে না।

আমি বললাম, কিন্তু এ সত্যি ক'রে সম্ভব নয়।

কাকাবাবু বললেন, নয় কেন? জলকে গরম ক'রে তেতাও এবং তেতাও থেকে টীন ক'রে দিলে ঠিক এই ব্যাপারই হয়; টীন থেকে তেতাও এবং তাও থেকে আবার জল করাও অসম্ভব কিছু নয়। রূপকথার দৈত্যের গল্পও ঠিক তাই—প্রথমে কিছু নেই, তারপরে বিরাট একটা ধোঁয়ার মেঘ; তারপর মেঘ যতই ঘনীভূত হচ্ছে, ততই ছোট হচ্ছে, হ'তে হ'তে শেষে দৈত্যের আকৃতি। আবার অদৃশ্য হবার বেলা দৈত্য থেকে মেঘ, মেঘ থেকে আবছা ধোঁয়া, তারপর বাস অদৃশ্য। না হবার কথা পেলে কোনটা এর মধ্যে?

এমন সহজ সুরে তিনি বলছেন যে কোথাও অবিশ্বাস করবার কথাই ওঠে না। আমরা দু'জনে নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলাম। কাকাবাবুও অনেকক্ষণ তেমনি করেই ঠায় বসে রইলেন, চোখ বুজে। তারপর বললেন, কি খবর, চুপ করে গেলে যে? হজম হচ্ছে না?

আমি বললাম, সবই মানলাম আপনার কথা। কিন্তু তাই যদি হয়ও, নিজেরই দেহ হোক আর পরেরই দেহ হোক তাকে এমন ক'রে ভাঙাগড়া করবার মত শক্তি আসবে কোথা থেকে? পরমাণুগুলো ব'লে যদি সত্যি কিছু থাকে ও, গায়ে স্প্রিংকিং প্লাগ লাগিয়ে লাগিয়ে তো আর কাজ চলত না নিশ্চয়ই?

কাকাবাবু হঠাৎ উঠে বসলেন। বললেন, there you are। এইটেই হচ্ছে আসল তত্ত্ব, এর কথাই আমি বলব। এতক্ষণ যা হ'ল সে তো শুধু ইন্ট্রোডাক্শন। কিন্তু রাত হচ্ছে, তুই বাড়ি যাবি না?

আমি বললাম, না খেলেও কেউ মারবে না, জানে আমি এখানে এসেছি। আগে আপনার কথা শেষ হোক, শেষ না শুনে আমি নড়ছি নে আর।

কাকাবাবু বললেন, সাধু প্রস্তাব। কিন্তু তাড়া আছে তো হাতিতে, কি বল?

কাকিমা বললেন, আছে, সে তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি যা বলছিলে বল।

কাকাবাবু বললেন, বলি। প্রভাত বলেছে, সবসময় স্পার্কিং প্লাগ দিয়ে কাজ চলত না। সবসময় চলে না, ঠিকই। কিন্তু কিছু কিছু ব্যবহার তারও ছিল ব'লে মনে হয়। বাদুড়ও যা ম্যাগনিফাইং গ্লাসের উল্লেখ পাইছি—যাদুকর যা পরীক্ষা এর ব্যবহার করত। বাদুড়টা ইলেকট্রিফায়েড হওয়া বিচিত্র নয়। তবুও এর ব্যবহার ছিল নিম্নশ্রেণীর মানে কম-শক্তিওয়ালা লোকেদের মধ্যেই। শক্তি যাদের বেশি তাঁদের এসব যন্ত্রপাতির দরকার হ'ত না। এখন এই শক্তিটা দি, তাই তোমাদের বলব।

ইন্টার-মলিকুলার স্পেসের কথা বলেছি। এই স্পেসটা ফাঁকা থাকে না, একটা অদৃশ্য জিনিসে ভরা থাকে আমরা বলি ইথার। ইথার পরমাণুগুলোকে যেমন পরস্পর থেকে আলাদা ক'রে রাখে, তেমনই আবার একত্র বেঁধেও রাখে। এখন এই ইথারকে যদি ইচ্ছেমত বাড়ানো-কমানো যায় তাহলে ইন্টার-মলিকুলার স্পেসকেও বাড়ানো কমানো যাবে, পরমাণুদের নতুন রকমে সাজিয়ে রূপ বদলানো বা অদৃশ্য হওয়াও আর অসম্ভব থাকবে না। আমি বলব এই ইথারকে ইচ্ছেমত কন্ট্রোল করাই ছিল প্রাচীনকালের যোগসাধনা, এরই জোরে ঋষি বা যাদুকররা ওসব কাণ্ড করতেন।

আমি বললাম, কিন্তু পরমাণু ছেড়ে নতুন পরমাণু পড়া?

কাকাবাবু বললেন, সেটা ইথার দিয়ে হবে না, তার জন্যে দরকার হবে ইলেকট্রিসিটি এনার্জি। বাইরে থেকে এনার্জি দেহে ঢোকানো যায়। কিন্তু এদের সাধনা বোধ হয় ছিল অন্য ধরনের। দেহের ভেতরেই ইলেকট্রিক চার্জের একটা বড় ভাণ্ডার এরা তৈরি করে নিত—এক কথায় গোটা দেহটাকেই একটা প্রকাণ্ড স্টোরেজ ব্যাটারি বা ডায়নামো ক'রে তুলতো। সেই এনার্জি দিয়েই আবার দেহের ইথারকেও কন্ট্রোল করা সম্ভব হ'ত। এই দু'টো শক্তি আসলে বিভিন্ন—প্রথমটা যার হ'ত তার দ্বিতীয়টা সব সময়ে হয়তো হ'ত না, কিন্তু দ্বিতীয়টা যে করতে পারত প্রথমটা তার স্বভাবতই এসে যেত। এইজন্যেই যাদুকর সন্ন্যাসীদের ভেতরে শক্তির তারতম্য দেখা যেত, একজনের শক্তি আরেক জনের শক্তির চেয়ে বেশি হ'ত।

আমি বললাম, কিন্তু সাধনা দিয়ে তো শুধু নিজের শক্তিই বাড়ানো যাবে। মানে নিজেকে নিয়ে যদলে না হয় নকুল রূপ ধরা যাবে। পরের দেহকে বদলে দেবে কি ক'রে?

কাকাবাবু বললেন, সেটা শক্ত কিছু নয়, নিজের মধ্যে যে এনার্জি জমে আছে তার খানিকটা চালান ক'রে দিলেই হ'ল। হীনশ্রেণীর যাদুকররা এর জন্যেই ম্যাগনিফাইং গ্লাস ব্যবহার করছে। দুওটা হ'ত কণ্ডাক্টার। গুণ দিয়ে যাকে ছোঁয়া হ'ল, গুণ বেয়ে তার দেহে যাদুকরের দেহের এনার্জি খানিকটা চ'লে গেল। পরেই দেখবে, এই সব খেলা দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে যাদুকর—নিজে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ছে। মানে তার সঞ্চিত শক্তি খানিকটা খরচা হ'য়ে যাচ্ছে। আবার দুই যাদুকরে যেখানে লড়াই, যার শক্তি কম সে বেশি শক্তিওয়ালাকে কাবু করতে পারছে না, কারণ তার সঞ্চিত শক্তিকে ছাড়িয়ে উঠতে পারছে না। অভিজ্ঞের

বেলাও তাই—ছোট মেয়েদের শাপে বা আশীর্বাদে বড়দের কিছু হয় না। একটু উচ্চস্বরের ধারা তাদের আর দরকার হত না; তারা জল ছিটিয়ে বা খালি চোখের দৃষ্টি দিয়েই শক্তি সংক্রামিত করতে পারত—যেমন এখনকার দিনে রেডিও এনার্জি দিয়ে সুরের কল চালানো সম্ভব হচ্ছে।

আমি বললাম, কিন্তু সমস্তই যদি হয়, মেয়েদের এনার্জিকে এভাবে বাড়িয়ে তুলত তারা কি ক'রে?

কাকাবাবু বললেন, সেইটেই তো এদের সাধনা। এ সাধনা এখন অনভ্যাসে লোপ পেয়ে গেছে। সম্ভবত একদল লোকের এই অস্বাভাবিক শক্তি দেখে অন্যদের ঈর্ষা হত, সমাজের সুশৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে তাই একে তারা চেপে মেরেছে। যাদুকর ডাইনিদের পুড়িয়ে মারার ইতিহাস ইউরোপে অনেক পাওয়া যায়, এখনও এর চলন আছে ব'লে অনেকে মনে করেন।

এদের সাধনাটা কি ধরণের ছিল তা অবশ্য এখন আর জানা যায় না। কিন্তু এ-সাধনা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার কিছুই নয়। সাধারণ মানুষের শক্তিতে যা কুলোয় না এমন অনেক খেলা হঠযোগীরা দেখায়—বিষ খেয়ে হজম করে, কবরের মধ্যে চ্যাপ্ত থাকে, আগুনের ওপর দিয়ে হাঁটে, শূন্যে ভেসে থাকে, হেঁটে নদী পার হয়। হঠযোগ মানে আর কিছুই নয়, বিশেষ রকমের একসারসাইজ দিয়ে শরীরে কতকগুলো অসাধারণ শক্তি সৃষ্টি করা। হঠযোগের চর্চা এখনও আছে। নিজের শক্তি দিয়ে অন্যকে বশ করার খেলা জিপনোটিস্টরা চালিয়েই যাচ্ছে। এর পরেও কি বলতে চাও, এ-সাধনা একেবারেই মিথ্যে বা আজগুবি?

আমি বললাম, মিথ্যে না হ'তে পারে কিন্তু সম্ভবও হয়তো নয়।

কাকাবাবু হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে বললেন, কেন সম্ভব হবে না? এককালে মানুষ এর চর্চা করেছে। সিদ্ধিলাভও করেছে। তারপর হয়তো চর্চা ছেড়ে দিয়েছে, এর সিদ্ধিও কাজেই লোপ পেয়েছে। আবার যদি কেউ চেষ্টা করে, কেন পারবে না?

আমার হঠাৎ মহিচ্ছন্ন হ'ল। বলে বললাম, আপনি পারেন?

কাকাবাবু বললেন, উঃ কি ক'রে বলব। চেষ্টা ক'রে দেখা যায়।

আমার জিতে তখন দুষ্টু সরস্বতী ভর করেছে। বললাম, করুন না চেষ্টা।

কাকাবাবু কেমন যেন অন্যমনস্ক সুরে বললেন, করতে পারি কোনদিন।

কাকীমা চুপ করে শুনছিলেন। তিনি হঠাৎ অদ্ভুতভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন। বিকৃত উত্তেজিত গলায় বললেন, না, না, ও চেষ্টা করতে হবে না।

আমরা দুজনেই অবাক হ'য়ে ফিরে তাকালাম। কাকীমার মুখে চোখে কিরকম একটা উত্তেজিত ভাব চোখ দুটো যেন ভয়ে বড় বড় হ'য়ে উঠেছে।

কাকাবাবু বললেন, কি হ'ল?

কাকীমা ছেলেমানুষের মত মাথা নেড়ে বললেন, না, কক্ষনো হবে না তা। তারপর একটু থেমে বললেন, আমার ভয় করছে।

কাকাবাবু একটু হেসে বললেন, ছি ছি।

কাকীমা বললেন, না। ঋষিরা যে তিনদিন বারণ ক'রে গেছেন, নিশ্চয় খারাপ জেনেই করেছেন। তাঁকে আর খুঁচিয়ে তুলতে হবে না।

কাকাবাবু বললেন, আচ্ছা আচ্ছা! আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এনিওয়েজ কিনে নিয়ে আসিস্ তো খানিকটা। বুড়ো বয়সে, শেষে ভূতের ভয়ে ধরল তোমাকে! হুঁঃ!

কাকীমা কথা বললেন না। হঠাৎ উঠে নীচে চ'লে গেলেন।

আমি বললাম, কি হ'ল!

কাকাবাবু বললেন, শরীরটা খারাপ লাগছে বোধ হয়।

আমি বললাম, থাক গে, আপত্তি যদি থাকে। কিন্তু আমাদের কথাটা শেষ হোক। সত্যি এর সাধনা করা এখনও সম্ভব, আপনি মনে করেন?

কাকাবাবু বললেন, অসম্ভব নিশ্চয়ই নয়, তবে শক্ত। হঠযোগের বই আমি কিছু কিছু নেড়ে চেড়ে দেখেছি। খুব বেশি সাঙ্কেতিক, মানেই বোঝা যায় না ভাল করে। বেশি জানাজানি হবার ভয়ে এরা সব কথা খুলে বলত না। তা'ছাড়া যে কোন নিছক অভ্যাস দিয়ে আরম্ভ করতে হবে তাকে প্র্যাক্‌টিকাল ডিমন্‌স্ট্রেশন ছাড়া খালি বই লিখে বোঝানোও যায় না। সেই জন্যেই যোগীরা এরা পরে পরে বলেছে, গুরু ছাড়া হবে না। হঠযোগটা আসলে ছিল একটা প্র্যাকটিকাল কাল্ট, গুরু-পরম্পরায় চলত। সেই প্র্যাকটিকাল ইন্‌স্ট্রাক্টরের দেখা যদি না মেলে, শুধু বই প'ড়ে আরম্ভ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপারই বটে।

রাত হচ্ছিল, দু'জনে নীচে নেমে এলাম। কাকীমাকে খুঁজতে গিয়ে দেখি, তিনি জানলার ধারে বাইরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কি যেন ভাবছিলেন, পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম তবু টেরই পেলেন না। বললাম, কি হ'ল, কাকীমা?

কাকীমা বললেন, কিছু না তো!

আমি বললাম, লুকোচ্ছেন। আচ্ছা, তখন কি হ'ল আপনার, চেঁচিয়ে উঠলেন কেন অমন ক'রে?

কাকীমা বললেন, কি জানি। হঠাৎ কেমন যেন মনে হ'ল বিপদ হবে।

আমি বললাম, কি কাণ্ড! হচ্ছিল তো সব গল্প। ওর এক্সপেরিমেন্ট করতে যাচ্ছেই বা কে!

কাকীমা ধরা গলায় বললেন, না পেলেই ভাল।

এর কিছুদিন পর আমাকে হঠাৎ কলকাতার বাইরে চলে যেতে হ'ল।

কবি, দেখতো ভাই কটা বাজল।

কবি কহিল সাতটা দশ।

সত্য সেন মৃদু হাসিয়া কহিলেন, আমি উঠব এবারে। একটু বাইরে যেতে হবে।

প্রভাতদা কহিলেন, উঠলে? হ্যাঁ, আমিও আজ চলি কবিরাজমশাই। আর একদিন হবে।

নিতাইবাবু কহিলেন, আরে দূর দূর তাই কখনও হয়। বলুন, বেশ কখন গল্পটা শোনা যাক। সন্ধ্যা, বোসো।

সন্ধ্যা সেন কাঁচুমাচু মুখ করিয়া কহিলেন, একটু কাজ ছিল!

নিতাইবাবু কহিলেন, আহা, কাজ তো রোজই আছে। কই প্রভাতদা বলুন।

প্রভাতদা কহিলেন, সবটা বলতে কিন্তু অনেক সময় লেগে যাবে। সেইজন্যেই বলছিলাম আজ আর থাক।

কল্পী কহিল, না না, বলুন।

গোপেনবাবু কহিলেন, আহা বলই না গো, কেন মিছে ভয় বাড়াচ্ছ। ও তো জানা কথাই, নিতাইবাবুও শুনবেন, তুমিও না শুনিয়ে ছাড়বে না।

নিতাইবাবু কহিলেন, বটে! আর বিয়ে?

গোপেনবাবু কহিলেন, আমার অত ইবে নেই। নেহাৎ না শুনলে প্রভাত রাগ করবে ব'লে তাই!

প্রভাতদা কহিলেন, তা, তুমি না হয় বাড়ীই চলে যাও না, পিসীমা বুড়ী আবোর তাস নিয়ে বসে থাকবেন।

গোপেনবাবু কহিলেন, পিসীমা মারা গেছেন এক্ষণ বছর আগে।

প্রভাতদা কহিলেন, তাও তো বটে। তাহ'লে কি আর করা, ব'সেই থাক না হয়।

কবিরাজ অসহিষ্ণু হইয়া কহিলেন, আরে কি মুশকিল। গল্পটা গেল কোথায়?

প্রভাতদা কহিলেন, হচ্ছে হচ্ছে, ভয় পাবেন না। হ্যাঁ, কি বলছিলাম?

কল্পী কহিল, আপনাকে কলকাতার বাইরে যেতে হ'ল।

গোপেনবাবু কহিলেন, সে কি হে। তুমি আবার গঙ্গা পার হ'লে কবে, জানিনি তো?

প্রভাতদা কহিলেন, জানতে এই কি। ঐ সময়টাতে আমার অ্যাঠাইমার শরীর খুব খারাপ হ'য়ে পড়ে। পুরোনো অজীর্ণ ছিল, তার ওপর বুড়ো বয়সে যা হয়, একটু লোভ, একটু অত্যাচারে,—একেবারে স্বাস্থ্য ভেঙে গেল। ডাক্তার বললে চেঞ্জে যেতে; শুনে তাঁরও বাই উঠল, তীর্থ করব। একা গিয়ে তো শক্তি নেই, তাই-ঝি, ভাইপো-বৌ, নাতি-নাতকুড়, চাকর-বাকর নিয়ে সে এক অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী, আমি তার সেনাপতি। কাশী গিয়ে মাসখানেক থাকলেন, অনেকটা ভাল হলেন, তারপরই আবার মনে হ'ল এত ভাল থাকা ভাল নয় লোকে নিন্দে করবে, খাস্ গুরু হল—আমার এখানে দেহ টিকছে না—অন্য কোথাও চল। কাশী থেকে হৃষীকেশ, সেখান থেকে মথুরা,—হরিদ্বার, এলাহাবাদ, রামগিরি সেতুবন্ধ ক'রে ক'রে পাকা দেড়টি বছর না নিয়ে দেশে ফিরলেন না আমাকে ফিরতে দিলেন। তীর্থ অবশ্য খুবই করা হ'ল—এক বাকিপুর ছাড়া। তাও বলেছিলাম, অ্যাঠাইমা, ওটা আর বাকী থাকে কেন, চল। আশা ছিল যে পথে একবার পা বাড়ালেই নিশ্চিন্ত, চট ঈশ্বরপ্রাপ্তি ঘটে যাবে; তাতেও যদি না টঁসেন তো তখন মানস সরোবরের ঘুরো আসব। তা বুড়ী পাকা খুন, ঠিক গোঁ ধরে বসলে, যাব না। তখন আমরা সেতুবন্ধ রামেশ্বর থেকে ফিরে আসছি। চটেমটে বললাম, তা যাবে কেন; দেশ ছেড়ে গঙ্গা ছেড়ে বুড়ো বয়সে মরতে এসে রাবণ রাজার দেশে, ব'লে তখন যত মাদ্রাজী আর মেড়ো পুরুত এসে হিড়িক-মিড়িক মন্তর প'ড়ে ভ্রাড

কমাবে, শুকনো চালুর পিঠি খেয়ে, আর চাই পদার খেয়ে বিশ্ব খেয়ে ঘরের খেয়ো। শুনে আঠাটিমার প্রাণে ভয় হ'ল, ওরে বাবারে ব'লে এক দৌড়ে কলকাতায় এসে পৌঁছে হাঁপ ছাড়লেন।

গোপেনবাবু কহিলেন, হাঁ, এখন মনে পড়ছে বটে, আকবরের একটা ছেড়েক ছিলে না। আমরা জানতাম দেশে গেছ তোমরা। কিন্তু আসল কথা যে ছেড়ে চলে এলে।

প্রভাতদা কহিলেন, ছেড়ে আসিনি। বলছি। এই ছেড় বছরকাল কাকাবাবুদের খবর বিশেষ পাই নি। কাকাবাবুর চিঠিপত্র লেখার অভ্যাস বেশি ছিল না, আমাদেরও ঠিকানার দিয়তা নেই, কে আর কাকে চিঠি লেখে। মাঝখানে একবার বাড়ীর চিঠিতে জেনেছিলাম কাকাবাবুরা হরিদ্বারে গেছেন কুম্ভমেলা দেখতে। আমরা এখন হরিদ্বার থেকে বহু দূরে চলে গেছি। হরিদ্বার থেকে আরও ওপরের দিকে যেতে পারেন, এমন আভাসও একটু যেন পেয়েছিলাম, তারপর আর জানিনি! কলকাতায় ফিরে এসে শুনলাম তাঁরা অনেকদিন ফিরেছেন, পুরোনো বাড়ীতেই আছেন। দেখা করতে গেলাম।

তোষল দোর খুলে দিলে।

ওপরে যেতেই কাকীমার সঙ্গে দেখা হ'ল। প্রণাম ক'রে বললাম, কাকাবাবু আছেন তো?

বললেন, আছেন। আজই এলে বুঝি?

বললাম, কাল রাত্তিরে। কোথায় কাকাবাবু?

কাকীমা বললেন, ওপরে।

ল্যাবোরেটরীতে? ব'লে আমি সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়েছি, কাকীমা হঠাৎ আমাকে বাধা দিলেন, বললেন, এখন যেয়ো না।

একটু অবাক হ'য়ে গেলাম। বললাম, কেন?

কাকীমা বললেন, ল্যাবোরেটরীতে নেই তিনি। ছাতের ঘরে।

বললাম, বেশ তো। কি হ'য়েছে তাতে?

কাকীমা বললেন, একটু ব্যস্ত আছেন, ডাকাডাকি করলে রাগ করবেন।

শুনে আমার তখনকার অভিমান হ'ল। অতদিন পর দেশে ফিরেছি, ফিরেই ছুটে দেখা করতে এলাম, উনি এতই ব্যস্ত আছেন, ডাকাডাকি করলে রাগ করবেন। ঠোক গিলে বললাম, থাক তাহ'লে আপনি ব'লে দেবেন আমি এসেছিলাম।

কাকীমা হেসে বললেন, পাগলা ছেলে, অমনি রাগ হ'য়ে গেল! নাও বোসো এইখানে, বল শুনি কি কি দেখে এলে। তারপর একটু দাঁড়িয়া থেকে সুরে বললেন, উনিও এক্ষুনি এসে যাবেন, ভয় নেই।

আমার তখনও রাগ যায়নি, বললাম, থাক, দরকার নেই এসে।

কাকীমা বললেন, আঃ, এ কী পাগল নিয়ে পড়লাম গো! আচ্ছা খাবে?

বললাম, না।

বললেন, আচ্ছা থাক, নাঃ খেয়েই পরে বল। কোথায় কোথায় বেড়ালে?

আমি সংক্ষেপে একটু-আধটু বললাম। ব'লে বললাম, আপনারা কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন?

কাকীমা বললেন, আমরা তো গেলাম কুম্ভমেলায়; তারপর সেখান থেকে আমি কলকাতায় ফিরে এলাম। উনি সাধুবাবার সঙ্গে সঙ্গে—বলেই হঠাৎ থেমে গেলেন যেন অসতর্ক অবস্থায় একটা গোপন কিছু ব'লে ফেলেছিলেন।

আমি বললাম, সাধুবাবা কে?

কাকীমা বললেন, কি জানি কে, উনি চেনেন! নাও, ঐ বুঝি এলেন। তুমি বোসো একটু, আমি চা করে আনি।

ব'লে উঠে গেলেন। আমার কেমন যেন ভারি খারাপ লাগল। মনে হ'ল আমি যেন আর ঠিক তেমনিভাবে ঘরের ছেলেটি নেই, আগের মত যখন খুশি যেমন খুশি আসা-যাওয়া মেলামেশা আর চলবে না এখানে। মনে মনে বললাম, দুতোর দরকার নেই অনাহূত অতিথি হ'য়ে, চ'লেই যাই। উঠব কি উঠব না দোনামনা করছি, এমন সময় সিঁড়ি ব'য়ে কাকাবাবু নেমে এলেন। সিঁড়ি থেকেই ডেকে বললেন, কি রে, কখন এলি? ভাল আছিস্ তো?

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে সমস্ত রাগ হট ক'রে জল হ'য়ে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে প্রণাম করলাম। থাক থাক হয়েছে ব'লে হাত আমার মাথার ওপর রাখলেন। বেশ ভাল ছিলি? কই, মোটা ত হসনি?

বলতে বলতে এধারে খাটের ওপর এসে বসলেন। আমিও এসে বসলাম। বসতে বসতে হঠাৎ চোখে পড়ল, কাকাবাবুর ভেতরে কি-যেন একটা পরিবর্তন হয়েছে। কি-সেটা ব'লে বোঝানো যায় না—মানে চোখে দেখা যায় না মনে ধরা পড়ে, এমনিতরো একটা পরিবর্তন। কথা বলতে বলতে বেশ লক্ষ্য ক'রে দেখলাম। খালি পা, খালি গা, শুধু একটি গরদের ধুতি পরা, কোঁচাটিকে উল্টে তুলে তার খুঁটোটিকে আমার পেট-কাপড়ে গুঁজে দিয়েছেন, ফিরের সময় বরকে যেমন ক'রে কাপড় পরায়—কাকাবাবুকে এ রকম সাজে আর কখনও দেখিনি। পরিবর্তন কিন্তু আসলে এসেছে তাঁর চোখে-মুখে, এমন একটা অদ্ভুত আত্মসমাহিত দৃষ্টি, একটা শুভ্রাবৃত ভাব—যে আমি বর্ণনা দিয়ে বোঝাতে পারব না; ছবি আঁকতে জানলে এঁকে দেখাতাম। সুপুরুষ তিনি এমনিতেই ছিলেন, ছাঁটা দীর্ঘ গৌরবর্ণ দেহ; টিকোলো নাক, উজ্জ্বল চোখ, মুখে কপালে বুদ্ধির দীপ্তি ঝলমল করছে। কিন্তু এ-যেন খালি বাইরের সৌন্দর্য নয়, মনে হ'ল যেন ভেতর থেকে একটা অলৌকিক দীপ্তি ফুটে বেরুচ্ছে সমস্ত মুখ সমস্ত দেহটাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

কথাও বলছেন তেমনি—যেন খুব দূর থেকে, আস্তে আস্তে, তাতে আগেকার সে সচ্ছলতা রয়েছে আছে কিন্তু আগের মতো সহজ অন্তরঙ্গতা নেই। যেন সর্বদাই কি একটা ভাবছেন, বাইরে যে-আলাপটা ক'রে যাচ্ছেন সে তাঁর মনের ধ্যানকে ভাঙতে পারছে না। এ রকম ভাব তাঁর আগেও দেখেছি, যখন কোন একটা নতুন তত্ত্ব নিয়ে মেতে উঠতেন তখনও এমনি ক'রে তাঁর মন কোথায় ডুবে তলিয়ে যেত। কিন্তু এবারকার মত দীপ্তি তাঁর চেহারায় আর কখনও দেখিনি। সেটা সত্যিকার তফাৎ না এতকাল পরে দেখলাম ব'লে আমারই চোখের ভুল, ভাল ক'রে বুঝবার আগেই কাকীমা ঘরে

এসে ঢুকলেন, হাতে চা আর খাবারের থালা। বেখলাম ক'প বেট ্য বেখাকে, কাকীমার আতিথ্যের নমুনা ঠিক আছে, একটুও কমায় নি।

খেতে খেতে আবার সেই আগেকার দিনের মত আড্ডা জমে উঠল, কাকাবাবুও আগের মতই সহজ সুরে কথাবার্তা ঠাট্টা তামাসা শুরু করলেন। কাকীমা বললেন, জান, প্রভাত কিন্তু তারি রাগ করেছে আজ, চলেই যাচ্ছিল।

কাকাবাবু বললেন, কারণ?

কাকীমা বললেন, তোমাকে ডাকতে বারণ করেছিলাম।

কাকাবাবু হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। আমার একটা হাতকে মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন, আচ্ছা আচ্ছা, কাঁদিসনে। তোকেই দিয়ে যাব সব।

কথাটা বুঝলাম না, বললাম, কি দিয়ে যাবেন?

কাকাবাবু বললেন, আছে আছে। শোন, তোকে কিছুদিন থেকেই মনে মনে খুঁজছিলাম। আমার এখানে কবে আসবি বল?

আমি বললাম, কবে আসব মানে? যখনই বলবেন। কেন?

কাকাবাবু বললেন, একটা জিনিস দেখাব তোকে।

কাকীমা বললেন, কি?

কাকাবাবু বললেন, আছে, সেই একসঙ্গেই দেখতে পাবে।

আমি বললাম, বেশ, এই রবিবারে?

কাকাবাবু বললেন, রবিবার? তার মানে হ'ল—দেয়ালে ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকালেন, মনে মনে কি হিসেব করলেন, তারপর বললেন, আচ্ছা। রবিবার ঠিক আটটায়।

আমি বললাম আরও আগে আসতে পারি।

কাকাবাবু বললেন, না, তার আগে নয়, তবে তার বেশিও দেরি কোরো না। আসতে হবে কিন্তু একেবারে তৈরী হয়ে—গরম চান ক'রে গোটা কাপড় প'রে।

আমি বললাম, সেলাম। ট্রামে চ'ড়ে আসবো তো?

কাকাবাবু বললেন, তা এসো। কাকীমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমিও সেদিন আটটার মধ্যে চান ক'রে তৈরী হয়ে নেবে। আর একদম খালি পেটে—কিছু খাওয়া চলবে না।

কাকীমা কাকাবাবুর কোন কিছুতেই বিস্ময় প্রকাশ করতেন না, তবু লক্ষ্য করলাম তিনিও অবাক হয়ে গেছেন। বাইরে অবশ্য শুধু ঘাড় নেড়ে বললেন, আচ্ছা।

আমি বললাম, ব্যাপার কি? যেন পুজো-পুজো গোনাচ্ছে?

কাকাবাবু বললেন, দেখতেই পাবে। তারপর আবার বললেন, পুজো ঠিক নয়, তবু সাবধান হওয়াই ভাল, কে জানে কোথা দিয়ে কি ছুঁৎ লেগে যায়।

ওর পরে আর সেদিন আড্ডা জমল না। বাড়ী চলে এলাম।

রবিবারে ঠিক সময়মত গিয়ে পৌঁছোলাম, আমি আটটার অনেক আগেই। কাকাবাবুর কথা বুঝি না বুঝি অবিশ্বাস বা অগ্রাহ্য করবার সাহস ছিল না, ভোরে উঠে স্নানাদি ক'রে ধোপা কাপড় পরেই গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম, কাকীমাও তৈরী হ'য়ে ব'সে আছেন। মুখ দেখে বুঝলাম, তাঁরও আগ্রহ কম নয় ভেতরে ভেতরে তিনিও আমার চেয়েও হয়তো বেশীই উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন।

বললাম, কাকাবাবু কোথায় ?

কাকীমা ঠিক আগের দিনের মত বললেন, ওপরে।

আমি বললাম, কাকীমা, একটি কথা জিজ্ঞাসা করব, রাগ করবেন না বলুন।

কাকীমা বললেন, কি কথা ?

আমি বললাম, ওপরের ঘরে কি করেন কাকাবাবু ?

কাকীমা বললেন, রাগ করলাম না, কিন্তু জবাবও দেব না।

আমি বললাম কেন ? জানেন না ?

কাকীমা বললেন সবটা না হোক কিছু হয়তো জানি, তবু যে বলবার হুকুম নেই। তা হোক, মন খারাপ কোরো না, আজই হয়তো জানতে পারে।

একটু পরেই কাকাবাবু নেমে এলেন। ঠিক সেই আগের দিনের মত—খালি পা খালি গা পরণে গরমের ধুতি, কপালে একটি রক্তচন্দনের ফোঁটা। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এসেছ ! বোসো। তুমিও এসো, আর দেরী কোরো না।

ঘরের মাঝখানে একটি ছোট গোল টেবিল, তাকে ঘিরে তিনটি চেয়ার, আগে থেকেই সাজানো ছিল। সেই চেয়ারে তিনজনে বসলাম। ঘরের দোর আর জানালা কাকীমা সব বন্ধ ক'রে দিলেন, খালি ঘুলঘুলি আর খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে অল্প খানিকটা আলো ঘরে ঢুকে ঘরটাকে কেমন রহস্যময় ক'রে তুলল, ঠিক অন্ধ পাওয়ারের নীল বাল্‌ব জ্বাললে যেমন হয়। কাকাবাবু বললেন গোড়াতে একটি কথা তোমাদের দুজনকেই ব'লে সতর্ক ক'রে দিচ্ছি—আজ যা দেখবে, খবরদার কাউকে এ সম্বন্ধে একটি কথাও তোমরা বলবে না, অন্তত; আমার অনুমতি পাবার আগে।

কাকীমা বললেন, কবে বলেছি ?

কাকাবাবু বললেন, জানি। তবু আর একবার সতর্ক ক'রে দিলাম। আর একটি কথা, যা দেখবে সেটা যতই আশ্চর্য্য মনে হোক কোন রকম কথা বলবে না, শব্দ করবে না, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে না বা মনে মনেও আমাকে ডাকাডাকি করবে না, মানে কোন রকমেই আমাকে ডিস্টার্ব করবে না।

আমরা ভয়ে ভয়ে বললাম, আচ্ছা।

কাকাবাবু বললেন, বেশ, তাহ'লে এবারে ঠিক হয়ে বোসো। তোমাদের কিছু করতে হবে না, খালি মনকে যতদূর পার নিশ্চিন্ত ক'রে, যা ঘটে দেখে যাও।

আমরা বসে চেয়ে রইলাম। কাকাবাবু দুটি হাত টেবিলের ওপরে রেখে বসলেন। ঘর সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ,

আমরা দু'জন চেপে চেপে নিশ্বাস ফেলছি। খালি ঘরটায় ঘড়িটার শব্দ শোনা যাচ্ছে, টক্ টক্ টক্ টক্। কাকাবাবু একটু ভ্রুকুটি করলেন, বললেন, ঘড়িটাকে থামিয়ে দাও।

আমি উঠে গিয়ে পেণ্ডুলামটাকে থামিয়ে দিয়ে আবার এসে বসলাম। ঘরে আর কোন শব্দ নেই। কাকাবাবু আস্তে আস্তে বললেন, এইবার তোমরা আমার এই আঙুলটাকে লক্ষ্য ক'রে দেখ।

ডান হাতের তর্জনীটিকে তিনি উঁচু ক'রে ধরলেন, একাগ্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে—ব'সে রইলেন। আঙুলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একবার চুরি করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, সে মুখের ভাব এমন হ'য়ে গেছে যেন ইহজগতের সঙ্গে আর তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। তাকাতে না তাকাতেই মনে হ'ল তাঁর ঐ একটুখানি কুঁচকে উঠেছে, যেন আমার তাকানোটা টের পাচ্ছেন তিনি। আবার তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে আঙুলের দিকে তাকালাম। আড়চোখে কাকাবাবুর দিকে একবার চেয়ে দেখলাম, তিনিও আঙুলের দিকে চেয়ে আছেন একেবারে অন্যমনস্ক হ'য়ে।

কতক্ষণ কাটল বলতে পারব না, পাঁচ মিনিট হ'তে পারে, আধঘণ্টাও হ'তে পারে। তারপর হঠাৎ আঙুলটা নড়ে উঠল। নড়ে ঠিক নয়, ধীরে ধীরে দুলে উঠল। দুলতে দুলতে তার ডগাটা ক্রমেই যেন ঝোঁয়াটে, অচ্ছ হয়ে উঠল। তারপর একেবারেই মিলিয়ে গেল। হাসবেন না আপনারা, বিশ্বাস হবার কথা নয় জানি, আমারও হঠাৎ বিশ্বাস হয় নি, তবু এ আমার চোখে দেখা, সে-দৃশ্য আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। একবার মনে হ'ল চোখের ভুল, একদৃষ্টে চেয়ে থেকে থেকে চোখে ধাঁধা লেগে গেছে। হাত তুলে চোখটা মুছে নেব ভাবলাম, হাত নাড়তেও সাহস হল না। খুব ক'রে চোখ পাঁচবার নিয়ে আবার তাকালাম সত্যিই আঙুল নেই—ওপরকার দুটি গাঁট একেবারে হাওয়া হ'য়ে গেছে, নিচেকার গাঁটটি শুধু উঁচু হ'য়ে আছে। কাকাবাবুর দিকে তাকালাম, কাকাবাবু একেবারে তন্ময়। আবার আঙুলের দিকে তাকিয়ে থাকলুম। একটু পরেই আবার একটি আবছা ধোঁয়া হাতের ওপরে এসে জমে গেল, তা থেকে ক্রমে সেই ফুলো আঙুলের ডগা, তারপরই আঙুলের স্বাভাবিক চেহারা আবার দেখতে পেলাম।

তখনও আমরা দু'জন আড়ষ্ট হ'য়ে আছি, কথা বলতে সাহস হচ্ছে না। কাকাবাবুই প্রথম কথা বললেন, জানলা খুলে দাও।

আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে জানলা দরজা সব খুলে দিলাম; বাইরে থেকে ঠাণ্ডা হাওয়ার স্রোত ঘরের মধ্যে চ'লে এল। কাকীমা শুধু নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, বাবাঃ! কাকাবাবুর দিকে চেয়ে দেখলাম, তাঁর কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। কোঁচার খুঁটে কপাল মুখ মুছে ফেলে, একটু অপ্রস্তুতের মত হেসে বললেন, হজ্জ ষ্ট্রেন হয়, বলুন কিনা।

উঠে গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়ালেন খানিকক্ষণ। তারপর আবার এসে চেয়ারে বসলেন। আমিও বসলাম। বসে বললাম, কাকাবাবু, একটি প্রশ্ন করব। এই যা দেখালেন, এ কি হিপনোটিজম্?

কাকাবাবু বললেন, না,, হিপনোটাইজ আমি তোমাদের করিনি। যা দেখেছ সত্যিই দেখেছ।

আমি বললাম, তার মানে? সত্যিই কি আপনার আঙুলটা—

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ। চুপ করে শোনো, সবই বলছি।

তোমার সঙ্গেই সেই একদিন আলাপ হয়েছিল, যাদুকরদের রূপ বদলানো নিয়ে, মনে আছে?

আমি বললাম, মনে পড়ল। নইলে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।

কাকাবাবু বললেন, আমি কিন্তু ভুলিনি। নতুন একটা সত্যের আভাস সেদিন কথা বলতে বলতে নিজের মনেই হঠাৎ জেগে উঠেছিল, কি করে তা জানি না। একেই বোধ হয় দৈব-প্রেরণা বলে। যাইহোক, একবার যখন তার আভাস পেলাম, তাকে আরও একটু খুঁজে দেখবার ইচ্ছে স্বভাবতই হ'ল। তোমার কাকীমা প্রথমে আপত্তি তুলেছিলেন, পরে তিনিও মত দিলেন, স্বেচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, কি বল?

কাকীমা চুপ করে ব'সে ছিলেন, মৃদুস্বরে বললেন, অনিচ্ছায় দিলে কি তাকে মত দেওয়া বলে?

কাকাবাবু জবাব না দিয়ে ব'লে চললেন: পুঁথিপত্র অনেক ঘাঁটলাম। প্রাচীন ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞানেরখনি সংস্কৃত সাহিত্য, তাও দেখলাম। কিন্তুতেই স্পষ্ট কিছু কোথাও পাই না! সেদিন বলেছি, আজও বলছি—এই বিদ্যা সকলের জন্যে নয়, কারণ এর যে অধিকারী সে অসাধ্য সাধন করতে পারে, মানব সমাজের অপরিসীম মঙ্গল বা অমঙ্গল দুটোই ঘটাবার শক্তি রাখে। এই জন্যেই হয়তো প্রাচীনকালের লোকেরা এর কায়দা-কানুন পুঁথিতে লিখে রেখে যান নি, গোপ্য বিদ্যা-পরম্পরায় এক মাত্র অতি সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। অথবা এও হ'তে পারে। পুঁথিতে কেউ কখনো লিখেছেন আবার বিরোধী পক্ষের হাতে প'ড়ে যে পুঁথিপত্র নষ্ট হ'য়ে গেছে। এর খুব বেশী চর্চা করেছিলেন বৌদ্ধ যতিরা; এর নাম ছিল অভিচার। ব্রাহ্মণ বা হিন্দুধর্ম যখন আবার প্রবল হ'য়ে উঠল, বৌদ্ধরা দেশে লুপ্ত হ'য়ে গেল, হিন্দুরা তাদের নানা বিদ্যের সঙ্গে একেও নষ্ট করে দিলে। এই অমঙ্গলের ফল বৌদ্ধদের তারা ভয় করত, কাজেই এর জড় রাখতে তারা চায় নি।

যাক সে কথা। পুঁথিপত্রে এর আভাস ইঙ্গিত পেলাম, কিন্তু আসল কথা কোথাও পাইনে। তখন অকূলপাথারে দেখব ঘুরে মানুষের মধ্যে যদি পাই। মানুষের মধ্যে খুঁজতে হ'লে খুঁজতে হবে সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে তাদের যা দেখি বেশীর ভাগই বুরুক। তবু চাষ যখন করতেই হয় তখন উড়িয়ে দেখা ছাড়া উপায় নেই। এরই মধ্যে হঠাৎ হরিদ্বারে কুম্ভমেলা পড়ল, গেলাম। কুম্ভমেলার কথা বোধ হয় জান, ভারতবর্ষের সমস্ত সম্প্রদায়ের সাধু সন্ন্যাসীরা এতে আসেন। বিশেষ করে হরিদ্বারে মেলা পড়লে কারণ হরিদ্বারে হিমালয় অঞ্চলের সাধুরাও আসেন। এলাহাবাদে বা পুরে আর কোথাও হলে এঁরা বড় একটা নামতে চান না। অথচ আমাদের দেশের লোকের বিশ্বাস, সত্যকার সাধনা এখনও যে দু'চারজন সাধুর মধ্যে বেঁচে আছে তাঁরা হিমালয়ে বাস করেন।

মেলায় মধ্যে ঘুরি আর সবাইকে লক্ষ্য করি, কারও মধ্যে সেই জিনিসের সন্ধান মেলে কিনা। অনেক খুঁজে খুঁজে প্রায় যখন হাল ছেড়েছি তখন হঠাৎ একদিন একটি সাধুর সঙ্গে আলাপ হ'য়ে গেল। এটুকু বুঝলাম, তিনি বিদ্যে জানুন না-জানুন অন্তত তার নামটা জানেন। তখন আর ছাড়া নয়। অনেক চেষ্টায় তাঁকে বিশ্বাস করালাম, আমি সত্যি করে মানুষের হিতার্থেই এই বিদ্যের সম্বন্ধে জানতে চাই।

কাকীমা বললেন, সাধুবাবা?

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ। তাঁর সঙ্গে আমার দেবের দিকে কি কথাবার্তা হ'ল তা আমি তোমাকেও সব বলিনি, বললে তুমি ভয় পেতে। সাধুবাবা যখন বিশ্বাস করলেন আমার সত্যিই কোন রকম দুষ্ট অভিপ্রায় নেই, তখন বললেন, তুমি সত্যি ক'রে দেখতে চাও? তাহ'লে তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

বললাম, কোথায়?

সাধুবাবা বললেন, অনেক দূরে। হিমালয়ের অভ্যন্তরে। সেখানে আমার গুরু মহারাজ আছেন, তিনি দেখাবেন তোমাকে।

আমি বললাম, আপনিই দেখান না।

তিনি বললেন, বাপরে, আমি জানি নাকি। যে বিভূতি যার থাকে সে কি আর এই মেলার হট্টগোলে ভিড় ঝাপ্‌তে আসে?

আমার তখন রোখ চেপেছে। তোমার কাকীমাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলাম। দিয়ে সাধুর সঙ্গে চললাম। দুর্গম পথ, কোন্‌দিকে কতদূরে তা কিছু বলব না। সাধুর গুরুর সঙ্গে দেখা হল; আর কি কি দেখলাম তারও ডিটেল্‌স্ বলব না। মোটের ওপর এটা বুঝে এলাম, সত্যি করে এ-বিদ্যা এখনও লোপ পেয়ে যায় নি। কি করে একে আয়ত্ত করা যায় তার প্রথম পাঠটিও তাঁর কাছেই নিয়েই এলাম। তিনি অবশ্য বলেছিলেন, শিখতে যদি চাস এইখানে থেকে শিখে যা। এ বড় কঠিন জিনিস। গুরু ছাড়া হয় না। কিন্তু আমার থাকবার উপায় ছিল না। তা ছাড়া ওসব বুজরুকির কথা সবাই বলে। কিছুটা সাধুকে জানিয়ে কিছুটা না জানিয়ে ট্রিকটি বদল যদি হ'ল বলতে পেরেছি, একদিন বিদ্যা নিয়ে চলে এলাম। এসে অবধি কথাটা আয়ত্ত করবার চেষ্টায় লেগে আছি, কিছু কিছু হয়েও এসেছে, তার প্রমাণ তোমরা আজ দেখলে! ছাতের ঘর হচ্ছে আমার এই সাধনার স্থান। সেইজন্যেই ওখানে বহন থাকি তাকতে বারণ আছে। এবার বুঝলে?

শুনতে শুনতে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। বললাম, বুঝলাম। জানতাম না ব'লেই সেদিন হঠাৎ মন খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে বসে কি করেন আপনি? প্রাণায়াম?

কাকাবাবু হেসে বললেন, যা বল। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর কথা নয়। এবার সভা ভঙ্গ। আর মনে থাকে যেন, পবনদার কাউকে একবর্ণও জানাবে না। নিজেরাও অনাবশ্যক গল্পগুজব আলোচনা কোরো না এ নিয়ে।

কাকাবাবু আবার ওপরে ম্যাগাজিনটায় চ'লে গেলেন। কাকীমা বললেন, তোমার খাবার কি ওপরে দিয়ে আসব? কাকাবাবু বললেন, তাই দিও, মিনিট পনরো পরে।

খাবার দিয়ে এসে কাকীমা আমার সঙ্গে গল্প করতে বসলেন। একথা সেকথা আজেবাজে গল্পগুজব, কিন্তু তার মধ্যেও মনে হ'ল কাকীমার মুখ কেমন ভ্যাকাশে হ'য়ে আছে, অনেক তলায় একটা বিষণ্ণতা কিছুতেই কেটে যাচ্ছে না। বললাম, কাকীমা, আপনার কি অসুখ করেছে আজ?

কাকীমা বললেন, না তো! তারপরই বললেন, কি জানি, আমার কেমন ভাল লাগছে না।

বললাম, কেন?

কাকীমা বললেন, তা জানিনে। খালি মনে হচ্ছে—ব'লে হঠাৎ থেমে গেলেন। জোর ক'রেই একটু হেসে বললেন, মানে মেয়ে মানুষের মন, ভয়ে ভয়েই যেন সারাক্ষণ।

আমি বললাম, বেশ তো, ভালই যদি না লাগে, বারণ ক'রে দিন না।

কাকীমা বললেন, না। বারণ করব না সে তো অনেক দিনই ব'লে দিয়েছি। দেশের একটা লুপ্ত বিদ্যা, একটা অতীত গৌরব। যদি উদ্ধার করতে পারে, আমি বাধা দেব কেন।

আমি বললাম, তবে যে বললেন আপনার মনে কিসের আশঙ্কা হচ্ছে ?

কাকীমা বললেন, ও কিছু নয়। বাতিক, হয়তো কাল ভাল ঘুম হয়নি ব'লে তাই।

কাকীমা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, আমিও বুঝে চ'লে এলাম সেদিন কি ঘুণাক্ষরেও ভেবেছিলাম, সেটা বাতিক নয়। ভেবেদের ইন্টুইশন বাকে বলে তাই, ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের আভাস সত্যিই সেদিন তিনি মনে মনে টের পেয়েছিলেন।

এর পর অনেকদিন ধ'রে তিনজনে মিলে এই সাধনা চলল। মাঝে মাঝে আমাদের বৈঠক বসত। কাকাবাবু নতুন কি শক্তি অর্জ্জন করলেন তার নমুনা দেখাতেন। উন্নতিও তাঁর অত্যন্ত দ্রুত হ'তে লাগল। না হ'তে পারে না—একে তাঁর সেই অসাধারণ প্রতিভা আর নিষ্ঠা। অন্যদিকে আমাদের দুজনের সত্যকার সহানুভূতি। বিশেষ করে কাকীমার একটুখানি নতুন শক্তির প্রমাণ পেলেই তিনি এমনই উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতেন যেন কতবড় একটা রাজ্য জয় করা হ'য়ে গেল। কাকীমার সে-ধরণের খুশী কাকাবাবুও অনুভব করতেন, কাকীমার আনন্দ দেখে তাঁরও মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত ; আবার তিনি হঠাৎ কোন কারণে মুষড়ে পড়লে কাকীমাই উৎসাহ দিয়ে তাঁকে চাঙা করে তুলতেন। দেখতাম আর ভাবতাম, কাকাবাবুই ভাগ্যবান লোক। এমন যার সহধর্ম্মিণী তাঁর ভয় হবে না তো হবে কার।

তারপর নতুন নতুন রকম এক্সপেরিমেন্ট সুরু হল। প্রথমে কাকাবাবু নিজের কোন অঙ্গ নিয়েই পরীক্ষা করতেন, প্রথম দিনের মত—একটা আঙুল বা একটা হাত অদৃশ্য হয়ে আবার ফিরে এল। প্রথম দিন অনেক সময় লেগেছিল, তিনিও ক্লান্ত হয়েছিলেন। ক্রমেই কম সময় লাগতে লাগল, তাঁর সে ক্লান্তিও কম হ'তে লাগল—ফেরে এমন হল যে হাতটা অদৃশ্য হয়ে আবার ফিরে আসতে সময়ই লাগে না। পরিবর্ত্তন প্রায় চোখেও ধরা পড়ে না। তারপর তার চেহারা বদলে দেওয়া হ'তে লাগল, হয়তো তর্জ্জনীটা উড়ে গিয়ে সেখানে একটা অনামিকা দেখা দিল, আবার সেটা বদলে তর্জ্জনী হ'ল। নিজের নাকটাকে একদিন বদলে খাবড়া বোঁচা নাক বানালেন, কাকীমা চোখ পাকিয়ে বললেন, খবরদার। আবার নিজের নাক ফিরিয়ে আনলেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে এসে অন্য কথাবার্তা হাসি তামাসাও এল, কাজের শ্রম সহজ হ'য়ে এসেছে তার প্রমাণ।

নিজের দেহ ছেড়ে তারপর বাইরের জিনিসে শক্তি সঞ্চালন শুরু করলেন। একটা গ্লাসে জল রেখে গ্লাসটাকে হাতে ধ'রে বললেন, ক্রমে গ্লাসের জল বোঁয়া হ'য়ে উবে গেল, আবার বোঁয়া হ'য়ে ফিরে এল। কাদির বোতলটাকে হাতে তুলে নিলেন, কালিটা উবে গেল, যখন ফিরে এল তখন বোতলে শুধু জল, আর ব্লটিং-প্যাডের ওপরে কতগুলো কালির গুঁড়ো। একটা গ্লাসে জল একটা গ্লাসে চিনি রেখে দু'হাতে দু'টোকে ছুঁয়ে বললেন, দুটোই উড়ে গিয়ে ফিরে এল, একগ্লাস চিনির পানা। তারপর আমাদের ওপর পরীক্ষা শুরু হ'ল। আমার হাত ধ'রে একদিন আমার একটা আঙুল উড়িয়ে দিলেন, আবার ফিরিয়ে আনলেন, বললেন, কি মনে হ'ল ?

বললাম, মনে হ'ল যেন, হাতটা ঝিরঝির ঝিরঝির করে অবশ হ'য়ে যাচ্ছে, কি কি ধরার মত।

কাকাবাবু বললেন, বল ইলেকট্রীক চার্জের মত।

বললাম, হ্যাঁ, তাও বলা যায়।

কাকাবাবু বললেন, বলা যায় না, তাই বলাই উচিত এক, এটা ইলেকট্রিক এনার্জিরই কাছাকাছি জিনিস।

আমি অবাক হ'য়ে বললাম, মানুষের গায়ে ?

কাকাবাবু বললেন, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে। বাঘ মাছ ইলেকট্রিক-শক্ দিতে পারে জানিস্ নে ?

আর একদিন কাকীমার কানটাকে উল্টিয়ে দিলেন, তার জায়গাতে ফিরে এল একটা মস্ত বড় বেগুনীর মত কাণ, ঝালরে, বিরাট ছাতাওয়ালা। কাকীমা তো কাঁদবার উপক্রম। তারপর আবার কাণ ঠিক করে দিলেন, শাসিয়ে বললেন, এখন থেকে সাবধান থাকবে, ঝগড়া-টগড়া করেছ কি, কাণ বদলে পাখার কাণ বসিয়ে দেব, বা নাক বদলে হাতীর শুঁড়।

কাকীমা ঠোঁট ফুলিয়ে বললেন, আমি ঝগড়া করি ?

কাকাবাবু বললেন, না কর, করতে তো পার। তাই আগে থাকতে সাবধান ক'রে রাখলাম।

আপনাদের চলতে এক্সপেরিমেণ্টের এত সব ডিটেল শুনতে ভাল লাগছে না। কিন্তু আমরা তখন এমন তন্ময় হয়েই এক দেখতাম, যে এর অতি ক্ষুদ্র একটু অংশকেও অনাবশ্যক বলে বাদ দেবার ক্ষমতা আমাদের ছিল না, আজও নেই।

ক্ষণী কহিল, না না, বাদ দিতে হবে না, সমস্তটাই বলে যান।

গোপেনবাবু কহিলেন, হ্যাঁ, বাদসাদ যা দেবার সে ওরা নিয়েই বিশ্বাস করবে'খন, তুমি সেজন্যে ভেবো না, বলে যাও।

প্রভাতদা কহিলেন, না করলে বিশ্বাস তো করেই গেল। আমরা নিজের চোখে দেখছিলাম, আমরা দু'জনে বিশ্বাস করছিলাম।

নিতাইবাবু কহিলেন, কি বিপদ। গোপেনবাবু, আপনার পিসীমা বলে থাকবেন না কি যেন বললেন তখন ?

গোপেনবাবু কহিলেন, হুঁ, পিসীমা বহুকাল মারা গেছেন, তাই তো বললাম।

নিতাইবাবু কাতর মুখভঙ্গি করিলেন।

অমল কহিল, নাঃ, পারা গেল না। বলুন প্রভাতদা।

প্রভাতদা কহিলেন, বলি। এর পরে এল আসল জিনিসের পরীক্ষা। রূপ পরিবর্তনের। কাকাবাবুর একাগ্র সাধনায় তখন সমস্তই সহজ হ'য়ে এসেছে, এটাও অনায়াসেই আয়ত্ত ক'রে ফেললেন। প্রথম দিন নিজের হাতটাকে বদলে একটা বাঘের থাবা বানালেন। তার পরদিন নিজের মুখটাকে বদলে বানালেন তাঁর বুড়ো দাদামশায়ের মুখ। এর পরে অঙ্গের রূপ পরিবর্তন করা শুরু হ'ল। কাকীমার সোধা বেঁড়ালটাকে একদিন বদলে সাদা খরগোস বানিয়ে দিলেন, সেটা ঘরময় লাফিয়ে বেড়াতে লাগল। কাকীমা বললেন, নাঃ, তাতি চমৎকার হ'য়েছে, ওটা এই রকমই থাক।

বলতে বলতে অদ্ভুত কাণ্ড। সে-খরগোস হঠাৎ এক লাফে ঘরের বাইরে চলে গেল, মিনিট দুই পরে আবার

দিয়ে এল, তার মুখে এক নোটি ইঁদুর। কাকীমা চেঁচিয়ে বললেন, ছ্যাদ্ ছ্যাদ্, কী নোংরা রে তুই, খরগোসে কখনও ইঁদুর খায়?

কাকাবাবু বললেন; ও তো খরগোস নয়। ওর দেহটাই বদলেছে মন প্রকৃতি সমস্ত বেড়ালেরই হয়ে গেছে। ওর ওকে, আবার বেড়াল বানিয়ে দিই।

কাকীমা বললেন, কেন, থাক না যেমন আছে।

কাকাবাবু বললেন, তা হয় না, মন বদলানো এত সহজ নয়। খরগোসের দেহ নিয়ে ও বাঁচবে না। ইঁদুর সাপ বেড়ালের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে মারা পড়বে। আবার তাকে বেড়াল বানিয়ে দিলেন। অমল একগ্লাস জল মেরে আমাকে?

কী কঠিন জল এই তো, দিয়েই মেরেছি।

জল খাইয়া প্রভাতদা একটুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে কহিলেন, এমনি করে আমাদের খেলা এগিয়ে চলল। কাকাবাবুর যোগসাধনের সময় দিনের পর দিন বেড়ে চলল, আমাদের বৈঠকও প্রায় রোজই বসতে লাগল। সমস্ত ব্যাপারটা যেন একটা নেশার মত পেয়ে বসল আমাদের। আমি তো সারাদিনই পড়ে থাকতাম, কাকাবাবুও ফাঁক পেলেই ছাতের ঘরে গিয়ে ঢুকতেন। এমন সাধের ল্যাবোরেটরি তাঁর, তারও দিকে নজর রহিল না, এক-একদিন এমনও হ'তে লাগল, যে এক নাগাদ হয়তো দশ পনেরো দিন ল্যাবোরেটরিতে গেলেনই না। কলেজের ক্লাসও মাঝেমাঝে কামাই যেতে লাগল।

সাধনায় কিন্তু কাকাবাবুর খুবই চটপট উন্নতি হচ্ছিল। আমি একদিন পেন্সিল কাটতে হাত কেটে ফেলাম। আঙুলে পটি জড়িয়ে গেছি, কাকাবাবু বললেন, হাতে কি হ'ল?

বললাম, কেটে গেছে।

বললেন, দেখি, ধোল।

আঙুলটাকে চোখের নিমিষে উড়িয়ে দিলেন, আবার তক্ষুনি সেটা ফিরে এল, বেমালুম আস্ত আঙুল। এরই দিন দুই পরে একদিন মাছ কুটতে কাকীমার হাতে কাঁটা বিঁধে গেল। দারুণ যন্ত্রণা। কাকাবাবু বাড়ি ছিলেন না। ফিরে এসে শুনলেন। বললেন, কাঁটা বেরিয়ে গেছে?

কাকীমা বললেন, না, ভেঙে থেকে গেল খানিকটা। দেখ তো, কেটে বার করতে হবে বোধ হয়।

কাকাবাবু তাঁর হাতটা নেড়ে চেড়ে দেখলেন, তারপর সেই অবস্থাতেই হঠাৎ হাতটাকে উল্টিয়ে দিলেন, ফিরে এল আস্ত হাত, ব্যথা নেই বা নেই কিছু নেই, ভাঙা মাছের কাঁটাটা টুক্ করে টেবিলের ওপরে পড়ল। কাকাবাবু বললেন, কেমন ম্যাজিক! থাক, ডাক্তার নাহ আছে, বুড়ো বয়সের একটা হিল্লে হল, এখন চাকরি যদি যায়ও চালিয়ে খেতে পারব।

কাকীমার চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল, বললেন, আচ্ছা, এ দিয়ে তো মানুষের অনেক রোগ-ব্যাধি সারিয়ে দিতে পার তুমি?

কাকাবাবু তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, ধীরে ধীরে বললেন, হয়তো পারব একদিন।

কাকীমা ছোট খুকীর মত আবদেরে সুরে বললেন, একদিন কেন এখনই পার না?

কাকাবাবু বললেন, না, আমার শক্তি এখনও বেশি নয়। ব্যবহার করলেই এ-শক্তি কমে যায়, ব্যাটারির মতন। আরও অনেক শক্তি সঞ্চয় করে নিতে হবে। তার পরে।

কাকীমা খুব খুশি হ'য়ে বললেন, আচ্ছা, সে আর কদিনই বা লাগবে!

কাকাবাবু অনেকক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন, তাঁর একটি হাত ধীরে ধীরে নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন,-তাহ'লে এখন তো আর তোমার এতে কোন ভয় বা আপত্তি থাকবে না, কি বল?

—তখন কি অনন্তায! বলতে বলতে কাকীমা হঠাৎ নুয়ে প'ড়ে কাকাবাবুর পায়ের ধুলো নিলেন। কাকাবাবু বললেন, আহাহা কি করছ, প্রভাত ছেলেমানুষ দেখে ফেলবে। কাকীমার মুখ তৎক্ষণে লাল টকটকে হ'য়ে উঠেছে। আমি যেন কিছু দেখতে পাইনি এমনি করে বেরিয়ে এলাম

কাকীমার কিন্তু তর সইল না। এর দিন সাতেক পরেই এক ভিখারী বুড়ীকে কাকাবাবুর কাছে এনে হাজির করে দিলেন, বললেন, আরাম করে দাও। থুত্থুড়ে বুড়ী, চোখে ভাল দেখতে পায় না, একটা পা ফুলে ঢোল হ'য়ে আছে, পায়ের পাতা থেকে হাঁটু অবধি মস্ত বড় নালী-ঘা, পচে আর মাছির ভনভনানিতে কাছে যাওয়া যায়। লাঠি দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ভিক্ষে চাইতে এসেছিল, কাকীমা তাকে বসিয়ে রেখেছেন।

বুড়ীকে বললাম পায়ে কি করে চোট লাগল?

বুড়ী বললে, কেটে গিয়েছিল বাবা। বুড়ো মানুষ চোখে ঠাওর পাই নি, হোঁচট খেয়ে প'ড়ে গিয়েছিলাম! পা কেটে এই এত বড় গর্ত। এখন সে ঘাও আর শুকোচ্ছে না, পাও নাড়তে পারছি না—কাছে গেলে লোকজন নাকে কাপড় দেয় দূর ছেই করে।

কাকীমার চোখে জল এল, বললেন ডাক্তারকে দেখাও নি?

বুড়ী বললে, খেতে পাই নে মা, পয়সা কোথায় পাব। তবু দেখিয়েছিলাম সরকারি ডাক্তারখানায়, বললে এ আর সারবে না রে বুড়ী—অনেক টাকার নাকি ওষুধ লাগে।

কাকীমা আর কথা বললেন না, খালি চোখ তুলে কাকাবাবুর দিকে চাইলেন। কাকাবাবু বললেন, দিচ্ছি। গরম জল দাও খানিকটা, মাটির গামলা করে।

কাকীমা তাড়াতাড়ি জল এনে দিলেন। কাকাবাবু বুড়ীকে একটা মোড়া পেতে বসালেন, পায়ের নীচে গামলাটা বসিয়ে দিয়ে বললেন, চোখ বোজ।

বুড়ী বললে, বাবা, লাগবে না তো? বড্ড কিন্তু বাবা।

কাকীমা বললেন, না না, লাগবে না। ব'লে নিজেই পেছন থেকে বুড়ীর মাথাটাকে বুকে চেপে নিয়ে দুহাত দিয়ে তার চোখ আড়াল করে দিলেন।

কাকাবাবু নুয়ে বসে তার পা'টাকে দেখলেন, তারপর আলগোছে হাঁটুর নীচেটা ছুঁয়ে, পাখানা শুদ্ধ উঁচিয়ে দিলেন। একটু পরেই পা ফিরে এল, আস্ত দুই পা। গামলায় জলটা দেখলাম পুঁজে মক্কে লাল হয়ে গেছে।

কাকাবাবু বললেন, ফিনিশ্‌ড্‌। গামলাটাকে ফিনাইল ঢেলে, ধুয়ে ফেলে দিতে হবে।

আমি বললাম, উঁহু, একটা ড্রেসিং দিয়ে দিন, নইলে গন্ধ রটাবে।

কাকাবাবু বললেন, ঠিক বলেছ। যাও তো গো, একটা ড্রেসিং দিয়ে যাও।

কাকীমা বললেন, কি দিয়ে দেব? কিছু তো নেই।

কাকাবাবু বললেন, আঃ যা হোক তাই দিয়েই যাও।

কাকীমা তখন বুকলেন, নারকেল তেলের শিশি এনে পা-ঘষা তাই তেল, ন্যাকড়া জড়িয়ে বেশ করে বেঁধে দিলেন। বললেন, তিনদিন খুলবে না। ভয় নেই, পা ঠিক হ'য়ে গেছে।

বুড়ী চোখ মেলে বললে, কই, ওষুধ তো পেলাম না?

কাকাবাবু বললেন, মন খারাপ লাগছে তার জন্যে?

বুড়ী লাঠি নিয়ে, ভয়ে ভয়ে পা ফেলে ফেলে চ'লে গেল। তিনদিন পরে চার দিনের দিন এসে হোরগোড়ায় একেবারে মহা হৈ হৈ জুড়ে দিলে—ও মাগো, মা কালী তোমাদের ভাল করুন গো, মা লক্ষ্মী বানিয়ে দিন তোমাকে।

কাকীমা কিকে দিয়ে মস্তবড় একবাটি চাল পাঠিয়ে দিলেন তাকে, তারপর গিয়ে ঘরের জানালা ধরে বাইরে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, দেখলাম তাঁর দুই চোখ বেয়ে জল পড়ছে।

কাকাবাবুর কাজ তখন অত্যন্ত সহজে চ'লে যাচ্ছে। এমন কি না-চুঁয়েও জিনিসপত্রের চেহারা বদলে যেন। একদিন কাকীমাকে বললেন, এইবার একটা যাদুধও বানাতে হবে। ধও দিয়ে এমনি চালান করতে পারলেই আর কি বাস, ম্যাজিসিয়ান হ'য়ে গেলাম।

কাকীমা বললেন, ম্যাজিসিয়ান বোলো না তো, বিশ্রী লাগে শুনতে।

কাকাবাবু বললেন, বেশ তো, কি বলব তাহ'লে ব'লে দাও, সিদ্ধপুরুষ?

কাকীমা বললেন, নয় তো কি! তারপর বললেন, সত্যি তুমি প্র্যাকটিস করে নাও, আমি একটা সোনার যাদুধও বানিয়ে দেব তোমাকে।

কথাটা মনে এল কিন্তু মুখে বললাম না—কাকীমা, সোনার যাদুধও তো আপনিই রয়েছেন, আকবার মড়া-সোনার কি দাম এর চেয়েও বেশী হবে!

প্রভাতদা থামলেন, হঠাৎ কেমন অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন, তারপর ধীরে ধীরে কহিলেন, হাসি আনন্দের মধ্যে দিয়ে আমাদের খেলা চলছিল, জানিও না কি ভয়ানক সর্বনাশ ঘনিয়ে আসছে। আগুন নিয়ে খেলছি সেটা টের পেলাম যখন আগুন একেবারে ঘরের মটকা ধরে ফেলেছে। এমনি বোধহয় হয়, ঈশ্বরের বিধানকে গায়ের জোরে ডিঙিয়ে চলতে গেলে তিনি এমনি ক'রেই তাঁর বজ্রকে পাঠিয়ে দেন, অলক্ষিতে। সবচেয়ে বড় জ্বালা হ'ল এই, একদিন হঠাৎ তোমাদের উপলক্ষ্য ক'রে এর সূত্রপাত হ'য়েছিল; তেমনি আরেকদিন আমার সেই তাকে উপলক্ষ্য করেই এর পাল্টা আঘাতও এসে হাজির হ'ল।

ক'দিন ধ'রে কাকাবাবুর শরীরটা বিশেষ ভাল যাচ্ছিল না। অসুখ কিছু নয়। তবু ভেতরে ভেতরে কেমন ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন মনে হচ্ছিল। আমাদের খেলার, বৈঠক ক'দিন বসে নি; ক্লান্ত শরীরে

ও করে আরও অবশ হয়ে পড়লেন বা'লে কাকীমাই ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। কলেজেও ঠিকমত যাওয়া হচ্ছিল না, কাকাবাবু সারাদিনই ছাতের ঘরে কাটাচ্ছিলেন। কাকীমা বোঝাচ্ছিলেন, বলছিলেন, একবার যাও কদিন ঘুরে এস, তা শুনছিলেন না।

এরই মধ্যে আবার কলেজেও কি গোলমাল হ'ল। নিয়মিত ক্লাশ হচ্ছিল না বলে ছেলেরা নাকি নালিশ করেছে; সেই খবর পেয়ে সেদিন কলেজে গিয়েছিলেন। সেখানে কি হয়েছিল জানি নে, তবে ফিরে এলেন যখন মুখ অত্যন্ত শুকনো, মনে হল কোথাও খুব বড় একটা আঘাত পেয়েছেন। হয়তো ছেলেরাই মুখের ওপর কোন অশিষ্টতা করে থাকবে—কি হয়েছে কাউকে বললেন না, কাকীমাকেও না, নিঃশব্দে ঘরে ইজি-চেয়ারে শুয়ে প'ড়ে রইলেন সমস্ত বিকেল বেলাটা।

সারাদিন অসহ্য গরম পড়েছে, সন্ধ্যার মুখে তাঁকে আমরা টেনে নিয়ে ছাতে গেলাম। ছাতের একদিকে মাদুর বিছিয়ে আমরা বসেছি, ওদিকে আর একটা মাদুর পেতে ভোম্বল পড়া করছে। পড়া তো ছাই, গলা ফাটিয়ে চীৎকারের মতো। আমরা প্রায় কেউ কথাই বলছিলাম না, কাকাবাবু চুপ ক'রে শুয়ে ছিলেন, কাকীমা ধীরে ধীরে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। ভোম্বলের চীৎকারটা সবারই কানে বড় বাজছিল।

কাকীমা বললেন, ভোম্বল, নীচে যাও, ঘরে গিয়ে বসে পড়া কর।

কাকাবাবু বললেন, থাক।

আমি বললাম, থাক না আপনার অসুবিধে হ'চ্ছে।

কাকাবাবু বললেন, না না, ঘরে গরম।

আবার তেমনি করে শুয়ে রইলেন। ভোম্বল কি একটা কথা উচ্চারণ ক'রে পড়ছিল। দু'বার তিনবার শুনে কাকাবাবু বললেন, ওকে বলে দাও তো ঠিক করে পড়ুক।

আমি উঠে গিয়ে ব'লে দিয়ে এলাম। ভোম্বল একবার ঠিক পড়ল, তারপরই আগের মত ভুল পড়তে লাগল। কাকাবাবু ক্লান্তস্বরে ডেকে বললেন, ওরে ওটা হচ্ছে না।

ভোম্বল একবার তাকিয়ে দেখলে; আবার যেমন পড়ছিল তেমনি ভুল পড়ে যেতে লাগল। কাকাবাবু হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বসলেন, গর্জন করে বললেন, এই ছেলে, ব'লে দিলাম পড়া ঠিক হচ্ছে না, তবু গ্রাহ্য হল না?

কাকীমা দু'হাত দিয়ে তাঁকে আগলে বললেন, থাক থাক, ও পড়ুক না ওর যা খুশী। তুমি শোও তো।

কাকাবাবু শুনলেন না, এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালেন। সোজা ভোম্বলের কাছে গিয়ে বাঁ-হাতে তার কান চেপে ধ'রলেন। ডান হাতে চড় উঁচিয়ে বললেন। গাধা কোথাকার, এক থাপ্পড়ে তোমার, বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন। আমরাও স্তব্ধ হ'য়ে গেলাম—ভোম্বলের ঘাড়ের ওপর ভোম্বলের মুখ নেই, মাথা আর মুখ সবটা মুড়ে বলে একটা গাধার মুণ্ডু হ'য়ে গেছে।

কাকাবাবু বিবর্ণ মুখে প্রায় শব্দহীন গলায় বললেন, এ কি হ'ল!

কাকীমা ছুটে গিয়ে তাঁকে পেছন থেকে ধ'রে দাঁড়ালেন।

ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই পেছনে সিঁড়ির মুখ থেকে একটা বিকট চীৎকার ফেটে উঠল, ওরে কি সর্বনাশ

হ'ল রে। ওরে আমার তোষল রে! তারপর কে একজন পেছন থেকে ছুটে এসে আমাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে ছাতের ওপর লুটিয়ে পড়ল, হাত পা ছুঁড়ে আকাশ কাটিয়ে চীৎকার করতে লাগল, ওরে আমি কি এই জন্ত এখানে এসেছিলাম রে! হায় হায় রে, আমার কি হ'ল রে!

ব্যাপার নিশ্চয়ই বুঝেছেন। তোষলের মা হঠাৎ কি কারণে ছাতে উঠে এসেছিলেন, পেছন থেকে ব্যাপারটি দেখে ফেলেছেন।

চোখের পলকে অনেক ব্যাপার ঘটে গেল। তোষলের মার চীৎকারে আশপাশের বাড়ির ছাতে লোকের ভিড় দাঁড়িয়ে গেল। কাকাবাবু হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে উঠে বিহ্বল-দৃষ্টিতে চারদিকে চাইতে লাগলেন। আমি একেবারেই কি করব না বুঝে দাঁড়িয়ে রইলাম। কাকীমাই সেখলাম মাথা ঠাণ্ডা হারিয়ে বসে আছেন, কাকাবাবুকে ধমক দিয়ে বললেন, কি দেখছ হাঁ ক'রে, ওকে নীচে নিয়ে যাও।

আমি তোষলের মার কাছে গিয়ে বললাম, শুনছেন!

কে শুনবে! তাঁর চীৎকার আরও বেড়ে গেছে, সে যন্ত্রণার মত মড়াকান্না। ওদিকে তোষলও কান্না জুড়েছে! ছুটে আসতে পারছে না, কাকীমা এক হাতে তাকে ধরে রেখেছেন। আমি আবার ডাকলাম, শুনুন, শুনছেন।

কাকীমা এবার চেঁচিয়ে উঠলেন, কি দেখছ দাঁড়িয়ে, নীচে নিয়ে যাও।

আমি বললাম, যাচ্ছেন না যে!

কাকীমা প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলেন, আঃ, তোর করে নিয়ে যাও না! মুখে চাপা দাও, এইটুকুন বুদ্ধি নেই তোমার?

তাঁর চীৎকারে আমারও যেন কাণ্ডজ্ঞান ফিরে এল। দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রে তাঁকে তুলে নীচে নিয়ে এলাম, তন্ময়িদা যাব না যাব না, ওগো কে আছ—ব'লে হাত পা ছুঁড়ে আঁচড়ে কামড়ে আমাকে একেবারে নাস্তানাবুদ করে দিলেন। আমি তাই বলে আর ছাড়লাম না তাঁকে, টেনে হিঁচড়ে একেবারে একতলায় একটা ঘরে এনে ফেলে বাইরে থেকে দোরে শেকল দিয়ে দিলাম, দিয়ে এক দৌড়ে আবার ছাতে উঠে গেলাম। তোষলার মুখে বুদ্ধি করে ছাতের সিঁড়িতে দরজা বন্ধ করে দিলাম, বাড়ির লোকজন সিঁড়ির কাছে জটলা করছিল। তাদের বললাম, ওপরে কেউ যাবে না, আর ওকে কেউ দোর খুলে দেবে না।

ছাতে তখনও তিনজনে ঠিক তেমনি ক'রেই দাঁড়িয়ে। আমি যেতেই কাকীমা বললেন, এসেছ? ধর এটাকে।

আমি তোষলকে চেপে ধ'রে রইলাম, না পালায়।

কাকীমা কাকাবাবুকে আস্তে আস্তে নাড়া দিয়ে ডাকতে লাগলেন, শুনছ গো, আমি বলছি।

কাকাবাবুর তন্দ্রা ভাঙল, বললেন, কি বলছ?

কাকীমা তোষলকে দেখিয়ে বললেন, এই-যে। তোষল। একে ঠিক করে দাও।

কাকাবাবু একটুক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর দুই হাতে তোষলের মাথাটা চেপে ধ'রে বিড়বিড় করে কি বলতে লাগলেন। মিনিট খানেক পরেই তোষলের গায়ের যন্ত্রণা চলে গিয়ে আবার তোষলের মুখ

হ'য়ে গেল। আমি একটানে তাকে দূরে ছিটিয়ে দিয়ে ছেড়ে দিলাম, সে দৌড়ে নীচে চ'লে গেল। কাকাবাবু তখন থরথর ক'রে কাঁপছেন, ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে। কাকীমাতে আমাতে ধরাধরি করে তাঁকে খাটের ওইয়ে দিলাম। শুয়ে শুয়েও অনেকক্ষণ তিনি খুব ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। কাকীমা কোন কথা বললেন না, দু'হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে তাঁর বুকে মাথা রেখে প'ড়ে রইলেন। আমি চুপ করে ব'সে রইলাম। কোথাও কোন শব্দ নেই, তবু টের পাচ্ছিলাম, কাকীমা কাঁদছেন। অনেকক্ষণ পরে কাকাবাবুর নিশ্বাসের শব্দ সহজ হ'য়ে এল। একটি হাত ধীরে ধীরে তুলে কাকীমার মুখের ওপর রাখলেন। প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বললেন, বেবু।

কাকীমা কথা বললেন না, শুধু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

আমি উঠে নীচে চ'লে এলাম; সবাইকে নীচে পাঠিয়ে দিয়ে দোতলার বারান্দায় অপেক্ষা ক'রে বসে রইলাম।

প্রায় দু'ঘণ্টা পরে ওঁরা নেমে এলেন। কাকীমা বললেন, তুমি এখনও যাও নি?

আমি ইঙ্গিতে বললাম, কেমন আছেন?

কাকীমাও ইঙ্গিতে বললেন, ভাল। মুখে বললেন, কাল সকালে এসো একবার।

পরদিন যেতেই কাকীমা বললেন, তোমরা চ'লে যেতে চাইছে।

আমি বললাম, তাই ভাল, দিন পাঠিয়ে।

কাকাবাবু ইজি-চেয়ারে শুয়ে ছিলেন। দেখে মনে হ'ল একরাত্রের মধ্যেই কত যেন রোগা হ'য়ে গেছেন। ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, চ'লে যাবে?

কাকীমা বললেন, হ্যাঁ এখন যাওয়াই ভাল, ক'দিন ঘুরে আসুক দেশ থেকে।

কাকাবাবু বললেন, আচ্ছা। কিন্তু ট্রেনে তো কাউকে যেতে হবে।

আমি বললাম, সে আমি যাব'খন আপনি ভাববেন না।

দুপুরবেলার গাড়িতেই দু'টিকে উঠিয়ে দিয়ে এলাম, মনে মনে বললাম, গেলেই যখন ধরা করে, ক'টা দিন আগে যদি যেতে!

কাকাবাবুর সে-দুর্বলতাটা তিন চারদিনের মধ্যেই কমল, কিন্তু আগের স্বাস্থ্য আর ফিরল না। দিনের দিন নিস্তেজ হয়ে পড়তে লাগলেন। বাইরে কোথাও কোন অসুখের চিহ্নমাত্র নেই, অথচ চোখের সামনেই তাঁর সুন্দর দেহটা তিলে তিলে ক্ষয় হ'য়ে যাচ্ছে, এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। ডাক্তার ডাকতে চাইলাম, কাকাবাবু হেসে বললেন, ডাক্তার এসে কি করবে? কাকীমাও বললেন, থাক।

আমি তবুও বললাম, এখনি ডাক্তার নয়। গিরীন ঘোষকে, যা বলুন, প্রফেসর রুদ্রকে একবার—

কাকীমা বললেন, না।

কারণ বুঝলাম, পরাজয়ের লজ্জাটাকে আর অন্যের সামনে মেলে ধরতে চান না। এদের ডেকেও যে, প্রকাণ্ড কিছু হ'ত এমন ভরসা আমার ছিল না, তবু লোকে একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখতে চায়।

ঠিক হ'ল আর নয়, এবার দীর্ঘকালের মত একটা ছুটি, বাইরে কোন নিরিবিলি জায়গাতে গিয়ে— তাতে যদি সুস্থ হন। আমি বললাম, আমিও যাব সঙ্গে। কলেজে ছুটি নেওয়া হ'ল। যাওয়ার তোড়জোড়

চলতে লাগল—জিনিসপত্র কেনা গোছানো, যাবার জায়গা ঠিক করা। আয়োজনের উৎসাহে কাকাবাবুও অনেকটা চাঙ্গা হয়ে উঠলেন; উঠে হেঁটে বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলেন পর্যন্ত। কাকীমা অবশ্য বেশি নড়াচড়া তাঁকে করতে দিতেন না। তিনিও সুবোধ বালকের মত সমস্ত হুকুম মেনে চললেন। কেবল একটি কথা কিছুতেই মানতে চাইলেন না, এত কাণ্ডের পরও তাঁর সেই যোগসাধন করতে বসা চাই। কাকীমা একদিন বললেন, আবার ও?

কাকাবাবু বললেন, তুমি বুঝছ না মোটে। সঞ্চিত শক্তি হঠাৎ ফুরিয়ে গিয়েই না আমাকে কাহিল করে ফেলেছে? সে-শক্তি আবার সঞ্চয় করে না নিলে হবে কেন?

কাকীমা বললেন, দরকার নেই শক্তিতে, তুমি সুস্থ থাক, সেই আমার ভাল।

কাকাবাবু বললেন, আরে কি বিপদ, সেই সুস্থ থাকার জন্যেই যে শক্তির দরকার এই কথাটা বুঝছ না কেন!

কাকীমা বললেন, দরকার নেই আমার বুঝে, অনেক বুঝেছি।

সম্মতি পেলেন না, তবু কিন্তু কাকাবাবু নেশা ছাড়তে পারলেন না, পাকেচক্রে অবসর পেলেই সাধনে বসতে লাগলেন। সে সাধন হ'ত কি করে তা আমি জানিনে, কাকীমা আমাকে কখনও দেখতে দেননি। কিন্তু এটা টের পেতাম, দুজনে এই নিয়ে লুকোচুরি খেলা চলছে। কাকাবাবু একটু সুযোগ পেলেই সাধনে বসবেন, কাকীমাও কিছুতেই সে সুযোগ ঘটতে দেবেন না। শেষে কাকীমা ছাতের ঘরে তালা লাগিয়ে দিলেন। ফল হ'ল না, কাকাবাবু ঘর একা পেলেই বিছানার চেয়ারে যেখানে আছেন সেইখানে বসেই সাধনে ডুবে যেতে লাগলেন। কাকীমাও তখন তাঁকে একেবারে চোখে চোখে আগলে রাখতে লাগলেন, একমুহূর্তের জন্যেও একা রেখে যাওয়া বন্ধ করলেন।

সবচেয়ে বড় মুশকিল, এতবড় একটা যুদ্ধ অহর্নিশি চলেছে, অথচ তার কথা দুপক্ষের কাউকে জানাবার উপায় নেই, কারও কাছে একটু সাহায্য বা সহানুভূতি চাইবার পথ নেই। জানার মধ্যে এক জানতাম আমি, আমাকেও ইদানীং সব কথা কাকীমা বলতে চাইতেন না। তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে এক অদ্ভুত বিরোধ চলেছে, আমি পুত্রস্থানীয়, আমাকে তাঁর কথা বলতে বোধহয় তাঁর অভিমানে বাধত।

আমি একদিন বললাম, কিন্তু কাকীমা, এই অবস্থায় ওঁকে বাইরে নিয়ে যেতে এখনও আপনি সাহস করেন? এ তবু পাচজন রয়েছে, তারা থাকা মানেই একটু সাহায্য পাওয়া। সেখানে একা পড়বেন, ওঁর এ-রোঁক সামলাবেন কি করে?

কাকীমা বললেন, তা পারব।

আমি বললাম, কি করে?

কাকীমা বললেন, দেখছ না এটা এখন ওর পক্ষে হয়ে উঠেছে একটা অবসেশন। এখানকার সমস্ত কিছুই ওঁকে সারাক্ষণ ঐ একই কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। এখান থেকে দূরে নতুন কোন জায়গায় গিয়ে পড়লে তোলা ওর পক্ষে সহজ হবে। আর তুমি তো সঙ্গে রইলেই; না হয় ফল হবে কলকাতায় ফিরে আসতে কতক্ষণ।

আর কথা কইলাম না।

যাত্রার আয়োজন চলতে লাগল। বাড়িও নেওয়া হয়ে গেল, কালিঘাং-এ। যাবার সাতদিন আগে আমি নিজে গিয়ে একখানা আলাদা কুপে রিজার্ভ করে এলাম। কিন্তু যাওয়া আর হ'ল না।

যেদিন আমাদের যাবার কথা তার দিন তিনেক আগে কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এলেন, সায়াল কলেজের একটি সাহেব প্রফেসর। নামটা মনে নেই, আর্থার্স, চিংকুথার, বহুকাল এদেশে ছিলেন, রিটায়ার করে দেশে যাচ্ছেন। বললেন, ডক্টর, তোমার কথা আমার মনে থাকবে, এমন নিষ্ঠা আর মেধা আমি ওদেশেও বেশি দেখিনি। আর ম্যাডাম, আপনাকে আর কি বলব, ডক্টর নিয়োগীর বরাত ভাল এমন একজন—কি বলে আপনাদের ভাষায়, সহধর্মিণী নয় ? A very nice word. The best one could think of.

কাকীমার মুখ লাল হ'য়ে উঠল, বললেন, আমি তো কিছুই করিনি ডক্টর। স্ত্রী হিসেবে আমার কর্তব্য যা, তাই মাত্র করেছি।

বুড়ো সাহেব, হা হা করে হেসে উঠলেন, মনে হ'ল এ বাড়িতে অনেকক্ষণ কেউ অমন করে হাসেনি। শেষে বললেন, এও কি মাত্র স্ত্রীর কর্তব্যই এমন করে সাকসেসফুলি-অ্যাচিভ্ড হওয়া ? কি জানি, স্ত্রী কথাটার মানে হয়তো আমরা ঠিক জানিনে। May-be that's why I could never be a good wife, nor have any. বলে আবার সেই হাসি!

হাসি থামলে বললেন, যাক, যার জন্যে এসেছিলাম বলি। আমি তো দেশে চলে যাচ্ছি, তোমরাও বাইরে যাচ্ছ, আর হয়তো আমাদের জীবনে দেখা হবে না—হয়তো কেন, খুব সম্ভবত হবেই না। যাবার আগে তাই দেখা করতে এলাম—You are a couple I shall remember and talk of all my life. আর একটি অনুরোধ, কাল সন্ধ্যায় আমি একটি ছোট্ট পার্টির আয়োজন করেছি, perhaps my last meeting with my friends here. তোমরা আসবে না ?

কাকাবাবু বললেন, নিশ্চয় যাব।

প্রফেসর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ইয়ং-ম্যান, তুমিও যাবে কিন্তু।

কাকাবাবুর যৌগতে আমাকে অনেকেই চিনতেন! কাকীমা বললেন, নিশ্চয়ই যাবে, ডক্টর নিয়োগী অসুস্থ, সেই জন্যেও ওকে যেতে হবে।

সাহেব খুব খুশী হ'য়ে চ'লে গেলেন।

পরদিন সন্ধ্যায় তিনজনে পার্টিতে গেলাম। সাহেবের বাড়ি ছিল আলিপুরে, সেই বাড়িতে পার্টি। সায়াল কলেজের এবং অন্য কলেজের, কলকাতা শহরের বহু বড় সায়াণ্টিষ্ট প্রফেসররা অনেকেই এসেছেন, কেউ একা, কেউ বা সস্ত্রীক। সে ভীনের পালের মধ্যে আমি একাই বক, তাঁদের গল্পগুজবে যোগ দেবার মত আমার সামর্থ্যও ছিল না, সাহসও ছিল না। অবশ্য গরজও যে খুব ছিল তা নয়, আমি গেছি কাকাবাবুর সঙ্গে, আমার যা কাজ তাঁকে নিয়েই। কাকাবাবুর একপাশে কাকীমা, একপাশে আমি। কাকাবাবু সে সময় প্রায়ই অন্যমনস্ক হ'য়ে থাকতেন, কথাবার্তা বেশি বলতে চাইতেন না। তিনি চুপচাপ করেই খেয়ে যাচ্ছিলেন, আমরাও তাই—কথা যা দু'একটা হচ্ছিল সে আমাদের নিজেদের মধ্যেই।

খাওয়া শেষ হ'য়ে গেল, হাত তখন ন'টা হবে। কেউ কেউ ট্রামে বাড়ি ফিরবেন, কাজেই টেবিল ছেড়ে একে একে সবাই উঠতে আরম্ভ করলেন। পাশের ঘরে গ্রামোফোন বাজানো হচ্ছিল, সেও থেমে গেল।

কাকাবাবু একটু আগে খাওয়া শেষ করেছিলেন। আমি আস্তে আস্তে বললাম, উঠবেন নাকি?

কাকাবাবু উঠতে গিয়েও, হঠাৎ আবার বসে পড়লেন।

আমি বললাম, কি হ'ল?

কাকাবাবু জবাব দিলেন না। চেয়ে দেখলাম, ওঁর মুখ হঠাৎ সাদা হ'য়ে গেছে, দুই হাতে শক্ত করে চেয়ারের হাতল চেপে ধরেছেন, হাত দুটো থরথর করে কাঁপছে। আবার বললাম, কি হ'ল কাকাবাবু?

কাকাবাবু এবারও জবাব দিলেন না, একবার শুধু আমার দিকে তাকিয়েই, চট করে আমার চোখ ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু সেই এক সেকেণ্ডের মধ্যেই তাঁর চোখের যে দৃষ্টি আমার নজরে পড়ল তাতে আমিও স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম—দুই চোখের ভেতর থেকে যেন একটা ভয়ের দৃষ্টি ফুটে বেরুচ্ছে। এমন দৃষ্টি আমি আর কখনও দেখিনি। কাকাবাবু ভয় পেয়েছেন! কিন্তু কিসের ভয়?

কাকীমারও ততক্ষণে ব্যাপারটা নজরে পড়েছে। চোখের ইশারায় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি?

মুখে কথা বলবার উপায় নেই, চারদিকে লোকজন। আমিও ইশারায় জানালাম, বলছি।

কাকাবাবু হঠাৎ অসুস্থ হয়েছেন, চেয়ার থেকে প'ড়ে যাবেন, তাই করে ধরে তাঁর দিকে মুখ করে বসতে গেলাম। ঘুরতে যেতেই তাঁর উরুতের সঙ্গে আমার হাঁটু ঠুকে গেল। চমকে উঠলাম, তারপর একখানা হাত তাঁর উরুতের ওপর রাখলাম। আন্দাজে টিপে দেখলাম। প্যান্টের ভেতরে কাকাবাবুর পা'খানা নেই, আছে একটা শক্ত কাঠের মত জিনিস, তাতে নানারকম খাঁজ আর পল কাটা।

আমার গা ঘেমে উঠল, মাথা ঘুরে গেল। কোন রকমে একটু সামলে নিয়ে কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকালাম। নির্ব্বিকার শুন্যদৃষ্টি মুখ, এক দৃষ্টে সামনে চেয়ে বসে আছেন। চোখ দিয়ে ওঁর দৃষ্টিটাকে লক্ষ করলাম, ঘরের ওধারে একটা মস্তবড় টেবিল, তার পলকাটা পায়ার দিকে কাকাবাবু চেয়ে আছেন।

কাকীমা আবার আমাকে ইশারায় প্রশ্ন করলেন, কি হ'ল?

আমি উত্তর দিলাম না। আবার সেই টেবিলের দিকে তাকালাম, সঙ্গে সঙ্গে আবার প্যান্টের ওপর দিয়ে হাত বুলিয়ে দেখলাম, না, ভুল হয়নি। এই তো, ঠিক সেইরকমের পলকাটা—। কাকাবাবুর দৃষ্টি আর মন টেবিলের পায়ার ওপর নিবদ্ধ হয়ে আছে, ফলে প্যান্টের মধ্যে ওঁর পা-খানাও বদলে টেবিলের পায়া হ'য়ে গিয়েছে। আমার দুই কান দিয়ে তখন আগুন বেরুচ্ছে। কাকীমার দিকে তাকালাম। তিনি ততক্ষণে অধৈর্য্য হ'য়ে উঠেছেন। ইশারায় টেবিলের পায়াটা দেখিয়ে দিলাম, কাকাবাবুর পা দেখলাম, শব্দ না করে শুধু ঠোঁট নেড়ে বললাম, পা' বদলে গেছে।

কাকীমা বুঝলেন। মাথা নীচু করে একটুক্ষণ ভাবলেন, হয়তো বা একটু চোখ মুছলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন, গৃহকর্ত্তা সায়েবকে ডেকে বললেন, আমাদের মাপ করবেন আপনারা, আমার স্বামী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

সায়েব এবং আরও কয়েকজন ছুটে এলেন, সে কি, আমরা কি সাহায্য করতে পারি, বলুন।

কাকীমা বললেন, না না, সাবধানের দরকার হবে না, খালি ওঁকে একটু থাকতে দিতে হবে। পাওয়া তো হয়ে গেছে, আপনারা সবাইকে অনুগ্রহ করে বাইরে ডেকে নিয়ে যান, এ ঘরে যেন কেউ না থাকে।

সাহেব তক্ষুনি ছুটে গিয়ে সবাইকে কথাটা বললেন। কিন্তু দেখলাম মশায়, শিক্ষিতই বলুন আর গেঁয়ো-চাষাই বলুন, আসলে সব মানুষই এক, মজা দেখবার লোভ কেউ ছাড়ে না। অত বড়-বড় সব পণ্ডিত আর প্রফেসরেরদল, খবরটি পাওয়ামাত্র সমস্তগুলো মিলে চারদিক থেকে এমন হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ল, আমরা আর নিশ্বাস নিতে পারি নে।

গোলমাল ও গরমে কাকাবাবুও একবারে উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন, হঠাৎ মুখ তুলে চেঁচিয়ে বললেন, But why, they call that a leg too, don't they?

কাকীমা বললেন, এই, কি বলছ?

কাকাবাবু আবার মাথা হেঁট করলেন। গোলমাল আরও বেড়ে গেল।

কাকাবাবু এই ভিড়ের মধ্যে যেন আরও একেবারে মরমে ম'রে গেলেন। যতদূর পারেন মুখ নীচু ক'রে মাটির দিকে চেয়ে রইলেন। সাহেবটি বাইরে থেকে ঘুরে ঘুরে শুনে শুনে ব'লে ডাকতে লাগলেন, please please come away, please move on, let him have some air. কে কার কথা শোনে।

এক-আধটুকু অস্পষ্ট হাসি, ঠাট্টার মন্তব্য কানে এল।

তখন কাকীমা হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। অত্যন্ত চেঁচিয়ে বললেন, Shameful। একটা লোক অসুখ হয়ে পড়েছে আপনারা একটু হাওয়া ছেড়ে দিতে পারছেন না? এমনি আপনাদের মজা দেখবার নেশা?

যান বলছি, বাইরে যান, ওঁকে হাওয়া ছেড়ে দিন।

ফল হ'ল। কেউ সুড়সুড় করে দোরের দিকে পা বাড়ালেন, কেউ কেউ বা মুখ বাঁকালেন, মহিলারা এক আধজন বেশ উচ্চকণ্ঠেই কটু মন্তব্য করতে করতে গেলেন—তা হোক, ঘর ঠিক সাফ হ'য়ে গেল। সাহেব এসে আর একবার বলে গেলেন, Many thanks to you madam, you saw I could not manage it।

কাকীমা শান্তস্বরে বললেন, Thanks। আর একটি কাজ আপনি করুন দয়া করে, আমাদের গাড়িটাকে একেবারে এই দোরের সামনে নিয়ে আসতে বলুন।

Right-O বলে সাহেব দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন।

সবাই চলে গেলে পর কাকীমা ধীরে ধীরে গিয়ে কাকাবাবুর পাশে দাঁড়ালেন, তাঁর কাঁধে একটি হাত রেখে অন্য হাতে তাঁর একখানা হাত তুলে নিয়ে বললেন, কি হ'ল, বাড়ী যাবে না?

কাকাবাবু মুখ তুলে তাঁর দিকে চাইলেন, একেবারে অসহায় দৃষ্টি, যেন ভীত-শিশু মার দিকে চেয়ে অভয় খুঁজছে।

কাকীমা আমাকে ইসারা করে বললেন, ওদিক থেকে ধর।

কাকাবাবুর কানের কাছে মুখ নামিয়ে, খুব মৃদু অথচ স্পষ্ট স্বরে বলতে লাগলেন, না, এ তোমার পা, তোমার নিজের পা, Your own leg, your own leg—

আমি কাকাবাবুর প্যান্টের ওপর হাত রেখিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পরে টের পেলাম, কাঠ বদলে আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

কাকাবাবু ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন, একহাত কাকীমার কাঁধে একহাত আমার কাঁধে রেখে পা বাড়ালেন। দরজা পর্যন্ত পৌঁছতে তিনবার বার থামতে হ'ল, দুবার ভুল পা থেকে খুলে পড়ে গেল—দুবারই পা ঠিক হয়েও হচ্ছে না, ফিরে ফিরে আবার সেই কাঠের পায়ে চলে যেতে চাইছে, মনকে কিছুতেই তার থেকে একেবারে ফিরিয়ে আনতে পারছেন না, মনে পড়ামাত্র পা আবার পাথা হয়ে যাচ্ছে। কাকীমা কানের কাছে কেবলই বলতে বলতে যাচ্ছেন, Your own leg, your own leg—দাঁড়িয়ে পড়তেই আবার একটু জোর দিয়ে দিয়ে বলছেন, আবার কাকাবাবু কয়েকপা হেঁটে যাচ্ছেন। এমনি করে শেষে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছনো গেল। অতিথিরা তখন হয়তো চলে গেছেন, হয়তো-বা অন্তত বলে আমাদের ঘুণাক্ষর করছেন, তা কক্ষন নে। গাড়িতে উঠে বসতেই সাহেব কোথায় আড়ালে ছিলেন, ছুটে এলেন—I am so very very sorry, that this should happen here, at my place।

কাকীমা বললেন, না না, আপনার দোষ কি, উনি আগে থেকেই অসুস্থ ছিলেন।

সাহেব বললেন, তা হোক, Still I feel I should n't have dragged him out—

আমরা তাঁকে আরও দুএকটা সান্ত্বনাবাক্য বলে চলে এলাম। গভীর রাত, আলীপুর থেকে সেই অন্ধকারে সার্কুলার রোড ধরে ঘরে পড়ার অবধি যাওয়া। গাড়ির মধ্যে কাকাবাবুর সেইরকম ঘন ঘন শ্বাসের শব্দ, যেন তাঁর দম ফেলতে কষ্ট হচ্ছে। কাকীমা তাঁকে কোলে শুইয়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রে নিয়ে এলেন, আমি ড্রাইভারের পাশে বসে তাঁদের নিশ্বাসের শব্দ শুনতে লাগলাম আর কাকীমার চোখের নিঃশব্দ ধারাকে স্পষ্ট দেখতে লাগলাম।

তার পরদিন থেকেই কাকাবাবুর শরীর একেবারে ভেঙে পড়ল। দেখতে দেখতে শয্যাশায়ী হ'য়ে গেলেন, উঠে বসবারও আর শক্তি রইল না। সবচেয়ে আশ্চর্য পরিবর্তন হ'ল মুখখানার—অমন টকটকে গৌরবর্ণ সমস্ত মুখে কপালে গলায় যেন কে নিশ-কালো কালি ঢেলে দিয়ে গেল। যেমনই অপূর্ব দীপ্তি সে-মুখে ফুটে বেরিয়েছিল দেখেছিলাম, ঠিক আবার তার পেছনে অন্ধকারটিকেও দেখলাম।

আর দেখলাম কাকীমাকে। সহধর্মিণীরূপে তাঁকে দেখেছি, দেখেছি ল্যাবোরেটরিতে, কিন্তু এ-যেন একেবারে নতুন করে দেখা দিলেন, এমন অপূর্ব মাতৃমূর্তি কখনও কল্পনা করতে পারি নি। দিনরাত রোগীর পাশে ঠায় ব'সে আছেন, খাওয়াচ্ছেন মোছাচ্ছেন, আবদার শুনছেন, গল্প বলছেন গান শোনাচ্ছেন—এমন অক্লান্ত সেবা মানুষে মানুষের করতে পারে, ভাবা যায় না। মনের মধ্যে কি আগুন তাঁর দিনরাত জ্বলছিল সে তো আমি জানতাম, কিন্তু কোনদিন ভুলেও তার এতটুকু আভাস বাইরে প্রকাশ পেল না, সমানে হাসিখুশি হ'য়ে গল্প করছেন, সেজেগুজে ফিটফাট হ'য়ে থাকছেন, কাকাবাবু তাঁর যে-যে শাড়িটি পরা পছন্দ করতেন, যেমন করে আলতাপরা টিপ পরাটি দেখতে ভালোবাসতেন—যেন প্রতিমুহূর্তে প্রাণ রেখে রেখেই তাঁকে সারিয়ে তুলবেন তিনি। দেখতাম আর মনে মনে প্রণাম করতাম!

কাকাবাবুর দিকে তখন তাকানো যায় না। এত যে উজ্জ্বল দীপ্তি, এমন যে প্রতিভা তার কোথাও

কিছু অবশিষ্ট নেই, যেন ঘরের ঘর আগুন লেগে দাউ দাউ করে জ্বলছিল, হঠাৎ নিভে গেছে। পড়ে আছে শুধু একগাদা ছাই—তাকে দেখে সেই আগুনের রূপকে মনে আনা দুঃসাধ্য ব্যাপার। সেরে তিনি উঠবেন এ আশা নিতান্তই দুরাশা, একথা মনে মনে বুঝতাম, তবু আশা যায় না—দুজনে মিলে প্রাণপণে চেষ্টা করতাম কিসে একটু আরাম দেওয়া যায় তাঁকে, কি করলে একমিনিট কাল একটু ভাল থাকেন। বাইরে যাওয়া আর হ'ল না—কলকাতার বড় বড় ডাক্তারদের এনে দেখানো হ'ল। সবাই বললেন, যে কারণেই হোক সম্পূর্ণ একটা নার্ভাস প্রোস্ট্রেসন চলেছে। একটু সুস্থ না হ'লে এঁকে নিয়ে দূর পাল্লার ভ্রমণ করা অসম্ভব। ঠিক এই সময়েই কলকাতায় খবর রটে গেল, ডক্টর নিয়োগী পাগল হ'য়ে গেছেন। খবরটা আমি শুনলাম, কাকীমাকে বললাম না। পরে দেখলাম তাঁরও কাণে কি করে পৌঁছেছে। অত্যন্ত মিথ্যে কথা, কিন্তু আমাদের করবার কিছুই ছিল না। কথাটা বেরিয়েছিল খুব সম্ভবতঃ, সেদিন যাঁরা কাকীমার ধমক খেয়ে মুড়মুড় করে পালিয়েছিলেন সেই মহাত্মাদের বা মহাত্মানীদের কারু মাথা থেকেই। কাকাবাবুকে হিংসে করবার মত লোকের তো অভাব ছিল না কলকাতা সহরে। তা হোক, ও নিয়ে মাথা ঘামাবার ফুরসৎ তখন আমাদের ছিল না। আমরা জানতাম কাকাবাবুকে যদি সারিয়ে তুলতে পারি তবে সবই আবার ঠিক হয়ে যাবে, আর তিনিই যদি না সেরে ওঠেন তো কারও কোন কথাতেই আমাদের এসে যায় না। এঁদের দু'চারজন অবশ্য বাড়ি অবধি ধাওয়া করেছিলেন, দেখা করতে। সত্যিকার সহানুভূতি নিয়ে, না মজা দেখতে, তা জানি না, জানবার দরকারও ছিল না। কাকীমা কাউকে বাড়ীতে ঢুকতে দিলেন না, সোজা বলে দিলেন, ডাক্তারের বারণ।

কাকাবাবু এই সময়টাতে কথাবার্তা প্রায়ই বলতেন না। খালি চুপ ক'রে শুয়ে থাকতেন, আর কি ভাবতেন। একদিন দেখলাম, তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। কাকীমা চোখ মুছিয়ে দিলেন, বললেন আবার তুমি ঐ সমস্ত কথা ভাবছ! কি হয়েছে তোমার, একবারে পার নি, আবার পারবে। অত ভয় কেন?

কাকাবাবু বললেন, পারব?

কাকীমা বললেন, নিশ্চয় পারবে। আমি তোমার কাছে রয়েছি তো, আমিই সাহায্য করব তোমাকে।

কাকাবাবু বললেন, আচ্ছা।

বলে চোখ বুজলেন। আবার বললেন, ভাবনা আমার সে নিয়ে নয়। মন খারাপও করছি না। লড়তে গিয়েছিলাম, হেরেছি। কি হয়েছে তাতে? আমার এ মৃত্যুই যদি হয়, তবু তো সে সৈনিকের মৃত্যু, কাপুরুষের মৃত্যু তো নয়!

কাকীমা বললেন, তবে তো বোঝাই। আর মৃত্যুই বা বলছ কেন এত, একবারের পরাজয় মানেই চিরকালের মত পরাজয় নয়।

কাকাবাবু বললেন, তা নয়। আমি ভাবছিলাম অন্য কথা।

কাকীমা বললেন, থাক অত কথা বোলো না তুমি। ক্লান্ত হ'য়ে পড়বে।

কাকাবাবু বললেন, না না, বলতে দাও আমাকে, বললে মন হালকা হয়।

কাকীমা বললেন, বেশ, বল।

কাকাবাবু বললেন, ভেবেছি বলে মন খারাপ করছি না আমি, তারপর এ সম্ভাবনা তো জানাই ছিল। মমী জান তো? প্রাচীন ইজিপ্টের লোকেরা রাজাদের মৃতদেহকে মমী করে রেখে গেল; তার সঙ্গে সঙ্গে রেখে গেল অভিশাপ, মমীর যে ঘুম ভাঙাবে মমীর হাতে তার নিস্তার নেই।

প্রাচীন ভারতের এই সব বিদ্যা আর বিজ্ঞান, একেও তারা মেরে মমী করে মাটিতে পুঁতে রেখে গেছে। সেই মমীর হাজার বছরের ঘুম ভাঙাতে গেলাম আমি, সে কি আমাকে না ছুবলে ছাড়বে? এর জন্য তো আমি প্রস্তুতই ছিলাম, হিমাদ্রির সেই সাধুও আমাকে একথা বলেছিলেন, সতর্ক করে দিয়েছিলেন?

কাকীমা আর্তস্বরে বললেন, এমন ঘটবে, জানতে তুমি?

কাকাবাবু বললেন, ঠিক এ-রকমটি জানতাম না, বিপদ হ'তে পারে জানতাম।

কাকীমা বললেন, জেনেও গিয়েছিলে?

কাকাবাবু বললেন, সোনা পাওয়ার কথা। বিপদ হ'তে পারে, তাই বলে এতবড় একটা রত্নের পুনরুদ্ধার করবার সুযোগ পাচ্ছি, চেষ্টা না করে ছেড়ে দেব! বিপদ কোথায় নেই? কিন্তু আমি তো সেকথা ভাবছি না, ভাবছি, এ-রকম হ'ল কেন?

কাকীমা বললেন, থাক, এখন আর ওসব ভেবে কি হবে। একটু ঘুমোও।

কাকাবাবু বললেন, বাঃ, কি হবে মানে? লড়েছি হেরেছি, তার জন্য দুঃখ নেই, বেঁচে থাকলে আবার লড়ব। কিন্তু এবার হারলাম কেন, সেটা জানতে হবে না? জানব, ভুল শুধরে নেব, নইলে আবার লড়ব কি ক'রে?

কাকীমা আর তর্ক করলেন না। কাকাবাবু চুপ করে শুয়ে শুয়ে কি ভাবতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পরে বললেন, প্রচাণ্ড, এক কাজ করতে পারিস?

আমি বললাম, কি?

কাকাবাবু বললেন, অনেকদিন হ'ল পড়েছি, ভাল মনে নেই। ক্রয়েডের বইগুলো একবার এনে দিতে পারিস্ আমাকে?

কাকীমা বললেন, না না, সে কক্ষনো হবে না। এই অবস্থার ওপর এখন আবার বই পড়ে আরও ক্লান্ত হবার কিছু দরকার নেই। কি হবে ফ্রয়েড প'ড়ে?

কাকাবাবু একটু বিরক্তির সুরে বললেন, কি ঝামেলা। বললাম যে এর কারণটা ভেবে পাওয়া আমার দরকার, নইলে স্বস্তি পাচ্ছি না! কাকীমার চোখ ছলছল ক'রে উঠল। কাকাবাবুকে চোখের জল তিনি দেখাতেন না, মুখ ফিরিয়ে উঠে গেলেন। কাকাবাবু চেয়ে থেকে থেকে বললেন, আর এই এক পাগল! কি করে যে বোঝাই!

মিনিট খানেক পরেই কাকীমা ফিরে এলেন, আবার স্নানমত মুখ-চোখ খুশিতে ঝলমল করছে। খাটের ধারে বসে বললেন, কই বল, কি বলছিলে।

কাকাবাবুও হাসলেন। বললেন, টিকবে না এক মিনিটও, নানা কথা। তবে অমন রাগ করার দরকার? শোন, বলছি কি, কদিন থেকে ভাবছি, এই যে পায়ের পায়তে পায়তে হঠাৎ আর পারলাম না, এর কারণ একটা নিশ্চয়ই আছে। কারণটা তাই জানতে ইচ্ছে করছে। খানি মনে হচ্ছে ফ্রয়েডের একটা জায়গাতে এর ব্যাখ্যা করা আছে, কথাটা মনে একটু একটু আসছে অথচ ঠিক মনে পড়ছে না, তাই অস্বস্তি

বোধ করছি। লম্বাটি তুমি রাখ কোরো না, দাও বইগুলো আমিয়ে। আমি এখন পড়ব না, এখানে সেখানে দু'একটা জায়গা মাত্র দেখব, তাও না হয় তোমরাই প'ড়ে শুনিয়ো আমাকে।

কাকীমা বললেন, কিন্তু সত্যি, এখন এই ট্রেনটুকুও না করলেই কি ভাল হ'ত না?

কাকাবাবু হঠাৎ অসহিষ্ণু হ'য়ে পড়লেন, বললেন, কতবার বোঝাব। বয় যদি আর নাই দেয়ে উঠি, যদি মরেই যাই, কি আমার হ'ল সেটা জেনে যাব না? সুস্থ মনে মরতেও দেবে না আমাকে?

কাকীমা আর কথা বললেন না, উঠে চলে গেলেন। পরদিন আমাকে টাকা দিয়ে বললেন, যা যা বই চান সব এনে দাও।

আমি বললাম, সত্যি দেব?

কাকীমা বললেন, হাঁ। অত বড় কথাই যখন বলতে পারলেন, আমি আর কিছুতে আপত্তি করব না —যা হয় হোক।

বই এল। কাকাবাবুর নির্দেশমত বইয়ের জায়গা জায়গা থেকে বেছে বেছে তাঁকে পড়ে শোনাতে লাগলাম, কখনও আমি, কখনও কাকীমা। একসঙ্গে বেশি পড়া যেত না, দিনে দু'পাতা চারপাতা, ব্যস।

কয়েক দিন পরে হঠাৎ একদিন শুনতে শুনতে বললেন, থাক, আর পড়তে হবে না। পেয়ে গেছি।

কাকীমা বললেন, কি?

কাকাবাবু বললেন, কাল বলব। আরও একটু ভেবে নিই, মিলিয়ে নেই।

পরদিন বললেন, এই কথাটাই মনে এসে এসেও ঠিক আসছিল না। কেন জানি তার জবাব অন্যেরাই দিয়ে গেছেন।

আমরা বললাম, কি জবাব?

কাকাবাবু বললেন, ক্রয়েডের কথা হচ্ছে, মানুষের মনে একদিকে থাকে প্রবৃত্তি, আর একদিকে থাকে সংযম, দুটোর সামঞ্জস্য ঘটিয়ে তবেই তাকে চলতে হয়। একদিকে পাল্লা ভারী হয়ে গেলেই মানুষ অস্বাভাবিক হ'য়ে উঠবে, অসংযম বা অন্যায় কাজ করবে। আমারও তাই হয়েছে। শক্তির সাধনা করেছি, তাকে বাড়িয়ে তুলেছি, তার সঙ্গে সঙ্গে সে-শক্তিকে সংযত রাখবার সাধনাও করতে হবে সেকথাটা ভুলেই গেছি। তার ফলে ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়িয়ে গেল, চাই, না চাই, মনে হওয়া মাত্র পরিবর্তন আপনি ঘটিয়ে ফেলি, তাকে সামলে রাখার বিদ্যে আমার জানা ছিল না—তাই না? ঠিক যেন ইঞ্জিনের স্টীমই খালি বাড়িয়ে গেছি, ব্রেককেও যে সেই সমান অনুপাতেই জোরালো করে তুলতে হবে একথা কখনও ভাবিনি। এর ফলে অ্যাকসিডেন্টও হতে বাধ্য! এখন বুঝতে পারছি সাধু এই ইঙ্গিতই করে-ছিলেন, বলেছিলেন, বাধা শক্তি বাড়ান সহজ, তাকে বুঝে-সুঝে প্রয়োগ করাই কঠিন। এইজন্যেই মনে শুরু ছাড়া হয় না।

এর পরেই তাঁর শরীর খুব বেশি ভেঙে পড়ল। আমাকে একদিন ডেকে বললেন, শোন, আমার দুটি কথা তোমাকে বলে যাবার আছে।

আমি বললাম, ওকি বলছেন আপনি?

কাকাবাবু হেসে বললেন, ওরে, চোখ বুজে থাকলেই কি মৃত্যুকে এড়ানো যায়? আমি বেশ টের পাচ্ছি আমার সময় হয়ে এসেছে। পরে হয়তো আর বলবার সময় পাব না! তোর কাকীমাকে ডাক।

কাকীমা এসে পাশে বসলেন। কাকাবাবু বললেন, শোন, প্রভাতকে দুটি কথা বলে দিয়ে যাই, কারণ আমার আত্মীয় বল ছেলে বল সব ওই। তুমিও শোন।

কাকীমা বললেন, বল।

কাকাবাবু বললেন, প্রথম কথা হচ্ছে, আমার লাইব্রেরি। এটা প্রভাত নেবে? ভেবেছিলাম তোমাকে খুব বড় সাপ্রাইজ করে দিয়ে যাব, তা আর হল না।

আমি বললাম, না কাকাবাবু, ওর মর্যাদা আমি রাখতে পারব না। কাকীমাকে দিয়ে যান বরং।

কাকাবাবু কাকীমার দিকে একবার চাইলেন, তারপর বললেন, ও নেবে না। থাক, কি আর হবে ওটা তা'হলে কলেজকেই দিয়ে দিয়ো।

কাকীমার মুখ লাল হয়ে উঠল। তীক্ষ্ণস্বরে বললেন, সাধারণ কলেজকে? না, কক্ষনো না।

কাকাবাবুর নামে যত বিশ্রী গল্প রটানো হচ্ছিল, তার কথা কাকাবাবু জানতেন না কাকীমা জানতেন। কাকাবাবু বললেন, কেন, কি হল?

কাকীমা বললেন, কিছু হয় নি। কিন্তু ওদের আমি কক্ষনো দেব না, এ আদেশ তুমি কোরো না আমাকে। তার চেয়ে বল, আমি নিজের হাতে আগুন লাগিয়ে সমস্ত পুড়িয়ে দিয়ে যাব।

কাকাবাবু ধীরে ধীরে বললেন, পুড়িয়ে দেবে? আমার কত কষ্টে গড়া জিনিস, তুমি তো জানো। একটু থেমে আবার বললেন, বেশ, তোমার যদি ইচ্ছে হয় অন্য কাউকেই দিয়ো, শুধু দেখো, অপাত্রে যেন না পড়ে।

কাকীমা বললেন, তাই দেব। আর কি?

কাকাবাবু বললেন, আর একটি কাজ প্রভাতকে করতে হবে। আমি বেঁচে থাকতে নয়; আমি যখন থাকব না তখন আমার এই সাধনার কাহিনী তুমি লোকের কাছে প্রকাশ করবে; লোকে জানুক, আজও এ অসম্ভব নয়, জানুক আমি একে সম্ভব করেছিলাম। এই ভার আমি তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি প্রভাত।

কাকীমা অনেকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইলেন তারপর বললেন, না।

কাকাবাবু বললেন, না? তুমি বুঝছ না বেবু, আমার যদি কেউ কোনদিন এই চেষ্টা করে। আমার কাছ থেকে পথের ইঙ্গিত যেটুকু তার পাওনা তা আমি তার জন্যে রেখে যাব না? জীবনে এও তো আমার কর্তব্য, হয়তো জীবনের এই শেষ কর্তব্য।

কাকীমা তবুও কাঠ হ'য়ে বসে রইলেন, তেমনি ধরা-গলায় বললেন, না।

কাকাবাবু বললেন, তবু বুঝবে না। দেখ সারা জীবন ধ'রে আমি কাজ করেছি, কখনও নাম চাইনি, খ্যাতি চাইনি। এই একটা অসাধ্য-সাধনের খ্যাতি। আমি যদি মৃত্যুর পরেও পেতে চাই, তোমরা এখনও বাধা দেবে আমাকে?

সেই একদিন দেখলাম কাকীমা চেঁচিয়ে কাঁদলেন। আর্তস্বরে কেঁদে উঠলেন না না, না গো না। তুমি জানো

না, ওরা কেউ বুঝবে না, হাসবে, তোমার নাম নিয়ে ঠাট্টা করবে। সে আমি সইতে পারব না। তোমার কাছে কখনও তো কোনো অন্যায় করিনি, এতবড় শাস্তি আমাকে তুমি দিয়ে যেয়ো না।

বিছানার ওপর শুয়ে পড়ে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন। কাকাবাবু ধীরে ধীরে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন, শেষে বললেন, আচ্ছা, থাক তবে।

অনেকক্ষণ পরে কাকীমা কথা বললেন। মুখ না তুলেই বললেন, আচ্ছা এক কাজ কর।

কাকাবাবু বললেন, কি ?

কাকীমা বললেন, আমিও বেশিদিন বাঁচব না। এখন নয়, আমি মরার পরে প্রভাত সমস্ত কথা প্রকাশ করবে।

কাকাবাবু বললেন বেশ, তাই।

ক'দিন পরে কাকাবাবু মারা গেলেন।

কাকীমা কান্নাকাটি করলেন না. যেমন তাঁর স্বভাব ছিল, অত্যন্ত ধীর শান্তভাবে সমস্ত কাজের ব্যবস্থা করলেন। আত্মীয়স্বজনদের খোঁজ পাঠিয়ে দিলেন, বাড়ি গাড়ি সব বেচে দিলেন, ল্যাবোরেটরিটা ইউরোপের কোন একটা ইউনিভার্সিটি নিয়ে গেল। সমস্ত বেচেকিনে কলকাতা শহরের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে দিয়ে, গিরিডিতে একটি ছোট্ট বাড়ি কেনা ছিল সেইখানে গিয়ে উঠলেন। আমিই পৌঁছে দিয়ে এলাম। বললাম, কাকীমা, শহরের বাইরে এই জঙ্গলে, এখানে কি থাকতে পারবেন ?

কাকীমা বললেন, এইখানেই থাকব। কলকাতা শহরে থাকা কি আমার পক্ষে সহজ ছিল মনে কর ?

প্রথম প্রথম আমি প্রায়ই যেতাম। কতগুলো সাঁওতাল ছেলেমেয়েকে জুটিয়ে নিয়েছিলেন, তাদের নিয়ে ছেলেমানষি হৈ-চৈ ক'রে দিন কাটাবার চেষ্টা করতেন। পরিণত জীবনের দুঃস্বপ্নকে ভুলে আবার বালো ফিরে যাওয়ার সে এক করুণ সাধনা। বছর দুই পরে একদিন হঠাৎ আমাকে বললেন, প্রভাত আর কোরো না, তুমিও আর এসো না আমার কাছে।

আমি বললাম, আসব না ?

কাকীমা বললেন, না। তুমি এলে খুব খুশী হই, তবু তোমাকে দেখলেই আমার আবার সব কথা মনে প'ড়ে যায়। ভুলতে পারিনে।

আমি বললাম, কিন্তু যদি অসুখ হ'য়ে পড়েন ?

তিনি বললেন, এই এরা আছে, এরাই দেখবে। আর আমি সব ব্যবস্থা করে রাখব, দুদিন পরে হোক দশ-বিশ বছর পরে হোক, যখনই মরি তুমি ঠিক খবর পাবে। তোমার ওপরে তাঁর কাজ চাপানো আছে, আমি সেকথা ভুলিনি।

এর পরে আর তাঁর সঙ্গে দেখা করিনি নিজে কয়েকবার তবুও গেছি, তাঁকে দেখা দিই নি, দূর থেকে লুকিয়ে দেখে আবার পালিয়ে চলে এসেছি। কখনও দেখেছি তিনি শিশু হ'য়ে শিশুদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছেন। কখনও দেখেছি শহরের বাইরে যেখানে শাল আর পলাশের বন ফুলে ফুলে ভর্তি হ'য়ে গেছে,

তার দিকে তাকিয়ে তন্ময় হ'য়ে হেঁটে যাচ্ছেন, চোখের দৃষ্টি এ-পৃথিবীতে নেই, যেন কোন্ হারানো দিনের উদ্দেশে মন তাঁর উধাও হ'য়ে চ'লে গেছে। ভুলতে পেরেছিলেন এ আদি বিশ্বাস করি না, তোলবার জিনিস এ নয়।

প্রভাতদা থামিলেন। নিতাইবাবু কহিলেন, তারপর?

প্রভাতদা কহিলেন, তারপর আর নেই। ক'দিন আগে একটি চিঠিতে তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়েছি। পুরোনো একটি খামে তাঁরই হাতে ঠিকানা লেখা হয়তো। আগে থাকতেই কারও হাতে দিয়ে রেখেছিলেন। তারপর খবরের কাগজে তাঁর মৃত্যুসংবাদ আপনারা সবাই দেখেছেন, দেও হয়তো তিনিই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন, যাতে পরে আমার কাছে পৌঁছবার বাধা না হয়।

প্রভাতদা হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবার চলি কবিরাজ মশাই—বলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

কবিরাজ কহিলেন, নিতাইবাবু, আমরাও তাহ'লে—

পাট হইতে নামিয়া জুতায় পা গলাইতে গলাইতে গোপেনবাবু কহিলেন, ডেঞ্জারাস লোক!

কষী দাঁতে দাঁত চাপিয়া কহিল ব্রুট!

২/-3-5৮

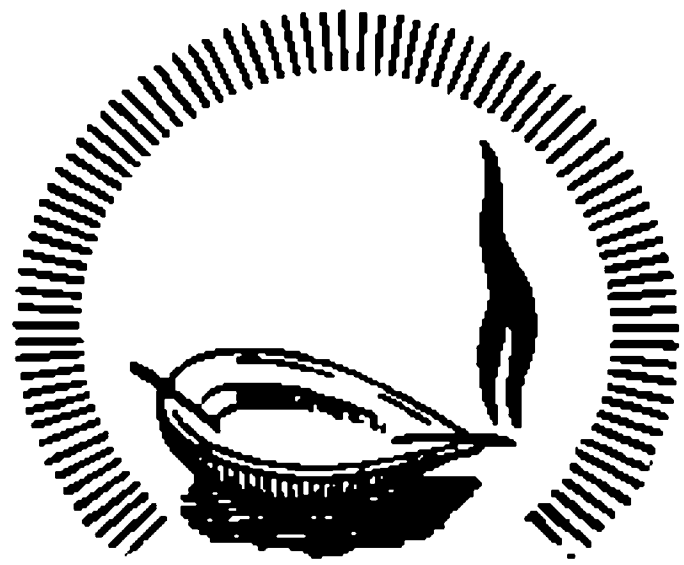

গল্প-ভারতী